



ଜଗନ୍ନାଥ ମେହରା
—ଆବିଷ୍କାର—

ডঃওহরলাল নেহরু আত্ম-চরিত

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
কর্তৃক অনূদিত

স্বরেশচন্দ্র মজুমদার
শ্রীগৌরান্ধ্র প্রেস
কলিকাতা

প্রকাশক : সুরেশচন্দ্র মজুমদার
মুদ্রাকর : প্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরীনাথ প্রেস
৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

১লা বৈশাখ, ১৩৪৪

মূল্য চারি টাকা

লোকান্তরিত।

কমলাকে

ভূমিকা

এই গ্রন্থের সমগ্র অংশই কারাগারে লিখিত হইয়াছে। কেবল পুনশ্চ এবং ১২৩৪-এর জুন হইতে ১২৩৫-এর ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত বর্ণনায় দুই একস্থানে সামান্য পরিবর্তন করিতে হইয়াছে। ইহা লিখিবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নিজেকে কোন নির্দিষ্ট কাজে নিয়োজিত রাখা, দীর্ঘ কারাবাসের নিঃসঙ্গতার মধ্যে ইহার প্রয়োজন ছিল। বাহার সহিত আমার ব্যক্তিগত যোগ রহিয়াছে, ভারতের সেই অতীত ঘটনাগুলি পর্যালোচনা করিয়া যাহাতে উহা আমি স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারি সে উদ্দেশ্যও ছিল। আত্মজিজ্ঞাসার ভাব লইয়া আমি লিখিতে আরম্ভ করি, শেষ পর্য্যন্ত বহুলাংশে সেই ভাবই রহিয়া গিয়াছে। পাঠকদের সম্পর্কে সতত সচেতন থাকিয়া আমি ইহা লিখি নাই; কিন্তু যদি কোন পাঠকের কথা মনে উদয় হইয়া থাকে, তবে তাঁহারা আমার স্বদেশের নরনারী। বিদেশী পাঠকদের জন্ত লিখিলে হয়ত আমি স্বতন্ত্র ভাবে লিখিতাম অথবা ভিন্নরূপ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করিতাম; বর্ণনামুখে যে সকল বিষয় উপেক্ষা করিয়া গিয়াছি হয়ত সেগুলির উপর বিশেষ জোর দিতাম, আবার যে সকল বিষয় ভাবে বর্ণনা করিয়াছি তাহা সংক্ষেপে করিতাম। শেষোক্ত প্রকারের বর্ণনায় অ-ভারতীয় পাঠকেরা উপভোগ করিবার কিছুই না পাইতে পারেন অথবা উহা অনাবশ্যক মনে করিতে পারেন অথবা তর্ক বা আলোচনার অযোগ্য মনে করিতে পারেন; কিন্তু আমার মনে হয় ভারতে এখনও ঐগুলির উপযোগিতা রহিয়াছে। আমাদের ঘরোয়া রাজনীতি এবং বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনাগুলিকেও বাহিরের লোকেরা অনাবশ্যক বা অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই মনে করিবেন।

আমি আশা করি পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন, এই গ্রন্থখানি আমার জীবনের এক বিশেষ দুঃখপূর্ণ সময়ে লিখিত। ইহার মধ্যে তাহার ছাপ বিগ্ৰহমান। যদি অধিকতর স্বাভাবিক অবস্থায় লিখিতে পারিতাম, তাহা হইলে ইহা হয়ত স্বতন্ত্র রকমের হইত এবং সম্ভবতঃ স্থানে স্থানে অধিকতর সংযত হইত। তথাপি আমি বর্তমান আকারেই ইহা প্রকাশের সঙ্কল্প করিলাম, কেন না লেখার সময় আমার মনে যে সকল ভাবের উদয় হইয়াছে, কেহ কেহ তাহা পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন।

আমার নিজের মানসিক বিকাশ ও পরিণতিকে অনুসরণ করিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, ভারতের আধুনিক ইতিহাস লিখিতে

চেষ্টা করি নাই। এই বর্ণনার মধ্যে ঐরূপ বাহ্য সাদৃশ্য রহিয়াছে বলিয়া কোন কোন পাঠক বিভ্রান্ত হইতে পারেন এবং ইহার যাহা প্রাপ্য নহে তাহার অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে পারেন। অতএব আমি তাঁহাদের সাবধান করিয়া দিয়া বলিতে চাহি, এই বর্ণনা সম্পূর্ণরূপে একদেশদর্শী এবং অনিবার্ধ্যরূপেই ইহাতে আত্মকীর্তন আসিয়া পড়িয়াছে; ইহাতে অনেক গুরুতর ঘটনার একেবারেই উল্লেখ করি নাই; অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি যাহারা ঘটনার শ্রোত নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা অল্পই বলিয়াছি। অতীত ঘটনার প্রকৃত আলোচনায় ইহা অমার্জনীয় হইতে পারে কিন্তু ব্যক্তিগত বিবৃতিতে এ প্রশ্নটুকু পাইবার আশা রাখি। যাহারা আমাদের আধুনিক অতীত সম্পর্কে প্রকৃতভাবে অধ্যয়ন করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে অগ্রত্ব অনুসন্ধান করিতে হইবে। যাহা হউক, এই গ্রন্থ ও অগ্রাণ্ড আত্মকথা তাঁহারা পরিপূরক হিসাবে পাঠ করিতে পারেন এবং ইহা বাস্তব ঘটনা বুঝিবার পক্ষে সহায়ক হইবে বলিয়া মনে করি।

আমার গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র, যে সমস্ত সহকর্মীর সহিত আমি দীর্ঘকাল একত্রে কাজ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, তাঁহাদের অনেকের কথা আমি সরলভাবে আলোচনা করিয়াছি; আমি দল বা ব্যক্তিরও সমালোচনা করিয়াছি, সম্ভবতঃ স্থানে স্থানে তাহা তীব্র হইয়াছে। কিন্তু এই সমালোচনার ফলে তাঁহাদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা হারাই নাই। আমার মনে হয় যাহারা জনসাধারণের কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি এবং যে জনসাধারণের তাঁহারা সেবা করেন, তাহাদের প্রতি সরল ব্যবহার করা ভাল। বাহ্য ভদ্রতা এবং অশোভনীয় ও কখনও বা বিরক্তিকর প্রশ্ন এড়াইয়া যাওয়ার দ্বারা পরস্পরকে এবং উপস্থিত সমস্তকে প্রকৃত ভাবে বুঝিবার সুবিধা হয় না। পরস্পরের ভেদ ও ঐক্য ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়ার উপরই প্রকৃত সহযোগিতার ভিত্তি স্থাপিত হওয়া উচিত এবং যতই অসুবিধা-জনক হউক না কেন সর্বদাই বাস্তব ঘটনার সম্মুখীন হওয়া উচিত। যাহা হউক; আমার বিশ্বাস আমি যাহা লিখিয়াছি, তাহাতে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে লেশমাত্র ঈর্ষা বা ঘেঁষ নাই।

আমি ইচ্ছা করিয়াই ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক ব্যাপারগুলি আলোচনা করি নাই, তবে সাধারণ ভাবে ও পরোক্ষভাবে উহা উল্লেখ করিয়াছি মাত্র। কারাগারে বসিয়া উহা সম্যকরূপে আলোচনা করার অবস্থা আমার ছিল না অথবা আমার কি করা উচিত তাহাও স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই। এমন কি কারামুক্তির পর বাহিরে আসিয়াও এ বিষয়ে নূতন কোন আলোচনা এই গ্রন্থে সংযোগ করা সমীচীন

মনে করি নাই। যাহা আমি লিখিয়াছি, তাহার সহিত উহার সামঞ্জস্য হইবে না বলিয়াই মনে করি। অতএব এই ‘আত্মচরিত’ ব্যক্তিগত জীবনের কয়েকটি রেখাচিত্র, অতীতের অসম্পূর্ণ বিবরণ এবং বর্তমানের সীমারেখায় আসিয়াও, সাবধানতা সহকারে তাহা হইতে স্বতন্ত্রই রহিয়া গেল।

বাদেনউইলার
২রা জানুয়ারী, ১৯৩৬।

জওহরলাল নেহরু

অনুবাদকের নিবেদন

একদিন পণ্ডিত জওহরলালের নিকট হইতে অপ্রত্যাশিতভাবে অনুরোধ আসিল, তাঁহার আত্ম-চরিত অনুবাদের ভার যদি আমি গ্রহণ করি, তাহা হইলে তিনি আনন্দিত হইবেন। সঙ্গে সঙ্গে বোলপুর ‘শান্তি-নিকেতন’ হইতে শ্রীযুক্ত অনিল কুমার চন্দ লিখিলেন, আপনাকে স্বীকার করিতেই হইবে, আপনি ছাড়া ইত্যাদি। বুঝিলাম, এড়াইবার পথ আমার বন্ধুরা পূর্বেই বন্ধ করিয়াছেন। সঙ্কোচ ও দ্বিধার সহিত কার্য্যভার গ্রহণ করিলাম। জওহরলালের চিন্তা ও আবেগের সতেজ বলিষ্ঠ প্রকাশ-ভঙ্গী, তাঁহার রচনা-নৈপুণ্য, তাঁহার ভাষার স্নসম্পূর্ণ সহজ শিষ্টতা, ভাষান্তরিত করিতে গিয়া যথাযথভাবে ফুটাইয়া তোলা দুঃসাধ্য এবং অনুবাদকের ক্ষেত্রও সীমাবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ; দ্বিধা-সঙ্কোচের কারণ ইহাই। দ্রুত অনুবাদ করিতে গিয়া মূল গ্রন্থের সৌন্দর্য্য কতখানি রক্ষা করিতে পারিয়াছি সে বিচারের ভার পাঠকগণের উপরই অর্পণ করিলাম।

কোন ভারতবাসী লিখিত আত্ম-চরিত ইতিপূর্বে স্বদেশে ও বিদেশে এমন সমাদর লাভ করে নাই। বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক, সাহিত্যিক ও সংবাদপত্র এই গ্রন্থখানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় ইহা অনূদিত হইয়াছে। ভারতেও হিন্দী, উর্দু, গুজরাটি, মারাঠী, তামিল, মালায়ালাম প্রভৃতি ভাষায় ইহার অনুবাদ হইয়াছে ও হইতেছে। অতএব বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকাদের হস্তে এই সর্বজন-সমাদৃত

এবং শত্রুমিত্র-প্রশংসিত গ্রন্থখানি উপহার দিতে সক্ষম হইয়া আমি আনন্দ ও গর্ববোধ করিতেছি।

জওহরলাল নব্যভারতের জাতীয় স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্যবিগ্রহ। জীবন প্রভাতেই তিনি দুর্লভের কামনায় অধীর হইয়া দুর্গম পথের যাত্রী হইয়াছেন। তাঁহার মানসিক বিকাশের ইতিহাস, চিন্তা ও চরিত্রের উদ্দাম গতিবেগের সহিত সংগ্রামের ইতিহাস, বঞ্চিত ভারতবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষার সহিত, ক্রটি ও প্রবৃত্তির বৈচিত্র্য সম্বন্ধে নিজেকে একান্ত করিবার ইতিহাস কেবল তাঁহার ব্যক্তিগত কাহিনী নহে, আমাদের জাতীয় আন্দোলনের এক গৌরবময় অধ্যায়। বাঙ্গলার স্বাধীনতাকামী জাগ্রত যুবকগণ শুনিবেন, ইহার মধ্যে তাঁহাদেরই দুরাকাঙ্ক্ষায় দুঃসাহসী হৃদয়ের প্রতিধ্বনি। ভারতবর্ষের অপমানাহত চিত্তের অবরুদ্ধ বেদনাকে বরণ করিয়া ধুমলেশহীন জ্যোতিঃশিখার মত জীবনের এই শোকহীন ভয়হীন অনন্তসাধারণ অভ্যুদয়ের বার্তা, আমার দুর্বল লেখনী যদি বিকৃত বা আড়ষ্ট না করিয়া থাকে তাহা হইলেই আমার এই কঠিন শ্রম সার্থক হইবে।

জওহরলালের প্রতি শ্রদ্ধা ও আমার প্রতি স্নেহ বশতঃ শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র মজুমদার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই গ্রন্থ মুদ্রণ ও প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মুদ্রণ, প্রচ্ছদপট, কাগজ, চিত্র প্রভৃতি যথাসাধ্য সুন্দর ও শোভন করিতে তিনি চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। ইংরাজী পুস্তকে যে সকল ছবি আছে, তাহা ছাড়াও আরও তিনখানি নূতন ছবি ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। ইংরাজী গ্রন্থের আকার ও আয়তনের সহিত এই গ্রন্থের সমতা রক্ষার জন্য তিনি স্থানীয় কাগজের কল হইতে অমূরূপ আকারের উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত করাইয়াছেন। ইহার জন্য গ্রন্থ প্রকাশে কিছু বিলম্ব হইয়াছে। তবে তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যতীত এতবড় গ্রন্থের মূল্য এত সুলভ করা সম্ভবপর হইত না। নিবেদন ইতি—

আনন্দলাজার পত্রিকা কার্যালয়

১লা বৈশাখ, ১৩৪৪ সাল

}

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

সূচীপত্র

বিষয়

পৃষ্ঠা

১। কাশ্মীর হইতে অবতরণ

নেহরু-পরিবারের দিল্লী আগমন—১৮৫৭-র বিদ্রোহ—আগ্রায়
মতিলালের জন্ম—এলাহাবাদে আগমন—পিতার শিক্ষা ও
আইন ব্যবসায়—জওহরলালের জন্ম।

১—৬

২। শৈশব কাল

ভারতবাসীর প্রতি ইংরাজ ও ফিরঙ্গীদের ব্যবহার—বাল্যজীবনের
চপলতা—অন্তঃপুরের ধর্মভাব—সামাজিক পূজা উৎসব—কাশ্মীরী
নারীদের স্বাধীনতা—পিতৃ-স্নেহ।

৭—১৩

৩। থিয়োজফি

আনন্দ ভবন—কনিষ্ঠা ভগ্নীর জন্ম—পিতার বিলাতযাত্রা—ইংরাজ
গৃহ-শিক্ষক—বাল্যের পাঠস্পৃহা—থিয়োজফিতে অনুরাগ—মিসেস
বেশাস্তের বক্তৃতা শ্রবণ—থিয়োজফিতে দীক্ষা গ্রহণ—রুশ-জাপান
যুদ্ধ—জাতীয়-ভাবের প্রথম উন্মেষ—বিলাতযাত্রা।

১৩—১৯

৪। হারো ও কেমব্রিজ

লণ্ডন—ডাঃ আনসারীর সহিত সাক্ষাৎ—হারো স্কুলে যোগদান—
ছাত্রজীবনের চাপলা—হারো হইতে বিদায়—কেমব্রিজ বিশ্ব-
বিদ্যালয়—যৌন অভিজ্ঞতার কথা—বিলাস-বিপুলতা—‘ভারতীয়
মজলিস’—বিশিষ্ট ভারতীয় রাজনীতিকদের দর্শনলাভ—পিতার
মডারেট মনোবৃত্তিতে বিরক্তি—জাতীয়দল ও তিলক—কেমব্রিজ
ত্যাগ—ব্যারিষ্টারী পাশ—নরওয়ে ভ্রমণ।

১৯—৩১

৫। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও ভারতে মহাযুদ্ধের সমসাময়িক রাজনীতি

বাকীপুর কংগ্রেস—গোখ্লে ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু—হাইকোর্টে
যোগদান—ইংরাজ কর্ত্তারীদের মানসিক অবস্থা—ত্রিনিবাস
শাস্ত্রীর বক্তৃতা শুনিয়া হৃৎ—মহাযুদ্ধ ও ভারতরক্ষা আইন—
হোমরুল লীগ—মডারেটগণের মনোভাব—জনসভায় প্রথম

বিষয়

পৃষ্ঠা

বক্তৃতা—পিতার মানসিক স্বন্দ—লঙ্কো কংগ্রেস ও গান্ধিজীর সহিত
প্রথম সাক্ষাৎ—সমাজতন্ত্রবাদের প্রতি অমুরক্তি—শ্রুর রাসবিহারী
ঘোষের সহিত সাক্ষাৎ ।

৩২—৪৩

৬। আমার বিবাহ ও হিমালয় ভ্রমণ

বিবাহ—কান্ধীর ভ্রমণ ।

৪৪—৪৬

৭। গান্ধিজীর অভ্যুদয়—সত্যাগ্রহ ও অমৃতসর

ভারতে অবরুদ্ধ উত্তেজনা—খিলাফৎ লইয়া মুসলমানদের বিকোভ
—রাউলট বিল—গান্ধিজীর আইন অমান্ত প্রস্তাব—পিতার
সত্যাগ্রহ বিরুদ্ধতা—পিতার সহিত মতান্তর—সত্যাগ্রহ দিবস—
জালিওয়ানালা বাগ—পঞ্জাবে সামরিক আইন—কংগ্রেসের
অনুসন্ধান কমিটি—দি ইণ্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকা—পিতার সভাপতিত্বে
অমৃতসর কংগ্রেস—মহাত্মাজীর বিলাতযাত্রা—খিলাফৎ কমিটির
দাবী—মুসলিম লীগের সভার অভিজ্ঞতা—গান্ধিজীর অসহযোগ
আন্দোলন ঘোষণা ।

৪৬—৫৫

৮। আমার বহিষ্কার ও তাহার ফলাফল

মডারেট ও চরমপন্থী—জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র—মাতা ও স্ত্রীসহ
মুর্সোদী যাত্রা—সরকারী নিষেধাজ্ঞা ও বহিষ্কার—আদেশ প্রত্যাহার
—কৃষক আন্দোলনের প্রথম অভিজ্ঞতা—কৃষক নেতা রামচন্দ্র—
পল্লীভ্রমণ—কৃষক ও রায়তদের অবস্থা ।

৫৬—৬৪

৯। কৃষকদের মধ্যে ভ্রমণ

পল্লীতে ভ্রমণ-কঃ—জনসভায় বক্তৃতা অভ্যাস—তালুকদার ও
জমিদার—অসহযোগ আন্দোলন—গভর্ণমেণ্টের সহিত কৃষকদের
সংঘর্ষ—রায়বেরেলীতে গুলিবর্ষণ—গ্রেফতারের ধুম—দৈজাবাদ
কৃষক আন্দোলন মন্দীভূত ।

৬৪—৭২

১০। অসহযোগ

কলিকাতা বিশেষ কংগ্রেস—লালাজী—সি. আর. দাশ ও পিতার
বন্ধুত্ব—কংগ্রেসের নব রূপান্তর—আইন সভা নির্বাচন বর্জন—
মিঃ জিন্নার মনোভাব—মডারেটগণের কংগ্রেস বিরোধিতা—
১৯২১-এর জাগরণ—ব্রিটিশ শাসকদের উপর প্রতিক্রিয়া—
কংগ্রেস ও খিলাফৎ—রাজনীতিক ধর্মভাবের আধিক্য—অহিংসার
নৈতিক আদর্শ ।

৭২—৮৫

বিষয়

পৃষ্ঠা

১১। ১৯২১ এবং প্রথম কারাদণ্ড

হিন্দু মুসলমান মিলন—গান্ধিজীর অহিংসা—আদর্শ—সরকারী
দমননীতি—খুবসাজের অভিযোজনা বয়স্কট—বাসুলা ও যুক্তপ্রদেশে
গ্রেফতার ও কারাদণ্ড—চৌরীচাওরা—গান্ধিজীর নিরুপদ্রব
প্রতিরোধ নীতি প্রত্যাহার ও কারাদণ্ড।

৮৫—৯৩

১২। অহিংসা ও তরবারীর পথ

গান্ধিজীর অহিংসানীতি—চৌরীচাওরার প্রতিক্রিয়া—আমার ও
পিতার কারাদণ্ড—কারামুক্তি ও আহাশ্বাদবাদে গান্ধিজীর সহিত
সাক্ষাৎ—আবার গ্রেফতার ও কারাদণ্ড।

৯৩—১০২

১৩। লক্ষ্মৌ জেল

কারাগার সম্পর্কে অপরিচয়ের ভীতি—কারাগারে প্রবেশের প্রথম
অভিজ্ঞতা—অসহযোগী বন্দীদের প্রতি কারাকর্তৃপক্ষের ব্যবহার—
দৈনন্দিন কার্য—জনপূর্ণ ব্যারাকে বাস—প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের
জন্তু ব্যাকুলতা—জেলে কঠোরতা—রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি
দুর্ব্যবহার।

১০৩—১১২

১৪। কারামুক্তি

কারামুক্তির প্রথম অনুভূতি—কংগ্রেসে অবসাদ—কাউন্সিল
প্রবেশ লইয়া মতভেদ—দেশবন্ধু ও পিতার চিন্তাধারা—পরিবর্তন
বিরোধী ও স্বরাজ্যদল—কংগ্রেসের মিউনিসিপালিটিতে প্রবেশ—
হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রী গ্রীণউড মীয়ার্স—এর পত্র—তাঁহার
সহিত আলোচনা—মন্ত্রিসভার প্রলোভন—যুক্তপ্রদেশে মন্ত্রিত্ব-বিভ্রাট
—স্বরাজ্যদলের ফলে মন্ত্রীদেব ক্ষমতা হ্রাস।

১১২—১১৯

১৫। সন্দেহ ও সংঘর্ষ

কংগ্রেসী রাজনীতিতে অবসাদ—স্বরাজ্যদলে যোগদানে অনিচ্ছা
—পিতা ও দেশবন্ধুর বন্ধুত্ব এবং চরিত্রগত স্বাতন্ত্র্য—আমাদের
পারিবারিক জীবনে পরিবর্তন—পিতার উপর নির্ভরতায় দুঃখ—
কংগ্রেসের সম্পাদকদিগকে বেতন দিবার প্রস্তাব—পিতার আপত্তি
—কংগ্রেসে দলাদলি।

১২০—১২৫

১৬। নাভার কৌতুক

পঞ্জাবে আকালী শিখ আন্দোলন—দিল্লী বিশেষ কংগ্রেসের পর
জাইটো যাত্রা—গ্রেফতার—নাভা জেলের অভিজ্ঞতা—নাভা

বিষয়

পৃষ্ঠা

আদালতে বিচার বিভ্রাট—পিতার উৎকর্ষ ও নাভা আগমন—
দেশীয় রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা—নাভার সিভিলিয়ান ব্রিটিশ শাসকের
কাণ্ড—বিচার শেষ ও অকস্মাৎ কারামুক্তি—আত্মদৌর্ভল্য।

১২৬—১৩৫

১৭। কোকোনদ ও মোলানা মহম্মদ আলী

কোকোনদ কংগ্রেস—মহম্মদ আলীর আমার প্রতি অনুরাগ—
আমাদের মধ্যে ধর্ম-সম্পর্কিত আলোচনা—তাঁহার ধর্মবিশ্বাসের
গভীরতা—তাঁহার ক্রমে কংগ্রেস ত্যাগ—হিন্দুস্থানী সেবাদল
গঠন—এলাহাবাদে কুস্ত মেলা—পুলিশের নিষেধাজ্ঞা—মালব্যজীর
সত্যগ্রহ—অবশেষে নিষ্পত্তি।

১৩৫—১৪৩

১৮। আমার পিতা ও গান্ধিজী

কারাগারে গান্ধিজীর পীড়া—পুণা হাসপাতালে অস্ত্রোপচার—পিতা
ও আমার পুণা যাত্রা—গান্ধিজীর কারামুক্তি—জুহুতে সমুদ্রতীরে
অবস্থান—গান্ধিজীর সহিত আলোচনা ও মতভেদ—স্বরাজ্যদলের
বাধা প্রদান নীতির ফল—আহাম্মদাবাদে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির
স্বরণীয় অধিবেশন—গোপীনাথ সাহাচার প্রস্তাব লইয়া তীব্র মতভেদ
—খাদি ও চরকা—স্বরাজীদের সহিত গান্ধিজীর আপোষরফা—
গান্ধিজীর সহিত পিতার পুনরায় মিলন—গান্ধিজীর প্রতি পিতার
শ্রদ্ধা—পিতার সহিত তাঁহার চরিত্রের পার্থক্য—স্বরাজ্যদলের
দৌর্ভল্য—বিশ্বাসঘাতক কংগ্রেসীদের সরকারী চাকুরী গ্রহণ ও
তাঁহার দল—বেলগাম কংগ্রেস—পিতার অসুস্থতা—হিমালয়ে
বিশ্রাম—দেশবন্ধুর মৃত্যুসংবাদ ও পিতার শোক—আমাদের
কলিকাতা যাত্রা।

১৪৩—১৫৫

১৯। উদ্দাম সাম্প্রদায়িত্ব

আমার টাইফয়েড রোগ ও আরোগ্য লাভ—হিন্দু মুসলমান সমন্বয়
—দাঙ্গা-হাঙ্গামা—সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির প্রাবল্য—কংগ্রেসের
বিপত্তি—ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের নীতি ও প্রতিরোধের উপায়ের
ব্যর্থতা—সাম্প্রদায়িকতার স্বরূপ—রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াপন্থীদের
তথাকথিত ধর্মামুরাগ—কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদী মুসলমান—
ঐক্য সম্মেলন ও তাঁহার ব্যর্থতা—এলাহাবাদে হিন্দু মুসলমান
কলহ।

১৫৫—১৬৪

২০। মিউনিসিপালিটির কাজ

এলাহাবাদ মিউনিসিপালিটির সভাপতিত্ব—মিউনিসিপালিটির

বিষয়

পৃষ্ঠা

ক্রটি—সরকারী হস্তক্ষেপ—ট্যাক্স ধার্যে পক্ষপাতিত্ব—স্বায়ত্ত
শাসনের ব্যর্থতা—কংগ্রেসের প্রভাব দূর করিবেন জগদ্বৈশিষ্ট্যের
চেষ্ঠা—কলিকাতা কংগ্রেসের আইন সংস্কার—কংগ্রেস কর্মীদের
চাকুরী হইতে বঞ্চিত করা—আমার পদত্যাগ—পত্নীর পীড়া—দ্বী-
কতাসহ ইউরোপে যাত্রা।

১৬৫—১৭২

২১। ইউরোপে

তের বৎসর পরের ইউরোপ—জেনেভার শ্রামজী কৃষকস্বার্থ সহিত
সাক্ষাৎ—রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ—মাদাম কামা—মৌলবী
ওবেইদুল্লাহ, মৌলবী বরকতউল্লাহ—বালিনে ভারতীয় বিপ্লবী দল
ঠাহাদের দুরবস্থা—হরদয়াল—বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—
মানবেন্দ্রনাথ রায়—নির্বাসিত ভারতীয়দের অবস্থা—অক্সফোর্ড
গুপ আন্দোলন।

১৭২—১৮০

২২। ভারতে রাজনৈতিক বিতর্ক

ইংলণ্ডে গমন—খনি শ্রমিকদের ধর্মঘট—ভারতের রাজনীতি
—কংগ্রেস বিরোধী নূতন জাতীয় দল—মালব্যজীর চরিত্র ও
দৃষ্টিভঙ্গী—লালা লাজপৎ রায়ের রাজনীতি—ক্রমবর্ধিত
সাম্প্রদায়িক মনোমালিঙ্গ—স্বরাজ্য দল ও জাতীয় দলে
বিরোধ—স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হত্যাকাণ্ড।

১৮১—১৮৭

২৩। ক্রসেলস-এ নির্ঘাতিত সম্মেলন

সম্মেলনের প্রতিনিধিদের পরিচয়—জর্জ ল্যান্সবেরির সভাপতিত্ব
—স্বায়ী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রতিষ্ঠান গঠন—পাশ্চাত্য
রাজনীতির অভিজ্ঞতা লাভ—ইউরোপে গোয়েন্দার কৌতুক—
দিল্লী-চুক্তিতে স্বাক্ষর করায় সজ্জ হইতে আমার বহিষ্কার—
পিতার ইউরোপে আগমন—আমাদের মনো যাত্রা—সোভিয়েট
যৌথ ব্যবস্থা পরিদর্শন—সাইমন কমিশন ঘোষণা—লণ্ডনে
শ্রম জন সাইমনের সহিত সাক্ষাৎ—মাদ্রাজ কংগ্রেসের জগদ্বৈশিষ্ট্য
কৃত ভারতে প্রত্যাবর্তন।

১৮৭—১৯২

২৪। ভারতে প্রত্যাবর্তন এবং রাজনীতিতে যোগদান

ইউরোপের অভিজ্ঞতা—মাদ্রাজ কংগ্রেস—স্বাধীনতার প্রস্তাব—
সাইমন কমিশন বয়কট প্রস্তাব—কংগ্রেসের সম্পাদকত্ব গ্রহণ—
দিল্লীতে হাকিম আজমল খাঁর মৃত্যু—আমার অহিন্দু সংস্কারের
সমালোচনা—১৯২৮-এর রাজনীতি, শ্রমিক-কৃষক-চাঞ্চল্য ও

‘বু-আন্মোলন—“Go back Simon”—সর্বদল সম্মেলনী—
লঙ্কো অধিবেশন—ইণ্ডিপেন্ডেন্স লীগ গঠন—সাইমন
কমিশনের বিরূপ অভ্যর্থনা—লাহোরে লালাজী পুলিশের প্রহারে
আহত হওয়ার ফলে দেশব্যাপী বিক্ষোভ—লালাজীর মৃত্যু—
ভগৎসিং ও টেরোরিজম্।

১৯৩—২০৫

২৫। যষ্টি সঞ্চালনের অভিজ্ঞতা

লঙ্কোয়ে বয়কটের আয়োজন—প্রথম পুলিশের প্রহারের অভিজ্ঞতা
—পিতার উৎকর্ষ ও লঙ্কো আগমন—পুলিশের কংগ্রেস মিছিল
আক্রমণ ও আমার মনোভাব—কমিশনের স্বতন্ত্র পথে প্রস্থান—
গোবিন্দবল্লভ পণ্ডিত গুরুতর আহত—পুলিশের নিষ্ঠুরতা—
অন্ধ সংঘর্ষের পরিণাম কি।

২০৬—২১০

২৬। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস

রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের চিন্তাধারা—ভারতে সমাজতন্ত্রবাদ—
ইণ্ডিপেন্ডেন্ট লীগের পরিণতি—আমার গ্রেফতারের গুজব—
আসন্ন কলিকাতা কংগ্রেস—পিতার সহিত মতভেদ—সর্বদল
সম্মেলনের রিপোর্টে ক্ষোভ—ঝরওয়ার ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে
যোগদান—শ্রমিক আন্দোলনের ভাবধারা—আমার সভাপতিত্ব—
ভারতে মালিক মনোবৃত্তি—শ্রমিক নেতাদের গ্রেফতার ও মীরাট
যড়যন্ত্র মামলার সূচনা—আইনজীবীদের অর্থলালসা—মীরাট
মামলা তথ্যের অভিজ্ঞতা।

২১১—২২০

২৭। ঝটিকার পূর্বাভাস

আইন সভাগুলির শোচনীয় পরিণতি—নিষমতান্ত্রিক আন্দোলনের
বার্ঘতা—গান্ধিজীর খাদি প্রচার ও জনসাধারণের উপর অপূর্ণ
প্রভাব—লাহোর যড়যন্ত্র মামলা ও অনশন ধর্মঘট—কারাগারে
ভগৎসিং ও যতীন দাসের সহিত সাক্ষাৎ—যতীন দাসের মৃত্যু—
গান্ধিজীর অস্বীকৃতিতে আমাকে সভাপতি নির্বাচন—নির্বাচনে
আমার বিরক্তি ও পরে আত্মসম্বরণ—পিতার আনন্দ—বড়লাট
কর্তৃক গোলটেবিল বৈঠক ঘোষণা—দিল্লীতে নেতৃ সম্মেলন—
সহযোগিতার সর্ব রচনা—আপোষের সর্বশেষ চেষ্টা—গান্ধিজী
এবং পিতার বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ—আলোচনার নিষ্ফলতা—
নাগপুরে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে সভাপতিত্ব—
শ্রমিক কংগ্রেসের সহিত জাতীয় কংগ্রেসের স্বাতন্ত্র্য—শ্রমিক
নেতাদের মতভেদের ফলে শ্রমিক কংগ্রেসে বিরোধ ও বিচ্ছেদ।

২২০—২৩২

বিষয়

পৃষ্ঠা

২৮। স্বাধীনতা এবং তাহার পর

লাহোর কংগ্রেসের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা—পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাব—
খাঁ আবদুল গফ্ফার খাঁ ও সীমান্তের কংগ্রেসকর্মীগণ—২৬শে
জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস ঘোষণা—এলাহাবাদে কুস্তি মেলা—
আনন্দ ভবনে জনতার ভীড়—আমার জনপ্রিয়তা—আমার ও
পিতার সম্পর্কে অলীক কাহিনী—বীরপুজায় আমি কি গর্বিত ?
—আমার জনপ্রিয়তায় পরিবারবর্গের পরিহাস—মানসিক স্বস্তি
সংঘাত ।

২৩৩—২৪১

২৯। আইন অমান্তের সূচনা

পূর্ণ স্বাধীনতা দিবসের প্রেরণা—গান্ধিজীর নেতৃত্ব গ্রহণ—লবণ
আইন ভঙ্গ প্রস্তাব—গান্ধিজীর সহিত বড়লাটের পত্র বিনিময়—
ডাণ্ডী অভিযান—কংগ্রেসের সংঘর্ষের ব্যবস্থা—জাম্বুসারে গান্ধিজীর
সহিত আমার ও পিতার সাক্ষাৎ—গান্ধিজী কর্তৃক লবণ আইন
ভঙ্গ—দেশব্যাপী আন্দোলনের বহু—১৪ই এপ্রিল আমার গ্রেফতার
—আমার ভননী ও পত্নীর পিকেটিংয়ে যোগদান—পেশোয়ারে
পাঠানদের উপর গুলিবর্ষণ—গাড়োয়ালী সৈন্যদের গুলিবর্ষণে
অস্বীকৃতি—বহুতর অর্ডিন্যান্স জারী—সংবাদপত্র দলন—
গান্ধিজীর গ্রেফতার—পিতার বোম্বাই গমন ও প্রত্যাবর্তনের পথে
গ্রেফতার ।

২৪২—২৫০

৩০। নৈনী জেলে

নিঃসঙ্গ কারাজীবনের অভিজ্ঞতা—যাবজ্জীবন দণ্ডিত বন্দীদের
মনোভাব—সাধারণ কয়েদীদের জীবনধারা—ভারতীয় জেলের
অব্যবস্থা—কারাবিধির অমানুষিক কঠোরতা—ইউরোপীয়ান
কয়েদীদের বিশেষ সুবিধা—কয়েদীদের দয়া-দাক্ষিণ্য—বাহিরের
ঘটনাবলীতে হৃদচিন্তা ।

২৫১—২৬১

৩১। এরোডায় আপোষের কথাবার্তা

সঞ্ছদ জন্মকরের দৌত্য—বোম্বাইয়ে পিতার বিবৃতি—জেলে সঞ্ছদ
জন্মকরের সাক্ষাৎ—আমার ও পিতার পুণা যাত্রা—এরোডা জেলে
নেতৃবৃন্দের বৈঠক—পিতার খাদ্য লইয়া কারাধ্যক্ষ কর্ণেল মার্টিনের
বিশ্বাস—নৈনীতে প্রত্যাবর্তন—পিতার শারীরিক অসুস্থতার
জ্ঞান কার্যমুক্তি—ট্যাক্স ও খাজনা বন্ধ আন্দোলন—আমার

কারামুক্তি—কৃষকদের মধ্যে প্রচার কার্য—মুসৌরীতে পিতার
সহিত সাক্ষাৎ—এলাহাবাদে পুনরায় গ্রেফতার।

২৬২—২৭১

৩২। যুক্তপ্রদেশে করবন্ধ আন্দোলন

জেলে বিচার—পঞ্চমবার কারাদণ্ড—পীড়িত পিতার কষ্টোৎসাহ—
—পিতার কলিকাতা যাত্রা—আমার কারাদণ্ডে খাজনাবন্ধ
আন্দোলনে নূতন উৎসাহ—কৃষক বিদ্রোহের আশঙ্কা—ভারতে
আন্দোলন মন্দীভূত—প্রবল দমননীতি—রাজনৈতিক বন্দীদের
বেত্রদণ্ড—নৈনীতে মালবাজী—১৯৩১-এর ১লা জাম্মায়ারী
কমলার গ্রেফতার—সে সংবাদে পিতার উৎকর্ষ ও এলাহাবাদ
প্রত্যাবর্তন—নৈনীতে পিতার সহিত সাক্ষাৎ—লগুনে
গোলটেবিল বৈঠক—শাস্ত্রীর বক্তৃতায় বিকোভ—পিতার
রোগবৃদ্ধি ও আমার অকস্মাৎ কারামুক্তি।

২৭২—২৮৩

৩৩। পিতৃবিয়োগ

গান্ধিজী ও অমৃতলাল কংগ্রেস নেতাদের কারামুক্তি—নেতৃবৃন্দের
এলাহাবাদ আগমন—রোগের সহিত পিতার সংগ্রাম—সহকর্মীদের
সহিত সাক্ষাৎ—কার্যাকরী সমিতির অধিবেশনে তাঁহার নিম্প্রভ
ভাব—পিতাকে লইয়া লক্ষ্মো যাত্রা—এই ক্ষেত্রমায়ী পিতৃবিয়োগ—
শবদেহ লইয়া এলাহাবাদ যাত্রা—গান্ধিজীর সম্মুখে গঙ্গাতীরে
চিত্তা নির্বাণ।

২৮৩—২৮৭

৩৪। দিল্লী-চুক্তি

বৈঠকী সদস্যদের ভারতে প্রত্যাবর্তন—গান্ধিজীর দিল্লীযাত্রা—
বড়লাটের সহিত আলোচনার সূচনা—দিল্লীতে রাজনৈতিক
আলোচনা—গান্ধিজী ও গণতন্ত্র—গান্ধিজী ও ভারতের ধর্মভাব
—জনসাধারণের উপর তাঁহার প্রভাব—গান্ধী-আরুইন আলোচনা
—৪ঠা মার্চ মধ্যরাত্রে গান্ধিজীর চুক্তির সন্ধে সম্মতি—
আন্দোলনের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া।

২৮৮—৩০০

৩৫। করাচী কংগ্রেস

চুক্তির ফলে আমার বিমর্ষভাব—বন্দীদের মুক্তিসমস্যা—ভগৎসিংয়ের
মৃত্যুদণ্ড মকুব গভর্নমেন্টের অস্বীকৃতি—টেরোরিষ্ট মনোবৃত্তি—
চন্দ্রশেখর আজাদ—দিল্লীচুক্তি স্বাক্ষর—আইন অমান্ত আন্দোলন
দ্বিগত—‘জরোৎসবে’ সরকারী কর্মচারীদের ক্রোধ—যুক্তপ্রদেশের
কৃষক সমস্যা—করাচী কংগ্রেস—মৌলিক অধিকারের প্রস্তাব—

বিষয়

পৃষ্ঠা

এলাহাবাদে মানবেন্দ্র রায়ের সহিত সাক্ষাতের কথা—পঞ্জাবের
অইর দল—কানপুরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্ণী
নিহত।

৩০০—৩১২

৩৬। দক্ষিণ ভারতে বিশ্রাম

পট্টী ও কনাসহ সিংহলযাত্রা—অম্বরাধাপুর দর্শন—নিউয়ারা ইলিয়া
স্বাস্থ্যবাস—বৌদ্ধভিক্ষু—শিশোর বালকের উক্তি—দক্ষিণ
ভারতের দেশীয় রাজ্য—হায়দ্রাবাদে শ্রীযুক্ত নাইডুর আতিথ্য
গ্রহণ—বোম্বাই আগমন।

৩১২—৩১৭

৩৭। সন্ধিকালের সংঘর্ষ

গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধিজীর যাত্রার সমস্তা—সরকারী দমননীতি
ও শাসকগণের মনোভাব—বাক্সলায় দমননীতি—যুক্তপ্রদেশের
কৃষক সমস্তা—সীমান্তের দমননীতি—“সীমান্ত গান্ধী”—সাম্প্রদায়িক
সমস্তা—রাজকর্মাচারীদের চুক্তিভঙ্গ—জগদ্ব্যাপী অর্থসঙ্কট ও পন্ডীর
দ্রবস্থা—কংগ্রেসকর্মীদের উপর দোষারোপ—বিরোধ—সিমলায়
গিয়া নিফল আলোচনা—অবশেষে গান্ধিজীর বিলাত যাত্রা।

৩১৭—৩২৭

৩৮। গোলটেবিল বৈঠক

গান্ধিজী সম্পর্কে ইংরাজ সাংবাদিকের মিথ্যাপ্রচার—কংগ্রেস
ও গান্ধিজী সম্পর্কে ইংলণ্ডের সংবাদপত্রে আজগুবি গল্প রটনা—
গোলটেবিল বৈঠকে প্রতিনিধি প্রেরণের উদ্দেশ্য—প্রতিক্রিয়াশীল
সদস্যদের মনোবৃত্তি—কায়মী স্বার্থবাদীদের কাণ্ড—বৈঠকে
স্বদেশবিরুদ্ধতা—মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার সহিত ব্রিটিশ স্বার্থের
মিলন—সুবিধাবাদীদের চক্রান্তে বৈঠক ব্যর্থ।

৩২৯—৩৪০

৩৯। যুক্তপ্রদেশে কৃষকদের দুঃখ-হৃদয়

কৃষক আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য—মন্দার ফল—ক্রমবর্ধিত রুবিষ্ণু—
কৃষকদের দাবী—প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের মনোভাব—আইনী ও
বে-আইনী পীড়ন—নিরাশ কৃষকদের অভিযোগ—জোরজুলুমের
কথা—সরকারী প্রস্তাব ও কংগ্রেসের মনোভাব—দিল্লীতে
অর্ডিগ্যান্স পুনঃ প্রয়োগের জন্ত তোড়জোড়—খাজনা মাপের
পরোয়ানা ও ভীতি প্রদর্শন—কংগ্রেস ও প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের
আপোষের বাধা।

৩৪১—৩৫৫

৪০। সন্ধির অবসান

বঙ্গলার দুর্বস্থা—হিজলী বন্দীশালায় গুলিবর্ষণ—চট্টগ্রামে পুলিশ কর্মচারী হত্যা—প্রতিশোধপ্রবৃত্তি ও সহর লুণ্ঠন—১৯৩১-
এয় নভেম্বরে কলিকাতা যাত্রা—টেরোরিষ্ট যুবকদের সহিত সাক্ষাৎ
—এলাহাবাদে কৃষক সম্মেলন—কর্ণাটক যাত্রা—বোম্বাই-
এলাহাবাদের পথে নিষেধাজ্ঞা—এটোয়ার প্রাদেশিক সম্মেলন
সমাপ্ত—সীমান্তে অর্ডিন্যান্স জারী—গ্রেফতার ও আবার
কারাগার।

৩৫৯—৩৬৭

৪১। গ্রেফতার, বাজেয়াপ্ত, অর্ডিন্যান্স

গান্ধিজীর প্রত্যাবর্তন—সাক্ষাৎ প্রস্তাবে বড়লাটের অস্বীকৃতি
—গান্ধিজীর গ্রেফতার ও চারিটি নূতন অর্ডিন্যান্স—ভারতে
অর্থ-সামরিক শাসন—আমার ও শেরওয়ানীর কারাদণ্ড—জেলে
জনসমাগমের সাড়া—দুই ভগ্নীর কারাদণ্ড—বাহিরের ঘটনায়
উৎকণ্ঠা।

৩৬৮—৩৭২

৪২। আত্মপ্রচারের ধূম

সরকারী কংগ্রেস নিম্না—এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকার বিবোদগার
—জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র—মাস্ত্রাজের ‘হিন্দু’—পূর্ব হইতে
প্রস্তুত গভর্নমেন্টের আক্রমণ—বাজেয়াপ্তের ধূম—অনিচ্ছুক
কংগ্রেসের বিরুদ্ধসাহ—ধনীদের সম্পত্তি ও টাকা বাজেয়াপ্তির ভয়—
নারী-বন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহার—যুক্তপ্রদেশে খাজনা মাপ—
গভর্নমেন্টের অস্বাভাবিক দোষলক্ষ্য—কৃষক পল্লীতে ক্রোক ও
বাজেয়াপ্তি—“আনন্দ ভবন” দখল—আয়কর না দেওয়ার আমার
মোটর গাড়ী ও আসবাব ক্রোক ও নীলাম—জাতীয় পতাকার
অপমান—আমার মাতাকে পুলিশের বেত্রাঘাত ও তাহার ফল।

৩৭২—৩৮৫

৪৩। বেরেলী ও দেরাহুন জেল

দেরাহুন জেলে বদলী—জাতীয় সংগ্রামের সমালোচনা ও অভিজ্ঞতা
—সংগ্রাম পরিচালনে ব্যয়ের কথা—সরকার পক্ষীয় ও
সুবিধাবাদীদের মনোভাব—মডারেট ও ব্যক্তিস্বাধীনতা—ভারতীয়
দমননীতি ও ব্রিটিশ মনোভাব—তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক—
বঙ্গলার দমননীতির তীব্রতা—কারাগারে দেশসেবক নরনারীদের
লাহুনা—জেলের কঠোরতার তীব্রতা।

৩৮৫—৩৯৭

বিবর

পৃষ্ঠা

৪৪। জেলে মানব প্রকৃতি

বেরেলজেল হইতে দেবাহনযাত্রা—পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের মানবতা ও সৌজ্ঞ—আমরা ও ইংবাজ—তেল দুর্ব্যবহারের ফলে মাতা ও পত্নীর সাতমাস দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ—জেলের সঙ্গিগণ—দৈনন্দিন কাজ—কারাদিধির সমালোচনা।

৩৯৭—৪০৬

৪৫। কারাগারে জীবজন্তু

বোলতা, ভীমরুল, উইপোকা—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য—চামটিকা, টিকটিকি, কাঠবিড়ালী, ময়না, টিয়াপাখী, পাপিয়া, বানর, বৃশ্চিক, বজ্রকীট ও কুকুর।

৪০৬—৪১৪

৪৬। সংঘর্ষ

দিল্লীতে ও কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনের চেষ্টা—আন্দোলন মন্দীভূত—সমাজতত্ত্ববাদ ও কম্যুনিজম—সোভিয়েট রুশিয়া—মার্কসীয় মতবাদ ও দর্শন—আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ—কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদ—গান্ধিজী ও কম্যুনিষ্টদের সমালোচনা—কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট—ভারতের ধনী সম্প্রদায়—কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীদের চরিত্র।

৪১৫—৪২৫

৪৭। ধর্ম কি ?

সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার প্রতিবাদে গান্ধিজীর অনশন—দেশবাসী চাঞ্চল্য—কারাগারে বসিয়া উৎকণ্ঠা—পুণাচুক্তি—আবার একুশদিন উপবাস—ধর্মের গোঁড়ামী—প্রণালীবদ্ধ ধর্ম—খৃষ্টানধর্ম ও সাম্রাজ্যবাদ—চার্চের মনোভাব—ধর্ম ও আত্মোন্নতি—গান্ধিজী ও ধর্ম—ধার্মিকের লক্ষণ।

৪২৬—৪৩৮

৪৮। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের দৈতনীতি

হরিজন আন্দোলন—আমার বিশ্বাস ও বিরক্তি—মন্দির প্রবেশ বিল ও সরকারী মনোভাব—সমাজ সংস্কারের বাধা—গান্ধিজীর কারামুক্তি—সাময়িক ভাবে নিরুপদ্রব প্রতিবেদন স্থগিত—পুণা-বৈঠক—আবার গান্ধিজীর বড়লাটের সাক্ষাৎ প্রার্থনা ও প্রত্যাখ্যান লাভ—হোয়াইট পেপার—লিবারেলদের মত ও মনোভাব—মি: শাস্ত্রীর বক্তৃতার সমালোচনা—দমননীতির উল্লেখরূপ।

৪৩৯—৪৫৫

বিবরণ

পৃষ্ঠা

৪৯। দীর্ঘকারাদণ্ডের অবসান

জে, এম, সেনগুপ্তের মৃত্যু—ভারতীয় মধ্যশ্রেণীর ভোজনবিলাস—
আমার খাণ্ড—ব্যারাম—গান্ধিজীর পুনরায় গ্রেফতার ও কারাদণ্ড
—অনশন ব্রত—নৈনীজেল হইতে কারামুক্তি।

৪৬৬—৪৬০

৫০। গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাৎ

দীর্ঘকাল তীব্র দমননীতির ফল—ইংরাজ মহলে নাৎসী মনোবৃত্তি
—কারামুক্তির পরের অবস্থা—সেঙ্গের কড়াকড়ি—পারিবারিক
আর্থিক অবস্থা—পূণাযাত্রা ও গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাৎ—গান্ধিজীর
সমস্যা—বোম্বাই আগমন—উদয়শঙ্করের নৃত্যদর্শন—নাটক ও
যাত্রাভিনয়—সমাজতন্ত্রীদল—ভারতীয় সমাজতন্ত্রী ও কম্যুনিষ্টদের
গান্ধিজীর বিরুদ্ধ সমালোচনা—তঁাহাদের চিন্তার ক্রটি।

৪৬০—৪৭১

৫১। লিবারেল দৃষ্টিভঙ্গী

পুণায় সার্ভেণ্ট অব ইণ্ডিয়া সোসাইটির সদস্যদের সহিত সাক্ষাৎ—
ভারতীয় লিবারেলগণ—তঁাহাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা—প্রাচীন
কালের বিশ্বাস—মডারেটদের সংঘ ও জায়বুদ্ধি।

৪৭২—৪৭৯

৫২. স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন

কংগ্রেস ও মধ্যশ্রেণী—ভারতপ্রবাসী ইংরাজদের চিন্তাধারা—
মডারেটগণ ও কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য—ইংরাজ ও ইংলণ্ডের
প্রতি আমার মনোভাব—ব্যক্তিগত ভাবে ইংলণ্ডের নিকট আমার
স্থান—সাম্রাজ্যবাদ ও সহযোগিতা—স্বাধীনতা ও আন্তর্জাতিকতা—
নূতন রাষ্ট্র না নূতন শাসন প্রণালী?—ব্রিটিশ শ্রমিকদল—
মডারেটীয় নিয়মতান্ত্রিকতা।

৪৮০—৪৯১

৫৩। প্রাচীন ও নবীন ভারত

জাতীয়তাবাদের গোড়ার কথা—বিগত শতাব্দীতে শিক্ষিত
ভারতবাসীর ব্রিটিশ মতবাদ গ্রহণ—ব্রিটিশ মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ—
অতীত ভারতের গর্ব ও গৌরব—ভারত ও ইতালীর সাদৃশ্য—
ভারত মাতা—প্রাচীন সংস্কৃতি ও নবীন ভাবধারা।

৪৯১—৪৯৯

৫৪। ব্রিটিশ শাসনের বিবরণ

ব্রিটিশ অধিকারের প্রথম ফল—বহুযুগের প্রতিক্রিয়া—বর্তমান
যুগের অম্পূর্ণাঙ্গী শাসনপ্রণালী—শান্তি ও রাজনৈতিক ঐক্য—

বিষয়

পৃষ্ঠা

অধ্যাকার ভারতের অবস্থা—ভয়াবহ দারিদ্র্য—বৈদেশিক অধীনতার
ফল—নিয়ন্ত্রণদণ্ড কর্মচারীদের চরিত্র দৌর্জাল্য—সিভিল সার্ভিসের
দোষগুণ—তীহাদের আত্মাভিমান—ভারতের জনসংখ্যা ও জন্ম
নিয়ন্ত্রণ—সামরিক চাকরী—প্রধান সেনাপতি, আফগান—সামরিক
মনোবৃত্তির সমালোচনা—ব্রিটিশ শাসনের অগ্নিপরীক্ষা।

৪৯৯—৫১৯

৫৫। অসবর্ণ বিবাহ ও অক্ষর সমস্যা

“ভারত কোন্ পথে”—আমার ভগ্নী কুম্ভার অসবর্ণ বিবাহ—লাটিন
অক্ষর প্রচলনের বাধা—ভারতীয় ভাষা সম্পর্কে ইংরাজদের বিকৃত
ধারণা—হিন্দুস্থানী ভাষা—কাশীতে হিন্দী লিখন পদ্ধতির
আলোচনা।

৫২০—৫২৮

৫৬। সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রতিক্রিয়া

বিসাঃভাই পাটেলের মৃত্যু—হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুতা—হিন্দু
মহাসভার সাম্প্রদায়িকতা—মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও
শুর সৈয়দ আহম্মদ খাঁর রাজনীতি—আলীগড় কলেজ—আগা খাঁর
নেতৃত্ব—অসহযোগ আন্দোলন—সাম্প্রদায়িকতার নব রূপান্তর—
গোলটেবিল বৈঠকে প্রতিক্রিয়াপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদ—হিন্দু ও
মুসলমান সংস্কৃতি।

৫২৯—৫৪৬

৫৭। বন্ধ পথ

আমার গ্রেফতার সম্বন্ধে জনরব—এলাহাবাদে কংগ্রেস কর্মী
সম্মেলন—সংবাদপত্রে প্রবন্ধ ও বিবৃতি প্রকাশ—আশাভঙ্গজনিত
দুঃখ—আমার সমাজতত্ত্ববাদ প্রচার—পারিবারিক অর্থাভাব—
কমলার চিকিৎসার্থ কলিকাতা যাত্রা।

৫৪৭—৫৫৬

৫৮। ভূমিকম্প

এলাহাবাদে ভূমিকম্প—কলিকাতায় সহকর্মীদের সহিত
আলোচনা—টেরোরিজম—জনসভায় তিনটি বহুতা দান—কবি
রবীন্দ্রনাথকে দর্শন করিবার জন্ত শান্তিনিকেতন যাত্রা—পাটনা ও
মজঃফরপুরে ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা দর্শন—ভূমিকম্প ও বিহার
গভর্ণমেণ্টের নিষেচনাতার সমালোচনা—সরকারী কর্মচারী মহলে
বিক্ষোভ—দশদিন ভূকম্প বিধ্বস্ত অঞ্চলে ভ্রমণ—রিলিফ কমিটি
ও সেবাকার্যের বিবরণ—ভূমিকম্প “অম্প্রাপ্ততা পাণের” শাস্তি—
গান্ধিজীর মন্তব্যে আমার বিহ্বলতা—এলাহাবাদ প্রত্যাবর্তন—
পুনরায় গ্রেফতার।

৫৫৬—৫৬৯

৫৯। আলীপুর জেল

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি জেল—মাগিষ্ট্রেটের আদালত—দুই বৎসর
কারাদণ্ড লাভ—সপ্তমবার জেলে প্রবেশ—আলীপুর জেল—
অত্যন্তরীণ অবস্থা—সরকার সেলাম।

৫৭০—৫৭৫

৬০। গণতন্ত্র—প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে

১৯৩৪-এ ইউরোপের অশান্তি—কাসিন্ত প্রতিক্রিয়া—ব্রিটিশ জাতির
স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা—ভারতে স্বৈর শাসন—
সাম্প্রদায়িকতা ও গণতন্ত্র।

৫৭৫—৫৮২

৬১। বিষাদ

আইন অমান্ত আন্দোলন প্রত্যাহারের সংবাদ—আইন সভায়
প্রবেশের জল্পনা কল্পনা—গান্ধিজীর বিবৃতি পাঠে অবসাদ—
গান্ধিজীর সহিত আমাদের প্রকৃতিগত পার্থক্য—ধর্ম ও ধর্মভাবের
উপর আমার ক্ষোভ—গান্ধিজীর নীতিবাদ।

৫৮৩—৫৯৬

৬২। স্ববিরোধিতা

গান্ধিজীর চিন্তা ও চরিত্র—তাঁহার মানসিক গঠন—সমাজতত্ত্ববাদ
ও গান্ধিজী—যজ্ঞযুগের নূতন সনাত্তা—গান্ধিজীর কার্যপদ্ধতি—
চরকা, তাঁত ও খাদি—কুটির শিল্প—কল-কারখানা—ভীতি—
গান্ধিজীর স্ববিরোধিতা—ভারতীয় দেশীয় রাষ্ট্রগুলির স্বৈর শাসন—
গান্ধিজী ও দেশীয় রাজত্ব—দেশীয় রাজ্যের ব্রিটিশ কর্মচারী—
কংগ্রেস ও দেশীয় রাজ্য—গান্ধিজী ও জমিদারী প্রথা।

৫৯৬—৬২৪

৬৩। হৃদয়ের পরিবর্তন না বলপ্রয়োগ

গান্ধিজীর অহিংসা-নীতি—অহিংসা নীতির সমালোচনা—অহিংসা ও
সত্য কি এককথা?—সমাজ ও রাষ্ট্র হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত—
বলপ্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা—ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও বলপ্রয়োগ—
সুবিধাভোগী শ্রেণীর হৃদয়ের পরিবর্তন—অহিংসা আন্দোলনের
প্রভাব—উহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা—গান্ধিজীর নীতি ও বাস্তব
অবস্থা—প্রাচ্যের নব রূপান্তর—বলপ্রয়োগের গুরুত্ব—সমাজ ব্যবস্থা
পরিবর্তনে অহিংসার শক্তি সীমাবদ্ধ—শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা।

৬২৪—৬৪৪

৬৪। পুনরায় দেরা জেলে

কলিকাতা হইতে বদলী—দেরা জেলে কঠোর ব্যবস্থা—কমলার

বিষয়

পৃষ্ঠা

পীড়া ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে হুশিয়ার—আইন অমাত্র
আন্দোলন প্রত্যাহার ও কংগ্রেসে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির
প্রভাব—আমায় মানসিক অবসাদ—কার্যকরী সমিতির সমাজ-
তত্ত্ববাদ ভীতি—কার্যকরী সমিতির নবম পন্থা—গভর্নমেন্টের জয়-
গর্ব—আত্মচরিত লেখা আবস্ত—কমলার পীড়া—এগার দিন ছুটি।

৬৪৪—৬৫৩

৬৫। এগার দিন

রোগশয্যায় কমলা—আমাদের বিবাহিত জীবন—প্রাচীন স্মৃতি—
বাহিরের ঘটনা সম্পর্কে মত প্রকাশে অনিচ্ছা—কংগ্রেসী কলহ
দেখিয়া বিষাদ—পুলিশের সহিত নৈনী জেলে গমন।

৬৫৩—৬৫৯

৬৬। কারাগারে প্রত্যাবর্তন

কমলার পীড়ায় হুশিয়ার—অক্টোবরে কমলার সহিত পুনরায়
সাক্ষাৎ—কমলার ভাওয়ালী যাত্রা—আমার আলমোড়া জেলে
গমন—পর্বত দর্শনে আনন্দ—খাঁ আব্দুল গফুর খাঁর গ্রেফতার
ও কারাদণ্ডের সংবাদ—আলমোড়া জেল হইতে ভাওয়ালীতে
কমলার সহিত সাক্ষাৎ।

৬৫৯—৬৬৬

৬৭। কতকগুলি আধুনিক ঘটনা

বোম্বাই কংগ্রেস—ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচন—কংগ্রেস জাতীয়
দল—কংগ্রেস ও সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা—বান্ধলার প্রতি বিশেষ
অবিচার—হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম কন্ফারেন্সের প্রগতিবিরোধী
মনোবৃত্তি—জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটির রিপোর্ট—ওট্টাওয়া
চুক্তির ফল—প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের প্রতিবাদ—মডারেটদের
বিক্ষোভ—যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা—সরকারী দমননীতির অবাধ
প্রয়োগ—আমাদের রাজনৈতিকগণের জাগতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে
অজ্ঞতা—অর্থ নৈতিক অবস্থার পরিবর্তন—নূতন সমাজ ব্যবস্থার
আবশ্যকতা—বিরুদ্ধ স্বার্থ সজ্ঞাতের তীব্রতা—সমাজতন্ত্রবাদের
প্রয়োজন—ভারতে কৃষক ও শ্রমিকদের ক্রমাবনতি—উদ্ধারের
পথ—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও কায়মী স্বার্থ—কার্ল মার্কসের
মতবাদ—সোভিয়েট কৃষি—ভারতের সমস্যা—কম্যুনিজম নহে,
সাম্প্রদায়িকতাবাদ—“জুগলি”।

৬৬৭—৬৯৪

৬৮। উপসংহার

আত্মবিশ্লেষণ—রামস্বামী আয়ারের মত—বর্তমানের সংশয়
ও ভবিষ্যতের আশা।

৬৯৫—৬৯৮

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|--|---------|
| পুনশ্চ | ৬৯৯—৭০০ |
| কোয়েটা ভূমিকম্প—কারামুক্তি—পীড়িতা পত্নীকে দেখিবার জন্ত জাখানী যাত্রা। | |
| পরিশিষ্ট—ক | ৭০১—৩ |
| পরিশিষ্ট—খ | ৭০৩—৬ |
| পরিশিষ্ট—গ | ৭০৭—৮ |

চিত্র-সূচী

| | | | |
|--|-----|-----|---------------------|
| গ্রন্থকারের পিতা | ... | ... | পৃষ্ঠা মুখ-চিত্র |
| পণ্ডিত মতিলাল নেহরু | | | |
| জওহরলালের মাতা স্বরূপরাণী নেহরু | ... | ... | ১০ |
| শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র সদনে জওহরলাল | ... | ... | ৭৬ |
| জনসভায় বক্তৃতা | ... | ... | ৯০ |
| লাহোর কংগ্রেস (১৯২৯) | ... | ... | ৯০ |
| সভাপতি জওহরলাল নেহরু দণ্ডায়মান | | | |
| মহিলা সত্যাগ্রহিণী | ... | ... | ২৪৯ |
| মধ্যস্থলে শ্রীমতী কমলা নেহরু উপবিষ্টা | | | |
| জওহরলাল নেহরু (১৯৩০) | ... | ... | ২৬০ |
| জওহরলাল নেহরুর বিচার (১৯৩০) | ... | ... | ২৭৪ |
| বঙ্গুপুত্র বিচার দেখিবার জন্ত নৈনী জেলের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন | | | |
| ১৯৩০ সালে জওহরলাল নেহরুর বিচার | ... | ... | ২৭৬ |
| (১) জেলের দরজায় জনতা | | | |
| (২) বিচার : পণ্ডিত মতিলাল জওহরলালের পার্শ্বে উপবিষ্ট | | | |
| (৩) পুত্রের সহিত দেখা করিবার জন্ত পণ্ডিত মতিলাল নৈনী জেলে ভ্রমণ ব্যারাকে যাইতেছেন | | | |
| করাচী কংগ্রেস | ... | ... | ৩০৮ |
| জওহরলাল জাতীয় পতাকা উত্তোলন লক্ষ্য করিতেছেন | | | |
| আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা | ... | ... | ৩০৮ |
| সংগ্রামের প্রারম্ভে মাল্যভূষিত জওহরলাল এবং কমলা নেহরু | | | |
| শ্রী ও কন্যাসহ জওহরলাল | ... | ... | ৩১২ |
| ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনী | ... | .. | ৩১৪ |
| জওহরলালের কণ্ঠা | | | |
| গোলটেবিল বৈঠক হইতে প্রত্যাগত মহাত্মা গান্ধীর | | | |
| সাক্ষাৎলাভের জন্ত বোম্বাই যাত্রাকালে চিওকী ষ্টেশনে | | | |
| গৃহীত জওহরলালের ফটো ; জওহরলাল ও মিঃ | | | |
| শেরওয়ানীর (তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান) পরবর্তী | | | |
| ষ্টেশনে গ্রেফতার হইয়া এলাহাবাদে প্রত্যাবর্তন | | | ৩৬৬ |
| গ্রন্থকার | ... | ... | ৫৬২ |
| কমলা নেহরু | ... | ... | ৬৬০ |

কাশ্মীর হইতে অবতরণ

“কোন লোকের পক্ষে নিজের বিষয় লিখিতে যাওয়া যেমন তৃপ্তিকর, তেমনি কঠিন। নিজের কোন অকীর্তির কথা বলিতে গেলে বৃকে যেমন বাজে, তেমনি আত্মপ্রশংসাও পাঠকগণের নিকট কর্ণ পীড়াদায়ক।”

—আব্রাহাম কলি।

‘বড়-ঘরের একমাত্র পুত্রের অতিরিক্ত আদরে নষ্ট হওয়ার সৎ অধিক : বিশেষতঃ ভারতবর্ষে। জন্মের পর এগার বৎসর পর্য্যন্ত সে-ই যদি একমাত্র সন্তান হয়, তাহা হইলে অত্যধিক প্রাশ্রয়ের পরিণাম হইতে তাহার পক্ষে অব্যাহতি পাওয়া কঠিন। আমার কনিষ্ঠা ভগিনীদ্বয় আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। আমাদের প্রত্যেক দুইজনের মধ্যে বয়সের ব্যবধানও কয়েক বৎসর করিয়া। অতএব, সমবয়সী সাথীর অভাবে আমার শৈশবজীবন একাকী নিঃসঙ্গভাবে কাটাইতে হইয়াছে। আমাকে বাল্যকালে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অথবা কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষার জন্ত দেওয়া হয় নাই বলিয়া বিদ্যালয়ের সাথীদের সহিত মিশিবারও সুযোগ পাই নাই। আমার শিক্ষার ভার গৃহশিক্ষয়িত্রী ও গৃহশিক্ষকগণের হাতে দিয়া সকলে নিশ্চিন্ত ছিলেন।

আমাদের গৃহে লোকের অভাব ছিল না। সাধারণ হিন্দুপরিবারের মতই আমাদেরও জাতি ভ্রাতাভগ্নী ও কুটুম্ব স্বজনে পরিবৃত বৃহৎ পরিবার। কিন্তু আমার জ্যেষ্ঠা ভাইরা তখন কেহ কলেজে কেহ বা স্কুলে পড়িতেন। তাঁহাদের সহিত আমার বয়সের ব্যবধান এত অধিক ছিল যে, তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের সহিত খেলিবার অথবা মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবার অযোগ্য মনে করিতেন। কাজেই বৃহৎ পরিবারের মধ্যেও আমি নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করিতাম; এবং একাকীই কোন খেলা বা খেলা লইয়া সময় কাটাইতাম।

আমরা কাশ্মীরী। দুইশত বৎসরের পূর্বে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা যশঃ ও ঐশ্বর্য্যের অনুসন্ধানে পর্ব্বতের

উপভাষ্যকা হইতে সম্বন্ধিশালী সমতলক্ষেত্রে অবতরণ করেন। ঔরঙ্গজেব তখন মৃত, মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংসোন্মুখ, ফারুকসিয়ার তখন দিল্লীর সিংহাসনে। আমাদের পূর্বপুরুষ রাজা কাউল সংস্কৃত ও পারশ্ব ভাষায় পণ্ডিতরূপে কান্দ্বীরে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। সম্রাট ফারুকসিয়ার যখন কান্দ্বীরে যান, তখন তিনি সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সম্রাটের অনুরোধে তিনি পরিবারবর্গসহ ১৭১৬ সালে দিল্লী চলিয়া আসেন। দিল্লীতে তিনি একটা খালের ধারে আবাসবাটী ও জায়গীর পান। এই খাল (নহর) হইতেই রাজা কাউলের নামের সহিত “নেহরু” উপাধি যুক্ত হয়। কাউল ছিল আমাদের পারিবারিক উপাধি—তাহা দাঁড়াইল কাউল নেহরু। পরবর্ত্তীকালে কাউল পরিত্যক্ত হইল, রহিল নেহরু।

সেই রাজনৈতিক অব্যবস্থার দিনে বহু ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া নেহরু পরিবারের জায়গীর ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া অবশেষে বিলুপ্ত হইল। আমার প্রপিতামহ লক্ষ্মীনারায়ণ নেহরু দিল্লীর তথাকথিত সম্রাট দরবারে ‘সরকার কোম্পানীর’ উকীল নিযুক্ত হইলেন। আমার পিতামহ গঙ্গাধর নেহরু ১৮৫৭ সালে বিরাট বিদ্রোহের পূর্বকাল পর্য্যন্ত কিছুদিন দিল্লীর কোতোয়াল ছিলেন। ১৮৬১ সালে মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

১৮৫৭র বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর সহিত আমাদের পরিবারের সম্পর্ক শেষ হয় এবং ইহার ফলে আমাদের পারিবারিক প্রাচীন কাগজপত্র দলিলাদি নষ্ট হইয়া যায়। সমস্ত ভূসম্পত্তি প্রায় বিনষ্ট হওয়ায়, আমাদের পরিবার অত্যাশ্রিত বহুতর গৃহহারাদের সহিত যোগ দিয়া প্রাচীন রাজধানী ছাড়িয়া আগ্রায় চলিয়া আসেন। তখনও আমাদের পিতার জন্ম হয় নাই। কিন্তু আমার দুই জ্যেষ্ঠতাত তখন যুবক এবং তাঁহারা কিছু ইংরাজীও শিখিয়াছিলেন। এই ইংরাজী জ্ঞানের জগ্ন আমার ছোট জ্যেষ্ঠ মহাশয় এবং আমাদের পরিবারের আরও কয়েকজন এক আকস্মিক ও শোচনীয় মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। দিল্লী হইতে আগ্রার পথে তাঁহার সহিত অত্যাশ্রিতের সঙ্গে তাঁহাদের কনিষ্ঠা ভগ্নীও ছিলেন। এই অল্পবয়স্কা বালিকা অত্যাশ্রিত কান্দ্বীরী বালিকার মতই অসামান্ত রূপসী ছিলেন। পথে কয়েকজন ইংরাজসৈন্য আমার পিসীমার রূপলাবণ্য দর্শনে মনে করিল, জ্যেষ্ঠমহাশয় কোন ইংরেজ বালিকাকে চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছেন। তখনকার দিনে এরূপ অভিযোগের বিচার ও শাস্তি কয়েক মিনিটের মধ্যেই শেষ হইত; এবং হয়তো অল্পকাল মধ্যেই জ্যেষ্ঠমহাশয় ও অত্যাশ্রিত সঙ্গীদের পশ্চিমার্ধস্থ বৃক্ষে ঝুলাইয়া ফাঁসী দেওয়া হইত। কিন্তু ভাগ্য ভাল যে, জ্যেষ্ঠমহাশয় ইংরাজী জানিতেন। তাহার ফলে বিচারে

কান্দীর হইতে অবতরণ

কিছু বিলম্ব হইল। ইতিমধ্যে তাঁহাদের পরিচিত একজন ঘটনাক্রমে সেই পথে আসিয়া পড়ায়, তিনি তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিলেন।

আগ্রায় তাঁহার। কিছুকাল বাস করিলেন। এবং এই আগ্রায়, ১৮৬১র ৬ই মে আমার পিতা ভূমিষ্ট হন। * আমার পিতার জন্মের তিন মাস পূর্বেই আমার পিতামহ লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। পিতামহের যে ক্ষুদ্র চিত্র আমাদের গৃহে রহিয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, তাঁহার পরিধানে মোগল দরবারের পোষাক হাতে বাকা তরবারি; দেখিলে মোগল অভিজাত বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু তাঁহার অবয়বে কান্দীরী ছাপ স্পষ্ট।

পরিবার প্রতিপালনের ভার পড়িল আমার দুই জেঠার উপর। পিতা তখন শিশু, সর্বজ্যেষ্ঠ বংশীধর নেহরু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বিচার বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করিলেন। নানাস্থানে বদলী হওয়ার ফলে তিনি অধিকাংশ সময়েই পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতেন। মধ্যম নন্দলাল নেহরু দেশীয় রাজ্যে চাকুরী গ্রহণ করেন। ইনি দশবৎসর রাজপুতানার খেতরী রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। পরে আইন পড়িয়া আগ্রায় আইন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। আমার পিতা ইহারই স্নেহচ্ছায়ে লালিতপালিত। ইহাদের পরস্পরের প্রতি অল্পরাগ ছিল গভীর। পিতার স্নেহ, ভ্রাতার প্রীতিমিশ্রিত সে এক আশ্চর্য্য নিবিড় সম্পর্ক। সর্বকনিষ্ঠ বলিয়া পিতা ছিলেন পিতামহীর আদরের দুলাল। এই বৃদ্ধামহিলার ছিল স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি। তাঁহার অভিপ্রায়কে অবহেলা করা কঠিন ছিল। তাঁহার পরলোক গমনের পর অর্দ্ধশতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছে; কিন্তু এখনও প্রাচীন কান্দীরী মহিলারা তাঁহার প্রথর কর্তৃত্বাভিমান ভুলিতে পারেন নাই।

জেঠামহাশয় নবপ্রতিষ্ঠিত হাইকোর্টে যোগ দিলেন। হাইকোর্ট আগ্রা হইতে এলাহাবাদে উঠিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরিবারবর্গও এলাহাবাদে উঠিয়া আসিলেন। তখন হইতেই এলাহাবাদে আমরা স্থায়ীভাবে বাস করিতে লাগিলাম। বহুবর্ষ পরে এইখানেই আমার জন্ম হয়। ক্রমে পশার বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জেঠামহাশয় স্থানীয় ব্যবহারজীবীদের অগ্রতম প্রধান হইয়া উঠিলেন। ইতিমধ্যে আমার পিতা কাণপুর ও এলাহাবাদে স্কুল ও কলেজের শিক্ষায় অগ্রসর হইতেছিলেন। তিনি বাল্যকালে পার্শী ও আরবী ভাষায় শিক্ষালাভ করেন। তারপর কিশোর বয়সে তাঁহার ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ হয়। কিন্তু সেই বয়সেই তিনি পার্শীভাষায় সুপণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ

* এক আশ্চর্য্য ও কৌতূহলোদ্দীপক সৌন্দর্য্য এই যে, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ঠিক এই বৎসরের ঐ মাসের ঐ তারিখে ভূমিষ্ট হন।

করেন। আরবীতেও তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। এই কারণে প্রাচীনগণ তাঁহাকে প্রকার দৃষ্টিতে দেখিতেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও স্কুল কলেজের ছাত্রজীবনে তিনি বিবিধ নষ্টামী ও দুষ্টামীর জন্ত খ্যাতিমান হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি ভাল ছেলের আদর্শ কোন দিনই ছিলেন না। লেখাপড়া অপেক্ষা খেলাধুলা এবং সঙ্গীদের সহিত নানা হুঃসাহসিক অভিযান করিতেই তিনি ভালবাসিতেন। কলেজের দুর্দান্ত ছেলেদের দলের তিনি ছিলেন নেতা, যখন একমাত্র কলিকাতা ও বোম্বাই ব্যতীত অগ্রজ ভারতীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য বেশভূষা ও আচার ব্যবহারের অহুকরণের রেওয়াজ হয় নাই, সেই সময়ই তিনি উহার প্রতি আকৃষ্ট হন। জেদী ও দুর্দান্ত হইলেও তিনি ইয়োরোপীয়ান অধ্যাপকদের প্রিয় ছিলেন এবং সর্বদাই সদয় ব্যবহার পাইতেন; তাঁহার তেজস্বিতা তাঁহাদের ভাল লাগিত। তিনি মেধাবী ছিলেন বলিয়া মাঝে মাঝে পড়াশুনা করিয়া অমনোযোগিতার ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতেন। কাজেই ক্লাসেও তিনি ভাল ভাবেই কাটাওয়া যাইতেন। পরবর্তী কালে তাঁহার অধ্যাপকদিগের অগ্রতম এলাহাবাদ মুর সেন্ট্রাল কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ হ্যারিসনের কথা আমাদের নিকট সম্মুখভরে উল্লেখ করিতেন। তাঁহার ছাত্রজীবনে উক্ত অধ্যাপকের লেখা একখানি পত্র তিনি সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন।

বিশেষ কৃতিত্ব না দেখাইলেও তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি একে একে উত্তীর্ণ হন। বি, এ, পরীক্ষা আসিল। তিনি দেখিলেন পড়া তৈরী হয় নাই। প্রথম দিন প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি ভাবিলেন, পাশ করিবার আশা আর নাই। ইহা ভাবিয়া তিনি আর পরীক্ষা দিলেন না। পরীক্ষা গৃহের পরিবর্তে, তাজমহলে গিয়া সময় কাটাইতে লাগিলেন (তখন আগ্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা হইত)। তিনি পরীক্ষা দিতেছেন না জানিতে পারিয়া তাঁহার অধ্যাপক তাঁহাকে ডাকিয়া ভৎসনা করিলেন এবং বলিলেন যে, প্রথম প্রশ্নপত্রের উত্তর ভালই হইয়াছে। অগ্রাগ্র প্রশ্নপত্রের উত্তর না দেওয়া অত্যন্ত নির্ভরিতার কাজ হইল। যাহা হউক, আমার পিতার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার এইখানেই শেষ। তিনি আর কখনও বি, এ পরীক্ষা দেন নাই।

ইহার পর তিনি জীবিকা অর্জনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। স্বভাবতই আইন ব্যবসায়ের কথা তাঁহার মনে পড়িল। ভারতবর্ষে কেবলমাত্র আইন ব্যবসায়েই প্রতিভা ও যোগ্যতার পুরস্কার আছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দৃষ্টান্তও তাহার চক্ষুর সম্মুখেই ছিল। তিনি হাইকোর্টের ওকালতী পরীক্ষা দিলেন। পাশ হইলেনই; উপরন্তু

কাম্বীর হইতে অবতরণ

সর্বপ্রথম হইয়া একটি স্বর্ণ-পদক লাভ করিলেন। তিনি মনোমত পথ খুঁজিয়া পাইয়া স্থায়ী হইলেন এবং তাঁহার দৃষ্টি ধারণা হইল, আইন ব্যবসায়ে সাফল্য অনিশ্চিত। তিনি কাণপুর জিলা আদালতে ওকালতী আরম্ভ করিলেন এবং সাফল্য লাভের অগ্রহে কঠিন পরিশ্রমে অল্প দিনেই কিছু পণ্যের প্রতিপত্তি করিলেন। কিন্তু তাঁহার ক্রীড়াপ্রীতি ও অজ্ঞান আমোদেও কিছু সময় ব্যয় হইত, কুস্তী ও 'দঙ্গলে' তাঁহার বিশেষ অমুরক্তি ছিল। সে সময় কাণপুর কুস্তী প্রতিযোগিতা খেলার জগৎ বিখ্যাত ছিল।

কাণপুরে তিন বৎসর শিক্ষানবিশী করিয়া পিতা এলাহাবাদ হাইকোর্টে যোগ দিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা পণ্ডিত নন্দলালের সহসা মৃত্যু হইল। পিতা শোকাবেগে মুহম্মান হইলেন। পিতৃতুল্য স্নেহময় ভ্রাতার মৃত্যু, কেবল তাঁহার বিয়োগব্যথা নহে, একটি বৃহৎ পরিবারের যিনি বর্তা এবং যাহার উপার্জন সর্বাধিক, তাঁহার অভাবে সমস্ত ভারও পিতার স্বন্ধে পড়িল।

সাফল্যের দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া তিনি কাম্বী-সাগরে ডুবিলেন; নিজেকে সকল বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সর্বশক্তি ব্যবসায়ে নিয়োগ করিলেন। জেষ্ঠা মহাশয়ের মক্কেলরা প্রায় সকলেই তাঁহার নিকটে আসিতে লাগিলেন। তাঁহার সাফল্যের আশা অল্পদিনেই সফল হইল। অর্থাগমের সহিত নূতন কাজও আসিতে লাগিল। অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সেই তিনি একজন শ্রেষ্ঠ উকীলরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। এই সাফল্যের মূল্যস্বরূপ তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি, সমস্ত কামনা আইনরূপী প্রিয়ার হস্তে সমর্পণ করিলেন। কি জনহিতকর, কি ব্যক্তিগত আর কোন কাজের অবসর তাঁহার রহিল না। ছুটির দিন অথবা আদালতের অবকাশ সময়েও তিনি আইন ব্যবসায়ে ডুবিয়া থাকিতেন। তখন ভারতীয় রাষ্ট্র-মহাসভা (কংগ্রেস) সবেমাত্র ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। তিনি প্রথমদিকে কয়েকটি অধিবেশনে যোগ দিয়াছিলেন এবং কংগ্রেসের প্রতি একপ্রকার মানসিক আকর্ষণতাও তাঁহার ছিল। কিন্তু তখনকার দিনে কংগ্রেসের কাজে তিনি বিশেষ উৎসাহ দেখান নাই। তিনি আইন ব্যবসায় লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। 'রাজনীতি ও সাধারণের কাজ সম্পর্কে সে সময় তাঁহার কোন নিশ্চিত ধারণা ছিল না। তখন ঐ সকল বিষয়ে তিনি খুব অল্পই খোঁজ খবর রাখিতেন বলিয়া ঐ দিকে আকৃষ্ট হন নাই। কোন আন্দোলন বা প্রতিষ্ঠানে অপরের কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া যোগ দিবার মত মানসিক অবস্থা তাঁহার ছিল না। তাঁহার বাল্য ও প্রথম যৌবনের যুদ্ধপ্রিয় প্রকৃতি বাহ্যতঃ শাস্ত বোধ হইলেও উহা এক নবীন

জওহরলাল নেহরু

রূপান্তরে নব নব জয়ের পথে আত্মপ্রকাশ করিল। এই শক্তিই ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া তিনি সাফল্য লাভ করিলেন। সাফল্যের সহিত আসিল সার্থক আত্মাভিমান ও আত্মপ্রত্যয়। তিনি সংগ্রাম—বাধা ও বিপত্তির সহিত সংগ্রাম ভালবাসিতেন। অথচ আশ্চর্য্য এই, রাষ্ট্র ক্ষেত্রে এই কালে তিনি পরিহার করিয়া চলিতেন। অবশ্য তৎকালে কংগ্রেসে রাজনৈতিক সংগ্রাম প্রবণতা অতি অল্পই ছিল। যাহাই হউক, সে ভূমি ছিল তাঁহার অপরিচিত, আইন ব্যবসায়গত কঠিন পরিশ্রমেই তিনি মগ্ন থাকিতেন। সাফল্যের প্রত্যেকটি সোপান দৃঢ় পদে অতিক্রম করিয়া তিনি উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলেন। অপরের অমুগ্রহে নহে, পরিশ্রম আত্মসাৎ করিয়াও নহে। তিনি মনে করিতেন, ইহা তাঁহার স্বকীয় বুদ্ধি ও শৌর্য্যবলে।

অবশ্য তিনি সাধারণভাবে জাতীয়তাবাদী হইলেও, ইংরেজ এবং ইংরেজ চরিত্রের প্রশংসা করিতেন। তিনি ভাবিতেন, তাঁহার স্বদেশবাসীর যে অধঃপতন ঘটিয়াছে, বর্তমান অবস্থা ও ব্যবস্থা তাহারই ফল। যে সকল রাজনীতিক কোন কাজ না করিয়া কেবল কথা বলিতেন, তাঁহাদের প্রতি তাঁহার মনে একটা অবজ্ঞার ভাব ছিল অথচ কথা ছাড়া আর কি করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজেরও কোন ধারণা ছিল না। নিজের সাফল্যের গর্বে তিনি ইহাও মনে করিতেন যে, যাহারা জীবনমুখে সকলকাম হয় নাই (অবশ্য সকলে নহে) এমন লোকেরাই রাজনীতি চর্চা করিয়া থাকে।

ক্রমশঃ আয় বৃদ্ধির ফলে আমাদের জীবন যাত্রারও অনেক পরিবর্তন হইল। আয় বৃদ্ধির অর্থই ব্যয় বৃদ্ধি। বিত্ত সঞ্চয় করাকে, পিতা নিজের ইচ্ছামত ও প্রয়োজন মত অর্থ উপার্জন করিবার ক্ষমতার প্রতি অবিশ্বাস বলিয়া মনে করিতেন। আমোদপ্রিয় এবং বিলাসপ্রিয় পিতা উপার্জিত অর্থ অজস্রভাবে ব্যয় করিতে কোন কুষ্ঠাই বোধ করিতেন না। এইরূপে ক্রমশঃ আমাদের পারিবারিক জীবন পান্চাত্য ভাবাপন্ন হইয়া উঠিল। এবং এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যেই আমার শৈশব অতিবাহিত হইয়াছে।*

* এলাহাবাদ ইংরেজী ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর ১৯৪৬ সন্বতের বদি মার্গশীর্ষ ৭ই তারিখে আমার জন্ম হয়।

শৈশবকাল

আমার সঘড়লালিত শৈশবকাল ঘটনাবৈচিত্র্যহীন। মনে আছে, এই সময় আমার দাদারা যে সকল বিষয় আলাপ করিতেন, তাহার অধিকাংশই আমি বুঝিতাম না। সময় সময় ভারতবাসীদের প্রতি ইংরাজ ও ইউরেশিয়ানদের উদ্ধত ও অপমানসূচক ব্যবহারের বিষয় আলোচনা হইত এবং সিদ্ধান্ত হইত, প্রত্যেক ভারতবাসীরই কর্তব্য ইহা সহ্য না করিয়া প্রতিবাদ করা। শাসক ও শাসিতের মধ্যে এই শ্রেণীর সম্বন্ধ অতি সচরাচর ঘটনা বলিয়া প্রায়ই আলোচনা হইত। যখনই কোন ইংরেজ ভারতবাসীকে হত্যা করিত, ইংরাজ জুরীর বিচারে সে অব্যাহতি পাইত। রেলের কামরা ইয়োরোপীয়ানদের জন্ত স্বতন্ত্র করা ছিল। যত ভীড়ই হউক না কেন, ঐ কামরা একেবারে শূণ্য থাকিলেও, কোন ভারতীয়কে তথায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না। ইয়োরোপীয়ানদের জন্ত নির্দিষ্ট নহে, এমন কোন কামরায় যদি দৈবাৎ কোন ইংরাজ যাত্রী থাকিতেন, তাহা হইলেও সেখানে ভারতীয়ের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ। সাধারণ ভ্রমণ, উদ্ভান ও অগ্ন্যাগ্ন স্থানেও খেতাবদের জন্ত চেয়ার বেঞ্চ নির্দিষ্ট থাকিত। বিদেশী শাসকগণের এই সকল দুর্ব্যবহারের কথা আমি ক্রুদ্ধ হইতাম; কোন ভারতীয় ইহার প্রতিশোধ লইয়াছে, একথা শুনিলে আনন্দ হইত। মাঝে মাঝেই আমার দাদারা অথবা তাঁহাদের বন্ধুদের সহিত এই শ্রেণীর কলহ ঘটিত এবং তাহা লইয়া আমরা উত্তেজিত ভাবে আলোচনা করিতাম। আমার এক দাদা খুব বলিষ্ঠ ছিলেন এবং তিনি ইচ্ছা করিয়াই ইংরাজ এবং অধিকাংশ সময়ে ইউরেশিয়ানদের সহিত ঝগড়া বাধাইতেন। ইউরেশিয়ানরা শাসকজাতির সহিত স্বজাতীয়ত্ব প্রমাণ করিবার জন্ত ইংরাজ শাসক ও বণিক অপেক্ষা অধিকতর রূঢ় অভদ্র ব্যবহার করিত। এই সকল কলহের অধিকাংশই রেল ভ্রমণকালে ঘটিত।

ইংরাজ শাসক ও তাহাদের ব্যবহারের জন্ত আমার চিত্তে বিক্ষোভের সঞ্চার হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ে, ব্যক্তিবিশেষ ইংরাজের প্রতি আমার মনে কোন বিরূপভাব ছিল না। আমার ইংরাজ শিক্ষয়িত্রী ছিলেন এবং মাঝে মাঝে পিতার ইংরাজ বন্ধুরা আমাদের বাড়ীতে আসিতেন। মনে মনে আমি ইংরাজদিগকে শ্রদ্ধা করিতাম।

জওহরলাল নেহরু

সন্ধ্যাবেলা পিতার বৈঠকখানায় বন্ধু সমাগম হইত। দিবসের কৰ্মকান্তির পর উৎসাহীরা বিশ্রান্ত্যাপে প্রবৃত্ত হইতেন। পিতার উচ্চহাস্যে গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিত। তাঁহার প্রাণখোলা হাসি এলাহাবাদের সকলেই জানিত। আমি মাঝে মাঝে তাঁহাদের পক্ষাৱ, আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া দেখিতাম এবং এই সকল বড় বড় লোকেরা কি কথাবার্তা বলেন, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিতাম। কখনো ধরা পড়িলে, কেহ আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেন। সলজ্জ ভীৰুতার সহিত কিয়ৎকাল পিতার ক্রোড়ে বসিয়া চলিয়া আসিতাম। একদিন দেখি, পিতা ক্লারেট বা ঐ জাতীয় এক প্রকার রক্তবর্ণ মদ্যপান করিতেছেন। ছইক্ষীর নাম আমি জানিতাম, কেননা প্রায়ই পিতা বন্ধুগণের সহিত ছইক্ষী পান করিতেন। কিন্তু লোহিত বর্ণের তরল পানীয় দেখিয়া আমি ভয় পাইলাম এবং দৌড়াইয়া গিয়া মাকে বলিলাম, বাবা রক্তপান করিতেছেন।

আমি অতিশয় পিতৃভক্ত ছিলাম। আমার দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন শক্তি, সাহস ও প্রতিভাদীপ্ত বন্ধির প্রতীক। অগাধ ঐহাদের দেখিতাম, তাঁহাদের অপেক্ষা তাঁহাকে অনেক শ্রেষ্ঠ মনে করিতাম। ভাবিতাম, আমি বড় হইলে বাবার মত হইব। ভক্তি ভালবাসা থাকিলেও আমি বাবাকে ভয় করিতাম। যখন তিনি চাকর বাকর বা অন্ত কাহারো প্রতি ক্রুদ্ধ হইতেন, তখন তাঁহাকে আমার ভয়ঙ্কর মনে হইত। তাঁহার ক্রুদ্ধ মুক্তি দেখিয়া আমি ভয়ে কাঁপিতাম। চাকরদের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠুর ব্যবহারে মনে মনে রাগও হইত। পিতার মত আশ্রয় মেজাজ আমি কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তিনি অতিমাত্রায় রক্তপ্রিয় ছিলেন এবং নিজেকে সঞ্চরণ করিবার মত দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিও তাঁহার ছিল। প্রায়ই তিনি আত্মসঞ্চরণ করিতেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিজেকে সংযত করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পরে তিনি ধৈর্য হারাইয়া পূর্বের মত রুদ্ধতা কদাচিৎ দেখাইতেন।

ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে, একবার পিতা আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। আমি তখন পাঁচ কি ছয় বৎসরের। একদিন দেখি, পিতার অফিসঘরের টেবিলের উপর দুইটি কাউন্টেন পেন রহিয়াছে। দেখিয়া লোভ হইল। মনে মনে ভাবিলাম, বাবার তো একসঙ্গে দুইটা কলমের দরকার নাই; কাজেই একটি আমি তুলিয়া লইলাম। পরে দেখি, বাড়ীময় হারান কলম খুঁজিবার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে,—আমি ভয় পাইলাম, কিন্তু কিছু বলিলাম না। কলমটি পাওয়া গেল, এবং আমি যে অপরাধী তাহাও জানিতে কাহারো বাকী রহিল না, পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে ভীষণ প্রহার করিলেন।

শৈশবকাল

বেদনায়, ক্ষোভে অপমানে অধীর হইয়া আমি যার নিকট ছুটিয়া গেলাম। আমার শরীরের বেদনা-স্থানগুলিতে কয়েকদিন ক্রীম প্রভৃতি মারিশ করিতে হইয়াছিল।

এই শাসনের জ্ঞাত পিতার প্রতি আমার মনে মোটেই বিরক্ত হয় নাই। আমার মনে হয়, তখন আমি ভাবিতাম, ওহারের মাত্রা একটু বেশী হইলেও শাস্তি ঠিকই হইয়াছে। আমার শ্রদ্ধাভক্তি চিরদিন প্রবল থাকিলেও তাহা ভয় মিশ্রিত ছিল। কিন্তু মায়ের সঙ্গে সখ্য ছিল অগ্নরূপ। মাকে আমি মোটেই ভয় করিতাম না। কেননা, আমি জানিতাম, আমি বাহা কবিতা তিনি তাহাতে সায় দিবেন। আমার প্রতি তাঁহার নির্কিচারণ স্নেহের আতিশয্যের সুযোগ লইয়া আমিও যথেষ্ট আবদার করিতাম। বাবা অপেক্ষা মাকেই আমি বেশী চিনিতাম; মার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল বেশী। যে কথা বাবাকে বলিতে পারিতাম না, তাহা অনায়াসে মাকে বলিতাম। মা ছোটখাট ছিলেন এবং ফিট ফাট থাকিতেন। অল্পদিনের মধ্যেই লম্বায় আমি মার প্রায় সমান হইয়া উঠিলাম এবং তাঁহাকে আমার সমকক্ষ বলিয়াই মনে করিতাম। মায়ের রূপলাবণ্য, তাঁহার বালিকাশুলভ ছোট ছোট হাত পা আমি দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম। আমার মাতামহকুল কাশ্মীর হইতে অপেক্ষাকৃত নবাগত, মাত্র দুই পুরুষ পূর্বে তাঁহার জন্মভূমি হইতে আসিয়াছিলেন।

বাল্যকালে মনের কথা বলিবার আর একজন সঙ্গী ছিলেন। তিনি বাবার মুন্সী; মুন্সী মোবারক আলী। তিনি বদায়ুনের এক ধনী পরিবারের বংশধর। ১৮৫৭র বিদ্রোহে এই পরিবারের সর্বনাশ হয়। ইংরাজ সিপাহীরা এই পরিবারের অনেককেই সমূলে উৎসন্ন করিয়াছিল। সেই দুঃখস্মৃতি তাঁহাকে ধীর গম্ভীর এবং সকলের প্রতি সদয় করিয়াছিল। বিশেষতঃ ছেলেপেলে তিনি বড় ভালবাসিতেন। যখনই আমি অসুখী হইতাম অথবা বিপদে পড়িতাম, তখনই তাঁহার নিরাপদ আশ্রয়ে ছুটিয়া যাইতাম। তাঁহার সুন্দর পক্ষ শ্রবণ দেখিয়া আমি মনে করিতাম, তিনি অতি প্রাচীনকালের লোক। তিনি অনেক প্রাচীনকাহিনী জানিতেন। আমি গল্প বলিবার জ্ঞাত আবদার করিতাম। তিনি আরব্য উপন্যাস অথবা অন্ত্যান্ত কাহিনী, কিম্বা ১৮৫৭-৫৮র ঘটনা বলিতেন। আমি ঘটনার পর ঘটনা অপলক নেত্রে সেই সকল আশ্চর্য্য গল্প শুনিতাম। আমি যথেষ্ট বড় হইবার পর “মুন্সীজীর” মৃত্যু হয়, কিন্তু তাঁহার স্মৃতি বহুমূল্য সম্পদের মত এখনো আমার মনে উজ্জ্বল রহিয়াছে।

অন্তঃপুরে মা ও জ্যেষ্ঠীদের নিকট আমরা রামায়ণ ও মহাভারতের

জওহরলাল নেহরু

অপূর্ণ উপাখ্যান অনুভব, নন্দলাল নেহরুর পত্নী, আমার জ্যেষ্ঠা প্রাচীন পুরাণ ও গল্পের ভাণ্ডার ছিলেন। তাঁহার নিকট শুনিয়া শুনিয়া আমি ভারতীয় পুরাণশাস্ত্র এবং উপকথায় অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম।

ধর্ম সম্বন্ধে আমার ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট ছিল। আমি উহা ত্রীলোকের বয়স্ক বয়স্ক বয়স্ক মনে করিতাম। বাবা এবং আমার জ্যেষ্ঠা ভাইরা ইহা লইয়া ঠাট্টা তামাসা করিতেন এবং তুচ্ছতাচ্ছল্য করিতেন।

বাড়ীর মেয়েরা পাল পার্বণে ব্রত পূজাদির অনুষ্ঠান করিতেন। যদিও ঐগুলি আমার ভাল লাগিত তথাপি বয়স্কদের অনুকরণ করিয়া ঐগুলির প্রতি অবজ্ঞার ভাব দেখাইতে চেষ্টা করিতাম। প্রায়ই মা ও জ্যেষ্ঠামাদের সহিত গঙ্গান্নানে যাইতাম। তাঁহাদের সহিত এলাহাবাদ ও বারাণসীতে মন্দিরে দেবদর্শনও করিতাম। বিখ্যাত সাধু সন্ন্যাসীর দর্শনেও আমি তাঁহাদের সঙ্গী হইতাম। কিন্তু এই সকল ঘটনা আমার চিত্তে বিশেষ রেখাপাত করে নাই।

ইহা ছাড়া বড় বড় উৎসবে আমোদ হইত। হোলীর দিনে সমগ্র নগরী উৎসব কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিত, আমরা রং ও আবীর ছিটাইয়া আনন্দ করিতাম। দেওয়ালীর রাত্রে গৃহে গৃহে সহস্র সহস্র স্তিমিত-ভাতি মৃৎপ্রদীপ জলিয়া উঠিত। জমাষ্টমীতে কংস কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম উপলক্ষ্যে মধ্যরাত্রে বিশেষ পূজার আয়োজন হইত (আমাদের পক্ষে ততক্ষণ জাগিয়া থাকা কঠিন হইত)। দশহরা ও রামলীলায় শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কাবিজয় প্রভৃতি প্রাচীন কাহিনীর জীবন্ত চিত্র মুক অভিনেতাগণ কর্তৃক অভিনীত হইত। বড় বড় মঞ্চের উপর সীতা রাম লক্ষণ প্রভৃতি থাকিত। সেইগুলি লইয়া শোভাযাত্রা হইত। বিশাল জনতা তাহা দেখিবার জন্য সমবেত হইত। মহরমের দিন আমরা ছেলের দল রেশমী পোষাক পরিয়া হুদূর আরবের হাসান হোসেনের দুঃখস্বস্তি মণ্ডিত শোকযাত্রা দেখিতে যাইতাম। বৎসরে দুইবার ঈদের সময় মুসলিমী উত্তম বসন পরিয়া জুম্মা-মসজিদে নামাজ পড়িতে যাইতেন। সেদিন তাঁহার বাড়ীতে আমরা বিবিধ মিষ্টান্ন ভোজন করিতাম। ইহার উপর হিন্দু-পঞ্জিকাছুষায়ী রক্তবন্ধন ভাইফোঁটা প্রভৃতি ছোটখাট উৎসব হইত।

আমাদের এবং অন্যান্য কাস্মীরী পরিবারে আরো কতকগুলি উৎসব হয়, যাহা এ স্কুলের হিন্দুরা পালন করেন না। তাহার মধ্যে প্রধান হইল, নওরোজ; স্বয়ং বৎসরের প্রথম দিবস। এই বিশেষ দিবসে আমরা নববস্ত্র পরিধান করিতাম, বাড়ীর ছেলেপিলেরা ঐ দিন কিছু কিছু পয়সাও পাইত।

শেষকাল

কিন্তু সমস্ত উৎসবের মধ্যে, আমার জন্মদিনের বাৎসরিক অনুষ্ঠানটিই আমার সর্বাধিক প্রিয় ছিল, এই উৎসবের নায়ক আমি স্বয়ং। এই দিন আমার আনন্দ ও উৎসাহের স্তর থাকিত না। অতি প্রত্যবে এক বৃহৎ তুলাদণ্ডে গম ও অগ্ন্যাগ্নি দ্রব্য দিয়া আমাকে ওজন করা হইত; ঐগুলি দরিদ্রদের মধ্যে বিতরিত হইত। আমি উৎকৃষ্ট নব বসন ভূষণে সজ্জিত হইতাম, এবং অনেক উপহার পাইতাম। অপরাহ্নে নিমন্ত্রণ সভা হইত। আমার জন্মই এই উৎসব, এই গল্পে আমার দুক ভরিয়া উঠিত। কিন্তু আমার বড় দুঃখ হইত, জন্মদিন মাত্র বৎসরে একটি। যাহাতে ঘন ঘন আমার জন্মোৎসব হয়, সেজন্ম আবদার করিতাম। তখন বৃষ্টিতাম না যে এমন দিন আসিবে যখন প্রত্যেকটি জন্মদিন বয়োরুদ্ধির অপ্রীতিকর বার্তা স্বরণ করাইয়া দিবে।

আত্মীয় স্বজন বা কোন বন্ধুজনের বিবাহে আমরা সপরিবারে দূরবর্তী সহরে বাইতাম। এই ভ্রমণ বড় আনন্দের হইত। বিবাহোৎসবে ছেলে-পেলেদের উপর শাসন শিথিল হইত। আমরা স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতাম। “সাদিখানা”য় (নিমন্ত্রিত কুটুম্বদের আবাস স্থল) বহু পরিবারকে একত্র ভীড় করিয়া থাকিতে হইত; কাজেই অনেক ছেলেমেয়ের জটলা হইত। এই জেগীর ঘটনায় আমি আর নিঃসঙ্গতা বোধ করিতাম না। প্রাণ ভরিয়া খেলাধুলা ও উপদ্রব করিতাম। অশাস্তপনার জন্ত জ্যেষ্ঠরা কচিং ধমকও দিতেন।

ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে আমাদের দেশে বিবাহব্যাপারে অপব্যয় ও অতিরিক্ত জাঁকজমক হইয়া থাকে। ইহা নিন্দার সন্দেহ নাই। অপব্যয় ছাড়াও এমন কতকগুলি অনুষ্ঠান হয়, যাহা অত্যন্ত স্থূলকৃতির পরিচায়ক। ইহার মধ্যে না আছে সৌন্দর্য্যবোধ না আছে কচির উৎকর্ষতা (ব্যতিক্রমও যে নাই তাহা নহে), কিন্তু ইহার জন্ত প্রধান অপরাধী, মধ্য জেগীর ভদ্র লোক। অবশ্য দরিদ্ররাও অপব্যয়ী, এমন কি ঋণ করিয়াও অপব্যয় করিয়া থাকে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, সামাজিক প্রথা নিয়মের জন্তই জনসাধারণ দরিদ্র। ইহার চেয়ে অধৌক্তিক কথা আর কিছু নাই। ইহারা ভুলিয়া যান, দরিদ্রের জীবনযাত্রা বিরস ও বৈচিত্র্যহীন। কদাচিৎ একটি বিবাহোৎসবে সঙ্গীত ও ভোজের ধুমধাম হয়; ইহা তাহাদের অবিরত হৃদয়হীন শ্রমের মধ্যে হৃদয়ের দুঃখ-বিশ্মতি। প্রাত্যহিক জীবনের নিরানন্দ একঘেয়েমী হইতে একটু আনন্দের অবকাশ। যাহাদের জীবনে হাসিবার অবসর অতি অল্পই মিলে, কে এমন নিষ্ঠুর যে তাহাদিগকে এই সামান্য আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিবে? অপব্যয়

নিবারণ কর, বৃথা জাঁকজমক কমাওয়া দাও (দরিত্রের অভাব-অনটনপূর্ণ ক্ষুদ্র আয়োজন সঙ্ক্ষে ঐ সকল বড় বড় শব্দ প্রয়োগ করা নির্বুদ্ধিতামাত্র), কিন্তু তাহাদের জীবনকে অধিকতর নীরস ও আনন্দহীন করিও না।

মধ্যশ্রেণীর স্বপক্ষেও বলিবার আছে। অপচয় অপব্যয় ছাড়িয়া দিলে এই সকল বিবাহ বৃহৎ সামাজিক সম্মেলন। এখানে বহু দিবসের ব্যবধানে দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় ও পুরাতন বন্ধুদের মিলন হয়। এরূপ সকলের একত্রে মিলন অগ্ৰত সহজ নহে। এই জন্তই বিবাহে মিলনোৎসব এত জনপ্রিয়। সামাজিক সম্মেলন হিসাবে আধুনিক রাজনৈতিক সম্মেলন, কংগ্রেস, কনফারেন্স অবশ্য কোন কোন দিক দিয়া বিবাহের মিলনোৎসবকে ছাড়াইয়া গিয়াছে।

ভারতে বিশেষতঃ উত্তর ভারতে অগ্ৰাঙ্গ অপেক্ষা কাস্মীরীদের একটি বিশেষ স্বেচছা আছে। তাঁহারা নিজেদের মধ্যে পর্দাপ্রথা মানেন না। ভারতের সমতল ক্ষেত্রে নামিয়া অ-কাস্মীরী অথবা অগ্ৰাঙ্গের সঙ্গে ব্যবহারকালে তাঁহাদিগকে অংশত পর্দাপ্রথা গ্রহণ করিতে হইয়াছে বটে। কেননা যে অঞ্চলে আসিয়া অধিকাংশ কাস্মীরী বাস করিতেছিলেন, সেখানে পর্দাপ্রথা সামাজিক মর্যাদা ও অভিজাত্য বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু নিজেদের মধ্যে স্ত্রীপুরুষে অবাধ মেলামেশার কোন বাধাই ছিল না। যে কোন কাস্মীরী অপর কাস্মীরীর অন্তঃপুরে গিয়া পুরমহিলাদের সহিত শিষ্টালাপ ইত্যাদি করিতে পারেন। ভোজ সভায় বা অগ্ৰাঙ্গ অস্থলানে স্ত্রীপুরুষ একত্রে আহারাদি করেন। কেবল মেয়েদের বসিবার আসন স্বতন্ত্র থাকে। বালকবালিকাদের মধ্যে সে রকম পাখকা করা হয় না। তবে আধুনিক পাশ্চাত্য দেশে স্বাধীনতা বলিতে যাঁহা বুঝায় ইহা তাহা নহে।

এমনি ভাবেই আমার বাল্যজীবন কাটিয়াছে। আমাদের বৃহৎ পরিবার— মাঝে মাঝে পারিবারিক কলহ হইত। যখন এই শ্রেণীর কলহে বাড়াবাড়ি হইত, তখন তাহা পিতার কানে উঠিত। তিনি ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া ভাবিতেন, স্ত্রীলোকদের নির্বুদ্ধিতার জন্তই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। আসলে কি ঘটিয়াছে আমি কিছুই বুঝিতাম না। ভাবিতাম, নিশ্চয়ই এমন কিছু অগ্রায় ঘটিয়াছে, যাঁহার জন্ত পরস্পরের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ অথবা কথাবার্তা বন্ধ হইয়াছে। আমি ইহাতে অত্যন্ত অন্থবী বোধ করিতাম। কিন্তু যখন পিতা হস্তক্ষেপ করিতেন তখন সব ঠিক হইয়া যাইত।

এই সময়ের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা স্মরণ আছে। তখন আমার বয়স সাত কি আট বৎসর। এলাহাবাদের অখারোহী সৈন্তদলের একজন

থিয়োজফি

সোনারের সহিত আমি প্রত্যহ অশারোহণে ভ্রমণ করিতে যাইতাম। আমার একটি আরবী টাটুঘোড়া ছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা আমি ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়াছিলাম। ঘোড়া দোড়াইয়া সোজা বাড়ীতে উপস্থিত—তাহার গৃষ্ঠে আমি নাই। পিতা তখন বন্ধুদের লইয়া টেনিস খেলিতেছিলেন। শূণ্য ঘোড়া দেখিয়া একটা আতঙ্কের সঞ্চার হইল। পিতা সদলবলে বিভিন্ন যানবাহনে একটা ছোটখাট শোভাযাত্রা করিয়া আমাকে খুঁজিতে বাহির হইলেন। পথেই আমার সহিত সাক্ষাৎ হইল; আমি যেন যুদ্ধ জয় করিয়া ফিরিতেছি, এমন ভাবে তাঁহারা আমাকে সমাদর করিলেন।

৩

থিয়োজফি

আমার দশ বৎসর বয়সে, আমরা আমাদের নূতন ও বৃহৎ বাড়ীতে উঠিয়া আসিলাম। বাবা এই বাড়ীর নাম রাখিলেন, “আনন্দভবন।” এই বাড়ীতে বৃহৎ উদ্যান এবং সাতার কাটিবার একটি জলাশয় ছিল। নূতন বাড়ীতে আসিয়া আমার কি আনন্দ। তখনও নূতন বাড়ী তৈয়ার চলিতেছিল, চারিদিকে খননকার্য ও নির্মাণকার্যের কলরব। রাজমজুরদের কাজকর্ম দেখিতে আমার বড় ভাল লাগিত।

সাতার দিবার জলাশয়টি বেশ বড় রকমের। অল্পদিনের মধ্যেই আমি সাতার শিখিলাম এবং জলে ডুবিয়া ভাসিয়া বড় আনন্দ পাইতাম। গ্রীষ্মকালে দীর্ঘদিবসে যখন তখন দিনে কয়েকবার করিয়া স্নান করিতাম। অপরাহ্নে বাবার বন্ধুরা স্নান করিতে আসিতেন। জলাশয়ের উপর এবং আমাদের বাড়ীতে বিজলি বাতি জলিত। তখনকার এলাহাবাদে এ এক নূতন ব্যাপার। এই স্নানাথীদের দলে মিশিয়া স্নান করা, বাহারা সাতার জানিতেন না তাঁহাদের অতর্কিতে টানিয়া অথবা ধাক্কা দিয়া ভয় দেখান, একটা উপভোগ্য ব্যাপার ছিল। আমার বিশেষভাবে মনে আছে, তখন ডাঃ তেজ বাহাদুর সপ্ত এলাহাবাদের নূতন উকীল। তিনি সাতার জানিতেন না, শিখিবার কোন ইচ্ছাও ছিল না। তিনি প্রথম সোপানের

আধহাত জলে বসিতেন, কিছুতেই দ্বিতীয় সোপানে পর্য্যন্ত নামিতে চাহিতেন না, কেহ টানাটানি করিলে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেন। পিতাও সঁাতার জানিতেন না। তবে তিনি দাঁতে দাঁত চাপিয়া অতি কষ্টে কোমরজল পর্য্যন্ত যাইতেন।

এই সময় বুয়ের যুদ্ধ চলিতেছিল। আমি আগ্রহ সহকারে যুদ্ধের বিষয় শুনিতাম, এবং আমার গৃহস্থভূতি ছিল বুয়েরদের দিকে। যুদ্ধের সংবাদ জানিবার আগ্রহে এই সময় আমি সংবাদপত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করি।

এই সময় আমার কনিষ্ঠা ভগ্নীর জন্ম আমার নিকট একটা নূতন আকর্ষণের বিষয় হইল। সকলেরই ভাই বোন আছে, আমার নাই, এই ক্ষোভ আমার মনকে পীড়া দিত। একটি ছোট্ট ভাই কিম্বা ভগ্নীর আগমন সম্ভাবনায় আমার মনের ভার লঘু হইয়া গেল। পিতা তখন ইউরোপে। আমার মনে আছে; সংবাদের জন্ত অধীরভাবে বারান্দায় অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় ডাক্তারদের মধ্যে একজন বাহির হইয়া বলিলেন, হয়তো ঠাট্টা করিয়াই বলিলেন, তোমার পক্ষে আনন্দের সংবাদ, পিতার বিষয়ে ভাগ বসাইবার জন্ত পুত্র সন্তান হয় নাই। এমন নীচ স্বার্থপরতা আমি অন্তরে পোষণ করি, এমন কথা কেহ কল্পনা করিতে পারে, এই কথা ভাবিয়া আমার মন তিক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

পিতার বিলাতযাত্রা লইয়া ভারতের কান্মীরী ব্রাহ্মণ-সমাজে তুমুল কোলাহল উঠিল। বিলাত হইতে ফিরিয়া পিতা প্রায়শ্চিত্ত করিতে অস্বীকার করিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে কংগ্রেসের অগ্রতম সভাপতি এবং কান্মীরী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিষ্ণু নারায়ণ দাস আইন পড়িবার জন্ত বিলাতে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি প্রায়শ্চিত্ত করা সত্ত্বেও সমাজের গোঁড়ারা তাঁহার সহিত সামাজিক ব্যবহার করেন নাই, তাঁহাকে 'এক ঘরে' করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় কান্মীরী ব্রাহ্মণ সমাজ কম বেশী দুই ভাগে বিভক্ত হয়, পরে অনেক শিক্ষার্থী কান্মীরী যুবক ইয়োরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া নামমাত্র প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সংস্কারক মলে যোগ দিয়াছিলেন। এই অহুষ্ঠান একটা গ্রহসন যাত্রা, ইহার সহিত ধর্মের কোন সম্বন্ধ ছিল না। ইহা সমাজের সমষ্টির অভিপ্রায়ের বাহ্য আভ্যুগত্য স্বীকার যাত্রা। প্রায়শ্চিত্তের পর প্রত্যেকেই কোন বাধাবোধি মানিতেন না, স্বচ্ছন্দে অ-ব্রাহ্মণ এবং অ-হিন্দুদের সহিত মিলিয়া মিলিয়া খাদ্য পানীয় গ্রহণ করিতেন।

পিতা তাহাও করিলেন না। লোক দেখান তথাকথিত শুদ্ধি প্রায়শ্চিত্ত করিতে তিনি একেবারেই অস্বীকার করিলেন। পিতার এই অবজ্ঞাপূর্ণ

খিয়োজফি

মনোভাব লইয়া তুমুল আলোচনা চলিল এবং অবশেষে একদল কান্দ্রী পিতার পক্ষ অবলম্বন করায় তৃতীয় দল গঠিত হইল। অবশ্য কয়েক বৎসরের মধ্যেই পুরাতন বাঁধাবাধি শিথিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই তিনদল পরস্পরের সহিত মিশিয়া গেল। বহু কান্দ্রী ছাত্র-ছাত্রী ইয়োরোপ ও আমেরিকায় শিক্ষা লাভ করিয়া ফিরিয়াছেন, প্রায়শ্চিত্তের প্রশ্নও কাহারও মনে উদ্ভিত হয় নাই। মুষ্টিমেয় গোঁড়া বিশেষভাবে প্রাচীনা খিলাগণ ব্যতীত, খাওয়া দাওয়ার বাঁধাবাধি নাই বলিলেই হয়। অ-কান্দ্রী, মুসলমান, অ-ভারতীয় সকলের সহিতই একত্র ভোজন সচরাচর চলিয়া থাকে। কান্দ্রী মহিলারা অগ্ৰাণ্ড সম্প্রদায়ের সম্মুখেও পর্দা-প্রথা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়াছেন; ১৯৩০-এর রাজনৈতিক আলোড়নে পর্দা প্রথা নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়াছে। অসবর্ণ বিবাহ জনপ্রিয় না হইলেও ক্রমশঃ বাড়িতেছে। আমার দুই ভগ্নীর বিবাহ অ-কান্দ্রীর সহিতই হইয়াছে এবং আমাদের পরিবারের একজন যবক একটি ছাত্রীকে তরুণীকে বিবাহ করিয়াছেন। সম্প্রদায় হিসাবে এই বিশাল দেশে আমাদের সংখ্যা অতি কম। ধর্মের বাধা অপেক্ষা সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য রক্ষার আগ্রহই অসবর্ণ বিবাহের বাধা। কান্দ্রীরা অনেকে তাঁহাদের আকৃতির আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য রক্ষার পক্ষপাতী। ভারতীয় ও অ-ভারতীয় মানব সমুদ্রে মিলিয়া যাইবার ভয়ে তাঁহারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্ত সর্বদাই সচেতন।

কান্দ্রী ব্রাহ্মণদের মধ্যে, প্রায় শতবর্ষ পূর্বে সম্ভবতঃ মির্জা মোহনলাল কান্দ্রীরাই (নিজের দত্ত উপাধি) প্রথম পাশ্চাত্য দেশে গমন করিয়াছিলেন। তিনি দিল্লী মিশন কলেজের ছাত্র। যৌবনে তিনি বুদ্ধিমান ও প্রিয়দর্শন ছিলেন। পাশী-দোভাষী রূপে তিনি ব্রিটিশ মিশনের সহিত কাবুলে যান। তিনি মধ্য এশিয়া ও পারস্যের বহু স্থল ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি যেখানেই যাইতেন, যোগাড়যন্ত্র করিয়া একটি বিবাহ করিতেন। সাধারণতঃ অভিজাত পরিবারের কন্যাই তিনি বিবাহ করিতেন। অবশেষে তিনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া পারস্য রাজপরিবারের এক যুবতীকে বিবাহ করেন। এই জন্তই তাঁহার উপাধি 'মির্জা'। তিনি ইয়োরোপও ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের তরুণী রাণী ভিক্টোরিয়ার সহিত সাক্ষাতের সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণ কাহিনী মনোরম ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন।

এগার বৎসর বয়সের সময় ফার্ডিনান্দ, টি, ব্রুক্স আমার নৃতন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। ইহার পিতা আইরিশ, মাতা ফরাসী কি বেলজিয়ান ছিলেন। ইনি একজন উৎসাহী খিয়োজফিষ্ট, এবং মিসেস

জওহরলাল নেহরু

এনি বেশাঙ্ক ইহার জন্ত শিতার নিকট স্থপারিশ করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় তিন বৎসর ছিলেন এবং নানাদিক দিয়া আমার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। এই সময় হিন্দী ও সংস্কৃত পড়াইবার জন্ত একজন স্নেহশীল বৃদ্ধ পণ্ডিতও আমার শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু কয়েক বৎসরের চেষ্টায় তিনি আমাকে অতি সামান্য সংস্কৃতও শিখাইতে সক্ষম হইলেন না। পরবর্তীকালে হারোতে যতটুকু লাতিন ভাষা পড়িয়াছিলাম, আমার সংস্কৃত বিজ্ঞা তাহার অধিক নহে। দোষ অবশ্য আমারই। নূতন ভাষা শিখিবার নিপুণতা আমার নাই, আর ব্যাকরণে কিছুতেই আমার মন বসিত না।

এক, টি, ক্রক্স আমার মনে পাঠস্পৃহা জাগাইয়া তুলিলেন। এই কালে অনিয়মিতভাবে বহু ইংরাজী বই আমি পড়িয়াছি। শিশু সাহিত্যে আমার বেশ দখল ছিল। ‘দি জাঙ্গল বুক’ ‘কিম’ এবং লুইস ক্যারোলের বইগুলি আমার বড় প্রিয় ছিল। গুস্তাভ ডোরের সচিত্র ‘ডন কুইক্সট’ পড়িয়া আমি মুগ্ধ হইতাম। ফ্রিডিয়ফ গ্লানসানের ‘কারদেইট নর্থ’ এক অজ্ঞাত রহস্যময় দেশে ভ্রমণস্পৃহা আমার চিত্তে বলবতী করিয়া তুলিত। স্কট, ডিকেন্স, থ্যাকারে, এইচ, জি ওয়েল্‌সের উপন্যাস, মার্ক টোয়েন এবং শার্লক হোমসের গল্প অনেক পড়িয়াছি। “প্রিজনার অফ জেন্সা” পড়িয়া আমি রোমাঞ্চিত হইতাম। জেরোম কে জেরোমের “থি মেন ইন এ বোট” আমার নিকট তখন সর্বশ্রেষ্ঠ রঙ্গরসের পুস্তক ছিল। আর একখানা বইএর কথা মনে আছে, ছা মোরিয়ারের “টিল্‌বি”, এবং “পিটার ইবেটসন।” এই সময় কবিতার প্রতিও আমার অতুরাগ হয়। বহু বিচিত্র পরিবর্তনের মধ্যেও অদ্যাবধি এই অতুরাগ আমি হারাই নাই।

ক্রক্স, আমার বিজ্ঞান শিক্ষারও প্রথম পথপ্রদর্শক। আমরা একটি ছোট ‘লেবরেটরি’ করিয়াছিলাম। সেইখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের অনেক প্রাথমিক পরীক্ষাকার্যে রত থাকিতাম।

সাধারণ লেখাপড়া ছাড়াও ক্রক্সের প্রভাবে আমি থিয়োজফির প্রতি আকৃষ্ট হইলাম। কিছুকাল এই আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল ছিল। তাহার কক্ষে থিয়োজফিষ্টদের সাপ্তাহিক বৈঠকে আমিও উপস্থিত থাকিতাম এবং ক্রমে থিয়োজফির কতকগুলি বাধাবলি এবং ভাব আয়ত্ত করিলাম। সেখানে দার্শনিক আলোচনা ও পুনর্জন্ম, স্বপ্ন দেহ, অশরীরী প্রাণী, আত্মার স্বপ্নজ্যোতিঃ প্রভৃতি আলোচনা হইত। প্রসঙ্গতঃ মাদাম ব্লাভাস্কী ও অগ্নাজ থিয়োজফিষ্টদের বড় বড় বইএর কথা তো উঠিতই, তাহা ছাড়া হিন্দুশাস্ত্র, বৌদ্ধদের ‘দশমপদ’ ‘পিথাগোরাস’ টায়নার এপোলিয়নস্ ও অগ্নাজ

দার্শনিক ও মহাত্মার বিষয় আলোচনা হইত। আমি অতি অল্পই বুঝিতাম, কিন্তু অতীন্দ্রিয় রহস্যের মোহে মুগ্ধ হইয়া ভারিতাম, সৃষ্টির সমস্ত রহস্য এই উপায়েই জানা যাইবে। জীবনে এই প্রথম আমি ধর্ম ও পরলোক সম্বন্ধে সচেতনভাবে চিন্তা করিতে লাগিলাম। বিশেষভাবে হিন্দুধর্মের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। আচার অহুষ্ঠানের জন্ত নহে—মহান উপনিষদ ও ভগবদগীতার জন্ত; অবশ্য আমি উহা বুঝিতে পারিতাম না, তথাপি উহা অপূর্ণ বলিয়া মনে হইত। আমি স্বপ্নে জ্যোতির্ময় দেহধারীদের দেখিতাম, নিজেও দূর দূরান্তরে উড়িতাম। আকাশে উড়িবার (কোন যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত) স্বপ্ন আমি অজীবন প্রায়ই দেখিয়া থাকি। মাঝে মাঝে এই স্বপ্ন এত স্পষ্ট ও বাস্তব বলিয়া মনে হয় যে, আমি নিয়ে ধরণীর বিশাল বিস্তারে প্রত্যেকটি বস্তু স্পষ্ট দেখিতে পাই। আমি জানি না আধুনিককালের ফ্রেড ও অগাস্ট স্বপ্ন-ব্যাখ্যাতারা ইহার কি ব্যাখ্যা করিবেন।

এই সময় মিসেস আনি বেনশান্ত এলাহাবাদে আসিয়া খিয়োজফিক সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা করেন। তাঁহার বাগ্মিতায় আমার অন্তর গভীর ভাবে আলোড়িত হইত, আমি স্বপ্নাবিষ্টের মত গৃহে ফিরিতাম। আমি খিয়োজফিক্যাল সোসাইটিতে যোগদানের সঙ্কল্প করিলাম। তখন আমার বয়স মাত্র তের বৎসর। যখন পিতার অমুমতি প্রার্থনা করিলাম, তিনি হাসিয়া সম্মতি দিলেন। মনে হইল, বাপারটিকে তিনি মোটেই গুরুতর বলিয়া মনে করিলেন না। তাঁহার তুচ্ছতাঙ্কিল্যে আমি একটু সন্তুষ্ট হইলাম। আমার পক্ষে তিনি অনেক দিক দিয়া মহান হইলেও আধ্যাত্মিক অমুরাগের অভাব দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। কিন্তু কার্যতঃ তিনি একজন পুরাতন খিয়োজফিকিষ্ট এবং যখন মাদাম ব্লাভাক্সি ভারতে আসিয়াছিলেন তখনই তিনি উক্ত সমিতিতে যোগদান করেন। ধর্মামুরাগ অপেক্ষা কোতূহলবশেই তিনি উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন এবং অল্পদিনেই খিয়োজফিকির সংশ্রব ত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁহার অগাধ বন্ধুরা, ষাঁহারা তাঁহার সহিত যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহার উহার সহিত যুক্ত থাকিয়া সমিতির উপদেশকমণ্ডলীতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

তের বৎসর বয়সে আমি খিয়োজফিক্যাল সোসাইটির সভ্য হইলাম। স্বয়ং মিসেস বেনশান্ত আমাকে দীক্ষা দিলেন। তিনি কতকগুলি ভাল ভাল উপদেশ দিলেন এবং কয়েকটি রহস্যময় মুদ্রা শিখাইয়া দিলেন। আমি এক অপূর্ণ ভাবাবেগ অনুভব করিলাম। আমি কানীতে খিয়োজফিক সম্মেলনে যোগদান

করিয়াছিলাম এবং শ্রমের বরন কর্ণেল অনেককে দেখিয়াছিলাম। জিশ বৎসর পর, বাল্যকাল সঙ্কে সক্রিয় ধারণা করা কঠিন। আমার স্পষ্ট মনে আছে, থিয়োজফি অনুপ্রাণিত হইয়া আমার চোখে মুখে একটা নিরীহ ও জিন্বেজ ভাব দেখা দিল। ধার্মিকদের মধ্যে থিয়োজফিষ্ট নরনারীদের মধ্যে ইহা সচরাচর দেখা যায়। আমি একজন বিশিষ্ট ধর্মসাধক, এই ধারণায় সর্বদা ডগমগ হইয়া থাকিতাম। আমার ভাবভঙ্গী দেখিয়া সমবয়সী ছেলে মেয়েরা আমার সহিত মিশিতে চাহিত না।

ইহার কিছুদিন পরেই এক, টি, ক্রকস্ আমাকে ছাড়িয়া গেলেন, থিয়োজফির সহিত আমার সম্পর্কও ফুরাইল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে (ইংলণ্ডে ফুলে বোগ দেওয়ার জন্তও বটে) আমার জীবন হইতে থিয়োজফির ছাপ একেবারেই মুছিয়া গেল। তথাপি এই কয় বৎসরে আমি ক্রকসের প্রতি গভীর ভাবে আকৃষ্ট ছিলাম এবং তাঁহার ও থিয়োজফির নিকট আমি স্বর্গী, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি সঙ্কোচের সহিত বলিব, পরে থিয়োজফিষ্টদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা কমিয়া গেল। আমি দেখিলাম, তাঁহারা অতি সাধারণ নরনারী মাত্র, কোন মহৎ আদর্শ সাধনের জন্ত চিহ্নিত নহেন। তাঁহারাও বিপদের পরিবর্তে আরাম চাহেন; আত্মোৎসর্গকারীর বিদ্রবহল জীবন অপেক্ষা নিরাপদ জীবনই তাঁহাদের কাম্য। কিন্তু মিসেস বেশাস্তের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বরাবর অক্ষুণ্ণ ছিল।

ইহার পরেই রুশ-জাপান যুদ্ধ আমার জীবনে একটা স্বর্ণীয় ঘটনা। জাপানের জয় লাভে আমি উৎসাহিত হইয়া উঠিলাম। প্রত্যহ আগ্রহ সহকারে নূতন সংবাদের জন্ত সংবাদপত্রের অপেক্ষা করিতাম। আমি জাপান সঙ্কে কতকগুলি বই কিনিয়া আনিলাম, কিছু কিছু পড়িলামও। জাপানের ইতিহাসের গহনে পথ হারাইলেও আমার প্রাচীন বীরত্বের কাহিনী এবং লাক্সার্ডিও হার্ণের মনোহর বর্ণনাভঙ্গী ভাল লাগিত।

জাতীয়তার ভাবধারায় আমি অনুপ্রাণিত হইলাম। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, ইয়োরোপের অধীনতা পাশ হইতে এশিয়ার মুক্তি লইয়া জল্পনা কল্পনা করিতাম। তরবারী হস্তে ভারতের স্বাধীনতার জন্ত যুদ্ধ করিতেছি, এই কল্পনা করিয়া আমি দুঃসাহসিক বীরত্বের স্বপ্ন দেখিতাম।

আমি চতুর্দশবর্ষে উত্তীর্ণ হইলাম। আমাদের পারিবারিক জীবনে অনেক পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল। আমার বড় ভাই-এরা উপার্জনক্ষম হইয়া পৃথক বাটি নির্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। নূতন চিন্তা, নানা অস্পষ্ট কামনা আমার মনে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। এবং মেয়েদের প্রতি আমি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করিতে লাগিলাম। কিন্তু তখনও আমি মেয়ে অপেক্ষা

হারো ও কেম্ব্রিজ

ছেলেদের সহিত খেলাধুলাই ভালবাসিতাম; মেয়েদের দলে মেশা আত্মমর্য্যাহার দিক দিয়া অনুচিত মনে করিতাম। কিন্তু কান্দ্রী নীময়ণ সভায় বা অন্ত্রজ বথানে হুন্দরী বালিকার অসম্ভাব হইত না, সেখানে একটি দৃষ্টি বা একটু স্পর্শে আমার চিত্ত পুলকে চঞ্চল হইয়া উঠিত।

১২০৫ সালের মে মাসে পনের বৎসর বয়সে আমি, পিতামাতা ও আমার শিশু ভগ্নীসহ ইংলণ্ড যাত্রা করিলাম।

৪

হারো ও কেম্ব্রিজ

মে মাসের শেষভাগে একদিন আমরা লণ্ডনে পৌঁছিলাম। ডোভার হইতে আসিবার সময় ট্রেনে, স্মসিমায় জলযুদ্ধে জাপানের জয়লাভের কাহিনী পাঠ করিলাম। আমার মন অত্যন্ত প্রসন্ন ছিল। পরদিন আমরা ডার্কিং ঘোড়দোড় দেখিয়া আসিলাম। লণ্ডনে আসিবার কয়েকদিন পরই ডাঃ এম, এ আনসারীর সহিত দেখা হইল। তখন তিনি যুবক, বেশ ফিট ফাট ও বুদ্ধিমান। কৃতিত্বের সহিত কয়েকটি পরীক্ষায় পাশ করিয়া তিনি তখন লণ্ডনের এক হাসপাতালে “হাউস সার্জনের” কার্য্য করিতেছিলেন।

আমার সৌভাগ্য, হারো-স্কুলে একটি জায়গা খালি ছিল বলিয়া ভর্তি হইতে পারিলাম। কেননা, আমার বয়স তখন পনের, স্কুলের নিয়মানুসারে ভর্তি হইবার নিদিষ্ট বয়স অপেক্ষা একটু বেশী। বাবা অন্ত্রাজ সকলকে লইয়া ইয়োরোপ ভ্রমণে চলিয়া গেলেন এবং কয়েক মাস পরে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

জীবনে কখনও একাকী এমন অপরিচিতদের মধ্যে বাস করি নাই। নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ বোধ হইতে লাগিল, বাড়ীর কথা বেশী করিয়া মনে পড়িল। কিন্তু এ ভাব বেশী দিন রহিল না। বিদ্যালয়ের জীবনযাত্রা, পড়াশুনা ও ক্রীড়াভোক্তৃকের মধ্যে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইলাম। কিন্তু তবু ঠিক যেন মিলিল না। সর্ব্বদাই মনে হইত, আমি ইহাদের মত নহি; তাহারাও আমার সম্বন্ধে হয়তো তাহাই মনে করিত। কাজেই আমাকে অনেকটা একা থাকিতে হইত। কিন্তু মোটামুটি আমি উৎসাহের সহিত

জওহরলাল নেহরু

খেলাধুলায় যোগ দিতাম। যদিও বিশেষ কোন ক্রীড়ানৈপুণ্য আমার ছিল না, তথাপি সকলে বৃত্তিত, আমি সহজে হটিবার পাত্র নহি।

ভাল লাটিন জানিতাম না বলিয়া আমাকে প্রথমে নিম্নশ্রেণীতে যোগ দিতে হইয়াছিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই আমি উপরের শ্রেণীতে উন্নীত হইলাম। সম্ভবতঃ অনেক বিষয়ে বিশেষতঃ সাধারণ জ্ঞানে, আমার বয়সের তুলনায় আমি অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছিলাম। আমার জ্ঞানার্বেষণের পরিধি ছিল অধিকতর বিস্তীর্ণ এবং আমি অগ্নাত সহপাটিগণ অপেক্ষা অধিক পুস্তক ও সংবাদপত্রাদি পাঠ করিতাম। পিতার নিকট পত্রে আমি লিখিতাম, অধিকাংশ ইংরাজ বালকই এত অল্প যে, খেলাধুলা ছাড়া অন্য বিষয়ে আলাপ করিতে জানে না। ইহার বাতিক্রমও অবশ্য ছিল, উপরের শ্রেণীতে উঠিয়া তাহা বুঝিয়াছিলাম।

আমার বতদূর স্মরণ হয়, ১৯০৫ এর শেষ ভাগে ইংলণ্ডে সাধারণ নির্বাচন ব্যাপারে আমি কোঁতুহলী হইয়াছিলাম। সেবার উদারনৈতিক দলের জয় হয়। ১৯০৬ এর প্রারম্ভে একদিন শিক্ষক মহাশয় নূতন গবর্ণমেন্ট সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন। তিনি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, ছাত্রদের মধ্যে কেবলমাত্র আমিই ঐ বিষয়ের খুঁটিনাটি সংবাদ রাখি। আমি তাঁহাকে ক্যাম্বেল ব্যানারম্যান মন্ত্রীসভার প্রত্যেকের নাম বলিয়াছিলাম।

রাজনীতি ছাড়া আর একটি বিষয়ে আমি আকৃষ্ট হইলাম। সে হইল বিমান-বিজ্ঞান ক্রমোন্নতি। তখনকার দিনে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় এবং সান্তোস দ্যামেঁ (পরে ফারমান, ল্যাথাম ব্লেরিয়ো) খ্যাতিমান হইয়াছেন। উৎসাহের আতিশয্যে হারো হইতে পিতার নিকট একপত্রে লিখিয়াছিলাম যে শীঘ্রই আমি প্রতি সপ্তাহের শেষে বিমানযোগে ভারতে ঘুরিয়া আসিতে পারিব।

আমার সময়ে হ্যারোতে ৪৫ জন ভারতীয় ছাত্র ছিল। তাহারা অল্প ছাত্রবাসে থাকিত, তাহাদের সহিত কদাচিৎ দেখা হইত। আমাদের বাড়ীতে (প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের) বরোদার গাইকোয়াড়ের এক পুত্র ছিলেন। তিনি বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড় ছিলেন। ভাল ক্রিকেট খেলিতে পারিতেন বলিয়া তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন। আমি আসিবার অল্পকালের মধ্যেই তিনি চলিয়া যান। তারপর আসিল কাপুরথালার মহারাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র পরমজিৎ সিংহ (বর্তমানে যুবরাজ)। বেচারী যেন জলের মাছ ডাঙ্গায় পড়িয়াছে, সর্বদাই সে অসন্তুষ্ট, ছেলেদের সহিত মোটেই মেলামেশা করিতে পারিত না। ছেলেরাও তাহার পিছনে লাগিত এবং তাহার ভাবভঙ্গীর অনুকরণ করিয়া ভেঙ্কাইত। সে কেপিয়া গিয়া ধৈর্য হারাইত এবং বলিত তাহাদিগকে একবার

হারো ও কেমব্রিজ

কাপুরখালায় পাইলে দেখিয়া গইবে। বলাবাহুল্য ইহাতে সে অব্যাহতি পাইত না। ইতিপূর্বে কিছুকাল সে ক্রাস্লে ছিল এবং ফরাসী ভাষা অনর্গল বলিতে পারিত। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে ইংলণ্ডের সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে বিদেশী ভাষা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা এমন বিচিত্র যে, ফরাসীভাষার ক্লাসে এই বিদ্যা! তাহার কোনই কাজে আসিত না।

একদিন এক কৌতুককর ঘটনা ঘটিল। মধ্যরাত্রে তন্দ্রাবধায়ক আসিয়া আমাদের প্রত্যেকের কক্ষ তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাস করিলেন। গুনলাম, পরমজিৎ সিংহ তাহার সোনারাধান স্বন্দর বেতখানা হারাইয়াছে। কিন্তু তল্লাসীতে পাওয়া গেল না। দুই তিন দিন পর হারো ও ইটনের মধ্যে লর্ডস্-এর মাঠে মাচ-খেলা হয়; ইহার অব্যবহিত পরেই বেতখানা মালিকের কক্ষেই পাওয়া গেল। বোঝা গেল, কেহ লর্ডসের মাঠে একটু বাবুগি করিয়া ছড়িখানা ফিরাইয়া দিয়া গিয়াছে।

আমাদের আবাসে ও অগ্ন্যাত ছাত্রাবাসে কয়েকজন ইহুদী ছাত্র ছিল। বাহিরে তাহারা মোটামুটি ভাল ব্যবহার পাইলেও,—তলে তলে ইহুদী-বিশেষ ছিল যথেষ্ট। ইহার ‘অভিশপ্ত ইহুদী’, এই ভাব আমার মধ্যেও অজ্ঞাতসারে সংক্রমিত হইল,—এরূপ মনোভাব পোষণ করা দোষের কিছু নহে এইরূপ মনে করিলাম। কিন্তু কখনও আমি ইহুদীদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করি নাই বরং পরবর্তীকালে কয়েকজন ইহুদীকে আমি বন্ধুরূপে পাইয়াছিলাম।

এই নূতন জীবন আমার অভ্যস্ত হইয়া উঠিল। হারো আমার ভাল লাগিত, কিন্তু মনে হইতে লাগিল, এখানকার শিক্ষার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে,—বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলাম। ১৯০৬-০৭ সালে ভারতের সংবাদে আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইত। ইংলণ্ডের সংবাদপত্রে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত খবর বাহির হইত, কিন্তু তাহা হইতেই অনুমান করিতে পারিতাম, বান্ধলা, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রে বড় বড় ব্যাপার ঘটিতেছে। লাল লাজপৎ রায় ও অজিত সিংহের নির্বাসন, বান্ধলার তুমুল আলোড়ন, পুণায় তিলকের নাম,—স্বদেশী ও বয়কট; এই সকল সংবাদে আমার অন্তর বিচলিত হইত; কিন্তু হারোতে এমন কেহ ছিল না, যাহার নিকট মনের কথা খুলিয়া বলি। ছুটির দিনে আমার জ্ঞাতিস্রাতা বা ভারতীয় বন্ধুদের সহিত দেখা হইলে মনের ভার লঘু করিবার সুযোগ পাইতাম।

স্কুলে, জি, এস, টি ভিলিয়নের গ্যারিবন্ডী গ্রন্থাবলীর একখণ্ড উপহার পাইয়াছিলাম। পড়িয়া মুগ্ধ হইলাম, এবং অল্প ছুইখণ্ড গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া

প্যারিসবন্দীর সমগ্র কাহিনী মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলাম। আমার মানসপটে ভারতেও স্বাধীনতার যুদ্ধের অম্লরূপ বীরত্বপূর্ণ ঘটনার চিত্র ডাসিয়া উঠিত এবং আমার চিন্তায় ভারত ও ইতালী যেন আশ্চর্য্যভাবে মিশিয়া গিয়াছিল। এমন বৃহৎ ভারের পক্ষে হারোর পরিসর অত্যন্ত সঙ্গীর্ণ,—আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর বিস্তৃতির মধ্যে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইলাম। আমার অনুরোধে পিতা সন্মত হইলেন;—মাত্র দুইবৎসর অধ্যয়ন করিয়া (সাধারণতঃ ইহার চেয়ে বেশী দিন থাকিতে হয়) আমি হারো হইতে বিদায় লইলাম।

আমি স্বেচ্ছায় হারো ত্যাগ করিতেছি। অথচ বিদায়ের মুহূর্ত্তে আমার চিত্ত বিব্রত, চক্ষু অশ্রুসঞ্জল হইয়া উঠিল। স্থানটির প্রতি আমার মমতা জন্মিয়াছিল,—এবং এখান হইতে প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনের একটি অধ্যায় শেষ হইল। তথাপি হারো ছাড়িবার সময় আমি কতখানি দুঃখিত হইয়াছিলাম, তাহাই ভাবি। হারোর পরম্পরাগত রীতি ও স্বর বাহার সহিত আমার প্রাণগত যোগ স্থাপিত হইয়াছিল,—তাহার জন্য দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক।

এইবার কেমব্রিজ টিনিটি কলেজ। ১৯০৭এর অক্টোবরের প্রারম্ভ,—আমার বয়স সতর বৎসর, অথবা আঠার বৎসরের কাছাকাছি। এখন আমি “আণ্ডার গ্রাজুয়েট”,—ভাবিয়া উৎফুল্ল। স্থলের তুলনায় ইচ্ছামত কাজ করিবার স্বাধীনতা এখানে কত বেশী। কৈশোরের বন্ধনশৃঙ্খল খসিয়া গেল,—আমি এখন নিজেই বয়স্ক যুবক বলিয়া দাবী করিতে পারি। আত্মাভিমানগর্ভিত ভঙ্গীতে আমি কেমব্রিজের বৃহৎ চত্বরে, সঙ্গীর্ণ পথে ভ্রমণ করিতাম, পরিচিত কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে অত্যন্ত আনন্দিত হইতাম।

কেমব্রিজে তিন বৎসর ছিলাম। এই শান্তিপূর্ণ তিনটি বৎসরে বিশেষ কোন বিরক্তির কারণ ঘটে নাই,—মহুগতিতে দিনগুলি কাটিয়াছে। বহু বন্ধু সমাগম, কিছু পড়াশুনা ও খেলাধুলা এবং ক্রমশঃ জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিধির বিস্তার—তিনটি বৎসর কত আনন্দের! আমি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ‘ট্রাইপোস’ লইয়াছিলাম। আমার বিষয় ছিল, রসায়ন, ভূবিজ্ঞান এবং উদ্ভিদবিজ্ঞান;—কিন্তু আমার আগ্রহ ঐগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। কেমব্রিজে অথবা ছুটির সময় লণ্ডনে অথবা অন্য কোন স্থানে এমন অনেকের সহিত দেখা হইত, যাহারা বিবিধ গ্রন্থ, সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিতেন। এই সকল বাজারচলন ক্যাসিনদুরন্ত অভিজাতভঙ্গীর আলোচনায় প্রথম প্রথম আমি

হারো ও কেমব্রিজ

একটু বিব্রত হইতাম। কিন্তু কয়েকখানি বই পড়িয়া সমসাময়িক আলোচনার বিষয়গুলি সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করিলাম। আলোচনাকালে অজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া মোটামুটি কাজ চালাইয়া যাইতে পারিতাম। এইভাবে জাফার দার্শনিক নীটসে (কেমব্রিজে ইহাকে লইয়া আলোচনার বেজায় ধুম), বার্গাভ শ'এর পুস্তকের ভূমিকা এবং লোজ ডিকিনসনের নবপ্রকাশিত পুস্তক লইয়া আমরা আলোচনা করিতাম। আমরা নিজেদের বেশ কূটতর্কিক মনে করিতাম এবং শ্রেষ্ঠাভিমান লইয়া যৌন-বিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র বিষয়ে লম্বা লম্বা কথা বলিতাম। কখনও বা আইভান ব্লক, হাভলক এলিস, ক্রাক্ট, এবিং, অথবা অটো ব্রুনিংগার প্রভৃতি বড় বড় নামের বুক্‌নি ঝাড়িতাম। আমরা ভাবিতাম, বিশেষজ্ঞ ছাড়া ঐ বিষয়ে অগ্ন্যাগ্নের যতটুকু জানা উচিত, আমাদের জ্ঞান তাহাপেক্ষা কম নহে।

কিন্তু কার্যতঃ, লম্বা লম্বা কথা বলিলেও যৌনব্যাপারে আমরা অধিকাংশই ছিলাম ভীক। অন্ততঃ আমার অবস্থা ছিল তাহাই। অনেক বৎসর পর্যন্ত, কেমব্রিজ ছাড়িবার পরেও আমার যৌন অভিজ্ঞতা কেবল পুখিলক মতবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কেন যে এরূপ ছিল, তাহা বলা একটু কঠিন। আমরা প্রায় সকলেই স্বীজাতির প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করিতাম—এই ব্যাপারে আমাদের মনে কোন পাপবোধও ছিল না। আমার মনে তো ছিলই না, উপরন্তু, ধর্মের নিষেধও ছিল না। আমরা বলিতাম,—ইহা সুনীতিও নহে, দুর্নীতিও নহে—ইহা প্রেমাশক্তি মাত্র। তথাপি এক স্বাভাবিক লজ্জাবশতঃ আমি ইহা হইতে দূরে থাকিতাম, এবং সচরাচর ইহা তৃপ্তির জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করা হয়, তাহার উপর আমার বিতৃষ্ণা ছিল। আমার ছাত্রজীবনে আমি অত্যন্ত লজ্জাশীল ছিলাম, সম্ভবতঃ আমার নিঃসঙ্গ শৈশবজীবনই ইহার কারণ।

এইকালের জীবন সম্পর্কে আমি একপ্রকার অস্পষ্ট স্মৃতিবাদী ছিলাম। যৌবনের স্বাভাবিক আবেগ ও অস্বস্তির ওয়াইল্ড এবং ওয়ালটার প্যাটারের প্রভাব আমাকে এরূপ করিয়াছিল। আনন্দ সন্তোষ ও বিলাসী জীবনের আকাঙ্ক্ষাকে একটা গালভরা গ্রীক-দার্শনিক নাম দেওয়া সহজ ও তৃপ্তিপ্রদ। কিন্তু আমার জীবনে ইহা ছাড়াও স্বতন্ত্র একটা ভাব ছিল, যাহার জন্য আমি বিলাসীদিগের প্রতি বিশেষ কোন আকর্ষণ অনুভব করিতাম না। ধর্মাত্মবৃত্তির অভাব এবং ধর্মের অত্যাচারের প্রতি বিতৃষ্ণার ফলে আমি স্বাভাবিকভাবেই অল্প কোন আদর্শের অনুসন্ধান করিতাম। কিন্তু আমার পল্লবগ্রাহিতা ছিল, কোন বিষয়ই তলাইয়া দেখিতাম না। জীবনের

সৌন্দর্য্যভূত্বিই আমাকে আকর্ষণ করিত। কুল ও অমার্জিত কটির ভৌগলিক্যকে সংযত করিয়া জীবন-যাপন, এবং জীবনের বহুমুখী কর্ম-প্রেরণার মধ্যে পূর্ণ উপভোগের আকর্ষণ ছিল। আমি জীবন ভোগ করিয়াছি এবং তাহার মধ্যে যে কিছু শাপ আছে, এমন কথা ভাবিতে আমি অস্বীকার করিয়াছি। পিতার জায় আস্বাদ্যের মধ্যেও দ্যুতজীড়কের মনোবৃত্তি রহিয়াছে। প্রথমে অর্থ লইয়া ছিনিমিনি খেলিয়াছি। তারপর জীবনের বৃহত্তর ব্যাপারেও মহত্তর পণ রাখিয়াছি। ১৯০৭-৮ সালে ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে যে অভাবনীয় ঘটনার সমাবেশ হইতেছিল,—তাহার মধ্যে দুঃসাহসিকের ভূমিকায় অভিনয় করিবার যে প্রবল প্রেরণা অনুভব করিতাম তাহা নিশ্চয়ই স্থবী ও বিলাসী জীবনের প্রতি অহুসারের চিহ্ন নহে। এই সব বিমিশ্র ও স্ববিরোধী আকাজক্ষায় আমার মন উদ্ভ্রাম হইয়া থাকিত। চিন্তার এই শৃঙ্খলাহীন অস্পষ্টতা সত্ত্বেও আমি বিশেষ উৎকর্ষা অনুভব করিতাম না, কেননা স্থিরসঙ্কল্প লইয়া কার্য্য করার দিন এখনও বহু দূরে। এখন, কি দৈহিক কি মানসিক জীবন মধুময়, নিত্য নূতন জ্ঞানলাভ, অনুভূতি ও আবিষ্কারের আনন্দ।—কত কিছু করিতে হইবে, কত জানিবার দেখিবার বুঝিবার রহিয়াছে। শীতকালের দীর্ঘ সন্ধ্যায় অগ্নিকুণ্ড ঘিরিয়া আমাদের মস্তুর আলোচনা ক্রমে গভীর হইয়া আসিত;—অধিক রাত্রিতে আগুণ নিভিয়া গেলে আমাদের চৈতন্য হইত, শীতকম্পিত দেহে অনিচ্ছার সহিত শয্যায় গমন করিতাম। সময় সময় আলোচনা-প্রসঙ্গে মুখর তর্কের উত্তেজনায় আমাদের কর্ণস্বর উচ্চগ্রামে উঠিত। কিন্তু এ সকলই কথার কথা ছিল। মানবজীবনের সমস্তাগুলি লইয়া আলোচনার ভাণে আমরা খেলা করিতাম মাত্র, কেননা তখনও আমাদের জীবনে ঐ সমস্তাগুলি বাস্তবরূপ গ্রহণ করে নাই, জগতের কর্মপ্রবাহের জটিল জালে তখনও আমরা জড়াইয়া পড়ি নাই। শীঘ্রই এই জগতের উপর মৃত্যুর কক্ষচ্ছায়া ঘনাইয়া উঠিবে,—মৃত্যু, হত্যা ও ধ্বংসের বিভীষিকার সম্মুখে জগতের যুবকগণ ব্যথিত ও পীড়িত হইবে, ইহা তখনও ভবিষ্যতের যবনিকায় আবৃত। আমরা দেখিতে পাইতাম—নিশ্চিত উন্নতির ধারায় সুবিন্যস্ত ব্যবস্থা,—যাহাতে স্বচ্ছল অবস্থার যে কোন ব্যক্তিই স্থবী হইতে পারে।

এইকালে সুখবাদ বা অনুরূপ যে সকল ধারণায় আমি প্রভাবান্বিত হইয়াছিলাম, তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম বলিয়া যদি কেহ মনে করেন যে ঐ সকল বিষয়ে আমার কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল, তাহা হইলে ভুল করা হইবে। বস্তুতঃ এ সব বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কথা

কারো ও কেমব্রিজ

আমি চিন্তাও করিতাম না। ঐগুলি অনির্দিষ্ট কৌতূহলের মত আমার মনের মধ্যে লঘুভাবে ভাসিয়া উঠিত,—কালক্রমে তাহা অল্পাধিক দাগ রাখিয়া গিয়াছে মাত্র। এই সকল বিষয় অনুধান করিয়া কখনও আমি মনকে ভারাক্রান্ত করি নাই। কর্তব্যকার্য, খেলাপ্লা, আমোদ-প্রমোদে জীবন বেশ স্বচ্ছন্দ ছিল,—কেবল ভারতের রাজনৈতিক সংঘর্ষের সংবাদে মাঝে মাঝে চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতাম। কেমব্রিজে যে সকল রাজনৈতিক গ্রন্থ পাঠে আমি প্রভাবান্বিত হইয়াছিলাম, তাহার মধ্যে মেরিডিথ টাউনসেন্ডের “এশিয়া এবং ইয়োরোপ” উল্লেখযোগ্য।

১২০৭ সাল হইতে কয়েক বৎসর ভারতবর্ষে অশান্তির আলোড়ন চলিতেছিল। ১৮৫৭র বিদ্রোহের পর এই প্রথম বৈদেশিক শাসনের নিকট অপ্রতিবাদে নত হইতে ভারত অস্বীকার করিল। তিলকের কার্যাপদ্ধতি ও কারাদণ্ড, অরবিন্দ ঘোষ এবং বাঙ্গলার স্বদেশী ও বয়কটের সঙ্কল্প প্রভৃতি সংবাদে ইংলণ্ডপ্রবাসী ভারতীয় আমরা অত্যন্ত উত্তেজনা বোধ করিতাম। আমরা প্রায় সকলেই তখন তিলকগান্ধী অথবা চরমপন্থী (তৎকালীন প্রচলিত নাম) হইয়া পড়িয়াছিলাম।

কেমব্রিজে ভারতীয়দের “মজলিস” নামে একটি সমিতি ছিল। এখানে আমরা প্রায়শঃ রাজনীতিচর্চা করিতাম, কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষের সহিত সম্পর্কহীন তর্ক মাত্র। পার্লামেন্ট অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিয়নের আলোচনাভঙ্গী, বহুতাকালে অঙ্গসঞ্চালন প্রভৃতির অনুকরণের দিকেই আমরা বেশী ঝোক দিতাম, বিষয়বস্তু হইত গোণ। আমি প্রায়ই মজলিসে থাকিতাম, কিন্তু তিন বৎসরের মধ্যে আমি এখানে কদাচিৎ বক্তৃতা করিয়াছি। আমি লজ্জা ও সঙ্কোচ কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারিতাম না। কলেজের তর্কসভায়ও এই কারণে আমি বিব্রত হইতাম। এখানে নিয়ম ছিল, নির্দিষ্ট সময়ে বৎসরে একেবারেই বক্তৃতা না করিলে জরিমানা দিতে হয়। আমি প্রায়ই জরিমানা দিয়াছি।

আমার মনে আছে এডুইন মন্টেগু প্রায়ই আমাদের তর্কসভায় আসিতেন। তিনি উত্তরকালে ভারতসচিব হইয়াছিলেন। তিনি ট্রিনিটি কলেজের প্রাক্তন ছাত্র এবং কেমব্রিজ কেন্দ্র হইতে পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। তাঁহার নিকটই আমি প্রথম বিখ্যাসের আধুনিক সংজ্ঞা শ্রবণ করি। তোমার যুক্তি যাহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করে না, তাহা বিশ্বাস করা কঠিন; অতএব যাহা যুক্তি অনুমোদিত, সেখানে অন্ধবিশ্বাসের কথা উঠিতেই পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানশাস্ত্র পাঠ করিয়া, তৎকালীন কতকগুলি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকে আমি সত্য বলিয়া মনে করিতাম।

জওহরলাল নেহরু

উনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বৈজ্ঞানিকদের বিজ্ঞান ও জগত সম্পর্কে কতগুলি স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, যাহা আজকাল নাই।

মজলিসে অথবা ঘরোয়া আলাপে ভারতীয় ছাত্রেরা ভারতীয় রাজনীতি আলোচনায় তীব্র ভাষা ব্যবহার করিত। এমন কি তৎকালীন বঙ্কদেশে আরক্ হিংসামূলক কার্যেরও কেহ কেহ প্রশংসা করিতেন। পরবর্ত্তীকালে আমি দেখিয়াছি, ইহারাই ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগ দিয়াছেন, হাইকোর্টের জজ অথবা শাস্তিশিষ্ট ব্যারিষ্টার ইত্যাদি হইয়াছেন। এই সকল বৈঠকী চরমপন্থীদের মধ্যে দুই একজন ব্যতীত পরবর্ত্তীকালে কেহই ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই।

কেমব্রিজে কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয় রাজনীতিকের দর্শন পাইয়াছিলাম। আমরা তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেও আমাদের মনে একটা হামবড়া ভাব ছিল। আমাদের শিক্ষা সংস্কৃতির পরিধি বিস্তীর্ণ এবং আমরা অধিকতর উদারতার সহিত কোন বিষয় দেখিতে পারি, এমন অহমিকা আমাদের মনে ছিল। বিপিনচন্দ্র পাল, লাল লাজপত্ রায় এবং গোপালকৃষ্ণ গোখলে কেমব্রিজে আসিয়াছিলেন। আমরা একটি বসিবার ঘরে বিপিন পালকে অভ্যর্থনা করিলাম। সেখানে আমরা ১০।১২ জন উপস্থিত ছিলাম, কিন্তু তিনি এমন গর্জন করিয়া বক্তৃতা দিতে লাগিলেন যেন তিনি দশ সহস্র শ্রোতার সম্মুখে জনসভায় বক্তৃতা করিতেছেন। সেই প্রচণ্ড কণ্ঠস্বরের কোলাহলে আমি বুঝিতেই পারিলাম না তিনি কি বলিতেছেন। লাজপত্ রায় বেশ শাস্ত গম্ভীরভাবে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাঁহার কথা আমার বেশ ভাল লাগিয়াছিল। আমি পিতার নিকট এক পত্রে লিখিয়াছিলাম যে, বিপিনবাবু অপেক্ষা লাজপত্ রায়কেই আমার বেশী ভাল লাগিল; ইহা শুনিয়া তিনি খুসী হইয়াছিলেন। কেননা তৎকালে তিনি বাঙ্গলার চরমপন্থীদের পছন্দ করিতেন না। গোখলে কেমব্রিজে এক জনসভায় বক্তৃতা করেন। এ বিষয়ে আমার এই মাত্র মনে আছে যে, বক্তৃতার শেষে এ, এম খাজা তাঁহাকে কতকগুলি প্রশ্ন করেন। প্রশ্নোত্তর এমনভাবে চলিতে লাগিল যে আমরা ভুলিয়া গেলাম, কি লইয়া ইহার আরম্ভ এবং বিষয় কি ছিল।

ভারতীয় সমাজে হরদয়ালের খুব খ্যাতি ছিল। আমি কেমব্রিজে যোগ দিবার কিছুকাল পূর্বে তিনি অক্সফোর্ডে ছিলেন। আমি যখন হারোর ছাত্র ছিলাম, তখন লণ্ডনে ইহাকে দুই তিনবার দেখিয়াছি।

কেমব্রিজে আমার সমসাময়িকদের মধ্যে অনেকেই পরে ভারতীয় কংগ্রেস-রাজনীতিতে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি যাইবার

হারো ও কেমব্রিজ

কিছুকাল পরেই জে, এম সেনগুপ্ত কেমব্রিজ ত্যাগ করেন। স্নেহ উদ্দিন কিচলু, সৈয়দ মহাম্মদ এবং তাসাদ্দুক আহম্মদ শেরওয়ানী আমার সমসাময়িক ছিলেন। বর্তমানে এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এস, এম সুলেমানও তখন কেমব্রিজে অধ্যয়ন করিতেন। অগ্নাগ্ন সমসাময়িকগণ বর্তমানে মন্ত্রীপদ ও সিভিল সার্ভিস আলো করিয়া আছেন।

লওনে থাকিতে আমরা শ্রামজী কৃষ্ণবর্মা এবং তাঁহার 'ভারতভবনের' কথা শুনিতাম, কিন্তু কখনও তাঁহার সহিত আমার দেখা হয় নাই, আমি ভারত-ভবনেও যাই নাই, তাঁহার 'ইণ্ডিয়ান সোসিয়লজিষ্ট' মধ্যে মধ্যে দেখিতাম। দীর্ঘকাল পরে ১৯২৬ সালে জেনেভায় শ্রামজীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তখনও তাঁহার পকেট 'ইণ্ডিয়ান সোসিয়লজিষ্টের' পুরাতন সংখ্যায় বোঝাই ছিল এবং যে ভারতীয় তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইত তাহাদের প্রায় প্রত্যেককেই তিনি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের গুপ্তচর বলিয়া সন্দেহ করিতেন।

লওনে তখন ইণ্ডিয়া অফিস একটি ভারতীয় ছাত্রবিভাগ খুলিয়া-ছিল। প্রত্যেক ভারতীয় ছাত্রই মনে করিত এবং মনে করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণও ছিল যে, ইহা গুপ্তচর দিয়া ছাত্রদের গতিবিধির উপর নজর রাখিবার কৌশলমাত্র। কিন্তু অধিকাংশ ভারতীয় ছাত্রকে ইহা ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক সহ্য করিতে হইত। কেননা ইহার সুপারিশ ব্যতীত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করা প্রায় অসম্ভব ছিল।

ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থায়, পিতা রাজনৈতিক আন্দোলনে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আমার মতভেদ থাকিলেও আমি ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। তিনি স্বাভাবিকভাবেই মডারেট দলে যোগদান করেন। ইহাদের অনেককে তিনি ব্যক্তিগতভাবে জানিতেন এবং অনেকেই তাঁহার সমব্যবসায়ী ছিলেন। যুক্তপ্রদেশের এক প্রাদেশিক সন্মেলনের সভাপতির আসন হইতে তিনি বাদলা ও মহারাষ্ট্রের চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৯০৭ সালে সুরাটে যখন কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া গিয়া নিছক মডারেট সমিতিতে পর্যাবসিত হয় তখন তিনিও উহাতে উপস্থিত ছিলেন।

সুরাট কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই এইচ, ডাবলিউ নেভিনসন কিছুদিনের জন্য এলাহাবাদে তাঁহার ভবনে অতিথি হন। তাঁহার ভারতবর্ষ সম্পর্কিত পুস্তকে তিনি পিতার বিষয় লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন, "বদান্ততা ব্যতীত অন্য সকল বিষয়েই তিনি মডারেট।" কিন্তু ইহা অত্যন্ত ভ্রান্ত

ধারণা। এক রাজনীতি ব্যতীত অন্য কোন বিষয়েই পিতা তখন মডারেট ছিলেন না। এবং ধীরে ধীরে এই মডারেট মনোবৃত্তিও কালে অন্তর্হিত হইয়াছিল। তাঁহার চরিত্রে গভীর ভাবপ্রবণতা, তীব্র আবেগ, অসীম আত্মমর্ধ্যাদাবোধ এবং দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ছিল এবং ইহা নিশ্চয়ই মডারেট হাঁচবে বিপরীত। তথাপি ১৯০৭-০৮ সালে এবং তাহার পরও কয়েক বৎসর তিনি মডারেটদের মধ্যেও মডারেট ছিলেন। চরমপন্থীদের প্রতি তাঁহার চিন্তা তিক্ত ছিল, যদিও আমার বিশ্বাস তিলককে তিনি শ্রদ্ধা করিতেন।

ইহার কারণ কি? আইন ও নিয়মতান্ত্রিকতা ছিল তাঁহার শিক্ষার ভিত্তি। তিনি আইনজ্ঞ ও নিয়মতান্ত্রিকের দৃষ্টি দ্বারাই রাজনীতি বিচার করিতেন। কঠিন ও তীব্র বাক্যের পশ্চাতে যদি বাক্যানুযায়ী কার্য না থাকে, তবে তাহা নিষ্ফল, ইহাই তাঁহার স্পষ্ট ধারণা ছিল। কোন কার্য্যকরী কর্ম্মপ্রচেষ্টা তিনি দেখিতে পান নাই। বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন দ্বারা আমরা অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিব, এমন ভরসা তাঁহার ছিল না। এই আন্দোলনের ভিত্তিতে যে ধর্ম্মমূলক জাতীয়তাবাদ ছিল, তাহা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। ভারতে পুনরায় প্রাচীন যুগ কিরায়ীয়া আনিবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ তাঁহার ছিল না। প্রাচীনযুগের প্রতি তাঁহার সহানুভূতিও ছিল না, ধারণাও ছিল অল্প, বরঞ্চ উন্নতির পরিপন্থী বলিয়া জ্ঞাতভেদ ও অত্যাগ্র কতকগুলি প্রাচীন প্রথার উপর তাঁহার বিতৃষ্ণা ছিল। পাশ্চাত্যের উন্নতির প্রতি তিনি গভীর আকর্ষণ অনুভব করিতেন এবং ভাবিতেন, ইংলণ্ডের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের দ্বারা আমরাও সমুন্নত হইব।

সামাজিক দিক হইতে দেখিলে ১৯০৭এর ভারতীয় জাতীয়তাবাদ নিশ্চিত-রূপেই প্রগতিবিরোধী। ভারতে এবং প্রাচ্যের অন্যান্য দেশে নবজাতীয়তাবাদ ধর্ম্মের ভিত্তির উপরই স্থাপিত হইয়াছিল। সামাজিক ব্যাপারে মডারেটগণ অনেক বেশী অগ্রসর ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় এবং জনসাধারণের সহিত তাঁহাদের কোন যোগ ছিল না। মডারেটগণ কিয়ৎ পরিমাণে উচ্চমধ্যশ্রেণীর প্রতিনিধি। উচ্চমধ্যশ্রেণীর আত্মপ্রতিষ্ঠা ছাড়া অন্য কোন অর্থনৈতিক আদর্শ তাঁহারা চিন্তা করিতেন না। মডারেটগণ জ্ঞাতভেদ প্রথার কাঠিন্য ভাবিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্কার এবং উন্নতিবিরোধী প্রাচীন সামাজিক প্রথা বর্জনের পক্ষপাতী ছিলেন।

মডারেটদের সহিত যোগ দিয়া পিতা এক আক্রমণমূলক কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করিলেন। বাঙ্গলা ও পুণার দুইচার জন নেতাকে বাদ দিলে, অধিকাংশ চরমপন্থীই তখন যুবক। এই যুবকগণ তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা

হারো ও কেমব্রিজ

করিয়া খেচ্ছামত চলিতে সাহস করে ইহাতে তিনি অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করিতেন। প্রতিবাদে তিনি ধৈর্য হীন ও অসহিষ্ণু হইতেন। বাহাদুরগকে তিনি মূর্থ বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের প্রতি ক্ষমাহীন হইয়া তিনি হুবিধা শাইলেই তীব্র আক্রমণ করিতেন। আমার মনে পড়ে, সম্ভবতঃ আমার কেমব্রিজ ত্যাগ করিবার পর, পিতার লেখা একটি প্রবন্ধ পড়িয়া আমি অত্যন্ত বিরক্তিবোধ করিয়াছিলাম। পিতার নিকট একখানি উদ্ধৃত ভাষায় লিখিত পত্রে আমি মন্তব্য করিয়াছিলাম, তাঁহার রাজনৈতিক কার্যে ব্রিটিশ-গভর্নমেন্ট অত্যন্ত আনন্দবোধ করিতেছেন। এই শ্রেণীর রূঢ় মন্তব্য তিনি কখনও প্রদাস্ত করিতে পারিতেন না,—অতএব বলাবাহুল্য তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। এমন কি আমাকে অবিলম্বে ইংলণ্ড হইতে দেশে ফিরাইয়া আনিবার সঙ্কল্প প্রায় ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিলেন।)

আমি কেমব্রিজে থাকিতেই প্রথমে উঠিল, ভবিষ্যতে আমি কি করিব। কিছুদিন ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের কথা আলোচনা চলিল,—তখনকার দিনে উহার একটা আকর্ষণ ছিল। কিন্তু কি পিতার কি আমার এ বিষয়ে ঐশ্বর্য্য ছিল না বলিয়া কথাটা চাপা পড়িল। ইহার আরও কারণ এই যে আমার বয়স কম ছিল, যদি আমাকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে হয় তাহা হইলে কেমব্রিজের উপাধি পরীক্ষার পরও তিন চার বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে। কেমব্রিজের উপাধি পাইবার সময় আমার বয়স ছিল বিশ বৎসর; তখন সিভিল সার্ভিসের নির্দিষ্ট বয়স ছিল ২২ হইতে ২৪। পরীক্ষায় কৃতকার্য হইলে আরও এক বৎসর ইংলণ্ডে থাকিতে হইবে। ইংলণ্ডে দীর্ঘ প্রবাসের ক্ষেত্রে আমাদের পরিবারস্থ সকলেই আমার দেশে যাওয়ার জগ্গ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমি যদি সিভিল সার্ভিসে যোগ দেই তাহা হইলে পরিবার ও গৃহ হইতে দূরে নানাস্থানে চাকুরী করিতে হইবে,—পিতা একথাও চিন্তা করিয়াছিলেন। দীর্ঘ অল্পপস্থিতির পর, আমার পিতা মাতা উভয়েই আমাকে নিকটে রাখিবার জগ্গ ব্যাকুল ছিলেন। এই সকল কারণে সিভিল সার্ভিস অপেক্ষা পৈত্রিক ব্যবসায় অবলম্বন করাই স্থির হইল,—আমি 'ইনার টেম্পলে' যোগ দিলাম। আমার ক্রমবদ্ধিত চরমপন্থী রাজনৈতিক মত সত্ত্বেও আমি সিভিল সার্ভিসে যোগ দিয়া ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের ভারতীয় শাসনযন্ত্রের চাকার দাঁতে পরিণত হইতে তখন তীব্র আপত্তি বোধ করি নাই, ইহাই আশ্চর্য্য। পরবর্ত্তীকালে এই প্রস্তাব আমার নিকট কি বিসদৃশ না মনে হইত!

১৯১০-এ আমি উপাধি লইয়া কেমব্রিজ ত্যাগ করিলাম। বিদ্যা-
'টাইপোস' পরীক্ষায় আমি সাধারণভাবে পাশ করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণী
"অনাস" পাইয়াছিলাম। ইহার পর দুই বৎসর আমি লণ্ডনে কেমব্রিজ
বেড়াইয়াছি। আইন পরীক্ষাগুলি একের পর আর সাধারণভাবেই উত্তীর্ণ
হইয়াছিলাম। অবসর ছিল প্রচুর—সময়ের স্রোতে গা ভাসানোর
খাতির। সাধারণভাবে কিছু পড়াশুনা, 'কেবিয়ান' ও সমাজতান্ত্রিক
মতবাদ লইয়া নাড়াচাড়া, সমসাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলন লইয়া
আলোচনায় সময় কাটিত। আয়র্লণ্ডের নারীদের ভোটাধিকারলাভের
আন্দোলনও বিশেষভাবে আমি লক্ষ্য করিতাম। ১৯১০-এর গ্রীষ্মকালে
আয়ারল্যান্ড ভ্রমণকালে আমি সিন-কিন আন্দোলনের সূচনা লক্ষ্য করিয়াছিলাম।

লণ্ডনে হারোর কয়েকজন পুরাতন বন্ধুর সাহচর্যে ব্যবহুল বিলাসে
মাতিলাম। আমি পিতার নিকট হইতে প্রচুর মাসোছারা পাইতাম
সময় সময় তাহাতেও কুলাইত না। বাবা টের পাইয়া আমার চরিত্র
খারাপ হইতেছে ভাবিয়া চিন্তিত হইলেন। কিন্তু কার্যতঃ বন্ধুরা
কিছুই করিতে পারে নাই। যাহাদিগকে চলতি ভাষায় বলে "সহরে বাবু"
সেই সকল ধনী অথচ মন্তকহীন ইংরাজদের চালচলন নকল করিবার চেষ্টা
করিতাম মাত্র। লক্ষ্যহীন আয়েসী জীবন আমাকে আকর্ষণ করিতে
পারিল না, ইহা বলাই বাহুল্য। ক্রমে ইহাতে আমার উৎসাহ কমিয়া
আসিল বটে, কিন্তু মনে হইতে লাগিল আমি যেন অহকারী হইয়া উঠিতেছি।

ছুটিতে আমি মাঝে মাঝে ইয়োরোপে বেড়াইয়াছি। ১৯০৯-এর গ্রীষ্মকালে
পিতার সহিত আমি যখন বালিনে, তখন কাউন্ট জেন্সলিন ব্রাস্টাফ
হ্রদ তীরবর্তী ফ্রিডরিকসাকেন হইতে তাঁহার নবনির্মিত বিমানশালা
বালিনে আসিয়াছিলেন। আমার বিশ্বাস ইহাই তাঁহার প্রথম যাত্রায়
দীর্ঘপথ অতিক্রম। এই উপলক্ষ্যে বিশাল জনতা হইয়াছিল এবং স্বয়ং
কাইজার তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। দশ বিশ লাখ লোক
বালিনের টেম্পল হক ময়দানে জমায়েৎ হইয়াছিল। জেন্সলিনখানার
সময়ে আসিয়া আমাদের মাথার উপরে চক্রাকারে ঘুরিয়া সাবলীল গতি
অবতরণ করিয়াছিল। ঐ দিন হোটেল আদলনের কর্তার প্রত্যেক
বাসিন্দাকে কাউন্ট জেন্সলিনের একখানা স্বন্দর চিত্র উপহার দিয়াছিলেন
ঐ চিত্রখানি এখনও আমার নিকট আছে।

ইহার দুইমাস পরে পারী নগরীতে আমি প্রথম 'একল' টাইম
বেষ্টন করিয়া এরোগ্যান্য উদ্ভিতে দেখি। আমার মনে হইল যেন
চালক ছিলেন কংগ্রেস লীগের। আঠারো বৎসর পরে, ১৯২৮-এ

হারো ও কেম্‌ব্রিজ

সম্মতিতে, তখন আটলান্টিকের অপর তীর হইতে লিওবার্গ উড়িয়া আসিয়া
অগ্নিগোরব লাভ করিয়াছিলেন।

১৯১০ সালে কেম্‌ব্রিজ হইতে পাশ করিবার অব্যবহিত পরে
নিঃশেষে সঙ্গীদের সহিত আনন্দভ্রমণ কালে একবার আশ্চর্যরূপে বাঁচিয়া
গিয়াছিলাম। পদব্রজে পার্বত্য অঞ্চল অতিক্রম করিয়া আমাদের গন্তব্যস্থলে
একটি ছোট হোটেলে ক্লান্তদেহে উপস্থিত হইলাম। আমরা স্নান করিতে
চাহি ওনিয়া সকলেই আশ্চর্য,—এমন কথা এখানে কেহ শুনে নাই
এক হোটেলেও তেমন বন্দোবস্ত ছিল না। হোটেলের লোকেরা বলিল,—
নিকটবর্তী একটা পার্বত্য নির্ঝরিণীতে আমরা স্নান করিতে পারি।
হোটেলের সৌজন্তে টেবিল ঢাকিবার কাপড় ও তোয়ালে লইয়া আমি ও
একজন ইংরাজ যুবক স্নান করিতে চলিলাম। অদূরবর্তী তুষারস্তূপ হইতে
গলিত জলধারায় পুষ্ট নির্ঝরিণী তীব্রবেগে কলকল ধ্বনি করিয়া প্রবাহিত।
আমি জলে নামিলাম। জল গভীর না হইলেও তুষার-নীতল এবং
জলদেশ অতিমাত্রায় পিচ্ছল। পদস্থলিত হইয়া আমি পড়িয়া গেলাম,
প্রাণায় যেন সমস্ত শরীর জমিয়া গিয়া হাত পা নাড়িবার শক্তি নাই।
পায়ের উপর দাঁড়াইতে না পারিয়া শ্রোতে ভাসিয়া চলিলাম। আমার
ইংরাজ সঙ্গী কোনমতে জল হইতে উঠিয়া তীর ধরিয়া দৌড়াইতে লাগিল
এবং অনেক কষ্টে আমার পা ধরিয়া জল হইতে টানিয়া তুলিল। পরে
আমরা বিপদের গুরুত্ব বুঝিতে পারিলাম। আমাদের সম্মুখে দুই তিনশত
পুঞ্জ পরেই এই গিরি-নির্ঝরিণী পর্ত্তগাত্র হইতে সোজা নীচে নামিয়া
গিয়াছে। এই জলপ্রপাতটি এ অঞ্চলে একটা দেখিবার বস্তু।

১৯১২র গ্রীষ্মকালে আমি ব্যারিষ্টারী পাশ করিলাম এবং আমার
স্নাতকসর ইংলণ্ড-প্রবাস সমাপ্ত করিয়া শরৎকালে স্বদেশে ফিরিয়া
আসিলাম। এই কাল আরও দুইবার আমি ছুটিতে দেশে আসিয়াছিলাম।
কিন্তু এইবার স্থায়ীভাবে প্রত্যাবর্তন! বোম্বাই বন্দরে নামিয়া আমার
মুনে হইল,—আমি একটি সাধারণ বালকমাত্র, আমার মধ্যে প্রশংসার
কিছুই নাই।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন এবং ভারতে মহাযাত্রা সমসাময়িক রাজনীতি

১৯১২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন মনোহর। তিলক কারাগারে—উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে চরমপন্থীরা (জাতীয়তাবাদী) ছত্রভঙ্গ। বঙ্গভঙ্গ রহিত হওয়ায় বাঙ্গলাদেশ অপেক্ষাকৃত স্বাধীন মলি-মিষ্টো শাসন-সংস্কার লইয়া মডারেটগণ বেশ জাঁকিয়া বসিয়াছেন। প্রবাসী ভারতীয়দের জন্ত বিশেষভাবে দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দের জন্ত কিছু আন্দোলন ছিল। কংগ্রেস মডারেটদের বার্ষিক মজলিসে পরিণত। সেখানে কতকগুলি দুর্বল প্রস্তাব গৃহীত হইত—উহা লইয়া কোন উল্লাস দেখা যাইত না।

১৯১২র বড়দিনে আমি প্রতিনিধি হইয়া বাকীপুর কংগ্রেসে যোগ দিয়াছিলাম। ইহা ইংরাজী শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর সম্মেলন, কেতাদুরস্ত ফিটফাট পোষাকের ছড়াছড়ি। ইহা রাজনৈতিক উৎসাহ উদ্দীপনানীহন সামাজিক সম্মেলন মাত্র। দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে সন্ত প্রত্যাগত গোখলে ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন এবং এই অধিবেশনে তিনিই সকলের শীর্ষস্থানীয়। যে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি রাজনীতি ও জনসাধারণের প্রতি একান্তভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তেজস্বী ও মনস্বী গোখলে তাঁহাদের পক্ষে। তাঁহার মানসিক বল ও শক্তিমত্তা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম।

গোখলের বাকীপুর ত্যাগ করার প্রাক্কালে একটি বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছিল। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য হিসাবে তিনি প্রথম শ্রেণীর কামরা পাইয়াছিলেন। তাঁহার শরীরও ভাল ছিল। অবাস্তবীয় লোকসঙ্গেও তিনি অত্যন্ত বিব্রত বোধ করিতেন। কংগ্রেসের কয়েকদিনের পরিশ্রমের পর তিনি একা শান্তিতে রেলের ভ্রমণ করিয়া সঙ্কর করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার নির্দিষ্ট কামরায় উঠিলেন কিন্তু অবশিষ্ট গাড়ীতে কলিকাতার প্রতিনিধিদের বেজায় ভীড়। কিছুক্ষণ পর ভূপেন্দ্রনাথ বসু (পরে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য) আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, তিনি ঐ কামরায় আরোহণ করিতে পারেন কি না।

স্বাধীনতা রাজনীতি

অবশ্যক,—তিনি জানিতেন বহু মহাশয়ের মুখ খুলিলে রক্ষা নাই, কিন্তু তথাপি রাজী হইতে হইল। কয়েক মিনিট পরেই বহু মহাশয় আবার আনিয়া গোথ্লে কেরিলেন। যদি তাঁহার একজন বন্ধুও এই কামরায় আসেন তহুঁ হইলে কি তাঁহার কোন আপত্তি আছে। বিনয়ী গোথ্লে আপত্তি করিতে পারিলেন না। গাড়ীতে উঠিয়া বহু মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, তিনি ও তাঁহার বন্ধু উপরের ‘বার্থে’ গুইতে অত্যন্ত অসুবিধা বোধ করেন; কাজেই গোথ্লে যদি কিছু না মনে করেন, তাহা হইলে তিনি উপরে উঠিলে তাঁহার নীচের দুইটি ‘বার্থ’ অধিকার করিতে পারেন। বেচারী গোথ্লে অগত্যা উপরে উঠিলেন এবং অশান্তিতে রাত্রি কাটাইলেন।

আইন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া আমি হাইকোর্টে যোগ দিলাম। কাজেও কতকটা মন বসিল। ইউরোপ হইতে ফিরিয়া কয়েক মাস বেশ আনন্দে কাটিল; বাড়ীতে ফিরিয়া পুরাতন পরিচয় নতুন করিয়া ঝালাইয়া লইয়া আমি স্তব্ধ হইলাম। কিন্তু সাধারণ আইনজীবীদের গায় আমার এই জীবনযাত্রার নতুনত্বের মোহ ক্রমশঃ দূর হইল, মনে হইতে লাগিল, এক লক্ষ্যহীন বিরস গতানুগতিকতার মধ্যে কেবলমাত্র ঝাঁচিয়া থাকার কোন সার্থকতা নাই। আমার ধারণা, পারিপার্শ্বিকের প্রতি এই অসন্তোষ আমার দৌ-আসলা অর্থাৎ মিশ্র শিক্ষার ফল। সাত বৎসর ইংলণ্ডে বাস করার ফলে আমার যে সকল অভ্যাস ও সংস্কার গড়িয়া উঠিয়াছিল, বর্তমানের সহিত তাহা সামঞ্জস্যহীন। আমাদের বাড়ীর ব্যবস্থা ও আবহাওয়া মোটামুটি ভালই ছিল। বাহিরে বার-লাইব্রেরী এবং ক্লাবে একই শ্রেণীর লোকের সহিত দেখা হইত, একই পুরাতন কথা—অধিকাংশই আইন ব্যবসায় সংক্রান্ত,—বার বার আলোচনা হইত। এই আবহাওয়ায়, মানসিক উৎকর্ষ সাধনের কিছুই নাই—আমার নিকট জীবন বিশ্বাস হইয়া উঠিল। এমন কি অবসর বিনোদনের বিশেষ কোন আমোদ প্রমোদও ছিল না।

ই, এম ফ্রস্টার সম্প্রতি প্রকাশিত জি, লোজ ডিকিনসনের জীবন চরিতে লিখিয়াছেন, ভারত সম্বন্ধে তিনি (ডিকিনসন) একদা বলিয়াছিলেন, “কেন উভয় জাতির মধ্যে মিলন হয় না? কারণ অতি ন্যূন, ভারতবাসীর সঙ্গ ইংরাজদের নিকট পীড়াদায়ক। এই অকাটা সত্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই।” সম্ভবতঃ অধিকাংশ ইংরাজই ঐরূপ বোধ করেন এবং ইহা কিছু আশ্চর্য্য নহে। ফ্রস্টার অগ্রজ লিখিয়াছেন, প্রত্যেক ইংরাজই নিজেকে জবরদখলী সৈন্যদলের (army of occupation) একজন সৈনিক বলিয়া মনে করে এবং সম্ভবতাবেই তদনুরূপ আচরণ ও

ব্যবহার করিয়া থাকে। এই অবস্থায় দুইটি জাতির মধ্যে স্বাভাবিক ও বাধ্যতামূলক সম্পর্ক কিছুতেই স্থাপিত হইতে পারে না। ইংরাজ ও ভারতবাসী পরস্পরের প্রতি শিষ্টাচারের ভাণ অভিনয় করিয়া থাকেন, কাজেই পরস্পর স্বাভাবিক ভাবে মিলিত হইবার অক্ষমতার অস্বস্তি অমুভব করিয়া থাকেন। একের অপরকে ভাল লাগে না—এড়াইতে পারিলে উভয়েই আরাম বোধ করেন।

সাধারণতঃ ইংরাজেরা সরকারী পরিমণ্ডলের সহিত সংশ্লিষ্ট একদল ভারতীয়ের সহিত মিশিয়া থাকেন, কদাচিৎ এমন ভারতবাসীর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়, যাহার সঙ্গ সতাই লোভনীয়। কিন্তু সেরূপ লোক পাওয়া গেলেও মন খুলিয়া মিশিবার সুবিধা হয় না। ব্রিটিশ শাসনের আমলে ব্রিটিশ ও ভারতীয় শাসকমণ্ডলীর নানাকারণে প্রাধান্য ঘটিয়াছে; এমন কি, তাঁহাদের সামাজিক মর্যাদাও কম নহে, কিন্তু এই শাসকশ্রেণী অত্যন্ত বৈচিত্র্যহীন, স্থূল-কচি এবং সঙ্কীর্ণচেতা। এমন কি, শিক্ষিত বুদ্ধিমান ইংরাজ যুবকও ভারতে অসিয়া অল্পদিনেই বুদ্ধি ও সংস্কৃতির দিক দিয়া অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়েন, জীবন্ত আদর্শ ও আন্দোলনের সহিত তাঁহার যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া যায়। সমস্ত দিন আফিসে অফুরান ফাইল ঘাঁটিয়া অপরাহে একটু ব্যায়াম বা ভ্রমণ করিয়া তিনি চলিলেন ক্লাবে, সেখানে সমশ্রেণীর চাকুরীয়াদের সহিত মেলামেশা, ছইক্কী পান, ‘পাঞ্চ’ বা অল্পরূপ ইংলণ্ডের সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা পাঠ। তিনি কদাচিৎ বই পড়েন, পড়িলেও পুরাতন প্রিয় পুস্তক লইয়াই সম্ভবতঃ নাড়াচাড়া করেন। এইভাবে মানসিক অধঃপতনের জগ্ন তিনি ভারতবর্ষের আবহাওয়ার দোষ দেন, এবং তাঁহাকে উত্থাপিত করিবার অপরাধে ‘এজিটেটর’দের (আন্দোলনকারী) অভিসম্পাত করেন। তিনি ইহা বুঝিতে পারেন না যে, ভারতের স্বৈরশাসনতন্ত্র এবং বাধ্যধরা আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতি—যাহার তিনি একটি ক্ষুদ্র অংশ—ইহার জন্ম দায়ী।

মাঝে মাঝে ছুটি, বিলাত গমন (ফার্লো) সত্ত্বেও ইংরাজ কর্মচারীদের যদি এই অবস্থা হয়, তাহা হইলে তাঁহার অধীনস্থ অথবা সমকক্ষ ভারতীয় কর্মচারীদের অবস্থাও বিশেষ ভাল নহে, কেন না তাহারা জ্ঞাতসারেই ইংরাজদের আদবকায়দা নকল করিয়া নিজেদের ঐ ছাঁচে গড়িয়া তোলে। সাম্রাজ্যের রাজধানী নয়াদিল্লীতে ইংরাজ ও ভারতীয় উচ্চ চাকুরীয়া মহলে অবিভ্রান্ত পদোন্নতি, ছুটির নিয়ম, ফার্লো, বদলী, চাকুরীয়া মহলের তদ্বির ও ও পক্ষপাতিত্বের কেলেকারীর কথার আলোচনা চলে,—ইহার মত নীরস অভিজ্ঞতা অল্পই আছে।

সমসাময়িক রাজনীতি

সরকারী চাকুরীয়া মহলের এই মানসিক আবহাওয়ার দ্বারা কলিকাতা বোম্বাইএর মত সহরের কিয়দংশ ছাড়া, ভারতের মধ্যাশ্রেণী বিশেষভাবে ইংরাজী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় প্রভাবান্বিত। বুদ্ধিজীবী, উকীল, ডাক্তার ও অন্যান্য অনেকে, এমন কি, আধা-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায়তনগুলি পর্যন্ত এই মনোভাবে আণ্ডত। এই সকল লোক, জনসাধারণ, এমন কি, নিম্ন-মধ্যাশ্রেণী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র জগতে বাস করেন। রাজনীতি সমাজের এই স্তরেই সীমাবদ্ধ। ১৯০৬ সাল হইতে বাঙ্গলার জাতীয় আন্দোলনের আলোড়ন প্রথম নিম্ন-মধ্যাশ্রেণীতে এক নবজীবনের চেতনা সঞ্চার করে এবং ইহা কতকাংশে জনসাধারণকেও প্রভাবিত করে। ইহাই উত্তরকালে গান্ধিজীর * নেতৃত্বে দ্রুত বিস্তার লাভ করে। জাতীয়তাবাদ প্রাণপ্রদ হইলেও ইহা সঙ্কীর্ণ মতবাদ এবং ইহা সমস্ত শক্তি এমনভাবে আকর্ষণ করে যে, অন্যান্য কার্যের অবসর থাকে না।

বিলাত হইতে ফিরিয়া প্রথম কয়েক বৎসর আমার জীবন বিতৃষ্ণার সহিত কাটিয়াছে, আইন ব্যবসায়েও আমি তেমন উৎসাহ বোধ করিতাম না। রাজনীতি বলিতে আমি বুঝিতাম, বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আক্রমণশীল জাতীয়তামূলক কার্যপদ্ধতি, কিন্তু তখনকার অবস্থা ইহার অগ্রকূল ছিল না। আমি কংগ্রেসে যোগদান করিলাম, ইহার সাময়িক সভা সমিতিতেও উপস্থিত থাকিতাম। ফিজিতে চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিকদের অথবা দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সমস্তা লইয়া আন্দোলনে আমি উৎসাহের সহিত কঠিন পরিশ্রম করিয়াছি, কিন্তু ইহা সাময়িক কাজ মাত্র।

অবসর বিনোদনের জন্ত আমি কখনও কখনও শীকারে যাইতাম কিন্তু ইহাতে আমার বিশেষ যোগ্যতাও ছিল না, আকর্ষণও ছিল না। অরণ্য ও ভ্রমণই আমি ভালবাসিতাম ও প্রাণীহতায় আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল না। অহিংস শীকারী বলিয়া আমার খ্যাতি রটিয়াছিল। একবার মাত্র দৈবক্রমে কান্দীয়ে আমি একটি ভল্লুক বধ করিয়াছিলাম। একবার একটি কুম্ভসার যুগশিশু শীকার করিয়া, আমার শীকারে যে

* এই পুস্তকে আমি মিঃ বা মহাস্বামী না লিখিয়া সর্বত্র “গান্ধিজী” লিখিয়াছি। অনেক ইংরাজ লেখক “জী” অর্থে বিশেষ আদরের ডাক বুঝেন। কিন্তু ভারতে “জী” সর্বত্র সকলের প্রতিই নির্বিচারে প্রযুক্ত হয়। ইহা সম্মান ও শ্রদ্ধাবাচক, আমার ভয়শক্তি অধিক পণ্ডিতের নিকট গুলিয়াছি সংস্কৃত ‘আর্য’ শব্দ প্রাকৃত ভাষায় ‘অজ’ হয়, তাহারই অপভ্রংশ ‘জী’।

সামান্য উৎসাহ ছিল তাহাও নিভিয়া গেল। সেই মরণাহত নিরীহ কৃষিশ্রমিক আমাদের পায়ের তলায় পড়িয়া অশ্রুসজ্জল আয়তনে কক্ষ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া প্রাণত্যাগ করিল। সেই কাতর দৃষ্টির দ্বিতীয় একদণ্ড আমাদের প্রায়ই উন্নত করিয়া তোলে।

এই সময়ে আমি গোথলের “সার্ভেট অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটির” প্রতি আকৃষ্ট হইলাম। এই সমিতির রাজনীতি অতিমাত্রায় নরমপন্থী এবং তখন আইন-ব্যবসায় ত্যাগ করার কোন সঙ্কল্প ছিল না বলিয়া ঐ সমিতিতে যোগ দিবার কথা আমি চিন্তাও করি নাই। তবে ঐ সমিতির সদস্যগণকে আমি শ্রদ্ধা করিতাম, কেন না তাঁহারা কেবল প্রাসঙ্গিক লইয়া দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সম্যকপথে পরিচালিত না হইলেও দেশে এই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে অনন্ততঃ অনন্তচিত্ত হইয়া সরল ও অনলস কর্ম করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

যাহা হউক, এই কালে রাজনীতির সহিত সম্পর্কহীন একটা সামান্য ব্যাপারে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর কথায় আমি অত্যন্ত মগ্ন হইয়াছিলাম। এলাহাবাদের এক ছাত্রসভায় বক্তৃতা করিতে উঠিয়া তিনি তাহাঙ্গিকে বলিলেন, তোমরা শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করিবে, অষ্টমত থাকিবে এবং কর্তৃপক্ষ যে সকল নিয়মাদি প্রণয়ন করিয়াছেন, যত্নসহকারে তাহা পালন করিবে। এই শ্রেণীর নিরীহ উপদেশ আমার মোটেই ভাল লাগে না। প্রভুত্বের নিকট সর্বদাই নত থাকিবে, এই ভাবের উপর জোর দিয়া বাজার চলন গতানুগতিক উপদেশ দান অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয়। ভারতে প্রচলিত আধা-সরকারী আবহাওয়ার ফলেই ইহা সম্ভব হয়, আমার ইহাই ধারণা। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী বলিতে লাগিলেন,—ছাত্ররা পরস্পরের অগ্রায়, ভুল, ত্রুটি, খলন অবিলম্বে কর্তৃপক্ষকে জানাইবে। অর্থাৎ সাদা কথায়, তাহারা গোপনে পরস্পরের উপর নজর রাখিবে এবং গুপ্তচরের কাজ করিবে। অবশ্য শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী এমন নিরাবরণ ভাষা ব্যবহার করেন নাই, কিন্তু আমি উহার অর্থ স্পষ্ট করিয়াই বুঝিলাম এবং একজন খ্যাতনামা নেতা যে ছাত্রদের বহুভাবে এমন উপদেশ দিতে পারেন, ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। আমি তখন সবেমাত্র ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়াছি এবং সেখানকার স্থল কলেজে আমি এই শিক্ষাই লাভ করিয়াছি যে, প্রাণান্তেও সহপাঠীর ত্রুটি ভুল উদ্ঘাটন করিবে না। কাহারও উপর গোপনে নজর রাখিয়া এবং তাহার কার্যকলাপ কর্তৃপক্ষের গোচরে আনিয়া একজন সঙ্গীকে বিপদে ফেলার মত শিষ্টনীতিবিরুদ্ধ পাপ অধিক আর কিছুই নাই। সহসা এই

সমসাময়িক রাজনীতি

আদর্শের বিপরীত উক্তি শুনিয়া আমি ব্যথিত হইলাম। বুঝিলাম, আমি যাহা শিক্ষা পাইয়াছি, ত্রীমুক্ত শাস্ত্রীর নীতির সহিত তাহার পার্থক্য কত অধিক।

মহামুদ আসিল—আমরা সচকিত হইলাম। প্রথমে আমাদের জীবন-যাত্রায় ইহার বিশেষ প্রভাব দেখা যায় নাই—যুদ্ধের ভয়াবহ প্রচণ্ডতার স্বরূপ ভারতবর্ষ তখনও উপলব্ধি করে নাই। রাজনৈতিক আন্দোলন মন্দীভূত হইয়া যেন মিলাইয়া গেল। ভারত রক্ষা আইন (ইংলণ্ডের দেশ রক্ষা আইনের অনুরূপ) সমস্ত দেশকে মুষ্টিবলে চাপিয়া ধরিল। মহামুদ্বের দ্বিতীয় বর্ষে ষড়যন্ত্র ও গুলি করিয়া গুপ্তহত্যার বিবরণ প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং পাঞ্জাবে রংক্রট সংগ্রহের জবরদস্তী মূলক ব্যবস্থার কথাও শোনা গেল।

বাহিরে উচ্চকণ্ঠে রাজভক্তি প্রচারের অন্তরালে ব্রিটিশের প্রতি সহানুভূতি অতি অল্পই ছিল। জাফানীর জয়লাভের বার্তা শুনিয়া কি মডারেট কি চরমপন্থী সকলেই তখন সন্তুষ্ট হইতেন। অবশ্য জাফানীর প্রতি কাহারও অনুরাগ ছিল না, আমাদের শাসকবর্গ শিক্ষালাভ করুক, এই আগ্রহই সকলের মনে ছিল। ইহা দুর্বল ও নিরুপায় মানবের পরের দ্বারা প্রতিশোধ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করাইবার ইচ্ছার অভিযুক্তি। আমরা অনেকে নানা বিমিশ্র ভাব লইয়া এই মহা আহব পর্য্যালোচনা করিতাম। মহামুদ্ব লিপ্ত সকল জাতির মধ্যে আমার ব্যক্তিগত সহানুভূতি সম্ভবতঃ ফরাসীর দিকে ছিল। মিত্রশক্তিপুঞ্জের অল্পকূলে বিরামহীন নিরলস প্রচারকার্য কিয়ৎপরিমাণে সফল হইলেও আমরা উহার উপর ততটা গুরুত্ব আরোপ করিতাম না।

ক্রমশঃ রাজনৈতিক জীবনে চেতনার সঞ্চার হইল। ক্যামুজির পর তিলক হোমরুল লীগ স্থাপন করিলেন; মিসেস বেশাস্তও আর একটি হোমরুল লীগ প্রতিষ্ঠা করিলেন। আমি দুই দলেই যোগ দিলাম, কিন্তু বিশেষভাবে মিসেস বেশাস্তের লীগের পক্ষে কার্য্য করিতে লাগিলাম। মিসেস বেশাস্ত ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে ক্রমশঃ অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন। কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে বেশ উৎসাহ দেখা গেল, মুসলিম লীগও কংগ্রেসের সহিত সমান তালে চলিতে লাগিল। দেশের আবহাওয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল, যুবকগণ অধীর আবেগে ভবিষ্যতের মহৎ সম্ভাবনা প্রত্যাশা করিতে লাগিল। মিসেস বেশাস্ত অন্তরীনে আবহাওয়া হওয়ায় শিক্ষিত সম্প্রদায় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, দেশের সর্বত্র হোমরুল লীগ জাঁকিয়া উঠিল। ১৯০৭ সাল হইতে কংগ্রেস হইতে বহিষ্কৃত পুরাতন

চরমপন্থীরা হোমরুল লীগে যোগ দিলেন, মধ্যশ্রেণীর বহু লোক আসিয়া লীগের সদস্য হইলেন। হোমরুল লীগে জনসাধারণ যোগ দেয় নাই।

মিসেস বেশান্তের অন্তরীনে অনেক প্রবীণ ব্যক্তি এবং কয়েকজন মডারেট নেতা পর্য্যন্ত বিচলিত হইলেন। আমার মনে আছে, এই অন্তরীনের কিছুদিন পূর্বে সংবাদপত্রে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতাগুলি পাঠ করিয়া আমরা উত্তেজিত হইলাম। কিন্তু অন্তরীনের অব্যবহিত পূর্বে এবং পরে শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী সহসা নীরব হইয়া গেলেন। যখন কাঙ্ক্ষিত সময় আসিল তখন তিনি পিছাইয়া গেলেন। তাঁহার এই নীরবতায় ক্রমশে নৈরাশ্র ও ক্ষোভের সঞ্চার হইল। যখন পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইবার প্রয়োজন তখনই তাঁহাকে পাওয়া গেল না। এই ঘটনার পর হইতে আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে, শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী কর্মক্ষেত্রের মানুষ নহেন, সঙ্কটের মধ্যে দাঁড়াইয়া কাজ করা তাঁহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ।

অগ্ন্যান্ত মডারেট নেতাদের মধ্যে কেহ আগাইয়া চলিলেন, কেহ বা পিছাইয়া পড়িলেন, কেহ কেহ দক্ষিণে সরিয়া রহিলেন। তখন গভর্ণমেন্ট ইয়োরোপীয় ডিফেন্স ফোর্সের অহু করণে মধ্যশ্রেণীর ভারতীয় যুবকদিগকে লইয়া একটি রক্ষাসেনাদল গড়িবার চেষ্টা করিতেছিলেন, ইহা লইয়া দেশে বেশ আলোচনা চলিতেছিল। এই ভারতীয় রক্ষাসৈন্যদলের প্রতি ইয়োরোপীয় দলের তুলনায় নানাভাবে পৃথক ব্যবহার করা হইত, এজন্য আমরা অনেকে অসুখব করিলাম, যতদিন না ঐ সকল অপমানজনক পার্থক্য দূর করা না হইতেছে, ততদিন আমাদের সহযোগিতা করা উচিত নহে। যুক্তপ্রদেশে অনেক আলোচনার পর সহযোগিতা করাই স্থির হইল। এই ব্যবস্থার মধ্যেও যুবকদের সামরিক শিক্ষা লাভের সুযোগ গ্রহণ করা কর্তব্য বলিয়া স্থির হইল। নূতন সৈন্যদলে যোগ দিবার জন্য আমি আবেদন করিলাম এবং ইহা কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য আমরা এলাহাবাদে একটি সমিতিও গঠন করিলাম। ঠিক এই সময় মিসেস বেশান্তের অন্তরীনের সংবাদ আসিল। সাময়িক উত্তেজনায় আমি উত্তোগী হইয়া গভর্ণমেন্টের কার্য্যের প্রতিবাদস্বরূপ রক্ষাসৈন্যদল সংক্রান্ত সভা সমিতি ও কার্য্যপ্রণালী স্থগিত করিতে সদস্যদিগকে সম্মত করাইলাম। সদস্যদিগের মধ্যে, আমার পিতা, ডাঃ তেজবাহাদুর সপ্ত, মিঃ সি, ওয়াই চিন্তামণি ও অগ্ন্যান্ত মডারেট নেতারা ছিলেন। ঐ মর্মে এক সাধারণ বিজ্ঞপ্তিও প্রচার করা হইল। কিন্তু যুদ্ধের সময় এই শ্রেণীর কাঙ্ক্ষের জন্য স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে অনেকেই অহুতপ্ত হইয়াছিলেন।

মিসেস বেশান্তের অন্তরীনের ফলে আমার পিতা ও অগ্ন্যান্ত মডারেট

সমসাময়িক রাজনীতি

নেতারা হোমরুল লীগে যোগদান করিলেন। কিন্তু কয়েক মাস পরে প্রায় সমস্ত মডারেটই লীগের সদস্যপদে ইস্তফা দিলেন। আমার পিতা রহিয়া গেলেন এবং এলাহাবাদ শাখার সভাপতি হইলেন।

ধীরে ধীরে আমার পিতা গোড়া মডারেট দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। যেখানে কর্তৃপক্ষ সতত আমাদের আবেদনে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, সেখানে অতিমাত্রায় অসুগত্য স্বীকারের বিরুদ্ধে তাঁহার স্বভাব বিদ্রোহ করিল। প্রাচীন চরমপন্থী নেতাদের বাক্য ও কার্য-প্রণালী তাঁহার নিকট অস্বীকৃত ছিল বলিয়া সেদিকেও তিনি ঝুঁকিলেন না। মিসেস বৈশাঙ্কের অন্তরীণ ও পরবর্ত্তী ঘটনাবলীতে তাঁহার মধ্যে গুরুতর পরিবর্তন দেখা দিল, কিন্তু তিনি রুতনিশ্চয় হইয়া পুরোভাগে আসিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। এই কালে তিনি বলিতেন, মডারেটদের কর্মনীতি কোন কাজের নহে, তবে হিন্দু-মুসলমান সমস্তা মীমাংসা ব্যতীত, কার্য্যতঃ বড় কিছু করা কঠিন। তিনি আমাদের নিকট বলিতেন এই সমস্তার মীমাংসা হইলে তিনি যুবকদের দলে যোগ দিবেন। আমাদের বাড়ীতে, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের যে মিলিত পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়, তাহা ১৯১৬র লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে গৃহীত হওয়ায় পিতা খুব খুসী হইলেন। তিনি দেখিলেন, মিলিতভাবে কার্য্য করিবার সুযোগ আসিয়াছে। মডারেট দলের প্রাচীন সহকর্মীদের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া তিনি অগ্রসর হইবার জ্ঞান প্রস্তুত হইলেন। ভারত-সচিব এডুইন মন্টেগুর ভারতে আগমনের সময় পর্য্যন্ত তাঁহারা কোন প্রকারে একত্র ছিলেন। কিন্তু মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মতভেদ দেখা দিল। ১৯১৮র গ্রীষ্মকালে, পিতার সভাপতিত্বে লক্ষ্ণৌএ আহূত প্রাদেশিক সম্মেলনে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটিল। মন্টেগু-চেমসফোর্ড প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করা হইবে আশঙ্কা করিয়া মডারেটগণ এই সম্মেলন বয়কট করিলেন। পরে তাঁহারা এই প্রস্তাব আলোচনার জ্ঞান আহূত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনও বয়কট করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে মডারেটবৃন্দ আর কংগ্রেসে যোগ দেন নাই।

মডারেটগণের নিঃশব্দে কংগ্রেসত্যাগ, জনসভায় অসুপস্থিতি অধিকাংশের মতের বিরুদ্ধেও স্বমত সমর্থন ও প্রচারের উৎসাহহীনতা আমার দৃষ্টিতে অত্যন্ত অগৌরবের বলিয়া মনে হইল। দেশকর্মীর পক্ষে ইহা অশোভনীয়। কেবল আমরা নহে, অধিকাংশ দেশবাসীর মতও ইহাই। মডারেটগণ যে ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্র হইতে সমূলে উৎসাদিত হইয়াছেন, তাঁহাদের এই ভীকৃত্যও তাহার অন্যতম কারণ। মডারেট দল সম্মিলিত ভাবে কংগ্রেস বয়কট করিবার

পর শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী কয়েকটি অধিবেশনে যোগ দিয়া তাঁহার মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি জনসাধারণের প্রজ্ঞাও লাভ করিয়াছিলেন।

মহাযুদ্ধের প্রথমভাগে আমার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক বা জনহিতকর কার্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। আমি সাধারণ সভায় বক্তৃতা করিতাম না। বক্তৃতা করিতে আমার ভয় ও সঙ্কোচ বোধ হইত। আমি জনসভায় ইংরাজীতে বক্তৃতা করা পছন্দ করিতাম না, কিন্তু হিন্দুস্থানীতে বক্তৃতা করিবার নিজ ক্ষমতা সম্বন্ধেও সন্দিহান ছিলাম। এই কালের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা মনে পড়ে। ১৯১৫ সালে, ঠিক তারিখ মনে নাই, আমি এলাহাবাদের এক জনসভায় প্রথম বক্তৃতা করি। সংবাদপত্র দমনের নূতন আইনের প্রতিবাদে ঐ সভা আহূত হয়। আমি সংক্ষেপে ইংরাজীতে কিছু বলিলাম। সভার শেষে সকলের সম্মুখে বক্তৃতামঞ্চের উপর আমাকে বিব্রত ও অপ্রস্তুত করিয়া ডাঃ তেজবাহাদুর সপ্ত আমাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া আশীর্বাদ করিলেন। ইহা আমার বক্তব্য বিষয় অথবা বলিবার ভঙ্গীর জন্ত নহে, তাঁহার আনন্দের কারণ এই যে, জনসাধারণের কাজে আর একজন নূতন কর্মী পাওয়া গেল। তখন জনসাধারণের কাজ বলিতে বক্তৃতা করাই বুঝাইত। এই কালে আমরা অর্থাৎ এলাহাবাদের অনেক যুবক মনে করিতাম, ডাঃ সপ্ত রাজনীতিক্ষেত্রে অধিকতর অগ্রগামী মতের অনুসরণ করিবেন। সহরের মডারেটদের মধ্যে তিনিই ছিলেন ভাবপ্রবণ এবং সময় সময় অত্যন্ত উৎসাহী হইয়া উঠিতেন, তাঁহার সহিত তুলনায় পিতাকে অত্যন্ত শীতল মনে হইত; যদিও বাহ্য আবরণের অন্তরালে প্রচুর অগ্নি ছিল। কিন্তু পিতার ইচ্ছাকে অবনমিত করার আশা আমরা প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছিলাম এবং কার্যতঃ ডাঃ সপ্তর নিকটই অধিক প্রত্যাশা করিতাম। দীর্ঘকাল জনহিতকর কার্যে নিযুক্ত পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যকেও আমরা প্রজ্ঞা করিতাম, তাঁহার সহিত প্রায়ই দীর্ঘ আলোচনা করিতাম; নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া সাহসিকতার পথে দেশকে পরিচালিত করিবার জন্ত তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিতাম।

এই সময়ে আমাদের গৃহে রাজনীতি আলোচনা বড় শান্তির ব্যাপার ছিল না। প্রায়ই আলোচনা গুরুতর আকার ধারণ করিত এবং আবহাওয়া গরম হইয়া উঠিত। বাক্যমাঝে পর্যাবসিত রাজনীতির সমালোচনা এবং কণ্ঠের আগ্রহ দেখিয়া পিতা বৃষ্টিতে পারিলেন আমি ক্রমশঃ চরমপন্থী হইয়া পড়িতেছি। কিন্তু কি করা উচিত, তাহা আমার নিকট স্পষ্ট

সমসাময়িক রাজনীতি

ছিল না ; পিতা অহুমান করিলেন, কতিপয় বাঙালী যুবকের মত আমিও হিংসাপন্থী হইয়া পড়িতেছি। ইহাতে পিতা অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইলেন। কিন্তু কার্যতঃ আমার ওপথে আকর্ষণ ছিল না। বর্তমান অবস্থা ও ব্যবস্থার বশত স্বীকার না করিয়া কিছু করা কর্তব্য, এই চিন্তায় আমি ক্রমশঃ অধীর হইয়া উঠিলাম। সমগ্র জাতির কল্যাণে কোন সাফল্যপূর্ণ কার্য সহজ মনে হইত না বটে, তবে কি ব্যক্তির জীবনে কি জাতির জীবনে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে এক সংগ্রামলীল মনোভাব পোষণ করা আত্মমর্যাদা ও জাতীয় মর্যাদার জ্যোতক বলিয়া মনে হইত। মডারেট-নীতিতে বিরক্ত পিতার মধ্যেও মানসিক দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। কিন্তু কোন পথ সন্ধিক্ষে যে পর্য্যন্ত না তিনি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ না হন, ততক্ষণ ক্ষেত্র পরিবর্তন করিবার মত লোক তিনি ছিলেন না। তাঁহার প্রত্যেক পদক্ষেপের পশ্চাতে রহিয়াছে, মানসিক সংগ্রামের তিক্ত ও কঠিন অভিজ্ঞান। নিজের প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়াই তিনি অগ্রসর হইয়াছেন, পশ্চাতে ফিরিবার ভাব সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়া। কোন সাময়িক উত্তেজনায় বশে নহে, বিচারবুদ্ধি দ্বারা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিয়াই তিনি অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার তীব্র আত্মমর্যাদাজ্ঞান আর তাঁহাকে পিছনে চাহিবার অবসর দেয় নাই।

মিসেস বেশাস্তের অন্তরীন হইতেই তাঁহার রাজনৈতিক মত পরিবর্তিত হইতে থাকে ; ক্রমে তিনি তাঁহার মডারেট সঙ্গীদের পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইলেন। অবশেষে ১৯১৯র পাঞ্জাবের বিষাদপূর্ণ ঘটনা তাঁহাকে আইনব্যবসায় ও অভ্যন্তর জীবন হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিল। তিনি গান্ধিজী প্রবর্তিত নূতন আন্দোলনের সহিত নিজের ভাগ্যান্বিত গাঁথিয়া লইলেন।

কিন্তু ইহা তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। ১৯১৫-১৭-এই সময় তিনি কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। একদিকে সংশয়সঙ্কুলতা, অত্রদিকে আমার সন্ধিক্ষে দুশ্চিন্তা—এই মানসিক অবস্থায় তিনি কোন বিষয়ে ধীরভাবে আলোচনা করিতে পারিতেন না। প্রায়ই তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিত, আমাদের আলোচনা সহসা বন্ধ হইয়া যাইত।

১৯১৬র বড়দিনে লাক্কো কংগ্রেসে গান্ধিজীর সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের জন্ত আমরা তাঁহাকে প্রজ্ঞা করিতাম, কিন্তু আমাদের মত যুবকদের নিকট তিনি স্তূর স্বতন্ত্র এবং রাজনীতির সহিত সম্পর্কহীনরূপেই প্রতিভাত হইতেন। তখন তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সমস্তা ব্যতীত, কংগ্রেসে জাতীয় রাজনীতি

সম্পর্কিত কোন আলোচনায় যোগ দিতেন না। ইহার কিছুকাল পরে চাম্পারণ জিলায় নীলকন্দের বিরুদ্ধে তাঁহার পরিচালনায় কৃষক আন্দোলনের সাফল্য দেখিয়া আমরা উৎসাহিত হইলাম। আমরা বুঝিলাম, তিনি তাঁহার দক্ষিণ আফ্রিকার অবলম্বিত উপায় ভারতেও প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন এবং তাহাতে সাফল্যের সম্ভাবনাও রহিয়াছে।

লন্ডো কংগ্রেসের পর, এলাহাবাদে সরোজিনী নাইডুর কয়েকটি আবেগময়ী বক্তৃতা শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। এই বক্তৃতাগুলিতে জাতীয়তাবাদ ও দেশাশ্বাবোধের পরিপূর্ণ প্রেরণা ছিল। আমি এই কালে খাঁটি জাতীয়তাবাদী হইয়া পড়িয়াছিলাম, আমার কলেজ-জীবনের অস্পষ্ট সমাজতান্ত্রিক ভাবগুলি প্রায় অস্মৃতিত হইয়াছিল। ১৯১৬ সালে আইরিশ-নেতা রোজার কেমেন্ট বিচারালয়ে দাঁড়াইয়া যে অপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা যেন উজ্জল অঙ্গুলী দিয়া দেখাইয়া দিল, পরাধীন জাতির সম্মানকে কি ভাবে অহুভব করিতে হয়। আয়ল্যাণ্ড ঈষ্টার বিদ্রোহের ব্যর্থতার পরও কি সে অপূর্ণ সাহসিকতা, যাহা ব্যর্থতাকে ব্যঙ্গ করিয়া জগতের সম্মুখে ঘোষণা করিতে পারে, কোন বাহুবল জাতির অপরাজিত আত্মাকে ধ্বংস করিতে পারে না।

আমার তৎকালীন এই মানসিক অবস্থার মধ্যেও আমি নূতন করিয়া সমাজতান্ত্রিক গ্রন্থ পড়িতে লাগিলাম, এবং স্থপ্ত প্রাচীনভাবগুলি পুনরায় যত্নে আলোড়ন উপস্থিত করিল। কিন্তু ইহা অস্পষ্ট, মানবতা ও আদর্শবাদ মাত্র, খাঁটি বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্ববাদ নহে। মহাযুদ্ধের সময়ে এবং তাহার পরেও বারট্রাও রাসেলের বইগুলি পড়িতে আমার খুব ভাল লাগিত।

এই সকল চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষাপ্রসূত মানসিক দ্বন্দ্বে আমি আইন ব্যবসায়ের প্রতি বিরুদ্ধ হইয়া উঠিলাম। আর কিছু করিবার নাই বলিয়াই ইহাতে লিপ্ত রহিলাম, কিন্তু আমি অহুভব করিতে লাগিলাম, আমার চিত্ত জনসাধারণের কাজে, বিশেষতঃ সংঘর্ষমূলক রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্ত যেরূপ ব্যাকুল, তাহার সহিত আইনজীবীর কর্তব্যের সামঞ্জস্য হইবে না। ইহা কোন নীতির প্রশ্ন নহে, সময় ও শক্তির প্রশ্ন। কলিকাতার বিখ্যাত ব্যবহারজীবী স্তার রাসবিহারী ঘোষ, কি কারণে জানি না, আমার প্রতি অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ হইয়াছিলেন, আইনব্যবসায়ে কি করিয়া উন্নতি করিতে হয়, সে বিষয়ে অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন। বিশেষভাবে তিনি আমাকে, আমার পছন্দমত আইনবিষয়ক একখানি গ্রন্থ লিখিবার উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, নবীনদের পক্ষে নিজেকে প্রস্তুত করিবার ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট

পছা। তিনি আমাকে গ্রন্থ লিখিতে সাহায্য করিবেন এবং উহা সংশোধন করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলেন। কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য তাঁহার এই আগ্রহ সমস্তই নিষ্ফল হইল, কেন না, আইনের বই লিখিয়া সময় ও শক্তির অপব্যবহার করিবার মত বিরক্তিকর কিছু আমি ভাবিতেই পারি না।

বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রীর রাসবিহারীর মেজাজ অত্যন্ত খিটখিটে হইয়াছিল, অল্পেই তিনি ধৈর্য হারাইতেন, এজন্য ‘জুনিয়র ব্যারিষ্টারেরা’ তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। তাঁহার দুর্বলতা ও ক্রটি সত্ত্বেও, তাঁহার মধ্যে আকর্ষণের অনেক কিছু ছিল এবং আমার তাঁহাকে ভাল লাগিত। পিতা এবং আমি সিমলায় একবার তাঁহার অতিথি হইয়াছিলাম, (১৯১৮ সাল, তখন সবেমাত্র মর্টেণ্ড-চেমসফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে) একদিন তিনি নৈশভোজনে কয়েকজন বন্ধুকে আহ্বান করেন, তাহার মধ্যে মিঃ খাপার্দেও ছিলেন। ভোজনাঙ্কে স্ত্রীর রাসবিহারী ও মিঃ খাপার্দেের তর্কযুদ্ধ মুখর হইয়া উঠিল। একজন হইলেন খাটি মডারেট এবং মিঃ খাপার্দে তৎকালে একজন প্রধান তিলক-পন্থী বলিয়া বিবেচিত হইতেন। পরবর্তী কালে অবশ্য তিনি ঘুঘুর মত নিরীহ এবং মডারেট অপেক্ষাও মডারেট হইয়াছিলেন। মিঃ খাপার্দে, গোখলের (কয়েক বৎসর পূর্বে মৃত) সমালোচনাগ্রন্থে বলিতে লাগিলেন, তিনি ছিলেন ব্রিটিশ গুপ্তচর; একবার লণ্ডনে তিনি আমার পিছনে লাগিয়াছিলেন। স্ত্রীর রাসবিহারী এই মন্তব্য বরদাস্ত করিতে পারিলেন না, তিনি উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, গোখলে তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধু, এবং তাঁহার মত উন্নতহৃদয় ব্যক্তি তিনি অল্পই দেখিয়াছেন, এহেন লোকের বিরুদ্ধে এমন কথা তিনি কিছুতেই মানিবেন না। তখন তিনি তুলিলেন শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর কথা। যদিও স্ত্রীর রাসবিহারী এ গ্রন্থও পছন্দ করিলেন না, তবে পূর্বের হ্রাস ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না। তিনি শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে যে গোখলের হ্রাস শুদ্ধা করেন না, ইহা স্পষ্টই বোঝা গেল। তিনি বলিলেন, যতদিন গোখলে জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি সার্ভেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটিকে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যুর পর উহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তারপর মিঃ খাপার্দে তুলনা করিয়া তিলকের প্রশংসা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, ইনি একজন প্রকৃত পুরুষসিংহ, ইহার ব্যক্তিত্ব অতি প্রখর এবং ইনি একজন প্রকৃত সাধু। “সাধু?” স্ত্রীর রাসবিহারী দীপ্তকণ্ঠে বলিলেন,—“সাধুদের আমি ঘৃণা করি, উহাদের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই।”

আমার বিবাহ ও হিমালয় ভ্রমণ

১৯১৬ সালে দিল্লী সহরে আমার বিবাহ হয়। সেদিন বাসন্তী পঞ্চমী, —বসন্ত ঋতুর প্রথম দিবস। এই বৎসর গ্রীষ্মকালে আমরা কান্দ্বীয়ে কাটাইয়াছি। আমাদের পরিবারবর্গ উপত্যকায় রহিলেন। আমি ও আমার এক জ্ঞাতি ভ্রাতা কয়েক সপ্তাহ পর্বতমালার মধ্য দিয়া লাভকের রাস্তা পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আসিলাম। জগতের উর্দ্ধলোকে সঙ্গীর্ণ নির্জন গিরিপথে ভ্রমণের ইহাই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা, এই পথ দূরে তিব্বতের মালভূমি পর্য্যন্ত প্রসারিত। জোজিলা গিরিসঙ্কটের শীর্ষে ঠাড়াইয়া দেখিলাম, নিম্নে শ্রামল গিরিমালা, উর্দ্ধে নিরাবরণ হিমশীতল শৃঙ্গরাজি। আমরা উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম, সঙ্গীর্ণ পথ, দুই দিকে তুষারমণ্ডিত তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ, সম্মুখে চিরতুষার। বাতাস শীতল তীক্ষ্ণ-স্পর্শ হইলেও দিবাভাগে সূর্য্যতাপ মনোরম। বাতাস এত স্বচ্ছ যে কোনও বস্তুর দূরত্ব সম্বন্ধে ভ্রম হয়। যাহাকে নিকটবর্তী বলিয়া মনে হইতেছে, বস্তুর তাহা বহুদূরে। ক্রমে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পথ তরুশূন্যহীন, কেবল উল্লসপর্বত বরফে আচ্ছন্ন। কচিং কোথাও নয়নানন্দকর পুষ্পসম্ভার। প্রকৃতির এই বস্ত্র নির্জনতায় আমি এক অপূর্ব তৃপ্তি লাভ করিলাম; আমার শিরায় শিরায় শক্তির অহুচ্ছৃতি,—হৃদয়ে আনন্দের উচ্ছ্বাস।

এই ভ্রমণকালে আমি এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলাম। জোজিলা গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিবার পর সম্ভবতঃ মাজ্জারনে আসিয়া গুলিলাম বিখ্যাত অমরনাথ গুহা মাত্র আট মাইল দূরে। সম্মুখে ছিল তুষার-মৌলী এক বৃহৎ পর্বত, কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? আট মাইল কত সামান্য। অনভিজ্ঞতাজনিত উৎসাহে আমরা যাত্রা স্থির করিলাম। আমাদের বন্দাবাস (সমুদ্র তীর হইতে ১১৫০০ ফিট উর্দ্ধে স্থাপিত) ত্যাগ করিয়া আমরা ক্ষুদ্র দলটি লইয়া পর্বতে উঠিতে লাগিলাম। স্থানীয় এক মেঘপালক আমাদের পথপ্রদর্শক হইল।

কতকগুলি তুষার চাপ আমরা দড়ির সাহায্যে অতিক্রম করিলাম, ক্রমে পথক্লেণ বাড়িতে লাগিল, শ্বাসকষ্ট অনুভব করিতে লাগিলাম। আমাদের কয়েকজন কুলির বোঝা ভারী না থাকা সত্ত্বেও নাকমুখ দিয়া রক্ত পড়িতে

আমার বিবাহ ও হিমালয় ভ্রমণ

লাগিল। ক্রমে বরফ পড়িতে লাগিল, তুষারবর্ষাও পিচ্ছিল হইয়া উঠিল। আমরা অবসর দেহে অত্যন্ত ক্লেশ ও সাবধানতার সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলাম। তথাপি নিকোঁধ জিহ্বা ছাড়িতে পারিলাম না। ভোর চারিটার সময় আমরা বস্ত্রাবাস ত্যাগ করিয়াছিলাম। বার ঘণ্টা অবিশ্রান্ত পর্বত আরোহণ করিয়া এক বৃহৎ তুষারক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম। চারিদিকে তুষারপর্বত বেষ্টিত এই রম্যভূমি বেন একটি মণিখচিত মুকুট অথবা একখণ্ড দেবলোক। কিন্তু সহসা বরফ পড়িতে লাগিল। কুয়াশায় এই মনোহর দৃশ্য ঢাকিয়া গেল। আমার ধারণা আমরা ১৫ কি ১৬ হাজার ফিট উর্দ্ধে উঠিয়াছিলাম। এমন কি আমরা অমরনাথ গুহা ছাড়াইয়া উপরে উঠিয়া পড়িয়াছি। এখন আমাদেরকে অর্দ্ধমাইল ব্যাপী তুষারক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া গুহার অপর পাশ্বে উপস্থিত হইতে হইবে। এবার আর চড়াই নাই এই আশ্বাসে কতকটা লঘু হৃদয়ে আমরা যাত্রা করিলাম। কিন্তু ইহাতেও বিঘ্ন উপস্থিত হইল। পথে বহুতর ফাটল এবং সত্তপতিত বরফে আবৃত বিপদসঙ্কুল স্থান ছিল। সত্তপতিত বরফই আমাকে ব্যর্থমনোরথ করিল। কেবল পা বাড়াইয়াছি, নূতন বরফ সরিয়া গেল, আমি এক বৃহৎ খালের মধ্যে পড়িলাম। সেই অতলে যদি তলাইয়া যাইতাম তাহা হইলে আমার দেহ ভবিষ্যতের ভৌগোলিক যুগের জন্ত বরফে সুরক্ষিত থাকিত। এক হাতে দড়ি ও অন্য হাতে পর্বতশৃঙ্খলের প্রান্ত ধরিয়া সে যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম। সঙ্গীরা আমাকে টানিয়া তুলিল। আমরা ঘাবড়াইয়া গেলাম কিন্তু সঙ্কল্প ত্যাগ করিলাম না। ক্রমে তুষারের ফাটল সংখ্যায় অধিক ও বিস্তীর্ণ হইয়া দেখা দিতে লাগিল, ঐগুলি উত্তীর্ণ হইবার উপযুক্ত কোনও সাজসরঞ্জাম আমাদের ছিল না। অগত্যা প্রান্ত ও ক্লাস্তদেহে নৈরাশ্য লইয়া আমাদের ফিরিতে হইল, অমরনাথ গুহা আর দেখা হইল না।

কাশ্মীরের গিরি অরণ্য উপত্যকা এমনভাবে আমাকে মুগ্ধ করিল যে, সঙ্কল্প করিলাম শীঘ্রই পুনরায় ফিরিয়া আসিব। তারপর তিস্তের মনোহর মানসসরোবর তুষারশৃঙ্খল কৈলাসগিরি দর্শনলালসা আমাকে কত দিন অধীর করিয়া তুলিয়াছে। কত ভ্রমণতালিকা প্রস্তুত করিয়াছি, কিন্তু আঠার বৎসরেও সে সাধ পূর্ণ হয় নাই। এমন কি, যে কাশ্মীর দেখিবার জন্ত প্রায়ই আমার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে, ক্রমশঃ রাজনীতি ও জনসাধারণের জটিল কাজে জড়াইয়া পড়িয়া সে সাধও পূর্ণ করিতে পারি নাই। পর্বতারোহণ কিংবা সমুদ্রলঙ্ঘন করিয়া আমার ভ্রমণতৃষ্ণা কারাগারে আসিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছে। কিন্তু এখনও মনে মনে অনেক সঙ্কল্প করি। কারাগারে কেহ আমাকে এ আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিতে

পারে না এবং কল্পনা ছাড়া কারাগারে আর কি-ই বা করিবার আছে? আমার দীপ্তিত সেই সরোবর সেই পর্বত দেখিবার জন্ত আমি যেদিন হিমগিরির কোড়ে ভ্রমণ করিব, আমি সেই দিনের স্বপ্ন দেখি। কিন্তু জীবন বহিয়া চলিয়াছে,—যৌবনও চলিয়াছে প্রৌঢ়ত্বের অভিমুখে, তাহাও পরিণামে একদিন বার্কাক্য আনিবে, যখন কি কৈলাস কি মানসসরোবর ভ্রমণের সামর্থ্য থাকিবে না কিন্তু যদি নাও তাহা দেখিতে পাই তথাপি কল্পনায় আনন্দ আছে।

“আমার মানসপটে ঐ পর্বতশিখর অটলোন্নত। সন্ধ্যারস্তুরাগে তাহাদের দুর্গম দূরারোহ স্থানগুলি আবৃত। এবং আমার আত্মা আঁখিপ্ৰান্তে বসিয়া সেই চিরশান্ত তুষার তৃণায় অধীর।

ওয়ান্টার ডি লা মেয়ার।”

৭

গান্ধিজীর অভ্যুদয়—সত্যগ্রহ ও অমৃতসর

মহাযুদ্ধের অবসানে ভারতবর্ষে এক অবরুদ্ধ উত্তেজনা দৃষ্ট হইল। কলকারখানা প্রসার লাভ করিয়াছে,—ধনিকশ্রেণীর ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য বর্দ্ধিত হইয়াছে। নীর্বহনীয় এই মুষ্টিমেয় ব্যক্তি অধিকতর ক্ষমতার জন্ত লুক্ক এবং সঞ্চিত অর্থ অধিকতর উপার্জনের আশায়, খাটাইবার সুবিধা খুঁজিতে ব্যস্ত। এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত বিশাল জনসংখ্যা যে দুর্ব্বল ভাবে পিষ্ট হইতেছিল তাহা হইতে মুক্তির আশায় ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। মধ্যশ্রেণীর মধ্যে সর্বত্র শাসনতন্ত্রের এক পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা, যাহা দ্বারা কতক পরিমাণে স্বায়ত্তশাসন পাওয়া যাইবে এবং তাহার ফলে অনেক নূতন কর্ম জুটিবে, অবস্থা অনেকাংশে উন্নত হইবে। শান্তিপূর্ণ ও সম্পূর্ণরূপে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছিল এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বায়ত্তশাসনের ঐতিহ্যের বিষয় লোকে আলোচনা করিতেছিল। আত্মশুদ্ধি কিছু অশান্তি জনসাধারণের মধ্যে, বিশেষ করিয়া কৃষকদের মধ্যে দেখা যাইতেছিল। পাঞ্জাবের পল্লীসভাগুলি বলপূর্ব্বক রংরট সংগ্রহের তিক্তস্মৃতি তখনও বিদ্যমান। “কামাগাটা মার্ক” জাহাজে

গাজিপুর অভ্যুদয়—সত্যাপ্রহ ও অমৃতসর

আগত পাঞ্জাবীদের বিরুদ্ধে দলননীতি ও অগ্নিপার বড়যন্ত্রের মামলায় অসন্তোষ বিস্তৃত হইয়াছিল। বৈদেশিক যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত সৈনিকেরা আর পূর্বের মত যত্নবৎ আশ্রয়পালনকারী নহে। তাহাদের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছিল ও তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট অসন্তোষ ছিল। তুরস্কের প্রতি ব্যবহার ও খিলাফত সমস্যা লইয়া মুসলমানদের মধ্যেও ক্রোধ ও উত্তেজনার সঞ্চার হইতেছিল। তুরস্কের সহিত সন্ধিপত্র তখন স্বাক্ষরিত হয় নাই বটে, কিন্তু অবস্থার গুরুত্ব বুঝা যাইতেছিল। এই কারণে তাহারা উত্তেজিত হইয়াও তখনও অপেক্ষা করিতেছিল।

ভয় ও উৎকর্ষামিশ্রিত আশা লইয়া সমগ্র ভারতবর্ষ এক বৃহৎ প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিতেছিল, এমন সময় রাউলাট বিল আসিল। ইহার মধ্যে প্রচলিত আইনের বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া বিনাবিচারে গ্রেফতার ও বন্দী করিবার ধারা ছিল। সমগ্র ভারতবর্ষে এক ক্রুদ্ধ প্রতিবাদের তরঙ্গ উঠিল, এমন কি মডারেটগণ পর্যন্ত সমস্ত শক্তি লইয়া এই প্রতিবাদে যোগ দিলেন। সকল শ্রেণীর সকল মতের ভারতবাসীর এই দেশব্যাপী প্রতিবাদ সত্ত্বেও শাসকগণ এই বিল আইনে পরিণত করিয়া ফেলিলেন। তবে জনমতকে সন্তুষ্ট করিবার জগু উহার পরমাণু মাত্র তিন বৎসর কর্ত্তী হইল। আজ পনের বৎসর পরে এই বিল ও তৎসংক্রান্ত আন্দোলনের কথা চিন্তা করিলে অনেক শিক্ষা লাভ করা যায়। ঐ বিল আইনে পশ্চিম হইবার পর তিন বৎসরের মধ্যে কখনও উহা প্রয়োগ করা হয় নাই, অথচ এই তিন বৎসরে যে অশান্তি আলোড়ন দেখা গিয়াছে ১৮৫৭র বিদ্রোহের পর ভারতে আর তাহা দেখা যায় নাই। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট সম্মিলিত জনমত অগ্রাহ্য করিয়া যে আইন পাশ করিলেন, অথচ প্রয়োগ করিলেন না—তাহাই এক বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি করিল। অশান্তি সৃষ্টি করাই এই শ্রেণীর আইনের উদ্দেশ্য যে-কেহ এইরূপ ভাবিতে পারে। আজ পনের বৎসর পরেও আমরা দেখিতেছি, রাউলাট আইন অপেক্ষাও কঠোর বহুতর আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে এবং তাহার প্রয়োগও নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। যে সকল নূতন আইন ও অর্ডিন্যান্সের আওতায় আমরা ব্রিটিশ শাসনের আশীর্বাদ লাভ করিতেছি তাহাদের সহিত তুলনায় রাউলাট বিল তো স্বাধীনতার ছাড়পত্র। অবশ্য তখনকার সহিত তুলনায় এখন পার্থক্য অনেক বেশী। ১৯১২ সাল হইতে আমরা মণ্টেগু-চেমসফোর্ড পরিকল্পনাযুগ্মী এক দফা স্বায়ত্তশাসন ভোগ করিতেছি, এখন শুনিতেছি আর এক দফা পাইবার সময় আসন্ন। আমরা উন্নতি লাভ করিতেছি।

১৯১৯র প্রথমভাগে গান্ধিজীৱ কঠিন পীড়া হয়। তিনি রোগশয্যা হইতে বড়লাটের নিকট আবেদন করেন যে, তিনি যেন রাউলাট, বিলে সম্মতিদান না করেন। অত্যাচারের মত এই আবেদনেও উপেক্ষা প্রদর্শিত হইল। গান্ধিজী নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই প্রথম নিখিল ভারতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। তিনি সত্যগ্রহ সভা স্থাপন করিলেন। সদস্যগণ রাউলাট আইন ও কতকগুলি নির্দিষ্ট দুর্নীতিমূলক আইন অমান্য করিবার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিলেন, অর্থাৎ তাঁহারা স্বেচ্ছায় প্রকাশভাবে কারাবরণ করিবেন।

এই প্রস্তাব প্রথম যখন আমি সংবাদপত্রে পাঠ করিলাম তখন আমার মন হইতে যেন একটা ভার নামিয়া গেল। অবশেষে পথের সন্ধান মিলিল। এই স্পষ্ট সরল কর্মপদ্ধতি হয় তো বা কার্য্যকরী হইতে পারে। আমি উৎসাহে মাতিয়া উঠিলাম, অবিলম্বে সত্যগ্রহ সভায় যোগ দিবার সঙ্কল্প করিলাম। আইনভঙ্গ কারাগমন প্রভৃতির পরিণাম কি, সে চিন্তাও মনে হইল না। আমার মনে হইল যেন কিছুই গ্রাহ্য করি না। কিন্তু সহসা আমার উৎসাহ নিভিয়া গেল। আমি বুঝিলাম ব্যাপারটা অত সহজ নয়। আমার পিতা এই নূতন ভাবের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। নূতন কিছু লইয়া সহসা মাতিয়া উঠা তাঁহার স্বভাব নহে। অগ্রসর হইবার পূর্বে তিনি সাবধানতার সহিত ভবিষ্যৎ চিন্তা করেন। সত্যগ্রহ সভা ও তাহার কার্য্যপদ্ধতি তিনি যত চিন্তা করিতে লাগিলেন ততই ইহা তাঁহার অপছন্দ হইতে লাগিল। কতকগুলি লোক জেলে গেলে কি লাভ হইবে এবং গভর্ণমেণ্টের উপরই বা তাঁহার প্রভাব কতটুকু? ইহা ছাড়া ব্যক্তিগতভাবেও তাঁহার মন সায় দিল না। আমি জেলে যাইব ইহা তাঁহার নিকট অত্যন্ত অযৌক্তিক মনে হইল। তখনও জেলে যাওয়ার পালা শুরু হয় নাই এবং ঐ ধারণা অত্যন্ত বিরক্তিকর ছিল। পিতা তাঁহার সন্তানদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। তাঁহার ঘ্নেহ বাহিরে প্রকাশ পাইত না কিন্তু সংঘর্মের অন্তরালে তাহা অত্যন্ত গভীর ছিল।

কিছুদিন ধরিয়া মানসিক স্বন্দ চলিল এবং আমরা উভয়েই অল্পভব করিলাম যে বৃহৎ একটা কিছু আসিতেছে যাহা আমাদের বর্তমান জীবনের ধারাকে বিপর্যাস্ত করিয়া ফেলিবে। আমরা পরস্পরের মনোভাব সম্পর্কে যথাসম্ভব সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলাম। যদি পারিতাম তাহা হইলে তাঁহার মানসিক যন্ত্রণা লাঘব করিতাম কিন্তু আমার চিন্তাও সত্যগ্রহকে বরণ করিবার অল্প প্রস্তুত হইয়াছে, এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না।

গান্ধিজীর অত্মদয়—সত্যগ্রহ ও অমৃতসর

আমরা উভয়েই সম্ভ্রুতিতে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। মর্শ্ববেদনায় কাতর হইয়া রাজির পর রাজি আমি যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিতাম—কোন পথে মৃত্তি? আর পিতা—আমি পরে আবিষ্কার করিলাম—রাজ্রে মেঝেতে শুইয়া পরীক্ষা করিতেন আমি কারাগারে গেলে কঠিন মৃত্তিকাশয়নে কিরূপ বেদনা পাইব!

পিতার অহুরোধে গান্ধিজী এলাহাবাদে আসিলেন। উভয়ের মধ্যে আলোচনাকালে আমি উপস্থিত ছিলাম না। এই আলোচনার ফলে গান্ধিজী আমাকে এই বিষয় লইয়া তাড়াতাড়ি কিছু করিতে অথবা পিতার মনে আঘাত করিতে নিষেধ করিলেন। আমি ইহাতে খুসী হইলাম না কিন্তু ভারতে তাহার পর যে সব ঘটনা ঘটিল তাহার ফলে অবস্থার পরিবর্তন হইল এবং সত্যগ্রহ সভার কার্য বন্ধ হইয়া গেল।

সত্যগ্রহ দিবস—নিখিল ভারত হরতাল এবং সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ—দিল্লী ও অমৃতসরের পুলিশ ও সৈন্যদলের গুলিবর্ষণ—বহুলোক হতাহত—অমৃতসর এবং আহম্মদাবাদে জনতার উপদ্রব—জালিয়ানালাবাদের হত্যাকাণ্ড—পাঞ্জাবে সামরিক আইনের ভয়াবহ অত্যাচার ও অপমান। পাঞ্জাব সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। বহির্জগতের দৃষ্টির বাহিরে কি ঘটতেছে কিছুই বোঝা গেল না। পাঞ্জাবের কোন সংবাদ পাওণা ছরুহ হইয়া উঠিল, পাঞ্জাবে গমনাগমন নিষিদ্ধ হইল। যে দুই-চারি জন ব্যক্তি সেই নরক হইতে পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহারা এত ভীতিবিহবল যে কোন ঘটনারই পরিষ্কার বিবরণ দিতে পারিল না। অসহায় অক্ষমের মত আমরা তিক্ত হৃদয়ে সংবাদের জগ্ন অপেক্ষা করিতে লাগিলাম মাত্র। আমরা কেহ কেহ সামরিক আইনের বিধি-নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া প্রকাশ্যভাবে পাঞ্জাবের পীড়িত অঞ্চলে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলাম কিন্তু আমাদিগকে নিবারণ করা হইল এবং ইতিমধ্যে সাহায্য প্রদান এবং অহুসন্ধান করিবার জগ্ন কংগ্রেসের পক্ষ হইতে একটি শক্তিশালী সমিতি গঠিত হইল। প্রধান প্রধান অঞ্চলে সামরিক আইন প্রত্যাহত এবং পুলিশের বাধা অপসারিত হইবামাত্র বিশিষ্ট কংগ্রেসনেতা এবং অগ্নাগ্ন সকলে পাঞ্জাবে উপস্থিত হইলেন। সাহায্যদান এবং অহুসন্ধানকার্যের সূচনা হইল।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও স্বামী প্রকানন্দ সাহায্যপ্রদানের ভার লইলেন, অহুসন্ধানের ভার প্রধানতঃ আমার পিতা ও চিত্তরঞ্জন দাশের উপর অর্পিত হইল। গান্ধিজীও পরিদর্শন করিতে লাগিলেন এবং সকলে প্রয়োজন মত তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। দেশবন্ধু দাশ

বিশেষভাবে অমৃতসর অঞ্চলের ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নির্দেশ অনুসারে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য আমাকে তাঁহার সহকারী নিযুক্ত করা হইল। তাঁহার সহিত একত্রে এবং তাঁহার অধীনে কার্য করার সুযোগ আমার জীবনে এই প্রথম আসিল। মূল্যবান অভিজ্ঞতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধাও বর্দ্ধিত হইল। জালিয়ানালাবাগ এবং যে গলিতে মানুষকে বুকে হাঁটিয়া চলিতে বাধ্য করা হইত ভ্রংসস্পর্কিত সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ আমাদের সম্মুখেই গৃহীত হইয়াছিল এবং পরে তাহা কংগ্রেস অনুসন্ধান সমিতির রিপোর্টে প্রকাশিত হয়। আমরা তথাকথিত বাগটি বহবার পরিদর্শন করিয়াছি এবং ইহার প্রত্যেক অংশ তন্নতন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছি।

কথা উঠিয়াছিল, মনে হয় মিঃ এডওয়ার্ড টমসনই কথাটা তুলিয়াছিলেন যে, জেনারেল ডায়ারের ধারণা ছিল, বাগ হইতে বাহির হইবার অল্প পথ আছে, এই কারণেই তিনি দীর্ঘকাল গুলিবর্ষণ করিয়া ছিলেন। এমন কি, তাহাই যদি ডায়ারের ধারণা হয় এবং কার্যতঃ নির্গমন পথ থাকিয়াই থাকে, তবু তাঁহার দায়িত্ব লঘু হয় না। তাঁহার এরূপ ধারণা ছিল ইহা অতি আশ্চর্যের কথা। তিনি যে উচ্চভূমির উপর দাঁড়াইয়াছিলেন সেখানে যে-কেহ দাঁড়াইলে সমস্তটা মাঠ পরিকাররূপে দেখিতে পাইবে এবং আরও দেখিবে, স্থানটি চারিদিকে কয়েকতলা উঁচু বাড়ীতে ঘেরা। কেবল একশত ফিটের মত জায়গায় কোন বাড়ী ছিল না, পাঁচ ফিট উচ্চ দেয়াল ছিল। যখন অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণে মরণাহত জনতা পলাইবার পথ পাইল না, তখন সহস্র সহস্র ব্যক্তি প্রাচীরের দিকে ধাবিত হইল এবং উহা লঙ্ঘন করিতে চেষ্টা করিল, জনতার পলায়ন বন্ধ করিবার জন্য দেয়ালের দিকে লক্ষ্য করিয়া (আমাদের গৃহীত সাক্ষ্য হইতে এবং প্রাচীরে অসংখ্য বুলেটের দাগ হইতে) গুলি বর্ষণ করা হইয়াছিল।

ঘটনার অবসানে দেয়ালের দুই পার্শ্বে হতাহত নরদেহ বড় বড় স্তূপে পরিণত হইয়াছিল। বৎসরের শেষে (১৯১৯) আমি অমৃতসর হইতে রাত্রির ট্রেনে দিল্লী আসিতেছিলাম, কামরায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম উপরের একখানি বার্থ ব্যতীত আর সবগুলিই নিদ্রিত যাত্রীরা দখল করিয়া ফেলিয়াছেন। আমি উপরের খালি বার্থ দখল করিলাম। প্রভাতে দেখিলাম আমার সহযাত্রী সকলেই সাময়িক কর্মচারী, তাঁহাদের মধ্যে একজন বড় গলায় অহঙ্কারের স্বরে কথা বলিতেছিলেন। আমার চিনিতে বিলম্ব হইল না যে ইনিই ডায়ার—জালিয়ানালা বাগের বীর। তিনি অমৃতসরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতেছিলেন, কেমন করিয়া

সমস্ত সহর তাহার করায়ত্ত হইয়াছিল, বিদ্রোহী নগরীকে ভস্মরূপে পরিণত করিবার কি আশ্রয় তিনি অনুভব করিয়াছিলেন কিন্তু কেবল করুণা বশতঃই তাহা করেন নাই। বুঝিলাম, তিনি হাণ্টার অনুসন্ধান কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্য দিয়া লাহোর হইতে ফিরিতেছেন। তাঁহার নির্দম হাবভাব ও কথাবলার ভঙ্গীতে আমি মগ্ন হইলাম। লাল ডোরাকাটা পায়জামা ও ড্রেসিংগাউন পরিয়া তিনি দিল্লী স্টেশনে নামিলেন।

পাঞ্জাবে অনুসন্ধানকালে গান্ধিজীকে আমি ঘনিষ্ঠভাবে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। আমাদের কমিটিতে তিনি প্রায়ই এমন অভিনব প্রস্তাব তুলিতেন যে, কমিটি তাহা অনুমোদন করিতে পারিতেন না কিন্তু তিনি যুক্তিতর্কসহকারে ঐগুলি গ্রহণ করিবার জগ্ন অনুরোধ করিতেন এবং পরবর্তী ঘটনায় তাঁহার দূরদর্শিতা আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তাঁহার রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টির উপর আমার বিশ্বাস জন্মিল।

পাঞ্জাবের ঘটনা এবং অনুসন্ধান আমার পিতার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিল। তাঁহার আইন ও নিয়মতত্ত্বনিষ্ঠার দৃঢ়ভিত্তি ইহাতে বিচলিত হইল। তাঁহার মন পরবর্তী কালের পরিবর্তনের জগ্ন প্রস্তুত হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে তিনি প্রাচীন মডারেটীয় ভূমি হইতে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। এলাহাবাদের প্রধান মডারেট সংবাদপত্র ‘দি লীডার’-এর উপর বিরক্ত হইয়া তিনি ১৯১৯-এর গোড়ায় এলাহাবাদ হইতে ‘দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট’ নামক একখানি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। কাগজখানি জনপ্রিয়তার দিক দিয়া সাফল্য লাভ করিল।

কিন্তু সূচনা হইতেই পরিচালনা ব্যাপারে এক আশ্চর্য্য অক্ষমতা ইহার প্রতিষ্ঠার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে লাগিল। এই পত্রিকার সহিত জড়িত ডাইরেট্টরগণ, সম্পাদকগণ এবং কার্যপরিচালনা বিভাগ সকলেই ইহার জগ্ন অল্লবিস্তর দায়ী। আমিও ইহার একজন ডাইরেট্টর ছিলাম। কিন্তু এই কাজে আমার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা ছিল না। সমস্ত ঝগড়া, কাগজ সংক্রান্ত গল্পগুজব নৈশ দুঃস্বপ্নের মত আমাকে ভারাক্রান্ত করিল। আমি এবং পিতা পাঞ্জাবে চলিয়া গেলাম। আমাদের দীর্ঘ অনুপস্থিতির মধ্যে কাগজের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইয়া অবশেষে উহা অর্ধসঙ্কটে পতিত হইল। ১৯২০-২১এ যদিও ইহা একবার মাথাচাড়া দিয়াছিল, কিন্তু এই আঘাত সামলাইতে পারিল না। অবশেষে ১৯২৩এ ইহা বন্ধ হইয়া গেল। সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারীর

অভিজ্ঞতা আমার চিন্তে যে ভীতির সঞ্চার করিল, তাহার ফলে সংবাদপত্রের ডাইরেক্টরের দায়িত্বগ্রহণ করিতে আমি বরাবর অস্বীকার করিয়াছি। অবশ্য কারাগার এবং বাহিরের অত্যাচার কার্যে উহা করা আমার পক্ষে সম্ভবপরও ছিল না।

১৯১৯এর বড়দিনে পিতা অমৃতসর কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন। পাঞ্জাবের সামরিক আইনের ফলে যে নূতন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা স্বরণ করাইয়া দিয়া কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্ত পিতা ‘মডারেট’ ও ‘লিবারেল’দিগের নিকট আবেগময় আবেদন প্রেরণ করিলেন। (এখন হইতে ‘মডারেটগণ’ নিজেদের ‘লিবারেল’ এই নামে পরিচয় দিতে লাগিলেন)। পিতা লিখিলেন, “পাঞ্জাবের ক্ষতবিক্ষত হৃদয়” তাঁহাদের আহ্বান করিতেছে। কিন্তু পিতা অভিপ্রেত উত্তর পাইলেন না। ‘মডারেটগণ’ যোগ দিতে অস্বীকার করিলেন। তাঁহারা তখন নূতন ‘রিফর্মের’ প্রতি লালায়িত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন। এই প্রত্যাখ্যানে পিতা আহত হইলেন এবং তাঁহার ও লিবারেলদের মধ্যে ব্যবধান বিস্তৃততর হইল।

অমৃতসর কংগ্রেস প্রথম গান্ধী কংগ্রেস। লোকমাত্র তিলকও এই কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ প্রতিনিধি এবং সমবেত বিশাল জনতা যে গান্ধীর নেতৃত্বের জগ্গাই উৎসুক হইয়াছিল তাহাতে লেশ মাত্রও সন্দেহ ছিল না। ‘মহাত্মা গান্ধী কি জয়’ ধ্বনিতে এই সময় হইতেই ভারতীয় রাজনৈতিক গগন মুখরিত হইতে থাকে। সচা অস্বরী-মুক্ত আলীভ্রাতৃদ্বয় আসিয়া কংগ্রেসে যোগদান করিলেন এবং জাতীয় আন্দোলন নূতন সুরে ও রূপে আত্মপ্রকাশ করিল।

মহম্মদ আলী শীঘ্রই খিলাফত ডেপুটেশন লইয়া ইউরোপে চলিয়া গেলেন। ভারতীয় খিলাফত কমিটি ক্রমে ক্রমে গান্ধীজীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার অহিংস অসহযোগের ভাব লইয়া নাড়াচাড়া আরম্ভ করিল। ১৯২০এর জানুয়ারী মাসে দিল্লীতে খিলাফত নেতৃবৃন্দ, মৌলবী ও উলেমাদের একটি সভার কথা আমার মনে আছে। কথা হইল, বড়লাটের নিকট এক খিলাফত ডেপুটেশন প্রেরিত হইবে, গান্ধীজীও তাহাতে যোগ দিবেন। গান্ধীজী দিল্লী আসিবার পূর্বেই প্রচলিত নিয়মানুসারে আবেদনের একখানা খসড়া বড়লাটের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। গান্ধীজী আসিয়া খসড়াখানি পাঠ করিয়া তীব্র আপত্তি প্রকাশ করিলেন। এবং কি, ইহাও বলিলেন, উহা বিশেষভাবে পরিবর্তিত না হইলে তিনি ডেপুটেশনে

গান্ধিজীর অভ্যুদয়—সভ্যাগ্রহ ও অসহযোগ

যোগ দিবেন না। তাঁহার আপত্তির কারণ এই যে, খসড়াখানিতে অনাবশ্যক বাগাড়ম্বর করা হইয়াছে। মুসলমানদের সর্বনিম্ন দাবী স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নাই। তাঁহার মতে ইহা কি বড়লাট, কি ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট, কি জনসাধারণ, এমন কি তাঁহাদের নিজেদের প্রতিও সুবিচার করা হয় না। অসম্ভব অতিরিক্ত দাবী করিয়া তাহার জ্ঞান চেষ্টা না করা অপেক্ষা স্পষ্টভাবে সর্বনিম্ন দাবী উল্লেখ করিয়া তাহা পূরণের জ্ঞান আশ্রয় চেষ্টা করা ভাল। যদি সভ্যই তাঁহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকেন তাহা হইলে ইহাই একমাত্র সঙ্গত ও সম্মানজনক পন্থা।

এই শ্রেণীর যুক্তি ভারতের রাজনীতি ও অগ্রগতি ক্ষেত্রে অভিনব। আমরা বাহ্যিক বাগাড়ম্বর ও আলঙ্কারিক ভাষায় অভ্যস্ত এবং সর্বদাই দরকষাকষি করিয়া জিতিয়া যাইবার মতলব আমাদের মনের মধ্যে থাকে। যাহা হউক, গান্ধিজীর মতই গৃহীত হইল। তিনি বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট প্রেরিত খসড়ার ক্রটি ও অস্পষ্টতা উল্লেখ করিয়া এক পত্র লিখিলেন এবং উহার আরও কয়েকটি নূতন বিষয় জুড়িয়া দিলেন। ইহাতে তিনি সর্বনিম্ন দাবী উল্লেখ করিলেন। উত্তরে বড়লাট নূতন বিষয়গুলি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া জানাইলেন যে, পূর্বের খসড়াই যথেষ্ট। গান্ধিজী ভাবিলেন, তাঁহার ও খিলাফত কমিটির মনোভাব স্পষ্ট রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব তিনি ডেপুটিশনে যোগ দিলেন।

ইহা স্পষ্টই বোঝা গেল যে, গভর্নমেন্ট খিলাফত কমিটির দাবী মানিয়া লইবেন না এবং সংঘর্ষ অনিবার্য। মোলবী উলেমাদের সহিত দীর্ঘ আলোচনা শুরু হইল, অহিংসা ও অসহযোগ, বিশেষভাবে অহিংসা লইয়া বিচার চলিল। গান্ধিজী তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, অহিংসা সর্বতোভাবে গ্রহণ করিবার প্রতিশ্রুতি যদি তাঁহারা দেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাদের সহিত যোগ দিবেন। কিন্তু অহিংসা সম্বন্ধে কোন বিধা সঙ্কোচ অথবা আপোষের ভাব থাকিতে পারিবে না। মোলবীদের পক্ষে এই নীতি পূর্ণরূপে বুঝিয়া উঠা সহজ ছিল না, তথাপি তাঁহারা স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা মূলনীতি হিসাবে নহে, কৌশলরূপেই ইহাকে গ্রহণ করিবেন, কেন না মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জ্ঞান বলপ্রয়োগ করা তাঁহাদের ধর্ম্মে নিষিদ্ধ নহে। ১৯২০ সালে কংগ্রেসের নীতি ও খিলাফত আন্দোলন একই লক্ষ্যে পাশাপাশি চলিতে লাগিল। কংগ্রেস গান্ধিজীর অসহযোগ গ্রহণ করায় উভয় আন্দোলন মিশ্রিত হইল। খিলাফত কমিটি প্রথম এই কার্য্যপদ্ধতি গ্রহণ এবং ১লা আগষ্ট হইতে আন্দোলন আরম্ভ হইবে বলিয়া ঘোষিত হয়।

বৎসরের প্রথম ভাগে এলাহাবাদে এই কার্যপদ্ধতি বিবেচনা করিবার জন্ত মুসলমানদের এক সভা (আমার মনে হয়, মুসলিম লীগের কাউন্সিল) আহূত হইয়াছিল। সৈয়দ রেজা আলীর গৃহে অধিবেশন হয়। মোলানা মহাম্মদ আলী তখন ইউরোপে; কিন্তু সৌকত আলী উপস্থিত ছিলেন। এই সভার কথা আমার মনে আছে, কেন না ইহার আলোচনা দেখিয়া আমি অত্যন্ত নিরাশ হইয়াছিলাম। সৌকত আলী অবশ্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন কিন্তু অগ্রাগ্র সকলে বিরসবদনে অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহারা ইহার প্রতিবাদ করিতে সাহস পাইতেছিলেন না অথচ ইহার দায়িত্ব গ্রহণ করিবার মত মনোভাবও তাঁহাদের ছিল না। এই শ্রেণীর লোক কি ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া বিপ্লব আন্দোলন পরিচালনা করিতে সক্ষম? গান্ধিজী বক্তৃতা করিলেন, তাহা শুনিয়া প্রত্যেকের মনে অধিকতর ভীতির ছায়া ফুটিয়া উঠিল। তাঁহার বক্তৃতায় নেতৃত্বের আশ্রয় ছিল, তিনি বিনয়ী অথচ কঠিন হীরকখণ্ডের জায় উজ্জ্বল, তাঁহার বাক্য মৃদুমধুর অথচ অনমনীয় ও ঐকান্তিক। তাঁহার দৃষ্টি স্নিগ্ধ ও গভীর অথচ তাহার মধ্যে উগ্রশক্তি ও দৃঢ়সঙ্কল্পের বজ্রাঘি। তিনি বলিলেন, এক শক্তিশালী বিরুদ্ধবাদীর সহিত বৃহৎ সংঘর্ষের সূত্রপাত হইবে, আপনারা যদি ইহা চাহেন তাহা হইলে সর্বস্ব হারাইবার জন্ত প্রস্তুত হইতে হইবে, আপনাদিগকে অহিংসা ও অগ্রাগ্র শৃঙ্খলা যথাযথ ভাবে পালন করিতে হইবে। যুদ্ধ বাধিলে সামরিক আইন অনিবার্য হইয়া উঠে। আমাদের অহিংস যুদ্ধেও যদি আমরা জয়লাভ করিতে চাহি তাহা হইলে আমাদের একনায়কত্ব ও সামরিক আইনের অনুরূপ কঠিন শৃঙ্খলা অঙ্গীকার করিতে হইবে। আপনারা আমাকে পদাঘাতে তাড়াইয়া দিতে পারেন, আমার মস্তক দাবী করিতে পারেন, অথবা ইচ্ছামত যে-কোন শাস্তি দিতে পারেন কিন্তু যত দিন আপনারা আমাকে নেতা বলিয়া স্বীকার করিবেন, তত দিন আমার সর্ব মানিতে হইবে, আমার একনায়কত্ব স্বীকার করিতে হইবে, সামরিক আইনের দৃঢ়শৃঙ্খলা মানিতে হইবে। কিন্তু একনায়কত্ব থাকিবে আপনাদের সদিচ্ছা, সহযোগিতা ও স্বেচ্ছায় স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যে মুহূর্ত্তে ইচ্ছা আমার ভাবান্তর দেখিলে আমাকে দূরে নিক্ষেপ করিবেন, আমি কোন অভিযোগ করিব না।

এই শ্রেণীর সামরিক উপমা ও অনমনীয় আবেগময় দৃঢ়তা দেখিয়া আমার আশ্রয় প্রোভারই বুক কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু সৌকত আলী ইহা যাত্রীদের পিঠ চাপড়াইয়া খাড়া রাখিলেন। যখন ভোটের সময়

গান্ধিজীর অত্যাচার—সত্যগ্রহ ও অযত্নসর

আসিল তখন অধিকাংশই নিরীহ ও সলজ্জভাবে প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলেন এবং ইহা যুদ্ধেরই জন্ম।

সভা হইতে নাহিরে আসিয়া আমি গান্ধিজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এক বৃহৎ সংঘর্ষের কি ইহাই পথ? আমি প্রত্যাশা করিয়াছিলাম উৎসাহ উদ্দীপনাময় ভাষা, জলন্তচক্ষু, কিন্তু তাহার পরিবর্তে দেখিলাম একদল ভীক্ৰ নিম্প্রভ মধ্যবয়স্ক লোক। ইহারা কেবল জনমতের ভয়ে ভোট দিয়াছে। অবশ্য মুসলিম লীগের এই সফল সদস্যের অতি অল্প সংখ্যক লোকই আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনেকে নিরাপদ সরকারী চাকুরীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুসলিম লীগ তখন এবং পরবর্তীকালেও মুসলমান জনমতের প্রতিনিধি স্থানীয় ছিল না। ১৯২০-এর খিলাফত কমিটি প্রকৃত শক্তিশালী ও প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল এবং এই কমিটি উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

১লা আগষ্ট গান্ধিজী অসহযোগ আন্দোলনের উদ্বোধন দিবস বলিয়া ঘোষণা করিলেন। অবশ্য উহা তখনও কংগ্রেসে আলোচিত ও গৃহীত হয় নাই। ঐ দিবসই লোকমাত্রে বোম্বাইয়ে দেহত্যাগ করেন এবং সিদ্ধোত্তমণ সমাপ্ত করিয়া ঐ দিন গান্ধিজী বোম্বাইয়ে উপস্থিত হন। সর্বজনপ্রিয় পরলোকগত মহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্ম বোম্বাই সহরে লক্ষ লক্ষ নরনারীর শোকযাত্রায় আমিও গান্ধিজীর সহিত যোগ দিয়াছিলাম।

আমার বহিষ্কার এবং তাহার ফলাফল

আমার রাজনীতি, আমার শ্রেণীর, অর্থাৎ—বুর্জোয়া-রাজনীতি। অবশ্য যখন (এখনও বহুল পরিমাণে) রাজনৈতিক আন্দোলন মধ্যশ্রেণীর আন্দোলন। কি মডারেট, কি চরমপন্থী—একই শ্রেণীভুক্ত এবং স্বীয় শ্রেণীমত উন্নতিতে আগ্রহাশ্রিত; কেবল পথ বিভিন্ন। মডারেটরা বিশেষভাবে মুষ্টিমেয় উচ্চশ্রেণীর প্রতিনিধি। এই শ্রেণী বৃটিশ শাসনের আমলে সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে, ইহারা বর্তমান প্রতিষ্ঠা ও স্বার্থ বিপন্ন হইবার আশঙ্কায় সহসা কোনও গুরুতর পরিবর্তনের বিরোধী, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ও বড় জমিদারশ্রেণীর সহিত ইহাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। চরমপন্থীদের মধ্যশ্রেণীর নিম্নতর স্তরের প্রতিনিধিও ছিল। ইহা ছাড়া যুদ্ধের ফলে বর্ধিত কারখানার শ্রমিকদের কতকগুলি স্থানীয় সমিতি ছিল, কিন্তু তাহার বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল না। কৃষক শ্রেণী অন্ধ, দারিদ্র্য-পীড়িত, অদৃষ্ট-নির্ভর, নিশ্চেষ্ট এবং প্রত্যেকের দ্বারাই শোষিত—গভর্নমেন্ট, জমিদার, কুসিদ্ধজীবী, ক্ষুদ্র কর্মচারী, পুলিশ, উকিলপুত্রোহিত, মোল্লা। সংবাদপত্রের পাঠকগণ বৃষ্টিতেই পারিবে না যে, ভারতে বিশাল কৃষকশ্রেণী এবং লক্ষ লক্ষ শ্রমিক রহিয়াছে কিম্বা তাহাদের কোন মূল্য আছে। ইংরাজপরিচালিত গ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলি বড় বড় রাজপুরুষদের কথা, বৃহৎ নগরীর ইংরাজদের সামাজিক জীবন, শৈলনিবাসগুলির খানাপিনা, নিমন্ত্রণ সভা, রন্ধন পোষাকে বলনৃত্য এবং সখের নাট্যাভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণে পূর্ণ থাকে। ভারতবাসীর দিক হইতে ভারতীয় রাজনীতি আলোচনা তাহারা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেন। এমন কি কংগ্রেসের অধিবেশনের বিবরণও শেষের দিকের পাতায় সংক্ষেপে প্রকাশিত হয়। এই সংবাদগুলির কোন মূল্য আছে তাহারা স্বীকার করেন না। কিন্তু যখন কোন খ্যাত কি অখ্যাত ভারতীয়, কংগ্রেসকে গালি দিয়া অথবা তাহার ঔদ্ধত্যের তীব্র সমালোচনা করিয়া কোনও প্রবন্ধ লেখেন তাহা সাদরে প্রকাশিত হয়। সময় সময় ধর্মঘটের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হয়, দাঙ্গাহাঙ্গামা বাতীত পল্লী অঞ্চলের সংবাদগুলিকে কদাচিৎ প্রাধান্য দেওয়া হয়।

আমার বহিকার ও তাহার ফলাফল

ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি য্যাংলো ইণ্ডিয়ান ভোলের নকল করিলেও জাতীয় আন্দোলনকে বহুলাংশে প্রাধান্য দিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া ভারতীয়দের বড় অথবা ছোট চাকুরীতে নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি প্রভৃতি লইয়া আলোচনা হয় এবং কোন কর্মচারীর বিদায় সম্বন্ধনায় যখন “অতিরিক্ত উৎসাহের সঞ্চার” হইতেই হইবে, তখন তাহাও প্রাধান্য দিয়া প্রকাশ করা হয়। গভর্নমেন্ট যখন পল্লীঅঞ্চলে জরিপের কাজ আরম্ভ করেন, যাহার ফলে সরকারী রাজস্ব বৃদ্ধি অনিবার্য তখন জমিদারদের পকেটে হাত পড়ে বলিয়া কাগজে হৈ চৈ শূক হয়। গরীব কৃষকের ইহার মধ্যে স্থান নাই। এই সকল খবরের কাগজের মালিক ও পরিচালক জমিদার ও ব্যবসায়ীরা এবং এইগুলিকেই আমরা “শ্রাশনালিষ্ট” বা জাতীয়তাবাদী পত্রিকা বলিয়া থাকি।

প্রথম দিকে কংগ্রেস যে সব অঞ্চলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই সেখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দাবী করিয়া প্রতি বৎসর প্রস্তাব পাশ করিত, যাহাতে জমিদারদিগের স্থায়ী অধিকার সাব্যস্ত হয়। রায়তদের কথা উল্লেখ করা হইত না।

কিন্তু গত বিশ বৎসরে জাতীয় আন্দোলনের প্রসারতা হেতু অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, এখন ভারতীয় পাঠকগণের মনোরঞ্জন করিবার জন্য ইংরাজী চালিত পত্রিকাগুলি পর্যন্ত ভারতীয় রাজনৈতিক সমস্যার জন্য কিছু স্থান দিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাও তাঁহারা নিজেদের অভিকৃতি অনুযায়ী করিয়া থাকেন। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির দৃষ্টি কিয়ৎ পরিমাণে উদার হইয়াছে, কৃষক ও শ্রমিকদের প্রতি সদয় সহানুভূতি প্রকাশ করা হয়; কেন না বর্তমানে ইহা একটা ফাসান এবং তাহাদের পাঠকেরাও কৃষি ও কারখানার সমস্যা লইয়া ইদানীং আলোচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু পূর্বের মত এখনও তাঁহারা তাহাদের মালিক ভারতীয় ব্যবসায়ী ও জমিদার শ্রেণীর স্বার্থই সমর্থন করিয়া থাকেন। বহু দেশীয় নৃপতিও এই সকল সংবাদপত্রে টাকা খাটাইয়া থাকেন এবং টাকার পূর্ণ সার্থকতা লাভের দিকেও তাহাদের দৃষ্টি থাকে। তথাপি এই শ্রেণীর সংবাদপত্র নিজেদের কংগ্রেসপন্থী বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন যদিও তাঁহাদের পরিচালকগণ কংগ্রেসের সদস্য পর্যন্ত নহেন। কিন্তু কংগ্রেস জনপ্রিয় বলিয়া অনেক ব্যক্তি ও দল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঐ নাম ব্যবহার করিয়া থাকেন; অবশ্য যে সকল সংবাদপত্র অধিকতর অগ্রসর হইতে চায় তাহাদিগকে মোটা জরিমানা, এমন কি, কঠোর প্রেস আইন ও সংবাদ-নিয়ন্ত্রণের চাপে অপঘাত মৃত্যুর ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিতে হয়।

জওহরলাল নেহরু

১৯২০ সালে কারখানার শ্রমিক অথবা কৃষিজুরদের অবস্থা সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম। আমার রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিধি মধ্যাশ্রমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অবশ্য আমি ভয়াবহ দারিদ্র্য ও দুঃখের কথা জানিতাম ও ভাবিতাম ভারতবর্ষ রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাইলে তাহার প্রথম কর্তব্য হইবে এই দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং তাহার সহিত অপরিহার্য মধ্যাশ্রমের প্রত্যক্ষ আমার নিকট পরবর্তী সোপান বলিয়া মনে হইত। গান্ধিজীর চম্পারণ (বিহার) এবং কায়রার (গুজরাট) কৃষক আন্দোলনের পর আমি কৃষকদের সমস্যাগুলির প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিলাম। কিন্তু ১৯২০-এর রাজনৈতিক ঘটনাগুলির এবং আগতপ্রায় অসহযোগ আন্দোলনের সম্ভাবনায় তখন আমার মনের সবখানি জুড়িয়া ছিল।

পরবর্তীকালে রাজনীতিক্ষেত্রে গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিবার একান্ত আকাঙ্ক্ষা আমি এই সময় হইতেই অনুভব করিতে লাগিলাম। একদিন আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমি সহসা কৃষকদের সংস্পর্শে আসিলাম, ইহা এক আশ্চর্য ঘটনা।

আমার মাতা এবং কমলা (আমার স্ত্রী) অন্তর্স্থ বলিয়া ১৯২০-এর মে মাসের প্রথমে তাঁহাদিগকে লইয়া মুসৌরীতে গেলাম। আমার পিতা তখন একজন বড় রাজার মামলা লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, তাঁহার বিরুদ্ধে ছিলেন মিঃ সি আর দাশ। আমরা মুসৌরীর শ্রভয় হোটেলে উঠিলাম। তখন ইংরাজ ও আফগান প্রতিনিধিদের মধ্যে সন্ধির কথাবার্তা মুসৌরীতে চলিতেছিল। (আমায়ুল্লার সিংহান আরোহণের পর ১৯১৯ এ আফগান যুদ্ধের অব্যবহিত পরের ঘটনা) আফগান প্রতিনিধিরাও শ্রভয় হোটেলে ছিলেন। তাঁহারা স্বতন্ত্র থাকিতেন, স্বতন্ত্র ভোজন করিতেন এবং কখনও সাধারণ বৈঠকখানায় আসিতেন না। আমার তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কোনও কৌতূহল ছিল না। এক মাসের মধ্যে কদাচিৎ কাহাকেও দেখিয়াছি। দেখা হইলেও কোন সম্ভাষণাদি হয় নাই। সহসা একদিন সন্ধ্যাবেলা পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট আসিয়া আমার সহিত দেখা করিলেন এবং প্রাদেশিক গভর্নমেন্টের একখানি পত্র দেখাইয়া বলিলেন যে, আপনি আফগান প্রতিনিধিদের কোনও সংস্পর্শে আসিবেন না—এই মর্মে প্রতিশ্রুতি লইতে আমি আদিষ্ট হইয়াছি। ইহা আমার নিকট অত্যন্ত আশ্চর্য্য মনে হইল। কেননা এক মাস অবস্থানের মধ্যে আমি তাহাদের সহিত দেখা পর্য্যন্ত করি নাই। ভবিষ্যতেও সে সম্ভাবনা অল্প। সুপারিন্টেন্ডেন্টও সেকথা জানিতেন; কেননা তিনি প্রতিনিধিদের উপর নজর রাখিতেন।

আমার বহিষ্কার ও তাহার কলাকল

তাহা ছাড়া গোয়েন্দাবিভাগের অসংখ্য গুপ্তচরের তো কথাই নাই। কিন্তু প্রতিশ্রুতি দেওয়া আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। আমি তাঁহাকে তাহা বলিলাম। তিনি আমাকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও দুই মাসের সুপারিন্টেন্ডেন্টের সহিত দেখা করিতে বলিলেন। আমি তাহাও করিলাম। কিন্তু কিছুতেই যখন আমি প্রতিশ্রুতি দিতে সম্মত হইলাম না, তখন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দেরাহুন জিলা ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য আমার উপর বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হইল। ইহার অর্থ আমাকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মুসৌরী ত্যাগ করিতে হইবে। রুগ্না মাতা এ জ্বীকে ফেলিয়া চলিয়া আসাটা আমার ভাল বোধ হইল না। অন্য দিকে আদেশ অমান্য করাও সম্ভব মনে করিলাম না। তখনও সিভিল ডিসওবিডিয়েন্সের কথা উঠে নাই। অগত্যা আমি মুসৌরী ত্যাগ করিলাম।

যুক্তপ্রদেশের তদানীন্তন গভর্ণর স্যার হারকুট বাটলারের সহিত আমার পিতার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তিনি তাঁহাকে বন্ধুভাবে এক পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, নিশ্চয়ই তিনি (স্যার হারকুট) এরূপ নির্বোধ আদেশ দেন নাই। নিশ্চয়ই সময়ের কোন উর্বর মস্তিষ্কে ইহার জন্ম হইয়াছে। স্যার হারকুট উত্তরে লিখিলেন যে এমন নির্দোষ আদেশ জওহরলাল সহজেই মান্য করিতে পারিত এবং তাহাতে তাহার মর্যাদার কোন লাঘব ঘটিত না। পিতা উত্তরে তাহার সহিত ভিন্ন মত অবলম্বন করিলেন, এবং লিখিলেন, যদিও ইচ্ছা করিয়া আদেশ ভঙ্গের উদ্দেশ্য জওহরলালের নাই তবুও তাহার মাতা ও স্ত্রীর স্বাস্থ্যের জন্য যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলে আদেশ থাকুক বা না থাকুক সে মুসৌরীতে ফিরিয়া যাইবে। তাহাই ঘটিল। আমার মাতার শারীরিক অবস্থা মন্দ, খবর পাইয়া তৎক্ষণাৎ আমি ও পিতা মুসৌরী যাত্রা করিলাম। যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে আমরা তারে সংবাদ পাইলাম আদেশ প্রত্যাহত হইয়াছে। মুসৌরীতে পৌঁছিয়া পরদিন প্রভাতে প্রথম বাহার সহিত আমার দেখা হইল তিনি একজন আফগান, আমার শিশুকন্যাকে কোলে লইয়া হোটেলের উঠানে দাঁড়াইয়া আছেন। আমি জানিলাম, তিনি একজন গচিব ও আফগান প্রতিনিধিদলের সদস্য। আমার বহিষ্কারের অব্যবহিত পরেই সংবাদপত্রে তাহা পাঠ করিয়া তাঁহার কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং প্রতিনিধিদলের নেতা প্রত্যহ এক বুড়ি ফল ও পুষ্পাদি আমার মাতার নিকট পাঠাইতেন।

পিতা ও আমি পরে দুই-এক জন প্রতিনিধির সহিত আলাপ করিয়াছিলাম। তাঁহারা আমাদের আফগানিস্থানে যাইবার জন্য সাদর নিমন্ত্রণ

জওহরলাল নেহরু

করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সে স্বেচ্ছা আমরা গ্রহণ করিতে পারি নাই। এবং আমি জানি না সে দেশের নূতন আমলে এখনও সে নিমন্ত্রণের মেয়াদ আছে কি না।

মুসৌরী হইতে বহিষ্কারের আদেশের ফলে আমাকে দুই সপ্তাহ এলাহাবাদে থাকিতে হইয়াছিল। এই সময় আমি কৃষক আন্দোলনে জড়াইয়া পড়িলাম। পরবর্তী কালে এই ঘনিষ্ঠতা আমার মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সময় সময় বিম্বিত হইয়া ভাবি বহিষ্কারের ফলে যদি এই সময় আমি এলাহাবাদে না থাকিতাম তাহা হইলে এই ষোণাষোণ ঘটিত না। হইতে পারে শীঘ্র বা বিলম্বে আমি কৃষক আন্দোলনে গিয়া পড়িতাম কিন্তু তাহার কারণ ও ভঙ্গী হইত স্বতন্ত্র এবং আমার মনে প্রতিক্রিয়াও হইত অল্প রকমের।

যতদূর স্মরণ হয়, ১৯২০এর জুন মাসের প্রথম ভাগে প্রায় ২ শত কৃষক প্রতাপগড় জিলার পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী পল্লী-অঞ্চল হইতে এলাহাবাদ সহরে ইাটিয়া আসিয়াছিল। স্থানীয় প্রধান রাজনৈতিকগণের দৃষ্টি তাহাদের দুঃখভুক্ষার প্রতি আকর্ষণ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। তাহাদের নেতা ছিল রামচন্দ্র নামক এক ব্যক্তি। সে অবশ্য স্থানীয় কৃষক ছিল না। আমি শুনিলাম, কৃষকেরা যমুনার কোনও একটি ঘাটে নদীতীরে আস্তানা কেলিয়াছে। কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে তাহাদের সহিত দেখা করিতে গেলাম। তাহারা আমাদের তালুকদারদের জোর করিয়া টাকা আদায়ের কথা, অমানুষিক অত্যাচারের কথা এবং তাহাদের অবস্থা যে কিরূপ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে তাহা বর্ণনা করিল। তাহারা আমাদের নিকট প্রার্থনা করিল, যাহাতে আমরা তাহাদের সহিত গিয়া এ বিষয়ে অনুসন্ধান করি। এইভাবে এলাহাবাদ আসায় তালুকদারদের ক্রুদ্ধ প্রতিশোধ প্রবৃত্তি হইতে রক্ষা করিবার আবেদনও তাহারা জানাইল। তাহারা কোন যুক্তি মানিতে চাহে না, আমাদেরকে অস্ত্র আবেগে আঁকড়াইয়া ধরিল, অগত্যা আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম দুই দিনের মধ্যেই তাহাদের অঞ্চলে যাইব।

রেলওয়ে, এমন কি, পাকা রাস্তা! হইতে বহুদূরের গ্রামগুলিতে আমি কতিপয় সহকর্মীসহ তিন দিন যাপন করিলাম। ইহা আমার নিকট নূতন আবিষ্কার! আমি দেখিলাম, পল্লীবাসীরা এক অপূর্ব উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনায় মতিয়া উঠিল। মুখে মুখে সংবাদ দিলে বিশাল জনতা হইত, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে লোকমুখে সংবাদ ছুটিত, কুটির তাগ করিয়া পিপীলিকাশ্রেণীর মত নরনারী বালকবালিকা প্রান্তর-পথ বাহিয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইত। অথবা ‘সীতারাম’ বলিয়া একবার চীৎকার করাই

আমার বহিষ্কার ও তাহার ফলাফল

যথেষ্ট—‘সীতা রা-আ-ম’ আকাশে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া দূরদূরান্তে জনসম্মুখে উচ্চকিত করিয়া তুলিত; জলশ্রোতের মত জনশ্রোত ছুটিয়া আসিত। এই সকল নরনারীর পরিধানে জীর্ণ মলিন বসন, বদনে জলন্ত উৎসাহ, নয়নে এক মহৎ সম্ভাবনার প্রতীক্ষা দীপ্তি, যেন এই মুহূর্তেই কোন ইন্দ্রজাল ঘটবে, তাহাদের দীর্ঘ দুঃখনিশার অবসান হইবে।

তাহাদের স্নেহ আমাদের উপর বর্ষিত হইল। তাহারা প্রীতিসিদ্ধ আশীর্ষক নয়নে আমাদের মুখের পানে চাহিল, যেন আমরা আশার সংবাদ লইয়া আসিয়াছি। যেন আমরা তাহাদিগকে প্রত্যাশিত স্বথস্বর্গে লইয়া যাইবার অগ্রদূত। তাহাদিগের পানে চাহিয়া তাহাদের দুঃখশা ও অজস্র কৃতজ্ঞতায় আমি লজ্জায় দুঃখে মরমে মরিয়া গেলাম, নিজের স্বচ্ছন্দ সুখী আরামের জীবনের জগ্ন লজ্জা বোধ করিলাম। ভারতের অর্দ্ধজন এই বিশালজনসম্মুখে অগ্রাহ করিয়া আমাদের নাগরিক সঙ্কীর্ণ রাজনীতির জগ্ন লজ্জিত হইলাম। ভারতের এই অসহনীয় দারিদ্র্য ও অধঃপতন দেখিয়া ক্ষোভে মিয়মান হইলাম, নগ্ন ক্ষুধিত বক্র মেহমুদ ও সম্পূর্ণরূপে অসহায় ভারতের এক নবীন চিত্র আমার মানসপটে উদ্ভিত হইল। নগরীর এই ক্ষণিকের অতিথির প্রতি তাহাদের বিশ্বাস দেখিয়া আমি বিব্রত হইলাম এবং অভিনব দায়িত্ব ভাবিয়া ভীত হইলাম। তাহাদের অনন্ত দুঃখকাহিনী শুনিলাম, ক্রমবদ্ধিত খাজনা, বেআইনী আবোয়াব, জমি ও মৃৎপুটীর হইতে উচ্ছেদ; চারি দিকে মাংসপ্রত্যাশী শকুনের দল—জমিদারের গোমতা, মহাজন ও পুলিশ। উদযান্ত পরিশ্রম করিয়া যাহা উৎপন্ন হয় তাহা তাহাদের নহে, তাহাদের প্রাপ্য পুরস্কার পদাঘাত, গালি এবং ক্ষুধিত উদর। উপস্থিত কৃষকগণের মধ্যে অনেকেই ভূমিশূন্য, জমিদার তাহাদের উচ্ছেদ করিয়াছে, দাঁড়াইবার মত এক কানি জমি কি একটি কুটির পর্য্যন্ত নাই। জমি উর্বর, খাজনা অত্যধিক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত এবং জমির উমেদার কম নহে। সকলেই জমির কান্দাল, এই অবস্থার সুযোগ লইয়া জমিদারেরা আইনত নির্দিষ্ট হারের অতিরিক্ত খাজনা বৃদ্ধি করিতে অক্ষম হইয়া নানা প্রকার বে-আইনী আবোয়াব দাবী করিয়া থাকে। রায়তেরা উপায়াস্তরহীন হইয়া মহাজনের নিকট টাকা কজ্জ করিয়া জমিদারের অগ্ৰাঘ্য দাবী পূরণ করে এবং পরে দেনা শোধ দিতে না পারিয়া এবং খাজনা দিতে অপারগ হইয়া ভূমি হইতে উৎখাত হইয়া সর্বস্বান্ত হয়।

এই প্রথা দীর্ঘকাল চলিয়া আসিতেছে এবং কৃষকগণেরও ক্রমবর্দ্ধমান

জগদ্বরলাল নেহরু

দারিদ্র্যের সূচনা হইয়াছে অনেকদিন। হঠাৎ কি ঘটিল যাহার ফলে পল্লী অঞ্চলে এই জাগরণ? আর্থিক অবস্থা, অবশ্য অযোধ্যার সর্বত্রই একরূপ। ১৯২০-২১এর কৃষক আন্দোলন প্রধানতঃ প্রতাপগড়, রায়বেরিলি ও ফৈজাবাদ এই তিনটি জেলায় আবদ্ধ ছিল। ইহা একটি ব্যক্তি—রামচন্দ্রের নেতৃত্বের ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। লোকে তাঁহাকে বলিত বাবা-রামচন্দ্র।

রামচন্দ্র ছিল মহারাষ্ট্র বাসী। সে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হইয়া ফিজিতে গিয়াছিল। দেশে ফিরিয়া যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিতে করিতে অযোধ্যায় আসিয়া উপস্থিত হয়। সে গ্রামে গ্রামে তুলসীদাসের রামায়ণ গান করিত ও কৃষকগণের দুঃখদুর্দশার কথা শুনিত। সে সামান্য লেখাপড়া জানিত এবং কিয়ৎপরিমাণে কৃষকদিগকে ঠকাইয়া স্বার্থসিদ্ধি করিত কিন্তু সজ্ঞ গড়িবার ক্ষমতা ছিল তাহার আশ্চর্য্য। সে কৃষকদিগকে ঘন ঘন সভা করিয়া নিজেদের দুঃখদুর্দশার আলোচনা করিতে শিখাইয়াছিল এবং এইভাবে তাহাদের মধ্যে একেবারে অল্পভূতি জাগাইয়াছিল। মাঝে মাঝে বৃহৎ জনসভায় আসিয়া তাহারা নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে চেতনা লাভ করিত। “সীতারাম” বহুকাল প্রচলিত সাধারণ ধ্বনি কিন্তু রামচন্দ্র তাহার মধ্যে সংগ্রামের জ্বোতনা সঞ্চার করিয়াছিল, উহা বিপদসূচক সঙ্কেতধ্বনির অল্পরূপ করিয়া তুলিয়াছিল এবং গ্রামগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছিল। ফৈজাবাদ, প্রতাপগড়, রায়বেরিলি সীতারামের প্রাচীন কাহিনীতে পরিপূর্ণ—এই জেলাগুলি ছিল প্রাচীন অযোধ্যা রাজ্য—এবং জনসাধারণের প্রিয় পুস্তক হইল তুলসীদাসের হিন্দী রামায়ণ। রামচন্দ্র এই রামায়ণ আবৃত্তি করিত এবং বক্তৃতা কালে তুলসীদাসের বচন উদ্ধৃত করিত। কৃষকদিগকে বহুল পরিমাণে সজ্ঞবদ্ধ করিয়া সে তাহাদিগকে অনেকপ্রকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল এবং কাল্পনিক আশায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার কোনও নির্দিষ্ট কার্য্যপদ্ধতি ছিল না, সে জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া অপরের স্বন্ধে দায়িত্ব নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিত। এই কারণেই সে কৃষকদিগকে এলাহাবাদে লইয়া আসিয়াছিল, যাহাতে লোকে তাহাদের আন্দোলনের প্রতি সহায়ত্বভূতীল হয়।

রামচন্দ্র আরও এক বৎসর কাল কৃষক আন্দোলনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। দুই বার কি তিনবার জেলেও গিয়াছে, কিন্তু পরে দেখা গেল, সে যেমন দায়িত্বজ্ঞানহীন, তেমনি বিশ্বাসের অযোগ্য।

অযোধ্যা কৃষক আন্দোলনের উপযুক্ত ভূমি। ইহা তালুকদারের দেশ।

আমার বহিষ্কার ও তাহার কলাকল

তাহারা নিজেদের “বাসারনস অফ আউথ” বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন জমিদারীপ্রথা এখানে সর্বাধিক কদর্যরূপে বিকশিত। জমিদারের শোষণ ক্রমশঃ অসহ্য হইতেছে, ভূমিশূণ্য কৃষকের সংখ্যা বাড়িতেছে, এবং এখানে প্রজারা একই শ্রেণীর বলিয়া অস্বাভাবিক প্রচেষ্টার অমূল্য।

ভারতবর্ষকে চৌটিমুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়, একদিকে জমিদারী প্রথা ও বড় বড় জমিদার, অতীতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাষী-মালিক। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম রহিয়াছে। বালুয়া, বিহার, আগ্রা ও অযোধ্যা লইয়া যুক্তপ্রদেশে জমিদারী প্রথা প্রচলিত। কৃষক-মালিকদের অবস্থার তুলনায় তরুণ ও ভাল হইলেও সেখানেও দুঃখ দুর্দশা আছে। পাজাব ও গুজরাটের কৃষকগণ (চাষী-মালিক) জমিদারী অঞ্চলের রায়ত হইতে বেশী সুবিধা পাইয়া থাকে। জমিদারীর অধীনে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজা আছে—দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত, স্বত্বহীন রায়ত, জোতদারের অধীনে কুকাবী প্রজা প্রভৃতি। ইহাদের পরস্পরের স্বার্থ এত বিপরীত ও স্ববিরোধী যে তাহারা এক-বন্ধ হইয়া কোন কাজ করিতে পারে না। যাহা হউক অযোধ্যায় ১৯২০-এ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট অথবা দীর্ঘ মেয়াদী প্রজা ছিল না, অধিকাংশই অল্পদিনের চুক্তিবদ্ধ প্রজা এবং যে-কেহ অধিক নজর দিতে রাজী হইত, প্রজাকে উচ্ছেদ করিয়া তাহাকে জমি দেওয়া হইত। এখানে প্রধানতঃ একই শ্রেণীর প্রজা বলিয়া উহাদিগকে সম্মিলিত চেষ্টার জগৎ সম্বন্ধ করা সহজ।

কার্য্যতঃ অযোধ্যায় স্বল্প মেয়াদী প্রজাদেরও অধিকারের কোন স্থায়িত্ব ছিল না। জমিদারেরা খাজানা লইয়া কখনও দাখিলা দেন না; প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার ইচ্ছা হইলে জমিদার সহজেই বাকী খাজানার কথা তুলিতে পারে। এবং প্রজা পক্ষে খাজানা আদায় দেওয়া প্রমাণ করা অসম্ভব। খাজানা ছাড়াও নানাবিধ অদ্ভুত নজর আবোয়াব প্রভৃতি আছে। আমি শুনিয়াছি, কোনও এক তালুকে পঞ্চাশটি বিভিন্ন দফায় ঐ শ্রেণীর আবোয়াব আদায় করা হয়। সম্ভবতঃ এই সংখ্যা অতিশয়োক্তি মাত্র। কিন্তু তালুকদারেরা নানা বিশেষ ব্যাপারে প্রজাদিগকে অর্থ দিতে বাধ্য করেন, ইহা কাহারও অজানা নাই। পরিবারে বিবাহের মাঙন, বিলাতে পুত্রের শিক্ষার ব্যয়, গভর্ণর কিংবা উচ্চ রাজকর্মচারীদের নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণের ব্যয়, হাতী অথবা মোটরগাড়ী কিনিবার অর্থ প্রজার নিকট হইতে আদায় করা হয়। এই সব বলপূর্ব্বক অর্থ আদায়ের অদ্ভুত অদ্ভুত নামও আছে। যথা—মোটরান, হাতীয়ানা প্রভৃতি।

অতএব অযোধ্যায় যে কৃষক আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠিবে ইহাতে আর

জওহরলাল নেহরু

আশ্চর্য্য কি? আমার নিকট সর্বাধিক আশ্চর্য্য এই যে নগরের সাহায্য, কিংবা রাজনৈতিকগণের হস্তক্ষেপ ব্যতীত স্বাভাবিক ভাবে আন্দোলন এত ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। এই কৃষক আন্দোলন কংগ্রেস হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এবং ইহার সহিত আগতপ্রায় অসহযোগের প্রায় কোন সম্পর্ক ছিল না। অথবা আরও সত্য করিয়া বলিলে বলা যায়, এই দুই শক্তিশালী আন্দোলনের মূলে ছিল একই কারণ। কৃষকেরা অবশ্য গান্ধিজীর ঘোষিত ১৯১৯এর বড় বড় হরতালে যোগ দিয়াছিল। এবং তাঁহার নাম গ্রামবাসীদের শ্রদ্ধা উদ্বেক করিত।

সুপ্রাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সকল বৃহৎ প্রজ্ঞা আন্দোলনের সম্পর্কে সহরবাসীরা গভীরভাবে অজ্ঞ; কোন সংবাদপত্রে ইহার এক ছত্র সংবাদও বাহির হয় না। পল্লী অঞ্চল সম্বন্ধে ইহাদের কোন কোতূহল নাই। আমি নিঃসংশয়ে বুঝিলাম, আমরা জনসাধারণ হইতে কত বিচ্ছিন্ন এবং সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ জগতে আমাদের কর্মপ্রচেষ্টা ও আন্দোলন আবদ্ধ।

৯

কৃষকদের মধ্যে ভ্রমণ

তিন দিন গ্রামে থাকিয়া আমি এলাহাবাদে ফিরিয়া আসিলাম। তারপর আরও কয়েক বার গ্রামে গিয়াছি। গ্রামে গ্রামে ভ্রমণকালে আমরা কৃষকদের সহিত একত্রে ভোজন করিয়াছি। তাহাদের সহিত মুৎকুটিরে শয়ন করিয়াছি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া তাহাদের সহিত আলাপ করিয়াছি, ছোট-বড় সভায় বক্তৃতা করিয়াছি। আমরা একখানি হাল্কা মোটর গাড়ী লইয়া গিয়াছিলাম, ঘাহাতে গাড়ীখানি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বাইতে পারে সেজন্য শত শত কৃষক সারারাত্রি জাগিয়া মাঠের মধ্যে অস্থায়ী পথ প্রস্তুত করিয়াছে। যদি কোন যায়গায় গাড়ী না চলিত তখন তাহারা আগ্রহসহকারে গাড়ীখানি ঘাড়ে করিয়া পার করিয়া দিয়াছে। এই কারণে গাড়ী ছাড়িয়া পদব্রজেই আমরা অধিকাংশ স্থানে গিয়াছি। আমরা যেখানেই গিয়াছি সেইখানেই সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ,

কৃষকদের মধ্যে ভ্রমণ

গোয়েন্দা এবং লক্ষ্মী হইতে প্রেরিত একজন ডেপুটি কালেক্টর উপস্থিত থাকিতেন। চষা জমি ও বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর দিয়া আমাদের অবিভ্রান্ত ভ্রমণের ফলে সে বেচারাও হয়রান হইয়া উঠিল। আমাদের ও কৃষকদের উপর তাহাদের বিরক্তির পরিসীমা ছিল না। লক্ষ্মীয়ে ডেপুটি কালেক্টর কতকটা মেয়েলী ধরণের যুবক, তাহার পায়ে ছিল পাকা চামড়ার 'পামহু'। বেচারা মাঝে মাঝেই আমাদের আরও ধীরে চলিতে অনুরোধ করিত, অবশেষে তাল রাখিতে না পারিয়া সে সরিয়া পড়িল।

তখন জুন মাস, গ্রীষ্মকাল। সূর্যের উত্তাপ প্রখর অগ্নিবর্ষী। ইংলও হইতে ফিরিবার পর তপ্ত মধ্যাহ্নে এভাবে ভ্রমণ করিতে আমি অনভ্যস্ত। প্রত্যেক গ্রীষ্মকালই আমি শৈলাবাসে অতিবাহিত করিয়াছি। আর এখন সারাদিন আমি প্রচণ্ড সূর্যালোকে ভ্রমণ করিতেছি। মাথায় টুপীর পরিবর্তে একখানি ছোট গামছা জড়াইয়া লইয়াছি। আমার মনে তখন এত চিন্তা ছিল যে অসহ্য গরমের কথা ভাবিবারও অবসর পাই নাই। এলাহাবাদে ফিরিয়া দেহে ও মুখে সূর্যাতাপসঞ্চিত কাল দাগ দেখিয়া বুঝিলাম যে শরীরের উপর দিয়া কি গিয়াছে। তবুও আমি সুখী। কেন না আমি বুঝিলাম কৃষকদের মত আমারও তাপসহনশীলতা আছে। আমার রোদ্ভভীতি নিতান্ত অর্থহীন। অভিজ্ঞতা হইতে দেখিয়াছি, প্রখর উত্তাপ এবং প্রচণ্ড শীত আমি অনায়াসে সহ্য করিতে পারি। এই কারণেই কি কার্যক্ষেত্রে কি কারাগারে আমি বিশেষ অসুবিধা বোধ করি নাই। অবশ্য আমার শরীরও বেশ কার্যক্ষম এবং আমি প্রত্যহ নিয়মিত ব্যায়াম করিয়া থাকি বলিয়াই উহা সম্ভব হইয়াছে। আমার পিতা একজন ব্যায়ামবীর ছিলেন এবং আজীবন নিয়মিত ব্যায়াম করিতেন। তাহার নিকট হইতে আমি এই শিক্ষা পাইয়াছিলাম। আমার পিতার যখন চুল পাকিয়া গিয়াছে, যখন তাঁহার মুখে হুচ্চিস্তা ও বেদনার কুঞ্চিত রেখা কাটিয়া বসিয়াছে, তখনও—তাঁহার মৃত্যুর দুই-এক বৎসর পূর্বেও, মুখের সহিত তুলনায় তাঁহার দেহ বিশ বৎসর নবীন বলিয়া প্রতিভাত হইত।

১৯২০-এর জুন মাসে আমার প্রতাপগড় ভ্রমণের পূর্বেও আমি মাঝে মাঝে গ্রামে গিয়াছি এবং কৃষকদের সহিত আলাপ করিয়াছি, বড় বড় মেলায় গঙ্গাতীরে হাজার হাজার কৃষক দেখিয়াছি এবং তাহাদের মধ্যে 'হোম ক্লব' আন্দোলনের প্রচার কার্য চালাইয়াছি। তখনও আমি ইহাদের পুরাপুরি বুঝিতে পারি নাই। ভারতে কৃষক যে কি তাহা ধারণা করিতে পারি নাই। আমাদের শ্রেণীর অনেকের মতই ইহাদের

কওহরলাল মেহর

আমি স্বাভাবিক বলিয়া মনে করিয়াছি। কিন্তু প্রতাপগড় জিলার গ্রাম পরিভ্রমণের পর আমার এক নূতন অহুভূতি আসিল। আমার ধ্যানে ভারতবর্ষের এই নয়দেহ ক্ষুধিত জনসাধারণ ছাড়া আর কিছু রহিল না, দেশব্যাপী নূতনভাবের প্রেরণাতেই হউক কিংবা আমার মনের ক্ষুধাতা বশতঃই হউক, যে চিত্র আমি দেখিলাম, যে অভিজ্ঞতা আমি লাভ করিলাম, তাহা চিরদিনের মত আমার মনে দৃঢ়াঙ্কিত হইল।

কৃষকেরা আমার লজ্জা সঙ্কোচ ভাঙ্গিয়া প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দেওয়াইয়া ছাড়িল। ইতঃপূর্বে আমি কদাচিৎ প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দিয়াছি। বক্তৃতার সময় উপস্থিত হইলেই আমার ভয় হইত। বিশেষভাবে হিন্দুস্থানীতে বক্তৃতা করিতে ঘাবড়াইয়া যাইতাম। কিন্তু তখন তাহাই রেওয়াজ ছিল। কৃষক সভায় অব্যাহতি পাওয়া কঠিন এবং এই সকল দরিদ্র, সরল লোকের নিকট লজ্জা সঙ্কোচের কি-ই বা আছে। আমার বাগ্মিতা কোশল কিছুমাত্র জানা ছিল না। আমি মানুষের সহিত মানুষ যেমন সাধারণ ভাবে কথা বলে তেমনি করিয়া তাহাদের নিকট আমার মনের কথা, আমার হৃদয়ের আবেগ ব্যক্ত করিতাম। লোকসংখ্যা দশজন হউক বা দশ হাজারই হউক আমি ব্যক্তিগত কথোপকথনের ভঙ্গীতেই বক্তৃতা করিতাম। ক্রটি ভুল সম্বন্ধে কোথাও বাধিয়া যাইত না। আমি অনর্গল বলিতাম। সম্ভবতঃ তাহাদের অনেকেই আমার অধিকাংশ কথা বুঝিত না। আমার ভাষা আমার চিন্তাধারা কৃষকদের নিকট সহজ নহে। আমার কণ্ঠস্বর উচ্চ নহে বলিয়া অনেকে শুনিতেই পাইত না। কিন্তু যাহাকে তাহারা ভালবাসে, বিশ্বাস করে তাহার এই সকল ক্রটি গণনার মধ্যেই আনে না।

আমি মুসৌরীতে মা ও স্ত্রীর নিকট ফিরিয়া গেলাম। কিন্তু কৃষকেরা আমার চিন্তা অধিকার করিয়া রহিল। আমি ফিরিবার জন্ত ব্যাকুল হইলাম। ফিরিয়া আসিয়াই আমি গ্রামে ভ্রমণ আরম্ভ করিলাম এবং কৃষক আন্দোলনের শক্তির বিকাশ লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। পদদলিত কৃষকের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিতেছে, সে সোজা হইয়া মাথা তুলিয়া হাঁটিতে পারে, জমিদারের গোমস্তা ও পুলিশীতি বহলাংশে তাহার হাস পাইয়াছে। কাহাকেও জমি হইতে উচ্ছেদ করা হইলে অগরে তাহা পাইবার জন্ত লালায়িত হয় না। জমিদারের পাইক-বরকন্দাজের মারপিট এবং বে-আইনি অর্থ আদায়ও অনেক কমিয়া গিয়াছে। যখনই একরূপ ঘটিত তখনই তাহারা অস্থমন্ধান করিয়া প্রতিকারের আবেদন করিত। ইহাতে জমিদারের কর্মচারী ও পুলিশেরা কতক পরিমাণে শঙ্কিত হইল।

কৃষকদের মধ্যে জমণ

তালুকদারেরাও ভয় পাইলেন, এবং তাঁহারা কৃষক আন্দোলনকে আক্রমণ না করিয়া আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলেন। প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টও অযোধ্যায় রায়জুন্সরী আইন সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

জমির মালিক এবং নিজেদের “জনসাধারণের স্বাভাবিক নেতা” মনে করিয়া গর্বিত তালুকদার ও জমিদারগণ বৃটিশ গভর্ণমেন্টের আত্মরে দুলাল। গভর্ণমেন্ট ইহাদিগের জন্ত বিশেষ শিক্ষা ও লালন পালনের ব্যবস্থা করিয়া অথবা না করিয়া এমন ভাবে মাথা খাইয়া রাখিয়াছেন যে, শ্রেণীহিসাবে ইহাদের বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে দেউলিয়া। অগ্রাগ্র দেশের জমিদারেরা প্রজাদের যৎকিঞ্চিৎ হিত করিয়া থাকে, কিন্তু ইহারা প্রজাদের জন্ত কিছুই করেন না, কেবল জমি ও প্রজার উপর পরগাছার মত অবস্থান করেন। ইহাদের কাজ হইল স্থানীয় সরকারী কর্মচারীদের তোষামোদে তুষ্ট রাখা। সরকারী কর্মচারীদের পক্ষপাতিত্ব ব্যতীত ইহাদের টিকিয়া থাকা কঠিন। বিশেষ অধিকার ও সুবিধা রক্ষার জন্ত ইহারা অবিরত সরকারী মহলে আনাগোনা করেন।

জমিদার বলিতে সকলেই এমন কিছু বড় বড় ভূম্যধিকারী নহে। ‘রায়তবারী’ প্রদেশগুলিতে ‘জমিদার’ বলিতে কৃষক-মালিকদের বুঝায়। এমন কি, যেখানে জমিদারী প্রথা আছে, সেখানেও মুষ্টিমেয় বড় জমিদার বাদ দিলে শত শত মাঝারি মধ্যস্থত্ব ভোগী এবং সহস্র সহস্র এমন জমিদার আছে, যাহাদের অবস্থা দারিদ্র্য-পীড়িত সাধারণ রায়তেরই মত। আমি যতদূর জানি তাহাতে যুক্তপ্রদেশে মোট প্রায় পনের লক্ষ জমিদার আছে। ইহাদের শতকরা নব্বই জনই দরিদ্র কৃষকের মত, অবশিষ্ট অংশের অবস্থা মোটামুটি ভাল। একটু বড় গোছের জমিদারের সংখ্যা সমস্ত প্রদেশে প্রায় পাচ হাজার হইবে এবং ইহাদেরও শতকরা দশ জন মাত্র বড় জমিদার ও তালুকদার। অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রে জমিদার অপেক্ষা বড় জোতদারের অবস্থা অনেক ভাল। এই সকল গরীব জমিদার ও মধ্যস্থত্ব-ভোগী জোতদার, শিক্ষার দিক দিয়া অনগ্রসর হইলেও সাধারণতঃ এই শ্রেণীর নরনারী বুদ্ধিমান; এবং উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে ইহারা অনেক উন্নত হইতে পারে। ইহারা জাতীয় আন্দোলনে উৎসাহের সহিত অংশ গ্রহণ করে। কয়েকজন ব্যতীত বড় জমিদার বা তালুকদার কখনও তাহা করেন না। আভিজাত্যের স্বাভাবিক গুণও ইহাদের মধ্যে নাই। শ্রেণী-হিসাবে ইহাদের শারীরিক ও মানসিক অবনতি অতি শোচনীয়। ইহাদের দিন ফুরাইয়াছে। যতদিন ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের মত বাহিরের শক্তি ইহাদিগকে রক্ষা করিবে, ততদিন কোনমতে টিকিয়া থাকিবে মাত্র।

জওহরলাল নেহরু

১৯২১ সালে সমস্ত যুক্তপ্রদেশ আমার কর্মক্ষেত্র হইলোও আমি মাঝে মাঝে পল্লীতে যাইতাম। তখন অসহযোগ আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহার বার্তা স্বদূর পল্লীতেও গিয়া পৌছিয়াছে। প্রত্যেক জিলায় কংগ্রেসকর্মীরা নূতন বালী প্রচারের জন্য পল্লীতে যাইতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের দুর্দশার প্রতিকার হইবে এমন আশ্বাসও দিতেন। স্বরাজ শব্দটি ছিল ব্যাপক, উহাতে সমস্তই বুঝাইত। অসহযোগ ও কৃষক আন্দোলন যদিও স্বতন্ত্র তথাপি আমাদের প্রদেশে উহা মিলিত মিশ্রিত হইয়া একে অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কংগ্রেসের প্রচারকার্যের ফলে মামলা-মোকদ্দমা যথেষ্ট কমিয়া গেল, আপোষ-রফার জন্য গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠিত হইল। কংগ্রেসের প্রভাবে আবহাওয়া শান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিল, কেন না, কংগ্রেসকর্মীরা অভিনব অহিংসনীতির উপর সমধিক জোর দিতেন। অহিংসনীতি যে সকলে সম্যকভাবে বুঝিত তাহা নহে, তথাপি ইহার প্রভাবে কৃষকেরা হিংসামূলক অন্তর্ধান হইতে বিরত ছিল।

এই সাক্ষ্য সামান্য নহে। কৃষক চাকলা প্রায়শঃই হিংসামূলক উপদ্রবের ও বিদ্রোহের আকার ধারণ করে। অযোধ্যার অংশবিশেষে কৃষকগণ এইকালে অসহিষ্ণু উত্তেজনায় মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল। একটি ফুলিকে দাবানল জলিয়া উঠিতে পারিত, তথাপি তাহারা আশ্চর্যরূপে শান্ত ছিল। কেবল একটি বলপ্রয়োগের কথা আমার মনে আছে। একজন তালুকদার তাহার নিজের বাড়ীতে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যখন গল্পগুজব করিতেছিল সেই সময় একজন কৃষক আসিয়া তাহাকে স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহার ও অসৎ জীবন যাপনের জন্য ভৎসনা করিয়া তাহার মুখে চপেটাঘাত করে।

আর এক প্রেণীর উপদ্রব দেখা দিল, যাহার ফলে গভর্ণমেন্টের সহিত সংঘর্ষ বাধিল। কিন্তু এই সংঘর্ষ অনিবার্য, কেন না, সত্বেষক কৃষকগণের ক্রমবর্দ্ধিত শক্তি গভর্ণমেন্ট উপেক্ষা করিতে পারে না। কৃষকেরা দলে দলে সভায় যোগ দিবার জন্য বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণ করিতে লাগিল। এই সকল জনসভায় ৬০।৭০ হাজার লোক পর্য্যন্ত হইত, তাহাদিগকে হটান কঠিন। যাহা কেহ কখনও শোনে নাই তাহাই ঘটিতে লাগিল, অর্থাৎ তাহারা প্রকাশ্যভাবে রেলকর্তৃপক্ষকে অগ্রাহ্য করিয়া বলিতে লাগিল যে পুরাতন দিন চলিয়া গিয়াছে। কাহার প্ররোচনায় তাহারা বিনা ভাড়ায় ভ্রমণ করিতে লাগিল আমি জানি না, আমরা তাহাদিগকে ইহা বলি নাই। মহা সুনীলাম যে তাহারা ঐরূপ করিতেছে। অবশ্য রেলকর্তৃপক্ষ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করায় ইহা রহিত হইল। ১৯২০র শরৎকালে (যখন আমি কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে যোগ দিবার জন্য কলিকাতায়

কৃষকদের মধ্যে ভ্রমণ

ছিলাম) কয়েকজন কৃষক-নেতা সামান্য অপরাধে গ্রেফতার হয়। প্রতাপগড় সহরে তাহাদের বিচার হইবে স্থির হইয়াছিল। বিচারের দিন চারিদিক হইতে বিশাল জনতা আসিয়া জেলের দ্বারা হইতে আদালত প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত ছাইয়া ফেলিল। ম্যাজিস্ট্রেট ভীত হইয়া সেদিনের মত বিচার স্থগিত রাখিলেন, কিন্তু জনতা বাড়িতে লাগিল এবং কারাগার প্রায় ঘিরিয়া ফেলিল। কৃষকেরা এক মুষ্টি ভাজা চানা খাইয়া অনায়াসে কয়েকদিন কাটাইতে পারে। অবশেষে সম্ভবতঃ জেলের মধ্যেই কোন রকমে বিচার সারিয়া কৃষক-নেতাদের ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ঘটনাটা আমি ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু কৃষকেরা ইহাকে একটা প্রকাণ্ড জয় বলিয়া মনে করিল। তাহারা ভাবিতে লাগিল, কেবলমাত্র জনসংখ্যার জোরেই তাহারা তাহাদের দাবী পূরণ করিয়া লইতে পারে। কিন্তু গভর্নমেন্টের নিকট এই ঔক্ততা অসহ্য হইয়া উঠিল এবং অল্পরূপ আর একটি ঘটনার ফল হইল স্বতন্ত্র। ১৯২১র জানুয়ারী মাসের প্রারম্ভে নাগপুর কংগ্রেস হইতে এলাহাবাদে ফিরিবার পরেই রায়বেরলি হইতে তারযোগে অল্পরোধ আসিল, আমি যেন অবিলম্বে তথায় যাত্রা করি, কেন না, গোলমালের আশঙ্কা আছে। আমি পরদিনই রওনা হইলাম। গিয়া দেখি কয়েকদিন পূর্বে কয়েকজন প্রধান কৃষক গ্রেপ্তার হইয়া স্থানীয় জেল হাজতে আটক আছে। প্রতাপগড়ে তাহাদের সাক্ষ্য এবং অবলম্বিত কৌশলের কথা শ্রবণ করিয়া দলে দলে কৃষক রায়বেরলী সহরে আসিতে লাগিল কিন্তু এবার গভর্নমেন্ট পূর্বে হইতেই অতিরিক্ত পুলিশ ও সৈন্য সংগ্রহ করিয়া কৃষকদের সহরে প্রবেশে বাধা দিলেন। সহরের বাহিরে একটি ছোট নদীর অপর পারে অধিকাংশ কৃষককে থামাইয়া রাখা হইল। অবশ্য অনেকে নানা পথ দিয়া সহরে প্রবেশ করিয়াছিল। ষ্টেশনে নামিয়া সমস্ত অবস্থা শুনিয়া যেখানে সৈনিকেরা কৃষকদের পথরোধ করিয়া আছে, তাড়াতাড়ি সেই নদীর দিকে অগ্রসর হইলাম। পথে জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হইতে আমাকে ফিরিয়া যাইবার জন্য তাড়াতাড়ি লেখা এক পত্র পাইলাম। আমি সেই নোটশের পশ্চাতে উত্তরে লিখিলাম যে, কোন আইনের কোন ধারায় তিনি আমাকে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছেন তাহা আমি জানিতে চাই এবং তাহা না জানা পর্য্যন্ত আমি বিরত হইব না। নদীতীরে উপস্থিত হইয়া অপর তীরে গুলিবর্ষণের শব্দ আমার কানে আসিল। সেতুর মুখে সৈন্যদল আমার গতিরোধ করিল। অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় নদীর ধারে শস্তক্ষেত্রে লুক্কায়িত ভীত কৃষকগণ দলে দলে আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহাদের ভয় দূর করিবার জন্য ও তাহাদিগকে শান্ত করিবার জন্য আমি এখানেই

জওহরলাল নেহরু

প্রায় দুই হাজার কৃষক লইয়া একটি সভা করিলাম। ইহা এক অস্বাভাবিক অবস্থা। ক্ষুদ্র নদীর অপর পারে তখন তাহাদেরই ভাইদের উপর গুলি বর্ষিত হইতেছে এবং প্রত্যেক স্থানেই সৈন্যদল টহল দিতেছে। 'কিন্তু সভার উদ্দেশ্য সফল হইল, কৃষকেরা কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল। জিলা ম্যাজিস্ট্রেট গুলিবর্ষণের স্থল হইতে ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহার অহুরোধে তাঁহার সঙ্গে আমি তাঁহার বাড়ীতে গেলাম। সেখানে তিনি নানা অছিলায় আমাকে দুই ঘণ্টা আটক রাখিলেন। বুঝিলাম, তিনি কৃষকগণ এবং সংহরের সহকর্মীদের নিকট হইতে আমাকে সরাইয়া রাখিতে চাহেন।

আমরা পরে দেখিলাম গুলির আঘাতে বহুলোক মারা গিয়াছে। কৃষকেরা যদিও ছত্রভঙ্গ হইতে বা ফিরিয়া যাইতে অস্বীকার করিয়াছিল তথাপি তাহারা বরাবর শাস্তিপূর্ণ ছিল; আমার বিশ্বাস যে আমি কিম্বা তাহাদের বিশ্বাসভাজন কেহ তাহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে বলিলে তাহারা তাহা পালন করিত। কিন্তু যাহাদের উপর তাহাদের বিশ্বাস নাই, তাহাদের নির্দেশ মানিতে তাহারা অস্বীকার করিয়াছিল। একজন প্রকৃত প্রস্তাবে ম্যাজিস্ট্রেটকে আমি না আসা পর্য্যন্ত কিছুকাল অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন কিন্তু তাহা তিনি শোনে নাই। যেখানে তিনি নিজে ব্যর্থ হইতেছেন সেখানে একজন 'এজিটের' সাফল্য লাভ করিবে ইহা অসম্ভব। বিদেশী গভর্ণমেণ্টের মর্যাদাবোধ স্বতন্ত্র।

রায়বেরিলী জেলায় দুইবার কৃষকদের উপর গুলি চলিয়াছিল কিন্তু তাহা হইতেও শোচনীয় ব্যাপার চলিল। প্রত্যেক প্রধান কৃষক-কর্মী ও গ্রাম্য-পঞ্চায়েতের সদস্য একটা ভীতির রাজ্যে বাস করিতে লাগিল। গভর্ণমেণ্ট কৃষক আন্দোলন ধ্বংস করিতে রুতসঙ্কল্প হইলেন। কংগ্রেসের প্রচারকার্যের ফলে তখন চরকা প্রচলন হইতেছিল। এই চরকাই সিডিশনের প্রতীক হইয়া উঠিল। চরকার মালিককে বিপদে পড়িতে হইত এবং প্রায়ই চরকা পোড়াইয়া ফেলা হইত। এইরূপে গভর্ণমেণ্ট রায়বেরিলী ও প্রতাপগড় জেলার পল্লী অঞ্চলে শত শত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিয়া ও অগ্ন্যস্ত্র উপায়ে কৃষক ও কংগ্রেস আন্দোলন দমনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিখ্যাত কর্মীরা প্রায় সকলেই উভয় আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলেন।

১৯২১ সালে, ইহার পরেই ফৈজাবাদ জিলা ব্যাপক দমননীতির স্বাদ পাইল। এখানে অশান্তি ঘটিল এক অদ্ভুত কারণে। কতকগুলি গ্রামের কৃষকেরা একত্রিত হইয়া এক তালুকদারের বাড়ী লুট করে। পরে প্রকাশ পাইল, ঐ তালুকদারের শত্রুপক্ষীয় আর এক জমিদারের কর্মচারীরা

কৃষকদের মধ্যে ভ্রমণ

প্ররোচনা দিয়া এই কার্য ঘটাইয়াছিল। এই অজ্ঞ গরীব কৃষকদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, মহাশ্য়া গান্ধী তাহাদিগকে লুট করিতে বলিয়াছেন এবং সেই আদেশ পালন করিবার জন্ত তাহারা “মহাশ্য়া গান্ধীকি জয়” বলিতে বলিতেই লুট করিয়াছিল।

এই সংবাদ শুনিয়া আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলাম এবং দুই-এক দিনের মধ্যেই কৈজাবাদ জিলার আকবরপুরের নিকটবর্তী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলাম। সেই দিনই আমি এক সভা আহ্বান করিলাম। ঘটনাস্থলের আট-দশ মাইল দূরবর্তী গ্রামসমূহ হইতে পর্য্যন্ত লোক আসিল, সভায় পাঁচ-ছয় হাজার লোক হইল। আমি কঠিন ভাষায় তিরস্কার করিলাম,—এই অপকারের দ্বারা তোমরা তোমাদিগকে ও আমার উদ্দেশ্যকে কলঙ্কিত করিয়াছ। তোমাদের প্রকাশ্যে অপরাধ স্বীকার করা উচিত (তখন আমি আমার জ্ঞানবিশ্বাস মত গান্ধীজীর সত্যগ্রহে অনুপ্রাণিত ছিলাম)। আমি তাহাদিগকে বলিলাম, যাহারা লুণ্ঠনে যোগ দিয়াছিল তাহারা হস্ত উত্তোলন করুক। আশ্চর্য্য এই, তৎক্ষণাৎ সভামধ্যে বহুতর পুলিশকর্মচারীর সম্মুখেই বিশ-পঁচিশ জন হাত তুলিল। ইহার অর্থ তাহারা বিপদ ডাকিয়া আনিল।

পরে ঘরোয়া আলোচনায় তাহারা সরল ভাষায় ঘটনার বিবরণ আমাকে জানাইল। আরও জানাইল, কিরূপে তাহারা বিপথগামী হইয়াছিল। তাহাদের জন্ত আমি দুঃখিত হইলাম। এই সকল নির্কোষ সরল লোকের দীর্ঘকালাবাসের নিমিত্তের ভাগী হইয়া আমি অনুতপ্ত হইলাম। যাহারা এই বিপদে জড়াইয়া পড়িল তাহাদের সংখ্যা পঁচিশ-ত্রিশ জনের বেশী হইবে না। এই জিলার কৃষক-অন্দোলনকে পিষিয়া মারিবার এমন মহাস্বেযোগ কর্তৃপক্ষ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিলেন। প্রায় এক হাজার লোক গ্রেফতার হইল। জিলার জেলখানা লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া মামলা চলিল। অনেকে মামলা চলিবার সময় কারাগারেই প্রাণত্যাগ করিল, অনেকের দীর্ঘ কারাদণ্ড হইল। পরে আমি যখন কারাগারে তখন তাহাদের কয়েকজনের সহিত দেখা হইয়াছিল। বালক ও যুবকেরা তাহাদের জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ কারাগারে কাটাইতেছে!

ভারতীয় কৃষকদের সহ করিবার বা দীর্ঘকাল প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা অতি অল্প। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কবলে লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রাণ হারায়, তথাপি ইহা আশ্চর্য্য যে, গভর্নমেন্ট ও জমিদারদের সম্মিলিত চাপ এক বৎসর কাল তাহারা প্রতিরোধ করিয়াছিল। কিন্তু গভর্নমেন্টের দৃঢ় আক্রমণের সম্মুখে তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িল, পরিণামে তাহাদের

ভওহরলাল নেহরু

আন্দোলনের মেরুদণ্ড সাময়িকভাবে ভাঙ্গিয়া গেল। ভাঙ্গিলেও আন্দোলন মরিল না। পূর্বের উৎসাহ ও জনতা না থাকিলেও অধিকাংশ গ্রামেই পুরাতন কর্মীরা ভয়ে বিহ্বল না হইয়া অল্প স্বল্প কাজ চালাইয়াছে। ইহা স্বরণ রাখা উচিত যে, এই ঘটনা ১৯২১-র শেষভাগে কংগ্রেসের কারাগমন সিদ্ধান্তের পূর্বে ঘটিয়াছিল। পূর্ব বংসরের ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও কৃষকেরা এই আন্দোলনেও যোগ দিয়াছিল।

কৃষক আন্দোলনে ভীত হইয়া গভর্ণমেন্ট তাড়াতাড়ি ভূমিসংক্রান্ত আইন প্রণয়নে ত্রুটি হইলেন। ইহাতে কৃষকের অবস্থার উন্নতির প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল বটে, কিন্তু যখন দেখা গেল, আন্দোলন আয়ত্তের মধ্যে আসিয়াছে তখন আইনের ধারাগুলি নরম হইয়া গেল। উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হইল এই যে, অযোধ্যার কৃষকগণ জমির উপর জীবনস্বত্ত্ব পাইল। ইহা শুনিতে মনোহর হইলেও পরে দেখা গেল, কৃষকের অবস্থার কোন ইতরবিশেষ হয় নাই। অযোধ্যায় কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ অল্পপরিমাণে রহিয়াই গেল। ১৯২২-এ যখন জগদ্ব্যাপী অর্থসঙ্কট দেখা গেল তখন শস্ত্রের মূল্য কমিয়া যাওয়ায় আবার একটি সঙ্কট আসন্ন হইল।

১০

অসহযোগ

অযোধ্যার কৃষক আন্দোলনের কথা একটু বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিয়াছি। এই আন্দোলনে আমার চক্ষু হইতে একটা আবরণ সরিয়া গেল। ভারতীয় সমস্তার একটা প্রধান দিক আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। এতদিন জাতীয়তাবাদীরা ইহার প্রতি প্রায় কোন দৃষ্টিই দেন নাই। এক অন্তর্নিহিত গভীর অসন্তোষের লক্ষণরূপে ভারতের সর্বত্রই কৃষকদের মধ্যে অশান্তি সচরাচর ঘটিয়া থাকে; ১৯২০-২১-এর আযোধ্যার একাংশের এই কৃষক আন্দোলন তাহারই অংশ মাত্র। তাহা হইলেও ইহার মধ্যে ভাবিবার ও শিখিবার অনেক কিছু ছিল। এই আন্দোলনের সূচনায় ইহার সহিত রাজনীতি বা রাজনীতিকগণের কোন সম্পর্ক ছিল না, এবং ইহার গতিপথেও রাজনীতিক বা বাহিরের লোকের প্রভাব যৎসামান্য। নিখিল ভারতীয় দৃষ্টিতে ইহা স্থানীয় ব্যাপার মাত্র;

অসহযোগ

বাহিরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইহা অল্পই সম্ভব হইয়াছে। এমন কি, যুক্তপ্রদেশের সংবাদপত্রগুলি ইহাকে একরূপ উপেক্ষাই করিয়াছে। কেন না সম্পাদকগণ এবং তাঁহাদের নাগরিক পাঠকগণের নিকট অর্ধদলিত কৃষকদের কার্যাবলীর রাজনৈতিক অথবা অন্য কোন গুরুত্ব নাই।

(১) পাঞ্জাব ও খিলাফতের অবিচার এবং সেই অত্যাচারের প্রতিকার স্বরূপ অসহযোগই তখন মুখ্য আন্দোলনের বিষয়। জাতীয় স্বাধীনতা বা স্বরাজের উপর তখন বেশী জোর দেওয়া হইত না। গান্ধিজীও অনির্দিষ্ট বৃহৎ উদ্দেশ্য পছন্দ করিতেন না। তিনি সর্বদাই সুনির্দিষ্ট কোন নিশ্চিত উদ্দেশ্যের উপর ঐকান্তিক জোর দেওয়া পছন্দ করেন। তৎসঙ্গেও জনসাধারণের চিন্তায় কথায় স্বরাজ শব্দটি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ও অসংখ্য সভা-সমিতিতে স্বরাজের কথা উল্লিখিত হইত। ১৯২০-র শরৎকালে কলিকাতায় কর্মপদ্ধতি ও বিশেষভাবে অসহযোগের কথা আলোচনার জন্ত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহূত হইল। দীর্ঘকাল নির্বাসনের পর আমেরিকা হইতে সন্তপ্রত্যাগত লালা লাজপত রায় হইলেন সভাপতি। অসহযোগ প্রস্তাবের নূতন ধারা তিনি পছন্দ করিলেন না এবং প্রতিবাদ করিলেন। ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে তিনি একজন চরমপন্থী বলিয়া বিবেচিত হইতেন। কিন্তু তাঁহার সাধারণ মনোভাব ছিল নিয়মতান্ত্রিক ও মডারেট। শতাব্দীর প্রথমভাগে লোকমান্য তিলক ও অত্যাচার চরমপন্থীদের সহিত তিনি ঘটনাচক্রে মিশিয়া গিয়াছিলেন; নিজের কোনও মর্ম্মগত বিশ্বাস হইতে নহে। কিন্তু দীর্ঘকাল বিদেশে থাকার জন্ত অনেক ভারতীয় নেতা অপেক্ষা তাঁহার অর্থনৈতিক ও সামাজিক-দৃষ্টি অধিকতর উদার ছিল।

উইল্ফ্রিড স্কাউয়েন ব্লান্ট, তাঁহার রোজনামচায় (সম্ভবতঃ ১৯০৯) গোপলে এবং লালাজীর সহিত সাক্ষাতের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি উভয়কেই অতি সাবধানী এবং বাস্তবের সম্মুখীন হইতে ভীত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তথাপি লালাজী তৎকালে অধিকাংশ ভারতীয় নেতাদের অপেক্ষা অগ্রগামী ছিলেন। ব্লান্টের বিবৃতি হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, তৎকালে আমাদের রাজনৈতিক ধারণা কত নিম্নস্তরের এবং আমাদের নেতারা কিরূপ ছিলেন তাহা একজন বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ বিদেশীর দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে ইহার কি বিপুল পরিবর্তন হইয়াছে!

একমাত্র লালাজী নহেন, আরও অনেক শক্তিশালী ব্যক্তিও প্রতিবাদী হইলেন। এককথায়, কংগ্রেসের প্রবীণ সেনানায়কগণ একযোগে গান্ধিজীর অসহযোগ প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করিলেন। মিঃ সি, আর, দাশ হইলেন

বিরুদ্ধ দলের নেতা।* তিনি অবশ্য প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত ভাবের বিরোধী ছিলেন না। ঐ প্রস্তাব মত কার্য্য করিতে, এমন কি তদপেক্ষা অধিক ত্যাগ স্বীকারের জন্তও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার প্রধান আপত্তির বিষয় ছিল, নূতন আইন সভাগুলি বর্জন-প্রস্তাবে।

প্রধান প্রধান প্রবীণদের মধ্যে তখন একমাত্র আমার পিতাই গান্ধিজীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার পক্ষে ইহা সহজ ছিল না। যে সকল কারণে তাঁহার প্রাচীন সহকর্মীগণ বিরুদ্ধতায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহার দ্বারা তিনিও প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মত তিনিও এই অভিনব পথে নিরুদ্দেশ যাত্রায় দ্বিধা বোধ করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, ইহার ফলে জীবনের অভ্যস্ত গতিপথ পরিবর্তিত হইবে, তথাপি তিনি কার্য্যতঃ কিছু করিবার অনিবার্য্য আবেগ অনুভব করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চিন্তাধারার সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য না থাকিলেও এই প্রস্তাবের মধ্যে তিনি প্রাণালীবদ্ধ কর্ম্মের সম্মান পাইয়াছিলেন। নিজের মনকে প্রস্তুত করিতে তাঁহার অনেক সময় লাগিয়াছিল। গান্ধিজী ও মিঃ সি, আর, দাশের সহিত তাঁহার দীর্ঘ আলোচনা হইয়াছিল। মফঃস্বলে একটা বড় মামলায় দুই পক্ষে তিনি ও মিঃ দাশ ছিলেন। মামলা ছাড়িয়া দিয়া ক্ষতি স্বীকার করা লইয়া তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ মতভেদ হয় নাই, বরঞ্চ তাঁহারা একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু পূর্বোন্নিখিত মতভেদের ফলেই কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে মূল প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁহারা ভিন্ন মতাবলম্বী হইলেন। তিন মাস পরে তাঁহারা নাগপুর কংগ্রেসে পুনরায় মিলিত হইলেন ও তখন হইতে তাঁহারা ক্রমশঃ পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হইতে ঘনিষ্ঠতর হইয়া একত্রে কাঁদা করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশেষ কংগ্রেসের পূর্বে পিতার সহিত আমার কদাচিৎ দেখা হইত। কিন্তু যখনই দেখা হইত তখনই লক্ষ্য করিতাম এই সকল সমস্তা লইয়া তিনি অত্যন্ত বিব্রত। সমস্তার জাতীয় দিক ছাড়াও একটা ব্যক্তিগত দিক ছিল। অসহযোগ করিলে আইন ব্যবসায় বর্জন করিতে হইবে। তাহার অর্থ অতীত জীবনকে নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজিতে হইবে, ষাট বৎসর বয়সে ইহা সহজ নহে। পুরাতন রাজনৈতিক বন্ধুগণ, ব্যবসায় অভ্যস্ত সামাজিক জীবন, ব্যয়বহুল বিলাসবাসন—এ সকলই ছাড়িতে হইবে। অধিক সমস্তাও কম নহে। তাঁহার আইন ব্যবসায়ের উপার্জন বন্ধ হইলে জীবনযাত্রায় বহুল অংশে ব্যয়সঙ্কোচ করিতে হইবে।

* কলিকাতা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগ প্রস্তাবের বিরুদ্ধতায় মেতুস গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সংশোধক প্রস্তাব আনিয়াছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল।—অনুবাদেরক।

অসহযোগ

কিন্তু এ সকল সঙ্গেও তাঁহার যুক্তিবাদ, তাঁহার তীব্র আত্মমর্যাদাজ্ঞান তাঁহার আত্মগরিমা, তাঁহাকে নূতন আন্দোলনে একান্তভাবে টানিয়া লইয়া গেল। পঞ্চাষের অত্যাচার এবং তৎপূর্ববর্তী দহুশটনায় তাঁহার চিন্তে ক্রোধ সঞ্চিত হইয়াছিল, অত্যাচার অবিচার ও জাতীয় অমর্যাদায় তাঁহার চিন্তা তিত্ত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা প্রকাশের পথ কোথায়? আকস্মিক উত্তেজনায় কিছু করিবার মত লোক তিনি নহেন। আইনজীবীর স্থান অনিয়মিত বুদ্ধির দ্বারা সকল দিক তুলমূল করিয়া বিচার করিয়া তিনি স্থির সিদ্ধান্তে আসিলেন এবং গান্ধিজীর সহিত আন্দোলনে যোগ দিলেন।

গান্ধিজীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তিনি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তাঁহার আকর্ষণ ও বিতৃষ্ণা দুইই ছিল প্রবল। যে ব্যক্তির প্রতি তাঁহার মন বিতৃষ্ণ হইত, তাহার সহিত তিনি কিছুতেই ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিতে পারিতেন না। কিন্তু ইহা এক আশ্চর্য্য সম্মিলন। একজন কঠোর তপস্বী, অশ্রদ্ধা ভোগবাদী; একজনের দৈহিক ভোগ-বাসনা বজ্জিত ধর্মজীবন, অপরের জীবনে ইন্দ্রিয়গ্রাম ও ভোগবাসনা স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক এবং পরলোক সম্পর্কে ক্রম্বেপহীন অবজ্ঞা। মনস্তত্ত্বের ভাষায় একজন অন্তর্মুখ অপরে বহির্মুখ। কিন্তু উদ্দেশ্যের ঐক্য তাঁহাদিগকে একত্র মিলিত করিল। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক মতভেদ ঘটিলেও তাঁহাদের বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল।

ওয়ার্ডার পেটার তাঁহার একখানি গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তপস্বী ও ভোগীর জীবনের সাধনপথ, প্রকৃতি স্বতন্ত্র ও বিরোধী হইলেও উভয়ের দৃঢ়তা ও ঐকান্তিকতার মধ্যে এক আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান। উভয়ের প্রকৃতি নীচতাবজ্জিত বলিয়া পরস্পরকে জানিতে ও বুঝিতে সুবিধা হয়, যাঁহা সাধারণ বিষয়ী লোকের পক্ষে সহজসাধ্য নহে।

কলিকাতার বিশেষ অধিবেশনের পর কংগ্রেস রাজনীতিতে গান্ধী-যুগ প্রবর্তিত হইল। দেশবন্ধু সি, আর, দাশ ও আমার পিতার নেতৃত্বে চালিত স্বরাজ্য দলের অভ্যুদয়ের পর গান্ধিজী তাঁহাদের সুযোগ দিয়া অল্পকালের জন্য সরিয়া দাঁড়াইলেও তাঁহার ধারাই চলিতেছিল। কংগ্রেসের ভোল ফিরিয়া গেল। ইয়োরোপীয় পোষাক অন্তর্হিত হইয়া আসিল খাদি। নিম্ন-মধ্যশ্রেণী হইতে আগত এক নূতন প্রতিনিধি দল দেখা দিল। কংগ্রেসের ভাষা হইল হিন্দুস্থানী অথবা যে প্রদেশে কংগ্রেসের অধিবেশন হইত সেই প্রদেশের ভাষা। জাতীয় কার্যে বিদেশীয় ভাষা ব্যবহারে আপত্তি বাড়িতে লাগিল। অধিকাংশ প্রতিনিধি ইংরাজী জানিত না। এক নূতন উত্তেজনা, নূতন আগ্রহ কংগ্রেস সম্মেলনে প্রত্যক্ষ

করা গেল। কংগ্রেসের অধিবেশনের পর গান্ধিজী 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র প্রবীণ সম্পাদক ওমতিলাল ঘোষের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলাম। তখন তিনি মৃত্যুশয্যায়। মর্ত্যিবাবু গান্ধিজী ও তাঁহার আন্দোলনকে আশীর্বাদ করিলেন ও বলিলেন, 'আমার দিন ফুরাইয়াছে। ইহলোক ছাড়িয়া কোথায় যাইব জানি না, তবে আমার একমাত্র সন্তোষ, যেখানেই যাইব সেখানে নিশ্চয়ই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নাই। এতদিন পর এই সাম্রাজ্যের বন্ধন-মুক্তি!' কলিকাতা হইতে ফিরিবার পথে আমি গান্ধিজীর সহিত শান্তিনিকেতনে গিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁহার সর্বজনপ্রিয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা 'বড়দাদার' দর্শনলাভ করিলাম। সেখানে আমরা কয়েকদিন কাটাইলাম। এই সময় সি, এফ, এণ্ড রুড্র আমাকে কয়েকখানি বই উপহার দিয়াছিলেন। আফ্রিকায় সাম্রাজ্যানীতির ফলে অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ঐ বইগুলি পড়িয়া আমি যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম। ইহার মধ্যে মোরেল রচিত 'ব্ল্যাক মানস্ বার্ডন' নামক বইখানি পড়িয়া আমার মন আলোড়িত হইয়াছিল।

এই সময় ভারতের স্বাধীনতা সমর্থন করিয়া সি, এফ, এণ্ড রুড্র একখানি পুস্তিকা লেখেন। নিখিল ভারত সম্প্রদায় রচনার উপর ভিত্তি করিয়া এই পুস্তকটি লেখা হইয়াছিল। স্বাধীনতার স্বপক্ষে অর্থগোষ্ঠীর যুক্তির অবতারণা করিয়া তিনি এই প্রবন্ধে ভারতের মর্ম্মকথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। আমাদের চিন্তের গভীর আলোড়ন এবং অনির্দিষ্ট আশা তিনি আবেগময়ী ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। কোনও অর্থনৈতিক সমস্যা অথবা সমাজতন্ত্রবাদের অবতারণা তিনি করেন নাই। ইহা নিছক সহজ জাতীয়তাবাদ। ইহা ভারতের তাঁর অপমানবোধ হইতে নিষ্কৃতির উগ্র আকাঙ্ক্ষা এবং আমাদের ক্রমাবনতির শ্রোত রুদ্ধ করিবার আবেগ। বিদেশী এবং শাসকসম্প্রদায়ের সন্তান হইয়াও তিনি যে আমাদের মনের কথা এমন ছব্ব প্রতিক্ষনি করিতে পারিলেন ইহা আশ্চর্য্য। সিলি বহুপূর্বেই বলিয়া গিয়াছেন যে, "বিদেশী শাসনকে অব্যাহত রাখিবার যে লক্ষ্য তাহাই অসহযোগের প্রসূতি" এবং এণ্ড রুড্রও লিখিয়াছেন, "আভ্যন্তরীণ শক্তিকে জাগ্রত করাই আত্মপ্রতিষ্ঠা একমাত্র পথ। ভারতের আত্মার মধ্য হইতেই প্রস্ফুরণের প্রচণ্ড শক্তিকে জাগ্রত করিয়া আলোড়ন আনিতে হইবে। বাহির হইতে আগত কোন ঘোষণা, অহুগ্রহ, পুরস্কার বা ঋণদ্বারা ইহা সম্ভব নহে। ইহা কেবলমাত্র ভিতর হইতেই সম্ভব। অতএব আমি মানসিক অপূর্ণ তৃপ্তি লইয়া দুর্ব্বল ভারমুক্তির প্রচেষ্টায় আত্মিক শক্তির এই প্রস্ফুরণ প্রত্যক্ষ করিতেছি। মহাত্মা গান্ধী ভারতের

অসহযোগ

কৰ্ণে এই মন্ত্ৰ উচ্চারণ কৰিতেছেন—“মুক্ত হও, কৃতদাস থাকিও না।” ভারতবৰ্ষে চেতনা সঞ্চার হইতেছে। সহস্রা সঞ্চালিত দেহে বন্ধনশৃঙ্খল শিথিল হইতেছে এবং স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত হ'ল।”

পরবর্তী তিন মাস কালে সমগ্র দেশে অসহযোগ আন্দোলন অগ্রসর হইতে লাগিল। নূতন আইন-সভার নির্বাচন বর্জন আশ্চর্য সাফল্য লাভ করিল। কিন্তু আইন-সভায় প্রবেশাধী প্রত্যেককে নিবারণ করা কিম্বা সদস্তপদ শূন্য রাখা সম্ভবপর নহে। মুষ্টিমেয় ভোটার যাহাকে খুসী নির্বাচিত কৰিতে পারে এবং অগ্ৰ প্রাথীর অভাবে যে-কেহ বিনা বাধায় নির্বাচিত হইতে পারে। অধিকাংশ ভোটারই ভোট দিতে বিরত রহিল এবং দেশের তীব্র মনোভাব দেখিয়া অনেকেই প্রার্থী হইলেন না। ভোট গ্রহণের দিন স্তার ভালেণ্টাইন চিরোল এলাহাবাদে উপস্থিত ছিলেন এবং ভোটকেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। বয়কটের আশ্চর্য সাফল্যে তিনি চমৎকৃত হইয়াছিলেন। এলাহাবাদ সহরের পনর মাইল দূরবর্তী এক গ্রাম্য ভোটকেন্দ্রে তিনি একজন ভোটারও দেখিতে পান নাই। তাঁহার এই অভিজ্ঞতার কথা ভারত সম্পর্কিত এক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

কলিকাতা কংগ্রেসে মিঃ সি, আর, দাশ ও আরও অনেকে বয়কটের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলেও তাঁহারা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়াছিলেন। নির্বাচন শেষ হইলে মতভেদের কারণ অন্তর্হিত হইল। ১৯২০-র ডিসেম্বরে নাগপুর কংগ্রেসে পুরাতন কংগ্রেস নেতারা অসহযোগের ভূমিতে আসিয়া মিলিত হইলেন। আন্দোলনের আশ্চর্য সাফল্যে অনেকের সংশয় দ্বিধা দূর হইল।

কলিকাতা কংগ্রেসের পর যে কয়েকজন খ্যাতনামা ও জনপ্রিয় নেতা কংগ্রেস হইতে সরিয়া দাড়াইলেন, মিঃ এম, এ, জিন্না তাঁহাদের অগ্রতম। সরোজিনী নাইডু তাঁহাকে বলিতেন, “হিন্দু-মুসলমান মিলনের দূত।” অতীতে তাঁহার চেষ্টায় কংগ্রেস ও মোহাম্মদ লীগের মিলন হইয়াছিল। কিন্তু কংগ্রেসের নবরূপান্তর—অসহযোগ ও নূতন নিয়মতন্ত্রদ্বারা কংগ্রেসকে জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার চেষ্টা তিনি অমুমোদন করিলেন না। বাস্তবতঃ রাজনৈতিক কারণে হইলেও আসলে তাঁহার কংগ্রেস হইতে দূরে সরিয়া যাওয়ার কারণ রাজনীতি নহে। এখনও কংগ্রেসে এমন অনেকে আছেন যাহারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁহার মত অগ্রসর নহেন। নূতন কংগ্রেসের সহিত তাঁহার প্রকৃতিগত ঐক্য সম্ভব হইল না। খদ্দরপরিহিত জনসাধারণ হিন্দী বক্তৃতা দাবী করিয়া থাকে, ইহা তিনি বরদাস্ত কৰিতে পারিলেন না। জনসাধারণের উৎসাহ তাঁহার নিকট ইতর জনতার

ভাবাভিষয়া বলিয়া মনে হইল। লণ্ডনের 'সেভিল রো' কিংবা 'বণ্ড স্ট্রিটের' সহিত কুটির সমন্বিত ভারতীয় গ্রামের যে পার্থক্য, জনসাধারণের সহিত তাঁহার পার্থক্য সেইরূপ। তিনি একবার একান্তে বলিয়াছিলেন, অন্ততঃ ম্যাট্রিকুলেশন পাশ না করিলে কাহাকেও কংগ্রেসে লওয়া উচিত নহে। এই প্রস্তাব তিনি ঐকান্তিকভাবে করিয়াছিলেন কি-না জানি না, তবে ইহার সহিত তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর ঐক্য ছিল। এইরূপে তিনি কংগ্রেস হইতে সরিয়া গেলেন। এবং রাষ্ট্রক্ষেত্রে সৈন্যহীন সেনাপতির মত একক হইলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে পরবর্তীকালে এই পুরাতন মিলনের দূত অতিমাত্রায় প্রগতিবিরোধী মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সহিত যোগ দিয়াছিলেন।

অবশ্য 'মডারেট' বা 'লিবারেল'দের সহিত কংগ্রেসের কোন সম্পর্ক রহিল না, তাঁহারা গভর্নমেন্টের সহিত যোগ দিয়া নূতন শাসনতন্ত্রে মন্ত্রী ও অগ্রাগ্র উচ্চ পদ গ্রহণ করিলেন; এবং অসহযোগ ও কংগ্রেস দমনে সহায়তা করিতে লাগিলেন। কিছু শাসন সংস্কার পাইয়াই তাঁহাদের আশা পূর্ণ হইল। কাজেই তাঁহাদের আন্দোলনের আর প্রয়োজনীয়তা রহিল না। যখন সমস্ত দেশ উৎসাহে অধীর ও আমূল পরিবর্তন প্রয়াসী, তখন তাঁহারা প্রকাশ্যে পরিবর্তনবিরোধী হইয়া গভর্নমেন্টের অংশরূপে পরিবর্তিত হইলেন। জনসাধারণের সহিত তাঁহাদের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটিল এবং ক্রমে তাঁহারা সমগ্রাণ্টলিকে শাসক সাম্রাজ্যের দৃষ্টিতে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিলেন। দয়া বলিয়া তাঁহাদের কিছু রহিল না। বড় বড় নগরে তাঁহাদের ব্যক্তিগত অস্তিত্ব রহিল মাত্র। শ্রীনিবাসশাস্ত্রী ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের নির্দেশে সাম্রাজ্যবাদীদের দূত হইয়া ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে, গভর্নমেন্টের বিরোধিতার জ্ঞাত কংগ্রেস এবং তাঁহার স্বদেশবাসীর নিন্দাপ্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

তথাপি লিবারেলগণ স্বাধীন হইলেন না। নিজের স্বদেশবাসী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জনসাধারণের ক্রুদ্ধ বিরোধকে চোখ কান বুজিয়া অস্বীকার করিলেও তাহা অত্যন্ত তিক্ত এবং অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা, গণ-আন্দোলন সংশ্রুতরূপে ক্ষমা করে না। গান্ধিজী প্রুণঃপুণঃ সাবধান বাণীর ফলে অসহযোগ আন্দোলন তাহার বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি সদয় ও ভদ্র ছিল, অত্যাধিক হইত বলা যায় না। এক দিকে এই আন্দোলন তাহার সমর্থকদিগের মধ্যে যেমন নূতন জীবনীশক্তির উদ্বোধন করিল, তেমনিই অত্র দিকে বিরুদ্ধবাদীরা এই পারিপাশ্বিক অবস্থার মধ্যে নিষ্কিন্ত হইয়া অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে লাগিলেন। গণজাগরণ ও প্রকৃত বৈপ্লবিক আন্দোলন

অসহযোগ

সর্বত্রই বিধার তরবারির মত কাজ করিয়া থাকে; একদিকে ইহা গণনাযকদের ব্যক্তিত্বকে সচেতন করিয়া তোলে, অতীতকে বিরুদ্ধবাদীদের মানসিক অবস্থা নিস্তেজ করিয়া ফেলে। এই কারণে কেহ কেহ যে অসহযোগ আন্দোলন পরমত অসহিষ্ণু এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া বশ ও মতের প্রাণহীন সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে চাহে, এই অভিযোগ করিয়া থাকেন। ইহা সত্য, কিন্তু সেট সত্য এই যে, অসহযোগ আন্দোলন, গণআন্দোলন এবং ইহার নেতার প্রখর ব্যক্তিত্ব ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারীকে অপূর্ণ প্রেরণায় উদ্বোধিত করিয়াছিল।

জনসাধারণের উপর ইহার আশ্চর্য প্রভাব এক মধ্যস্থিত সত্য। পাষণ্ডতার ঠেলিয়া ফেলিয়া এক মহান ভাব ও উন্মাদনায় স্বাধীনতার নবীন আকাজকা জাগিয়া উঠিল। ভয়ের দুর্ভহ ভার দূরে সরিয়া গেল, তাহারা ঋজু মেরুদণ্ড লইয়া শির উন্নত করিল। স্বদূর পল্লীর বাজারে অতি সাধারণ লোকেরাও কংগ্রেস, স্বরাজ, পাঞ্জাব ও খিলাফতের কথা আলোচনা করিতে লাগিল। (নাগপুর কংগ্রেসেই প্রথম স্বরাজ লাভ লক্ষ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হয়)। পল্লী অঞ্চলে ‘খিলাফত’ শব্দটির এক অভিনব অর্থ করা হইত। জনসাধারণ মনে করিত ইহা উর্দু শব্দ ‘খিলাফ’ হইতে আসিয়াছে। তাহার অর্থ বাধা দেওয়া—বিরোধিতা করা। তাহারা করিয়া লইল, ইহার অর্থ গভর্ণমেণ্টের বিরোধিতা করা। অগণিত সভা-সমিতির মধ্য দিয়া জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক জ্ঞান বিস্তৃত হইতে লাগিল। এবং তাহারা নিজেদের বিশেষ অর্থনৈতিক দুর্গতির বিষয় আলোচনা করিতে শিখিল।

কংগ্রেসের কার্যপদ্ধতি লইয়া সমস্ত ১৯২১ সন আমাদের এক অপূর্ণ উন্মাদনার মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছে। আশা উৎসাহ ও উত্তেজনার অন্ত ছিল না। মহা উদ্দেশ্যের জন্ত আত্মসমর্পণের আনন্দে আমরা অভিভূত হইয়াছি। কোন সন্দেহ, কোন দ্বিধা আমাদের ছিল না। সম্মুখে প্রশস্ত পথ—পরম্পরের সহযোগিতা ও উৎসাহের সাহায্যে আমরা সৈনিকের দৰ্প লইয়া অগ্রসর হইয়াছি, যে শ্রম কখনও কল্পনা করি নাই আমরা ততোধিক শ্রম করিয়াছি। আমরা জানিতাম, গভর্ণমেণ্টের সহিত সংঘর্ষ অনিবার্য—আসন্ন। সেইজন্য কক্ষক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইবার পূর্বে যতটা সম্ভব কাজ করিবার জন্ত আমরা চেষ্টা করিয়াছিলাম।

সর্বোপরি স্বাধীনতার অমুভূতি, স্বাধীনতার গর্বে আমাদের মন ভরিয়া উঠিল। পুণ্ডিত আশাভঙ্গ জনিত মনের দুর্ভহ ভার অন্তর্হিত হইল। ফিস্ ফাস্ করিয়া কথা বলা, শাসকবর্গের দণ্ড এড়াইবার জন্ত ঘুরাইয়া

কিরাইয়া আইনসম্বন্ধে বক্তৃতা করার প্রয়োজন আর রহিল না। আমরা যাহা ভাবিতাম, তাহাই উচ্চৈশ্বরে প্রকাশ করিতাম। ফল যাহাই হউক কি আসে যায়? কারাগার? তাহাতে আমাদের উদ্দেশ্য অধিকতর সাফল্য লাভ করিবে। অগণিত গুপ্তচর এবং গোয়েন্দা বিভাগের ব্যক্তির আামাদের পিছনে পিছনে সর্বদাই ঘুরিত। এই বেচারাদের কি ছরবস্থা! কেননা, আবিষ্কার করিবার মত গোপন কোন কিছুই নাই। কেননা, আমাদের মন মুখ ছিল এক।

আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ভারতবর্ষের এই দ্রুত পরিবর্তন দেখিয়া আমরা বিশ্বাস করিতাম স্বাধীনতা নিকটবর্তী হইতেছে। আমাদের রাজনৈতিক কার্যের সাফল্য আমরা আনন্দিত হইতাম। আমাদের উদ্দেশ্য ও উপায় বিরুদ্ধ দল অপেক্ষা উন্নততর। এজন্য আমরা তাহাদের অপেক্ষা নৈতিক দিক দিয়া নিজেদের শ্রেষ্ঠতর মনে করিতাম। এক অভিনব পন্থার আবিষ্কারক আমাদের নেতার জন্ম আমরা গর্ব বোধ করিতাম। এই গর্ব সময় সময় আমাদের মাঝে ধর্মোন্মাদনায় অভিভূত করিত। চারিদিকের সংঘর্ষের মধ্যেও এবং সংঘর্ষে রত থাকিয়াও আমরা এক অপূর্ণ মানসিক শান্তি অনুভব করিতাম।

আমাদের নৈতিক শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেন্ট বিহ্বল হইলেন। তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না যে কি ঘটতেছে। মন হইতে লাগিল, ভারতবর্ষে তাহাদের পরিচিত প্রাচীন ব্যবস্থা ওলট পালট হইয়া যাইতেছে। সর্বত্র এক আক্রমণোন্মুখ শক্তির বিকাশ, এবং নিভীক আত্মপ্রত্যয়, ব্রিটিশ শাসনের যে প্রধান স্তম্ভ—মর্যাদা, তাহাই যেন মুষড়াইয়া পড়িল। অতি সামান্য পরিমাণ দমননীতি আমাদের অনেক অধিকতর শক্তিশালী করিল। বড় বড় নেতাদের বিরুদ্ধে কিছু করিতে গভর্ণমেন্ট দীর্ঘকাল ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কি প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইতে পারে তাহা তাঁহারা ভাবিয়া পাইলেন না। ভারতীয় সৈন্যদলকে কি পূর্ণভাবে বিশ্বাস করা যায়? পুলিশ কি আমাদের আদেশ পালন করিবে? ভাইসরয় লর্ড রেডিং ১৯২১-র ডিসেম্বর মাসে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা “ইতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়” (puzzled and perplexed)।

১৯২১-এর গ্রীষ্মকালে যুক্তপ্রদেশের গভর্ণমেন্ট, জিলা কমিশনারীদের নিকট একখানি কৌতুককর ইস্তাহার প্রেরণ করেন। পরে উহা সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হইয়াছিল। ‘শতরুই’ (অর্থাৎ কংগ্রেস) আশু মুষড়াইয়া সব কিছু করিতেছে, এজন্য উহাতে ক্ষোভ প্রকাশ করা হইয়াছিল। সরকারের তরফ হইতে কিছু করিবার জন্য নানা উপায় চিন্তা করা চলি লাগিল।

অসহযোগ

ইহার ফলেই হাশ্বকর ‘আমান সভার’ সৃষ্টি। লোকের বিশ্বাস, এই উপায়ে অসহযোগ আন্দোলনের বিশোধিতা করাব সিদ্ধান্ত একজন ডায়েট মন্ত্রী আবিষ্কার।

বহু ব্রিটিশ শাসকের মন তাক্ষিয়া পড়িতে লাগিল। চাপ অত্যন্ত অধিক। ক্রমবর্দ্ধিত বিরোধিতা এবং অবাধ্যতা যেন বর্ষার কালো মেঘের মত সরকারী চিত্তগগন ছাইয়া ফেলিল। শান্তিপূর্ণ ও অহিংস আন্দোলনকে বলপূর্ব্বক দাবাইয়া দিবার কোন পথ তাঁহারা খুঁজিয়া পাইলেন না। সাধারণ ইংরাজগণ অহিংসাকে বিশ্বাস করিতেন না; তাঁহারা উহাকে এক কৌশলপূর্ণ আবরণ মনে করিতেন এবং ভাবিতেন ইহার অন্তরালে এক হিংসামূলক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের গুপ্ত ষড়যন্ত্র চলিতেছে। রহস্যময় প্রাচ্য সম্পর্কে পাশ্চাত্যের বদ্ধমূল ধারণার মধ্যে লালিত পালিত ইংরাজ সম্ভান বাল্যকাল হইতেই এরূপ ভাবিতে অভ্যস্ত হয়। সে মনে করে, বাজারে সন্ধ্যা গলিপথে না জানি কত গুপ্ত ষড়যন্ত্র চলিয়াছে। এইরূপে কল্পিত রহস্যবৃত্ত দেশ সম্পর্কে ইংরাজ কদাচিৎ সরলভাবে চিন্তা করিতে পারে। প্রাচ্যবাসীও যে রহস্যহীন সাধারণ মানুষ তাহা বুঝিবার জ্ঞান সে চেষ্টাও করে না। সে প্রাচ্যবাসীর সংশ্রব হইতে দূরে সরিয়া থাকে। গুপ্তচর ও গুপ্তসমিতি ঘটিত গল্প ও উপন্যাস হইতে ধারণা সংগ্রহ করিয়া কল্পনায় শিহরিয়া উঠে। ১৯১৯-এর এপ্রিলে পঞ্জাবে তাহাই ঘটয়াছিল। কর্তৃপক্ষ ও সাধারণ ইংরাজগণ ভয়ে অভিভূত হইয়া সর্বত্র বিপদের বিভীষিকা দেখিতে লাগিলেন। দেশব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থান এবং ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের আয়োজন লইয়া যেন এক দ্বিতীয় বিদ্রোহ আসন্ন। যে-কোনও উপায়ে আত্মরক্ষা করিবার অন্ধ আদিম মনোবৃত্তিধারা চালিত হইয়া তাহারা এক ভয়াবহ কাণ্ডের অবতারণা করিলেন যাহা উত্তর কালে জালিয়ানাবাগ এবং অমৃতসরের বৃকেইটা গলিরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ১৯২১ সালে শাসক ও শাসিতের মনোমালিন্য চরমে উঠিয়াছিল। শাসকগণের বিরক্তি, ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবার কারণেরও অভাব ছিল না। যাহা কার্য্যতঃ ঘটতেছিল তাহাকে কল্পনায় তাহারা আরও বড় করিয়া দেখিতেছিল। শাসকগণের কল্পনার আতিশয্যের একটি দৃষ্টান্ত আমার মনে আছে। ১৯২১ সালে ১০ই মে এলাহাবাদে আমাদের ভগ্নী স্বরূপের বিবাহ স্থির হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, বিবাহ উপলক্ষ্যে সাধারণভাবে সমস্ত পঞ্জিকাছুসারে এই শুভদিন নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষ্যে গান্ধিজী ও অন্যান্য প্রধান নেতাগণ ও আলী ভ্রাতৃদ্বয় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সুরবিধার জ্ঞান এ সময় এলাহাবাদে কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশনও নির্দ্ধারিত

জওহরলাল নেহরু

হইয়াছিল। বাহিরের খ্যাতনামা নেতাদের আগমনের সুযোগে স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীরা বেশ জাকজমকের সহিত একটি জিলা সম্মেলনের ব্যবস্থা করিলেন। চারিদিকের গ্রাম হইতে বহুসংখ্যক ইহাতে যোগ দিবে, এইরূপ প্রত্যাশা ছিল।

এই সকল রাজনৈতিক সম্মেলনের আয়োজনে এলাহাবাদে যথেষ্ট পরিমাণে গুণগোণ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। ইহাতে কতকগুলি লোকের টনক নড়িয়া উঠিল। একদিন আমার এক ব্যারিষ্টার বন্ধুর নিকট শুনিলাম, অনেক ইংরাজ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া মনে করিতেছেন শীঘ্রই এই নগরে একটা উলটপালট উপস্থিত হইবে। তাহারা ভারতীয় ভূতাদিগকে অবিশ্বাস করিতে লাগিলেন ও পকেটে রিভলভার লইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ইহাও বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল যে, স্থানীয় ইংরাজবাদীরা যাহাতে এলাহাবাদ দুর্গে আশ্রয় লইতে পারেন তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আমি আশ্চর্য্য হইলাম এবং এই শ্রেণীর ধারণা কেমন করিয়া সম্ভব হইল ভাবিয়া পাইলাম না। অহিংসা মন্ত্রের শ্রমি যখন স্বয়ং আসিতেছেন তখন এই ঘুমন্ত শান্তিপূর্ণ এলাহাবাদ নগরীতে সশস্ত্র অভ্যুত্থান সম্ভবপর, ইহা বাতুলের কল্পনা। এমন কি, ইহা পর্য্যন্ত কানাকানি হইয়াছিল যে, ১০ই মে (ঘটনাক্রমে আমার ভ্রমীর বিবাহের জন্ম নিরূপিত দিবস) ১৮৫৭-এর মিরাত বিদ্রোহের দিবস এবং তাহার স্মৃতি-বার্ষিকী অচুষ্টিত হইবে।

(১৯২১ সালে খিলাফত আন্দোলনকে প্রাধান্য দেওয়ার ফলে বহু সংখ্যক মৌলবী ও মুসলমান ধর্ম প্রচারকগণ রাজনৈতিক সংসর্গে যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহারা আন্দোলনের উপর ছাপ আনিয়াছিলেন যাহাতে মুসলমান জনতা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইত।) অনেক পাশ্চাত্যভাবাপন্ন মুসলমান, যাহারা ধর্ম লইয়া মাথা ঘামাইতেন না তাঁহারাও দাড়ি রাখিতে আরম্ভ করিলেন এবং ধর্মাচরণে নৈষ্ঠিক হইয়া উঠিলেন। পাশ্চাত্য ভাবের ক্রমপ্রসার ও নূতন নূতন চিন্তার ফলে যে মৌলবীদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি স্বাভাবিকরূপে কমিয়া আসিতেছিল তাঁহারা পুনরায় প্রবল হইয়া মুসলমান সমাজের উপর আধিপত্য বিস্তার করিল। আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের ধর্মপ্রবণ মনের ধর্মপ্রবণতা হইল ইহার সহায়ক, গান্ধিজীও ঐরূপ এবং তিনিও মৌলবী ও মৌলনাদের প্রতি অত্যন্ত অসহ্য।

(বলা বাহুল্য, গান্ধিজী সর্বদাই আন্দোলনের ধর্ম ও আধ্যাত্মিক ভঙ্গীর উপর জোর দিতেন। তাঁহার অবশ্য ধর্মের গোড়ামী ছিল না। তথাপি সমগ্র আন্দোলনের মধ্যে এক ধর্মের জাগরণ অল্পভূত হইল এবং জনসাধারণের

অসহযোগ

মধ্যেও এই আন্দোলন ধর্মজীবনের আকাজক্ষা জাগাইল। অধিকাংশ কংগ্রেসকর্মী স্বাভাবিকরূপেই গান্ধিজীর জীবনাদর্শে নিজেদের জীবন গড়িতে লাগিলেন, এমন কি, তাঁহার ভাষা ধ্যান নকল করিতেন।^(১) কিন্তু গান্ধিজীর প্রধান সহকর্মীরা—কাধ্যাকরী সমিতির সদস্যেরা, অর্থাৎ আমার পিতা, দেশবন্ধু দাশ* এবং অগ্গাণ্ড সকলে নাধারণভাবে ধর্মপাণ ব্যক্তি ছিলেন না। এবং তাঁহারা রাজনৈতিক সমস্যাগুলিকে রাজনৈতিক ভিত্তিতেই বিবেচনা করিতেন। তাঁহারা জনসভায় বক্তৃতায় ধর্মের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেন না। কিন্তু বাক্য অপেক্ষা তাঁহাদের ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের প্রভাবই ছিল বেশী। জগতের লোক যাহা কামনা করে সেই ঐহিক স্তরে তাঁহারা বহুলাংশে ত্যাগ করিয়া সাধারণ জীবন যাপন করিতেন। ইহাকে লোকে ধর্মের লক্ষণ বলিয়াই মনে করিত এবং ইহা ধর্মভাব জাগরণের সহায়ক হইয়াছিল।

(২) কি হিন্দু কি মুসলমান—আমাদের রাজনীতির মধ্যে এই ধর্মভাবের আধিক্য দেখিয়া আমি বিব্রত হইতাম। আমার ইহা ভাল লাগিত না। অধিকাংশ মোলবী, মোলনা, স্বামীরা জনসভায় যে ভাবে বক্তৃতা করিতেন তাহা আমার নিকট ক্রেশ্ণকর মনে হইত। তাঁহারা ইতিহাস, সমাজনীতি অর্থনীতির সহিত ধর্মের ওড়ন পাড়ন দিয়া সরল ভাবে চিন্তা করিবার পথ রুদ্ধ করিতেন। আমার নিকট ইহা অগ্গায় বলিয়া মনে হইত। গান্ধিজীর কতকগুলি উক্তিও আমার কানে বাজিত।^(৩) তিনি প্রথমই রামরাজ ও সত্যযুগ ফিরিয়া আনিবার কথা উল্লেখ করিতেন, কিন্তু ইহা নিবারণ করিবার শক্তি আমার ছিল না। জনসাধারণের সুপরিচিত ও সহজবোধ্য বলিয়াই গান্ধিজী ঐ শ্রেণীর উক্তি করিয়া থাকেন, ইহা মনে করিয়া আমি সামান্যলাভের চেষ্টা করিতাম। জনসাধারণের হৃদয় স্পর্শ করিবার তাঁহার এক আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল।^(৪)

(৫) কিন্তু ইহা লইয়া আমি বেশী মাথা ঘামাইতাম না। আমার হাতে ছিল বহু কাজ, আমি মনে করিতাম আন্দোলনের অগ্রগতির তুলনায় এ সকল বিষয় অতি তুচ্ছ। বৃহৎ আন্দোলনে সকল শ্রেণীর সকল মতের লোকই যোগ দিয়া থাকে। যদি আমাদের মূল লক্ষ্য অব্যাহত থাকে, এই সব ছোটখাট বিক্ষোভ ও সঙ্কীর্ণতাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু গান্ধিজী এক দুর্বোধ্য বিশ্বয়! সময় সময় তাঁহার ভাষা একজন আধুনিকের পক্ষে বোঝা কঠিন হইত। কিন্তু তিনি একজন মহান ও

অনন্তসাধারণ ব্যক্তি, তাঁহার যশস্বী নেতৃত্বের উপর পূর্ণ আস্থা লইয়া আমরা প্রায় নির্বিচারে, অন্ততঃ সাময়িকভাবে, তাঁহাকে অনুসরণ করিতে লাগিলাম। সময় সময় আমরা নিজেদের মধ্যে রহস্য ছলে তাঁহার খেয়াল ও বিশেষত্বগুলি আলোচনা করিতাম এবং বলিতাম, যখন স্বরাজ আসিবে তখন ঐসব খেয়ালে উৎসাহ দিব না।

আমাদের মধ্যে অনেকে রাজনীতি ও অগ্ন্যাগ্ন বিষয়ে তাঁহার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইলেও তাঁহার বিশিষ্ট ধর্মমত সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলাম। প্রত্যক্ষভাবে ধর্মভাব আমার মধ্যে সঞ্চারিত না হইলেও ইহার পরোক্ষ প্রভাব হইতে আমি সম্পূর্ণরূপে আত্মরক্ষা করিতে পারি নাই। ধর্মের বাহ্য আচরণের উপর আমার কোনও আকর্ষণ ছিল না। তথাকথিত ধার্মিকরূপে জনসাধারণকে ভুলাইবার চেষ্টা আমি অত্যন্ত অপছন্দ করিতাম। কিন্তু তথাপি এই বিষয়ে আমার মনের উগ্রতা কমিয়া গেল। ১৯২১ সালে আমার মনে ধর্মজীবনের নিয়মানুবর্তিতার একটা ছাপ পড়িয়াছিল যাহা আশৈশব কখনও অনুভব করি নাই। কিন্তু তথাপি ধর্ম হইতে আমি দূরেই ছিলাম।

আমাদের আন্দোলন ও সত্যগ্রহের নৈতিক বিধিবদ্ধ সংযমপ্রণালী— আমার ভাল লাগিত। অহিংসার পথকে আমি কোন দিনই চরমভাবে গ্রহণ করি নাই, কিন্তু ক্রমে ইহার উপর আমার আস্থা বাড়িয়াছিল। আমাদের বর্তমান অবস্থায় এবং আমাদের পরম্পরাগত সংস্কারের প্রভাবে আমাদের পক্ষে ইহাই প্রকৃত পথ, আমার মনে এইরূপ বিশ্বাসই জন্মিয়াছিল। সঙ্কীর্ণ ধর্মপথের উর্দ্ধে থাকিয়া রাজনীতিকে আধ্যাত্মিকতায় অনুপ্রাণিত করিবার আদর্শ আমার ভালই মনে হইত। মহৎ উদ্দেশ্য, মহান উপায়েই সিদ্ধ হয়। ইহা যে কেবল একটা নৈতিক পথ তাহা নহে, বাস্তব রাজনীতিতেও ইহার মূল্য আছে; কেন না, উপায় যদি ভাল না হয় তাহা হইলে উদ্দেশ্য বার্থ হইয়া নূতন বাধার সৃষ্টি করিতে পারে। তখন আমার মনে হইত, পঙ্কিল পথ অবলম্বন কি ব্যক্তি কি জাতির পক্ষে মর্যাদাহানিকর ও অশোভনীয়। পঙ্কিল পথের কলঙ্কমণ্ডলিত হইতে আত্মরক্ষার উপায় কি? যদি আমরা নত হইয়া সর্বাস্থ্যের মত চলি তাহা হইলে আত্মমর্যাদার সহিত উন্নত শিরে কেমন করিয়া অগ্রসর হইব?

তখন এইরূপে অনেক চিন্তা করিতাম। অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে আমার প্রাণিত বস্তু পাইলাম। জাতীয় স্বাধীনতার লক্ষ্য—দুর্বলের শোষণের অবসান—আমার মনের মধ্যে এক অপূর্ণ তৃপ্তি আনিল। আমি যেন ব্যক্তিগতভাবে মুক্তির স্বাদ পাইলাম। আমি এত উল্লসিত হইলাম

যে, বার্থতার সম্ভাবনা পর্যাস্ত গণনার মধ্যে আনিলাম না, ভাবিতাম বার্থতা আসিলেও তাহা ক্ষণস্থায়ী। ভাগবৎ গীতার দার্শনিক তত্ত্ব আমি বুঝিতামও না কিহা উহার মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টাও করিতাম না। প্রতিদিন সন্ধ্যায় গাঙ্কিজীর আশ্রমিক প্রার্থনায় যোগ দিয়া গীতার শ্লোক পাঠ করিতাম। যাহার মধ্যে মানবজীবনের আদর্শের ইঙ্গিত ছিল—বীর, বিগতস্পৃহ ও অল্পবিশ্ব ইহয়া কর্তব্য কর্ম কর, ফলের জ্ঞান লক্ষ্য ইহও না। আমার অনীর ও অশাস্ত চিত্ত এই আদর্শে আকৃষ্ট হইত।

১১

১৯২১ এবং প্রথম কারাদণ্ড

১৯২১ আমাদের নিকট এক স্বর্ণীয় বৎসর। জাতীয় সভা রাজনীতি, ধর্ম, অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদ এবং ধর্মোদ্ধ গোড়ামীর এক আশ্চর্য মিলন মিশ্রণ। এই পটভূমিকার উপর পল্লীতে কৃষকচাঞ্চল্য এবং বৃহৎ নগরীগুলিতে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন মাথা তুলিতেছিল। জাতীয়তা এবং তৎসংশ্লিষ্ট অস্পষ্ট অথচ গভীরব্যাপক আদর্শবাদ এই সকল বিভিন্ন এবং স্থানে স্থানে স্ববিরোধী অসন্তোষগুলিকে একই ক্ষেত্রে মিলিত করিতে আশ্চর্য সাফল্য লাভ করিয়াছিল। এই জাতীয়তাবাদ একটা মিলিত শক্তি, ইহার পশ্চাতে হিন্দু জাতীয়তাবাদ এবং ভারতের ভৌগলিক সীমার বাহিরে প্রসারিত দৃষ্টি মুসলমান জাতীয়তাবাদের পার্থক্য স্পষ্ট ছিল। কিন্তু তৎসঙ্গেও সময়ের গুণে ইহা এক ভারতীয় জাতীয়তাবাদরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। কিছুকালের জ্ঞান ইহা পরস্পর মিলিয়া একত্রে চলিতে লাগিল। সর্বত্র ‘হিন্দু-মুসলমান কি জয়ধ্বনি’, গাঙ্কিজী এই বিচিত্র বিভিন্ন শ্রেণীর জনসম্মুখে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত করিতে লাগিলেন, ইহা আশ্চর্য। (অন্য এক নেতার সম্পর্কে কথিত উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলা যায়) গাঙ্কিজী “জনসাধারণের বিমূঢ় আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক।”

সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য ঘটনা হইল এই, এইসকল আকাঙ্ক্ষা ও আবেগ বৈদেশিক শাসকসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইলেও ইহার মধ্যে বিশেষ

বিদ্বেষের ভাব ছিল না। জাতীয়তাবাদের মূলে রহিয়াছে এক বিরুদ্ধভাব। পরজাতিবিদ্বেষ ও ঘৃণার মধ্যেই, বিশেষতঃ পরাধীন দেশে বিদেশী শাসকবৃন্দের বিরুদ্ধতার মধ্যেই, ইহা পরিপুষ্ট ও সঞ্জীবিত থাকে। ১৯২১-এর ভারতবর্ষে নিশ্চয়ই ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও ঘৃণা ছিল, কিন্তু অনুরূপ অবস্থায় পতিত অন্যান্য দেশের তুলনায় ইহা অতি আশ্চর্যরূপে অল্প ছিল, গান্ধিজীর অহিংসা নীতির প্রয়োগ-তত্ত্ব ব্যাখ্যার ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল নিঃসন্দেহ। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে জাগ্রত দেশব্যাপী শক্তির অনুভূতি এবং অদূর ভবিষ্যতেই সাফল্যের উপর পূর্ণ বিশ্বাসই ইহার অগ্রতম কারণ। যখন আমরা কুশলতার সহিত কার্য্য করিতেছি এবং সিদ্ধির সম্ভাবনা আসন্ন তখন আমরা কেন বৃথা বিদ্বেষের বশে ক্রুদ্ধ হইব? আমরা ভাবিতাম উদারতা দেখাইলেও আমাদের ক্ষতি নাই। যদিও আমাদের কার্য্যধারা সতর্ক ও নিয়মাবলী ছিল তথাপি আমাদের যে সকল স্বদেশবাসী বিরুদ্ধ দলে যোগ দিয়া জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধতা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি আমরা উদার ছিলাম না। এখানে ক্রোধ ও বিদ্বেষের কথা ছিল না, কেন না, তাঁহারা এতই নগণ্য শক্তি যে, আমরা তাঁহাদিগকে অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা করিতাম। কিন্তু তাঁহাদের দুর্বলতা, সুবিধাবাদ, আত্মমর্য্যাদা ও জাতীয়সম্মানের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার জন্য আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক ঘৃণা করিতাম।

(আমরা কর্ম্মের আনন্দে মাতিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম কিন্তু আমাদের লক্ষ্য সম্পর্কে কোনই স্পষ্ট ধারণা ছিল না। এখন আশ্চর্য্য হইয়া ভাবি, তখন আমাদের আন্দোলনের কি তত্ত্বের দিক, কি দার্শনিক দিক কিম্বা আমাদের নিশ্চিত লক্ষ্য কি হওয়া উচিত, সে বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা কেন করি নাই। অবশ্য আমবা সকলে মিলিয়া উচ্চকণ্ঠে স্বরাজের কথা বলিতাম কিন্তু প্রত্যেকে নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী উহার ব্যাখ্যা করিতাম। আন্দোলনের তরুণ বয়স্ক ব্যক্তিরা ইহাকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক শাসনপ্রণালী বলিয়া মনে করিতেন এবং আমরা জনসভায় তাহাই বলিতাম। আমরা অনেকে ভাবিতাম, ইহার ফলে কৃষক ও শ্রমিকদের বোঝা অনেকাংশে লাঘব হইবে। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ নেতা স্বরাজ বলিতে স্বাধীনতা অপেক্ষা অনেক কম বুঝিতেন। গান্ধিজী নিরুদ্দিগ্ধ চিন্তে বিষয়টিকে অস্পষ্ট করিয়া রাখিতেন এবং এ বিষয়ে কোনও স্পষ্ট চিন্তাকে প্রত্যাখ্যান দিতেন না।) কিন্তু তিনি সর্বদাই নারীদের সুশুভবিধার কথা উল্লেখ করিতেন বলিয়া আমরা স্বপ্তি বোধ করিতাম, অবশ্য সেই সঙ্গে তিনি ধনীদিগকেও যথোচিত আশ্বাস দিতেন। (গান্ধিজী কখনও কোন সমস্তাকে যুক্তিবাদের

দিক হইতে দেখিতেন না, তিনি চরিত্র ও ধর্মের উপর ঝোঁক দিতেন। ভারতীয় জনসাধারণের চরিত্র ও সাহসিকতাকে তিনি আশ্চর্যরূপে দৃঢ় করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সাক্ষপাঙ্গদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন যাহারা কি সাহসিকতা কি চরিত্র কোনটাই অজ্ঞান করিতে পারেন নাই অথচ মনে করিতেন শিথিল ও স্থলদেহের নিরীহ অভিব্যক্তিই ধার্মিকের লক্ষণ।

গান্ধী-নির্দিষ্ট সংঘের আদর্শে অনুপ্রাণিত জনসম্মুখে দেখিয়া আমরা আশাব্যস্ত হইলাম। পদদলিত অধঃপতিত ছত্রভঙ্গ জনসাধারণ সহসা মেরুদণ্ড সোজা করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, এবং অপূর্ব শৃঙ্খলার সহিত ঐক্যবদ্ধ কার্য করিতে লাগিল। আমরা ভাবিনাম, এই কার্যপ্রণালী জনগণের শক্তিকে দুর্দমনীয় করিয়া তুলিবে। কাজের পশ্চাতে যে চিন্তা থাকা আবশ্যক, আমরা তাহা ভুলিয়া গেলাম। আমরা ভুলিয়া গেলাম যে, মতবাদ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে চেতনা না থাকিলে জনসাধারণের এই শক্তি ও উৎসাহ বাষ্পের মত উড়িয়া যাইবে। আমাদের আন্দোলনের পুনরুত্থানবাদী দল কাজ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। ইহারা এই ভাবের সৃষ্টি করিলেন যে, রাজ ও অর্থনৈতিক আন্দোলন অথবা অস্ত্রায়ের প্রতিকারের জন্ত অহিংস কার্যপ্রণালী একটা নূতন বাণী, যাহা ভারতবাসীর নিকট হইতে জগৎ শিক্ষালাভ করিবে। সকল জাতির সকল সম্প্রদায়ের চিত্রে, আমরাই ঈশ্বরের বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্ত নির্বাচিত বলিয়া যে কৌতুককর ভ্রান্ত ধারণা থাকে, আমরাও অনেকেংশে ঐরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া পড়িলাম। যুদ্ধ বা অস্ত্রাস্ত্র সহিংস শক্তির অনুরূপ অহিংসাও একটি নৈতিক অস্ত্র। ইহা যে কেবল নীতিসম্মত তাহা নহে, কার্যকরীও বটে। আমার বিশ্বাস, আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই গান্ধিজীর যন্ত্র ও আধুনিক সভ্যতাসম্মত পুরাতন মতবাদ মানিয়া লইয়াছিল। আমরা ভাবিতাম, তিনি নিজেও উহা অবাস্তব কল্পনা এবং আধুনিককালে কার্যে পরিণত করা অসম্ভব বলিয়া মনে করিতেন। আমরা নিশ্চয়ই আধুনিক সভ্যতার আবিষ্কারগুলি বর্জন করিবার পক্ষপাতী ছিলাম না; আমরা ভাবিতাম, ভারতের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী ঐগুলি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে গ্রহণ করা সম্ভবপর। ব্যক্তিগতভাবে বৃহৎ কলকারখানা ও দ্রুত ভ্রমণের উপর একটা আকর্ষণ আছে, তথাপি মহাত্মা গান্ধীর মতবাদে অনেকেই প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন এবং অস্ত্র ও তাহার পরিণাম সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করিতেন। একদল চাহিলেন ভবিষ্যতের দিকে আর একদল অতীতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু

আশ্চর্য্য এই, পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণু হইয়া তাঁহারা একই উদ্দেশ্যে কার্য্য করিতে লাগিলেন এবং অবলীলাক্রমে ত্যাগ স্বীকার ও দুঃখ বরণ করিতে লাগিলেন।

আমি সম্পূর্ণরূপে আন্দোলনের মধ্যে আরও অগ্ন্যাগ্নের মতই ডুবিয়া গেলাম। পুরাতন বন্ধুবান্ধব, বিশ্রাজ্জালাপ, খেলাধূলা, পুস্তক পাঠ—এ সকলই আমাকে ছাড়িতে হইল। এমন কি, আমাদের কাজের খবর ছাড়া সংবাদপত্রও ভাল করিয়া পড়িবার সময় পাইতাম না। এ কাল পর্য্যন্ত জগন্মাপারের গতি ও পরিণতিগুলির সহিত পরিচিত থাকার জগ্ন কিছু কিছু সমসাময়িক পুস্তক পাঠ করিয়াছি। কিন্তু এখন আর তাহা সম্ভব হইয়া উঠে না, আমার পারিবারিক জীবনের বন্ধন দৃঢ় হইলেও আমি আমার পরিবারবর্গ স্বী ও কন্যাকে প্রায় ভুলিয়া থাকিতাম। বহুদিন পরে এই কালের কথা ভাবিতে গিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছি যে, আমার পত্নী কি আশ্চর্য্য ধৈর্য্যসহকারে আমার এই অবজ্ঞা সহ্য করিয়াছেন। আকিস, কমিটি এবং জনতা—এই তিন লইয়া আমার দিন কাটিত। ‘পল্লীতে প্রচার করা’ ইহাই ছিল আন্দোলনের বাণী এবং আমরা মাইলের পর মাইল পদব্রজে শস্যক্ষেত্র, প্রাস্তর, অতিক্রম করিয়া দূর দূরান্তরে গ্রামে যাইতাম এবং কৃষকসভায় বক্তৃতা করিতাম, জনগণের চিন্তের আবেগ আমাকে মুগ্ধ করিত। জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার শক্তির অল্পভূতিতে আমি পুলকিত হইলাম, জনতার মনোভাব আমি ক্রমে বুঝিতে লাগিলাম।) সহরের জনতা ও কৃষকদের মধ্যে পার্থক্য আমি বুঝিতে লাগিলাম। বৃহৎ জনতার ঠেলাঠেলি, হুড়াহুড়ি, ধূলি এবং অগ্ন্যাগ্ন অস্থবিধার মধ্যেও আমি বেশ আরাম বোধ করিতাম। অবশ্য তাহাদের শৃঙ্খলার অভাব মাঝে মাঝে আমাকে বিরক্ত করিত। ইহার পর আমি কয়েকবার কৃষ্ণ ও বিরুদ্ধভাবাপন্ন জনতার সম্মুখীন হইয়াছি, তাহাদের উত্তেজনা প্রকট ফুলিঙ্গে জলিয়া উঠিতে পারিত কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা ও আত্মবিশ্বাসের বশে আমি অবিচলিত থাকিয়াছি। আমি জনতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সোজা তাহাদের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইতাম; তাহার ফলে সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারই পাইয়াছি। এমন কি মনে না মিলিলেও ভিন্ন ব্যবহার পাই নাই। কিন্তু জনতা অস্থির ও চপলমতি, হয়ত ভবিষ্যতের গর্ভে আমার জগ্ন ভিন্ন রূপ অভিজ্ঞতা রহিয়াছে।

আমি জনসাধারণের মধ্যে মিশিয়াছি, জনসাধারণও আমাকে গ্রহণ করিয়াছে, তথাপি আমি তাহাদের সহিত এক হইতে পারি নাই, নিজে সর্বদাট স্বতন্ত্র ভাবিয়াছি। আমার স্বতন্ত্র মানসিক স্বর হইতে

জনসাধারণকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে দেখিতাম। আমরা এই বিশ্বয় চিরদিনের যে, আমি আমার চারিদিকের সহস্র সহস্র ব্যক্তি হইতে সকল দিক দিয়াই পৃথক,—অভ্যাস পৃথক, আকাঙ্ক্ষা পৃথক, মানসিক ও সংস্কৃতিগত দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক, অথচ কেমন করিয়া ইহাদের সদিচ্ছা ও বিশ্বাস অর্জন করিলাম। আমি যাহা নই তাহারা কি তাহাই ভাবিয়া আমাকে গ্রহণ করিয়াছিল? যখন তাহারা আমাকে ভাল করিয়া জানিবে, তখনও কি সহ্য করিবে? আমি কি মিথ্যা ছলনায় তাহাদের সদিচ্ছা লাভ করিয়াছি? আমি সরলভাবে সোজাসুজি তাহাদের সাহিত কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছি, এমন কি, সময় সময় কর্কশ বাক্য ব্যবহার করিয়াছি, তাহাদের মজ্জাগত বিশ্বাস ও কথাগুলির তীব্র সমালোচনা করিয়াছি, কিন্তু তথাপি তাহারা আমাকে অকাতরে সহ্য করিয়াছে। তথাপি আমার মন হইতে এই ধারণা গেল না, তাহাদের এই যে স্নেহ তাহা আমি যাহা তাহার প্রতি নহে, তাহারা কল্পনায় আমার এক স্বতন্ত্র মূর্তি গড়িয়া ভালবাসিয়াছে। এই কল্পনা গঠিত মূর্তি কতদিন থাকিবে এবং কেনই-বা থাকিবে এবং যখন উহা ভাঙ্গিয়া পড়িবে তখন তাহারা দেগিবে বাস্তব মূর্তি এবং তার পর? আমার মধ্যে অনেক লঘু চাপলা আছে কিন্তু এই সকল জনতার সম্মুখে অহঙ্কারের প্রশ্ন আসিতেই পারে না। আমাদের মধ্যশ্রেণীর অনেকে যেমন নিজেদের জনসাধারণ হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করেন, সেরূপ কোন স্থূল রুচি বা অভিনয়ের ভাবও আমাতে ছিল না। এই জনতা নির্বোধ, ব্যক্তিগতভাবে বৈচিত্র্যহীন কিন্তু তাহাদের বৃহৎ সম্মেলন আমার চিত্তকে করুণায় দ্রব এবং প্রত্যশন দুঃখের ছায়ায় ঘনায়মান করিয়া তুলিত।

কিন্তু যেখানে বক্তৃতামঞ্চের উপর আমাদের বিশিষ্ট কর্মীদের লইয়া আমরা রাজনৈতিক সম্মেলন করিতাম তাহা ছিল স্বতন্ত্র, সেখানে অভিনয়ের ভঙ্গী, নিজেকে জাহির করিবার স্থূল রুচি এবং ফেনায়িত ভাষায় বক্তৃতা করিবার কোন অভাব হইত না। এ বিষয়ে আমরা সকলেই অগ্নাধিক দোষী, কিন্তু ছোটখাট খিলাফৎ নেতাদের এ বিষয়ে জুড়ি ছিল না। বৃহৎ শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া স্বাভাবিক ভাব রক্ষা করা কঠিন এবং আমাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকের এমন আত্মপ্রচারের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল; কাজেই আমরা বাহিরে গম্ভীর ও ভব্য হইয়া নেতার ভাবভঙ্গী নকল করিতে চেষ্টা করিতাম। কোন উচ্ছ্বাস বা লঘুচাপলা প্রকাশ না পায় সেদিকে সচেষ্ট থাকিতাম। আমরা হাঁটিবার সময়, বসিবার সময় ও কথা বলিবার সময় হিসাব করিয়া চলিতাম। সহস্র সহস্র চক্ষু যে আমাদের দেখিতেছে সে সম্বন্ধে বিশেষ

জগদ্বয়লাল নেহরু

সচেতন থাকিতাম। আমাদের বক্তৃতা প্রায়ই খুব জোরালো হইত। কিন্তু তাহা এলোমেলো ও লক্ষ্যহীন। অপরে যেমন করিয়া দেখে তেমন করিয়া নিজেকে দেখা কঠিন। সেইজন্য নিজেকে সমালোচনা করিতে অক্ষম হইয়া আমি অপরের ভাবভঙ্গীগুলি নিপুণভাবে লক্ষ্য করিতাম। এবং ইহাতে আমি প্রচুর আমোদ পাইতাম এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাবিয়া আতঙ্কিত হইতাম, হয়ত বা আমার ভাবভঙ্গী অপরের নিকট একরূপ হাস্যোদ্দীপক মনে হয়।

সমস্ত ১৯২১ সাল ধরিয়া কংগ্রেসকর্মীদের গ্রেফতার ও কারাদণ্ড চলিতে লাগিল। কিন্তু তখনও ব্যাপকভাবে ধরপাকড় আরম্ভ হয় নাই। ভারতীয় সৈন্যদলে অসন্তোষ সৃষ্টির অভিযোগে আলী-ভ্রাতৃদ্বয় দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। যে বক্তৃতার জগু তাঁহাদের কারাদণ্ড হইল তাহা শত শত বক্তৃতামঞ্চ হইতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি কর্তৃক পঠিত হইল। আমার কতকগুলি বক্তৃতার জগু শীঘ্রই রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হইবে, গ্রীষ্মকালে একরূপ গুজব শুনলাম কিন্তু কাষাতঃ সেরূপ কিছু ঘটিল না। বৎসরের শেষভাগে অবস্থা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইল, ইংলণ্ডের যুবরাজের ভারত আগমন উপলক্ষে সর্ববিধ সম্বর্ধনা বর্জন করিবার জগু কংগ্রেস অমুজ্জা প্রচার করিলেন। নভেম্বর মাসের শেষভাগে বাঙ্গলার স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী বে-আইনী ঘোষিত হইল। যুক্ত প্রদেশেও অমুরূপ ইস্তাহার জারী হইল। দেশবন্ধু দাশ বাঙ্গলায় এক উদ্দীপনাময়ী বাণী প্রচার করিলেন, “আমি দেহে লৌহ শৃঙ্খলভার এবং মনিবন্ধে হাত কড়ির স্পর্শ অনুভব করিতেছি। ইহা পরাদীনতা বন্ধনের বেদনা। সমস্ত ভারতবর্ষই এক বৃহৎ কারাগার। কংগ্রেসের কার্য চালাইতে হইবে। আমি বন্দী হই কি বাহিরে থাকি, কি আসে যায়? আমি বাচি কিংবা মরি তাহাতে ও কিছু আসে যায় না।”

আমরা যুক্তপ্রদেশে সরকারী ইস্তাহারের প্রত্যুত্তর দিলাম। ঘোষণা করিলাম, স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী পূর্বের মতই সজ্জাবদ্ধ ভাবে কার্য্য করিবে। এবং দৈনিক সংবাদপত্রে স্বেচ্ছাসেবকদের নাম প্রকাশিত হইল। প্রকাশিত আলিকার সর্বশীর্ষে আমার পিতার নাম দেওয়া হইল। তিনি স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন না। কেবল গভর্নমেন্টের আদেশ অবজ্ঞা করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি স্বেচ্ছাসেবক দলে যোগ দিয়া নিজের নাম দিলেন। ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে আমাদের প্রদেশে যুবরাজ আসিবার কয়েক দিন পূর্বে ব্যাপকভাবে গ্রেফতার আরম্ভ হইল।

আমরা বুঝিলাম, এতদিনে সঙ্কট ঘনাইয়া আসিল; কংগ্রেসের সহিত

গভর্ণমেন্টের অনিবার্ধ্য সংঘর্ষ আসন্ন। তখনও কারাগার অজ্ঞাত স্থান, সেখানে যাওয়া এক অভিনব অভিজ্ঞতা। এক দিন এলাহাবাদের কংগ্রেস আফিসে বসিয়া আমি বাকী কাজ শেষ করি গেছি, এমন সময় একজন 'কেরানী উত্তেজিত ভাবে আসিয়া বলিলেন, 'পুলিশ থানাতল্লাসীর পরোয়ানা লইয়া আসিয়াছে এবং আফিসবার্দ্দা ঘিরিয়া ফেলিয়াছে'। এই অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথম, কাজেই আমিও একটু বিচলিত হইলাম। কিন্তু ইচ্ছা হইল পুলিশের আনাগোনা অবিচলিত থাকিয়া বাহিরে ধীর স্থির এবং দৃঢ়তা দেখাই। এই জন্ত আমি একজন কেরানীকে থানাতল্লাসীর সময় পুলিশের সঙ্গে থাকিতে বলিলাম এবং বাকী সকলকে পুলিশের আগমন উপেক্ষা করিয়া নির্বিকার ভাবে কাজ করিয়া যাঁহিতে বলিলাম। কিছুক্ষণ পরেই একজন বন্ধু ও সহকর্মী একজন পুলিশ কর্মচারীর সহিত আমার নিকট বিদায় লইতে আসিলেন, তাঁহাকে আফিসের বাহিরে গ্রেফতার করা হইয়াছিল। এই অভিনব ঘটনাকেও আমি অত্যন্ত অহঙ্কারের সহিত প্রতি দিনের তুচ্ছ ব্যাপারের মতই মনে করিলাম এবং আমার সহকর্মীর প্রতি অত্যন্ত ঔদাসীন্য দেখাইলাম। তখন আমি একখানা চিঠি লিখিতেছিলাম। যেন ব্যাপার কিছুই নহে এরূপ ভাব দেখাইয়া আমার বন্ধু ও পুলিশ কর্মচারীকে পত্র লেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিলাম। ক্রমে সহরের অগ্রগত গ্রেফতারের সংবাদ আসিতে লাগিল। অবশেষে আমি বাড়ীতে কি হইতেছে জানিবার জন্ত রওনা হইলাম। গিয়া দেখি যে, বৃহৎ বাড়ীর কতকাংশে পুলিশ থানাতল্লাসী আরম্ভ করিয়াছে এবং জানিলাম যে, তাহারা আমাকে ও পিতাকে গ্রেফতার করিবার জন্ত আসিয়াছে।

যুবরাজের অভ্যর্থনা বর্জন করিবার কার্যপ্রণালী ইহার চেয়ে আর কোন উপায়েই আমরা সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারিতাম না। তাঁহাকে যেখানেই লইয়া যাওয়া হইয়াছে, সেখানেই তিনি হরতাল এবং জনশূন্য রাস্তা দেখিয়াছেন। তিনি যেদিন এলাহাবাদে আসিলেন সেদিন সমগ্র নগরী যুতের মত নিস্তব্ধ ছিল। কয়েক দিন পরে জিনি যখন কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন সেই, বিশাল নগরীর মুখর কর্মকোলাহল সহসা নিস্তব্ধ হইয়া গেল। যুবরাজের পক্ষে ইহা সহ্য করা কঠিন। কিন্তু এই জন্ত তাঁহার কোন দোষ নাই। তাঁহার প্রতি কোন বিরুদ্ধ ভাব কাহারও মনেই ছিল না। যুবরাজের ব্যক্তিত্বের স্মরণ গ্রহণ করিয়া ভারত গভর্ণমেন্টের বিশীর্ণ মর্যাদা চাক্ষু করিয়া তুলিবার বিরুদ্ধেই ভারতবাসী বিক্ষোভ দেখাইয়াছিল।

জওহরলাল নেহরু

সমস্ত দেশে বিশেষভাবে বাংলা ও যুক্ত প্রদেশে গ্রেফতার ও কারাদণ্ডের ধুম পড়িয়া গেল। এই দুই প্রদেশের বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী ও নেতারা বন্দী হইলেন। সহস্র সহস্র নেতা ও যুবক কারাগারে চলিয়া গেলেন। প্রথমতঃ সহরের অধিবাসীরাই অগ্রসর হইল। কারাযাত্রী অজস্র স্বেচ্ছাসেবকের যেন শেষ নাই। যুক্ত প্রদেশের কংগ্রেস-কমিটির সভা যখন চলিতেছিল, তখন একযোগে সমস্ত সদস্য (৫৫ জন) গ্রেফতার হইলেন। ষাঁহারা কোন দিন কংগ্রেস অথবা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন নাই তাঁহারাও গ্রেফতার হইবার জ্ঞাত জিদ দেখাইতে লাগিলেন। এমন ঘটনাও ঘটিয়াছে, গভর্নমেন্টের আফিসের কেমনাী আফিস হইতে বাড়ীতে ফিরিবার পথে জনসাধারণের উৎসাহের স্রোতে ভাসিয়া বাড়ীতে না গিয়া কারাগারে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। যুবক, বালকেরা পুলিশের কয়েদী গাড়ীতে উঠিয়া বসিত এবং কিছুতেই নামিতে চাহিত না। প্রত্যেক দিন অপরাহ্নে আমরা জেলের ভিতরে বসিয়া শুনিতাম লড়ীর পর লড়ী বোঝাই বন্দীরা জয়ধ্বনি দিতে দিতে কারাগারে প্রবেশ করিতেছে। জেলখানা বোঝাই হইয়া গেল। জেলকর্মচারীরা এই অসম্ভব অবস্থায় কি করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। পুলিশ লড়ী বোঝাই বন্দী আনিয়া চালানে কেবল মাত্র সংখ্যা উল্লেখ করিয়া জেলে জমা দিয়াছে। নাম ধামের কোন খোজ নাই। এই অভূতপূর্ব অবস্থায় জেলকর্মচারীরা এই অগণিত বন্দী লইয়া কি করিবেন বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। কেন-না, জেলসংক্রান্ত আইন-কানুনে এমন নামধামহীন দলবদ্ধ বন্দীদের গ্রহণ করার কোন উল্লেখ নাই।

গভর্নমেন্ট নির্বিচারে গ্রেফতারের নীতি ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র কংগ্রেসকর্মীদের গ্রেফতার করিতে লাগিলেন। জনসাধারণের উত্তেজনার প্রথম আবেগ মন্দীভূত হইয়া আসিল এবং অধিকাংশ বিখণ্ড কর্মীই জেলে যাওয়ার ফলে বাইরে একটা অনিশ্চিত অসহায় ভাব দেখা গেল। কিন্তু বাস্তবতঃ এইরূপ হইলেও ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ বিক্ষোভ নানা বৈপ্লবিক সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ১৯২১-এর ডিসেম্বর এবং ১৯২২-এর জানুয়ারী মাসে অসহযোগ আন্দোলন সংশ্লিষ্ট আন্দোলনে প্রায় ত্রিশ হাজার ব্যক্তি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। কিন্তু যখন অধিকাংশ নেতা ও কর্মী কারাগারে তখনও এই আন্দোলনের নেতা মহাত্মা গান্ধী বাহিরে থাকিয়া নির্দেশ ও উপদেশ দিয়া জনসাধারণকে অহুপ্রাণিত করিতেছিলেন। এবং অবাঞ্ছনীয় অনেক ব্যাপারকে সংযত করিতেছিলেন। ভারতীয় সৈন্ত এবং পুলিশের মধ্যে অসন্তোষ দেখা

অহিংসা ও তরবারীর পথ

দিতে পারে, এই আশঙ্কায় গভর্ণমেন্ট তখনও তাঁহাকে গ্রেফতার করেন নাই।

সহসা ১৯২২-এর ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে ঘটনার শ্রোত ফিরিয়া গেল। আমরা কারাগৃহে বিশ্বয়বিমূঢ় আতঙ্কে ও নিলাম, গান্ধিজী নীরুপদ্রব প্রতিরোধ নীতি প্রত্যাহার করিয়াছেন, সংদর্শমূলক আন্দোলন স্থগিত হইয়াছে। আমরা সংবাদপত্রে পড়িলাম, 'চৌরীচাওরা' গ্রামে জনতা পুলিশের উপর প্রতিশোধ লইবার আক্রোশে থানায় আগুন দিয়া ছয়-সাত জন পুলিশকে পোড়াইয়া মারিয়াছে। আন্দোলন বন্ধ হওয়ার ইহুঁই কারণ।

যখন আন্দোলন সকল দিক দিয়া অগ্রসর হইতেছে এবং আমরা প্রতিষ্ঠা ও সাফল্য লাভ করিতেছি, এমন সময় এভাবে আন্দোলন বন্ধ হওয়ার আমরা ক্রুদ্ধ হইলাম। কিন্তু কারাগারে বসিয়া আমাদের এই ক্রোধ নৈরাশ্য কোন কাজেই আসিল না। নীরুপদ্রব প্রতিরোধনীতি স্থগিত হইল, অসহযোগ আন্দোলন নিষ্প্রভ হইয়া গেল। বহুকাল উৎকর্ষ ও দুশ্চিন্তার পর গভর্ণমেন্ট স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন এবং ইহার স্বযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিলেন। কয়েক সপ্তাহ পরেই গান্ধিজী বন্দী হইলেন এবং স্বদীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন।

১২

অহিংসা ও তরবারীর পথ

চৌরীচাওরার দুর্ঘটনার পর সহসা আন্দোলন স্থগিত হওয়ায় কংগ্রেসের খ্যাতনামা নেতা মাভ্রেই বিক্ষুব্ধ হইলেন,—অবশ্য গান্ধিজী রহিলেন অবিচলিত। আমার পিতা (তখন কারাগারে) অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। যুবকেরা স্বাভাবিকভাবেই অধিকতর উত্তেজিত হইল। ইহা প্রতিক্রিয়ায় আমাদের সমস্ত আশা ধূলিসাৎ হইয়া গেল। আন্দোলন স্থগিত রাখার যে যুক্তি দেওয়া হইল এবং তাহার ফল কি হইবে ইহা ভাবিয়া আমরা অত্যন্ত চিন্তাক্লিষ্ট হইলাম। চৌরীচাওরার ঘটনা শোচনীয় সন্দেহ নাই এবং ইহা অহিংস আন্দোলনের সম্পূর্ণ বিরোধী, কিন্তু স্বদূর পল্লীগ্রামের এক উন্নত কৃষক জনতার কাঁধের ফলে আমাদের জাতীয়

স্বাধীনতার আন্দোলন অন্তত: কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকিবে কেন? কোন স্থানে হঠাৎ হিংসামূলক কার্য ঘটিলে ইহাই যদি তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হয় তাহা হইলে অহিংস-সংঘর্ষের নীতি ও প্রয়োগ-কৌশলের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন ক্রটি আছে। আমাদের মনে হইল, এই শ্রেণীর অপ্রত্যাশিত ঘটনা একেবারেই ঘটিবে না, এমন কোন নিশ্চিত প্রতীক্ষিত দৈবচক্র অসম্ভব। ভারতবর্ষের তেত্রিশ কোটি নরনারীকে অহিংসার তত্ত্ব ও আচরণে সুশিক্ষিত করিয়া তাহার পর কি আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে? এমন কি, তাহাও যদি সম্ভব হয়, তথাপি আমাদের মধ্যে কয়জন বলিতে পারে যে, পুলিশের চরম দুর্ব্যবহারের সম্মুখেও সম্পূর্ণ শান্তভাবে অবস্থান করিবে? যদি ইহাতেও আমরা সক্ষম হই তাহা হইলেও অসংখ্য প্ররোচক চর এবং ঐ শ্রেণীর বর্ণচোরা যাহারা আন্দোলনে যোগ দিয়া নিজেরাও বলপ্রয়োগ করিবে এবং অপরকেও বলপ্রয়োগ করিতে উত্তেজিত করিবে, তাহাদিগকে এড়ান যাইবে কিরূপে? অতএব ইহাই যদি আমাদের কার্যের একমাত্র মানদণ্ড হয় তাহা হইলে অহিংস প্রতিরোধের উপায় সর্বদাই ব্যর্থ হইবে।

এই উপায়ের কার্যকারিতায় বিশ্বাস করিয়াই আমরা ইহা স্বীকার করিয়াছিলাম এবং কংগ্রেসও ইহা গ্রহণ করিয়াছিল। গান্ধিজী এই নীতি দেশের সম্মুখে কেবলমাত্র জায়সঙ্গত উপায়রূপেই স্থাপন করেন নাই, আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে অধিকতর কার্যকরী বলিয়াই উপস্থিত করিয়াছিলেন। ‘অহিংসা’ এই নামটি নীতিবাচক হইলেও ইহা এক স্বক্রিয় উপায় এবং অত্যাচারীর ইচ্ছার নিকট নিরীহভাবে বশতা-স্বীকারের বিপরীত। ইহা কাপুরুষের কন্মবিন্মুখতা নহে, ইহা শক্তিমানের অত্যাচার ও জাতীয় পরাধীনতার বিরুদ্ধে ক্রোধপূর্ণ উপেক্ষা। কিন্তু যদি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি—বন্ধুর ছদ্মবেশে, আমাদের শত্রুও হইতে পারে—তাহাদের হঠকারিতায় আমাদের আন্দোলন বিপর্যস্ত করিয়া দিতে পারে তাহা হইলে সাহসী ও শক্তিমানের মূল্য কি?

গান্ধিজী তাঁহার অতুলনীয় বাগিতা দ্বারা শান্তিপূর্ণ অসহযোগ এবং অহিংসার পথ সকলকে গ্রহণ করিতে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাষা সরল আড়ম্বরহীন, তাঁহার কণ্ঠস্বর স্পষ্ট এবং নিরুদ্ধিগ্ন। কিন্তু বাহিরে তিনি দীর্ঘ প্রশান্ত হইলেও তাঁহার অন্তরে ছিল বহিঃজালাদীপ্ত পুঞ্জীভূত আবেগ, তাঁহার কণ্ঠোচ্চারিত প্রত্যেকটি শব্দ আমাদের হৃদয়ে ও মনে শরবৎ বিদ্ধ হইয়া এক অপূর্ণ উন্মাদনা সৃষ্টি করিত। তাঁহার নির্দেশিত পথ কঠিন ও বিঘ্নবহুল কিন্তু তাহা বীরের পথ। মনে হইত,

অহিংসা ও তরবারীর পথ

ইহা আমাদের প্রার্থিত স্বাধীনতার স্বর্গে লইয়া যাইবে। এই আশায় বুক বাঁধিয়া আমরা অগ্রসর হইয়াছিলাম। ১৯২০ সালে তিনি “তরবারীর পথ” শীর্ষক এক বিখ্যাত প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন—

“যেখানে সমস্তা কাপুরুষতা না বলপ্রয়োগ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমি সেখানে বলপ্রয়োগ করিতেই বলিব . . . ভারতবর্ষ কাপুরুষের মত নিরুপায় হইয়া অসীম অমর্যাদা সহন করিতেছে, এই দৃশ্য অপেক্ষা বরং আমি দেখিতে চাই, সে তরবারীহস্তে আত্মসম্মান রক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, অহিংসা হিংসা হইতে বহু গুণে শ্রেষ্ঠতর এবং শাস্তিদান অপেক্ষা ক্ষমা অধিকতর পৌরুষব্যাপ্তক। ক্ষমা বীরস্ব ভূষণম্।

“কিন্তু যেখানে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাহা প্রয়োগ করা হয় না,—ক্ষমা সেইখানেই। নিরুপায় ভীরুর ক্ষমার ভাগ অর্থহীন। মার্ক্সার কর্তৃক ছিন্নবিচ্ছিন্ন মুখিক কখনই তাহাকে ক্ষমা করিতে পারে না . . . কিন্তু আমি ভারতবর্ষকে এত অসহায় মনে করি না, নিজেকেও তাহা ভাবি না।

“আমাকে কেহ ভুল বুঝিবেন না, শক্তি কেবল দৈহিক বল হইতে আসে না, অনমনীয় ইচ্ছাশক্তি হইতেই উহা আসিয়া থাকে . . .

“আমি স্বপ্নবিলাসী নহি। আমি নিজেকে একজন কুশলকর্মা আদর্শবাদী বলিয়া দাবী করি। অহিংসা কেবল ঋষি ও মুনিগণের ধর্ম নহে—ইহা সাধারণ মানুষেরও ধর্ম। বলপ্রয়োগ পশুর ধর্ম—মানুষের ধর্ম অহিংসা। পশুর মধ্য আত্মিক শক্তি নিদ্রিত, সে বাহুবল ছাড়া আর কিছু বুঝে না, কিন্তু মানুষের মর্যাদা তাহাকে উচ্চতর নীতি—আত্মিক শক্তি গ্রহণ করিতে প্রেরণা দেয়।

“এই কারণে আমি ভারতবর্ষের সম্মুখে আত্মোৎসর্গের সুপ্রাচীন নীতি উপস্থিত করিতে সাহসী হইয়াছি। সত্যগ্রহের মূল এবং শাখাপ্রশাখা, অসহযোগ, নিরুপদ্রব প্রতিরোধ, প্রাচীন আত্মসংযমের নূতন নাম মাত্র। যে সকল ঋষি চারিদিকে হিংসার মধ্যেও অহিংসানীতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাঁহারা নিউটন অপেক্ষাও অধিকতর প্রতিভাশালী, তাঁহারা ওয়েলিংটন অপেক্ষাও বড় যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহারা অস্ত্রপ্রয়োগ-কৌশলী হইয়াও উহার অপ্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন এবং শ্রান্ত ক্লান্ত জগৎকে শিখাইয়াছিলেন যে মুক্তির পথ অহিংসার মধ্য দিয়া, হিংসার মধ্য দিয়া নহে।

“অহিংসার স্বক্রিয় অবস্থা হইল—সচেতনভাবে দুঃখ বরণ করা। ইহা

অগ্রায়কারীর ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ নহে, ইহা অত্যাচারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের আত্মার শক্তি প্রয়োগ করা। এই নীতি দ্বারা জীবন গঠন করিয়া তুলিলে একক নিঃসঙ্গ ব্যক্তিও অগ্রায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যকে উপেক্ষা করিয়াও নিজের সম্মান, নিজের ধর্ম, নিজের আত্মাকে রক্ষা করিতে পারে এবং সেই সাম্রাজ্যকে ধ্বংস ও পুনর্গঠন করিতে পারে।

“অতএব অহিংসা দুর্বলের ধর্ম বলিয়া আমি ভারতবাসীকে গ্রহণ করিতে বলিতেছি না। আমার ইচ্ছা, ভারতবর্ষ নিজের শক্তি সামর্থ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকিয়াই অহিংস আচরণ করুক। আমি দেখিতে চাই, ভারতবর্ষ তাহার অপরাজিত আত্মাকে চিহ্নক যাহা সমস্ত শারীরিক দৌর্বল্যের উর্দ্ধে জয়গোরবে সমুন্নত এবং যাহা সমগ্র জগতের পাশবল প্রতীহত করিতে পারে . . .

“আমি সিন্‌ফিন্‌ আন্দোলন হইতে অসহযোগকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখি। ইহা হিংসার সহিত পাশাপাশি আন্দোলনরূপে চলিতে পারে না। যাহারা হিংসামূলক কার্যে বিশ্বাসী তাহাদিগকে আমি এই শাস্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলিতেছি, ইহা কখনও আভ্যন্তরিক দুর্বলতায় বার্ষ হইবে না, কেবল উপযুক্ত সাড়ার অভাবেই ইহা বার্ষ হইতে পারে এবং তাহাই প্রকৃত সঙ্কটের সময়। অনেক উন্নতহৃদয় ব্যক্তি জাতীয় অপমান আর সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদের ক্রোধের চরিতার্থতা খুঁজিতেছেন, তাহারা হিংসা অবলম্বন করিবেন কিন্তু আমার মনে হয়, তাহারা তাহাদিগকে অথবা তাহাদের দেশকে অগ্রায় হইতে মুক্ত না করিয়াই বিনষ্ট হইবেন। ভারতবর্ষ তরবারীর পথ গ্রহণ করিলে সাময়িক জয়লাভ করিতে পারে কিন্তু সেই ভারতবর্ষে আমার গর্ষ করিবার কিছুই থাকিবে না। আমি ভারতবর্ষের ভক্ত, কেন না, আমার সমস্তই তাহার দান, আমি পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি, সমগ্র জগৎকে দিবার জগ্ন তাহার এক বাণী আছে।”

এই সকল যুক্তিতে আমরা বিচলিত হইয়াছিলাম। কিন্তু কি আমরা, কি সমগ্রভাবে জাতীয় কংগ্রেস, অহিংস উপায়কে ধর্মের মত অথবা সংশয়হীন মূলমন্ত্ররূপে গ্রহণ করে নাই, করা সম্ভবপরও ছিল না। বিশেষ ফললাভের জগ্ন ইহা একটি উপায়রূপে অবলম্বিত হইয়াছিল এবং সেই ফলের দ্বারা ইহার চূড়ান্ত বিচার সম্ভব। ব্যক্তিবিশেষ ইহাকে ধর্মের মত অথবা অত্যাচার মূলমন্ত্রের মত গ্রহণ করিতে পারেন কিন্তু কোনও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক থাকিয়া তাহা পারে না। চৌরিচাওয়া এবং তাহার পরবর্তী ঘটনাগুলি দেখিয়া আমরা অহিংস উপায়ের

অহিংসা ও তরবারীর পথ

সার্থকতা নূতন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম। নিরুপদ্রব প্রতিরোধ স্থগিত রাখা সম্পর্কে গান্ধিজীর যুক্তিই যদি সত্য হয় তাহা হইলে আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা সর্বদাই এমন অবস্থার সৃষ্টি করিয়া তুলিতে পারিবে যাহার ফলে আন্দোলন তাগ করা হাড়া গতান্তর থাকিবে না। অহিংস উপায়ের মাধ্যমেই ক্রটি রহিয়াছে, না গান্ধিজী যেভাবে ব্যাখ্যা করিতেছেন তাহাই ভুল? যাহাই হউক, তিনিই ইহার আবিস্কারক ও স্রষ্টা, অতএব ইহাব ভাল মন্দ বিচার করিবার তিনি অপেক্ষা আর কে আছে? তিনি না থাকিলে আমাদের আন্দোলন কোথায় থাকিত?

বহুবর্ষ পরে ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইবার পূর্বে গান্ধিজী সন্তোষজনকভাবে এই সমস্যার মীমাংসা করিয়াছিলেন। তিনি প্রচার করিলেন, কোন স্থানে বলপ্রয়োগের আকস্মিক ঘটনার ফলে আন্দোলন তাগ করা হইবে না। ঐ শ্রেণীর অপরিহার্য ঘটনার ফলে যদি অহিংস উপায়ে সংঘর্ষ অচল হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সর্বত্রই অহিংসা একটি আদর্শ উপায় নহে। কিন্তু গান্ধিজী ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহার নিকট অহিংস উপায় অসম্ভব এবং যে কোন অবস্থায়, এমন কি, বিরুদ্ধ পারিপাশ্বিক অবস্থায়ও, সৌম্যবদ্ধভাবে ইহা লইয়া কার্য করা যাইতে পারে। অহিংস নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিস্তৃত করিয়া গান্ধিজী যে এই ব্যাখ্যা দিলেন তাহা তাঁহার মানসিক ক্রমবিকাশের ফল কি না আমি জানি না। ১৯২২-এর ফেব্রুয়ারী মাসে নিরুপদ্রব প্রতিরোধনীতি বর্জনের কারণ কাব্যতঃ কেবলমাত্র ‘চৌরীচাপরা’ নহে, অথচ অধিকাংশ লোকের তাহাই বিশ্বাস। ‘চৌরীচাপরা’ একটা চরম পরিণতি মাত্র। গান্ধিজী প্রায়ই তাঁহার বিবেকের অনুভূতি অনুযায়ী কার্য করিয়া থাকেন। জনসাধারণের সহিত দীর্ঘ ঘনিষ্ঠতার ফলে অত্যন্ত মহান জননেতাগণের মতই সাধারণের চিন্তা, কর্মপ্রবণতা এবং তাহাদের শক্তিসম্পর্কে সম্যক ধারণা করিবার তাঁহার এক আশ্চর্য্য শক্তি জন্মিয়াছিল। এই অনুভূতির আবেগই তাঁহার কর্মের নিয়ামক। পরে অবশু বিস্মিত ও বিস্মক সহকর্মীদিগকে প্রবোধ দিবার জগু তাঁহার অনুভূতিলব্ধ সিদ্ধান্তকে তিনি যুক্তির আবরণ দিতে চেষ্টা করেন। এই আবরণ প্রায়ই অসম্পূর্ণ হইত। ‘চৌরীচাপরা’র পর আমাদের এইরূপই মনে হইয়াছিল। তখন আমাদের আন্দোলন দৃশ্যতঃ শক্তিশালী এবং দেশব্যাপী উৎসাহসঞ্চেত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। সমস্ত সত্য ও শৃঙ্খলা বিলুপ্ত হইতেছিল। আমাদের কর্মীরা সকলেই কারাগারে এবং জনসাধারণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আন্দোলন পরিচালনা করিবার অল্প শিক্ষাই পাইয়াছিল। যে কোন

অপরিচিত ব্যক্তি আসিয়া কংগ্রেস-কমিটির ভার গ্রহণ করিত। প্রকৃত প্রস্তাবে বহু অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তি, এমন কি, প্ররোচক গুপ্তচরেরা পর্য্যন্ত আগাইয়া আসিয়া কংগ্রেস ও খিলাফত পরিচালনা করিতে লাগিল। ইহাদিগকে সংযত করিবার কোন উপায় ছিল না।

অবশ্য বৃহৎ আন্দোলনে এরূপ ঘটনা অবশ্যস্বাবী। নেতাদিগকে সর্ব্বাগ্রে কারাগারে যাইতে হইবে এবং কাজ চালাইবার জন্ত অপরের উপর বিশ্বাস করিতে হইবে। জনসাধারণকে বড়জোর কতকগুলি সহজ কাজ করিতে ও কোন কোন কাজ হইতে বিরত থাকিতে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। ১৯৩০-এর পূর্বে কয়েক বৎসর ধরিয়া এই শ্রেণীর কিছু শিক্ষা আমরা দিয়াছিলাম। তাহার ফলে ১৯৩০ এবং ১৯৩২-এর আইন অমান্ত আন্দোলন সজ্জবদ্ধ, সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী হইয়াছিল। ১৯২১—২২-এ ইহার অভাব ছিল, তখন জনসাধারণের উৎসাহ উত্তেজনার পশ্চাতে বিশেষ কিছুই ছিল না। অতএব আন্দোলন চলিলে যে নানাস্থানে বলপ্রয়োগ ও উৎপাতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইত ইহা নিঃসন্দেহ ও তাহার ফলে গভর্ণমেণ্ট বক্তাক্ত উপায়ে তাহা দমন করিয়া ফেলিয়া এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করিত যাহার প্রতিক্রিয়ায় জনসাধারণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িত।

এই সকল যুক্তি এবং ঘটনা গান্ধিজীর মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং এই সূত্র ধরিয়া অহিংস উপায়ে আন্দোলন পরিচালনার ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন তাহা অদ্রাস্ত। ক্রমাবনতি নিরোধ করিয়া তিনি নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। এক স্বতন্ত্র ভূমি হইতে দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহার এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু সেই দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত অহিংসা নীতির কোনও সম্পর্ক নাই। দুই কূল বজায় রাখিয়া এখানে চলা কঠিন। অবশ্য আকস্মিক হিংসার প্রতিক্রিয়ায় বক্তাক্ত দমননীতি অবলম্বিত হইলেও জাতীয় আন্দোলন একেবারে নিভিয়া যাইত না; কেন না, এই শ্রেণীর আন্দোলন ভস্মরাশির মধ্য হইতেও পুনরায় জলিয়া উঠে। সময় সময় সাময়িক অবসাদের দিনে সমস্তাগুলি স্পষ্টভাবে বুঝা যায় এবং চিন্তে দৃঢ়তার সঞ্চার হয়। সাময়িক অবসাদ বা আপাতপরাজয় বড় কথা নহে, আদর্শ ও কর্মনীতি বড় কথা। জনসাধারণ যদি কর্মনীতিকে কলঙ্কমুক্ত রাখিতে পারে তাহা হইলে অল্পদিনেই অবসাদ দূর হইয়া যায়। ১৯২১-২২-এ আমাদের কর্মনীতি ও উদ্দেশ্য কি ছিল? আমাদের অস্পষ্ট স্বরাজ এবং অহিংস সংঘর্ষের পশ্চাতে কোনও অস্পষ্ট মতবাদ ছিল না। যদি ব্যাপকভাবে আকস্মিক বলপ্রয়োগের প্রাদুর্ভাব ঘটিত তাহা হইলে অহিংস-

অহিংসা ও ভয়বায়ীর পথ

নীতি স্বভাবতই বিনষ্ট হইত এবং পূর্বকথিত দরাজেও আকড়িয়া ধরিবার কিছু থাকিত না। সাধারণতঃ দীর্ঘকাল আন্দোলন চালাইবার মত পর্যাপ্ত শক্তি জনসাধারণের নাই। কংগ্রেসে প্রতি সহানুভূতি এবং বিদেশী শাসনের প্রতি অসন্তোষ গতই ব্যাপক হউক না কেন আমাদের উপযুক্ত মেরুদণ্ড ও সজ্জশক্তি ছিল না। এমন আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এমন কি, যাহারা সাময়িক উত্তেজনার কারাগারে আসিয়াছিল তাহারা শীঘ্রই একটা মিটমাট প্রত্যাশা করিত।

অতএব একটা নৈরাশুজনিত প্রতিক্রিয়াসত্ত্বেও ১৯২২-এ নিরুপদ্রব প্রতিরোধনীতি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত ঠিকই হইয়াছিল; তবে মনে হয় ইহা আরও স্পষ্টভাবে করা যাইত।

যাহা হউক, সহসা আন্দোলনের গতি রুদ্ধ হওয়ায় প্রতিক্রিয়ার মুখে উহাই সম্ভবতঃ দেশে এক নূতন বিপত্তির সৃষ্টি করিল। রাজনৈতিক সজ্জার্থে নিষ্ফল ও আকস্মিক হিংসা বন্ধ হইলেও অবরুদ্ধ হিংসা বাহির হইবার পথ খুঁজিতে লাগিল এবং সম্ভবতঃ পরবর্তী কয়েক বৎসরে সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ ইহার ফলেই তীব্র হইয়াছে। রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রগতি-বিরোধী বিভিন্নশ্রেণীর সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা বিশাল জনসংঘসমর্থিত অসহযোগ ও নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের চাপে লুকাইয়া থাকিয়া বাধা হইয়াছিল, এই অবস্থার সুযোগে তাহারা বাহিরে আসিল। গুপ্তচরগণ এবং যাহারা কলহ বাধাইয়া কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করিতে চাহে এরূপ অনেকে কাজে লাগিয়া গেল। মোপলা বিদ্রোহ ও অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতার সহিত উহার দমন—বন্ধদ্বার রেলওয়ে মালগাড়ীতে বোম্বাই মোপলা বন্দীদের শোচনীয় মৃত্যু—সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ প্রচারকারীদিগকে একটা সুযোগ দিল। যদি নিরুপদ্রব প্রতিরোধ স্থগিত করা না হইত এবং যদি গভর্ণমেন্ট আন্দোলন দমন করিয়া ফেলিতেন তাহা হইলে হয়তো এত সাম্প্রদায়িক তিক্ততা দেখা দিত না এবং পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্ম এত উৎসাহ অবশিষ্ট থাকিত না।

নিরুপদ্রব প্রতিরোধ প্রত্যাহত হইবার পর আর একটি ঘটনার ফল ভিন্নরূপ হইতে পারিত। নিরুপদ্রব প্রতিরোধের প্রথম তরঙ্গে গভর্ণমেন্ট চমকিত ও ভীত হইলেন। তৎকালীন বড়লাট লর্ড রেডিং প্রকাশ্য বক্তৃতায় বলিলেন, তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়াছেন। তখন যুবরাজ ভারতবর্ষে, তাহার এই উপস্থিতির ফলে গভর্ণমেন্টের দায়িত্ব অনেকখানি বাড়িয়াছিল। ১৯২৬-এর ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে ব্যাপক ধরপাকড় আরম্ভ হইবার কিঞ্চিৎ পরেই গভর্ণমেন্ট কংগ্রেসের সহিত আপোষের

জওহরলাল নেহরু

জন্ম চেষ্টিত হইলেন। যুবরাজের কলিকাতা আগমন উপলক্ষেই ইহার সূচনা হইল। দেশবন্ধু দাশের (তখন তিনি জেলে) সহিত বাঙালী গভর্নমেন্টের প্রতিনিধিদের কিছু ঘরোয়া আলোচনা হইল। গভর্নমেন্ট ও কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের লইয়া একটি ক্ষুদ্র গোলটেবিল বৈঠক বসাইবার প্রস্তাব উঠিল। গান্ধিজী দাবী করিলেন, এই বৈঠকে করাচীতে বন্দী মোলানা মহম্মদ আলীকেও উপস্থিত থাকিবার সুযোগ দিতে হইবে। এই দাবীর ফলেই প্রস্তাব ফাসিয়া গেল। গভর্নমেন্ট কিছুতেই সন্মত হইলেন না। গান্ধিজীর এই মনোভাব দেশবন্ধু দাশের মনঃপূত হয় নাই। তিনি কারার বাহিরে আসিয়া প্রকাশ্যে ইহার সমালোচনা করিলেন এবং বলিলেন, গান্ধিজী ভুল করিয়াছেন। আমরা অনেকে (তখন জেলে) ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ না জানার দরুণ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। যাহা হউক, ইহা মনে হইল তখন ঐ শ্রেণীর সম্মেলনের সার্থকতা অতি অল্পই। যুবরাজের কলিকাতা পরিদর্শন ব্যাপারটা ভালভাবে নির্বাহ করিবার জন্মই গভর্নমেন্ট উদগ্রীব ও উত্তোষী হইয়াছিলেন। আমাদের মূল সমস্যাগুলির সহিত ইহার কোন সম্পর্ক ছিল না। নয় বৎসর পরে যখন কংগ্রেস ও জাতি অধিকতর শক্তিশালী তখনও দেখা গিয়াছে যে, এই শ্রেণীর সম্মেলনে বিশেষ কোনও ফল হয় নাই। কিন্তু ইহা ছাড়িয়া দিলেও আমার নিকট গান্ধিজীর, মহম্মদ আলীর উপস্থিতির দাবী সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হইয়াছিল। কেবল কংগ্রেস নেতাক্রমে নহে, সমস্ত খিলাফতের প্রমুখ কংগ্রেসের এক মুখ্য সমস্যা, তখন খিলাফত নেতাক্রমেও তাঁহার উপস্থিতির একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ছিল। রাষ্ট্রক্ষেত্রে একজন সহকর্মীকে বর্জন করিতে হয় এমন কোনও কক্ষকোশলই প্রশস্য নহে। গভর্নমেন্ট যে তাঁহাকে কারামুক্তি দিতে স্বীকৃত হইলেন না তাহা হইতেই বোঝা গেল যে, সম্মেলনে কোনও ফললাভের সম্ভাবনা নাই।

১) আমি ও পিতা বিভিন্ন অপরাধে ও বিভিন্ন ধারায় ছয় মাস করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলাম। বিচার একটা প্রহসনের অভিনয় মাত্র এবং আমরা নিয়মমত উহাতে কোন অংশ গ্রহণ করি নাই। অবশ্য আমাদের কার্যপদ্ধতি ও বক্তৃতায় অতি সহজেই দণ্ড দিবার মত অনেক উপাদান ছিল। কিন্তু কার্যতঃ যে অভিযোগ করা হইল তাহা অপূর্ণ! বে-আইনী ঘোষিত কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক সজ্জার সদস্যরূপে পিতাকে বিচার করা হইল এবং এই অপরাধের প্রমাণস্বরূপ তাঁহার হিন্দীতে দস্তখত করা একখানি বিজ্ঞপ্তিপত্র দাখিল করা হইল। দস্তখত তাঁহার নিজের সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি ইতিপূর্বে কদাচিৎ হিন্দীতে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং

অতি অল্প লোকই তাঁহার হিন্দী দস্তখত সনাক্ত কৰিতে পাৰে। ছিন্ন মলিন বসন পরিহিত একটি ভদ্রলোককে হাজির কৰা হইল এবং সে পৃথক কৰিয়া দস্তখত সনাক্ত কৰিল। লোকটি নিৰেট নিরক্ষর; কেন না, সে কাগজটি উল্টা কৰিয়া ধৰিয়া পরীক্ষা কৰিতেছিল। পিতাৰ বিচাৰকালে আমাৰ চাৰি বৎসরের কন্যার অদৃষ্টে প্রথম আদালতের কাগজায় উঠিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। আমাৰ পিতা বিচাৰকালে তাহাকে কোলে কৰিয়া বসিয়া লেন।

(আমাৰ অপৰাধ হইল হৰতালেৰ বিজ্ঞাপন বিলি কৰা। তখনকাৰ আইনে ইহা অপৰাধ ছিল না।) অবশ্য ইদানীং ডোমিনিয়ান ষ্টেটসের দিকে আমাদেৱেৰ দ্ৰুত অগ্রসৰ হওয়াৰ ফলে উহা এখন বে-আইনী হইয়াছে। যাহা হউক, আমাব কাৰাদণ্ড হইল। তিন মাস পৰে কাৰাগাবে যখন আমি পিতা ও অনাগ্ৰেৱেৰ সহিত আছি, তখন শুনিলাম যে, কোনও কৰ্তৃস্থানীয় ব্যক্তি কাগজপত্ৰ পৰীক্ষা কৰিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, আমাব কাৰাদণ্ড ভুল হইয়াছে এবং আমাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। আমি আশ্চৰ্য্য হইলাম, কেন না, আমাৰ পক্ষ হইতে কেহ কোন তথ্য কৰে নাই। নিৰূপদ্ৰব প্ৰতিৰোধ প্ৰত্যাহাৰেৰ ফলেই বিচাৰফল পুনঃপৰীক্ষা কাৰ্য্যে নবচেতনাৰ সঞ্চাৰ হইয়াছিল। পিতাকে ছাড়িয়া বিষয়চিহ্নে কাৰাগাৰ হইতে বহিৰ্গত হইলাম।

কাৰাগাব হইতে বাহিৰ হইয়াই আমি আহম্মদাবাদে গান্ধিজীৱ সহিত সাক্ষাতেৰে সন্মিলন কৰিলাম। কিন্তু আমি উপস্থিত হইবাৰ পূৰ্বেই তিনি গ্ৰেফতাৰ হইয়াছিলেন। আমি সৰৱমতী জেলে গিয়া তাঁহাৰ সহিত সাক্ষাৎ কৰিলাম। আমি তাঁহাৰ বিচাৰকালে উপস্থিত ছিলাম। ইহা এক চিৰস্মৰণীয় ঘটনা এবং যাহাৰা সেখানে উপস্থিত ছিলেন কেইই জীৱনে বিন্ধত হইবেন না। ইংৰাজ ভজ্ঞ মৰ্যাদাব সহিত সৌজন্যপূৰ্ণ ব্যবহাৰ কৰিয়াছিলেন। আদালতে গান্ধিজীৱ বিবৃতি সকলকে বিচলিত কৰিয়াছিল। আমবা আলোড়িত হৃদয় লইয়া বিচাৰগৃহ হইতে ফিৰিয়া আসিলাম, তাঁহাৰ মূৰ্তি এবং জীৱন্ত ভাষা মানসপটে অঙ্কিত হইয়া ৱহিল।

আহম্মদাবাদ হইতে ফিৰিলাম। বন্ধু ও সহকৰ্মীগণ কাৰাগাৰে, নিঃসঙ্গ একাকীত্ব আমাকে পীড়িত কৰিতে লাগিল। আমি দেখিলাম, স্থানীয় কংগ্ৰেস কমিটিৰ অস্তিত্ব প্ৰায় বিলুপ্ত। অতএৱ পুনৰায় আত্মনিয়োগ কৰিলাম। বিদেশীবস্ত্ৰ বয়কট আন্দোলনেৰ দিকে আমাৰ ঝোঁক পড়িল। নিৰূপদ্ৰব প্ৰতিৰোধ স্বগিত হইলেও ইহা চলিতেছিল। এলাহাবাদেৰ প্ৰায় সমস্ত বস্ত্ৰ ব্যবসায়ীই বিদেশী বস্ত্ৰ ক্ৰয়-বিক্ৰয় বন্ধ কৰিবাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি

দিয়াছিলেন এবং এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ত তাঁহারা একটি সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। এই সমিতির নিয়ম ছিল যে, কেহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলে তাহাকে অর্থদণ্ড দিতে হইবে। আমি দেখিলাম, কতকগুলি বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া বিদেশী বস্ত্র আমদানী করিতেছেন। তাঁহারা প্রতিশ্রুতি পালন করিতেছেন ইহা তাঁহাদের প্রতি অত্যন্ত অবিচার। আমরা তর্ক-বিতর্ক করিলাম কোন ফল হইল না। বস্ত্রব্যবসায়ী সমিতিও বিশেষ কিছু করিতে পারিলেন না। আমরা স্থির করিলাম, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীর দোকানে পিকেটিং করা হইবে। পিকেটিং-এর ইচ্ছিতেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল; তাঁহারা জরিমানা দিয়া নূতন প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিলেন। জরিমানার টাকা বস্ত্রব্যবসায়ী সমিতি গ্রহণ করিলেন।

আমি এবং যে সকল সহকর্মী ব্যবসায়ীদের সহিত কথাবার্তায় যোগ দিয়াছিলাম, ইহার দুই-তিন দিন পরেই সকলে মিলিয়া গ্রেফতার হইলাম। আমাদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের ভীতিপ্রদর্শন, ও জবরদস্তি করিয়া টাকা আদায়ের অভিযোগ উপস্থিত করা হইল। আমাকে রাজদ্রোহ প্রচার ও আরও কয়েকটি অপরাধে অভিযুক্ত করা হইল। আমি আত্মপক্ষ সমর্থন না করিয়া আদালতে একটি সুদীর্ঘ বিবৃতি দিলাম। আমাকে তিন দফায় শাস্তি দেওয়া হইল। বলপ্রয়োগ ও অর্থ আদায়ের অভিযোগ রহিল কিন্তু রাজদ্রোহের অভিযোগ প্রত্যাহত হইল। সম্ভবতঃ ইহার কারণ এই যে, আমার শাস্তি কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট বিবেচনা করিয়াছিলেন। আমার যতদূর স্মরণ হয় তাহাতে তিন দফার মধ্যে, দুই দফায় আঠার মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছিল, তবে উভয় দণ্ড একসঙ্গে চলিবে ইহাই ছিল আদেশ। আমার মোট কারাদণ্ড হইল এক বৎসর নয় মাস। ইহাই আমার দ্বিতীয় বার শাস্তি। প্রায় ছয় সপ্তাহ বাহিরে কাটাইয়া আমি পুনরায় কারাগারে ফিরিয়া গেলাম।

লন্ডো জেল

রাজনৈতিক অপরাধে কারাদণ্ড ১৯২১-এর ভারতবর্ষে কিছু নূতন ঘটনা নহে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় হইতেই লোকে বিশেষভাবে ক্রমাগত জেলে ঘাইতেছিল। ইহার অধিকাংশ কারাদণ্ডই অত্যন্ত দীর্ঘ। বিনাবিচারে অন্তরীণে আবদ্ধ করার ব্যবস্থাও ছিল। সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জননায়ক লোকমাত্র তিলক পরিণত বয়সে দীর্ঘ ছয় বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। মহাযুদ্ধের সময় অন্তরীণ ও কারাদণ্ড মুহূর্মুহ ঘটতে লাগিল, ষড়যন্ত্রের মামলা সচরাচরের ঘটনা হইয়া উঠিল। সাধারণতঃ মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন নির্কাসন দণ্ডে উহার পরিণতি ঘটিত। মহাযুদ্ধের সময় আলী-ভাতৃদ্বয় ও মোলানা আবুল কালাম আজাদ অন্তরীণে আবদ্ধ ছিলেন। যুদ্ধের অব্যবহিত পরে পঞ্জাবে সামরিক আইনের আমলে বহুলোকের ডাক পড়িল। ষড়যন্ত্রের মামলায় এবং সরাসরি জঙ্গীবিচারে বহুলোক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইল। কাজেই রাজনৈতিক অপরাধে কারাদণ্ড ভারতে সচরাচর ঘটনাই হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইতিপূর্বে কেহ স্বেচ্ছায় কারাবরণ করে নাই। ইতিপূর্বে কোন ব্যক্তির রাজনৈতিক কার্যকলাপ অথবা গোয়েন্দা পুলিশের কোপদৃষ্টির ফলে কারাদণ্ডের সম্ভাবনা ঘটিত কিন্তু তখন আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া কারাদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা চলিত। অবশ্য দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলনে গান্ধিজীও তাঁহার সহস্র সহস্র অনুচর স্বতন্ত্র দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন।

১৯২১-এ কারাগার ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত। কারাগারের নিম্নম লৌহদ্বার উন্মুক্ত হইয়া অমনি একজন নূতন কয়েদীকে গ্রাস করে, তাহার পর কি ঘটে অল্প লোকেই তাহা জানিত। আমরা কল্পনা করিতাম কয়েদীরা অত্যন্ত বে-পরোয়া এবং ভয়ঙ্কর প্রকৃতির দুষ্ট লোক। সেখানে নির্জনতা, অপমান, নির্যাতন এবং সর্বোপরি অনিশ্চিতের ভীতি রহিয়াছে, ইহাই আমাদের ধারণা ছিল। ১৯২০ সাল হইতে ক্রমাগত জেলে যাওয়ার জল্পনা কল্পনা ও বহুসংখ্যক সহকর্মীর কারাগমনের ফলে আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত ঘৃণা ও আপত্তির তীব্রতা মন্দীভূত হইয়াছিল। কিন্তু মনে মনে নিজেকে যতই প্রস্তুত করা যাউক না কেন, প্রথম লৌহদ্বার-পথে প্রবেশকালে

মানসিক উত্তেজনা ও অনিশ্চিত প্রত্যাশার আবেগ হইতে নিস্তার পাওয়া যায় না। ইহার পর গত তের বৎসরে কার্যাতঃ দণ্ডবিধি আইনের বহু বিভিন্ন ধারায় দণ্ডিত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে রাজনৈতিক অপরাধে অন্ততঃ তিন লক্ষ নরনারী কারাগারে গিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। ইহাদের মধ্যে সহস্র সহস্র বারবার কারাগৃহে গিয়াছেন, কারাভ্যন্তরে কি আছে তাহাও তাহাদের উত্তমরূপে জানা ছিল। সেই অস্বাভাবিক নিরানন্দ নির্ধ্যাতন এবং ভয়াবহ বৈচিত্রাহীন জীবনযাত্রার সহিত নিজেকে যতটুকু খাপ খাওয়াইতে পারা যায় সে চেষ্টা সকলেই অল্প-বিস্তর করিয়াছেন। অভ্যাগে মানুষের অনেক কিছুই সহিয়া যায়। আমরাও ক্রমে ইহাতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিলাম, কিন্তু তথাপি যতবার জেলে গিয়াছি, দ্বারদেশে সেই পুরাতন উত্তেজনার অনুভূতি জাগিয়াছে—রক্তে জাগিয়াছে চাঞ্চল্য। এবং লোকজন, যানবাহন, তরুলতা, বিস্তীর্ণ প্রসারিত প্রান্তর,—দীর্ঘকাল যাহাদের সহিত অদর্শন ঘটিবে এমন পরিচিত মুখগুলি সর্বশেষবার দেখিবার জন্য চক্ষু আপনা হইতেই পিছনে ফিরিয়া চাহিত। প্রথম কারাদণ্ড লইয়া বন্দন জেলে গিয়াছিলাম তখনকার দিনগুলি আমাদের ও কারাকর্মচারীদের উভয়তই অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার দিন। দলে দলে নূতন ধরনের বন্দীদের আগমনে জেল কর্মচারীদের অবস্থা প্রায় অচল হইয়া উঠিল। এই নবাগতদের প্রতিদিন বর্ধিত বিপুল সংখ্যা এক অভূতপূর্ব বস্তার মত মনে হইতে লাগিল, যাহা পরম্পরাগত দমস্তই প্রাচীন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিবে। নবাগতদের লইয়া বিব্রত হইবার আরও কারণ এই যে, ইহার মধ্যে সকল শ্রেণীর লোক থাকিলেও অধিকাংশ মধ্যশ্রেণীর। যাহা হউক, সকল শ্রেণীর সমবায় গঠিত এই নবাগত দলের একটি বিষয়ে ঐক্য ছিল, তাহারা সাধারণ কয়েদী হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক এবং তাহাদের প্রতি চিরাচরিত আচরণ করা সহজ নহে। কর্তৃপক্ষ ইহা বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু প্রচলিত নিয়মের পরিবর্তে কি করা যাইতে পারে তাহার কোনও নজিরও নাই অভিজ্ঞতাও নাই। সাধারণ কংগ্রেস বন্দীরা নিরীহ ও মোলায়েম প্রকৃতির লোক ছিল না এবং কারাপ্রাচীরের মধ্যেও তাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠের শক্তি অনুভব করিত এবং কারাভ্যন্তরে কি ঘটতেছে সে সম্পর্কে জনসাধারণের বিজ্ঞাগ্রত কৌতূহল এবং বাহিরের আন্দোলনও গণনার বিষয় ছিল। এই শ্রেণীর উগ্র মনোভাব সত্ত্বেও সাধারণতঃ আমরা কারাকর্তৃপক্ষের সহযোগিতাই করিতাম। আমাদের সাহায্য না পাইলে কর্মচারীরা আরও বেশী মুশ্বিলে পড়িতেন। প্রায়শই জেলারের অহুরোধে বিভিন্ন ব্যারাকে গিয়া

লক্ষ্মী জেল

আমাদের স্বৈচ্ছাসেবকদিগকে শাস্ত করিতে হইত কিম্বা কোনও নিয়ম মানিবার জন্ত অস্বস্তিকর করিতে হইত।

আমরা স্বৈচ্ছায় কারাবরণ করিয়াছি। অনেক স্বৈচ্ছাসেবক আবার পাকেচক্রে বিনাকারাদেশেই জেলে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। অতএব পলায়ন করিবার প্রশ্ন এখানে উঠিতেই পালে না। যদি কেহ বাহিরে যাইতে চাহে তবে তাহার পক্ষে অস্বস্তিকর হওয়া কিম্বা ভবিষ্যতে কোন আইন-বিরোধী কার্য করিব না, এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিলেই যথেষ্ট হইত। পলায়নের চেষ্টা অত্যন্ত কলঙ্কজনক বলিয়া বিবেচিত হইত এবং উহা আইন অমান্য জনিত আন্দোলন হইতে পলায়নেরই অনুরূপ ছিল। আমাদের লক্ষ্মী জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং তিনি প্রায়ই জেলারকে (ইনি একজন খান সাহেব) বলিতেন যে, তিনি যদি কতকগুলি কংগ্রেস বন্দীকে পলায়ন করিবার সুযোগ দিতে কৃতকার্য হন তাহা হইলে (সুপারিন্টেন্ডেন্ট) গভর্ণমেন্টের নিকট তাহার খাতিয়ার উপাধির জন্ত সুপারিশ করিবেন।

আমাদের অধিকাংশ বন্দীকে কারাগারের মধ্যভাগে বড় বড় ব্যারাকে রাখা হইয়াছিল। আমাদের মধ্যে আঠার জনকে বাছিয়া লইয়া সম্ভবতঃ কিছু ভাল ব্যবহারের জন্ত এক পুরাতন তাঁতশালায় জায়গা দেওয়া হইয়াছিল। আমার পিতা, দুইজন সম্পর্কিত ভ্রাতা এবং আমি স্বতন্ত্রভাবে বিশ ফুট দীর্ঘ এবং মোল ফুট প্রশস্ত একটি চালাঘরে স্থান পাইয়াছি। জেলের মধ্যে এক ব্যারাক হইতে অল্প ব্যারাকে যাইবার স্বাধীনতা আমাদের ছিল। বাহিরের আত্মীয়স্বজনের সহিত প্রায়ই দেখা করিতে দেওয়া হইত। আমরা দৈনিক সংবাদপত্র পাইতাম। তাহাতে নূতন নূতন গ্রেফতার এবং আন্দোলনের সংবাদ কারাজীবনের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার করিত। আলাপ-আলোচনায় আমাদের অনেক সময় কাটিত। লেখাপড়া করিবার সময় আমি অতি অল্পই পাইতাম।

আমি সকালবেলায় উঠিয়া আমাদের চালা ঘরখানি ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিতাম। পিতার ও আমার নিজের কাপড় কাচিতাম এবং কিছু সময় চরকায় সূতা কাটিতাম। তখন শীতকাল, উত্তর ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সময়। প্রথম কয়েক সপ্তাহ আমরা স্বৈচ্ছাসেবকদিগকে শিক্ষা দেওয়ার অধিকার পাইয়াছিলাম। যাহারা নিরক্ষর তাহাদিগকে আমরা কিছু হিন্দী ও উর্দু এবং অগ্রাগ্র প্রাথমিক বিষয় শিক্ষা দিতাম। সন্ধ্যাবেলায় আমরা 'ভলিবল' খেলিতাম।*

* সংবাদপত্রে একটি বিজ্ঞপ্তি গল্প প্রচারিত হইয়াছিল এবং পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ করা

ক্রমে কড়াকড়ি বাড়িতে লাগিল। আমাদের সীমানার বাহিরে গিয়া অল্প ব্যারাকে স্বেচ্ছাসেবকদের সহিত দেখা করা বন্ধ হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে পড়াইবার কাজও ফুরাইল।

মার্চ মাসের প্রথম ভাগে জেল হইতে বাহির হইয়া ছয়-সাত সপ্তাহ পরে এপ্রিল মাসে আমি পুনরায় ফিরিয়া আসিলাম। আসিয়া দেখি অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। পিতাকে নৈনিতাল জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। এবং তাঁহার প্রস্থানের পরই নূতন নিয়ম জারী হইয়াছে। পূর্বে আমি যেখানে থাকিতাম, সেই বৃহৎ তাঁতশালা হইতে সমস্ত বন্দীকে লইয়া জেলের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড ব্যারাকে স্বতন্ত্র রাখা হইয়াছে। ব্যারাকগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে জেলের মধ্যে ক্ষুদ্র জেল। এক ব্যারাক হইতে অল্প ব্যারাকে সংবাদ আদান প্রদানের কোন উপায় ছিল। দেখাশুনা এবং চিঠিপত্রের আদান প্রদান সঙ্কুচিত করিয়া মাসে একবার করা হইল। খাদ্যদ্রব্য অতি সাধারণ, তবে আমরা প্রয়োজন মত খাদ্য বাহির হইতে আনিবার অহুমতি পাইয়াছিলাম।

আমি যে ব্যারাকে ছিলাম সেখানে প্রায় পঞ্চাশ জন বন্দী ছিলেন। আমাদের বিছানাগুলির ব্যবধান ছিল তিন চার ফুট মাত্র। এজন্য আমাদের মধ্যে ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয়, ব্যারাকে অনেকে আমার পরিচিত এবং বন্ধু ছিলেন। কিন্তু দিবারাত্র গোপনীয়তার একান্ত অভাব সহ করা অত্যন্ত কঠিন। এক জনতা সার্বক্ষণ চাহিয়া আছে। একই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরক্তি ও অসহিষ্ণুতা, ইহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার কোন নিরালা কোণ নাই। আমরা প্রকাশ্যে একত্রে স্নান করিতাম, কাপড় ধুইতাম, ব্যায়ামের জন্য ব্যারাকের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করিতাম এবং বিরক্তি ও ক্লান্তির শেষ সীমা পর্যন্ত আলাপ অথবা তর্ক করিতাম। তর্ক করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতাম। পারিবারিক জীবনের নিরানন্দগুলি এখানে শত গুণ বেশী, অথচ তাহার কমনীয়তা এবং পারস্পরিক সম্বোধ প্রায় নাই। এখানে বিভিন্ন কচির নানা শ্রেণীর লোক। ইহা সকলের পক্ষেই মানসিক যন্ত্রণাপ্রদ হইয়া উঠিত, এবং এখানে নির্জনতার

সঙ্গেও মাঝে মাঝে ঐ গল্প প্রচার হয়। গল্পটা এই যে, যুক্তপ্রদেশের তদানীন্তন গভর্ণর স্যার হারকুট বাটলার জেলখানায় আমার পিতার অল্প কারাগারে 'সেম্পেন' পাঠাইত। স্যার হারকুট কারাগারে আমার পিতার অল্প কোন উপহারই পাঠান নাই। অথবা অল্প কেহ তাহার জন্য 'সেম্পেন' বা মদ্যজাতীয় কোন বাণীও প্রেরণ করেন নাই। কংগ্রেসে অসহযোগ গৃহীত হইবার পর ১৯২০ সালে পিতা মদ্য পান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং এই কালে তিনি মদ্য গ্রহণ করিতেন না।

লক্ষ্মী ভেল

জন্ম আমি ব্যাকুল হইয়া উঠিতাম। আমার পরবর্তী কারাজীবনে অবশ্য আমি নিৰ্জনতা ও গোপনীয়তা যথেষ্ট পৰিমাণে পাইয়াছি। যখন মাসেব পর মাস কদাচিৎ কোনও কার্যকৰ্মচাৰী ব্যতীত আব কাহারও দৰ্শন পাই নাই, কিন্তু ইহাতে ও গুণ প্রকার মনোবেদনায় কাতব হইয়া মনোমত ব্যক্তির সঙ্গ লাভেব জন্ম কাতব হইতাম। সেই নিঃসঙ্গ অবস্থায় ১৯২২-এব লক্ষ্মী ভেলে জনতার চট্টপোলেব মধ্যেও ফিৰিয়া গাইতে ইচ্ছা হইত, তথাপি আমি মনে মনে জানি, যদি লেখাপড়াৰ স্ববিধা থাকে তাহা হইলে নিৰ্জনতাই আমার অধিকতব কাম্য।

অবশ্য এই কথা আমি বলিব যে, আমার শঙ্কীদেব ব্যবহাৰ ভদ্র এবং আনন্দদায়ক ছিল। এবং আমার পবম্পব প্রীতিব সহিত হাস কৰিয়াছি। কিন্তু মনে হয়, কখনও কখনও পবম্পবেব সঙ্গ বিবক্তি আনিত। এবং দুবে সন্ধ্যা একটু নিৰ্জনে যাইতে ইচ্ছা হইত। ব্যাবাকেব বাহিৰে প্রাচীৰেব ধাবে গিয়া ফাঁকা জায়গাটুকুতে একটু নিৰ্জনতাব স্বাদ পাইতাম। তখন বৰ্ষাকাল, আকাশে মেঘ থাকিত বলিয়া ইহাব সুযোগ গ্রহণ কৰিতাম। কি সূৰ্য্যতাপ, এমন কি, বৃষ্টিতে ভিজিয়াও যতটা সময় পাবিতাম ব্যাবাকেব বাহিৰে থাকিতে চেষ্টা কৰিতাম।

সেই ফাঁকা জায়গাটুকুতে শুইয়া আমি উৰ্দ্ধে আকাশেব মেঘেব দিকে চাহিতাম। জীবনে কখনও এমন আশ্ৰয় লইয়া আকাশে মেঘমালাব বর্ণবৈচিত্ৰ্যেব এত রূপ দেখি নাই। “পবিবৰ্ত্তিত মেঘমালায় ষড়্ৰুতুব আবৰ্ত্তবিলাস দেখিতে দেখিতে শুইয়া থাকাও মধুময়। সমুদ্রবৰ্ষা কি আনন্দময় সম্ভোগ।”

কিন্তু হায়! আমাদের নিকট সময় সম্ভোগেব ছিল না। ইহা ছিল দুৰ্ৰহ ভাব। যখন আমি বৰ্ষাব মেঘপুঞ্জেব দ্রুত পবিবৰ্ত্তনলীলা দেখিয়া কাটাইতাম তখনই ক্লান্তি মোচনেব আনন্দে মন ভবিয়া উঠিত। এ যেন বন্দী-জীবনেব বন্ধন মুক্তি আবিষ্কাবেব আনন্দ। আমি বলিতে পাবি না যে, এই বিশেষ বৰ্ষাকালটি কেন এমন কবিয়া আমাব চিত্ত হরণ কবিল, কেন না, ইহাব পূৰ্বে ও পবে আব কোন বধায়ই আমি এমন অভিভূত হই নাই। আমি পরতশিখবে ও সমুদ্রগৰ্ভে বহুবাব মুগ্ধনেত্রে সূৰ্য্যোদয় এবং সূৰ্য্যাস্ত দেখিয়াছি। তাহাব আলোকধাবায় স্নান কৰিয়াছি। সে রূপ-সমাবোহে সমস্ত হৃদয় ও মন পুলকে নৃত্য কৰিয়াছে। কিন্তু তাহাও ক্ষণিকেব। দৰ্শনেই সব ফুৰাইয়া গিয়াছে। মন সহজেই বিয়্যাস্তবে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই কাবাগাবে সূৰ্য্যোদয় নাই, সূৰ্য্যাস্তও নাই, দিখলয়বেখা আমাদের চক্ষুব সম্মুখ হইতে আবৃত।

জওহরলাল নেহরু

প্রভাত উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রচণ্ড সূর্য্য কারাপ্রাচীরে ভাসিয়া উঠে। কোথাও কোন বর্ণবৈচিত্র্য নাই। কারাপ্রাচীর ও ব্যারাকে শ্রীহীন ধূসর বর্ণ দেখিতে দেখিতে চক্ষু ক্লান্ত এবং পীড়িত হয়। আলোও আধারের খেলা এবং রঙের লুকোচুরি দেখিবার জন্ত ক্ষুধিত দৃষ্টি ব্যাকুল হইয়া উঠে। যখন বর্ষার মেঘ মন্ডর গতিতে আকাশে ভাসিয়া চলে, ক্ষণে ক্ষণে আকার ও আকৃতির কত পরিবর্তন, বহু বিচিত্র বর্ণের সে কি সমারোহ। বিম্বিত আনন্দে আমি যেন একপ্রকার ভাবসমাধিতে মগ্ন হইয়া তাহা নিরীক্ষণ করিতাম। কখনও কখনও বিদীর্ণ মেঘের অন্তরালে গভীর নীল আকাশখণ্ড যেন অনন্তের আভাস আনিত—বর্ষার সে এক বিশিষ্ট দৃশ্য।

ক্রমে আমাদের উপর বিধিনিষেধের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। কঠোরতর নিয়ম প্রবর্তিত হইল। আমাদের আন্দোলনের পান্টা জ্বাবে গর্ভগমেণ্ট যেন জানাইয়া দিতে চাহিলেন যে, তাঁহাদের বিরুদ্ধতা করিবার জন্ত আমাদের উদ্ধত স্পর্ধায় তাঁহারা কি পরিমাণ অসম্মত হইয়াছেন। এই সকল নূতন বিধি এবং তাহার প্রয়োগ-পদ্ধতি লইয়া জেলকম্মী ও রাজবন্দীদের মধ্যে বিরোধ বাধিল। তখন আমরা ঐ জেলে কয়েক শত বন্দী ছিলাম। আমরা প্রায় সকলেই নূতন ব্যবস্থার প্রতিবাদ স্বরূপ কয়েক মাসের জন্ত বাহিরের আত্মীয় বন্ধুদের সহিত দেখা করা বন্ধ করিয়া দিলাম। এই অশান্তির জন্ত আমরা কয়েকজন নায়ী, ইহা স্থির করিয়া কারা কর্তৃক আমাদের সাত জনকে ব্যারাক হইতে স্বতন্ত্র করিয়া জেলের এক প্রান্তে লইয়া যাওয়া হইল। অর্থাৎ পুরুসোত্তম দাস ট্যাগুন, মহাদেব দেশাই, জর্জ জোশেফ, বালকৃষ্ণ শর্মা, দেবদাস গান্ধী এবং আমাকে স্বতন্ত্র করা হইল।

আমাদিগকে একটি অপরিসর স্থানে রাখা হইল। এইখানে অনেকগুলি অসুবিধাও ছিল, মোটের উপর এই পরিবর্তনে আমি সূখী হইলাম। এখানে জনতার হট্টগোল নাই। আমরা অনেক শাস্তির ও গোপনীয়তার সুযোগ পাইলাম। পড়াশুনা করিবারও সময় পাওয়া গেল। জেলের অগ্ন্যাগ্ন অংশে অবস্থিত আমাদের সহকর্মীদের সহিত বিচ্ছেদ ঘটিলই, রাজনৈতিক বন্দীদেরকে খবরের কাগজ দেওয়া বন্ধ করার ফলে বহিষ্কৃত হইতেও আমরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইলাম।

সংবাদপত্র না পাইলেও বাহিরের কিছু কিছু সংবাদ পাইতাম। জেলের কড়াকড়ির মধ্য দিয়া সর্বদাই কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। আমাদের মাসিক দেখাসাক্ষাৎ ও পত্রের মধ্যেও অসংলগ্ন ও টুকরা টুকরা সংবাদ

লক্ষৌ জেল

মিলিত। আমরা বুঝিলাম, বাহিরের আন্দোলনে ভার্টার টান ধরিয়াছে। সে ইঙ্গ্রাজালের মুহূর্ত্ত অবসান, সাফল্য অস্পষ্ট ভবিষ্যতে সরিয়া গিয়াছে। কংগ্রেস পরিবর্তন-প্রয়াসী ও পরিবর্তন-বিরোধী দুই দলে বিভক্ত হইয়াছিল। এক দলের নেতা হইয়াছেন দেশবন্ধু দাশ এবং আমার পিতা। তাঁহাদের মতে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক আইন-সভার নির্বাচনে যোগ দেওয়া উচিত এবং সম্ভব হইলে ঐগুলি দখল করা উচিত। রাজা গোপালাচারীর নেতৃত্বে চালিত অপর দল অসহযোগের পুরাতন কার্যপদ্ধতির পরিবর্তন প্রস্তাব মাত্রেরই বিরোধিতা করিতে লাগিলেন। অবশ্য গান্ধিজী তখন কারাগারে ছিলেন। আন্দোলনের মহোচ্চ আদর্শের উত্তালতরঙ্গ যাহা আমাদের কাছে উজ্জ্বল তুলিয়াছিল তাহাই ভার্টার টানে ক্ষুদ্র কলহ এবং ক্ষমতালাভের ষড়যন্ত্রের নিম্নস্তরে নিক্ষেপ করিল। আমরা বুঝিলাম, উত্তেজনার মুহূর্ত্তে মহৎ ও দুঃসাহসিক কাজ করা যত সহজ, উত্তেজনা নিভিয়া গেলে তাহাও তত সহজ নহে। বাহির হইতে আগত সংবাদে আমরা দমিয়া গেলাম এবং কারাজীবনে স্বভাবতই যে সব উপহাস ও বিদ্রূপ শ্রুত হইয়া থাকে তাহার কলেও জীবন অসহনীয় হইয়া উঠিল। তথাপি অন্তরে অন্তরে এ সাস্থনাই পাইলাম যে, আমরা আমাদের অ'ত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদা রক্ষা করিয়াছি এবং ফলাফলের দিকে না তাকাইয়া যথাকর্তব্য পালন করিয়াছি। ভবিষ্যৎ অস্পষ্ট, কিন্তু আর যাহাই ঘটুক না কেন, আমাদের জীবনের অধিকাংশ ভাগ যে কারাগারে কাটাইতে হইবে তাহা বুঝিতে পারিলাম। আমাদের মধ্যে এই শ্রেণীর আলোচনা চলিত, বিশেষভাবে আমার মনে আছে, একদিন জর্জ জোশেফের স্মৃতি আলোচনার পর আমরা পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম। এই ঘটনার পর যোশেফ ক্রমে আমাদের আন্দোলন হইতে দূরে সরিয়া গিয়া আমাদের কার্যাবলীর একজন উগ্র সমালোচক হইয়াছেন। লক্ষৌ জেলের সিভিল ওয়ার্ডে এক শরৎ সন্ধ্যায় বসিয়া আমরা সে আলোচনা করিয়াছিলাম তাহা কি তাঁহার মনে আছে ?

আমরা ধারাবাহিকরূপে কাজ ও ব্যায়াম করিতে লাগিলাম। ব্যায়ামের জন্ত আমরা প্রাচীর-ঘেরা জায়গাটুকুতে চক্রাকারে দৌড়াইতাম অথবা আমাদের ইয়ার্ডের কূপ হইতে প্রকাণ্ড চামড়ার থলিয়ায় করিয়া জল তুলিতাম। যে ভাবে দুইটি বলদ একত্র করিয়া জল তোলা হয় আমরাও সেই ভাবে দুই জন করিয়া জল তুলিতে লাগিয়া যাইতাম। এই জল সেচন করিয়া আমাদের উঠানে একটি ছোট তরকারির বাগান করিয়াছিলাম। আমরা প্রায় সকলেই প্রত্যহ কিছুকাল স্নাতা কাটিতাম। কিন্তু এই

জওহরলাল নেহরু

শীতকালের দীর্ঘ অপরাহ্নে পুস্তক পাঠ করাই ছিল আমার প্রধান কাজ। সুপারিন্টেন্ডেন্ট যখনই আমাদের ইয়ার্ডে আসিতেন তখনই দেখিতেন, যে আমি পড়িতেছি। এত বেশী পড়াশুনায় মনোযোগ বোধ হয় তাঁহার ভাল লাগিত না। একদিন এই বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, তিনি নিজে বার বৎসর বয়সেই সাধারণ পড়াশুনার পাঠ চুকাইয়া দিয়াছেন। এই সংঘর্ষের ফলে সেই সাহসী ইংরাজ কর্ণেল নিশ্চয়ই বিরক্তিকর অনেক চিন্তার হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ ইহাতেই ভবিষ্যতে তিনি যুক্তপ্রদেশের কারাগারসমূহের ইন্সপেক্টরের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। দীর্ঘ শীত সন্ধ্যায় নির্মল আকাশে তারকারাজির প্রতি আমরা চাহিয়া থাকিতাম। সৌরমণ্ডলের মানচিত্র হইতে অনেকগুলির নাম ও অবস্থান আমরা চিনিয়াছিলাম। রাত্রে পরিচিত তারকাগুলির উদয়ের জ্ঞান আমরা অপেক্ষা করিতাম এবং দেখামাত্র পুরাতন বন্ধুদর্শনের মত আনন্দ হইত। এই ভাবে দিন কাটে, দিন সপ্তাহ হয়, সপ্তাহ মাস হয়, মাসের পর মাস যায়, এক বাধাধরা জীবনযাত্রায় আমরা ক্রমেই অভ্যস্ত হইয়া উঠিলাম। বাহিরে আমাদের কাজের ভার লইয়াছেন নারীরা—আমাদের জননী, জায়া ও ভগ্নীগণ। দীর্ঘ প্রতীক্ষায় তাহারা বিরক্ত, প্রিয়জন কারাগারে রহিয়াছে, দৈনিক স্বাধীনতা তাহাদের নিকট ভৎসনার ন্যায় মনে হইতে লাগিল।

১৯২১-এর ডিসেম্বরে আমাদের প্রথম গ্রেফতারের পর হইতে পুলিশ প্রায়ই আমাদের এলাহাবাদের বাড়ী আনন্দভবনে আসিত। আমার ও পিতার জরিমানার টাকা আদায় করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। কংগ্রেসের নিয়ম ছিল স্বেচ্ছায় জরিমানা না দেওয়া। কাজেই পুলিশ দিনের পর দিন আসিয়া ক্রোক করিত এবং কিছু কিছু আসবাবপত্র লইয়া যাইত। আমার চারি বৎসরের কন্যা ইন্দিরা এই ক্রমাগত জিনিষপত্র অপসারণ ও নষ্ট করায় মহা বিরক্ত হইয়া পুলিশের কার্যের প্রতিবাদ করিত ও তাহার তীব্র অসন্তোষ জ্ঞাপন করিত। আমার আশঙ্কা হয়, ভবিষ্যৎ জীবনে সাধারণ পুলিশবাহিনী সম্পর্কে তাহার ধারণার উপর এই বাল্যস্মৃতির প্রভাব থাকিবে।

জেলের আমাদের সাধারণ অ-রাজনৈতিক কয়েদীদের হইতে পৃথক রাখার চেষ্টা করা হইত। এইজন্ত কতকগুলি জেল রাজনৈতিকদের জন্ত পৃথকরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পৃথক করা অসম্ভব এবং আমরা প্রায়ই তাহাদের সংস্পর্শে আসিতাম এবং তৎকালীন কারাজীবনের বাস্তব কাহিনীসকল তাহাদের নিকট প্রত্যক্ষভাবে

লক্ষ্মী জেল

শুনিলাম। ইহা দৈহিক অত্যাচার, অবৈধ উপায়ে পদলাভের চেষ্টা ও উৎকোচ প্রদানের মর্য়ন্দ কামিনী। খাণ্ডরূপে যাহা দেওয়া হয় তাহা অতি নিরুপ্ত। আমি পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, ইহা অখণ্ড। সাধারণতঃ কারাকর্মচারীরা অল্পবেতনভোগী ও অকর্মণ্য। ইহার নানা ছলনায় কয়েদী এবং তাহাদের আত্মীয়স্বজনের উপর জুলুম করিয়া অর্থ আদায় করিয়া থাকে। জেলার তাহার সহকারী এবং ওয়ার্ডারগণের যে সকল দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা জেল ম্যানুয়েলে উল্লেখ আছে তাহা এত বিভিন্ন প্রকার ও বিচিত্র যে, কোন এক ব্যক্তির পক্ষে বিবেক ও যোগ্যতার সহিত তাহা যথাযথ পালন করা প্রায় অসম্ভব। যুক্তপ্রদেশে (সম্ভবতঃ অগ্ন্যাগ্ন প্রদেশেও) জেলের পরিচালনা কার্যের সাধারণ নিয়মের সহিত কয়েদীর চরিত্র সংশোধন সম্ভাবহার শিক্ষাদান কিম্বা কার্য্যকরী কোন ব্যবসায় শিখাইবার কোন সম্পর্ক নাই। কারাগারে পরিশ্রম করাইবার উদ্দেশ্যই হইল কয়েদী হ্রদয়ান করা।* তাহাকে ভয় দেখাইয়া অন্ধ আত্মগতো অবনত করিতেই হইবে; উদ্দেশ্য, সে যেন কারাগার হইতে এমন ভয় ও বিভীষিকার স্মৃতি লইয়া যায় যে, যাহাতে কারাগারের স্মৃতি স্মরণ করিবামাত্র কোন অপরাধ করিতে তাহার হৃদকম্প হয়।

ইদানীং কারাব্যবস্থার কিঞ্চিৎ সংস্কার হইয়াছে। খাণ্ড একটু ভাল হইয়াছে, কয়েদীদের কাপড়-চোপড় ও অগ্ন্যাগ্ন বিষয়ে কিছু ভাল হইয়াছে। রাজনৈতিক বন্দীরা কারামুক্ত হইয়া বাহিরে আন্দোলন করার ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে ওয়ার্ডারেরা যাহাতে “সরকারের” প্রতি বিশ্বস্ত থাকে সেজন্য তাহাদিগকে প্ররোচিত করিবার

* যুক্তপ্রদেশের জেল ম্যানুয়ালের ৯৮৭ ধারায় ছিল—(নূতন সংস্করণে তাহা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে) “জেলে দৈহিক পরিশ্রমকে কেবল কার্য্যকরী মনে করিলেই চলিবে না। যেন রাখিতে হইবে, ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য শাস্তি। অথবা ইহাকে ল'ভজনক করিবার প্ররোচনাও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। জেলের কাজের প্রধান ও মুখ্য লক্ষ্য হইবে এই যে, ইহাকে বিরক্তিকর কঠোর এবং অস্বাস্থ্যকারী পক্ষে ভীতিপ্রদ করিতে হইবে।”

ইহার সহিত রুশিয়ার সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলদারী আইনের তুলনা করা যাইতে পারে,—

৯ ধারা—“সমাজরক্ষামূলক উপায়গুলির এরূপ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে যাহার লক্ষ্য দৈহিক দণ্ডান, মনুষ্যোচিত মর্যাদার লোপ ঘটান কিম্বা প্রতিশোধমূলক বা শাস্তিমূলক।

২৬ ধারা—“কাদারগণের উদ্দেশ্য হইবে অস্বাস্থ্যকারীকে অস্বাস্থ্যকর্মপ্রবণতা হইতে বিরত রাখা। কয়েদীর উপর কোন প্রকার পীড়ন চলিবে না কিম্বা তাহাকে অনাবশ্যক ও অতিরিক্ত দুঃখভোগ করিতে যেন না দেওয়া হয়।”

জওহরলাল নেহরু

জন্তু বেতনও বেশ ভালভাবে বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। বালক ও তরুণ কয়েদীদেরকে লেখাপড়া শিখাইবার অতিসামান্য চেষ্টাও আজকাল করা হইতেছে। কিন্তু এ সকল পরিবর্তন ভাল হইলেও সমস্তকে অল্পই স্পর্শ করিয়াছে। পুরাতন ধারা সমানভাবেই চলিতেছে।

অধিকাংশ রাজনৈতিক বন্দীই সাধারণ কয়েদীর মতন ব্যবহার পাইয়াছেন। তাঁহারা বিশেষ সুবিধা বা সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার পাইতেন না কিন্তু তাঁহারা বুদ্ধিমান এবং দৃঢ়-চরিত্র বলিয়া তাঁহাদিগকে দিয়া যাহা খুসী করান কিছা টাকাকড়ি আদায় করা সহজ ছিল না। এই কারণে কারাকর্মচারীরা তাঁহাদিগকে বিষদৃষ্টিতে দেখিত। জেলের শৃঙ্খলা ভঙ্গ কি অনুরূপ কোন সুযোগ পাইলেই ইহাদিগকে কঠিন দণ্ড দেওয়া হইত। এইরূপ শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে পনের-ঘোল বৎসর বয়স্ক এক যুবককে (সে নিজের নাম বলিত আজাদ) বেত্রদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইল। তাহাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া চাবুক মারার তেকাটায় বাধা হইল, প্রত্যেকটি বেত্রাঘাত যখনই তাহার দেহে কাটিয়া বসিতে লাগিল, সে সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিতে লাগিল, “মহাত্মা গান্ধীকি জয়।” অজ্ঞান হওয়ার পূর্বে পর্য্যন্ত বালক ধ্বনি উচ্চারণ করিয়াছিল। পরবর্তীকালে এই বালকই এক টেরোরিষ্ট দলের নেতা হইয়াছিল।

১৪

কারামুক্তি

জেলে মানুষ অনেক কিছু হইতেই বঞ্চিত হয় কিন্তু তাহার মধ্যেও নারীর কণ্ঠস্বর ও শিশুর হাসির অভাবই বেশী করিয়া মনে পড়ে। জেলের দৈনন্দিন শব্দ শ্রুতিস্থখকর নহে। জেলের কথাবার্তা কর্কশ, ভয়চকিত এবং ভাষা ইতর ও অঙ্গীল। আমার মনে আছে, একদিন হঠাৎ এক নূতন অভাব বোধ করিলাম। লক্ষ্যে জেলে সহসা আমার মনে হইল সাত-আট মাস আমি কুকুরের ডাক শুনি নাই।

১৯২৩-এর জানুয়ারী মাসের শেষ দিন আমায় সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি পাইলাম। লক্ষ্যে জেলে তখন “বিশেষ শ্রেণীর” বন্দীসংখ্যা একশত

কারামুক্তি

হইতে দুই শতের মধ্যে ছিল। ১৯২১-২২ ডিসেম্বর ও জানুয়ারীতে যাহারা এক বৎসর ও তাহার কম দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন তাঁহারা দণ্ড ভোগান্তের পূর্বেই মুক্তি পাইয়াছিলেন; কেবল যাহাদের দীর্ঘ কারাদণ্ড হইয়াছিল অথবা যাহারা দ্বিতীয় বার ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এখানে কেবল তাঁহারা ই ছিলেন। এই আকস্মিক কারামুক্তিতে আমরা বিস্মিত হইলাম। এই সাধারণ দণ্ড মকুবের সংবাদ আমরা পূর্বে পাই নাই। স্থানীয় প্রাদেশিক আইন সভায় রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিবার একটা প্রস্তাব পাশ হইয়াছিল বটে, কিন্তু সরকারী শাসন-পরিষদ কদাচিৎ এরূপ দাবী গ্রাহ্য করিয়া থাকেন। যাহা হউক, গভর্নমেন্টের দিক দিয়া এখন স্বেচ্ছায়। কংগ্রেস গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে কিছু না করিয়া এখন আত্মকলহে মগ্ন এবং খ্যাতনামা কোন কংগ্রেসকর্মী এ সময় জেলের মধ্যে ছিলেন না বলিয়াই এই দয়াদুর্ক দেখান হইল।

কারাবার হইতে বাহির হইবার প্রথম মুহূর্তে একটা তৃপ্তি ও আনন্দময় চাঞ্চল্য বোধ হইয়া থাকে। মুক্ত বায়ু, অব্যাহত মাঠ, রাজপথের গতিশীল জনতা ও ধানবাহন, পুরাতন বন্ধুদের সহিত মিলন, এই সমস্ত মিলিয়া এক অপূর্ণ উন্মাদনা আনিয়া দেয়। বহির্জগতের সহিত প্রথম সংঘাতে মন উদ্বেল হইয়া উঠে। কিন্তু এই উৎফুল্ল আবেগ অতি ক্ষণস্থায়ী, কেন না, কংগ্রেস রাজনীতির অবস্থা অত্যন্ত নিরুৎসাহজনক হইয়া উঠিয়াছিল। আদর্শবাদের পরিবর্তে জটিল চক্রান্ত এবং বিভিন্ন উপদলগুলি যে সকল উপায়ে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠানগুলি দখল করিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহা দেখিয়া ভাবপ্রবণ ব্যক্তির রাজনীতির উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

আমি নিজে কাউন্সিল প্রবেশের বিরুদ্ধ মতই পোষণ করিতাম, কেন না, ইহার ফলে কোশলের নামে আপোষ-রফার মধ্যে পুড়িতে হইবে এবং আমাদের উদ্দেশ্য ক্রমেই শিথিল হইয়া পড়িবে কিন্তু কার্যতঃ তখন দেশের সম্মুখে কার্যপ্রণালী ছিল না। পরিবর্তনবিরোধীরা গঠনমূলক কার্যের উপর জোর দিতে লাগিলেন। ইহা মুখ্যতঃ সমাজ-সংস্কারমূলক পদ্ধতি মাত্র। ইহার স্বপক্ষে এইটুকু বলা যায় যে, ইহার দ্বারা কর্মীরা জনসাধারণের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতে পারিবেন। কিন্তু যাহারা রাজনৈতিক কার্যক্রমে বিশ্বাসী তাঁহারা ইহাতে সুখী হইতে পারিলেন না। অথচ প্রত্যেক সংঘর্ষমূলক কার্যের অসাফল্যের প্রতিক্রিয়ায় যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে কিছুকালের জন্য পার্লামেন্টীয় নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়া চলা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এই নূতন আন্দোলনের নেতৃত্ব দেশবন্ধু দাশ ও আমার পিতা যে কার্যপদ্ধতি নির্দেশ করিলেন

জওহরলাল নেহরু

তাহা সহযোগিতা অথবা গঠনমূলক নহে, তাহা বাধাপ্রদান ও উপেক্ষা করার নীতি।

দেশবন্ধু জাতীয় সংগ্রামকে আইন সভার মধ্যেও লইয়া যাইবার পক্ষপাতী ছিলেন। আমার পিতারও অল্পবিস্তর সেইরূপ ইচ্ছা ছিল। তবে তিনি গান্ধিজীর মত মানিয়া লইয়া ১৯২০-এ আইন সভা বর্জনে সম্মতি দিয়াছিলেন। তিনি জাতীয় আন্দোলনে সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে উৎসুক ছিলেন এবং তখন ইহার একমাত্র পথ ছিল গান্ধী-নির্দিষ্ট কার্যপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা। সিন্ফিন্গণ যেমন পার্লামেন্টের আসনগুলি দখল করিয়া হাউস অফ কমন্সে যোগ দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন; যুবকগণের মধ্যে অনেকে সেইরূপ কৌশলের কথা চিন্তা করিতেন। ১৯২০-এর গ্রীষ্মকালে এই প্রকার বর্জনে গ্রহণ করিবার জন্য গান্ধিজী অতীব ইচ্ছুক হইয়াছিলেন কিন্তু তিনি স্বীকৃত হন নাই। মহাত্মদ আলী তখন খিলাফত ডেপুটেশন লইয়া ইউরোপে। তিনিও ফিরিয়া আসিয়া বয়কট ও বর্জনের পদ্ধতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন। সিন্ফিন্ পদ্ধতির উপর তাঁহারও ঝোঁক ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে কাহারও ব্যক্তিগত চিন্তা বা ধারণার কোনই মূল্য নাই, কেন না, পরিণামে গান্ধিজীর মতই বলবত্তর হইত। তিনিই আন্দোলনের স্রষ্টা; কাজেই খুঁটিনাটি সকল বিষয়েই তাঁহার স্বাধীনতা থাকা উচিত, এইরূপই সকলে মনে করিতেন। সিন্ফিন্ পদ্ধতির বিরুদ্ধে (হিংসামূলক কার্যের সহিত সংশ্রব ছাড়াও) তাঁহার প্রধান যুক্তি ছিল এই যে, ভোট দিও না, নির্বাচন-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইও না—ইহা জনসাধারণ যত সহজে বুঝিবে সিন্ফিন্ পদ্ধতি তত সহজে ধরিতে পারিবে না। আইন সভায় নির্বাচিত হইয়া প্রবেশ করিতে বিরত থাকিলে জনসাধারণের চিত্ত বিভ্রান্ত হইবে। এবং আরও কথা এই, যাহারা নির্বাচিত হইবেন তাঁহারা স্বভাবতই আইন সভায় যাইতে চাহিবেন এবং তাঁহাদিগকে ঠেকাইয়া রাখা কঠিন হইবে। আন্দোলনের শৃঙ্খলা এবং শক্তি এমন ছিল না যে দীর্ঘকাল তাঁহাদিগকে ঠেকাইয়া রাখা যাইতে পারে। আইন সভার মধ্য দিয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সরকারী অহুগ্রহ লাভের জন্য লালায়িত হইয়া অধঃপতনের দিকে অনেকেই গড়াইয়া যাইত। এই সকল যুক্তির সারবস্তু আমরা পরে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। স্বরাজ্য দল আইন সভায় প্রবেশ করার পর ইহার অনেক কথাই সত্যে পরিণত হইয়াছিল। তথাপি ১৯২০ সালে কংগ্রেস যদি আইন সভাগুলি দখল করিতে চেষ্টা করিত তাহা হইলে ফল কি হইত ইহা মাঝে মাঝে মনে হয়। খিলাফত কমিটির সহায়তায় তখন কংগ্রেস কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক প্রত্যেকটি

কারাবুক্তি

নির্বাচিত আসন লাভ করিতে পারিত, ইহা নিঃসন্দেহ। আজ (আগষ্ট ১৯৩৪) পুনরায় কংগ্রেস কর্তৃক কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে সমস্ত প্রেরণের কথা চলিতেছে এবং এই উদ্দেশ্যে একটি পার্লামেন্টারি বোর্ডও সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ১৯২০-এর পর নানা ঘটনায় আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কাটলগুলির ব্যবধান ও গভীরতা বাড়িয়াছে। নির্বাচনে কংগ্রেস যে সাফলাই লাভ করুক না কেন, ১৯২০-এ যাহা হইতে পারিত বর্তমানে তাহা সম্ভব নহে।

ফল হইতে বাহির হইবার পর আমি আরও কয়েকজনের সহিত মিলিত হইয়া দুই যুগ্মমান দলের সহিত আপোষরকার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কোনই ফল হইল না; আমি পরিবর্তনপ্রয়াসী ও পরিবর্তন-বিরোধী উভয়দলের রাজনীতির উপরই বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। অগত্যা যুক্তপ্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকরূপে আমি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলির গঠনকার্যে প্রবৃত্ত হইলাম। গত বৎসরের আলোড়নের পর অনেককিছুই করিবার ছিল। আমি খুব খাটিতে লাগিলাম; কিন্তু এই কাজের কোন নিশ্চিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল না। আমার মন শিথিল হইয়া আসিতেছিল, এমন সময় একটা নতুন কাজ জুটিয়া গেল। আমার মুক্তির কয়েক সপ্তাহ পরেই আমাকে টানিয়া লইয়া এলাহাবাদ মিউনিসিপালিটির মাধ্যম বসাইয়া দেওয়া হইল। এই নির্বাচন এত আকস্মিক যে সভা আরম্ভের ৪৫ মিনিট পূর্বে পর্যন্ত আমার নাম কেহ উল্লেখ করেন নাই, এমন কি, সম্ভবতঃ ভাবেনও নাই। শেষ মুহূর্তে কংগ্রেসপক্ষীয়েরা স্থির করিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে আমি ছাড়া আর কাহারও সাফল্যের সম্ভাবনা নাই।

এই বৎসর দেশের নানাস্থানে কংগ্রেসের নেতারা মিউনিসিপালিটির সভাপতি হইয়াছিলেন। দেশবন্ধু কলিকাতার মেয়র, ভিটলভাই প্যাটেল বোম্বাই করপোরেশনের সভাপতি এবং সর্দার বলভভাই প্যাটেল আহমদাবাদের সভাপতি হইলেন। যুক্তপ্রদেশেও বড় বড় মিউনিসিপালিটিগুলির চেয়ারম্যানের পদে কংগ্রেস পক্ষীয়ই অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

মিউনিসিপালিটির বিভিন্ন বিভাগের কার্যে আমি ক্রমশঃ বেশী সময় দিতে লাগিলাম। এবং কতকগুলি সমস্তার প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। আমি অহুস্কার ও গবেষণা করিয়া মিউনিসিপালিটি সংস্থাকে বড় বড় পরিকল্পনা করিলাম। কিন্তু পরে দেখিলাম ভারতীয় মিউনিসিপালিটিগুলি যেভাবে গঠিত তাহাতে চমকপ্রদ বড় বড় সংস্থারের স্থান অতি সঙ্কীর্ণ। অবশ্য করিবার অনেক কিছুই ছিল। যন্ত্রটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং উহার গতি বাড়াইবার জন্য আমি কঠিন পরিশ্রম করিতে

জওহরলাল নেহরু

লাগিলাম। এদিকে কংগ্রেসেরও কাজ বাড়িল। প্রাদেশিক সম্পাদকের দায়িত্বের উপর নিখিল ভারতীয় সম্পাদকের ভারও গ্রহণ করিতে হইল। এই সকল বিভিন্ন কাজে আমাকে প্রত্যহ প্রায় ১৫ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হইত এবং দিবাবসানে আমি ক্লান্তিতে অবসন্ন হইয়া পড়িতাম।

জেল হইতে বাড়ী ফিরিয়া যে পত্রখানি আমার প্রথম চোখে পড়িল তাহা এলাহাবাদ হাইকোর্টের তখনকার বিচারপতি শ্রী গ্রীমউড্ মিয়ার্স-এর লেখা। পত্রখানিতে আমি ছাড়া পাইবার কয়েকদিন পূর্বের তারিখ ছিল। বুঝিলাম তিনি ছাড়া পাওয়ার খবর পূর্বেই জানিতেন। তাঁহার পত্রের সৌজন্যপূর্ণ ভাষা এবং মাঝে মাঝে আমাকে তাঁহার সহিত দেখা করিবার সহৃদয় আমন্ত্রণে আমি একটু বিস্মিত হইলাম। তাঁহার সহিত আমার পরিচয় নাই বলিলেই হয়। তিনি ১৯১৯-এ যখন এলাহাবাদে আসেন তখন আমি আইন ব্যবসায় প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছি। আমার মনে আছে, তাঁহার আদালতে মাত্র একদিন আমি কোনও মামলায় সওয়াল জবাব করিয়াছিলাম। এবং সে-ই আমার হাইকোর্টে সর্বশেষ উপস্থিতি। কোন কোন কারণে হয় ত বা তিনি আমাকে ভাল করিয়া না জানিয়াই আমার প্রতি অনুকূল ধারণা পোষণ করিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল—একথা তিনি পরে বলিয়াছিলেন যে, আমি বড় বেশী অগ্রসর হইব, সেইজন্য তিনি আমার উপর সংপ্রভাব বিস্তার করিয়া আমাকে ব্রিটিশ সদিচ্ছা বুঝাইয়া দিবার জন্য ব্যর্থ হইয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত কৌশলের সহিত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে অধিকাংশ ইংরাজের এই ধারণা যে, ভারতের সাধারণ “চরমপন্থী” রাজনৈতিকদের ব্রিটিশ বিরোধী হইবার কারণ যে তাহারা সামাজিক ব্যাপারে ইংরাজের নিকট খারাপ ব্যবহার পাইয়াছেন। ইহাই ক্রোধ বিরক্তি এবং চরমপন্থার কারণ। একটা গল্প প্রচলিত আছে এবং অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও বলিয়া থাকেন যে, আমার পিতা কোনও ইংরাজ ক্লাবের সদস্য নির্বাচিত হইতে না পারিয়া ব্রিটিশ বিরোধী ও চরমপন্থী হইয়াছেন। এই গল্পটির কোন ভিত্তি নাই এবং ইহা সম্পূর্ণ এক পৃথক ঘটনার অপলম্পাত্র।* কিন্তু অধিকাংশ ইংরাজের নিকট জাতীয় আন্দোলনের উৎপত্তির এই শ্রেণীর যুক্তি ও ব্যাখ্যা সত্য হউক মিথ্যা হউক, সহজ ও হৃদয়গ্রাহী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে পিতার অথবা আমার এমন কোনও কারণ ছিল না; ব্যক্তিগতভাবে আমরা ইংরাজের নিকট ভদ্র ব্যবহারই

* ৩৬ অধ্যায়ের পাদটীকায় এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

কারাশক্তি

পাইয়াছি এবং খোলাখুলিভাবেই মিশিয়াছি। তজ্জাচ সমস্ত ভারতীয়ের মতই জাতিগত পরাধীনতা সম্পর্কে আমরা সচেতন ছিলাম এবং তাহার জন্ত অন্তরে ক্রোধ ও তিক্ততাও ছিল। আমি অকপট চিন্তে স্বীকার করিতেছি, এমন কি, এখনও একজন ইংরাজের সহিত আমি প্রাণ খুলিয়া মিশিতে পারি। অবশ্য তিনি যদি একজন সরকারী কর্মচারী হন এবং মুকুবিয়ানা ভঙ্গী দেখান তাহা হইলেও সে মেলামেশায় আমোদের কোন অভাব হয় না। সম্ভবতঃ মডারেট বা ঐ জাতীয় ধাঁহার ভারতে ইংরাজের সহিত রাজনৈতিক সহযোগিতা করিয়া থাকেন তাঁহাদের অপেক্ষা আমার সহিত ইংরাজ স্বভাবের সৌসাদৃশ্য অনেক অধিক।

শ্রুত গ্রীমউড ভাবিলেন, বন্ধুভাবে মিলন এবং সরল সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা তিনি আমার মন হইতে তিক্ততার মূল কারণগুলি দূর করিবেন। তাঁহার সহিত আমার কয়েকবার দেখা হইয়াছিল। কোন মিউনিসিপালিটির ট্যাক্সের প্রতিবাদ করিবার অছিলায় তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন ও সঙ্গে সঙ্গে অপর সব বিষয়েও আলোচনা করিতেন। একদিন তিনি ভারতীয় মডারেটদিগকে অতি তীব্রভাবে আক্রমণ করিলেন। ভীক, কাপুরুষ, স্ববিধাবাদীর দল, চরিত্র ও মেরুদণ্ডহীন—এই সকল কথা অত্যন্ত ঘৃণার সহিত বলিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি মনে কর যে এই লোকগুলির উপর আমাদের কোন শ্রদ্ধা আছে? আমি আশ্চর্য হইলাম, একথা আমাকে বলিবার প্রয়োজন কি? সম্ভবতঃ তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, এই শ্রেণীর কথায় আমি খুব স্বীকৃত হইব। কথায় কথায় তিনি নূতন কাউন্সিল এবং মন্ত্রীদেব কথ্য তুলিলেন। দেশের সেবা করিবার জন্ত এই সব মন্ত্রীর কত স্বেচ্ছা তাহাও উল্লেখ করিলেন। শিক্ষা দেশের একটা প্রধান ও মুখ্য সমস্যা। একজন শিক্ষা মন্ত্রী যদি নিজের হুঁচকামত কাজ করিবার স্বাধীনতা পান তাহা কি লক্ষ লক্ষ মানবের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণে একটা উপযুক্ত স্বেচ্ছা নহে? জীবনে এমন স্বেচ্ছা কয়জন পায়? তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন—মনে কর তোমার মত একজন লোক—বুদ্ধি, চরিত্র, আদর্শবাদ এবং কর্মোৎসাহ যাহার আছে তাহাকে যদি এই প্রদেশের শিক্ষার ভার দেওয়া হয় তাহা হইলে তোমার মত লোক কি অসাধ্য সাধন করিতে পারে না? তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, অল্পদিন পূর্বে তাঁহার সহিত গভর্ণরের সাক্ষাৎ হইয়াছে, এবং নিজের উদ্দেশ্য মত কাজ করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আমাকে দেওয়া হইবে। সম্ভবতঃ তিনি বেশী দূর অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া আশ্বাসঘরণ

করিলেন এবং বলিলেন তিনি সরকারীভাবে কিছু বলিতেছেন না, ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত প্রস্তাব মাত্র।

শ্রী গ্রীমউডের এই কুট কৌশলপূর্ণ প্রস্তাবটি হইতে অবশ্য আমি পরিভ্রাণ পাইয়াছিলাম। মন্ত্রীরূপে গভর্ণমেন্টের সহিত সহযোগিতা করার কথা ত আমি ভাবিতেই পারি না এবং নিশ্চয়ই ইহার মত ঘৃণার্থ আমার নিকট আর কিছু নাই। কিন্তু তখন এবং পরবর্ত্তীকালেও কিছু স্থায়ী প্রত্যক্ষ গঠনমূলক কাজের জন্ত আমার মনে মাঝে মাঝে আকাঙ্ক্ষা জাগিত। মাহুঘের পক্ষে ধ্বংস, আন্দোলন এবং অসহযোগ স্বাভাবিক কার্য্যপদ্ধতি নয়। কিন্তু আমাদের ভাগ্য এরূপ যে ধ্বংস ও সংঘর্ষের মরুভূমি অতিক্রম করিয়াই আমাদেরকে সেইখানে যাইতে হইবে, যেখানে আমরা গঠনমূলক কিছু করিতে পারিব। হয় ত আমাদের অধিকাংশের শক্তিসামর্থ্য ও জীবন এই শিথিল বালুকারাশির মধ্য দিয়া সংঘর্ষ ও ক্লান্তিতেই নিঃশেষিত হইবে এবং গঠন করিবে আমাদের পুত্র অথবা পুত্রের পুত্রগণ।

ঐ কালে মন্ত্রীগিরি কত সস্তা ছিল,—অন্ততঃ যুক্তপ্রদেশে। যে দুইজন মডারেট মন্ত্রী অসহযোগ আন্দোলনের কালে কাধ্য করিয়াছিলেন তাঁহাদের মেয়াদ ফুরাইল। কংগ্রেসী আন্দোলন যখন বর্ত্তমান বাবস্থার পক্ষে বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছিল তখন গভর্ণমেন্ট কংগ্রেস দমনে মডারেট মন্ত্রীদের কাজে লাগাইয়াছিলেন। তখন তাঁহারা সম্মান পাইতেন, সরকারী শাসন পরিষদও তাঁহাদের শ্রদ্ধা করিয়া চলিতেন। সেই দুদিনে গভর্ণমেন্টের সমর্থকরূপে মন্ত্রীদিগকেই তাঁহারা আকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। মন্ত্রীরা সম্ভবতঃ মনে করিতেন, এই সম্মান ও শ্রদ্ধা তাঁহাদের জায়া প্রাপ্য। কংগ্রেসের সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণের প্রতিক্রিয়া হইতেই যে গভর্ণমেন্ট এইরূপ করিতেছেন তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন না। যখন আক্রমণ বন্ধ হইল, সঙ্গে সঙ্গে মডারেট মন্ত্রীদের মূল্যও গভর্ণমেন্টের দৃষ্টিতে একদম কমিয়া গেল। সহসা দেখা গেল, সম্মান ও শ্রদ্ধা বলিয়া কিছু অবশিষ্ট নাই। মন্ত্রীরা ইহাতে ক্ষুব্ধ হইলেন কিন্তু সে নিষ্ফল আক্ৰোশ তাঁহাদের কোন কাজেই আসিল না। শীঘ্রই তাঁহারা পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তারপর নূতন মন্ত্রীর অহুসন্ধান চলিতে লাগিল কিন্তু গভর্ণমেন্ট সহসা কৃতকার্য্য হইলেন না। আইন সভার মুষ্টিমেয় মডারেট তাঁহাদের সহকর্মীদের প্রতি দুর্ব্যবহারে সহ্যহৃৎসিম্পন্ন হইয়া সরিয়া রহিলেন। অবশিষ্ট সদস্তগণের অধিকাংশই জমিদার, তাহার মধ্যে মোটামুটি লেখাপড়া জানেন এরূপ লোকের

কারাশুভি

সংখ্যাও অতি কম। কংগ্রেস আইন সভা বর্জন করায় সেখানে বহু বিচিত্র লোকের আশ্চর্য্য সম্মেলন ঘটিয়াছিল।

এই সময় অথবা কিছু দিন পরে যুক্তপ্রদেশে একজন ব্যক্তিকে মন্ত্রীগিরি দেওয়ার প্রস্তাব সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। তিনি নাকি উত্তর দিয়াছিলেন যে, তিনি এত লঘুচিত্ত নহেন যে, নিজকে একজন মন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করেন; তবে তাঁহার কিছু বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, হইতে পারে তাহা সাধারণ লোক অপেক্ষা একটু বেশী, অন্ততঃ তাঁহার ধারণা এ খ্যাতিটুকু তাঁহার আছে। গভর্ণমেন্ট তাঁহাকে মন্ত্রী করিয়া কি জগতের সম্মুখে একজন নিরেট মুখ বলিয়া পরিচিত করিতে চান?

এই প্রতিবাদের কিছু কারণ ছিল। মডারেট মন্ত্রীরা সঙ্কীর্ণচেতা, রাজনীতি বা সামাজিক ব্যাপারে উদারদৃষ্টিহীন। অবশ্য এ দোষ তাঁহাদের নয়, ইহা তাঁহাদের বন্ধ্য। মডারেটীয় নীতির ফল। যাহা হউক, সাধারণ চাকুরীজীবী বা বৃত্তিজীবীদের দক্ষতা তাঁহাদের ছিল এবং দৈনন্দিন কাজ তাঁহারা বিবেক বুদ্ধি অনুসারে চালাইয়া যাইতে পারিতেন। তাঁহাদের পর যাহারা জমিদারশ্রেণী হইতে আসিলেন তাঁহাদের শিক্ষাও সাধারণ ভাবে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। আমার মতে তাঁহাদিগকে লিখিতে পড়িতে জানেন এই মাত্র বলা চলে, তাহার বেশী নহে। গভর্ণর এই ভদ্রলোকদিগকে উচ্চপদে মনোনীত করিয়া যেন দেখাইতে লাগিলেন ভারতীয়েরা কত অযোগ্য, কত অপদার্থ। তাঁহাদের সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে, “ভাগ্য যখন সুপ্রসন্ন তখন সব বিষয়েই সাহস করা যাইতে পারে, নারীর পক্ষে অসাধ্য কিছুই নাই।”—রিচার্ড গারনেট্।

শিক্ষা থাক আর নাই থাক, এই সব মন্ত্রীর হাতে জমিদারদের ভোট ছিল এবং ইহারা সরকারী কর্মচারীদিগকে সুন্দর সুন্দর বাগান পার্টিতে আপ্যায়িত করিতে পারিতেন। অনশনক্লিষ্ট প্রজার নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থের ইহা অপেক্ষা অধিক কি সম্ভব হইতে পারে?

সন্দেহ ও সংঘর্ষ

অশান্তিজনক সমস্যাগুলি ভুলিয়া থাকিবার জ্ঞান আমি নানারকম কাজ করিতে লাগিলাম। কিন্তু এড়ান কঠিন; স্বাভাবিক ভাবেই মনে যে সকল প্রশ্ন গড়িয়া উঠে, তাহার কোন সন্তোষজনক উত্তর খুঁজিয়া পাই না। এখন যাহা করিতেছি তাহা কেবল নিজকে ভুলাইবার জ্ঞান, ইহার মধ্যে ১৯২০-২১-এর মত প্রাণের পরিপূর্ণ বিকাশ নাই। তখনকার দিনে যে বর্ষে আত্মরক্ষা করিতাম, সেই আবরণ ত্যাগ করিয়া আমি ভারত ও জগতের বিচিত্র: ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। এখন অনেক পরিবর্তন দেখি, যাহা পূর্বে লক্ষ্য করি নাই, নূতন আদর্শ নূতন বিষয় আলোকের পরিবর্তে সংশয়ের অন্ধকারই ঘনাইয়া তুলে। গান্ধিজীর নেতৃত্বের উপর আমার অবিকলিত আস্থা সত্ত্বেও আমি তাঁহার কার্যপদ্ধতির কোন কোন অংশ পূর্বাপেক্ষা অধিকতর বিচার করিয়া দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু তিনি তখনও কারাগারে আমাদের আয়ত্তের বাহিরে, তাঁহার উপদেশ পাওয়া সম্ভবপর নহে। আমি দেখিলাম কংগ্রেসের দুই দলই—কাউন্সিলগামী দল এবং পরিবর্তনবিরোধী দল কোনই কাজ করিতেছেন না। প্রথমোক্ত দল ক্রমশ: সংস্কারপন্থী ও নিয়মতান্ত্রিক হইয়া পড়িতেছেন এবং তাহার ফল আমার নিকট চোরাগলিতে আটকাইয়া পড়িবার মত বোধ হইল। পরিবর্তনবিরোধীরা মহাত্মাজীর একনিষ্ঠ অনুচর বলিয়া কথিত হইতেন; কিন্তু মহাপুরুষদের অগ্রাঙ্ক শিষ্যগণের মতই তাঁহারাও তাঁহার শিক্ষার মূলভাব ছাড়িয়া বাহিরের খোসা লইয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কোন ভেজস্বিতা ছিল না, কার্যত: তাঁহারা অত্যন্ত নিরীহ সদাশয় সমাজসংস্কারক মাত্র, কিন্তু তাঁহাদের এক স্রবিধা ছিল, স্বরাজ্যীরা যখন আইন সভায় নিয়মতান্ত্রিক কলকৌশল লইয়া সারাক্ষণ ব্যাপৃত ছিলেন তখন তাঁহারা (পরিবর্তনবিরোধী) কৃষকসাধারণের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছিলেন।

★ (আমার কারামুক্তির কিছুকাল পরেই দেশবন্ধু দাশ আমাকে স্বরাজ্য দলে যোগ দেওয়াইবার জ্ঞান চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার যুক্তির নিকট আমি আত্মসমর্পণ না করিলেও আমি যে কি করিব সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা আমার ছিল না। আমার পিতা এইকালে স্বরাজ্য দল

সন্দেহ ও সংশয়

লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আশ্চর্য্য উল্লেখযোগ্য যে, তিনি কখনও আমাকে উক্ত দলে লইবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন নাই অথবা কোন প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন নাই। ইহা সত্য যে, আমি তাঁহার সহিত এই দলে যোগ দিলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার অনগ্রসাধারণ সুবিবেচনা ছিল বলিয়াই তিনি এ বিষয়ে আমাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছিলেন।

এই কালে আমার পিতার সহিত দেশবন্ধু দাশের বন্ধুত্ব অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। এই বন্ধুত্বের মধ্যে রাজনৈতিক সহকর্মীর সম্পর্ক অপেক্ষা অনেক বেশী কিছু ছিল। তাঁহাদের পরস্পরের অনুরাগ ও নিবিড় প্রীতি দেখিয়া আমি একটু আশ্চর্য্য হইলাম, কেন না পরিণত বয়সে এরূপ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব কদাচিৎ হইয়া থাকে। পিতার বহু পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন এবং লঘুভাবে সকলের সহিত মিশিবার ক্ষমতাও ছিল তাঁহার অসাধারণ। কিন্তু বন্ধুত্ব হইতে তিনি সতর্ক থাকিতেন এবং শেষ বয়সে জীবন ও মাহুষের প্রতি তাঁহার অবজ্ঞা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তথাপি তাঁহার ও দেশবন্ধুর মধ্যে কোন ব্যবধান রহিল না এবং তাঁহারা পরস্পরকে হৃদয়ের সহিত গ্রহণ করিলেন। আমার পিতা বয়সে নয় বৎসরের বড় হইলেও দুইজনের মধ্যে শরীরের তুলনায়, পিতার স্বাস্থ্য ও শক্তি বেশী ছিল। যদিও তাঁহারা উভয়েই আইনজীবী ও ঐ ব্যবসায়ে একই প্রকার সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি অনেক দিক দিয়া উভয়ের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ছিল। চিত্তরঞ্জন দাশ আইনব্যবসায়ী হইলেও কবি ছিলেন এবং কবির আবেগ লইয়া সব কিছু দেখিতেন। আমি শুনিয়াছি, তিনি বাঙ্গলায় কতকগুলি উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিয়াছেন। তিনি বাগ্মী ও ধর্মপ্রবণ ছিলেন। আমার পিতা অত্যন্ত বাস্তববাদী এবং কবিত্বহীন কঠোর ছিলেন। কাজকর্ম ও সজ্জ গঠনাদি বিষয়ে তিনি নিপুণ ছিলেন কিন্তু তাঁহার মধ্যে ধর্মভাব ছিল না বলিলেই হয়। তিনি ছিলেন যোদ্ধা—আঘাত করিতে বা পাইতে সর্বদাই প্রস্তুত। তিনি যাহাদিগকে নির্দোষ মনে করিতেন তাহাদের সঙ্গ সহ্য করিতে পারিতেন না। করিলেও সন্তোষের সহিত করিতেন না। এবং তিনি প্রতিবাদ-অসহিষ্ণু ছিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বীকে সম্পূর্ণ পরাভূত করিবার প্রবল উদ্বেগনায় তিনি কর্ম করিতেন। এইরূপে আমার পিতা ও দেশবন্ধুর চরিত্রে স্বাতন্ত্র্য সন্দেহও স্বরাজ্য দলের যুগ্ম নেতারূপে তাঁহারা আশ্চর্য্য সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা একে অন্তের চরিত্রগত ত্রুটি ও অভাব কতক পরিমাণে পরিপূরণ করিতেন এবং তাঁহারা পরস্পরকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতেন।

জওহরলাল নেহরু

এমন কি, পূর্ব হইতে পরামর্শ না করিয়াও কোন বিবৃতি বা ঘোষণা-পত্রে একে অস্ত্রের নাম ব্যবহার করিতে পারিবেন পরস্পরকে এইরূপ অধিকার পর্যন্ত দিয়াছিলেন।

স্বরাজ্য দলের প্রতিষ্ঠা শক্তি ও দেশের নিকট মর্যাদার পশ্চাতে এই ব্যক্তিগত বজুস্বের গভীর প্রেরণা ছিল। স্বরাজ্য দলের সূচনাতেই ইহার মধ্যে ভাঙ্গনের বীজ ছিল, কেন না, কাউন্সিলের মধ্য দিয়া ব্যক্তিগত উন্নতির সম্ভাবনা দেখিয়া অনেক ভাগ্যান্বেষী ও স্ববিধাবাদী এই দলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। গভর্নমেন্টের সহিত সহযোগিতায় উন্মুখ কয়েক জন খাটি মডারেটও এই দলে ছিলেন। নির্বাচনের পরেই এই সকল মনোভাব উপরে তাসিয়া উঠিল, কিন্তু দলের নেতৃত্ব ইহা দৃঢ় হস্তে দমন কবিয়া ফেলিলেন। আমার পিতা ঘোষণা করিলেন “ব্যাধিদুষ্ট অঙ্গ ছেদন করিতেও” তিনি কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিবেন না এবং তিনি এই ঘোষণানুযায়ী কার্য্য করিয়াছিলেন।

১৯২৩-এর পর হইতে পারিবারিক জীবনে আমি অনেক শান্তি ও আনন্দ পাইয়াছি, যদিও তাহা উপভোগের সময় আমার অতি কম ছিল। সৌভাগ্যক্রমে পবিত্রস্ব সকলের নিকটেই আমি স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা পাইয়াছি এবং দুশ্চিন্তা ও দুর্দিনে সকলেই আমাকে সাহায্য দিয়াছেন, আশ্রয় দিয়াছেন, কিন্তু এই বিষয়ে আমার নিজের অযোগ্যতা স্বরণ করিয়া আমি অত্যন্ত লজ্জিত হই। ১৯২০ হইতে আমার পত্নীর মধুর ব্যবহারের নিকট আমি কত ঋণী। গর্বিতা ও ভাবপ্রবণা হইয়াও তিনি আমার খেয়াল খুলী অকাতরে সহ্য করিয়াছেন এবং প্রয়োজনের মুহূর্ত্তে আমাকে শান্তি আরাম ও আনন্দ দিয়াছেন।

১৯২০-এর পর আমাদের জীবনযাত্রা-প্রণালীর কিছু পরিবর্তন হইয়াছিল। ইহা পূর্বাপেক্ষা অনেক আড়ম্বরহীন এবং চাকরবাকরের সংখ্যাও কমিয়া গিয়াছিল, তথাপি প্রয়োজনীয় আরামের অভাব ছিল না। অনাবশ্যক আড়ম্বর কমাইবার জন্য এবং অংশতঃ প্রাত্যহিক ব্যয় নির্বাহের জন্য গাড়ী, ঘোড়া এবং আমাদের নূতন জীবনযাত্রার পক্ষে অনাবশ্যক ও সামঞ্জস্যহীন আসবাবপত্র প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া ফেলা হইল। আমাদের কতক আসবাবপত্র পুলিশ ক্রোক করিয়া বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছিল। এই সকল আসবাবপত্র এবং মালীর অভাবে আমাদের ভবনের পূর্বের শ্রী আর রহিল না, বাগান জঙ্গল হইয়া উঠিল। প্রায় তিন বৎসর বাড়ী ও বাগানের দিকে কোন দৃষ্টিই দেওয়া হয় নাই। অতিমাত্রায় ব্যয়বাহুল্যে অভ্যস্ত পিতা এইসব ব্যয়সঙ্কোচ পছন্দ করিতেন না।

সন্দেহ ও সংশয়

এ জন্ত তিনি ঘরে বসিয়া অবসর সময়ে আইনের পরামর্শ দিয়া অর্থ উপার্জনের সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু তিনি অতি অল্প সময়ই দিতে পারিতেন, তথাপি তাঁহার উপার্জন মন্দ হইত না।

অর্থের জন্ত পিতার উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া আমি অসামান্য ও একটু নিরানন্দ বোধ করিতাম। আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করার পর, আমার নিজের বস্তুতঃ কোন আয়ই ছিল না। শেয়ার হইতে যে মুনাফা আসিত তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। আমার স্ত্রীর এবং আমার বিশেষ ব্যয়ভূষণ ছিল না। বরঞ্চ আমাদের ব্যয়ের অল্পতা দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইতাম। ১৯২১ সালেই আমি ইহা অনুভব করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম। খাদি কাপড় এবং রেলের তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণে অতি অল্প অর্থেরই দরকার হইয়া থাকে। কিন্তু পিতার সহিত বাস করার ফলে তখন আমি বুঝিতে পারিতাম না গৃহস্থালীর অগণিত ব্যয় একত্র করিলে কি পরিমাণ মোটা অঙ্কে পৌঁছায়। যে কোন প্রকারেই হউক অর্থচিন্তা কখনও আমাকে বিব্রত করে নাই। আমার বিশ্বাস, আবশ্যক অর্থ উপার্জনের ক্ষমতা আমার আছে এবং আমরা তুলনায় অনেক কম খরচে চালাইয়া লইতে পারি।

আমরা পিতার বিশেষ ভারস্বরূপ ছিলাম না। এবং এমন কি, ইহার আভাস ইঙ্গিতেই তিনি হয় ত অত্যন্ত ব্যথিত হইতেন। তথাপি এই অবস্থা আমার ভাল বোধ হইত না। কিন্তু পরবর্তী তিন বৎসর কাল ইহা চিন্তা করিয়াছি কিন্তু কোন মীমাংসা পাই নাই। উপার্জন করিবার উদ্দেশ্যে একটা কাজ অবশ্য আমি সহজেই জোগাড় করিতে পারিতাম কিন্তু তাহা হইলে সাধারণের কাজে যে সময় ব্যয় করিতেছি তাহা হয় ছাড়িতে হয়, না হয় কমাইয়া দিতে হয়। তখন আমার সমস্ত সময় কংগ্রেস ও মিউনিসিপালিটির কার্যে নিযুক্ত ছিল। অর্থোপার্জনের জন্ত এই কাজ ছাড়িয়া দেওয়া আমার ভাল বোধ হইল না। বড় বড় ব্যবসায়ীর কারখানা হইতে মোটা উপার্জনের যে সকল সুবিধাজনক প্রস্তাব আসিয়াছিল এই কারণে তাহা গ্রহণ করিলাম না। বৃহৎ ব্যবসায়ের সহিত যুক্ত হওয়াটাও আমি পছন্দ করিলাম না। পুনরায় আইন ব্যবসায়ে ফিরিয়া যাওয়ার প্রশ্ন অবশ্য উঠিতেই পারে না। আইন ব্যবসায়ের প্রতি আমার ঔদাসীন্য ক্রমেই বাড়িতেছিল।

১৯২৪-এর কংগ্রেসে সাধারণ সম্পাদকদিগকে বেতন দিবার একটি প্রস্তাব উঠিয়াছিল। আমি তখন একজন সাধারণ সম্পাদক ছিলাম এবং এই প্রস্তাব আমি সমর্থন করিয়াছিলাম। আমার মনে হইল, কাহাকেও

জওহরলাল নেহরু

সারাক্ষণ খাটাইয়া লইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহের মত বৃত্তি না দেখিয়া অত্যাশ। অত্যাশ উপার্জন না করিয়াও চলে এমন লোক নির্দ্ব্যস্তিত করিতে হয়। এই শ্রেণীর ভদ্রলোকের অবসর আছে বটে কিন্তু সম্ভবতঃ রাজনীতির দিক হইতে তাঁহারা বাহ্যনীয় নহেন এবং কোন কার্যের জন্ত তাঁহাদিগকে দায়ী করাও যায় না। কংগ্রেস অবশ্য বেশী দিতে পারিত না। কংগ্রেসের বৃত্তির হার অত্যন্ত কম ছিল। কিন্তু আমাদের দেশে সাধারণ ধনভাণ্ডার হইতে (গভর্নমেন্টের না হইলেও) বেতন লওয়ার বিরুদ্ধে এক অত্যাশ এবং সম্পূর্ণ অমৌক্তিক সংস্কার আছে। পিতাও আমার বেতন লইবার বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি প্রকাশ করিলেন। আমার সহযোগী সম্পাদকের অর্থের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল, তথাপি তিনি কংগ্রেসের নিকট বেতন লওয়া আত্মমর্যাদার পক্ষে হানিজনক মনে করিলেন। কাজেই এই ব্যাপারে আমার মর্যাদাবোধ না থাকিলেও এবং আমি বেতন লইতে সম্পূর্ণ উৎসুক থাকিলেও সে আশা ছাড়িতে হইল।

একদিন ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পিতার নিকট কথাটা তুলিলাম। এই নির্ভরতা যে ভাল লাগিতেছে না তাহাও তিনি আঘাত না পান এইরূপ মৃদুভাবে কথাটা উত্থাপন করিলাম। তিনি আমাকে বুঝাইলেন, সামান্য কয়েকটা টাকা উপার্জনের জন্ত জনসাধারণের কাজ ছাড়িয়া সময় ব্যয় করিলে আমার পক্ষে নির্বোধের কাজ হইবে। আমার এবং আমার জীবর এক বৎসরের প্রয়োজন তিনি কয়েকদিনেই উপার্জন করিয়া দিতে পারেন। তাঁহার তর্কের মধ্যে যুক্তি ছিল কিন্তু আমি তৃপ্ত হইলাম না। তথাপি তাঁহার উপদেশ মতই চলিতে লাগিলাম।

এই সকল পারিবারিক ব্যাপার এবং টাকাকড়ির দুশ্চিন্তা ১৯২৩-এর প্রারম্ভ হইতে ১৯২৫-এর শেষ পর্য্যন্ত চলিল। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক ঘটনারও পরিবর্তন হইতে লাগিল এবং আমিও একরূপ আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বিভিন্ন লোকের সহিত মিলিত হইয়া নিখিল ভারত কংগ্রেসের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকিলাম। ১৯২৩-এর অবস্থার একটু বিশেষত্ব ছিল। ইহার আগে চিত্তরঞ্জন দাশ গয়া কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন। কাজেই ১৯২৩-এ তাঁহারই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতি থাকিবার কথা, কিন্তু এই কমিটির অধিকাংশ সদস্য তাঁহার ও স্বরাজ্য নীতির বিরুদ্ধে ছিলেন। অবশ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সংখ্যা অতি অল্পই বেশী ছিল। দুই দলই প্রায় সমান সমান। ১৯২৩-এর গ্রীষ্মের প্রারম্ভে নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির বোম্বাই বৈঠকে ব্যাপার সজীব হইল, দাশ মহাশয় সভাপতির পদে ইন্তফা দিলেন এবং একটি ছোট মাঝামাঝি

সন্দেহ ও সংঘর্ষ

দল হইতে নূতন কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইল। কিন্তু কমিটিতে এই কেন্দ্রীয় দলের পশ্চাতে কোন সমর্থন ছিল না। দুইটি দলের সমিচ্ছার উপরই তাঁহাদের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছিল। এই দল যে-কোন দলের সহিত যোগ দিয়া অপর দলকে অবশ্য হারাইতে পারিত। ডাঃ আলবারী হইলেন নূতন সভাপতি এবং আমিও একজন সম্পাদক থাকিয়া গেলাম।

শীঘ্রই দুইপক্ষ হইতেই আমাদের উপর উৎপাতের সৃষ্টি হইল। পরিবর্তন-বিরোধীদের স্বদৃঢ় দুর্গ গুজরাট কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কতকগুলি নির্দেশমত কার্য্য করিতে অস্বীকার করিয়া বসিল। গ্রীষ্মকালের শেষ ভাগেই আবার নাগপুরে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন হইল। এখানে তখন জাতীয় পতাকা সত্যাগ্রহ চলিতেছিল। মন্দভাগ্য কেন্দ্রীয় দলের প্রতিনিধিস্বরূপ আমাদের কার্য্যকরী সমিতির সংক্ষিপ্ত ও খ্যাতিহীন জীবনের এইখানেই অবসান ঘটিল। ইহার পতন ঘটিল, কেন না, ইহা বিশেষভাবে কাহারও প্রতিনিধি ছিল না এবং ষাঁহাদের হাতে কংগ্রেসের প্রকৃত ক্ষমতা তাঁহাদেরই উপর কর্তৃত্ব করিতে প্রয়াসী হইল। গুজরাটের শৃঙ্খলাবিরোধী কার্য্যের উপর ভৎসনামূলক প্রস্তাবের অসাফল্যের ফলেই কার্য্যকরী সমিতিকে পদত্যাগ করিতে হইল। আমার মনে আছে, ইস্তফাপত্র দাখিল করিয়া আমি কত আনন্দিত ও ভারমুক্ত হইয়াছিলাম। দলাদলির কোশলের অতি সামান্য অভিজ্ঞতাই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছিল এবং কতিপয় খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতার ষড়যন্ত্র-নৈপুণ্য দেখিয়া আমি ব্যথিত হইয়াছিলাম।

এই সভায় দাশ মহাশয় “ঠাণ্ডা রক্ত” বলিয়া আমার উপর দোষারোপ করিয়াছিলেন। আমার ধারণা তাঁহার কথা সত্য। অবশ্য ইহার পরিমাপ করা মাপকাঠির বিভিন্নতার উপর নির্ভর করে। অনেক বন্ধু ও সহকর্মীর সহিত তুলনায় আমার রক্ত অনেক বেশী ঠাণ্ডা। তথাপি অতিরিক্ত ভাবাবেগ ও মেজাজে বিচলিত হইবার ভয়ে আমি সর্বদাই সাবধান থাকি। বৎসরের পর বৎসর আমি রক্ত ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য কঠিন উদ্যম করিয়াছি কিন্তু সাফল্য যেটুকু পাইয়াছি তাহা বাহ্যিক মাত্র।

নাভার কোঁতুক

স্বরাজ্য দল ও পরিবর্তনবিরোধীদের মধ্যে টানাটানি চলিতে লাগিল; প্রথমোক্ত দলই জয়ী হইতে লাগিলেন। ১৯২৩-এর শরৎকালে দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে স্বরাজীরা আর এক দিকে অগ্রসর হইলেন। এই কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে আমি এক আশ্চর্য্য বিপদসঙ্কুল ব্যাপারে জড়াইয়া পড়িলাম।

(পাঞ্জাবে শিখদের সহিত বিশেষভাবে আকালী শিখদের সহিত গভর্নমেন্টের পুনঃ পুনঃ সংঘর্ষ চলিতেছিল। ব্রিটচরিত্র মোহান্তদের তাড়নায় গুরুদ্বার ও তৎসংশ্লিষ্ট স্বাবর ও অস্বাবর সম্পত্তি অধিকার করিবার জন্য শিখদের আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাতে গভর্নমেন্ট হস্তক্ষেপ করায় সংঘর্ষ বাধিল।) গুরুদ্বার আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলনপ্রসূত দেশব্যাপী জাগরণেরই ফল এবং আকালীরা অহিংস সত্যগ্রহের আদর্শেই কার্য্য করিতে লাগিলেন। এই কালে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার মধ্যে গুরু-কা-বাগের সংঘর্ষই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সত্যগ্রহী শিখজাতি—ইহার মধ্যে অধিকাংশই ভূতপূর্ব সৈনিক—পুলিশের পাশবিক প্রহার সহ্য করিয়াও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা প্রদর্শন করিয়াছিল। এই সাহস ও অসীম ধৈর্য্য দেখিয়া সমস্ত ভারতবর্ষ চমৎকৃত হইল। গভর্নমেন্ট কর্তৃক গুরুদ্বার কমিটি বে-আইনী ঘোষিত হইয়াছিল এবং কয়েক বৎসর সংঘর্ষের পর অবশেষে শিখেরা জয়ী হইলেন। এই আন্দোলনের প্রতি স্বাভাবিক রূপেই কংগ্রেসের সহানুভূতি ছিল এবং আকালী আন্দোলনের সহিত যোগ রক্ষা করিবার জন্য কংগ্রেস এক জন বিশেষ কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তিনি অমৃতসরে থাকিয়া এই কার্য্য করিতেন।

আমি যে ঘটনার কথা বলিতেছি, তাহার সহিত সাধারণ শিখ আন্দোলনের সম্পর্ক অতি অল্প হইলেও ইহা শিখদের চাঞ্চল্যের প্রতিক্রিয়া হইতেই উদ্ভূত, ইহা নিঃসন্দেহ। নাভা ও পাতিয়ালা—পাঞ্জাবের এই দুই সামন্ত রাজ্যর মধ্যে ব্যক্তিগত বিরোধ অতি তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল, এবং তাহার ফলে ভারত গভর্নমেন্ট

নাভার কৌতুক

নাভার মহারাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া একজন ইংরাজ শাসক নিযুক্ত করেন। নাভারাজের গদিচ্যুতি লইয়া বিদ্রুদ্ধ শিখেরা নাভার এবং নাভার বাহিরে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। নাভারাজের জাইটো নামক স্থানে শিখদের ধর্মসংক্রান্ত উপাসনা ও গ্রন্থপাঠ নৃতন ইংরাজ শাসক বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহার প্রতিবাদ স্বরূপ এবং গুরু গ্রন্থসাহেব পাঠ অব্যাহত ভাবে চালাইবার জন্ত শিখেরা জাইটোয় জাঠা প্রেরণ করিতে লাগিলেন। জাঠার প্রবেশ-পথ রুদ্ধ করিয়া পুলিশ তাহাদিগকে প্রহার করিত। অবশেষে গ্রেফতার করিয়া দূরবর্তী দুর্গম জঙ্গলে তাহাদের লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিত।) আমি সংবাদপত্রে এইসব প্রহারের বিবরণ পাঠ করিয়াছিলাম; দিল্লী বিশেষ কংগ্রেসের পরেই আমি শুনিলাম, শীঘ্রই আর একদল জাঠা রওনা হইবে। ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার জন্ত আমাকে আমন্ত্রণ করা হইল, আমি সানন্দে সম্মতি দিলাম। জাইটো দিল্লীর অতি নিকটে, ইহাতে আমার মাত্র একদিন সময় নষ্ট হইবে। দুইজন কংগ্রেস সত্ৰকর্মী এ, টি গিদবাগী ও মাদ্রাজের কে, শাস্তানম আমার সঙ্গে চলিলেন। জাঠা অধিকাংশ পথ হাঁটিয়া চলিল। আমরা পূর্ব হইতে ঠিক করিলাম, নাভার সীমান্তে নিকটবর্তী এক রেলস্টেশনে আমরা জাঠার সহিত মিলিত হইব। সময়মত নিদ্রিষ্টস্থানে আসিয়া আমরা একখানি গরুর গাড়ীতে জাঠা হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া পশ্চাতে চলিতে লাগিলাম। জাইটোতে পুলিশ জাঠার গতিরোধ করিল এবং নাভা শাসকের দস্তখতি একখানা পরোয়ানা তৎক্ষণাৎ আমার উপর জারী হইল যে, আমি যেন নাভায় প্রবেশ না করি এবং করিলেও তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাই। অত্বরূপ পরোয়ানা গিদবাগী ও শাস্তানমের উপরও জারী করা হইল, তবে নাভা কর্তৃপক্ষ তাহাদের নাম জানিতেন না বলিয়া পরোয়ানায় নাম ছিল না। আমরা পুলিশ কর্মচারীকে বলিলাম যে, আমরা জাঠার অন্তর্ভুক্ত নহি, আমরা দর্শক হিসাবে আসিয়াছি, নাভারাজের নিয়মভঙ্গ করিবার কোন অভিপ্রায় আমাদের নাই। বিশেষতঃ নাভারাজ্যে যখন আমরা আসিয়া পড়িয়াছি তখন প্রবেশ না করিবার আদেশের কোন অর্থ হয় না। মানুষ আকাশে উড়িয়া যাইতে পারে না। আমরা পুলিশ কর্মচারীকে বলিলাম, পরবর্তী টেনের কয়েক ঘণ্টা বিলম্ব আছে। এই সময়টুকু আমরা দিগকে জাইটোতেই থাকিতে হইবে। আমরা দিগকে তৎক্ষণাৎ গ্রেফতার করিয়া হাজতে বন্দী করা হইল। তারপর পুলিশ জাঠার উপর তাহাদের নিয়মিত কর্তব্য সাধন করিল।

সমস্ত দিন হাজতে রাখিয়া, সন্ধ্যাবেলায় আমাদের রেলস্টেশনে ফিরা

বাওয়া হইল। আমাকে ও শাস্ত্রানমকে এক হাতকড়িতে বাঁধিয়া (আমার দক্ষিণ এবং তাহার বামহস্ত) হাতকড়ির সহিত বাঁধা শিকল হস্তে একজন কনেষ্টেবল আগাইয়া চলিল; অল্পরূপ বেশে গিদবানী আমাদের পিছন পিছন আসিতে লাগিল। জাইটোর পথ দিয়া এইভাবে চলিবার সময় আমার মনে পড়িতে লাগিল, অনিচ্ছুক কুকুরকে জোর করিয়া শিকলে বাঁধিয়া টানিয়া লওয়া হইতেছে। প্রথমে আমরা অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করিলাম, পরক্ষণেই সমস্ত ব্যাপারটির কৌতুক বোধ করিয়া অনেকটা লঘু বোধ করিলাম। এ অভিজ্ঞতা উপভোগ্য। রাত্রিটা অত্যন্ত কষ্টে কাটিল। প্রথমতঃ ধীরগতি ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর জনবহুল কামরা, তারপর মধ্যরাত্রিতে একবার গাড়ীবদল এবং অবশেষে নাভার হাজত। পরদিন দ্বিপ্রহরে, অর্থাৎ আমাদের নাভা জেলে হাজির করার পূর্ব পর্য্যন্ত হাতকড়ি ও শিকল বরাবর ছিল। এই অবস্থায় অল্প এক জনের সহযোগিতা ব্যতীত নড়াচড়া কঠিন। অল্প একজনের সহিত এক রাত্রি এবং পর দিনের -অর্দ্ধেক সময় একত্রে হাতকড়ি বন্ধ হইয়া থাকিবার যে অভিজ্ঞতা, তাহার পুনরভিনয় দেখিতে আমার রুচি নাই।

নাভা জেলে আমাদের অপরিষ্কার এবং আশ্বাস্যকর 'সেলে' আটক করা হইল। অত্যন্ত অপরিষ্কার ও স্যাংসেতে ছোট ঘর, হাত দিয়া ছাদ স্পর্শ করা যায়, এত নীচু। রাত্রে মেঝেতে আমাদের শুইতে হইত এবং অনেক সময় আতঙ্কে চমকিয়া উঠিয়া বুঝিতে পারিতাম এইমাত্র একটা ইন্দুর আমার মুখের উপর দিয়া দোড়াইয়া গেল।

দুই-তিন দিন পর আমাদের বিচারের দ্রুত আদালতে হাজির করা হইল এবং দিনের পর দিন বিচারের নামে এক কৌতুককর প্রহসনের অভিনব অভিনয় চলিতে লাগিল। ম্যাড্রিষ্টেট অথবা জুজ নামক ব্যক্তিটি সম্পূর্ণ নিরক্ষর বলিয়াই মনে হইল। তিনি ইংরাজী জানেন না ইহা নিঃসন্দেহ, এমন কি, আদালতের ভাষা উর্দুও তিনি লিখিতে পারেন কি-না সন্দেহ। এক সপ্তাহের অধিককাল আমরা তাহাকে দেখিয়াছি, এই সময়ের মধ্যে তিনি একছত্রও উর্দু লেখেন নাই। কিছু লিখিবার আবশ্যক হইলে তিনি আদালতের কেরানীকে হুকুম করিতেন। আমরা কতকগুলি ছোট খাট দরখাস্ত করিয়াছিলাম। তিনি দরখাস্ত পড়িয়া তখনই কোন নির্দেশ দিতেন না; ঐগুলি বাখিয়া দিয়া পরদিন অপরের লেখা মন্তব্য সহ ফেরৎ দিতেন। আমরা নিয়মিতভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করি নাই। অসহযোগ আন্দোলনের সময় হইতে আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন না করাই আমাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, এমন কি যেখানে আত্মপক্ষ

নাভার কোতুক

সমর্থন করা দোষের নহে, সেখানেও উহার চিন্তা পর্যন্ত আমার নিকট কুংসিত কাজ বলিয়া মনে হইত। আমি আদালতে এক দীর্ঘ বিবৃতি দিয়াছিলাম। উহাতে সমস্ত ঘটনার আশুপূর্বিক বিবরণ এবং নাভার ব্যাপার, বিশেষ ভাবে ব্রিটিশ শাসকের আমলের ব্যাপার সম্পর্কে আমার মতামতও প্রকাশ করিয়াছিলাম।

আমাদের এই অতি সাধারণ ও সহজ মামলাও দিনের পর দিন চলিতে লাগিল। সহসা আর এক নতুন ব্যাপার ঘটিল। একদিন অপরাহ্নে আদালত বন্ধ হওয়ার পর আমাদেরিগকে সেইখানেই রাখা হইল। সন্ধ্যা ৭টার পর আমাদের আর একটা ঘরে লওয়া হইল। সেখানে টেবিলের সম্মুখে একজন বসিয়াছিলেন; আরও কয়েকজন লোকও ছিল। জাইটোতে যিনি আমাদেরিগকে গ্রেফতার করিয়াছিলেন, আমাদের সেই পুরাতন বন্ধু পুলিশ কর্মচারীটিও এখানে উপস্থিত ছিল। সে পাড়াইয়া উঠিয়া এক বিবৃতি দিতে লাগিল। আমরা কোথায় আছি এবং কি হইতেছে জিজ্ঞাসা করায় জবাব পাইলাম যে, ইহা আদালত এবং ষড়যন্ত্র করিবার অপরাধে আমাদের বিচার হইতেছে। এতদিন আদেশ ভঙ্গ করিয়া নাভায় প্রবেশের অপরাধে আমাদের বিচার চলিতেছিল; কিন্তু এই অভিযোগ তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। পরিষ্কার বোঝা গেল, পূর্বের অপরাধে বড় জোর ছয় মাস কারাদণ্ড হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে আমাদের সমুচিত শিক্ষা হইবে না বিবেচনা করিয়াই আরও গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিবার প্রয়োজন হইল। ষড়যন্ত্র প্রমাণ করিবার মত সাক্ষ্য প্রমাণ ছিল না, এই জন্য এক চতুর্থ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিয়া আনিয়া আমাদের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইল। এই লোকটির সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ ছিল না। এই বেচারী শিপের সহিত আমাদের কোন আলাপ পরিচয় ছিল না। জাইটো যাইবার পথে তাহার সহিত মাত্র একবার দেখা হইয়াছিল। ষড়যন্ত্রের মামলা চালাইবার এই প্রকার উত্তোগ আয়োজন দেখিয়া একজন ব্যবহারজীবী হিসাবে আমি অবাক হইলাম। মামলাটি একেবারেই মিথ্যা এবং বাহু ভদ্রতার খাতিরেও কতকগুলি সাধারণ আদবকায়দা দেখান উচিত ছিল। আমি বিচারককে বলিলাম যে, এ বিষয়ে আমরা পূর্বে হইতে কোন নোটিশ পাই নাই এবং আমরা যে আত্মপক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা করিতে পারি সে বিষয়ে বিবেচনা করা হয় নাই। এই যুক্তি তিনি গ্রাহ্য করিলেন—ভাবে এরকম বোঝা গেল না। ইহাই নাভার নিয়ম। আমাদের যদি উকিলের দরকার হয় তাহা হইলে নাভারই একজনকে

জওহরলাল নেহরু

মনোনীত করিতে হইবে। বাহির হইতে উকিল নিযুক্ত করিতে পারি কি-না একথার উত্তরে আমাকে বলা হইল যে, নাভায় এরূপ অচ্যুত দিবার নিয়ম নাই। নাভার বিচার-পদ্ধতি সম্বন্ধে আরও অনেক কিছুই বুঝিতে পারিলাম। অবশেষে বিরক্ত হইয়া আমরা বিচারককে বলিলাম যে, তিনি যাহা খুশী করুন, আমরা এ বিচারে কোন অংশ গ্রহণ করিব না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার এই সঙ্কল্প টিকিল না। আমাদের সম্পর্কে অসম্ভব মিথ্যা কথাগুলি শুনিয়া চূপ করিয়া থাকা কঠিন। আমরা মাঝে মাঝে সাক্ষীদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত অথচ তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলাম। ঘটনার বিবরণ লিখিত ভাবেও আমরা আদালতে পেশ করিলাম। এই ষড়যন্ত্র মামলার বিচারকটি প্রথম বিচারক অপেক্ষা অনেকাংশে শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান।

দুইটি মামলাই একত্র চলিতে লাগিল। ফলে আমরা প্রত্যহ কিছুকালের জুজু জেলের নোংরা সেল হইতে মুক্তি পাইতাম। ইতিমধ্যে নাভার ইংরাজ শাসকের পক্ষ হইতে জেল সুপারিনটেন্ডেন্ট একদিন আসিয়া বলিলেন, যদি আমরা দুঃখ প্রকাশ করি এবং নাভা হইতে চলিয়া যাই তাহা হইলে আমাদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করা হইবে। আমরা উত্তর দিলাম, দুঃখ প্রকাশ করিবার মত আমরা কিছুই করি নাই, শাসকেরই আমাদের নিকট দুঃখ প্রকাশ করা উচিত। আমরা কোন প্রকার প্রতিশ্রুতি-পত্র লিখিতেও প্রস্তুত নই।

প্রায় ১৫ দিন পর দুইটি মামলা শেষ হইল। আমরা আত্মপক্ষসমর্থন করি নাই, তবুও এক-তরফা মামলাতে এত সময় লাগিল, কেন-না মামলা চলিবার কালে কোন প্রশ্ন উঠিলেই মামলা স্থগিত রাখা হইত এবং অন্তরালে অবস্থিত কোন কর্তৃপক্ষ—নগরবতঃ ইংরাজ শাসকটির সহিত পরামর্শের পর আবার মামলা শুরু হইত। এইরূপে অনেক সময় নষ্ট হইয়াছে। সর্বশেষ দিন অভিযুক্ত পক্ষের সওয়াল জবাব শেষ হইবার পর আমরা লিখিত বিবৃতি আদালতে দাখিল করিলাম। প্রথম আদালতের কার্য স্থগিত হইল, কিন্তু আমরা আশঙ্কিত হইয়া দেখিলাম, অল্পক্ষণ পরেই বিচারক উদ্যুত লেখা এক প্রকাণ্ড রায়সহ আদালতে হাজির হইলেন। অল্প সময়ের মধ্যে এতবড় একটা রায় লেখা যে সম্ভবপর নহে তাহা স্পষ্টই বোঝা গেল। আমরা বিবৃতি দাখিল করিবার পূর্বেই ইহা প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল। আমাদের নিকট রায় পাঠ করা হইল না। কেবল শুনাইয়া দেওয়া হইল যে, নাভার সীমানা ত্যাগের আদেশ অমান্ত করার সর্বোচ্চ শাস্তিরূপে আমাদেরকে ছয় মাস করিয়া কারাবন্দ দেওয়া হইয়াছে।

নাভার কৌতুক

ঐদিনই ষড়যন্ত্রের মামলায় আমাদের আঠার মাস কি দুই বৎসর করিয়া শাস্তি হইয়াছিল আমার ঠিক মনে নাই। ইহার সহিত ঐ ছয়মাস কারাদণ্ড যোগ হইবে। অর্থাৎ আমাদের সর্বমোট দুই বৎসর কি আড়াই বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

এই বিচারের সময় আমরা যে সব আশ্রয় ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা পর্যবেক্ষণ করিলাম, তাহাতে দেশীয় রাজ্যের শাসনপ্রণালী অথবা ভারতীয় দেশীয় রাজ্যে ব্রিটিশ শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা হইল। সমস্ত বিচারপ্রণালী এক প্রহসন মাত্র। এই কারণেই বোধ হয় সংবাদপত্রের লোক ও বাহিরের লোককে আদালতে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। পুলিশ যাহা খুশী করে, জজ-ম্যাজিস্ট্রেটদের তারা গণনার মধ্যেই আনে না এবং কার্যতঃ তাঁহাদের নির্দেশ অমান্য করে।) বেচারী ম্যাজিস্ট্রেট নিরীহভাবে ইহা সহ করেন কিন্তু আমাদেরকেও তাহা সহ করিতে হইবে কেন বুঝিতে পারিলাম না। অনেক বার আমি দাফতাইয়া পুলিশের ভদ্র ব্যবহার এবং ম্যাজিস্ট্রেটকে মান্য করিবার দাবী উপস্থিত করিয়াছি। কখনও কখনও পুলিশ অত্যন্ত অভদ্রভাবে ম্যাজিস্ট্রেটের হাত হইতে কাগজ কাড়িয়া লইত। ম্যাজিস্ট্রেট তাহার প্রতিকারে অক্ষম, এমন কি, আদালতের শৃঙ্খলা পর্যন্ত রক্ষা করিতে পারিতেন না, তখন তাঁহার কাজ আমরা করিয়া দিতাম। মন্দভাগ্য ম্যাজিস্ট্রেটের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিত, তিনি পুলিশের ভয়ে সর্বদাই ভীত এবং আমাদেরকেও ভয় করিতেন, কেন না আমাদের গ্রেফতারের ফলে সংবাদপত্রে আন্দোলন চলিতেছিল। আমাদের মত সাধারণে পরিচিত রাজনীতিকদেরই যখন এই অবস্থা তখন স্বল্প পরিচিত ব্যক্তিদের ভাগ্যে কি ঘটে তাহা ভাবিয়া আশ্রয় হইতে হয়।

পিতার দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। সেই কারণে নাভায় আমার অপ্রত্যাশিত গ্রেফতারে তিনি বিশেষভাবে বিচলিত হইলেন। কেবল গ্রেফতারের সংবাদ ছাড়া আর বিশেষ কিছুই তিনি জানিতে পারেন নাই। মানসিক উৎকণ্ঠায় তিনি আমার সংবাদ জানিবার জন্য বড়লাটের নিকট তার করিলেন। নাভায় গিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার পথে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত করা হইল। যাহা ইউক, অবশেষে তিনি জেলে গিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু আমি যখন আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছি না তখন তাঁহার সাহায্যের বিশেষ কোন আবশ্যক নাই, আমি তাঁহাকে আমার জন্য চিন্তা না করিতে এবং এলাহাবাদে ফিরিয়া যাইতে অহরোধ করিলাম। তিনি

জওহরলাল নেহরু

কিরিয়া গেলেন, কিন্তু আমাদের যুবক উকিল-বন্ধু কপিলদেব মালব্যকে নাভায় মামলা পর্য্যবেক্ষণের জন্ত রাখিয়া গেলেন। নাভা আদালতের অতি সংক্ষিপ্ত অভিজ্ঞতার ফলে কপিলদেবের আইন ও বিচারপ্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞান অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল সন্দেহ নাই। একবার পুলিশ তাঁহার হাত হইতে কাগজপত্র কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছিল। অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যই অনুন্নত ও মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের যুগে রহিয়াছে। ব্যক্তিগত স্বৈরাচারী প্রভুত্ব এখানে অবাধ কিন্তু তাহার মধ্যেও যোগ্যতা কিংবা উদার দয়ার অভাব। সে সকল স্থানে এমন সব আশ্চর্য ঘটনা ঘটে যাহা কখনও প্রকাশিত হয় না। তাহাদের অযোগ্যতার দরুণই মন্দভাগ্য প্রজারা একটু আসান পায় এবং নানাভাবে অত্যাচারও কম হইয়া থাকে। কারণ শাসকমণ্ডলীর মধ্যেও সেই অযোগ্যতাই প্রতিফলিত। তাহার ফলে অত্যাচার ও অবিচার নিখুঁত হইয়া উঠিতে পারে না। অবশ্য ইহাতে অত্যাচার যে অল্প হয় তাহা নহে, উহা দূরপ্রসারী ও ব্যাপক হইয়া উঠিতে পারে না। কোন দেশীয় রাজ্য যখন প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ শাসনাধীনে আসে তখন এই ভারকেন্দ্র পরিবর্তিত হইয়া এক অভিনব অবস্থার সৃষ্টি হয়। সেই অর্ধ সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ঠিক থাকে, স্বৈরাচারও থাকে অব্যাহত, পুরাতন নিয়মকানুন মতই কাঁধা চলিতে থাকে, ব্যক্তিস্বাধীনতা, সভা সমিতি, মতপ্রকাশ (ইহা একপ্রকার সর্বগ্রাসী) প্রভৃতির উপর বিধিনিষেধ সমানভাবেই চলে কিন্তু এমন একটি পরিবর্তন হয় যাহা মূলদেশকে নূতন আকার দেয়। শাসকগণ অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠে, শাসন ব্যাপারে কর্তৃকুশলতার পত্তন হয়, তাহার ফলে সামন্ততান্ত্রিক ও স্বৈর-শাসনের বন্ধন আরও চাপিয়া বসে। কালক্রমে ব্রিটিশ শাসনের ফলে অবশ্য কতকগুলি প্রাচীন প্রথা ও উপায়ের পরিবর্তন হইবে, কারণ ঐগুলি কুশলতার সহিত শাসনকার্য্য নির্বাহের এবং ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তারের অন্তরায়স্বরূপ। কিন্তু গোড়াতে তাঁহারা অবস্থার সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়া জনসাধারণের উপর কর্তৃত্বকে দৃঢ় করিয়া তোলেন এবং জনসাধারণ তখন কেবল যে সামন্ততন্ত্র এবং স্বৈরাচার সহ্য করে তাহা নহে, শক্তিশালী শাসকগণ ঐ ব্যবস্থাকে অতি নৈপুণ্যের সহিত দৃঢ় হস্তে প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

(নাভায় আমি ইহার কিছু দেখিয়াছি। এই রাজ্যের ব্রিটিশ শাসক একজন সিভিলিয়ান। ভারত গভর্নমেন্টের অধীনে ইনি একজন স্বৈরাচারী শাসকের সম্পূর্ণ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত, তথাপি প্রত্যেক ব্যাপারে আমাদেরগকে নাভার আইন ও পদ্ধতির কথা শুনাইয়া অতি সাধারণ অধিকারও দেওয়া হইত

নাভার কোতুক

না। আমরা প্রাচীন সামন্ততন্ত্র এবং আধুনিক আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রের সমবেত মূর্তির সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলাম। ইহাতে উভয় দিকের অসুবিধাগুলি পূর্ণমাত্রায় ছিল কিন্তু কোন দিকেরই সুবিধাগুলি ছিল না।

এই ভাবে বিচার শেষ হইয়া আমাদের কারাদণ্ড হইয়া গেল। বিচারক কি রায় দিলেন তাহা আমরা জানিতে পারিলাম না বটে, কিন্তু দীর্ঘ কারাদণ্ডের বাস্তব সত্যের সম্মুখে ঠাণ্ডা হইয়া গেলাম। আমরা রায়ের নকল চাহিলাম, আমাদিগকে সেজন্য দরখাস্ত করিতে বলা হইল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় জেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট আমাদিগকে ডাকিয়া লইয়া ব্রিটিশ শাসকের একখানি আদেশপত্র দেখাইলেন। ফৌজদারী কার্যবিধি অনুসারে আমাদের দণ্ড স্থগিত রাখা হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন সর্ভ না থাকায় আমাদের পক্ষে আইনতঃ কারাদণ্ডের এইখানেই শেষ হইল। সুপারিন্টেন্ডেন্ট ব্রিটিশ শাসকপ্রদত্ত অণু একখানি হুকুমনামা বাহির করিলেন, তাহাতে আমাদিগকে নাভা ত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে এবং বিলম্ব অসুমতি ব্যতীত প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। আমি আদেশ দুইখানির নকল চাহিলাম, কিন্তু তাহা অগ্রাহ্য হইল। তারপর আমাদিগকে রেলস্টেশনে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। নাভায় আমাদের পরিচিত একটি প্রাণীও ছিল না। সহরের সদর দরজাও সে রাত্রির মত বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সংবাদ লইয়া জানিলাম তখনই একখানি ট্রেন আসালা অভিমুখে যাইবে। আমরা উহাতে উঠিয়া বসিলাম। আসালা হইতে আমি দিল্লী হইয়া এলাহাবাদে ফিরিয়া আসিলাম।

এলাহাবাদ হইতে নাভার শাসকের নিকট, তাঁহার দুই খণ্ড আদেশপত্রের এবং দুইটি রায়ের নকল চাহিয়া পত্র লিখিলাম। পত্রের উত্তরে তিনি উহার নকল দিতে অস্বীকার করিলেন। আমি পুনরায় লিখিলাম, যদি আমি আপীল করি তাহা হইলে উহার প্রয়োজন আছে, তথাপি তিনি রাজী হইলেন না। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও, যাহাতে আমি ও আমার সঙ্গীরা আড়াই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলাম, সেই রায়গুলি পড়িবার সুযোগ পাইনাই। কি জানি হয়ত এই কারাদণ্ড এখনও আমার জগৎ ঝুলিতেছে এবং নাভা কর্তৃপক্ষ অথবা ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ইচ্ছা করিলেই সম্ভবতঃ ইহা প্রয়োগ করিতে পারেন।

এই ভাবে আমরা তিন জন ত “স্থগিত” অজুহাতে মুক্তি পাইলাম কিন্তু তথাকথিত ষড়যন্ত্রের চতুর্থ ব্যক্তি, যাহাকে আমাদের সহিত দ্বিতীয় অভিযোগে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, সেই শিখটির ভাগ্যে কি হইল

জওহরলাল নেহরু

তাহা অনেক চেষ্টা করিয়াও জানিতে পারি নাই। খুব সম্ভব তাহাকে ছাড়া হয় নাই। তাহার কোন প্রভাবশালী বন্ধু ছিল না এবং তাহার অল্পকূলে কোন আন্দোলনও হয় নাই; কাজেই অগ্নাগ্ন অনেকের মতই সে দেশীয় রাজ্যের কারাগারে বিন্ধুতির অন্ধকারেই ডুবিয়া আছে। কিন্তু আমরা তাহাকে ভুলি নাই। সামান্য যাহা কিছু সম্ভব তাহা আমরা করিয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস, গুরুদ্বার কমিটিও চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরে অল্পসন্ধানে জানিলাম যে, সে “কোমাগাটামারু” দলের একজন এবং দীর্ঘ কারাদণ্ড ভোগ করিয়া অল্পদিন পূর্বে মুক্তি পাইয়াছিল। এই শ্রেণীর লোককে পুলিশ বাহিরে রাখিতে চাহে না, সেই জগুই তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ রচনা করিয়া তাহাকে জড়াইয়া ফেলা হইয়াছিল।

গিদবানী, শাস্তানম্ এবং আমি তিনজনেই নাভা জেল হইতে টাইফয়েড রোগের বীজাণু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম এবং তিন জনেই ঐ রোগে আক্রান্ত হইলাম। আমার পীড়া সাংঘাতিক হইল এবং কিছুদিন অত্যন্ত সঙ্কটের মধ্যে কাটিল। তবে তিন জনের মধ্যে আমিই অল্পে অব্যাহতি পাইলাম। আমাকে তিন কি চার সপ্তাহ শয্যাশায়ী থাকিতে হইয়াছিল। অপর দুইজন দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী ছিলেন।

নাভার ব্যাপারের জের এইখানেই শেষ হইল না। ছয় মাস কি তাহারও পরে গিদবাণী অমৃতসরে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে শিগগুরদ্বার কমিটির সহিত একযোগে কার্য করিতেছিলেন। কমিটি পাঁচ শত ব্যক্তি লইয়া গঠিত এক বিশেষ জাঠা জাইটোতে পাঠাইলেন। গিদবাণী দর্শকরূপে এই জাঠার সহিত নাভার সীমান্ত পর্য্যন্ত যাইবার সংকল্প করিলেন। নাভার সীমান্তে পুলিশ জাঠার উপর গুলি চালাইল, বহুলোক হতাহত হইল। গিদবাণী আহতদের সেবাকার্য্যে অগ্রসর হইলে পুলিশ তাহাকে ছোঁ মারিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। তাহার বিরুদ্ধে কোন মামলা করা হইল না, তাহাকে কেবল জেলে আটকাইয়া রাখা হইল। প্রায় এক বৎসর কাল জেলে থাকিবার পর সম্পূর্ণরূপে ভগ্নস্বাস্থ্যে গিদবাণীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

গিদবাণীর গ্রেফতার ও কারাদণ্ড শাসনক্ষমতার দানবীয় অপব্যবহার বলিয়া আমার মনে হইল। আমি শাসক (সেই ইংরাজ সিভিলিয়ান) মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিয়া গিদবাণীর প্রতি এরূপ ব্যবহারের কারণ জানিতে চাহিলাম। তিনি উত্তর দিলেন যে, বিনামূল্যে তাহারাজ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি আদেশ ভঙ্গ করায় কারারুদ্ধ হইয়াছেন, আমি

কোকোনদ ও মোলানা মহম্মদ আলী

পুনরায় পত্র লিখিয়া ইহার বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিলাম। যে ব্যক্তি আহতদের সেবায় রত ছিল তাহাকে গ্রেফতার করা যে সম্মতি-বিরোধী তাহাও উল্লেখ করিলাম এবং অনুরোধ করিলাম তাঁহার আদেশ, হয় প্রকাশ করুন না হয়, আমার নিকট একখণ্ড পাঠাইয়া দিন। তিনি অস্বীকৃত হইলেন। গিদবাণীর প্রতি যে ব্যবহার করা হইয়াছে আমার প্রতিও শাসক সেইরূপ ব্যবহার করুক, এই ইচ্ছা লইয়া আমিও নাভা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। সহকর্মীর প্রতি অনুরাগ ও বিশ্বাসের দিক দিয়া ইহা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু অনেক বন্ধু আমার সঙ্গে ভিন্ন মত অবলম্বন করিলেন ও আমাকে নিবৃত্ত করিলেন। আমি বন্ধুদের পরামর্শের অন্তরালে আশ্রয় লইলাম এবং নিজের দুর্বলতার উপর এক সূক্ষ্ম আবরণ নিক্ষেপ করিলাম। যাহাই হউক, আসলে নাভা জেলে পুনরায় ফিরিয়া যাইতে আমার অনিচ্ছা ও দুর্বলতাই আমাকে যাইতে দিল না। একজন সহকর্মীকে বিপদের সময় পরিত্যাগ করিবার লজ্জা আমি সর্বদাই বোধ করিয়াছি। সাধারণতঃ সাহস অপেক্ষা অগ্রপশ্চাত্ত বিবেচনারই আমরা অধিকতর পক্ষপাতী।

১৭

কোকোনদ ও মোলানা মহম্মদ আলী

(১৯২৩-এর ডিসেম্বর মাসে দক্ষিণ ভারতের কোকোনদ সহরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হইল। মোলানা মহম্মদ আলী ছিলেন সভাপতি।) তাঁহার যেমন অভ্যাস, তেমনই এক সুদীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করিলেন। তবে এই অভিভাষণ বেশ তথ্যপূর্ণ হইয়াছিল। তিনি মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক ভাবের প্রথম উন্মেষ-কাল হইতে আলোচনা করিয়া আগা খাঁর নেতৃত্বে ১৯০৮-এ বড়লাটের নিকট স্বরণীয় মুসলিম ডেপুটেশান প্রেরণের কথা তুলিলেন। এই ডেপুটেশান যে গভর্ণমেন্টের সৃষ্টি এবং ইহার সুযোগ লইয়াই তাঁহারা সরকারী ভাবে এই প্রথম সাম্প্রদায়িক পৃথক নির্বাচন প্রথা এবং সাম্প্রদায়িক বিশেষ পক্ষপাতের কথা ঘোষণা করেন।

মহম্মদ আলী আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাঁহার সভাপতিত্বের আমলে আমাকে কংগ্রেসের সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিতে বাধ্য করির্দেন। কংগ্রেসের

জওহরলাল নেহরু

ভবিষ্যৎ কার্যপ্রণালী সম্পর্কে আমার সংশয় থাকায় আমার আফিস সংক্রান্ত কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। কিন্তু মহম্মদ আলীকে ঠেকান কঠিন। আমরা উভয়েই, বুঝিতে পারিলাম যে, অর্ন্ত কেহ সম্পাদক হইলে নূতন সভাপতির সহিত আমার মত ভাল রাখিয়া চলিতে পারিবে না। মানুষ সম্বন্ধে তাঁহার ভালমন্দ ধারণা দুই দিকেই চরম। সৌভাগ্যক্রমে আমাকে তিনি পছন্দ করিতেন। আমাদের মধ্যে প্রীতি ও শ্রদ্ধার বন্ধন ছিল। তিনি গভীরভাবে এবং আমার মতে অত্যন্ত অযৌক্তিকভাবে ধর্মপ্রবণ ছিলেন, কিন্তু আমি ছিলাম তাহার বিপরীত। তথাপি তাঁহার অকৃত্রিম আগ্রহ, তাঁহার অপরিপুষ্ট কর্মশক্তি এবং ক্ষুরধার বুদ্ধির জগৎ তাঁহার প্রতি আমি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। তিনি পরিসরসিক ছিলেন, কিন্তু সময় সময় তীব্র ব্যঙ্গ দ্বারা তিনি অপরকে আহত করিতেন। এই স্বভাবের জগৎ তিনি অনেক বন্ধুকেই হারাইয়া ছিলেন। কাহারও সম্বন্ধে যদি কোন চটুল মন্তব্য তাঁহার মনে জাগিত তাহা হইলে তিনি তাহা গোপন রাখিতে পারিতেন না, অগ্রপশ্চাত্ত বিবেচনা না করিয়া প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন।

আমাদের মধ্যে ছোটখাট মতভেদ সত্ত্বেও তাঁহার সভাপতিত্বের আমলে আমরা দুজনে ভালভাবে কাজ চালাইতে লাগিলাম। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্যালয়ে আমি এই নিয়ম প্রবর্তন করিয়াছিলাম যে, কোন সদস্যের নাম লিখিবার কালে তাহার পূর্বে বা পরে কোন সম্মানসূচক উপাধি যোগ করা হইবে না। ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর উপাধির অসম্ভাব নাই—মহাত্মা, মোলানা, পণ্ডিত, শেখ, সৈয়দ, মুন্সী, মোলবী; ইহার উপর শ্রী, শ্রীযুক্ত, মিঃ ও এক্সোসার তো আছেনই। এই সকল অজস্র উপাধি অনাবশ্যকরূপে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে আমি একটা সং দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিলাম। কিন্তু তাহা সম্ভবপর হইল না। মহম্মদ আলী এক জরুরী তার করিয়া “সভাপতি রূপে” আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, প্রাচীন ব্যবস্থাই বজায় রাখিতে হইবে, বিশেষভাবে গান্ধিজীর নিকটে পত্র লিখিতে হইলে ‘মহাত্মা’ শব্দ ব্যবহার করিতেই হইবে।

আমাদের মধ্যে আর একটি বিষয় লইয়া প্রায়ই তর্ক বাধিত—সে হইল, ‘সর্বশক্তিমান ঈশ্বর’। আমাদের কংগ্রেসের প্রস্তাবের মধ্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অথবা প্রার্থনার ভাবে ঈশ্বরের নাম উল্লেখ করিবার প্রতি মহম্মদ আলীর অত্যন্ত বেশী ঘোঁক ছিল। আমি প্রতিবাদ করিলে তিনি আমার অধ্যাত্মিকতার জগৎ ধমক দিতেন। তথাপি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পরবর্তীকালে তিনি আমাকে বলিতেন যে, আমার বাহ্য ব্যবহার ও

কোকোনদ ও মৌলানা মহম্মদ আলী

অস্বীকৃতি সত্ত্বেও আসলে আমি যে একজন পরম ধার্মিক সে সন্দেহে তাঁহার মনে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার এই ধারণার মধ্যে কতটুকু সত্য আছে তাহা আমি সময় সময় বিস্মিত হইয়া ভাবিয়াছি। সম্ভবতঃ ধর্ম ও ধর্মভাব সর্বদা ব্যক্তিগত অনুভূতির উপর এইরূপ ধারণা নির্ভর করে।

আমি তাঁহার সহিত ধর্ম লইয়া আলোচনা এড়াইয়া চলিতাম, কেন না, আমি জানিতাম যে, ইহার ফলে উভয়েই বিরক্ত হইব এবং হয়ত বা আমি তাঁহার মনে বেদনা দিব। কোন মতবাদে দৃঢ়বিশ্বাসী ব্যক্তির সহিত এই বিষয় লইয়া আলোচনা করা সর্বদাই কঠিন; সম্ভবতঃ অধিকাংশ মুসলমানের সহিত তর্ক করা আরও কঠিন। কেন না, এ ক্ষেত্রে চিন্তার স্বাধীনতা তাঁহাদিগকে দেওয়া হয় না। তাঁহাদের মতবাদের দিক দিয়া তাঁহাদের পথ সরল ও বাধাধরা এবং বিশ্বাসী মুসলমান কখনও দক্ষিণে বা বামে হেলিতে পারেন না। সর্বত্র না হইলেও হিন্দুদের ভাব অনেকটা স্বতন্ত্র। আচরণে তাঁহারা অত্যন্ত গোঁড়া হইতে পারেন। আধুনিককালের অনুপযোগী উন্নতিবিরোধী কুপ্রথা তাঁহারা মানিয়া চলিতে পারেন এবং চলিয়া থাকেন, তথাপি ধর্ম সর্বদা যে-কোন প্রকার বৈপ্লবিক মতবাদে আলোচনা করিতে তাঁহারা সর্বদাই প্রস্তুত। আমার ধারণা, আধুনিক আধ্যাত্মজীবীদের সাধারণতঃ চিন্তার এত ঔদার্য্য নাই। মুসলমানদের শ্রায়ই তাঁহারা নিজেদের সরল বাধাধরা রাস্তায় চলিয়া থাকেন। বুদ্ধিমান শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে একটা পরস্পরাগত দার্শনিক ধারা আছে; যদিও আচরণের উপর উহার প্রভাব নাই, তথাপি উহার ফলে ধর্ম সম্বন্ধীয় প্রশ্নগুলি বিভিন্ন মতবাদের দিক হইতে বিচার করিতে সংস্কারগত কোন বাধা নাই। আমার মনে হয় হিন্দুদের মধ্যে মত ও আচার ব্যবহারের বহু স্ববিরোধী সমাবেশ ঘটায় ইহা কিয়ৎপরিমাণে সম্ভব হইয়াছে। ধর্ম শব্দটি সাধারণতঃ যে অর্থে ব্যবহার করা হইয়া থাকে ঠিক সেই অর্থে উহা দ্বারা হিন্দুয়ানী বুঝান যায় না। তথাপি কি আশ্চর্য্য দৃঢ়তা, কি আশ্চর্য্য জীবনীশক্তি ইহার! প্রাচীন হিন্দু-দার্শনিক চার্ব্বাকের মত যদি কেহ নিজেকে নাস্তিক বলিয়া প্রচার করে তথাপি সে হিন্দু নহে, এ কথা বলিতে কেহ ভরসা করিবে না। হিন্দু ধর্মের সন্তান যাহাই করুক সে হিন্দুই থাকিবে। আমি ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মিয়াছি, ধর্ম ও সামাজিক আচার নিয়ম সম্পর্কে আমি যথেষ্টই করি আর যাহাই বলি না কেন, আমি ব্রাহ্মণই থাকিব বলিয়া মনে হয়। যদিও আমি নামের সহিত কোন সম্বন্ধ বা জাতিবাচক উপাধি ধোঁগ করিতে অনিচ্ছুক তথাপি ভারতীয়গণের নিকট আমি ‘পণ্ডিত’ অথবা থাকিয়াই যাইব। আমার মনে পড়ে, সুইজারল্যান্ডে একবার এক তুর্কী

পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে আমি পূর্বাঙ্কে তাঁহার নিকট এক পরিচয়-পত্র পাঠাইয়াছিলাম এবং ঐ পত্রে আমার নাম পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলিয়া উল্লেখ ছিল। তিনি আমাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য এবং একটু নিরাশ হইলেন, এবং কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন যে, “পণ্ডিত” দেখিয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন, একজন সৌম্যকান্তি প্রবীণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের দর্শন পাইবেন।

এই সকল কারণে মহম্মদ আলীর সহিত আমি ধর্ম্ম লইয়া আলোচনা করিতাম না; কিন্তু চূপ করিয়া থাকিবার লোক তিনি ছিলেন না। কয়েক বৎসর পরে (১৯২৫ কিংবা ১৯২৬-এর প্রথম ভাগে) তিনি আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। একদিন দিল্লীতে তাঁহার বাড়ীতে আমি গিয়াছি এমন সময় তাঁহার মুখ ছুটিল এবং আমার সহিত ধর্ম্মালোচনা করিবার জন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলাম। বলিলাম, আমাদের উভয়ের ধারণার মধ্যে এত পার্থক্য যে, আমরা পরস্পরকে কিছু বুঝাইতে পারিব না। কিন্তু তাঁহার কথার মোড় ঘুরাইয়া দেওয়া করিলাম। তিনি বলিলেন, “আজ আমরা একটা হেস্তুনেস্ত করিবই। আমার ধারণা, তুমি মনে কর যে, আমি একজন ধর্ম্মাঙ্ক গোঁড়া। বেশ, আমি তোমার নিকট প্রমাণ করিতেছি, আমি তাহা নহি।” তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন যে, ধর্ম্ম বিষয়ে তিনি গভীর ও ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন। তিনি বইয়ের তাক দেখাইলেন; সেখানে বহুবিধ ধর্ম্ম-পুস্তক, বিশেষভাবে ইসলাম ও খৃষ্টধর্ম্ম বিষয়ের অনেক পুস্তক ছিল, এবং এইচ জি ওয়েলসের “গড দি ইন্ডিজিড্‌ল কিং” ও কয়েককথানি আধুনিক পুস্তকও ছিল। যুদ্ধের সময় যখন তিনি দীর্ঘকাল অন্তরীণে আবদ্ধ ছিলেন তখন তিনি বহুবার কোরাণ এবং তাহার সর্ববিধ টীকা ও ভাণ্ড পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, এই অধ্যয়নের ফলে তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছে যে, কোরাণের শতকরা সপ্তানব্বই ভাগ সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত, এমন কি, কোরাণের নাম না করিয়াও ঐগুলির যৌক্তিকতা প্রমাণ করা যাইতে পারে, অবশিষ্ট তিন ভাগ দৃশ্যতঃ তাঁহার নিকট যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। তবে যে কোরাণের সপ্তানব্বই ভাগ সত্য তাহার অবশিষ্ট তিন ভাগও নিশ্চয়ই সত্য। তাঁহার দুর্বল যুক্তিপ্রয়োগ ক্ষমতা নিভূল, আর কোরাণ ভুল, ইহা কি সম্ভব? অতএব তিনি সিদ্ধান্তে আসিলেন যে, কোরাণের শতকরা একশত ভাগই অশাস্ত্র সত্য।

এই তর্কের যুক্তি খুব স্পষ্ট নহে। কিন্তু আমার তর্ক করিবার প্রবৃত্তি হইল না। তাঁহার পরের কথায় আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম।

কোকোনদ ও মোলানা মহম্মদ আলী

মহম্মদ আলী বলিলেন, তাঁহার স্থির বিশ্বাস, যদি কেহ খোলা মন লইয়া কোরাণ পাঠ করে তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই ইহার সত্যকে গ্রহণ করিবে; বাপু (গান্ধীজী) যত্নসহকারে উহা পাঠ করিয়াছেন এবং তিনি নিশ্চয়ই ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ; কিন্তু অহঙ্কারের জন্ত তিনি ইহা প্রকাশে স্বীকার করেন না।

তাঁহার সভাপতিত্বের বৎসর শেষ হইলে মহম্মদ আলী ক্রমশঃ কংগ্রেস হইতে দূরে সরিয়া পড়িতে লাগিলেন অথবা তাঁহার ভাষায় কংগ্রেসই তাঁহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া গেল। তিনি কংগ্রেস এবং নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে যোগ দিতেন এবং কয়েক বৎসর নানাভাবে ইহাতে অংশ গ্রহণ করিতেন। কিন্তু মতভেদ বাড়িয়া চলিল, মনোমালিঙ্গ প্রবল হইল। কিন্তু ইহার জন্ত সম্ভবতঃ কোন বিশেষ ব্যক্তি বা দল দায়ী নহে; দেশের কতকগুলি ঘটনার ফলেই ইহা অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই শোচনীয় পরিণতিতে আমরা অনেকে ব্যথিত হইলাম, কেন না, সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন লইয়া যত মতভেদই থাকুক না কেন, রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে পার্থক্য অতি অল্প ছিল। ভারতীয় স্বাধীনতার আদর্শে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন এবং এই সাধারণ রাজনৈতিক মনোভাবের জন্ত সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন সম্পর্কেও তাঁহার সহিত একটা সম্ভোষণনক ব্যবস্থা করা সর্বদাই সম্ভব হইত। যে সকল প্রগতিবিরোধী নিজেদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থের সমর্থক বলিয়া জাহির করিয়া থাকে তাহাদের সহিত রাজনীতির দিক দিয়া তাঁহার কোন সামঞ্জস্য ছিল না।

ভারতের পক্ষে দুর্ভাগ্য যে, ১৯২৮-এর গ্রীষ্মকালে তিনি ইউরোপে ছিলেন। তখন সাম্প্রদায়িক সমস্যা মীমাংসার একটা মন্ত চেষ্টা চলিতেছিল এবং সে চেষ্টা সাক্ষ্যের কাছাকাছি আসিয়াছিল। যদি মহম্মদ আলী উপস্থিত থাকিতেন তবে ঘটনা অন্য আকার ধারণ করিত। কিন্তু তিনি যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন ভাঙ্কন শুরু হইয়াছে এবং অনিবার্যরূপে তিনি অপর দলে যোগ দিলেন।

দুই বৎসর পরে, ১৯৩০-এ যখন আমরা অধিকাংশই কারাগারে এবং আইন অমান্য আন্দোলন পূর্ণোন্মমে চলিতেছে তখন মহম্মদ আলী কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করিয়া গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করিলেন। তাঁহার বিলাত গমনে আমি ব্যথিত হইলাম। আমার বিশ্বাস, তিনিও এই ব্যাপারে সূখী হইতে পারেন নাই। তাঁহার লণ্ডনের কার্যপ্রণালীতে উহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। তিনি অল্পভব করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রকৃত স্থান ভারতবর্ষে সংগ্রামের মধ্যে, লণ্ডনে নিষ্কল বৈঠকের

জওহরলাল মেহর

সভাগৃহে নহে। তিনি যদি স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে পারিতেন তাহা হইলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, তিনি সংঘর্ষে যোগ দিতেন। কিন্তু তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, কয়েক বৎসর ধরিয়া কাল ব্যাধি তাঁহাকে অল্পে অল্পে জীর্ণ করিতেছিল। যখন তাঁহার বিশ্রাম ও চিকিৎসার প্রয়োজন ছিল অধিক তখন লগুনে গিয়া কিছু বড়রকম প্রাপ্তির আশায় তাঁহার উৎকণ্ঠিত কর্মপ্রবণতা মৃত্যুকে নিকটতর করিল। নৈনী জেলে তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া আমি মর্ম্মাহত হইলাম।

১৯২৯-এর ডিসেম্বরে লাহোর কংগ্রেসে তাঁহার সহিত আমার শেষ সাক্ষাৎ। আমার সভাপতির অভিভাষণের কতকগুলি অংশ তাঁহার নিকট ভাল বোধ হয় নাই এবং তিনি উহার তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, কংগ্রেস অগ্রসর হইতেছে এবং একটা রাজনৈতিক সংঘর্ষ নিকটতর হইতেছে। তাঁহার মধ্যেও যথেষ্ট সংগ্রামপ্রবণতা ছিল এবং তাহা ছিল বলিয়াই অপরকে অগ্রসর হইতে দিয়া নিজে পশ্চাতে থাকা ভালবাসিতেন না। তিনি আমাকে গম্ভীরভাবে বলিলেন, “জওহর, আমি তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি ; তোমার বর্তমান সহকর্ম্মীরাই তোমাকে পরিত্যাগ করিবে, তাহারা সঙ্কটের মুহূর্ত্তে তোমাকে বিপদের মুখে ফেলিয়া পলায়ন করিবে। তোমার কংগ্রেসী ভ্রাতারা তোমাকে ফাঁসীতে ঝুলাইয়া ছাড়িবে।” কি বিষাদময় ভবিষ্যদ্বাণী !

১৯২৩-এর ডিসেম্বরে কোকনদ কংগ্রেসে আর একটি বিশেষ ঘটনায় আমি ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। এইখানে নিখিল ভারত স্বেচ্ছাসেবক সঙ্ঘের অর্থাৎ হিন্দুস্থানী সেবাদলের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার পূর্বেও অবশ্য প্রতিষ্ঠানের কার্য পরিচালনা অথবা জেলে যাইবার জগু স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অভাব ছিল না। কিন্তু ইহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও সংহতির অত্যন্ত অভাব ছিল। ডাঃ এন এস হার্ডিকারই প্রথম নিখিল ভারতীয় ভিত্তিতে সুশিক্ষিত ও সুশৃঙ্খল সেবকদল গঠনের পরিকল্পনা করিলেন। ইহারা কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় জাতীয় কার্য করিবে। তিনি আমার সহযোগিতা প্রার্থনা করিলেন। আমি সানন্দে সম্মতি দিলাম, কেন না, কল্পনাটি আমার ভাল লাগিল। কোকনদেই কাজ আরম্ভ হইল। পরে আমরা দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম যে, কংগ্রেসের খ্যাতনামা নেতারা সেবাদলের প্রতি বিরুদ্ধভাব পোষণ করেন। একজন বলিলেন যে, ইহা অত্যন্ত বিপজ্জনক হইয়া উঠিতে পারে ; কংগ্রেসের ভিতর এই সামরিক দল ঢুকাইলে ইহারা একদিন কংগ্রেসের অসামরিক কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা অপহরণ করিতে পারে। অগ্নু কেহ কেহ বলিলেন, কর্তৃপক্ষের

কোকোনদ ও মোলানা মহম্মদ আলী

আদেশ পালনে তৎপরতার জগৎ যতটুকু শৃঙ্খলার দরকার ততটুকু ভাল, ইহার জগৎ স্বেচ্ছাসেবকগণকে সামরিক কুচকাওয়াজ শিখান অবাঞ্ছনীয়। অনেকের মনের মধ্যে এই ধারণা ছিল যে, কংগ্রেসের অহিংসার আদর্শের সহিত ড্রিল-করা সুশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ঠিক সামঞ্জস্য হইবে না। অবশ্য হাদ্দিকার এই কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন এবং দীর্ঘকাল ধৈর্য্যসহকারে পরিশ্রম করিয়া প্রমাণ করিলেন, আমাদের সুশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকেরা কত কর্মতৎপর, এমন কি অহিংসও হইতে পারে।

১৯২৪-এর ফিরিয়া আসিবার অব্যবহিত পরে ১৯২৪-এর জাভহারী মাসে এলাহাবাদে আমি এক নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম। আমি স্মৃতি হইতে লিখিতেছি বলিয়া তারিখের কিছু গোলমাল হইতে পারে। সেবার এলাহাবাদে গঙ্গাতীরে কুস্ত কিংবা অর্ধকুস্ত স্নানের বৃহৎ মেলা বসিয়াছিল। দশে দশে যাত্রী গঙ্গায়মুনা-সঙ্গমে, অর্থাৎ ত্রিবেণী তীরে, স্নানের জন্য আসিতে লাগিল, গঙ্গাগর্ভ দৈর্ঘ্যে প্রায় এক মাইল হইবে, কিন্তু শীতকালে নদী শুকাইয়া বিস্তীর্ণ বালুচর জাগিয়া উঠে, ইহার উপর যাত্রীদের তাঁবু ফেলিবার সুবিধা হয়। এই নদীগর্ভে গঙ্গার প্রবাহ প্রতি বৎসরই পরিবর্তিত হয়।

১৯২৪-এ গঙ্গার স্রোত ত্রিবেণী সঙ্গমে যাত্রীদের স্নান করার পক্ষে অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল ছিল। স্নানযাত্রীদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করিয়া এবং অগ্ন্যাগ্ন প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করিতে পারিলে বিপদের আশঙ্কা অনেক কম হয়।

যোগে স্নান করিয়া পূণ্যার্জনের কোন স্পৃহা আমার ছিল না বলিয়া আমি এই বিষয় লইয়া কোন চিন্তা করি নাই। কিন্তু সংবাদপত্রে লক্ষ্য করিতেছিলাম, এই বিষয় লইয়া পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের মধ্যে বাদানুবাদ চলিতেছিল। তাঁহারা (অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ) ত্রিবেণী সঙ্গমস্থলে স্নান করা নিষিদ্ধ করিয়া এক আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। মালব্যজী ইহার প্রতিবাদ করিলেন, কেন না, ধর্মাচরণের দিক দিয়া সঙ্গমে স্নান করাই বিধি। ছুঁটনা ও প্রাণহানি নিবারণের জন্য সাবধানতা অবলম্বন করিয়া গভর্ণমেণ্ট ঠিকই করিয়াছিলেন। কিন্তু সরকারী ব্যবস্থা ঘেরূপ হয় এক্ষেত্রেও সেইরূপ হৃদয়হীন ও বিরক্তিকর হইয়াছিল।

কুস্তের যোগের দিন অতি প্রত্যুষে মেলা দেখিবার জন্য আমি নদীতীরে উপস্থিত হইলাম। স্নান করিবার আমার কোন ইচ্ছা ছিল না। সেখানে গিয়া শুনিলাম মালব্যজী জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিনীত ভাষায় সরকারী আদেশ অমান্যের সঙ্কল্প ব্যক্ত করিয়া এক পত্রে ত্রিবেণী

সকলে স্নান করিবার অঙ্কমতি চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ম্যান্ড্রেট অঙ্কমতি দেন নাই। মালব্যাজী সত্যগ্রহ করিবার সকল লইয়া দুই শত ব্যক্তিসহ সন্ধ্যা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই অবস্থা দেখিয়া আমিও একটু কোতুহলী হইয়া উঠিলাম। এবং আকস্মিক উত্তেজনায় সত্যগ্রহী দলে যোগ দিয়া বসিলাম। সন্ধ্যার পথে বিস্তীর্ণ স্থান শক্ত বেড়া দিয়া ঘিরিয়া রাখা হইয়াছিল। বেড়া পর্যন্ত আসিবার পর পুলিশ আমাদের গতিরোধ করিল এবং আমাদের সহিত যে মহিখানি ছিল তাহা কাড়িয়া লইয়া গেল। আমরা অহিংস সত্যগ্রহী; কাজেই বেড়ার ধারে বালুর উপর শান্তভাবে বসিয়া রহিলাম। প্রভাত অতিবাহিত হইয়া সূর্য পশ্চিমে চলিয়া পড়িল। আমরা বসিয়াই আছি। যতই সময় যাইতে লাগিল, সূর্য প্রথর হইয়া উঠিল, বালু তাতিয়া উঠিল এবং আমরা প্রত্যেকে ক্ষুধায় কাতর হইয়া উঠিলাম। পদাতিক এবং অশ্বরোহী সৈন্যদলও ছিল। আমরা অসহিষ্ণু হইয়া একটা কিছু করিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। অন্তরিক্তে কর্তৃপক্ষও ধৈর্য হারাইয়া বলপ্রয়োগে আমাদেরকে তাড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেছে বলিয়া মনে হইল। সৈন্যদল সহসা কি একটা আদেশ পাইয়া স্ব-স্ব অস্ত্রে আরোহণ করিয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইল; আমার তৎক্ষণাৎ মনে হইল (সত্য নাও হইতে পারে) যে আমাদের উপর ঘোড়া চালাইয়া দিয়া তাড়াইবার ব্যবস্থা হইতেছে। ঘোড়ার পায়ে তলায় দলিত হইবার বিন্দুমাত্র আগ্রহও আমার ছিল না এবং আমি এভাবে বসিয়া একেবারেই বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। অতএব আমার পার্শ্বে যাহারা বসিয়াছিল তাহাদিগকে বলিলাম, চল আমরা বেড়া ডিঙাইবার চেষ্টা করি এবং স্বয়ং অগ্রসর হইয়া বেড়ার উপর উঠিয়া বসিলাম। তৎক্ষণাৎ আরও অনেকে আমার অনুসরণ করিল এবং কয়েকটি খুঁটি তুলিয়া ফেলিয়া যাইবার মত পথ প্রস্তুত করিল। একজন আমার হাতে একখানি জাতীয় পতাকা দিল। পতাকাখানি বেড়ার উপর স্থাপন করিয়া আমি বসিয়া রহিলাম। কেহ বেড়া ডিঙাইতেছে, কেহ সন্ত প্রস্তুত সঙ্গীপথে প্রবেশ করিতেছে আর ঘোড়সোয়ারেরা জনতাকে হটাইয়া দিতেছে—এই সমস্ত মিলিয়া দৃশ্যটি আমার নিকট খুব উপভোগ্য মনে হইল। এ কথা আমি বলিব যে, ঘোড়সোয়ারেরা অত্যন্ত সতর্কতার সহিত তাহাদের কর্তব্য পালন করিতেছিল। তাহারা মাথার উপর লাঠি ঘুরাইয়া জনতাকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছিল, কিন্তু কাহাকেও আঘাত করে নাই। ফরাসী বিদ্রোহীদের রাজপথে বেড়া দিয়া আত্মরক্ষার অস্ত্র স্থিতি আমার মনের উপর তাসিয়া উঠিল।

আমার পিতা ও গান্ধিজী

অবশেষে আমি বেড়ার অপর পারে নামিয়া পড়িলাম এবং ক্লান্তি ও গরমের ফলে গন্ধার গিয়া ডুব দিলাম। কিরিয়া আসিয়া দেখি, মালবাজী ও অন্তান্ত অনেকে বেড়ার ধারে তেমনই বসিয়া আছেন, ঘোড়সোয়ার ও পদাতিক পুলিশেরা ততক্ষণে সন্ত্যাগ্রহী হল ও বেড়ার মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি অন্তরিক দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া পুনরায় মালবাজীর পাশে বসিলাম। দেখিলাম মালবাজী অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছেন এবং তাঁর মনের ভাবকে সংযত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। সহসা কাহাকেও কিছু না বলিয়া মালবাজী ঘোড়সোয়ার ও পুলিশের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলেন। মালবাজীর মত একজন বৃদ্ধ ও দুর্বলদেহ ব্যক্তির এই হুঃসাহস দেখিয়া আমরা অবাক হইয়া গেলাম। যাহা ইউক, আমরাও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম, পুলিশ ও ঘোড়সোয়ার কিছুক্ষণ আমাদেরিকে বাধা দিতে চেষ্টা করিয়া কিছুই বলিল না, অল্পকাল পরে তাহার চলিয়া গেল।

আমাদের মনে দ্বিধা ছিল, হয়ত বা গভর্ণমেন্ট আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিবেন, কিন্তু সেরূপ কিছু ঘটিল না। সম্ভবতঃ মালবাজীর বিরুদ্ধে কিছু করা গভর্ণমেন্টের অভিপ্রেত ছিল না। অতএব এই সামান্য সংঘর্ষের এইখানেই শেষ হইল।

১৮

আমার পিতা ও গান্ধিজী

১৯২৪-এর প্রথমভাগে সহসা সংবাদ আসিল, কারাগারে গান্ধিজী গুরুতর পীড়িত, তাঁহাকে হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের জন্য স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। সমস্ত ভারতবর্ষ উৎকণ্ঠায় অধীর হইয়া উঠিল, আমরা আতঙ্কে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যা কাটিয়া গেল, দেশের চারিদিক হইতে জনশ্রোত পুণায় তাঁহাকে দর্শন করিতে চলিল, হাসপাতালে তিনি রক্ষী-বেষ্টিত বন্দীরূপে অবস্থান করিলেও নির্দিষ্ট সংখ্যক বন্ধুবান্ধবকে তাঁহার সহিত দেখা করিতে দেওয়া হইত। পিতা ও আমি তাঁহার সহিত হাসপাতালে সাক্ষাৎ করিলাম।

তাঁহাকে হাসপাতাল হইতে আর কারাগারে লওয়া হয় নাই। তিনি ক্রমশঃ নিরাময় হইতেছেন দেখিয়া গভর্ণমেন্ট অবশিষ্ট দণ্ড নাকচ করিয়া তাঁহাকে মুক্তি দিলেন। ছয় কংসর কারাবন্দের মধ্যে তিনি মাত্র প্রায়

দুই বৎসর দণ্ডভোগ করিলেন। মুক্তির পর তিনি স্বাস্থ্য লাভার্থ বোম্বাইয়ের নিকটে সমুদ্র তীরবর্তী জুহতে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

আমরাও সপরিবারে জুহতে আসিয়া সমুদ্রতীরে একটি ক্ষুদ্র কুটারে আশ্রয় লইলাম। এখানে আমরা কয়েক সপ্তাহ ছিলাম। অনেকদিন পর আমি বিশ্বাসের অবকাশ পাইলাম। মনের সাথে সমুদ্রে সাঁতার দিতাম, দৌড়াইতাম, অথবা সমুদ্রতীরে অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতাম। এখানে আমার উদ্দেশ্য অবশ্য অবকাশের আনন্দ উপভোগ নহে, আমরা গান্ধিজীর সহিত আলোচনার জগুই আসিয়াছিলাম। পিতা তাঁহাকে স্বরাজ্য দলের অবস্থা বুঝাইয়া স্বমতে আনিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার আশা ছিল গান্ধিজী পুরাপুরি সাহায্য না করিলেও অন্ততঃ নিরপেক্ষ থাকিবেন। আমি যে সমস্ত সমস্যা লইয়া বিব্রত ছিলাম তাহার জগুও গান্ধিজীর সহিত পরামর্শ করার প্রয়োজন ছিল। গান্ধিজীর ভবিষ্যৎ কার্যপদ্ধতি জানিবার জগুও আমার ঔৎসুক্য ছিল।

স্বরাজ্য দলের দিক দিয়া জুহ আলোচনায় কোনই ফল হইল না, গান্ধিজী অটল রহিলেন এবং এই আলোচনায় মোটেই প্রভাবান্বিত হইলেন না। বন্ধুভাবে আলোচনা ও পারস্পরিক সৌজগ্ৰ সঙ্ঘেও স্পষ্টই বোঝা গেল, আপোষ অসম্ভব। অবশেষে তাঁহারা পরস্পরের সম্মতি লইয়া ভিন্ন মত অবলম্বন করিলেন এবং তদনুসারে সংবাদপত্রে বিবৃতি বাহির হইল।

গান্ধিজী আমার একটি সংশয়ও মীমাংসা করিয়া দিলেন না। ফলে আমিও কতকটা নিরাশ হইয়া জুহ হইতে প্রত্যাবর্তন করিলাম। তিনি স্বভাকতই অধিকদূর ভবিষ্যৎ দেখিতে চান না এবং দীর্ঘকালব্যাপী কোন কার্যপদ্ধতি নির্দিষ্ট করিতে চান না। তাঁহার মতে আমাদের দৈর্ঘ্য সহকারে জনসেবা করিয়া যাইতে হইবে, কংগ্রেসের গঠনমূলক ও সমাজ-সংস্কারমূলক কার্য চালাইতে হইবে এবং সংগ্রামশীল কাণ্ডের জগু শুভদিনের অপেক্ষা করিতে হইবে। তবে সমস্যা এই, যদি সেই শুভদিনও আসে তাহা চোরিচাওয়ার মত ঘটনা ঘটিয়া পুনরায় ত আমাদের সমস্ত প্রত্যাশা ধূলিসাৎ করিয়া দিতে পারে? এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য সন্ধানও তিনি কোন নিশ্চিত উক্তি করিলেন না। আমরা চাহিতেছি সে সন্ধান অনেকেই আমাদের ধারণা স্পষ্ট করিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন। কংগ্রেস তখনও এ বিষয়ে কোন নিশ্চিত ঘোষণার প্রয়োজন অনুভব করিতেছিলেন না। আমরা কি স্বাধীনতা এবং কিছু সামাজিক পরিবর্তন চাহি, না, আমাদের নেতারা উহা অপেক্ষা অল্প প্রত্যাশী হইয়া আপোষ করিবার পক্ষপাতী?

আমার শিভা ও গান্ধী

কয়েকমাস পূর্বে যুক্ত প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে আমি স্বাধীনতার উপর জোর দিয়াছিলাম। আমার নাতা হইতে ফিরিবার কিছুকাল পরেই ১৯২৩-এর শরৎকালে এই সম্মেলন হইয়াছিল। নাতা জেল হইতে পুরস্কারস্বরূপ যে রোগ-বীজাণু আনিয়াছিলাম তাহার আক্রমণ হইতে তখনও আমি অব্যাহতি পাই নাই। রোগশয্যায় শুইয়াই আমাকে ঐ অভিভাষণ লিখিতে হইয়াছিল, এবং আমি সম্মেলনে উপস্থিত হইতে পারি নাই।

যখন আমরা কয়েকজন স্বাধীনতাকেই কংগ্রেসের মুখ্য লক্ষ্য হিসাবে স্পষ্ট করিয়া লইবার জন্ত চেষ্টা করিতেছিলাম তখন আমাদের মডারেট বন্ধুরা—থাহারা আমাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন অথবা আমরাই থাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়াছি—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শক্তি ও মহিমার প্রকাশ স্তবস্তুতি আরম্ভ করিয়া দিলেন। অশুচি কার্য্যতঃ আমাদের স্বদেশবাসীরা এই সাম্রাজ্যের পাদপীঠ মাত্র, এবং ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহে ভারতীয়দের প্রতি হয় দাসবৎ ব্যবহার করা হয়, না হয় তাহাদিগকে প্রবেশ করিতেই দেওয়া হয় না। যিঃ শাস্ত্রী দূত সাজিলেন এবং স্তার তেজবাহাদুর সপ্ত ১৯২৩-এর লগুনে আহৃত সাম্রাজ্য সম্মেলনে গব্বের সহিত ঘোষণা করিলেন, “আমি গব্বের সহিত বলিতে পারি যে, আমার স্বদেশই এই সাম্রাজ্যকে মহিমান্বিত করিয়াছে।”

মডারেট নেতা ও আমাদের মধ্যে যেন এক মহাসমুদ্রের ব্যবধান; আমরা যেন বিভিন্ন দেশের অধিবাসী, আমাদের ভাষা স্বতন্ত্র এবং আমাদের স্বপ্ন—যদি তাঁহাদের কোন স্বপ্ন থাকে—তবে তাহাও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অতএব আমাদের উদ্দেশ্যকে কি নিশ্চিত ও স্পষ্ট করিয়া লওয়া উচিত নহে?

কিন্তু এই শ্রেণীর চিন্তা অল্প-সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। অনেকেই অতি-নির্দিষ্টতা পছন্দ করেন না। বিশেষতঃ জাতীয় আন্দোলন স্বভাবতঃই অস্পষ্টতা ও এক প্রকার রহস্যের আবরণে আবৃত থাকে। ১৯২৪ সালের প্রথম ভাগে ব্যবস্থা পরিষদ ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে স্বরাজ্যীরাই জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। “ভিতর হইতে বাধা প্রদান” এবং আইনসভা ধ্বংস করিবার দৃষ্টভরা উক্তির পর এই দল কি করিবে? সূচনা মন্দ হইল না। ব্যবস্থা পরিষদে সেই বৎসরের বাজেট না-মঞ্জুর হইল এবং একটি প্রস্তাবে ভারতের স্বাধীনতা-সমস্তার সমাধানকল্পে গোলটেবিলের দাবী করা হইল। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙ্গলার আইনসভা সাহসের সহিত সরকারের সমস্ত

দাবী না-মঞ্জুর করিলেন। কিন্তু কি ব্যবস্থা পরিষদ কি প্রাদেশিক আইনসভায় বড়লাট এবং গভর্নরগণ তাহাদের বিশেষ-ক্ষমতাবলে বাজেট মঞ্জুর করিয়া দিলেন। অনেক বক্তৃতা হইল, আইনসভার মধ্যে কিছু চাঞ্চল্য দেখা গেল, স্বরাজীরা সাময়িক জয়গর্ভে অহুতব করিলেন, সংবাদ-পত্রে বড় বড় শিরোনামায় ইহা প্রচার করা হইল, বাস্ এই পর্য্যন্ত। ইহার বেশী তাঁহারা কি করিতে পারেন? বড়জোর তাঁহারা একই কৌশলের পুনরতিনয় করিতে পারেন কিন্তু উহার নতুনত্ব রহিল না, উৎসাহ শীতল হইয়া গেল, বড়লাট ও গভর্নরগণ কর্তৃক বিশেষ ক্ষমতাবলে আইন এবং বাজেট পাস্ করায় লোকের মন অভ্যস্ত হইয়া উঠিল। অবশ্য কাউন্সিলের মধ্যে ইহার পরবর্ত্তী সোপানে অগ্রসর হইবার সামর্থ্য স্বরাজীদের ছিল না। তাহার স্থান আইনসভাগৃহের বাহিরে।

১৯২৪ সালের মধ্য ভাগে আহম্মদাবাদে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির এক সভা হইল। এই সভায় অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে গান্ধিজীর সহিত স্বরাজীদের বিরোধ উপস্থিত হইয়া কতকগুলি নাটকীয় ঘটনার সূত্রপাত করিল। গান্ধিজীই প্রথমে অগ্রসর হইলেন। কংগ্রেসী নিয়মতন্ত্রে তিনি কতকগুলি গুরুতর পরিবর্তনের প্রস্তাব করিলেন। যাহার ফলে ভোটাধিকার এবং কংগ্রেসের সদস্য সম্প্রদায় নিয়মের আমূল পরিবর্তন করিতে হইবে। পূর্বে নিয়ম ছিল যে, স্বরাজ লাভের জন্য শাস্তিপূর্ণ উপায় সমন্বিত কংগ্রেসের মূলনীতি মানিয়া লইয়া যে চারি আনা চাঁদা দিবে সেই কংগ্রেসের সদস্য হইবে। গান্ধিজী চাহিলেন, চারি আনার পরিবর্তে প্রত্যেক সদস্যকে হাতে কাটা নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থতা দিতে হইবে। ইহা ভোটাধিকারে এক গুরুতর পরিবর্তন এবং নিশ্চয়ই নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির ইহা করিবার অধিকার নাই। কিন্তু ইচ্ছামত কার্য্য করিবার বাধা উপস্থিত হইলে গান্ধিজী নিয়মতন্ত্রকে কদাচিৎ মর্ধ্যাদা দিয়া থাকেন। আমি নিয়মতন্ত্রের উপর এই আশ্বাতের ফলে অত্যন্ত বাধিত হইলাম এবং কার্য্যকরী সমিতির নিকট আমার সম্পাদকীয় পদত্যাগ-পত্র প্রেরণ করিলাম। কিন্তু ঘটনাবলীর পরিবর্তনের ফলে আমি পদত্যাগ লইয়া পীড়াপীড়ি করিলাম না। পিতা এবং দেশবন্ধু গান্ধিজীর প্রস্তাবের বিরোধিতা করিলেন এবং তাঁহাদের তাঁর অসম্মতি জ্ঞাপন করিবার জন্য ভোট গ্রহণের অব্যবহিত পূর্বে অহুচরবর্গ সহ সভা হইতে বাহির হইয়া গেলেন। এমন কি অবশিষ্ট উপস্থিত সভ্যগণেরও কেহ কেহ প্রস্তাবের বিরোধিতা করিলেন। তৎসত্ত্বেও অধিকাংশের ভোটে প্রস্তাব গৃহীত হইল। কিন্তু পরিণামে উহা প্রত্যাখ্যত হইল। কেননা স্বরাজীদের

সভাভাগ এবং এই বিষয়ে আমার পিতা ও দেশবন্ধুর অনমনীয় দৃঢ়তা দেখিয়া গান্ধিজী অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। তাঁহার মধ্যে যে ভাবাবেগ সঞ্চিত হইয়াছিল কোন সমস্তের একটি মন্তব্যের আঘাতে তাহা ভাঙিয়া পড়িল। ইহা স্পষ্টই বোঝা গেল, তিনি অত্যন্ত মর্মান্বিত হইয়াছেন। তিনি সভার সম্মুখে এমন মর্ম্মস্পর্শী ভাষণ বক্তৃতা করিতে লাগিলেন যে কতিপয় সমস্ত অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। ইহা কল্পণ এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব। *

তঁহার প্রতিবাদ হইবে, ইহা জানিয়াও তিনি কেন কেবলমাত্র হাতে কাটা সূতায় চাঁদা দিবার নিয়ম প্রবর্ত্তনের জন্ত এত উৎসুক হইয়াছিলেন, আমি কোন দিনই তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। সম্ভবতঃ তিনি

* এই ঘটনা জেলে বসিয়া স্মৃতি হইতে লিখিয়াছি, এখন দেখিতেছি যে আমার স্মৃতি অসম্পূর্ণ এবং আলোচ্য বিষয়ের একটা গুরুতর দিক আমি উল্লেখ করি নাই, কলে প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হইয়াছে। একজন বাকালী টেরোরিষ্ট বুঝক (পোপীনাথ সাহা) সম্পর্কিত প্রস্তাব ঐ সভায় উপস্থিত করা হইয়াছিল এবং যদিও প্রস্তাবটি পাস হয় নাই তথাপি গান্ধিজী অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন। আমার বতদূর স্মরণ হয় তাহাতে ঐ প্রস্তাবে তাহার কাণ্ডার নিন্দা করা হইয়াছিল কিন্তু তাহার উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতি ছিল। প্রস্তাব অপেক্ষাও উহার সমর্থনসূচক বক্তৃতাগুলিতে গান্ধিজী বেশী দুঃখিত হইয়াছিলেন। অহিংসা সম্পর্কে কংগ্রেসের অনেকেই তেমন প্রভাবান্বিত নহে। এই ধারণাই তাঁহাকে অধিকতর বিচলিত করিয়াছিল। কয়েকদিন পরে এই সম্পর্কে তিনি 'ইয়ং ইণ্ডিয়ান' লিখিয়াছিলেন, "চারিটি প্রস্তাবেই আমার পক্ষে মজমুখ্যক ভোট বেশী ছিল। ইহার অর্থ আমার পক্ষের দলই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সভায় উভয় দলই সমান সমান ছিলেন। পোপীনাথ সাহা প্রস্তাব লইয়াই হাতাহাতি বাধিয়াছিল। বক্তৃতায় এবং উৎসাহিত যে সকল দৃশ্য আমি দেখিলাম তাহাতে আমার চক্ষু খুলিয়া গেল-----পোপীনাথ সাহা প্রস্তাবের পর সভার পাকীভা আর রহিল না। এই অবস্থার মধ্যে আমাকে সর্বশেষ প্রস্তাব উপস্থিত করিতে হইল। আলোচনা যতই অগ্রসর হইতে লাগিল আমি ততই পন্থীর হইয়া উঠিতে লাগিলাম। এই পীড়াদায়ক অবস্থার মধ্য হইতে আমার পলায়ন করিবার ইচ্ছা হইল। প্রস্তাব উপস্থিত করিতেও আমার ভয় করিতে লাগিল। কোন বক্তার মনে কোন ঈর্ষার ভাব ছিল না, ইহা আমি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে পারিয়াছি কিনা জানি না। কংগ্রেসের মূলনীতি অথবা অহিংসার প্রতি অবজ্ঞা এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতা সম্পর্কে চেতনার অভাবই আমাকে অধিকতর পীড়িত করিয়াছে---। সমস্ত জন কংগ্রেস প্রতিনিধি ঐ প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন, ইহা এক সংশয়াকুল অভিজ্ঞান। এই ঘটনা এবং ইহার উপর গান্ধিজীর মন্তব্য বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা হইতে অহিংসার প্রতি গান্ধিজীর কি অসীম অমুয়ক্তি এবং কোন অনিচ্ছাকৃত কি গোণ ভাবেও অহিংসা-বিরোধী কোন চেষ্টা তাঁহার মনে কি পরিমাণ প্রতিক্রিয়ার স্কার করে তাহা বুঝা যায়। ইহার পরে তিনি বাহা করিয়াছেন, তাহা এইরূপ প্রতিক্রিয়ারই ফল, তাঁহার সমস্ত উপায় ও কার্যপদ্ধতির মূল ভিত্তি হইল এই অহিংসনীতি।

চাইয়াছিলেন, যে সকল ব্যক্তি তাঁহার খাদি প্রভৃতি গঠনমূলক কার্যে বিশ্বাসী তাহারাই কংগ্রেসে থাকিবে এবং বাদ বাকী সকলে হয় উহা মানিয়া লইবে নয় কংগ্রেস ত্যাগ করিবে। যদিও কংগ্রেসের অধিকাংশ দল তাঁহার পক্ষে ছিল, তথাপি তিনি আপন সঙ্কল্প শিথিল করিলেন এবং অন্তদ্বন্দ্বের সহিত আপোষ করিতে লাগিলেন। আমি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, তিনি চার মাসের মধ্যে তিনি এ বিষয়ে কয়েকবার তাঁহার মত পরিবর্তন করিলেন, বোধ হইল, তিনি যেন অকূল সমুদ্রে পড়িয়া বিভ্রান্ত হইয়াছেন। আমি তাঁহার সহিত এইকালে ঘনিষ্ঠভাবে না মেশার ফলে, আমার বিশ্বাস আরও বাড়িল। প্রশ্নটি আমার নিকট কোন দিনই খুব গুরুতর বলিয়া মনে হয় নাই। কায়িক শ্রমকে ভোটাধিকারের যোগ্যতার মাপকাঠি করা ভাল কিন্তু তাহাকে যেরূপ সৌম্যবদ্ধ করা হইয়াছিল, তাহার কোন অর্থ হয় না।)

আমার মতে, গান্ধিজী সম্পূর্ণ অপরিচিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পড়িয়াই অসুবিধা বোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিজের ভূমি—সত্যাগ্রহের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের কর্মভূমিতে তিনি অনন্যসাধারণ, এখানে তাঁহার প্রত্যেক পদক্ষেপ অপ্রাস্ত্য। জনসাধারণের মধ্যে নীরবে সমাজসংস্কারমূলক কার্য্য স্বয়ং অথবা সহকর্মীদের লইয়া পরিচালন করিতেও তাঁহার দক্ষতা অসীম। তিনি চরম সংগ্রাম অথবা পরিপূর্ণ শান্তি বুঝেন। কিন্তু হু এর মাঝামাঝি অবস্থার মধ্যে তিনি স্থায়ী বোধ করেন না। স্বরাজ্যদলের আইনসভার মধ্যে তিনি বাধাদান ও কোলাহল দেখিয়া কিছু মাত্র চঞ্চল হইলেন না। যে কাউন্সিলে যাইতে চাহে, সে সেখানে গিয়া কর্তৃপক্ষের সহিত সহযোগিতা করুক এবং ভাল আইন-কানুন প্রণয়নে চেষ্টা করুক, নতুবা কেবলমাত্র বাধা দিতে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না। যাহার উহা করিবার প্রবৃত্তি নাই তাহার পক্ষে বাহিরে থাকাই ভাল। স্বরাজ্যের এই দুইয়ের কোনটাই গ্রহণ না করায় তিনি তাঁহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে অসুবিধা বোধ করিতে লাগিলেন।

যাহা হউক অবশেষে তিনি স্বরাজ্যীদের সহিত একটা আপোষ রফা করিয়া লইলেন। পুরাতন চারি আনা চাঁদা দেওয়া অথবা হাতেকাটা সূতায় চাঁদা দেওয়া দুই প্রকার প্রথাই প্রবর্তিত রহিল, তিনি স্বরাজ্যদলের আইনসভার কার্য্য প্রায় অন্তিমোদন করিলেন কিন্তু নিজে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রহিলেন, লোকের বিশ্বাস হইল তিনি রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এবং শাসকসম্প্র-

আমার পিতা ও গান্ধীজী

দায়ের বিশ্বাস হইল তাঁহার জনপ্রিয়তা হ্রাস হইয়াছে এবং তাঁহার সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হইয়াছে। দাশ এবং নেহরু গান্ধীকে নেপথ্যে অন্তরালে ঠেলিয়া দিয়া রাজনৈতিক রঙ্গক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই শ্রেণীর মস্তব্য গত পনের বৎসর ধরিয়া নানাভাবে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে; কিন্তু প্রত্যেক বারই দেখা গিয়াছে যে আমাদের শাসকগণ ভারতবাসীর মনোভাব সম্পর্কে গভীর ভাবেই অজ্ঞ। ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গক্ষেত্রে গান্ধীজীর আবির্ভাবের পর হইতে জনসাধারণের মধ্যে তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তি কখনও হ্রাস হয় নাই এবং তাহা এখনও অব্যাহতই আছে। মনুষ্যপ্রকৃতি দুর্বল; অতএব তাঁহার কথা মত সকলে কাজ করিতে পারে না। কিন্তু সাধারণের চিন্তে গান্ধীজীর প্রতি যথেষ্ট সদিচ্ছা বিद्यমান। যখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা অসুস্থ হয় তখন তাহারা বিরাট গণ-আন্দোলনের মাঝে জাগিয়া উঠে। অতথা তাহারা নতশিরে নীরবে থাকে। কোন নেতা যাহুদও ঘুরাইয়া শূন্য হইতে গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করিতে পারেন না, স্বাভাবিক ভাবে অভিব্যক্ত ঘটনার সুযোগ তিনি গ্রহণ করিতে পারেন কিম্বা তাহার জগৎ প্রস্তুত হইতে পারেন কিম্বা স্বয়ং ঘটনার সৃষ্টি করিতে পারেন না।

কিন্তু একথা সত্য যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে গান্ধীজীর জনপ্রিয়তার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। অগ্রসর হইবার মুহূর্তে তাহারা তাঁহার অনুগমন করে কিন্তু যখন অনিবার্যরূপে প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তখন তাহারা হইয়া উঠে সমালোচক। তথাপি অধিকাংশই তাঁহার নিকট মাথা নীচু করিয়াছে। অতঃ কোন কার্যকরী রাজনৈতিক উপায়ের অভাবও ইহার অন্যতম কারণ। মডারেট, রেসপন্সিভিটি অথবা ঐ শ্রেণীর দলের কথা কেহ গণনার মধ্যেও আনে না। যাহারা সম্মতবাদী, হিংসায় বিশ্বাসী, আধুনিক জগতের রাজনৈতিক মতবাদ হইতে তাহারা সম্পূর্ণ বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের প্রণালী নিফল ও বর্তমান কালের অনুপযোগী। সমাজতান্ত্রিক কার্যপদ্ধতিও দেশের সুপরিচিত নহে। এবং ইহা কংগ্রেসের উচ্চ শ্রেণীর সদস্যদের পক্ষে অত্যন্ত ভীতিপ্রদ।

১৯২৪ সালের মধ্যভাগে সাময়িক রাজনৈতিক মনকষাকষির পর আমার পিতার সহিত গান্ধীজীর পুনরায় মিলন হইল ও উভয়ের সম্পর্ক অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। উভয়ের মধ্যে যতই কেন পার্থক্য থাকুক না, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সুবিশেষণার অভাব ছিল না। তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি এই শ্রদ্ধার কারণ কি? মহাত্মা গান্ধীজীর কতকগুলি রচনা সংগ্রহ “আধুনিক চিন্তাধারা” এই নামে পুস্তকাকারে

জওহরলাল নেহরু

বাহির হইয়াছিল। ঐ পুস্তকের ভূমিকা লিখিতে গিয়া পিতা তাঁহার মনোভাব আমাদিগকে জানিবার সুযোগ দিয়াছিলেন।

তিনি লিখিতেছেন, “ঋষি ও মহাত্মাদের বিষয় আমি শুনিয়াছি কিন্তু কখনও তাঁহাদিগকে দেখিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই, এবং আমি অকপটে স্বীকার করিব তাঁহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার মনে সংশয় আছে। আমি মানুষ এবং যাহা মনুষ্যোচিত তাহাতে বিশ্বাসী। এই পুস্তকে বাহ্যিক রচনা সংগ্রহ করা হইয়াছে তিনি একজন মানুষ এবং তাহাতে মনুষ্যোচিত গুণাবলী বিদ্যমান।... মনুষ্যপ্রকৃতির দুইটি মহৎ গুণের তিনি দৃষ্টান্তস্থল—শ্রদ্ধা ও শক্তি.....

“বাহ্যিক মধ্যে শক্তি নাই, বিশ্বাস নাই, সে-ই প্রশ্ন করে, ‘ইহার দ্বারা আমার কি ফল লাভ হইবে?’ ‘হয় জয় নয় মৃত্যু,’ এই উত্তরে তাহার মন সায় দেয় না.....কিন্তু দীন হীনও ইহাতে সোজা হইয়া দাঁড়ায়... বিশ্বাসের দৃঢ়ভূমিতে অকম্পিত পদে দাঁড়াইয়া শক্তির অপরাহত শৌর্য্যে অটল থাকিয়া তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীকে মাতৃভূমির জন্য আত্মোৎসর্গ ও তুংগের বাণী বিরামহীন ভাবে শুনাইতেছেন। তাঁহার বাণী লক্ষ লক্ষ হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।.....”

উপসংহারে তিনি সুইনবার্ণের দুই পংক্তি কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

“আমাদের মধ্যে আমরা কি নরের মধ্যে নরোত্তম পাই নাই, যে মানুষ ঘটনাবলীর ‘অধিরাজ’?”

তিনি উল্লিখিত বাক্যে স্পষ্টতঃই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন মহাত্মা বা সাধুপুরুষ হিসাবে নহে, তিনি মানুষ হিসাবেই গান্ধীকে শ্রদ্ধা করেন। তাঁহার চরিত্রে শক্তি ও অনমনীয় দৃঢ়তা ছিল বলিয়াই তিনি গান্ধীজীর মানসিক বলের প্রশংসা করিতেন। এই ক্ষুদ্র ক্লেশ-জীর্ণ তনু মনুষ্যটির মধ্যে এমন এক লৌহ-কাঠিন্য ছিল যাহা পর্বতের মত অটল এবং যত বড়ই হউক না কেন, কোন বাহুবলের সাধ্য নাই যে তাঁহাকে অবনত করে। তাঁহার দেহের মধ্যে আকর্ষণের কিছুই নাই, তথাপি তাঁহার কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত নগ্নদেহে, তাঁহার প্রত্যেক ভাবভঙ্গীমায় এমন একটা মহৎ গরিমা প্রকাশ পায় যাহার সম্মুখে অপরে মাথা নত না করিয়া পারে না। তিনি বিনয়ী ও নিরীহ এবং তৎসম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সচেতন কিন্তু তথাপি তিনি জানেন তাঁহার মধ্যে প্রভুত্বের ভাব আছে, শক্তি আছে এবং সময়মত অত্যন্ত অধীরতার সহিত তিনি আদেশ করেন এবং প্রত্যাশা করেন অপরে অবনত শিরে তাহা পালন

আমার পিতা ও গান্ধিজী

করিবে। তাঁহার প্রশান্ত গভীর দৃষ্টি অপরকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া মৰ্ম্মহলে প্রবেশ করে। তাঁহার স্পষ্ট গভীর কর্ণস্বর অলক্ষ্যে প্রবেশ করিয়া হৃদয় মধ্যে আবেগময় আলোড়ন উপস্থিত করে। তাঁহার শ্রোতা একজনই হউক আর সহস্র হউক তাঁহার চবিত্রমাধুর্য্য ও আকর্ষণী শক্তি সকলকেই টানিয়া লয়, শ্রোতা ও বক্তার মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে না। এই ভাবপ্রবাহের সহিত মনের যোগ অতি অল্প থাকিলেও তাহা একেবারে উপেক্ষার ছিল না। হৃদয়াবেগের সহিত তুলনায় মন ও যুক্তির স্থান নিশ্চয়ই পশ্চাতে ছিল। বাগ্মিতা বা মনোহর বাকবিন্যাস কোশল দ্বারা এই “মন্ত্রমুগ্ধ” অবস্থার সৃষ্টি হইত না, তাঁহার ভাষা সরল, স্পষ্টনির্দিষ্ট এবং কদাচিৎ তিনি অনাবশ্যক শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই মন্তব্যটির অকপট চরিত্র এবং প্রথর ব্যক্তিত্বই তাঁহার প্রতি সকলকে আকর্ষণ করে। তাঁহার অন্তরের গভীর শক্তির পরিচয় বাহিরের ভঙ্গীতে ফুটিয়া উঠে। তাঁহার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে লোকমুখে প্রচলিত যে সকল গল্প রটিয়া গিয়াছে সম্ভবতঃ তাহাও পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে পূর্ব হইতে অনেকটা অমূল্য করিয়া রাখে। হয় ত একজন অপরিচিত, এই সকল কাহিনী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ব্যক্তি অতি সহজে তত অভিসৃত হইবে না। তথাপি গান্ধিজীর এক বিশেষ বিশেষ এই যে, তিনি অনায়াসে অপরের চিত্ত জয় করিতে পারেন অন্ততঃপক্ষে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিরস্ত করিয়া ফেলিতে পারেন।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অমুরাগী হইলেও মনুষ্যহস্ত-রচিত কারুশিল্পের প্রতি গান্ধিজীর বিশেষ অমুরাগ নাই। তাম্রমহল তাঁহার দৃষ্টিতে বল-নিপীড়িত পর-শ্রমের প্রতীকমাত্র, অথবা কিছু বেশী। স্বগন্ধ উপভোগ করিবার ক্ষমতাও তাঁহার অত্যন্ত দুর্বল, তথাপি তিনি নিজের মত করিয়া জীবন যাত্রার একটা প্রণালী ঠিক করিয়া লইয়াছেন এবং সমগ্রভাবে তাহা স্থান্দর। তাঁহার ভাবভঙ্গীর মধ্যে কমনীয়তা আছে, ক্রুদ্ধিমতা নাই। তাঁহার চরিত্রে কর্কশ ভাব কিম্বা কোন উগ্রতা নাই। এবং আমাদের দেশে মধ্যশ্রেণী স্থলভ স্থলরুচি ও ইতরতার লেশমাত্রও তাঁহার মধ্যে নাই। তিনি অন্তরের মধ্যে গভীর শান্তির সন্ধান পাইয়াছেন, জীবনের বন্ধুর যাত্রাপথে তিনি চারিদিকে সেই শান্তি বিলাইয়া দৃঢ় ও নির্ভীক পদক্ষেপে চলিয়াছেন।

কিন্তু আমার পিতার সহিত তাঁহার পার্থক্য কত বেশী! তাঁহার মধ্যেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের শক্তি এবং রাজোচিত মহিমা বিद्यমান। স্থানবর্ণের যে দুই ছত্র কবিতা তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা তাঁহার সম্বন্ধেও প্রযুক্ত। যে কোন সভাসমিতিতে তিনি উপস্থিত হইলে

অবলীলাক্রমে নেতার আসন গ্রহণ করিতেন। টেবিলের যে কোন দিকেই তিনি উপবেশন করুন না কেন তাহাই হইত প্রধান আসন। (একজন বিখ্যাত ইংরাজ বিচারক পরবর্তী কালে ইহা বলিতেন)। তিনি গান্ধিজীর মত নিরীহ অথবা কোমল প্রকৃতির ছিলেন না এবং কাহারও সহিত মতানৈক্য ঘটিলে তাঁহাকে ছাড়িয়া কথা কহিতেন না। তাঁহার প্রকৃতি ছিল প্রভুপ্রিয়। এ জন্ম তিনি একদিকে যেমন অনেকের সশ্রদ্ধ আনুগত্য লাভ করিতেন অত্য়দিকে তীব্র বিরোধিতারও অসম্ভাব ছিল না। তাঁহার সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকা কঠিন। হয় তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে, না হয়, অপছন্দ করিতে হইবে। তাঁহার প্রশস্ত ললাট, দৃঢ়নিবদ্ধ ওষ্ঠদ্বয়, আত্মবিশ্বাসের স্ফোটক চিবুকের সহিত ইতালীর মিউজিয়মে রক্ষিত রোম সম্রাটগণের আবক্ষ মূর্তির আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। ইতালীর অনেক বন্ধু তাঁহার চিত্র দেখিয়া এই সৌসাদৃশ্যের কথা বলিয়াছিলেন। পরিণত বয়সে তাঁহার শুভ্র কেশরাশি, তাঁহার গম্বিত ভাবভঙ্গীর মধ্যে যে অনিন্দিত মহিমার বিকাশ হইত—আধুনিক জগতে তাহা কত বিরল। আমার পিতার প্রতি পক্ষপাত আছে, কিন্তু ক্ষুদ্রতা ও দৌর্বল্যভরা এই জগতে আমি তাঁহার মহত্বের অভাব অনুভব করি। তাঁহার উদার আচরণ, ব্যবহার ও অপূর্ব শক্তিমত্তা আমি চারিদিকে কোথাও খুঁজিয়া পাই না।

আমার মনে আছে, ১৯২৪ সালে যখন স্বাভ্যাদলের সহিত গান্ধিজীর বিরোধ চলিতেছিল তখন পিতার একখানি ফটো তাঁহাকে দেখাই। এই ফটোগ্রাফে পিতার প্রতিকৃতি গুপ্তবজ্জিত ছিল এবং ইতিপূর্বে গান্ধিজী কখনও পিতাকে সেই বিখ্যাত-গুপ্তবহীন অবস্থায় দেখেন নাই। তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া একদৃষ্টিতে প্রতিকৃতিখানা দেখিতে লাগিলেন। গুপ্ত অস্তহিত হওয়ায় মুখমণ্ডল ও চিবুকের মধ্যে একটা কাঠিগা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। গান্ধিজী গুপ্ত হস্তে বসিলেন, এখন বসিতেছি কাহার সহিত আমাকে বাদে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার চক্ষুদ্বয় এবং সদাহাস্ত-প্রফুল্ল রেখায় মুখমণ্ডল হইতে কাঠিগা অস্তহিত হইত। আবার সেই নির্মল চক্ষুদ্বয় কদাচিৎ দীপ্ত হইয়া উঠিত। হৃৎসের নিকট জল যেমন প্রিয়, ব্যবস্থাপরিষদের কার্য্যও তেমন পিতার নিকট হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তাঁহার আইন ও নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষার ফলে সত্যগ্রহ অপেক্ষা এই খেলার কৌশল তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন। তিনি দলের মধ্যে কঠিন শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেন এবং অগাধ দল বা ব্যক্তিকে তাঁহার সমর্থনে প্রবৃত্ত করিতেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি নিজের দলের লোকদের লইয়া বিভ্রত হইয়া

আমার পিতা ও গান্ধীজী

পড়িলেন। স্বরাজ্য দলের সূচনায় পরিবর্তনবিরোধী দলের সহিত বিরোধের ফলে কংগ্রেসের বলবৃদ্ধির জন্ত অনেক অবাক্তিত ব্যক্তিকে স্বরাজ্যদলে গ্রহণ করা হইয়াছিল। তরপর আসিল নির্বাচন ইহার জন্ত অর্থের আবশ্যক এবং তাহা ধনীদেব নিকট হইতে সংগ্রহ করা ছাড়া উপায় নাই। এই সকল ধনীদেব হাতে রাখিবার জন্ত তাঁহাদের কয়েকজনকে স্বরাজ্যদলের প্রাণীকূপে দাঁড় করান হইল। একজন আমেরিকান সোশ্যালিষ্ট বলিয়াছেন (স্মর ষ্ট্রাকোর্ড ক্রিপস্ কর্তৃক উল্লিখিত) যে, রাজনীতি গরীবের নিকট হইতে ভোট এবং ধনীর নিকট হইতে নির্বাচন যুদ্ধে রসদ আদায় করিবার এবং একের আক্রমণ হইতে অপরকে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দিবার এক মোলায়েম কৌশল মাত্র।

ঐ কারণে স্বরাজ্যদলের সূচনাতেই উহার মধ্যে দুর্বলতার বীজ প্রবেশ করিল। ব্যবস্থাপরিষদ ও প্রাদেশিক আইনসভায় কার্য করিতে গিয়া অপরের সহিত এবং নরমপন্থীদের সহিত প্রত্যহই আপোষ করিতে হইত এবং এই অবস্থার মধ্যে অভিযানের দৃঢ়সঙ্কল্প কিম্বা স্থনির্দিষ্ট নীতি বেশী দিন টিকিতে পারে না। ক্রমশঃ শৃঙ্খলা নষ্ট হইতে লাগিল, দলের উগ্রতা কমিয়া আসিল, দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি ও ভাগ্যান্বেষীরা উষ্মেগের কারণ হইয়া উঠিল। “ভিতর হইতে বাধাদান” করিবার উদ্দেশ্য ঘোষণা করিয়া স্বরাজ্যদল আইন সভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ খেলা অপরেও খেলিতে পারে এবং গভর্ণমেণ্ট সুকৌশলে স্বরাজ্যদলের মধ্যে বাধা উপস্থিত ও ভেদ ঘটাইতে লাগিলেন। উচ্চপদ এবং অগ্রাঙ্ক অনেক প্রলোভন দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিদের নিকট উপস্থিত করা হইল। তাহারা উহা হাত বাড়াইয়া অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পারেন। তাহাদের যোগ্যতা, রাজনীতিকোচিত গুণাবলীর এবং মধুর ব্যবহারের প্রশংসা করা হইতে লাগিল। তাহাদের চাবিদ্ধিকে পণাশালা এবং কক্ষক্ষেত্রের ধূলি ও কোলাহলহীন অপূর্ণ আরামের ব্যবস্থা করা হইল।

স্বরাজ্যদলের উচ্চ কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। কেহ কেহ খসিয়া পড়িয়া অস্থির হইতে লাগিল। পিতা চীৎকার করিলেন, ভয় দেখাইয়া “রোগদুষ্ট অজ্ঞচেদনের” কথা বলিলেন। অজ্ঞ যেখানে নিজেই খসিয়া পাইবার জন্ত ব্যগ্র তখন এই ভীতি প্রদর্শন একান্তই বৃথা হইল। কোন কোন স্বরাজ্যী মন্ত্রী হইলেন কেহ বা প্রাদেশিক শাসন পরিষদের সদস্য হইলেন। একদল স্বরাজ্যী স্বতন্ত্র হইয়া নিজেদের “রেসপন্সিভিটি” অর্থাৎ পারম্পরিক সহযোগিতাবাদী বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অবস্থায় এই নামটি প্রথম লোকমান্য

জওহরলাল নেহরু

ভিলক ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন ইহার অর্থ লাড়াইল এই যে, সুযোগ পাইলেই একটি চাকুরী লইয়া তাহার সদ্যবহার করা। অবশ্য এইভাবে কতকংশের দলত্যাগ সঙ্গেও স্বরাজ্যদলের কাজ চলিতে লাগিল। কিন্তু ঘটনার গতি দেখিয়া পিতা এবং দাশ মহাশয় উভয়েই কিঞ্চিৎ বিরক্ত এবং আইনসভায় এই নিষ্ফল শ্রমে ক্লান্ত হইয়া উঠিলেন। ইহার সহিত উত্তর ভারতে ক্রমবর্ধমান হিন্দু-মুসলমান মনোমালিগ্ন এবং তাহা হইতে দাঙ্গা হাঙ্গামার উৎপত্তি তাঁহাদিগকে আরও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করিল।

১৯২১-২২-এ যে সকল কংগ্রেসপন্থী আমাদের সহিত কারাগারে ছিলেন এখন তাঁহারা কেহ বা মন্ত্রী কেহ বা গভর্নমেন্টের বড় চাকুরীয়া। ১৯২১ সালে যে গভর্নমেন্ট আমাদের কার্য্য বে-আইনী বলিয়া আমাদের জেলে পাঠাইয়াছিলেন সেই গভর্নমেন্টেও কতিপয় মডারেট (ইহারাও প্রাচীন কংগ্রেসপন্থী) ছিলেন। ভবিষ্যতে কয়েকটি প্রদেশে হয় ত বা আমাদের সহকর্মীরাই আমাদের বিরোধী ঘোষণা করিয়া কারাগারে পাঠাইবেন। এই সকল নূতন মন্ত্রী এবং শাসন পরিষদের সদস্য মডারেট অপেক্ষাও স্থপটু ও কাঁধাঢ়ক। ইহারা আমাদের ভাল করিয়াই চিনেন এবং আমাদের দুর্বলতা কি এবং কেনন করিয়া তাহার সুযোগ লইতে হয় তাহাও জানেন। তাঁহারা আমাদের কার্য্যপ্রণালীর সহিত স্থপরিচিত, বৃহৎ জনতার মতিগতি এবং জনমত সম্পর্কেও তাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে। নাংসীদের মতই মতপরিবর্তন করিবার পূর্বে ইহারা কিছুকাল বৈপ্লবিক কার্য্যপদ্ধতিতে যোগ দিয়াছেন, এবং তাঁহাদের সেই অভিজ্ঞতার ফলে তাঁহারা অজ্ঞ ও অদূরদর্শী সাধারণ শাসকসম্প্রদায় কিম্বা মডারেট মস্ত্রিগণ অপেক্ষা অধিকতর কুশলতার সহিত কংগ্রেসের পুরাতন সহকর্মীদিগকে দমন করিতে পারেন।

(১৯২৪-এর ডিসেম্বর মাসে গান্ধিজীর সভাপতিত্বে বেলগাম-এ কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। তিনি বহুবর্ষ যাবৎ কার্য্যতঃ কংগ্রেসের স্থায়ী মহা-সভাপতি হইয়াই আছেন। অতএব তাঁহার পক্ষে সভাপতির অভিভাষণ আমার মোটেই ভাল লাগিল না, উহার মধ্যে প্রেরণা পাইবার মত কিছুই ছিল না। অধিবেশনের শেষে আমি পুনরায় গান্ধিজীর নির্দেশে আগামী বৎসরের জ্ঞান নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যকরী সম্পাদক নির্বাচিত হইলাম। আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি ক্রমশঃ কংগ্রেসের স্থায়ী সম্পাদক হইয়া উঠিলাম।)

১৯২৫-এর গ্রীষ্মকালে ইপানী রোগ বৃদ্ধি হওয়ায় পিতা অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তিনি পরিবারবর্গসহ হিমালয়ের ডালহৌসী পর্বতে চলিয়া

উদ্দাম সাম্প্রদায়িকতা

গেলেন, আমি কয়েকদিন পর যাইয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলাম। এই সময়ে আমরা ডালহৌসী হইতে হিমালয়ের গভীর গহনে চম্বায় ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। পার্বত্য পথভ্রমণে শ্রান্ত হইয়া আমরা যখন সেখানে উপস্থিত হইলাম, (জুন মাস) তখনই তারে চিত্তব্রঞ্জন দাশের মৃত্যু সংবাদ আসিল। পিতা শোকে মুহমান হইয়া দীর্ঘকাল মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার নিকট ইহা এক নিষ্ঠুর আঘাত। আমি কদাচিৎ তাঁহাকে এত অধীর হইতে দেখিয়াছি। তাঁহার একমাত্র ঘনিষ্ঠ ও প্রিয়তম সহকর্মী সমস্ত দায়িত্ব তাঁহার স্বন্ধে নিক্ষেপ করিয়া সহসা চলিয়া গেলেন। বোঝা ক্রমেই ভারি হইয়া উঠিতেছিল, দলের দৌর্ভাগ্য বাড়িতেছিল। তিনি এবং দেশবন্ধু উভয়েই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ফরিদপুর প্রাদেশিক সম্মেলনে দেশবন্ধুর সর্বশেষ বক্তৃতায় এই ক্লাস্তি পরিস্ফুট হইয়াছিল।

আমরা পরদিন প্রভাতে চম্বা ত্যাগ করিয়া ডালহৌসী পশ্চাতে ফেলিয়া মোটর যোগে পার্বত্য পথ দিয়া দূরবর্তী রেলষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। সেগান হইতে এলাহাবাদ হইয়া কলিকাতায় যাত্রা করিলাম।

১৯

উদ্দাম সাম্প্রদায়িকতা

(নাভা জেল হইতে ফিরিবার পর আমার পীড়া এবং টাইফয়েড রোগের সহিত যুদ্ধ আমার জীবনে এক নূতন অভিজ্ঞতা।) জ্বর রোগে অথবা শারীরিক দুর্বলতার জ্ঞান বিছানায় শুইয়া থাকিতে আমি অনভ্যস্ত। আমার স্বাস্থ্যের জ্ঞান আমি গর্ভবোধ করিয়া থাকি। আমাদের দেশে সাধারণতঃ শরীরটা ভাল নয়, বলিবার বা ভাবিবার যে ফাসান দেখা যায় আমি বরাবর তাহার প্রতিবাদ করিয়া থাকি। আমার যৌবন এবং সুগঠিত দেহের জ্ঞান এ যাত্রা পরিত্যাগ পাইলাম। দুর্বল দেহে বিছানায় শুইয়া আমি ক্রমশঃ স্বাস্থ্যলাভ করিতে লাগিলাম। এই কালে দৈনন্দিন কাজ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে নিকৃতি লাভ করিয়া দূর হইতে সমস্ত বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমার মন পূর্বাপেক্ষা শান্ত হইল এবং আমি সকল বিষয় অধিকতর স্পষ্টভাবে দেখিতে ও বুঝিতে লাগিলাম। সম্ভবতঃ কঠিন

পীড়ায় সকলেরই অল্পবিস্তর এই শ্রেণীর অহুভূতি হইয়া থাকে ; কিন্তু আমার ইহা এক আধ্যাত্মিক অহুভূতির মত মনে হইল। এই শব্দটি আমি কোন সঙ্গীর্ণ ধর্মসম্পর্কিত অর্থে ব্যবহার করিতেছি না। ^{১২ম}আমাদের রাজনীতির ভাবুকতার স্তরের উর্দ্ধে উঠিয়া আমি পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী, যাহা ঘারা এতকাল রাষ্ট্রক্ষেত্রে চালিত হইয়াছি, তাহা যেন স্পষ্টতররূপে দেখিতে পাইলাম। এই স্পষ্টতার মধ্যে নূতন প্রশ্ন উঠিল কিন্তু আমি কোন সন্তুস্তর পাইলাম না। জীবন এবং রাজনীতিকে ধর্মের দিক হইতে দেখিবার ভাব আমার মন হইতে ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইল। এই অভিজ্ঞতার বিষয় অধিক লেখা আমার পক্ষে অসাধ্য। এই অহুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা সহজ নহে। তাহার পর এগার বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, এখন আমার মনে ইহা অস্পষ্ট স্মৃতি মাত্রে পর্য্যবসিত ; কিন্তু ইহা আমার উত্তমরূপে স্মরণ আছে যে, ইহার ফলে আমার চিন্তাধারা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়াছিল। তাহার পর দুই বৎসর বা ততোধিক কাল আমি একরূপ অনাসক্ত ভাবে কার্য্য করিয়াছি।

অবশ্য আমার আয়ত্তের বাহিরে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছিল এবং যাহার সহিত আমি নিজের সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারিতেছিলাম না তাহাও কিয়ৎপরিমাণে আমার মানসিক পরিবর্তনে সহায়তা করিয়াছিল। কতকগুলি রাজনৈতিক পরিবর্তনের কথা আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু তদপেক্ষা বহুগুণে গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। বিশেষতঃ উত্তর ভারতের কয়েকটি নগরে অতি নৃশংস পাশবিক নিষ্ঠুরতার সহিত দাঙ্গা হাঙ্গামা ঘটিল। ক্রোধ ও অবিশ্বাসের আবহাওয়ায় কলহের এমন সব নূতন কারণ দেখা দিল, যাহা ইতিপূর্বে আমরা কখনও শুনি নাই। ইতিপূর্বে গোহত্যা লইয়া বিশেষতঃ বকুরীদের দিন হাঙ্গামা ও মনকষাকষি হইত। যদি হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের পক্ষ উৎসব একই দিনে হইত তাহা হইলেও কলহ হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ মহরম ও রামলীলার কথা উল্লেখ করা ন্যূন হইতে পারে। মহরম শোকাবহ ব্যাপার। ইহার মিছিল গম্ভীর, অশ্রু ও বিষাদ-উদ্দীপক, পক্ষান্তরে রামলীলা আনন্দের উৎসব, অজ্ঞায়ের উপর সত্যের জয় ঘোষণা। এই দুইটি পরস্পর বিরোধী—তবে সৌভাগ্যক্রমে দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পূর্বে এই দুই উৎসব এক সময় অহুষ্ঠিত হয়। রামলীলা সৌর মাস হিসাবে গণিত হয় বলিয়া প্রতি বৎসর একই সময় অহুষ্ঠিত হয়, মহরম চান্দ্র মাস হিসাবে গণিত হয় বলিয়া প্রতিবৎসরই সময়ের পরিবর্তন হয়।

কিন্তু কলহের যে নূতন কারণ উপস্থিত হইল তাহা নিত্য-নৈমিত্তিক

উদ্ধাম সাম্প্রদায়িকতা

সচরাচর ঘটনা। ইহা মসজিদের সম্মুখে বাস্তব সমস্যা। মুসলমানেরা আপত্তি করিতে লাগিলেন যে বাস্তব এবং যে কোন গোলমালে মসজিদে প্রার্থনা করিবার ব্যাঘাত হয়। প্রত্যেক বৃহৎ সহরেই কতকগুলি করিয়া মসজিদ আছে। এখানে পাঁচ বার করিয়া উপাসনা হয় এবং বিবাহ ও শবযাত্রাসহ নানাবিধ গোলমালের অভাব নাই, কাজেই কলহের সম্ভাবনা পদে পদে। বিশেষভাবে মসজিদে সাক্ষা উপাসনার সময় শোভাযাত্রা ও গোলমালের বিরুদ্ধে আপত্তি করা হইতে লাগিল। কিন্তু এই সময় হিন্দু মন্দিরে সন্ধ্যারতির কাসর-ঘণ্টা বাজিয়া ওঠে। কাজেই আরতি-নামাজ সমগ্রাই বড় হইয়া উঠিল।

যাহা পরস্পরের প্রতি হ্রবিবেচনা এবং মনোভাব লক্ষ্য করিয়া একটু অদলবদল করিয়া লইলেই মীমাংসা হইতে পারিত, তাহাই তীব্র কলহে পরিণত হইয়া দাঙ্গা হাঙ্গামার কারণ হইল ইহা আশ্চর্য্য মনে হইতে পারে। কিন্তু ধর্মোন্নয়নতা কখনও যুক্তি, হ্রবিবেচনা এবং আপোষের ধার ধারে না। এবং যখন তৃতীয় পক্ষ এক পক্ষকে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে উদ্ধাইয়া দিবার জন্য উপস্থিত থাকে, তখন ত কথাই নাই।

উত্তর ভারতের কয়েকটি নগরে অচ্যুত এই দাঙ্গাহাঙ্গামাগুলির কারণ অনেকে বড় করিয়া দেখিতে পারেন। অধিকাংশ সহর বন্দর এবং সমগ্র পঞ্জী-ভারত শান্তই ছিল এবং এই সকল ঘটনায় উত্তেজিত হয় নাই। তবে সংবাদপত্রে অতি সামান্য সাম্প্রদায়িক অশান্তির সংবাদও বিশেষ প্রাধান্য দিয়া প্রকাশ করা হইত। সহরবাসীদের মধ্যেই যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ও তিক্ততা বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, একথা নিঃসন্দেহ। সাম্প্রদায়িক নেতারা পুরোভাগে আসিয়া ইহাকে অধিকতর বাড়াইয়া তুলিলেন এবং সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দাবীগুলির মধ্যে ইহার প্রতিচ্ছায়া ফুটিয়া উঠিল। যে সকল রাষ্ট্রীয় প্রগতিবিরোধী মুসলমান অসহযোগ আন্দোলনে পিছনে পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা সাম্প্রদায়িক বিরোধের স্বযোগে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের পৃষ্ঠপোষকতায় আবার প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। জাতীয় ঐক্য এবং ভারতের স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া ইহারা নিতানূতন অসম্ভব সাম্প্রদায়িক দাবী উপস্থিত করিতে লাগিলেন। হিন্দুদের পক্ষেও রাজনৈতিক প্রগতিবিরোধীরা আসিয়া প্রধান প্রধান নেতা সাজিলেন এবং হিন্দুস্বার্থরক্ষার নামে গভর্নমেন্টের হাতে খেলার পুতুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের কোন আশাই সফল হইল না এবং বস্তুতঃ হইতেও পারে না। তাঁহাদের অবলম্বিত উপায়ে তাঁহারা তাঁহাদের একটি দাবীও গভর্নমেন্টের নিকট আদায় করিতে পারেন নাই। তাঁহারা কেবল দেশের সাম্প্রদায়িক মনোভাব বৃদ্ধি করিতে কৃতকার্য্য হইলেন।

কংগ্রেস বিপাকে পড়িল। জাতীয় ভাবের প্রতিনিধি এবং জাতীয় আদর্শ সম্বন্ধে সচেতন কংগ্রেস স্বভাবতঃ এই সাম্প্রদায়িকতার প্রাবল্যে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। জাতীয়তার আবরণে অনেক কংগ্রেসপন্থী আসলে ছিলেন সাম্প্রদায়িকতাবাদী। কিন্তু মোটের উপর কংগ্রেসনেতারা অটল রহিলেন, কোন সাম্প্রদায়িক দলের পক্ষাবলম্বন করিলেন না। এই সময় শিখ এবং অগ্রাগ্রা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের পক্ষ হইতে বিশেষ দাবী ঘোষিত হইতে লাগিল। ইহার ফলে উভয় পক্ষের চরম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা কংগ্রেসকে অভিশাপ দিতে লাগিলেন।) বহুপূর্বে, এমন কি অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইবারও কিছুদিন পূর্বে গান্ধিজী সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসার জগু তাঁহার নিজের সূত্রগুলি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উদারতা ও সদিচ্ছার উপরেই সমাধান নির্ভর করে। এজন্য মুসলমানদের সর্ববিধ দাবী স্বীকার করিয়া লইতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তিনি তাহাদের চিন্তন করিতে চাহিয়াছিলেন, দর কষাকষি করিবার মনোভাব তাহাতে ছিল না। দূরদর্শিতা এবং বস্তুর প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে সত্য ধারণা লইয়া তিনি বাস্তব দৃষ্টিতে ইহার মীমাংসা চাহিয়াছেন। কিন্তু এমন অনেকে ছিলেন যাহারা কোন বস্তুর প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা বাজার দরের বিষয়েই বেশী জানিতেন এবং কেনাবেচার পদ্ধতি পরিত্যাগে অনিচ্ছুক ছিলেন। বস্তুর প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা কি মূল্য দিতে হইতেছে সেই সম্পর্কেই তাঁহার বেশী সচেতন।

অপরকে দোষ দেওয়া ও সমালোচনা করা সহজ। কাহারও উদ্দেশ্যের ব্যর্থতার একটা কৈফিয়ৎ আবিষ্কার করিবার লোভ সংবরণ করা কঠিন। ব্যর্থতার জগু অপরের বাধাই দায়ী—না নিজেদের চিন্তা ও কাণ্ডের ভুলই দায়ী? আমরা গভর্নমেন্টকে দোষ দিয়াছি। সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের দোষ দিয়াছি, অবশেষে কংগ্রেসকেও নিন্দা করিয়াছি। অবশ্য বাধা পাইয়াছি, গভর্নমেন্ট এবং তাহার সমর্থকেরা ইচ্ছা করিয়াই অবিরত বাধা দিয়াছেন। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট অতীতে এবং বর্তমানে আমাদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। বিভক্ত করিয়া শাসন করা সকল সাম্রাজ্যেরই নীতি এবং এই নীতির সাফল্যই বিজিতের উপর তাহাদের শ্রেষ্ঠতার নিদর্শন। ইহার বিরুদ্ধে আমরা অভিযোগ করিতে পারি না, অন্ততঃ ইহাতে আশ্চর্য্য হওয়া উচিত নহে। ইহাকে অবজ্ঞা করিয়া এতৎসম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন না করা চিন্তার ক্রটি মাত্র।

(কি উপায়ে ইহাকে আমরা প্রতিরোধ করিতে পারি? দর কষাকষি করিয়া বাজার-চলন কৌশলে নিশ্চয়ই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। কেননা আমরা যত বেশী দিতে চাহি না কেন, তৃতীয় পক্ষ সর্বদাই তাহার

উজ্জ্বল সাম্প্রদায়িকতা

বেশী দিতে চাহিবে এবং তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি মত কার্যও করিতে পারেন।) যদি জাতীয় ও সামাজিক স্বার্থ সম্বন্ধে সাধারণ দৃষ্টি-ভঙ্গিমা না থাকে, তাহা হইলে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে এক যোগে কার্য করা সম্ভব নয়। যদি আমরা বর্তমান প্রচলিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলিকে মানিয়া লইয়া এখানে ওখানে এক আধটু সংস্কার চাহি এবং উচ্চ চাকুরীগুলিতে অধিকসংখ্যক ভারতবাসী নিয়োগ করিতে চাহি, তাহা হইলে আমরা একাবন্ধ কোন কার্য করিবার প্রেরণাই পাইব না। কেননা উহার উদ্দেশ্য হইবে, যাহা চাহিয়া চিন্তিয়া পাওয়া গেল, তাহা ভাগ বাটোয়ারা করিয়া লওয়া। এক্ষেত্রে প্রবল প্রভুত্বের গরিমায় প্রতিষ্ঠিত তৃতীয় পক্ষই উহা নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং তাহাদের মনোমত অনুগ্রহভাজনদিগের মধ্যেই পুরস্কার বিতরণ করিবে।) (অতএব স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ব্যবস্থা, এমনকি, বর্তমান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক সামাজিক ব্যবস্থার পরিকল্পনার উপরই আমরা সম্মিলিত কার্যপদ্ধতির দৃঢ় ভিত্তি রচনা করিতে পারি। এই পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত দাবী হইল পূর্ণ স্বাধীনতা। ইহার দ্বারা জনসাধারণকে বুঝাইতে হইবে যে, বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটা ভারতীয় সংস্করণ (যাহার মূলে থাকিবে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব) অর্থাৎ ডোমিনিয়ন স্টেটস্ বলিতে যাহা বুঝায় তাহা আমরা চাহিতেছি না, ইহা হইতে স্বতন্ত্র এবং সম্পূর্ণ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গড়িবার জগুই আমাদের অভিধান। পূর্ণ স্বাধীনতা অর্থে অবশ্যই কেবল রাজনৈতিক মুক্তি বুঝায়, ইহাতে সামাজিক পরিবর্তন বা জনসাধারণের অর্থনৈতিক মুক্তি বুঝায় না।) তবে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্থে লণ্ডন সহরের সহিত আমরা যে আর্থিক ও অর্থনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ আছি তাহার অপসারণ বুঝায়, এবং এ বন্ধন অপসারিত হইলে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তন করা আমাদের পক্ষে সহজসাধ্য হইবে। তখন আমার চিন্তা প্রণালী এইরূপ ছিল। অবশ্য এখনও আমি মনে করি না যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিছক রাষ্ট্রীয় মুক্তিই আনিবে। ইহার সহিত সামাজিক স্বাধীনতাও আসিবে। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ নেতাই বর্তমানের সঙ্গীর্ণ বিধিবদ্ধ রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই তাঁহাদের চিন্তা সীমাবদ্ধ রাখিলেন। এবং এই ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াই তাঁহারা সাম্প্রদায়িক ও নিয়মতান্ত্রিক প্রত্যেকটি সমস্যা সমাধান করিতে চেষ্টা করিলেন। ইহার অবশ্যজ্ঞাবী ফল এই হইল যে, বর্তমান ব্যবস্থা যাহাদের করায়ত্ত, তাঁহারা সেই ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের হাতে গিয়া পড়িলেন। ইহা ছাড়া তাঁহাদের অন্তরূপ করিবার উপায়ও ছিল না। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক আন্দোলনে যোগ দিলেন। কিন্তু ইহাদের সাধারণ

দৃষ্টিভঙ্গী সংস্কারমূলক, বৈপ্লবিক নহে। সংস্কারমূলক পদ্ধতির দ্বারা ভারতের রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সমস্যাগুলি সমাধানের দিন বহুকাল অতীত হইয়াছে। বর্তমান অবস্থায় বৈপ্লবিক দৃষ্টি-ভঙ্গী লইয়া আমূল পরিবর্তনমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ ব্যতীত গত্যন্তর নাই। কিন্তু এমন নেতা কোথায় যিনি এ ভিত্তিতে দাঁড়াইতে পারেন ?)

(আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের অস্পষ্টতাই সাম্প্রদায়িকতা প্রচারে সহায়তা করিয়াছে। স্বরাজের জন্ত সংঘর্ষের সহিত দৈনন্দিন জীবনের কোন স্পষ্ট সম্বন্ধ জনসাধারণ দেখিতে পায় নাই। তাহারা সহজাত বুদ্ধি লইয়া সংগ্রামে যোগ দিয়াছে কিন্তু তাহাদের হাতের অস্ত্র ছিল দুর্বল এবং উহা অপর প্রয়োজনে নিয়োগ করা বিশেষ কঠিন নহে। প্রতিক্রিয়ার সময় জনসাধারণের এই অজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করা অত্যন্ত সহজসাধ্য ছিল। সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ধর্মের নামে ইহা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ত প্রয়োগ করিয়াছে।) যে সকল দাবী বা কার্যপদ্ধতির সহিত জনসাধারণের, এমনকি, নিম্নমধ্যশ্রেণীর স্বার্থের কোন যোগ নাই, হিন্দু মুসলমান উভয়শ্রেণীর বুজ্জিয়াদল ধর্মের পবিত্র নাম লইয়া ঐ সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ত জনসাধারণের সমর্থন লাভ করিয়াছিল, ইহা এক পরমাস্ত্রাঘটনা। যে কোন সাম্প্রদায়িক দল হইতে যে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক দাবী করা হইয়াছে, সেগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, উহা কেবল চাকুরীর দাবীমাত্র এবং এই চাকুরীগুলি মুষ্টিমেয় উচ্চমধ্যশ্রেণী ছাড়া আর কাহারও ভাগ্যে জুটিতে পারে না। অবশ্য আইনসভাগুলিতে বিশেষ ও অতিরিক্ত আসনের দাবীও ছিল। এই দাবীর মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা অপেক্ষা সাম্প্রদায়িক ভাবে চাকুরী বণ্টনের ক্ষমতা লাভের প্রতিই আগ্রহ ছিল বেশী। (উচ্চ মধ্যশ্রেণীর মুষ্টিমেয় ব্যক্তির লাভের জন্ত জাতীয় ঐক্য ও উন্নতির বিলম্বরূপ এই সকল সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক দাবীকে অত্যন্ত চতুরতার সহিত বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের জনসাধারণের দাবীরূপে প্রকাশ করা হইল। উহার নিফলতা ঢাকিবার জন্ত ধর্মপ্রাণকে আবরণ স্বরূপ ব্যবহার করা হইল।)

(এইরূপে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াপন্থীরা সাম্প্রদায়িক নেতার ছদ্মবেশে রাষ্ট্রক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলেন এবং তাহাদের কার্যপ্রণালীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব অপেক্ষা রাজনৈতিক উন্নতিতে বাধা দিবার আগ্রহই ছিল, অধিকতর প্রবল। রাজনৈতিক ব্যাপারে আমরা বাধা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম কিন্তু এই বিরক্তিকর অবস্থার মধ্যে তাহারা যে কি পর্যন্ত

উদ্ধাম সাম্প্রদায়িকতা

যাইতে পারেন সে দৃশ্য অত্যন্ত ক্লেশজনক। মুসলমান সাম্প্রদায়িক নেতারা অতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কথা বলিতে লাগিলেন। মনে হইতে লাগিল ভারতের জাতীয়তা বা স্বাধীনতার জন্ত তাঁহাদের কোন মাথাব্যথা নাই। হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতারা সর্বদা জাতীয়তার বুলি মুখে আওড়াইলেও কার্যক্ষেত্রে তাঁহাদের অগম্যতাই পরিস্ফুট হইতে লাগিল। তাঁহারা গভর্ণমেন্টের দরজায় ধরণা দিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাও কোন কাজে আসিল না। কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক অথবা অল্পরূপ কোন “উচ্ছেদমূলক” আন্দোলনের নিন্দা করিতে উভয় দলই একমত, এবং কায়েমী স্বার্থের কোন ক্ষতি হয় এমন প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতে এই দুইদলের ঐক্য অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী।) মুসলমান সাম্প্রদায়িক নেতারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ক্ষতিজনক অনেক কিছুই করিয়াছেন ও বলিয়াছেন; কিন্তু দল ও ব্যক্তি হিসাবে তাঁহারা গভর্ণমেন্ট ও জনসাধারণের সম্মুখে মর্য্যাদার সহিত ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতাদের সম্বন্ধে একথা বলা চলে না।

কংগ্রেসের মধ্যে বহু মুসলমান আছেন। ইহাদের সংখ্যা কম নহে। ইহার মধ্যে অনেকে যোগ্য ব্যক্তি এবং কয়েকজন খ্যাতনামা ও জনপ্রিয় মুসলমান নেতাও রহিয়াছেন। কংগ্রেসী মুসলমানদের মধ্যে অনেকে “জাতীয়তাবাদী মুসলমান দল” রূপে সজ্জবদ্ধ হইয়া সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানদের বিরোধিতা করিয়াছেন। আরম্ভে তাঁহারা কিছু সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন এবং শিক্ষিত মুসলমানদের অধিকাংশই তাঁহাদের পক্ষে এরূপ অনুমিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহারা সকলেই উচ্চ মধ্যশ্রেণীর এবং তাঁহাদের মধ্যে কাহারও শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব ছিল না। তাঁহারা কেহ বা বৃত্তিজীবী কেহ বা ব্যবসায়ী—জনসাধারণের সহিত সংযোগহীন। তাঁহারা সাধারণের মধ্যে কখনও প্রচারকার্য্যও করিতেন না। তাঁহারা বৈঠকী সভাসমিতিতে নিজেদের মধ্যে চুক্তি ইত্যাদি করিতেন। কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দী সাম্প্রদায়িক নেতারা অধিকতর নিপুণ ছিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহারা জাতীয়তাবাদী নেতাদিগকে একস্থান হইতে হানান্তরে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন! এবং ক্রমে একের পর আর তাঁহাদের প্রত্যেকটি নীতিই পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন। জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা বার বার পিছু না হটিয়া “কম অনিষ্টকর” এই নীতি লইয়া দৃঢ়পদে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু প্রতিবারই তাঁহাদিগকে আর একটু পশ্চাতে হটিয়া অল্প একটি “কম অনিষ্টকর” বাছিয়া লইতে হইয়াছে। তারপর এমন সময় আসিল যখন তাঁহাদের নিজের বলিতে আর কিছু

রহিল না এবং যুক্ত-নির্বাচন ব্যতীত ধরিয়া থাকিবার মত আর কোন মূলনীতি রহিল না। কিন্তু আবার সেই “কম অনিষ্টকর” নীতি গ্রহণ করিবার দুর্ভাগ্য তাঁহাদের সম্মুখে দেখা দিল এবং তাঁহারা সর্বশেষ আশ্রয়টিও পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। তাঁহারা দল গঠন করিবার সময় তাঁহাদের পতাকায় গর্বভরে যে সকল নীতি ও কার্যক্রম লিখিয়া দিয়াছিলেন, সমস্তই মুছিয়া গেল, তাঁহারা কেবল নামে মাত্র জীবিত রহিলেন।

জাতীয় মুন্নিম্ দল হিসাবে তাঁহাদের পতন ও বিলোপ ঘটিলেও অবশ্য ব্যক্তিগত ভাবে অনেকেই কংগ্রেসের প্রধান নেতৃপদে রহিয়াছেন। ইহা এক সুদীর্ঘ শোচনীয় ইতিহাস। ইহার সর্বশেষ অধ্যায় মাত্র এই বৎসর (১৯৩৪) লিখিত হইয়াছে। ১৯২৩ হইতেই পর পর কয়েক বৎসর তাঁহারা শক্তিশালী দল ছিলেন এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাঁহাদের মনোভাব বিরূপ ছিল। এমন কি কয়েকটি ঘটনায় যখন গান্ধিজী অনিচ্ছাসত্ত্বেও সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের কোন কোন দাবী মানিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সহকর্মী জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরাই তীব্র বিরোধিতা করিয়া উহাতে বাধা দিয়াছেন।

(বিংশ দশকের মধ্যভাগে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানকল্পে আলাপ আলোচনার জন্ত কতকগুলি “ট্র্যাক সম্মেলন” আহূত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ১৯২৪ সালে তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি মোলানা মহম্মদ আলী কর্তৃক আহূত সম্মেলনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।) দিল্লীতে গান্ধিজী যখন একুশ দিন উপবাসব্রত পালন করিতেছিলেন সেই সময় ইহার অধিবেশন হয়। এই সকল সম্মেলনে অনেকে সদিচ্ছা ও ঐকান্তিক আগ্রহ লইয়া যোগ দিয়াছিলেন এবং আপোষ-রক্ষার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কতকগুলি সাধু ও উত্তম প্রস্তাব পাস ব্যতীত মূল সমস্যার কোন সমাধান হয় নাই। এই শ্রেণীর সম্মেলনে এক মত ব্যতীত অধিকাংশ ভোটে কোন মীমাংসা হওয়া কঠিন এবং প্রত্যেক সম্মেলনেই বিভিন্ন দলের এমন কতকগুলি ব্যক্তি উপস্থিত থাকিতেন যাঁহাদের ধারণা তাঁহাদের মত সম্পূর্ণ গ্রহণ করাই সমস্যার সমাধান। কতিপয় বিখ্যাত সাম্প্রদায়িকতাবাদীর আদৌ সমাধানের ইচ্ছা ছিল কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নিশ্চয়ই রহিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রগতিবিরোধী এবং যাঁহারা রাষ্ট্রক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনকামী তাঁহাদের সহিত উহাদের কোন সাধারণ মিলনভূমি ছিল না।

উদ্ধার সাম্প্রদায়িকতা

ব্যক্তিবিশেষের পিছাইয়া পড়া অপেক্ষাও প্রকৃত বিয়ের কারণ আরও গভীর ছিল। এই সময় শিখেরা তাহাদের সাম্প্রদায়িক দাবী উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিতে লাগিলেন। এবং তাহার ফলে পঞ্জাবে এক জটিল ত্রিধাবিভক্ত সমস্তার উদ্ভব হইল। সাম্প্রদায়িকতার কেন্দ্রভূমি হইল পঞ্জাব। পরম্পরের বিরুদ্ধে ভীতি আক্রোশ এবং ভ্রান্ত ধারণা এইখানেই সর্বাধিক প্রবল হইল। অত্যাচার প্রদেশে কৃষক সমস্তা—বাক্সলায় হিন্দু জমিদার এবং মুসলমান প্রজার সমস্তা, সাম্প্রদায়িকতার ছন্নবেশে দেখা দিল। পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশে মহাজন ও ধনী শ্রেণীর সাধারণতঃ হিন্দু, এবং খাতকের দল অধিকাংশই মুসলমান চাষী। সুদ-লোভী মহাজনের উপর দায়িকের সমস্ত আক্রোশ সাম্প্রদায়িকতার শক্তিই বৃদ্ধি করিতে লাগিল। সচরাচর মুসলমানেরা দরিদ্রতর সম্প্রদায় এবং মুসলমান সাম্প্রদায়িক নেতারা সর্বস্বত্বারাদের চিন্তে ধনীদের প্রতি যে বিরোধ থাকে, সেই মনোবৃত্তিকে সাম্প্রদায়িক উদ্বেগ সিক্তির কার্যে লাগাইল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, তাহাদের প্রস্তাবে সর্বস্বত্বারাদের উন্নতিসাধনের জন্য কোন কার্য তালিকা ছিল না। অথচ ইহার বলেই সাম্প্রদায়িক মুসলমান নেতারা কিয়ৎ পরিমাণে জনসাধারণের প্রতিনিধি হইয়া কিছু শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতারা—অর্থনৈতিক দিক হইতে দেখিতে গেলে—ধনী ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। তাহারা হিন্দু জনসাধারণের সাময়িক সহায়ভূতি পাইলেও কদাচিৎ তাহাদের সমর্থন লাভ করিয়াছেন। অতএব সমস্তা কিয়ৎপরিমাণে অর্থনৈতিক স্তরভেদের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল, যদিও দুর্ভাগ্যক্রমে ইহা হিসাব করা হয় নাই। ক্রমে ইহা অর্থনৈতিক শ্রেণীগত বিরোধের রূপ গ্রহণ করিতে পারে, যদি সে সময় আসে, তাহা হইলে অদ্যকার সকল দলের উচ্চ শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক নেতারা নিজেদের মতভেদ মিটাইয়া লইয়া সম্ভবত্বভাবে একই শ্রেণী স্বার্থের শত্রুদের সম্মুখীন হইবে। এমনকি বর্তমান অবস্থার মধ্যেও একটা রাজনৈতিক সমাধান খুব বেশী কঠিন নহে। কিন্তু যদি—এবং ইহা একটি স্পষ্টত্ব যদি—তৃতীয় পক্ষ উপস্থিত না থাকিত!

(১৯২৪-এর দিল্লীর সম্মেলন শেষ হইতে না হইতেই এলাহাবাদে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধিল। হতাহতের দিক দিয়া এই দাঙ্গা অন্তান্তগুলির তুলনায় এমন কিছু বড় নহে, তথাপি নিজের ঘরে এই দৃশ্য দেখা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমি দিল্লী হইতে অতি দ্রুত এলাহাবাদে ফিরিয়া আসিয়া দেখি হাঙ্গামা শেষ হইয়াছে; কিন্তু উভয় পক্ষের বিষেষ এবং অন্তঃকালনের মামলায় দীর্ঘকাল ধরিয়া উহার জের চলিল। কি উপলক্ষে দাঙ্গা বাধিল আমি

জগদ্বরলাল নেহরু

তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। সেই বৎসর অথবা তাহার পরে এলাহাবাদে রামলীলা উৎসব ও শোভাযাত্রা লইয়া গগুগোল বাধিয়াছিল। রামলীলা উৎসবে সাধারণতঃ বহু বৃহৎ শোভাযাত্রা বাহির হইয়া থাকে কিন্তু মসজিদের সম্মুখে বাদ্য বাজান সম্পর্কিত বিধিনিষেধের প্রতিবাদস্বরূপ উহা পরিত্যক্ত হইল। প্রায় আট বৎসর কাল এলাহাবাদে রামলীলা উৎসব হয় না। বৎসরের মধ্যে এই সর্বপ্রধান উৎসবে এলাহাবাদ জিলার লক্ষ লক্ষ নরনারীর আনন্দ সম্মেলন হইত—আজ তাহা এক বেদনাময় স্মৃতিতে পর্য্যবসিত। আমার শৈশবের রামলীলা উৎসবের স্মৃতি মনে আছে। কত উৎসাহ উদ্দীপনাই না হইত! অগ্গাণ্ড জিলা ও বিভিন্ন সহর হইতে দলে দলে লোক ইহা দেখিতে আসিত। ইহা হিন্দুদের হইলেও অপরের যোগ দিবার কোন বাধা ছিল না এবং মুসলমানেরাও দলে দলে আসিয়া জনতা বৃদ্ধি করিত; সর্বত্র আনন্দ ও উৎসবের কলহাস্ত্রে মুখরিত হইত, কেনাবেচার ধুম পড়িত। বহুবৎসর পরে বড় হইয়া রামলীলার শোভাযাত্রা দেখিয়াছি কিন্তু পূর্বের উৎসাহ বোধ করি নাই এবং শোভাযাত্রার সং ও সাজান চোঁকি প্রভৃতি দেখিয়া বিরক্তিই বোধ করিয়াছি। আমার কারু-শিল্পরুচি এবং আনন্দ উপভোগের স্তর অনেক উচ্চে উঠিয়া গিয়াছে। তবুও বৃহৎ জনতার আনন্দ উৎসাহ আমি উপভোগ করিয়াছি। তাহাদের নিকট ইহা উৎসবের আনন্দময় অবকাশ। আজ আট নয় বৎসরকাল, বয়স্কদের ত কথাই নাই, এলাহাবাদের বালক বালিকারা পর্য্যাপ্ত দৈনন্দিন জীবনের বিরস একঘেয়েমির মধ্যে একটি দিবসের আনন্দময় উত্তেজনা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। ইহার কারণ অতি সামান্য মতভেদ এবং কলহ। ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মবুদ্ধিকে ইহার জন্ত নিশ্চয়ই জবাবদিহি করিতে হইবে। ইহার আনন্দকে কি ভাবে বিনষ্ট করিতেছে!

মিউনিসিপালিটির কাজ

প্রায় দুই বৎসর এলাহাবাদ মিউনিসিপালিটির কাজ আমি চালাইয়াছি। কিন্তু কাছের মন বসিত না। তিন বৎসরের জন্ত আমি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়াছিলাম। দ্বিতীয় বৎসর আরম্ভ হইবার পর হইতেই আমি নিষ্কৃতির পথ খুঁজিতে লাগিলাম। কাজটা আমার ভাল লাগিয়াছিল এবং ইহাতে অনেক সময় ব্যয় করিতাম।) সহকর্মীদের সদিচ্ছায় কিছু সাফল্যও আমি লাভ করিয়াছিলাম। এমনকি প্রাদেশিক গভর্নমেন্টও আমার প্রতি রাজনৈতিক বিরক্তি সত্ত্বেও মিউনিসিপালিটি-সংক্রান্ত কতকগুলি কাজে আমার প্রশংসা করিয়াছিলেন। (তথাপি আমি বুঝিতে পারিলাম, খাটি ভাল কাজ করিবার পথে অনেক বাধা বিদ্যমান।

কোন ব্যক্তিবিশেষ যে ইচ্ছা করিয়া বাধা দিতেন এরূপ নহে এবং আমি সকলের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত সহযোগিতাই পাইয়াছি। কিন্তু একদিকে ছিল গভর্নমেন্টের শাসনযন্ত্র, অন্যদিকে মিউনিসিপালিটির সদস্যগণ এবং জনসাধারণের ঔদাস্য। গভর্নমেন্ট কর্তৃক নিষ্পত্তি মিউনিসিপাল শাসন-যন্ত্রের বাধন কষণ এত শক্ত যে, তাহার মধ্যে নূতন কিছু করা কিম্বা কোনদিকে আমূল পরিবর্তন করা অসম্ভব। মিউনিসিপালিটির অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে গভর্নমেন্টের উপর নির্ভরশীল। প্রচলিত মিউনিসিপাল আইনের ট্যাক্স ধার্যের কোন অভিনব পরিবর্তন অথবা জনহিতকর কার্য করার উপায় ছিল না। যে সকল পরিকল্পনা সম্পূর্ণ আইনসম্মত, তাহাও গভর্নমেন্টের মঞ্জুরীর অপেক্ষা রাখে এবং একমাত্র অতিরিক্ত আশাবাদী এই শ্রেণীর মঞ্জুরী আশা করিয়া বৎসরের পর বৎসর অপেক্ষা করিতে পারেন। আমি দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম, যখনই জাতিগঠন কিম্বা সমাজসেবামূলক কোন কাজের প্রস্তাব হয়, গভর্নমেন্টের শাসনযন্ত্র কত আয়াস সহকারে অক্ষম অকর্মণ্যতা লইয়া মন্থর গতিতে অগ্রসর হয়; কিন্তু যখন কোন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে দমন অথবা আঘাত করিতে হয়, তখন অকর্মণ্যতা বা মন্থরতার লেশমাত্রও থাকে না। এই বৈসাদৃশ্য কত সহজে চোখে পড়ে।

জওহরলাল নেহরু

প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের ভার একজন মন্ত্রী হস্তে ত্রুস্ত। কিন্তু সাধারণতঃ এই মহামায়া বুদ্ধিমান ব্যক্তিটি মিউনিসিপালিটি সংক্রান্ত এবং জনহিতকর কার্য সম্পর্কে গভীর ভাবেই অজ্ঞ। প্রকৃত প্রস্তাবে বিভাগীয় সিভিলিয়ান স্থায়ী কর্মচারীরাই কার্য পরিচালনা করেন। মন্ত্রীকে তাঁহারা গণনার মধ্যেই আনেন না। ভারতের উচ্চকর্মচারী মহলে, গভর্ণমেন্টের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল পুলিশী ব্যবস্থায় কাজ চালান, এইরূপ ধারণা প্রচলিত আছে। এবং এই শ্রেণীর কর্মচারীরাও ঐ প্রচলিত বিশ্বাসে অল্পপ্রাণিত। এই ধারণার উপর প্রভুত্ববলবৎ অল্পগ্রহপ্রবণতা থাকা সত্ত্বেও বড় আকারে কোন সমাজ সেবার্ধ্য ইহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না।

গভর্ণমেন্টের নিকট অধিকাংশ মিউনিসিপালিটি ঋণী—পুলিসের দৃষ্টির সহিত মহাজনের দৃষ্টি মিলাইয়া তাঁহারা মিউনিসিপালিটির উপর লক্ষ্য রাখেন। ঋণের কিস্তী নিয়মমত শোধ হইয়াছে কি? মিউনিসিপালিটির আর্থিক অবস্থা কি সচ্ছল, হাতে উদ্ধৃত কিছু আছে কি?—এই সকল প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক এবং প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই; কিন্তু মিউনিসিপালিটি কেবলমাত্র টাকা ধার করিবার এবং নির্দিষ্ট নিয়মে পরিশোধ করিবার প্রতিষ্ঠান নহে। ইহাকে শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি কার্যই মুখ্যভাবে করিতে হয়। শাসকগণ প্রায়ই ইহা ভুলিয়া যান। ভারতীয় মিউনিসিপালিটিগুলির সমাজ-হিতকর কার্য অতি অল্প। তাহাও আবার আর্থিক অসঙ্গতির অজুহাতে সঙ্কুচিত করা হয় এবং সাধারণতঃ ইহার ফলে শিক্ষাবিভাগই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সরকারী চাকুরীয়া ব্যক্তিগত ভাবে মিউনিসিপাল স্কুলগুলির কোনই খবর রাখেন না। কেননা তাঁহাদের সম্মান-সম্মতির সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যয়বহুল আধুনিক প্রাইভেট স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া থাকে।

অধিকাংশ ভারতীয় সহরই দুই ভাগে বিভক্ত। একাংশ ঘন বসতিপূর্ণ নগরী—অন্য অংশে বাগান ও সুপ্রশস্ত প্রান্তর সমন্বিত বাংলো বা “কটেজ”। ইংরাজেরা এই অংশকে “সিভিল লাইনস্” বলিয়া থাকেন। এই সিভিল লাইনে ইংরাজ কর্মচারীরা, ব্যবসায়ীরা, উচ্চ-মধ্যশ্রেণীর ভারতীয় বৃত্তিজীবী ও সরকারী কর্মচারীরা বাস করেন। যদিও মিউনিসিপালিটির আয় সিভিল লাইন অপেক্ষা মূল সহরে অনেক বেশী, তথাপি বেশীর ভাগ টাকা সিভিল লাইনেই খরচ করিতে হয়। সিভিল লাইনের বিস্তার ও পরিধি অনেক বেশী বলিয়া সেখানে রাস্তার সংখ্যাও বেশী এবং এগুলি মেরামত করিতে, পরিষ্কার করিতে

মিউনিসিপালিটির কাজ

জল ও আলো দিতে হয়। তাহার উপর বিস্তীর্ণ পয়োপ্রণালী, জলগরবরাহ এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা আছে। মূল সহরের অংশ অত্যন্ত অবহেলিত। বিশেষতঃ দরিদ্র বস্তীগুলিতে কোন নজরই দেওয়া হয় না। এদিকে ভাল রাস্তার সংখ্যা অত্যন্ত কম। অধিকাংশই সরু গলি। আলোর ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নাই এবং পয়োপ্রণালী কিম্বা স্বাস্থ্য-রক্ষার ব্যবস্থাও নিতান্ত অল্পপুষ্ট। সাধারণ লোকেরা ইহা নীরবে সহ্য করে, এবং কদাচিৎ অভিযোগ করিয়া থাকে। অভিযোগ করিলেও কোন প্রতিকার হয় না। “সিভিল লাইন” বাসীরাই ক্ষুদ্র বৃহৎ দাবী লইয়া মিউনিসিপালিটিকে বিব্রত রাখে।

ভারকেন্দ্রের সাম্যরক্ষার জ্ঞান এবং কিছু উন্নতিসাধনের জ্ঞান আমি জমির মূল্যের নিরিখে ট্যাক্স ধার্যের প্রস্তাব করিলাম কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই একজন সরকারী কর্মচারী তাঁত্র আপত্তি তুলিলেন। আমার মনে হয়; ইনি জিলা ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি বলিলেন যে, এই ব্যবস্থা ভূমি সংক্রান্ত আইন-কানূনের বিরোধী। অবশ্য এই শ্রেণীর ট্যাক্সের ফলে সিভিল লাইনের বাংলোর মালিকদিগের ট্যাক্স বাড়িয়া যাইত সন্দেহ নাই। কিন্তু চুড়ি মাণ্ডল বা অরুপ ট্যাক্স গভর্নমেন্ট সর্বদাই সমর্থন করিয়া থাকেন, তাহার ফলে ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খাজদ্রব্য এবং অন্যান্য পণ্যত্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হয় এবং ইহার বোঝা গরীবের ঘাড়েই বেশী করিয়া পড়ে। এই সমাজনীতিবিরুদ্ধ এবং অনিষ্টকর মাণ্ডলই ভারতীয় মিউনিসিপালিটিগুলির প্রধান অবলম্বন। কিন্তু এক্ষণে বৃহত্তর সহরগুলিতে ইহা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইতেছে।

মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যানরূপে আমি দুই বিপাকের মধ্যে পড়িলাম। একদিকে নৈব্যক্তিক প্রভুত্বচালিত গভর্নমেন্ট যন্ত্র—পুরাতন গরুর গাড়ীর মত কাঁচা কর্দমাক্ত রাস্তার নির্দিষ্ট রেখায় যন্ত্রের গতিতে চলিয়াছে। দ্রুত চলিতেও ইহার আপত্তি, মোড় ঘুরিতে ততোধিক আপত্তি। অন্যদিকে আমার সহকর্মী সদস্যদল—তাঁহারাও পরিচিত দাগের বাহিরে যাইতে সমান অনিচ্ছুক। কাহারও কাহারও বড় বড় পরিবর্তন ছিল এবং তাঁহারা কাজেও বেশ উৎসাহ দেখাইতেন। কিন্তু সমগ্রভাবে তাঁহাদের কোন দূরদৃষ্টি ছিল না। কোন পরিবর্তন বা উন্নতির আগ্রহও ছিল না। পুরাতন ধারাই ভাল, নূতন পরীক্ষার ফল কি হইবে কে জানে। এমন কি উৎসাহী আদর্শবাদীরা সমস্ত বাধা-ধরা দৈনন্দিন কাজের জালে জড়াইয়া ঠাণ্ডা হইয়া গেলেন। কিন্তু পক্ষপাতিত্ব কিম্বা নূতন লোক নিযুক্ত করিবার সময় সদস্যদের মধ্যে অত্যন্ত কর্মতৎপরতা দেখা

মাইত। কিন্তু তাঁহাদের এই উৎসাহের ফলে যে কুশলতা বাড়িত তাহা নহে।

বৎসরের পর বৎসর সরকারী-সিদ্ধান্ত এবং সরকারী কৰ্মচাৰিবৃন্দ ও সংবাদপত্ৰ মিউনিসিপালিটি ও লোকালবোর্ডের কার্যের সমালোচনা করিয়া থাকেন। ইহাতে এই সারমৰ্ম উদ্ধার করা হয় যে, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষের পক্ষে উপযোগী নহে। এইগুলির ক্রটি অবস্থা অনেক আছে কিন্তু যে ব্যবস্থার মধ্যে উহাদিগকে কার্য্য করিতে হয়, তাহা সংশোধনের দিকে মোটেই মনোযোগ দেওয়া হয় না। এই ব্যবস্থা গণতান্ত্রিকও নহে স্বৈচ্ছাচারমূলকও নহে। ইহা মাঝামাঝি এমন একটি বস্তু যাহার মধ্যে উভয়ের অনুরূপিতাগুলি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। কেন্দ্রীয় গভৰ্ণমেণ্টের পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্ৰণের কতকগুলি ক্ষমতা নিশ্চয়ই থাকা আবশ্যিক; কিন্তু যদি কেন্দ্রীয় গভৰ্ণমেণ্ট গণতান্ত্রিক এবং জনসাধারণের অভাব সম্পর্কে সচেতন হন, তাহা হইলেই গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের সহিত তাহার সামঞ্জস্য সম্ভবপর। কিন্তু যেখানে ইহার অভাব, সেখানে হয় দুইয়ের মধ্যে বিরোধ বাধিবে, নয় কেন্দ্রীয় প্রভুত্বের সম্পূর্ণ বশত স্বীকার করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় প্রভুত্ব দায়িত্ব গ্রহণ করেন না অথচ ক্ষমতা পরিচালনা করিয়া থাকেন। এই অসন্তোষজনক অবস্থায় জনসাধারণের আয়ত্তে কোন বাস্তব ক্ষমতা আসিতে পারে না। এমন কি মিউনিসিপাল বোর্ডের সদস্যরা পর্য্যাপ্ত নির্বাচক মণ্ডলী অপেক্ষা কতৃপক্ষের মুখ চাহিয়াই কার্য্য করেন। জনসাধারণও প্রায়শঃই বোর্ডের প্রতি উদাসীন। প্রকৃত সমাজকল্যাণকর প্রশ্ন বোর্ডের দৈনন্দিন কার্য্যের এলাকার বাহিরে বলিয়া কদাচিত্ উহা বোর্ডে উঠিয়া থাকে এবং যে প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ ট্যাক্স আদায় করা, তাহার প্রতি জনসাধারণ প্রসন্ন হইতে পারে না।

স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির ভোটাধিকারও সীমাবদ্ধ; ভোটারের যোগ্যতার নিরিখ আরও নিম্ন এবং বিস্তৃত হওয়া উচিত। বোম্বাইয়ের মত বৃহৎ সহরের কর্পোরেশনের ভোটাধিকার অতিশয় সঙ্কীর্ণ বলিয়া আমার ধারণা। কিছুদিন পূর্বে ভোটাধিকার বিস্তৃত করিবার একটি প্রস্তাব কর্পোরেশনেই বর্জিত হয়। অধিকাংশ সদস্যই বর্তমান ব্যবস্থাতেই সন্তুষ্ট এবং ভোটাধিকার প্রসারিত করিয়া নিজেদের অবস্থা অনিশ্চিত করিতে চাহেন না।

কারণ যাহাই হউক, আমাদের দেশের মিউনিসিপালিটিগুলি সাফল্য ও যোগ্যতার নিদর্শন না হইলেও অন্ত্যান্ত গণতান্ত্রিক ও

মিউনিসিপালিটির কাজ

উন্নতিশীল দেশের মিউনিসিপালিটির সহিত ইহার তুলনা চলিতে পারে। এইগুলি সাধারণতঃ ঘৃষ্যখোর নহে, তবে অকর্মণ্য। এবং এইগুলির প্রধান দুর্বলতা আশ্রিতবাংসল্য এবং কোন বিষয় সত্য-দৃষ্টিতে দেখিবার অক্ষমতা। ইহা স্বাভাবিক। কেননা গণতন্ত্রকে সার্থক করিতে হইলে, চাই স্বগঠিত জনমত এবং দায়িত্ববোধ। তাহার পরিবর্তে আমাদের চারিদিকে এক সর্বদ্যাপী প্রভুত্বের আবেষ্টনী এবং গণতন্ত্রের অশুভ্রূল আবহাওয়ার অভাব। এদেশে জনসাধারণকে কোন শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা নাই এবং প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া দিয়া জনমত গঠন করিবার কোন চেষ্টা নাই। ফলে জনসাধারণের দৃষ্টি ব্যক্তিগত, সাম্প্রদায়িক অথবা অগ্ন্যাগ্ন ক্ষুদ্র বিষয়ে সাধারণতঃ আকৃষ্ট থাকে।

(মিউনিসিপালিটি হইতে রাজনীতি দূরে সরাইয়া রাখিবার জগ্ন গভর্ণমেন্ট সততই আগ্রহশীল। জাতীয় অন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন প্রস্তাব দেখিলেই তাঁহারা ত্রুটি করেন, জাতীয়তার অশুভ্রূল কোন পাঠ্যপুস্তক মিউনিসিপাল স্কুলে পড়িতে দেওয়া হয় না, এমনকি জাতীয় নেতাদের চিত্রও সেখানে রাখিতে দেওয়া হয় না। মিউনিসিপালিটির ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হইবে এই ভয় দেখাইয়া জাতীয় পতাকা অপসারিত করা হয়।) কিছুকাল হইল সমস্ত প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট একযোগে কংগ্রেসপন্থীদিগকে মিউনিসিপাল কর্পোরেশন ও বোর্ডগুলির চাকুরী হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন, সাধারণতঃ এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে শিক্ষা ও অগ্ন্যাগ্ন ব্যাপারে গভর্ণমেন্টের সাহায্য বন্ধ করিবার ভীতি প্রদর্শনই যথেষ্ট। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে, বিশেষভাবে কলিকাতা কর্পোরেশনের জগ্ন এই আইন করা হইয়াছে, যাহারা গভর্ণমেন্ট-বিরোধী রাজনৈতিক অন্দোলনে কিম্বা আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়াছে, তাহাদিগকে চাকুরী দেওয়া হইবে না। উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ রাজনৈতিক, ইহার মধ্যে অযোগ্যতা কিম্বা অক্ষমতার কোন প্রশ্ন নাই। এই সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝা যাইবে যে, মিউনিসিপালিটি ও জিলাবোর্ডগুলিতে কতটুকু গণতন্ত্র ও কতটুকু স্বাধীনতা রহিয়াছে। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে মিউনিসিপালিটি বা ঐ চাকুরী হইতে (অবশ্য তাহারা প্রত্যক্ষ সরকারী চাকুরী প্রার্থী হয় না) বঞ্চিত করার চেষ্টা সঘন্থে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, গত পনের বৎসরে প্রায় তিন লক্ষ লোক কারাগারে গিয়াছে। রাজনীতি ছাড়িয়া দিলেও এই তিন লক্ষ লোকের মধ্যে বহু শক্তিমান আদর্শবাদী, সমাজের প্রতি

জওহরলাল নেহরু

কৰ্তব্যপৰায়ণ ও নিঃস্বার্থ ব্যক্তি আছেন। ইহাদের শক্তি কৰ্মতৎপরতা ও সেবার আদর্শের প্রতি অমুরাগ আছে। অতএব জনহিতকর অথবা অমুরূপ বিভাগে এই উৎকৃষ্ট শ্রেণী হইতেই কৰ্মচারী সংগ্রহ করা কৰ্তব্য। কিন্তু গভর্নমেন্ট এই সকল লোককে বাহিরে রাখিবার জন্য সৰ্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়াছেন, এমনকি আইন পাশ করিয়া ইহাদিগকে এবং ইহাদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। গভর্নমেন্ট পোষাকুকুরের বংশবৃদ্ধিরই অমুরাগী এবং তাহাতেই উৎসাহ দিয়া থাকেন। তারপর স্বায়ত্তশাসন বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে অযোগ্যতার অপবাদ দিয়া থাকেন। এই সকল প্রতিষ্ঠানে রাজনীতির সহিত সম্পর্ক থাকিবে না একথা যদিও মুখে বলা হয়, তথাপি গভর্নমেন্টের পছন্দমত রাজনীতিতে উৎসাহ দিবার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বোর্ডের স্থলের শিক্ষকগণকে চাকুরীর ভয় দেখাইয়া গ্রামে গ্রামে গভর্নমেন্টের পক্ষে প্রচারকার্যের জন্য কার্যতঃ বাধ্য করা হইয়াছিল।

গত পনের বৎসর কংগ্রেসকর্মীরা বহু বিয়ের সম্মুখীন হইয়াছেন, গুরুদায়িত্ব স্বেচ্ছা লইয়াছেন এবং সর্বোপরি তাঁহারা কিছু সাফল্যের সহিতই এক শক্তিমান, আত্মরক্ষায় স্বদক্ষ গভর্নমেন্টের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। এই কঠিন ভূমিতে শিক্ষা লাভ করিয়া তাঁহারা পাইয়াছেন আত্মপ্রত্যয় কৰ্মকুশলতা এবং আত্মরক্ষার শক্তি। অতিমাত্রায় প্রভুত্বপরায়ণ শাসনতন্ত্রের ফলে ভারতবাসী যে পৌরুষ ও অগ্ন্যাগ্ন গুণ হারাইয়া ফেলিতেছিল, ইহা তাঁহারা পুনরায় ফিরাইয়া পাইয়াছেন। অবশ্য অগ্ন্যাগ্ন গণ-আন্দোলনের মতই কংগ্রেসের আন্দোলনের মধ্যেও নির্বোধ অকর্মণ্য দুষ্করিত্ব প্রভৃতি অনেক অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তি প্রবেশ করিয়াছিল। তথাপি আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, গড়ে একজন কংগ্রেসকর্মী সমগ্ৰবিশিষ্ট কোন ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর কুশলকন্মা এবং শক্তিমান।

এই ব্যাপারের আর একটা দিক আছে, যাহা গভর্নমেন্ট এবং তাহার পরামর্শদাতারা বুঝিতে পারেন না। কংগ্রেসকর্মীদিগকে সমস্ত চাকুরী অথবা জীবিকার্জনের অগ্ন্যাগ্ন উপায় হইতে বঞ্চিত করার চেষ্টাকে প্রকৃত বিপ্লবীরা অভ্যর্থনাই করিয়া থাকে। সাধারণ কংগ্রেসকর্মীরা বৈপ্রবিক মনোভাবাপন্ন নহেন বলিয়া অখ্যাতি আছে। তাহারা কিছুকালের জন্য অর্দ্ধবৈপ্রবিক কাজকর্মে লিপ্ত থাকিয়া অবশেষে পুনরায় সাধারণ দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় প্রবৃত্ত হন। নিজের ব্যবসায়

মিউনিসিপালিটির কাজ

বৃদ্ধি অথবা স্থানীয় রাজনীতির জটিল জালে জড়াইয়া পড়েন। বৃহত্তর সমস্তা তাঁহাদের মন হইতে ক্রমে মুছিয়া যায় এবং বৈপ্লবিক আবেগ শাস্ত হইয়া আসে। মাংসপেশীতে মেদ দেখা দেয়, নিরাপদ জীবনের প্রতি মমত্ব বৃদ্ধি পায়। মধ্যশ্রেণীর কর্মীদের এই অনিবার্য প্রবণতার ফলে অগ্রগামী এবং বৈপ্লবিক মনোবৃত্তিবিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মীরা তাঁহাদের সহকর্মীদিগকে আইনসভা অথবা মিউনিসিপালিটি প্রভৃতির নিয়মতান্ত্রিক আবর্ত হইতে কিম্বা সারাক্ষণের জন্ত চাকুরীগ্রহণ হইতে নিবৃত্ত করিতে বেগ পাইয়া থাকেন। যাহা হউক এইবার গভর্ণমেন্ট আমাদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছেন এবং কংগ্রেসকর্মীদিগের পক্ষে চাকুরী পাওয়া কঠিন করিয়া তুলিয়াছেন। ইহার ফলে তাঁহাদের মধ্যে বৈপ্লবিক উৎসাহ আরও কিছু কাল থাকিবে—এমনকি বাড়িতেও পারে।

(এক বৎসর কিম্বা আরও অধিককাল মিউনিসিপালিটির কাজ করিয়া দেখিলাম আমার কর্ম-শক্তিকে সার্থকতার সহিত প্রয়োগ করিতে পারিতেছি না। বড়জোর আমি কাজের মধ্যে কিছু গতিবেগ ও কিছু কুশলতা সঞ্চার করিতে পারি, কিন্তু কোন গুরুতর পরিবর্তন সাধন করিতে পারি না।) আমি চেয়ারম্যানের পদে ইস্তফা দিতে চাহিয়াছিলাম কিন্তু বোর্ডের সদস্যগণ আমায় পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে আমি এত দয়া ও সৌজন্ত পাইয়াছি যে, আমার পক্ষে অমরোধ এড়ান কঠিন হইল। যাহা হউক দ্বিতীয়বারের শেষে আমি পদত্যাগ করিলাম।

১৯২৫ সাল। শরৎকালে আমার পত্নীর কঠিন পীড়া হইল এবং কয়েকমাস ধরিয়া তিনি লঙ্কোর হাসপাতালে শয্যাশায়ী রহিলেন। সেবার কানপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। কতকটা উন্নয়ন ভাবে আমাকে এলাহাবাদ, কানপুর ও লঙ্কোর মধ্যে ছুটাছুটি করিতে হইল (আমি তখনও কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক)।

চিকিৎসকগণ আমার স্ত্রীকে সুইজারল্যাণ্ডে লইয়া গিয়া চিকিৎসার পরামর্শ দিলেন। আমি কোন ছুতায় ভারতবর্ষের বাহিরে যাইবার জন্ত ব্যগ্র হইয়াছিলাম, কাজেই প্রস্তাবটি আমার ভাল লাগিল। আমার মন সমস্তায় আচ্ছন্ন, কোন পথ স্পষ্টরূপে দেখিতেছিলাম না। ভাবিলাম, হয় ত ভারতবর্ষ হইতে দূরে সরিয়া গেলে উন্নততর গণতান্ত্রিক উপর সমস্ত বস্ত ভাল করিয়া দেখিতে পারিব, এবং আমার মনের অন্ধকার কোণগুলিও আলোকিত হইয়া উঠিবে।

১৯২৬-এর মার্চ মাসের প্রথমভাগে আমি স্ত্রী ও কন্যাসহ বোম্বাই

হইতে ভিনিস্ যাত্রা করিলাম। ঐ জাহাজে আমার ভগ্নী এবং ভগ্নীপতি রণজিৎ পণ্ডিতও ছিলেন। আমাদের বিলাত যাত্রার কথা উঠিবার বহুপূর্বেই তাঁহারা ইউরোপ ভ্রমণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

২১

ইউরোপে

তের বৎসর পর পুনরায় ইউরোপে চলিয়াছি। যুদ্ধে বিদ্রোহে এই কয় বৎসরে কি অভূতপূর্ব পরিবর্তন হইয়াছে! মহাযুদ্ধের মধ্যেই পরিচিত প্রাচীন জগতের মৃত্যু হইয়াছে। নবীন জগৎ আমার জন্ম অপেক্ষা করিতেছে। আমি ইউরোপে ছয় সাত মাস, বড়জোর এই বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত থাকিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, কিন্তু কাব্যতঃ আমাদের এক বৎসর নয় মাস থাকিতে হইল।

এই সময়টা দেহ ও মনের পরিপূর্ণ বিশ্রাম ও শাস্তিতে কাটিয়াছে। আমরা অধিকাংশ সময় সুইজারল্যাণ্ডে জেনেভায় এবং মন্টানার পার্কৃত্যে স্বাস্থ্যবাসে কাটাইয়াছি। ১৯২৬-এর গ্রীষ্মকালে আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী রুক্ষা ভারতবর্ষ হইতে আসিয়া আমাদের দলে যোগ দিল, এবং অবশিষ্ট সময় আমাদের সঙ্গেই ইউরোপে ছিল। বেশীর ভাগ সময় আমার স্ত্রীকে ছাড়িয়া বাইতে না পারায় আমি কেবলমাত্র অল্প সময়ের জন্ম কয়েকটি স্থান দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। পরে আমার স্ত্রী কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করিলে আমরা ইংলণ্ড ফ্রান্স ও জার্মানীতে কিছু ভ্রমণ করিয়াছি। তুষার-শৈলমালা-বেষ্টিত আমাদের এই পার্কৃত্য আবাসে আমি ভারতবর্ষ ও ইউরোপ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে করিতাম। স্বদেশের ঘটনাবলী বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে, আমি দূর হইতে দ্রষ্টার মত সংবাদ পাঠ এবং ঘটনাগুলি লক্ষ্য করিতেছি, কখন বা নূতন ইউরোপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ইহার রাজনীতি, অর্থনীতি, ইহার স্বাধীন সামাজিক জীবন বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি। যখন জেনেভায় ছিলাম তখন স্বভাবতঃই রাষ্ট্রসংঘ এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী লক্ষ্য করিয়াছিলাম।

ইউরোপে

কিন্তু শীতের প্রারম্ভের সহিত এদেশের শীতকালের খেলাধুলায় মাতিয়া উঠিলাম। আগামী কয়েকমাস ইহাই আমার প্রধান কাজ হইয়া উঠিল। ইতিপূর্বে আমি বরফের উপর “স্কেটিং” করিয়াছি, কিন্তু “স্কিইং” এক নূতন অভিজ্ঞতা। ইহার অভিনবত্বে আমি মুগ্ধ হইলাম। ইহা শিখিতে অত্যন্ত কষ্ট হইল। অনেকবার আছাড় খাইলাম; তবুও সাহসের সহিত পুনঃ পুনঃ উত্তম করিয়া অবশেষে কৃতকার্য হইলাম। ইহাতে আমি অত্যন্ত আমোদ অন্ভব করিতাম।

এখানে জীবন মোটের উপর অত্যন্ত বৈচিত্র্যহীন। দিনে দিনে আমার স্ত্রী ক্রমশঃ শক্তি ও স্বাস্থ্য লাভ করিতে লাগিলেন। এখানে কদাচিৎ কোন ভারতবাসীর সহিত দেখা হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র পার্শ্বত্যা নিবাসের অধিবাসিবৃন্দ ছাড়া অল্পলোকের সহিতই দেখা হইত। কিন্তু পোনে দুই বৎসরের মধ্যে ইউরোপে আমাদের সহিত কয়েকজন সুপরিচিত নির্বাসিত এবং প্রাচীন বিপ্লবপন্থী ভারতীয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে।

তখন জেনেভার একটি বাড়ীর উপর তলায় শ্রামজী কৃষ্ণবর্মা তাঁহার পীড়িতা পত্নীকে লইয়া বাস করিতেন। এই বৃদ্ধা দম্পতির কোন সঙ্গী ছিল না। সারাক্ষণের জ্ঞান ভৃত্যাদিও ছিল না। তাঁহাদের ঘরগুলি শ্রান্তসৈতে ধূলিমলিন ও দুর্গন্ধপূর্ণ। শ্রামজীর অর্থ ছিল প্রচুর, কিন্তু তিনি ব্যয়বৃদ্ধ ছিলেন। এমন কি তিনি কয়েকটি পয়সা বাঁচাইবার জ্ঞান ট্রামে না উঠিয়া হাটিয়া যাইতেন। প্রত্যেক নবাগতকেই তিনি সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন। এবং উপযুক্ত প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত মনে করিতেন, এই ব্যক্তি হয় তাঁহার টাকার লোভেই আসিয়াছে, নয় ব্রিটিশের গুপ্তচর। তাঁহার পকেট তাঁহার সম্পাদিত প্রাচীন কাগজ “ইণ্ডিয়ান স্যোশিওলজিস্টে” বোঝাই থাকিত। তিনি ঐগুলি টানিয়া বাহির করিয়া তাঁহার বার চৌদ্দ বৎসর পূর্বের লেখা কোন প্রবন্ধ অত্যন্ত উৎসাহের সহিত পাঠ করিতেন। তিনি পুরাতন গল্প করিতে ভালবাসিতেন। হ্যামস্টাডে ইণ্ডিয়া হাউসের গল্প করিতেন, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তাঁহার পেছনে যে সকল গোয়েন্দা লাগাইয়াছিলেন, কেমন করিয়া তিনি তাহাদের চিনিয়া ফেলিতেন এবং তাহাদের বেকুব বানাইতেন সেই সব গল্প করিতেন। তাঁহার ঘরের দেয়ালে বহু তাক এবং সেগুলি ধূলিমলিন ও অযত্নরক্ষিত পুরাতন পুঁথিপুস্তকে বোঝাই। মেঝের উপরও বই ও খবরের কাগজের ছড়াছড়ি। সেগুলি হয় ত মাসের পর মাস কেহ নাড়াচাড়া করে নাই। মোটের উপর চারিদিকে বিষন্ন নির্জনতা—যেন ধ্বংসের স্তূপ, জীবন এখানে যেন অবাঞ্ছনীয় অতিথি—অন্ধকার নিস্তব্ধ বারান্দার উপর দিয়া হাটিবার

সময় মনে হয়, যেন প্রত্যেক অঙ্ককোণে মৃত্যুর ছায়া ঘনাইয়া রহিয়াছে। এই বাড়ী হইতে বাহির হইলে মুক্ত বায়ুতে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচা যায়।

শ্রামজী তাঁহার টাকাকড়ির একটা বিলি ব্যবস্থার জন্য ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। কোন জনহিতকর কার্যে, বিশেষভাবে ভারতীয় ছাত্রদের বিদেশে শিক্ষার জন্য একটা স্থায়ী ধনভাণ্ডার স্থাপনের তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তিনি আমাকে একজন অছি নিযুক্ত করিতে চাহিলেন। কিন্তু আমি এই দায়িত্ব গ্রহণ করিবার কোন আগ্রহ দেখাইলাম না। তাঁহার আর্থিক ব্যাপারের সহিত জড়িত হইবার কিছুমাত্র ইচ্ছাও আমার ছিল না; তাহা ছাড়াও আমি যদি এ বিষয়ে অতিরিক্ত আগ্রহ দেখাই, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ সন্দেহ করিবেন, তাঁহার টাকার উপর আমার লোভ আছে। কেহ জানিত না তাঁহার কত টাকা আছে। জার্মানীর “মার্কের” দাম পড়িয়া যাওয়ায় তাঁহার গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে এইরূপ একটা গুজব শুনিয়াছিলাম।

সময় সময় অনেক খ্যাতনামা ভারতীয় জেনেভায় আসিতেন। রাষ্ট্রসভ্যে যে সব সরকারী চাকুরীয়া শ্রেণীর ভারতীয় আসিতেন, শ্রামজী তাঁহাদের ছায়াও মাড়াইতেন না। কিন্তু আন্তর্জাতিক শ্রমিক সভায় অনেক বে-সরকারী এমন কি বিখ্যাত কংগ্রেসসম্পন্ন ভারতীয় আসিতেন, শ্রামজী তাঁহাদের সহিত দেখা করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু এই সকল ভদ্রলোক তাঁহাকে দেখিলে অত্যন্ত ঘাবড়াইয়া যাইতেন এবং অস্বাচ্ছন্দ্যের সহিত প্রকাশভাবে তাঁহার সহিত মেলামেশা এড়াইয়া চলিতেন। পারতপক্ষে গোপনে ছাড়া দেখা করিতে চাহিতেন না। তাঁহার সহিত মেলামেশা অনেকেই খুব নিরাপদ মনে করিতেন না।

কাজেই সম্মানসম্ভূতি আত্মীয় বন্ধুহীন এমন কি প্রায় মনুষ্যসংসর্গ বর্জিত ভাবে শ্রামজী ও তাঁহার পত্নী নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতেন। তিনি যেন অতীতের স্মৃতিচিহ্ন, তাঁহার দিন কুরাইবার পরও যেন বাঁচিয়া আছেন। বর্তমানের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই এবং জগৎ যেন তাঁহাকে বিশ্বৃত হইয়াছে। এখনও তাঁহার চক্ষুতে সেই পূর্বের অগ্নি জ্বলিত এবং আমার ও তাঁহার মধ্যে সাদৃশ্যের অভাব সত্ত্বেও আমি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি প্রদর্শন না করিয়া পারিলাম না।

সম্প্রতি সংবাদপত্রে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাঠ করিয়াছি এবং তাঁহার অল্পদিন পরেই তাঁহার আজীবনের প্রধান সঙ্গিনী সেই মহিয়সী গুজরাটী মহিলারও মৃত্যু সংবাদ পাইয়াছি। সংবাদে প্রকাশ যে, তিনি বিদেশে ভারতীয় মহিলাদের শিক্ষার জন্য প্রচুর টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

ইউরোপে

আর একজন বিখ্যাত ব্যক্তি—তঁাহার নাম আমি বহুকাল যাবৎ জানি, সেই রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের সহিত সুইজারল্যান্ডে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটিল। তঁাহাকে তখন দেখিলাম (সম্ভবতঃ এখনও) একজন সদানন্দময় আশাবাদী, বাস্তবের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন হইয়া তিনি এক ভাবরাজ্যে বাস করিতেছেন। তঁাহাকে দেখিয়া আমি প্রথমতঃ অবাক হইলাম। তঁাহার পোষাক পরিচ্ছদ তিব্বতের মালভূমি অথবা সাইবেরিয়ার উপযুক্ত; কিন্তু গ্রীষ্মকালে এই মস্তোর মত স্থানের সম্পূর্ণ অল্পযুক্ত। তঁাহার পোষাক অর্দ্ধ সামরিক, পায়ে রুশীয় বুট জুতা এবং তঁাহার সর্বোচ্চ কাগজপত্র ও ফটো বোকাই বড় বড় পকেট। তাহার মধ্যে জার্মান চ্যামেলার বেথ ম্যান হলণ্ডের লেখা একখানা চিঠি, কাইজারের নিজের নাম দস্তখত করা একখানা ছবি, তিব্বতের দালাইলামার নিকট হইতে প্রাপ্ত একখানি সুন্দর রেশমী কাপড়ে লেখা জড়ান পত্র এবং অসংখ্য দলিল দস্তাবেজ, ছবি রহিয়াছে। এই সকল পকেটের বিচিত্র কাগজপত্র দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। তিনি বলিলেন, একবার চীনদেশে মূল্যবান কাগজপত্র সহ তঁাহার একটি হাত বাস্ক হারাইয়া গিয়াছিল, সেই হইতে তিনি কাগজগুলি সর্বদা কাছে রাখাই সম্ভব মনে করেন। এতগুলি পকেটের কারণ তাহাই।

মহেন্দ্রপ্রতাপ তঁাহার জাপান, চীন, তিব্বত ও আফগানিস্থানের ভ্রমণ ও অপূর্ণ অভিজ্ঞতার অনেক ভাল ভাল গল্প বলিতে পারেন। তঁাহার বৈচিত্র্যময় জীবন-কাহিনী উপন্যাসের ন্যায় মনোহর। বর্তমানে তিনি “ছাপিনেস সোসাইটি” বা সুখসঞ্চারক সমিতি লইয়া মাতিয়া আছেন। এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা তিনি স্বয়ং এবং ইহার বাণী হইল “সুখী হও”। তঁাহার এই সমিতি ল্যাটভিয়ায় (অথবা লিথুয়ানিয়ায়?) সর্বাধিক সাফল্য লাভ করিয়াছে।

তঁাহার প্রচারকার্যের ধারা এইরূপ, মাসে মাসে তিনি তঁাহার বাণী পোষ্টকার্ডে ছাপাইয়া জেনেভায় বিভিন্ন সভাসমিতি উপলক্ষে সমবেত সদস্যদের মাঝে বিতরণ করেন। তঁাহার মুদ্রিত বাণীর নীচে তিনি নানা ছাঁদে এক বিশেষ ভঙ্গীতে নিজের নাম দস্তখত করেন। “মহেন্দ্রপ্রতাপের” আত্মকর মাত্র ব্যবহার করেন এবং তাহার সহিত তঁাহার প্রিয় বিভিন্ন দেশের নাম যোগ করিয়া নিজেকে তাহার প্রতিনিধি রূপে বর্ণনা করেন। তিনি যে আন্তর্জাতিক এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী, তাহাও বর্ণনা করিবার জন্য সর্বশেষে লেখেন “মানবজাতির ভৃত্য”। মহেন্দ্রপ্রতাপের সব কথার উপর গুরুত্ব আরোপ করা কঠিন। তিনি যেন কোন মধ্যযুগীয় উপন্যাসের নায়ক। যেন বিংশ শতাব্দীতে কোথা হইতে ছিটকাইয়া এক

জওহরলাল নেহরু

ডনকুইক্সোট আসিয়াছেন। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণরূপে সরল এবং তাঁহার আবেগ অকৃত্রিম।

প্যারীতে আমরা উগ্রস্বভাবা এবং ভয়ঙ্করী মাদাম কামার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তিনি সোজাসৃজি আসিয়া মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়াই পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। উত্তর দিলেও কোন ফল হয় না (সম্ভবতঃ তিনি বন্ধু কাল); কেননা কোন প্রমাণেই তাঁহার নিজের বন্ধমূল ধারণা তিনি ত্যাগ করেন না।

ইতালীতে কিয়ৎকালের জন্ত আমার মোলবী ওবেইদুল্লার সহিত দেখা হইয়াছিল। তিনি চালাক-চতুর এবং প্রাচীন ধরণের রাজনৈতিক কলকৌশলে সুপটু; কিন্তু আধুনিক ভাবধারার সহিত তাঁহার কোন পরিচয় নাই। তিনি আমাকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের (ইউনাইটেড রিপাব্লিকস্ অব্ ইণ্ডিয়া) একটা পরিকল্পনা দেখাইয়া বলিলেন, ইহা দ্বারাই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব। তিনি আমাকে ইস্তাম্বুলে (কন্সটান্টিনোপল) তাঁহার অতীত কাব্যকলাপের কথা বলিলেন। আমার নিকট সেগুলি খুব গুরুতর বলিয়া মনে হয় নাই এবং সেগুলি আমি অল্পকাল পরেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কয়েক মাস পরেই লালাজী সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং তাঁহার নিকটও তিনি এসব গল্প করেন। লালাজী তাঁহার কথায় অত্যন্ত মুগ্ধ হন। সেই সকল গল্পই নানা অযৌক্তিক ও আশ্চর্য্যরূপে পল্লবিত হইয়া সেই বৎসরের ভারতীয় আইন সভার নির্বাচনে ব্যবহৃত হইয়াছিল। পরে মোলবী ওবেইদুল্লা হেজাজে যান। তাহার পর আর কয়েক বৎসর আমি তাঁহার কোন সংবাদ পাই নাই।

সম্পূর্ণ পৃথক চরিত্রের আর একজন মোলবী—বরকতুল্লার সহিত আমার বার্লিনে প্রথম সাক্ষাৎ হয়। এই হাসিখুশী বৃদ্ধ মহা উৎসাহী এবং অত্যন্ত মিশুক প্রকৃতির। তিনি সাদাসিধে, খুব বেশী বুদ্ধিমান নহেন কিন্তু সমসাময়িক জগতের নবীন ভাবধারা বুঝিবার জন্ত সর্বদাই চেষ্টিত। আমরা সুইজারল্যান্ডে থাকিতেই ১৯২৭ সালে সানফ্রান্সিস্কোতে তাঁহার মৃত্যু সংবাদে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলাম।

বার্লিনে আরও অনেক ভারতীয় ছিলেন। যুদ্ধের সময় ইহাদের একটি দল ছিল; কিন্তু সে দল বহুদিন পূর্বেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে কলহ উপস্থিত হওয়ায় তাঁহারা প্রত্যেকে অপরকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া সন্দেহ করিতেন এবং এই কারণে তাঁহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। সর্বত্রই রাজনৈতিক নির্বাসিতের ভাগ্যে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। বার্লিনে এই সকল ভারতীয় মধ্যশ্রেণীয় বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বসবাস করিতেছেন।

ইউরোপে

মহাযুদ্ধের পর জার্মানীতে ইহাদের কখনও কাজ জোটে, কখনও জোটে না। যাহাই হউক, তাঁহাদের আর বৈপ্লবিক আগ্রহ নাই। এমন কি, তাঁহারা রাজনীতি এড়াইয়া চলেন।

যুদ্ধের সময় এই ভারতীয় পুরাতন দলের কাহিনী অত্যন্ত কৌতূহলপ্রদ। ১৯১৪ সালের সেই চিরস্মরণীয় গ্রীষ্মকালে ইহারা জার্মানীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তাঁহারা জার্মান ছাত্রদের সহিত একই জীবন যাপন করিতেন, তাঁহাদের সঙ্গীত গাহিতেন, তাঁহাদের খেলাধুলায় যোগ দিতেন, তাঁহাদের সহিত বীয়ার মত্ত পান করিতেন এবং জার্মান সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি সহানুভূতি ও শ্রদ্ধাপ্রকাশ করিতেন। যুদ্ধের সহিত তাঁহাদের কোন প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না; কিন্তু সমগ্র জার্মানবাসী জাতীয় ভাবের তীব্র উচ্ছ্বাসের স্রোতে তাঁহারা ভাসিয়া গেলেন। তাঁহারা আসলে জার্মানীর পক্ষপাতী ছিলেন না, তাঁহাদের মনের ভাব ছিল ব্রিটিশ-বিরোধী; এবং ভারতীয় জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা ব্রিটনের শত্রুদের প্রতি অমূল্য হইয়াছিলেন। যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই বৈপ্লবিক মনোবৃত্তি সম্পন্ন কতিপয় ভারতীয় সুইজারল্যান্ড হইতে জার্মানীতে আসিয়াছিলেন। ইহারা একটি সমিতি গঠন করিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে হরদয়ালকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কয়েক মাস পরে হরদয়াল আসিলেন এবং ইতিমধ্যে সমিতি বেশ শক্তিশালী হইয়া উঠিল। ভারতীয়দের ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবকে নিজেদের সুবিধাজনক কাজে লাগাইবার জন্য জার্মান গভর্নমেন্টই এই সমিতিকে শক্তিশালী করিয়া তুলিলেন। ভারতীয়েরা এই আন্তর্জাতিক অবস্থার সুযোগে কেবলমাত্র জার্মানীর সুবিধার জন্য কাজ না করিয়া নিজেদের জাতীয় সুবিধাও অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। যদিও এই ব্যাপারে তাঁহাদের নিজস্ব বিশেষ স্বাধীনতা ছিল না, তবুও জার্মান কর্তৃপক্ষের গরজ দেখিয়া একটা বিধিব্যবস্থা করিবার জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা জার্মানীর নিকট ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি এবং পাকা কথা চাহিলেন। জার্মান পররাষ্ট্র বিভাগের সহিত তাঁহাদের একটা সন্ধি হইয়া গেল। স্থির হইল, জয়লাভের পর জার্মানী ভারতের স্বাধীনতা মানিয়া লইবে এবং (আরও কতকগুলি ছোটখাট সর্ভে) ভারতীয়েরা ইহার বিনিময়ে যুদ্ধের সময় জার্মানীকে সাহায্য করিবার জন্য প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই ভারতীয় সমিতির সহিত জার্মান কর্তৃপক্ষ সম্মানজনক ব্যবহার করিতে লাগিলেন এবং সমিতির সদস্যরা বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতের মর্যাদা পাইতে লাগিলেন।

অনভিজ্ঞ যুবকদল গঠিত এই সমিতির অপ্রত্যাশিত সম্মান ও প্রতিষ্ঠায়

জওহরলাল নেহরু

অনেকেরই মাথা গরম হইয়া উঠিল। তাঁহারা মনে করিতে লাগিলেন, তাঁহারা যেন ঐতিহাসিক ঘটনার নায়করূপে এক যুগান্তরকারী মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হইয়াছেন। ইহাদের অনেকে অসমসাহসিক কার্য্য করিয়াছেন, অনেকের জীবন বিপন্ন হইয়াছে, অল্পের জন্ত মৃত্যুর কবল হইতে জ্ঞাণ পাইয়াছেন। কিন্তু যুদ্ধের শেষের দিকে ইহাদের গুরুত্ব কমিয়া গেল এবং পরে কেহ ইহাদের প্রায় গ্রাহ্যই করিত না। আমেরিকা হইতে আগত হরদয়াল অনেক পূর্বেই পরিত্যক্ত হইলেন। সমিতির সহিত তাঁহার বনিবনাও হইল না। সমিতি এবং জাশ্মাগ গভর্ণমেন্ট তাঁহাকে বিশ্বাসের অযোগ্য মনে করিয়া পরিত্যাগ করিলেন। বহুকাল পরে আমি ১৯২৬-২৭ সালে ইউরোপে গিয়া দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি যে, তখনও ইউরোপ প্রবাসী ভারতীয়েরা হরদয়ালের প্রতি কি পরিমাণ বিরক্তি ও ঘৃণা পোষণ করেন। তিনি তখন স্নাইডেনে ছিলেন। আমার সহিত তাঁহার দেখা হয় নাই।

যুদ্ধ শেষ হইল। সঙ্গে সঙ্গে বার্লিনের ভারতীয় কমিটিরও পরমাযু ফুরাইল। আশাভঙ্গজনিত মনোবেদনায় তাঁহাদের জীবন দুর্ভহ হইয়া উঠিল। বৃহৎ পণ বাখিয়া দ্যুতক্রীড়ায় তাঁহারা হারিয়া গেলেন। যুদ্ধের সময় তাঁহাদের গুরুত্ব এবং দুঃসাহসী কার্য্যকলাপের অবসানে দৈনন্দিন বৈচিত্রাহীন জীবন ছাড়া আর কিছুই রহিল না। কিন্তু নিরাপদ-ভাবে তাহা নির্বাহ করাও কঠিন হইয়া উঠিল। তাহাদের পক্ষে ভারতে ফিরিয়া আসাও কঠিন, অত্য়দিকে যুদ্ধের পর পবাজিত জাশ্মাগীতে বাস করাও সহজ নহে। জীবন সংগ্রাম অত্যন্ত কঠিন। কয়েকজনকে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ভারতে ফিরিতে দিলেন, বাদবাকী আর সকলকেই জাশ্মাগীতে বাধ্য হইয়া থাকিতে হইল। তাঁহাদের অবস্থা অতি শোচনীয়। তাহারা দৃশ্যতঃ কোন রাষ্ট্রেরই নাগরিক নহেন। তাঁহাদের বৈধ ছাড়পত্র নাই। জাশ্মাগীর বাহিরে ভ্রমণ করা তাঁহাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। জাশ্মাগীতে বাস করাও নানা কারণে বিঘ্নবহুল এবং তাহাও স্থানীয় পুলিশের দয়ার উপর নির্ভর করে। জীবনের এই দুঃখ কষ্ট, প্রতিদিনের দুশ্চিন্তা এবং আহার বাসস্থানের জগ্গ ও অবিরত উৎকর্ষা, ইহাই তাহাদের ভাগ্য হইল।

১৯৩০-এর পর তাঁহারা যদি নাৎসী নীতি অবলম্বন না করিয়া থাকেন তাহা হইলে নাৎসীরাজ্যে তাঁহাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়াছে। “নরডিক্” শ্রেণীর আর্ধ্য নহে, বিশেষতঃ এশিয়াবাসী বিদেশীরা বর্তমান জাশ্মাগীতে অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তি। ভাল ব্যবহার করিলে লোকে তাঁহাদিগকে সহ্য করে মাত্র। হিটলার ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন সমর্থন

ইউরোপে

করিয়া স্পষ্টভাবে অভিমত ঘোষণা করিয়াছেন, কেন না, তিনি ব্রিটনের সদিচ্ছা লাভ করিতে চাহেন। যে সকল ভারতবাসীর উপর ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট অসন্তুষ্ট তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই তিনি উৎসাহ দিবেন না।

পূৰ্বোক্ত ভারতীয় সমিতির বিশিষ্ট সদস্য চম্পকরমণ পিল্লের সহিত আমাদের বার্লিনে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন এবং যুবক ভারতীয় ছাত্রেরা তাঁহাকে এক অশ্রদ্ধাপূর্ণ উপাধি দিয়াছিলেন। তিনি জাতীয়তাবাদ ছাড়া আর কিছুই বুঝিতেন না। সামাজিক বা অর্থনৈতিক দিক হইতে কোন প্রশ্ন আলোচনা করিতে অত্যন্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেন। জার্মান জাতীয়তাবাদী “লৌহশিরস্ত্রাণ” দলের সহিত তিনি বেশ ভাব করিয়া লইয়াছিলেন। জার্মানিতে যে কয়জন ভারতীয়কে নাংসীয়া পছন্দ করিতেন, তিনি তাঁহাদের একজন ছিলেন। কয়েকমাস পূর্বে জেলে থাকিতেই বার্লিনে তাঁহার মৃত্যুসংবাদ আমি পাঠ করি।

ভারতের এক বিখ্যাত বংশের সন্তান বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের মানুষ। তাঁহাকে সকলে আদর করিয়া “চট্টো” বলিয়া ডাকিত। তাহার যোগ্যতা, কর্মকুশলতা এবং চরিত্রমাদুর্য্য অসুপম। তিনি সর্বদাই অভাবহীন, তাঁহার বসন জীর্ণ, এমন কি এক সন্ধ্যা খাওয়া জোটাও মাঝে মাঝে কর্তন হইত। কিন্তু তথাপি তিনি লঘুচিত্ত এবং পরিহাসরসিক ছিলেন। আমার কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি ইংলণ্ডে শিক্ষালাভার্থ গিয়াছিলেন। আমি যখন হ্যারোতে পড়ি তখন তিনি অক্সফোর্ডে ছিলেন। তিনি আর ভারতবর্ষে ফিরেন নাই। মাঝে মাঝে তাঁহার চিত্র দেশের জন্ত ব্যাকুল হইত এবং ফিরিয়া আসিবার জন্ত তিনি চেষ্টা করিতেন। তাঁহার পারিবারিক জীবনের সমস্ত বন্ধনই ছিন্ন হইয়াছে এবং ভারতে ফিরিয়া আসিলে তিনি নিজেকে নিঃসঙ্গ ও অস্থখী বোধ করিতেন ইহাও নিশ্চিত। কিন্তু দীর্ঘকাল বর্ষের পর বর্ষ বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করিয়াও স্বদেশের প্রতি টান সমানই রহিয়া গিয়াছে, কোন নির্বাসিতই মানসিক বিষাদ হইতে পরিত্রাণ পায় না। মাংসিনি ইহাকে বলিতেন আত্মার ক্ষয়রোগ।

বিদেশে আমি যে সকল ভারতীয় রাজনৈতিক নির্বাসিতের সহিত পরিচিত হইয়াছি, তাঁহাদের বেশীর ভাগের মধ্যেই আমি বিশেষ কোন বিশেষত্ব দেখি নাই। তাঁহাদের স্বার্থভাগের প্রতি আমি শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং তাঁহাদের বর্তমান দুঃখ, দৈন্ত, বিষয়, বাধার প্রতি আমার আন্তরিক সহানুভূতি রহিয়াছে। তাঁহারা সারা জগতে ছড়াইয়া আছেন, আমার সহিত অল্প কয়েকজনেরই দেখা হইয়াছে। খ্যাতিমান দুই-চারি জন ছাড়া

বাদবাকী অল্পাংশ অনেকে যে ভারতবর্ষের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেই ভারতবর্ষই তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছে। যে কয়েকজনের সহিত আমার দেখা হইয়াছিল তাহার মধ্যে মাত্র দুই জনের বুদ্ধির দীপ্তিই আমার মনে রেখাপাত করিয়াছে। এক বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অপর মানবেন্দ্রনাথ রায়। রায়ের সহিত মস্কোতে আমার মাত্র আধ ঘণ্টা আলাপ হয়। তিনি তখন কম্যুনিষ্ট দলের একজন নেতা ছিলেন। পরে তাঁহার কম্যুনিজম্ গোঁড়া কমিন্‌টার্ণ মার্ক কম্যুনিজম্ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া যায়। আমার বিশ্বাস, চট্টো পুরাপুরি কম্যুনিষ্ট ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার কম্যুনিজমের দিকে ঝোঁক ছিল। রায় বর্তমানে তিন বৎসর হইল ভারতীয় কারাগারে আছেন।

ইউরোপে আরও অনেক ভারতীয় ভাসিয়া বেড়াইতেছেন। ইহার। বৈপ্রবিক ভাষায় কথা বলেন, অসমসাহসিক ও অবাস্তব প্রস্তাব করেন, এবং আশ্চর্য্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। দেখিলে মনে হয়, তাঁহাদের উপর ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের ছাপ পড়িয়াছে।

আমরা অনেক ইউরোপীয়ান ও আমেরিকানের সহিতও দেখা করিয়াছি। জেনেভা হইতে ভেলেনিউভের ওলা ভিলায় আমরা কয়েকবার (প্রথমবার গান্ধিজীর পরিচয়-পত্র সহ) তীর্থযাত্রীর মত রোম্যা রোল্যান্স দর্শন লাভ করিয়াছি। যুবক জাম্বাণ কবি ও নাট্যকার আর্গণ্ট টোলারের স্মৃতি (নাৎসী আমলে তিনি আর জাম্বাণ নহেন) এবং নিউ ইয়র্ক সিভিল লিবার্টি ইউনিয়নের রোজার বন্ডুইনের স্মৃতি ভুলিবার নহে। জেনেভাতে স্থলেখক আমেরিকা প্রবাসী ধনগোপাল মুখার্জীর সহিতও আমার বন্ধুত্ব হইয়াছিল। ইউরোপ যাইবার পূর্বে ভারতে আমার সহিত অক্সফোর্ড গ্রুপ আন্দোলনের ফ্রাঙ্ক বাক্‌ম্যানের সহিত দেখা হইয়াছিল। তিনি তাঁহাদের আন্দোলন সম্পর্কে কতকগুলি রচনা আমাকে দিয়াছিলেন, আমি সেগুলি পড়িয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। অকস্মাৎ দীক্ষা গ্রহণ, নিজের অতীত সম্পর্কে অকপট স্বীকারোক্তি এবং একপ্রকার ধর্মসংশ্লিষ্ট পুনরুত্থানবাদী আবহাওয়ার সহিত আধুনিক যুগের স্বাধীন বুদ্ধির সামঞ্জস্য কি করিয়া হয় আমার ধারণায় আসিল না। বুদ্ধিমান ব্যক্তির। কি ভাবে এই আশ্চর্য্য ভাবাবেগে অধীর হইয়া পড়েন, আমি বুঝিতে পারিলাম না। আমার কৌতূহল বাড়িল। জেনেভায় ফ্রাঙ্ক বাক্‌ম্যানের সহিত আবার সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে রুম্যানিয়ার কোন স্থানে তাঁহাদের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আহ্বান করিলেন। দুঃখের কথা এই নূতন ভাববাতিকতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ আমার ঘটিল না। আমার কৌতূহল অতৃপ্ত রহিয়া গেল এবং অক্সফোর্ড গ্রুপ আন্দোলনের পরিপুষ্টির কথা আমি যতই পাঠ করি ততই আশ্চর্য্য হই।

ভারতে রাজনৈতিক বিতর্ক

আমাদের সুইজারল্যান্ডে আগমনের কিছুদিন পরেই ইংলণ্ডে সাধারণ ধর্মঘট আরম্ভ হইল। আমি অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া পড়িলাম। আমার স্বাভাবিক সহানুভূতি ছিল ধর্মঘটদিগের প্রতি। অল্পদিন পরে ধর্মঘট ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এই সংবাদে আমি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলাম। কয়েক মাস পরে আমি ইংলণ্ডে গিয়া কিছু দিন ছিলাম। খনির শ্রমিকদের ধর্মঘট তখনও চলিতেছিল। রাত্রে লণ্ডন সহর অন্ধ-আলোকিত হইত। ডার্কিসায়ারের নিকটবর্তী খনি অঞ্চলে আমি অবস্থা দেখিতে গিয়াছিলাম। আমি দেখিলাম আবালবৃদ্ধবনিতার শুষ্ক মুখে বেদনার চিহ্ন, তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে শ্রীহীনতার ছাপ। তদপেক্ষাও মর্ম্মান্তিক দৃশ্য উদ্ঘাটিত হইল স্থানীয় বিচার আদালতে, সেখানে ধর্মঘটী ও তাহাদের স্ত্রীদের বিচার চলিতেছিল। কয়লার খনির ডাইরেক্টর এবং ম্যানেজারেরাই এখানে ম্যাজিস্ট্রেট এবং তাঁহারাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধে জরুরী আইন অনুসারে বিচার করিয়া ধর্মঘটীদের দণ্ড দিতেছিলেন। একটি বিচার দেখিয়া আমি ক্রুদ্ধ হইলাম। তিনটি কি চারটি স্ত্রীলোককে তাহাদের কোলে সম্মানসহ কাঠগড়ায় হাজির করা হইল। তাহাদের অপরাধ—তাহারা ধর্মঘটবিরোধী শ্রমিকদের ব্যঙ্গ করিয়াছে। এই অল্পবয়স্কা জননীগণ (তাহাদের সম্মানগুলিও) জীর্ণমলিনবসনা এবং পুষ্টিহীন অত্যন্ত শীর্ণ। দীর্ঘকালব্যাপী ধর্মঘটের বেদনা ও অভাব অনটনের প্রতিচ্ছবি তাহাদের অবয়বে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যে সকল ধর্মঘটবিরোধী শ্রমিক তাহাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছে, তাহাদের প্রতি ইহাদের বিরক্তি ও তিক্ততা স্বাভাবিক।

শ্রেণী হিসাবে বিচার-বৈলক্ষ্যের সংবাদ প্রায়ই পাঠ করা যায় এবং ভারতে ত ইহা সচরাচর ঘটনা। কিন্তু ইংলণ্ডে যে তাহার কলঙ্কমলিন দৃষ্টান্ত দেখিব এ প্রত্যাশা আমার ছিল না। আমি মর্ম্মাহত হইলাম। আমি আশ্চর্য্য হইয়া আরও দেখিলাম সর্ব্বত্রই ধর্মঘটীরা যেন ভয়ে আড়ষ্ট। আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে, পুলিশ ও কর্তৃপক্ষের কঠোর নীতি তাহাদিগকে ভীত করিয়া রাখিয়াছে এবং সকল প্রকার অস্ত্রায়

জওহরলাল নেহরু

ব্যবহারই তাহারা নীরবে সহ্য করিতেছে। দীর্ঘকাল ধর্মঘটের পর তাহারা শ্রান্ত ক্লান্ত, তাহাদের সমস্ত ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। অগ্ন্যাগ্ন ট্রেড ইউনিয়নের শ্রমিকেরা বহুপূর্বেই তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছে। তথাপি দরিদ্র ভারতীয় শ্রমিকদের সহিত ইহাদের আকাশ পাতাল ব্যবধান। এততেও ব্রিটিশ খনি-শ্রমিকদের সম্মুখিত তখনও প্রবল, জাতীয়, এমন কি আন্তর্জাতিক সহায়ত্ব তাহাদের পক্ষে। ট্রেড ইউনিয়ন্স আন্দোলনের সাহায্যে প্রচারকার্য এবং অগ্ন্যাগ্ন নানাবিধ সহায়তা তাহারা লাভ করিতেছে। ভারতীয় শ্রমিকেরা এ সকল সুবিধা পায় না। তথাপি চোখে মুখে ভীতির ছাপের দিক দিয়া উভয়ের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য।

এই বৎসর ভারতবর্ষে ব্যবস্থা পরিষদ ও প্রাদেশিক আইন সভার তৃতীয় বার্ষিক নির্বাচনের ব্যাপার চলিতেছিল। এ সম্বন্ধে আমার বিশেষ কৌতূহল ছিল না। কিন্তু তীব্র বাদপ্রতিবাদের খবর সুইজারল্যান্ডেও আমার নিকট পৌঁছিত। আমি গুনিলাম, ভূতপূর্ব স্বরাজ্য দল এবং অধুনা কংগ্রেস দলের বিরুদ্ধতা করিবার জগ্ন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং লাল লাজপত রায় এক নূতন দল গঠন করিয়াছেন। ইহারা হইলেন জাতীয় দল। আমি তখনও বুঝিতে পারি নাই, এখনও জানি না নীতিগত কি পার্থক্যের ফলে এই নূতন দল পুরাতন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন। অবশ্য ইদানীং আইন সভার দলগুলির মধ্যে নীতিগত কোন পার্থক্য নাই, ইহা একই কথার হেরফের মাত্র। সর্বোপরি স্বরাজ্য দলই কাউন্সিলের মধ্যে সংগ্রামশীল শক্তি লইয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং ইহারাই অগ্ন্যাগ্ন দল অপেক্ষা নরমপন্থী বলিয়া বিবেচিত হইতেন। কিন্তু এই পার্থক্য নীতিগত নহে, কেহ একটু বেশী চরম, কেহ একটু কম।

নূতন জাতীয়দল অনেকাংশে নরমপন্থী এবং স্বরাজ্য দল অপেক্ষা নিঃসন্দেহে দক্ষিণমার্গী। হিন্দু মহাসভার সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রক্ষা করিয়া ইহারা কার্য্য করিতেছিলেন এবং ইহা সম্পূর্ণভাবে একটি হিন্দু দল। পণ্ডিত মালব্যের এই দলের নেতৃত্বের কারণ সহজেই বুঝা যায়, কেন না, ইহা তাহার নিজের মতবাদেরই অভিব্যক্তি। যদিও তিনি পুরাতন সাহচর্য্য রক্ষা করিয়া কংগ্রেসের মধ্যেই ছিলেন তথাপি তাহার মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী মডারেটগণ হইতে বিশেষ পৃথক ছিল না। তিনি অসহযোগ অথবা কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ সম্মুখমূলক কার্য্যপ্রণালীর প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না এবং কংগ্রেসের নূতন কার্য্যপ্রণালী গঠনে যোগ দেন নাই। যদিও তিনি কংগ্রেসে শ্রদ্ধা ও সাদর অভ্যর্থনা লাভ করিতেন তথাপি নূতন কংগ্রেসের মধ্যে তিনি ছিলেন না। তিনি কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির সদস্য হন নাই। তিনি কংগ্রেসের

ভারতে রাজনৈতিক বিভর্ত

নির্দেশ, বিশেষভাবে আইন সভা সম্পর্কিত নীতি কখনও মানিয়া লন নাই। তিনি হিন্দু মহাসভারও একজন জনপ্রিয় নেতা এবং সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে কংগ্রেসের নীতির সহিত তাঁহার পার্থক্য ছিল। কংগ্রেসের ন্যূনা হইতে তিনি ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া এই প্রতিষ্ঠানের উপর তাঁহার আবেগময় অমুরাগ ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের আদর্শবাদও তাঁহাকে আকর্ষণ করিত এবং তিনি জানিতেন যে, কংগ্রেস ব্যতীত অন্য কোন প্রতিষ্ঠানই এ সম্পর্কে কোন উল্লেখযোগ্য কার্য্য করিতেছে না। এই সকল কারণে তাঁহার হৃদয় সর্বদাই কংগ্রেসপন্থীদের দিকে খাচিত হইত, বিশেষতঃ সংগ্রামের মুহূর্ত্তে তিনি কংগ্রেসের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতেন কিন্তু তাঁহার মস্তিষ্ক থাকিত অন্য দলের সহিত। ইহার অপরিহার্য্য ফলস্বরূপ তাঁহাকে ক্রমাগত নিজের মনের সহিত যুদ্ধ করিতে হয় এবং কখনও বা তিনি একই কালে দুই বিপরীত দিকে চলিবার চেষ্টা করেন। তাহার ফলে জনসাধারণের বুদ্ধি ঘুলাইয়া যায়। কিন্তু জাতীয়তাবাদ একটি আশ্চর্য্য ধোঁয়াটে পদার্থ এবং মালবাজী সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সহিত সম্পর্কহীন নিছক জাতীয়তাবাদী মাত্র। তিনি কি সামাজিক কি অর্থনৈতিক সকল দিক দিয়াই প্রাচীন সনাতন শিক্ষা, সংস্কৃতির সমর্থক, এবং ভারতীয় দেশীয় নৃপতি, বড় জমিদার এবং তালুকদারগণ তাঁহাকে একজন সহৃদয় বন্ধুরূপে গৃহণ করেন। তিনি কেবলমাত্র একটি পরিবর্তন চাহেন এবং সমস্ত অন্তর দিয়া সেই পরিবর্তন কামনা করেন—ভারতে বৈদেশিক কর্তৃত্বের অবসান হউক। তাঁহার যৌবনের শিক্ষা ও অধ্যয়ন এখনও তাঁহার মনের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে। তিনি তিন চার সহস্র বৎসরের পুরাতন হিন্দু সংস্কৃতি ও বর্ণাশ্রমধর্মের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া, টি এইচ গ্রীন, জন ষ্টুয়ার্ট মিল, গ্লাডস্টোন ও মর্লির চিন্তাধারায় অল্পপ্রাণিত ঊনবিংশ শতাব্দীর চশমা দিয়া মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী তীব্র গতিশীল এবং বৈপ্লবিক আবেগময় বিংশশতাব্দীকে নিরীক্ষণ করেন। বহুবিধ স্ববিरोধিতার ইহা আশ্চর্য্য সম্মেলন; কিন্তু এই সকল বিরোধিতার নিরসন করিবার স্বকীয় শক্তির উপর তাঁহার বিশ্বাসের বিশ্বাস আছে। তিনি যৌবনের প্রারম্ভ হইতে বহু জনহিতকর কার্য্য করিয়াছেন, বারাগনসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মত সর্বহং প্রতিষ্ঠান তাঁহার সাফল্যের নিদর্শন। তাঁহার অকপট চরিত্র, সতত কল্পপ্রবণতা, অপূর্ণ বাগ্মিতা, অমায়িক ব্যবহার, শ্রদ্ধা-উদ্বেককারী ব্যক্তিত্বের ফলে ভারতীয় জনসাধারণের, বিশেষভাবে হিন্দুদিগের নিকট তিনি প্রিয় হইয়াছেন। তাঁহার সহিত ষাঁহাদের মতভেদ আছে, ষাঁহারা তাঁহার রাজনীতির অহুগামী নহেন, তাঁহারাও তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত ভালবাসিয়া থাকেন। তাঁহার বয়ঃক্রম

জগদ্বলাল নেহরু

এক স্বাধীনকালের জনসেবার কলে বর্তমান ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং অভিজ্ঞতম ব্যক্তি। কিন্তু তবুও যেন মনে হয়, তিনি আজিকার দিনের লোক নহেন, বর্তমান জগতের সহিত তাঁহার যোগসূত্র ছিল হইয়াছে। তাঁহার কথা সকলেই শ্রদ্ধাবনত শিরে শ্রবণ করে কিন্তু তাঁহার ভাষা ও ভাব আজিকার দিনে অনেকের নিকটেই দুর্বোধ্য।

অতএব মালবাজী যে স্বরাজ্য দলে যোগদান করিলেন না ইহা স্বাভাবিক। প্রথমতঃ এই দলের অগ্রগামী রাজনীতির বাধা, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার পক্ষে কংগ্রেসের নিয়মশৃঙ্খলার সম্পূর্ণ অনুগত্য স্বীকার করা কঠিন। রাজনীতি এবং সাম্প্রদায়িকতার দিক দিয়া তিনি একটু নরমপন্থা এবং বিস্তৃততর পরিধি চাহিয়াছিলেন। স্থাপয়িতা ও নেতাহিসাবে তিনি নূতনদলের মধ্যে তাহাই পাইয়াছিলেন।

কিন্তু যদিও লালা লাজপৎ রায় দক্ষিণপন্থী এবং সাম্প্রদায়িকতার দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন তথাপি তাঁহার এই নূতন দলে যোগদানের কারণ অনুমান করা কঠিন। গ্রীষ্মকালে আমার সহিত জেনেভায় লালাজীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার সহিত কথাবার্তা হইতে বুঝিতে পারি নাই যে, তিনি কংগ্রেস দলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবেন। ইহা কেমন করিয়া ঘটয়াছিল তাহা এখনও আমার নিকট দুর্বোধ্য। নির্বাচন যুদ্ধের সময় তিনি এমন কতকগুলি অভিযোগ আনিয়াছিলেন যাহা হইতে তাঁহার মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কতকটা অনুমান করা যায়। কংগ্রেসের নেতারা ভারতের বাহিরের লোকের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন তিনি এই অপবাদ দিয়াছিলেন। তিনি আরও অভিযোগ আনিয়াছিলেন যে, তাঁহার কাবুলে একটি কংগ্রেসের শাখা প্রতিষ্ঠানের ষড়যন্ত্র করিতেছেন। কিন্তু পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি তাঁহার অভিযোগগুলি বিস্তৃত বিবরণ দিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন নাই।

আমার মনে আছে, সুইজারল্যাণ্ডে বসিয়া ভারতীয় সংবাদপত্রে লালাজীর অভিযোগগুলি পাঠ করিয়া আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলাম। কংগ্রেসের সম্পাদক হিসাবে আমি আমাদের প্রতিষ্ঠানের সকল খবরই জানি। কাবুল কমিটিকে শাখারূপে গ্রহণ করিবার প্রস্তাবের দায়িত্ব আমারই এবং দেশবন্ধু দাশও এ ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন। অভিযোগের বিষয়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমি তখনও জানিতাম না, এখনও জানি না। তবে সাধারণভাবে ঐগুলি বিচার করিয়া আমি বলিতে পারি যে, কংগ্রেসের দিক দিয়া দেখিলে ঐগুলি ভিত্তিহীন। আমি জানি না, কে লালাজীর

মনে ঐক্য প্রাপ্তি ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছিলেন। হয় ত কতকগুলি গুপ্তব
 তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন অথবা যে মৌলবী ওবেইদুল্লাহর কথায় আমি
 কোন গুপ্ত আরাপ করি নাই তিনি হয় ত তাঁহার দ্বারাই প্রভাবান্বিত
 হইয়াছিলেন। কিন্তু নির্বাচন এক অদ্ভুত দৃশ্য। ইহাতে সাধারণ
 ভ্রমতার আদর্শ ওলট পালট হইয়া যায় এবং বিন্দুস্বরূপ বিচার উপস্থিত
 হয়। ইহা আমি গতই দেখিতেছি ততই আশ্চর্য্য হইতেছি এবং
 সম্পূর্ণরূপে গণতন্ত্রবিরোধী এক বিতৃষ্ণা আমার মধ্যে বর্ধিত হইতেছে।

কিন্তু ব্যক্তিত্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও ক্রমবর্ধিত সাম্প্রদায়িক
 মনোমালিন্যের আবহাওয়ায় জাতীয়দল অথবা অনুরূপ কোন দলের সৃষ্টি
 অনিবার্য্য। একদিকে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু-ভীতি, অত্রদিকে
 মুসলমানদের ভয়প্রদর্শনে (হিন্দুদের মতে) হিন্দুদের বিক্ষোভ। অনেক হিন্দু
 ভাবিতে লাগিলেন যে, মুসলমানেরা জোর করিয়া আদায় করিবার মনোভাব
 দেখাইতেছেন এবং অত্র পক্ষে যোগ দিব এই ভয় দেখাইয়া বিশেষ স্ববিধার
 ফিকির খুঁজিতেছেন। ইহার ফলে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী
 হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা এবং হিন্দু জাতীয়তার প্রতিনিধিস্বরূপ হিন্দু মহাসভা
 প্রবল হইয়া উঠিল। মহাসভার আক্রমণমূলক কার্য্যপদ্ধতির প্রতিক্রিয়ায়
 মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা পরিপুষ্ট হইতে লাগিল এবং ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায়
 দেশের সাম্প্রদায়িক উত্তাপ বর্ধিত হইতে লাগিল। সমস্তা দাঁড়াইল,
 দেশবাসী সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় এবং এক বৃহৎ সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়
 লইয়া। কিন্তু দেশের সকল অংশের অবস্থা সমান নহে। পাঞ্জাব ও
 সিন্ধুদেশে হিন্দু ও শিখের সংখ্যালঘিষ্ঠ ও মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ
 সম্প্রদায়। এখানে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলি ভারতের অন্যান্য অংশের
 মুসলমানদের মতই বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় কর্তৃক নির্ধাতিত হইবার
 ভয় করিতে লাগিল। অথবা সত্য কথা বলিলে বলিতে হয়, প্রত্যেক দলের
 মধ্যশ্রেণীর চাকুরীপ্রার্থীর দল একে অপরের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইবে
 এই ভয় করিতে লাগিল এবং কায়মী স্বার্থের মালিকগণও আয়ুল
 পরিবর্তনজনিত ক্ষতির আশঙ্কায় আতঙ্কিত হইয়া উঠিল।

সাম্প্রদায়িকতার অভ্যুত্থানে স্বরাজ্য দল ক্ষতিগ্রস্ত হইল। অনেক
 মুসলমান সদস্য খসিয়া পড়িয়া সাম্প্রদায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোগ দিলেন।
 কতক হিন্দু সদস্যও জাতীয় দলে চক্ষিমাণ গেলেন। মালবাজী ও লাল লাজপৎ
 রায়ের মিলিত শক্তি হিন্দু নির্বাচকমণ্ডলীর উপর প্রভাব বিস্তার করিল
 এবং সাম্প্রদায়িকতার কেন্দ্রভূমি পাঞ্জাবে লালাজীর অসামান্য প্রভাব
 ছিল। স্বরাজ্য দল অথবা কংগ্রেসের পক্ষ হইতে নির্বাচন সংগ্রামের

জওহরলাল নেহরু

দায়িত্বের অধিকাংশই পড়িল আমার পিতার স্বন্ধে। তাঁহার দায়িত্বের অংশ যিনি গ্রহণ করিতে পারিতেন সেই দাশ মহাশয় তখন পরলোকে। পিতা সংগ্রামপ্রিয় ছিলেন এবং কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না। এবং বাধা যতই প্রবল হইল তিনি ততই অধিকতর উৎসাহে নির্বাচনযুদ্ধে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন। তিনি কঠিন আঘাত পাইলেন, প্রতিঘাত করিতেও ইচ্ছন্ততঃ করিলেন না। উভয় দলের সংঘর্ষের মধ্যে শালীনতার চিহ্নও রহিল না এবং এই নির্বাচন এক তিক্ত স্মৃতি রাখিয়া গেল।

জাতীয় দল অনেকাংশে সাফল্য লাভ করিলেন। কিন্তু এই সাফল্যের ফলে ব্যবস্থা পরিষদের মধ্যে রাজনৈতিক উগ্র মত প্রশমিত হইল। দক্ষিণমারগীরাই বেশী শক্তি লাভ করিলেন। স্বরাজ্য দলও ছিল কংগ্রেসের দক্ষিণমারগীদল। এবং দলের শক্তিবৃদ্ধি করিতে গিয়া ইহারা এমন সব অবাস্থনীয় লোককে দলে প্রবেশ করিতে দিলেন, যাহারা দলের যোগ্যতা ও কুশলতার অপহুব ঘটাইল। জাতীয় দলেরও অবস্থা প্রায় একই প্রকার, তবে তাঁহারা আরও এক স্তর নীচে নামিয়া গেলেন এবং রাজনীতির সহিত সম্পর্কহীন, খেতাবধারী, জমিদার ও ব্যবসায়ীরা এই দলে ভীড় জমাইলেন।

১৯২৬-এর শেষভাগে এক কলঙ্কমলিন কুর্কীড়ির সংবাদে সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুণায় ও লজ্জায় শিহরিয়া উঠিল। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বুদ্ধির শোচনীয় অধোগতি এই ঘটনায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। রোগশয্যা-শায়ী স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এক ধর্ম্মাঙ্ক কর্তৃক নিহত হইলেন। যে ব্যক্তি গুর্খাসৈন্তের উদ্যত রাইফেল ও সঙ্গীদের সম্মুখে অনাবৃত বক্ষ প্রসারিত করিয়া ধরিয়াছিলেন, তাঁহার এই শোচনীয় পরিণতি! আট বৎসর পূর্বে আর্ধ্য সমাজের এই নেতা দিল্লীর জুম্মা মসজিদের বক্তৃতা মঞ্চ হইতে হিন্দু-মুসলমান মিলিত বিশাল জনতাকে একা ও ভারতের স্বাধীনতার বাণী শুনাইয়াছিলেন এবং উৎসাহ উদ্দীপনায় জনতা হিন্দু-মুসলমানের জয় ধ্বনি করিয়াছিল। তাহারা রাজপথে সেই মিলনের জয়ধ্বনি নিজেদের দেহের রক্তে লিপিয়া দিয়াছিল। আজ তিনি তাঁহার একজন স্বদেশবাসী কর্তৃক নিহত হইলেন! সে মনে করিল এই হত্যা দ্বারা সে ধর্ম্মাচ্ছোদিত কার্য্যই করিল এবং সে ইহার দ্বারা 'বেহেস্ত' লাভ করিবে।

যে সাহস মহৎ উদ্দেশ্যের জগ্ন্য দৈহিক যন্ত্রণা, এমন কি মৃত্যুবরণ করিতে পারে, আমি সর্ব্বদাই সেই সাহসের অত্মরাগী। আমার বিশ্বাস, অনেকেই ইহার প্রশংসা করেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মধ্যে এক পরমাশ্চর্য্য নির্ভীকতা ছিল। সন্ন্যাসীর গৈরিকে আবৃত তাঁহার দীর্ঘ সমুন্নত দেহ

ভারতে রাজনৈতিক বিতর্ক

বয়োধিকোও যাহা ঋজু, তাঁহার দীপ্ত চক্ষু, বাহাতে সময় সময় অপরের দৌর্বল্য দেখিলে ক্রোধ ও বিরক্তির ছায়া জাগিয়া উঠে—এই চিত্র আমার মানসপটে কত সমুজ্জল এবং ঘুরিয়া ফিরিয়া কতবার তাহা আমার মনে পড়ে!

২৩

ক্রসেলস-এ নির্যাতিত সম্মেলন

(১৯২৬-এর শেষ ভাগে বার্লিন থাকাকালীন আমি গুনিতে পাইলাম যে, শীঘ্রই ক্রসেলসে নির্যাতিত জাতিগুলির এক কংগ্রেসের বৈঠক বসিবে।) প্রস্তাবটি আমার ভাল লাগিল। ক্রসেলস কংগ্রেসে ভারতীয় রাষ্ট্র মহাসভার পক্ষ হইতে সরকারী ভাবে প্রতিনিধি প্রেরণ করা উচিত এই মর্মে আমি ভারতে পত্র লিখিলাম। আমার প্রস্তাব মঞ্জুর হইল এবং আমি ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলাম।

১৯২৭-এর ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে ক্রসেলস-এ কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল। ইহার প্রবর্তক কে আমি জানি না। (এই কালে সর্বদেশের রাজনৈতিক, নির্বাসিত ও চরমপন্থীদের আকর্ষণের কেন্দ্র ছিল বার্লিন। এ বিষয়ে বার্লিন প্রায় পার্যীর সমকক্ষ হইয়া উঠিতেছিল। কমুনিষ্টরাও এখানে শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল।) নির্যাতিত জাতিসমূহ নিজেদের মধ্যে এবং বামপন্থী শ্রমিকদের সহিত মিলিত হইয়া এক সাধারণ উদ্দেশ্যে কার্য করিবার কথা তখন আলোচিত হইতেছিল। স্বাধীনতার সর্বজনীন যুগ্ম সাম্রাজ্যবাদরূপী এক সাধারণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। অতএব সকলের মিলিত-ভাবে কার্যপদ্ধতি স্থির এবং সম্ভব হইলে একত্রে কার্য করাই উচিত, এই শ্রেণীর কথা অনেকেই ভাবিতেছিলেন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী প্রভৃতি শক্তি বাহাদের উপনিবেশিক সাম্রাজ্য আছে, তাহারা এই শ্রেণীর উত্তমের স্বভাবতই বিরোধিতা করিবেন। কিন্তু যুদ্ধের পর জার্মানীর কোন উপনিবেশ না থাকায়, জার্মান গভর্নমেন্ট অগ্ৰাণ্য শক্তির উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির এই শ্রেণীর আন্দোলনের প্রতি এক সদয় নিরপেক্ষতা দেখাইতেন। এই কারণেই বার্লিন সর্বদেশের অসঙ্খ্য ও অগ্রগামী দলের কেন্দ্রভূমি হইয়াছিল। (ইহাদের মধ্যে চীনের কু-মিন-টাং-

এর বামপন্থীরাই খুব বেশী অগ্রগামী এবং সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন; তখন চীনে কু-মিন-টাং-এর দুর্ব্বার অভিযানের সম্মুখে প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। এমন কি, সাম্রাজ্যবাদী-শক্তিগুলি তাহাদের আক্রমণশীল অভ্যাস ও সম্প্রদায়িক সংঘত করিয়া এই অভিনব দৃশ্য দেখিতেছিল। মনে হইতে লাগিল যেন চীনের ঐক্য ও স্বাধীনতার সমস্তার সমাধান আর অধিক দূরে নহে। (কু-মিন-টাং-এর সাফল্যের বার্তা সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। ইহারা জানিতেন, সম্মুখেও বাধা আছে প্রচুর। এই কারণে শক্তিবৃদ্ধির জন্ত ইহারা আন্তর্জাতিক প্রচারকার্যে রত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই দলের বামপন্থীরাই বিদেশের কম্যুনিষ্ট কিম্বা কম্যুনিষ্টভাবাপন্নদের সহিত সহযোগিতা করিয়া এই আন্দোলনের প্রতি ঝোঁক দিয়াছিলেন।) স্বদেশে দলের মধ্যে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি এবং বাহিরে চীনের জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধি এই উভয়বিধ লক্ষ্য তাঁহাদের ছিল। দলের মধ্যে তখনও ভেদ দেখা দেয় নাই। দুই কিম্বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দ্বী কিম্বা পরস্পর বিরোধীদল তখনও সৃষ্ট হয় নাই, বাহ্যতঃ তাঁহারা সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন।

(কু-মিন-টাং-এর ইউরোপীয় প্রতিনিধিরা) নির্ঘাতিত জাতিসমূহের কংগ্রেসের প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করিলেন। সম্ভবতঃ ইহারা ই আরও কতিপয় ব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া এই কংগ্রেসের ব্যবস্থা করেন। সূচনা হইতেই এই প্রস্তাবের পশ্চাতে কয়েকজন কম্যুনিষ্ট অথবা অল্পরূপ মতাবলম্বী ব্যক্তি ছিলেন। তবে কম্যুনিষ্টরা কখনও মুখ্য অংশ গ্রহণ করেন নাই।

(আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা পীড়িত লাটিন আমেরিকা হইতেই সাহায্য এবং কাধ্যাকরী সমর্থন আসিল। তখন) মেক্সিকোর সভাপতি ছিলেন চরমপন্থী। তাঁহারাও যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী লাটিন আমেরিকান দলের পুরোভাগে আসিবার জন্ত আগ্রহশীল ছিলেন। অতএব মেক্সিকো ক্রসেল্‌স্‌ কংগ্রেস সম্বন্ধে অত্যন্ত আগ্রহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। স্থানীয় গভর্নমেন্ট সরকারীভাবে যোগ দিতে না পারিলেও তাহাদের পক্ষ হইতে একজন বিখ্যাত বাঙ্গালীতিবিশারদ দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন।

(জাভা, ইন্দো-চীন, প্যালেষ্টাইন, পিরিয়া, মিশর, উত্তর আফ্রিকার আরবগণ এবং আফ্রিকার নিগ্রোগণের জাতীয় সম্মেলনের পক্ষ হইতে প্রতিনিধিগণ ক্রসেল্‌স্‌-এ উপস্থিত ছিলেন। ইহা ছাড়া, বহু চরমপন্থী শ্রমিকসংঘের প্রতিনিধি এবং ইউরোপীয় শ্রমিক সংঘর্ষে দীর্ঘকালে নেতৃত্ব করিয়াছেন এমন কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তিও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। (অনেক

ক্রসেল্‌স-এ নির্ব্যাতিত সম্মেলন

কম্যুনিষ্টও প্রতিনিধিরূপে আলোচনায় বিশেষভাবে যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কম্যুনিষ্টরূপে নহে, শ্রমিকসঙ্ঘ বা অল্পরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি রূপেই আসিয়াছিলেন।)

জর্জ ল্যান্সবেরী সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার অভিভাষণ বেশ আবেগময় হইয়াছিল। এই বক্তৃতা হইতে প্রমাণ হইল যে, কংগ্রেস ততটা চরমপন্থী নহে এবং কম্যুনিজম প্রচারের কৌশলমাত্রও নহে। কিন্তু মোটের উপর সম্মেলন কম্যুনিষ্টদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্নই ছিল। যদিও কতকগুলি ব্যাপারে মতের ঐক্য সম্ভবপর হয় নাই তথাপি সম্মিলিতভাবে কাধ্য করিবার ভূমির অভাব ছিল না।

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হইতে মিঃ ল্যান্সবেরী স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু তাঁহার এই হঠকারিতার জ্ঞপ্তি পরে তিনি অতৃপ্ত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ব্রিটিশ শ্রমিকদলের সহকর্মীরাও তাঁহার এই কাধের অল্পমোদন করে নাই। শ্রমিকদল তখন “হিজ্‌ ম্যাজেস্টিস্‌ অপোজিসন্‌” হইতে “হিজ্‌ ম্যাজেস্টিস্‌ গভর্নমেন্টে”রূপে ফুটিবার উপক্রম করিতেছেন। এবং ভবিষ্যৎ মন্ত্রীদের পক্ষে বৈপ্লবিক রাজনীতি লইয়া আলোচনা নিরাপদ নহে। সময় নাই এই অজুহাত দেখাইয়া তিনি সভাপতির পদত্যাগ করিলেন। এমন কি সঙ্ঘের সদস্যপদও ত্যাগ করিলেন। দুই তিন মাস পূর্বে যাহার বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির এই আকস্মিক মত পরিবর্তনে আমি ব্যথিত হইলাম।

যাহা হউক অনেক প্যাতনামা ব্যক্তি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সঙ্ঘের পৃষ্ঠপোষক হইলেন। ইহাদের মধ্যে আইনষ্টাইন, মাদাম সান ইয়াং সেন এবং আমার মনে হয় রোম্যাঁ রোল্যাঁও ছিলেন।) কিন্তু পরে প্যালেষ্টাইনে আরব ও ইহুদী কলহে সঙ্ঘের আরব প্রীতিমূলক কার্যকলাপের সহিত একমত না হইতে পারিয়া কয়েকমাস পরে আইনষ্টাইন পদত্যাগ করেন।

(ক্রসেল্‌স্‌ কংগ্রেস এবং পর পর বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত সঙ্ঘের কমিটির অধিবেশন হইতে আমি পরাধীন দেশ ও উপনিবেশগুলির সমস্তা সম্পর্কে অনেক জ্ঞানসঞ্চয় করিলাম।) পাশ্চাত্য শ্রমিকজগতের আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ ও সংঘাত ইহার মধ্য দিয়া আমি অধিকতর স্পষ্টভাবে দেখিতে পারিলাম। ইতিপূর্বেও আমি কিছু কিছু জানিতাম এবং পুঁথি-পুস্তকেও কিছু পাঠ করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার জ্ঞানের পশ্চাতে কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা বা ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল না। এখন এই যোগাযোগের ফলে কোন সমস্তার সম্মুখীন হইলেই আমি বুঝিতে পারি, কোন অন্তর্নিহিত সংঘাতের ইহা

প্রতিচ্ছবি। শ্রমিকজগতে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক অপেক্ষা তৃতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতি আমার সহানুভূতি ছিল। যুদ্ধের পর হইতে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের কার্যকলাপ দেখিয়া আমি বিতুষ্ট ও বিরক্ত হইয়াছিলাম। ইহার সর্বপ্রধান সমর্থক ব্রিটিশ শ্রমিকদের আচরণ ও ব্যবহার সম্পর্কে ভারতে আমরা অনেক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করিয়াছিলাম। এই কারণে সদিচ্ছা লইয়া আমি অনিবার্যরূপে কমুনিজম-এর দিকে ঝুঁকিলাম। ইহার আর যে দোষই থাকে অন্ততঃ ইহার ভণ্ডামি নাই এবং ইহা সাম্রাজ্যবাদী নহে। ইহা মতবাদের অহুবর্তন নহে, কেন না, কমুনিজম-এর সূক্ষ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানিতাম না। আমি অত্যন্ত সীমাবদ্ধরূপে ইহার মোটামুটি অবয়বের সহিত পরিচিত ছিলাম। ইহা এবং রুশিয়ার অভূতপূর্ব পরিবর্তনের প্রতি আমি আকৃষ্ট হইলাম। কিন্তু কমুনিষ্টদের মতবাদের গোড়ামী, আক্রমণশীল ও কিয়ৎপরিমাণে স্থলকচির কাব্যপ্রণালী এবং কাহারও সহিত মতে না মিলিলেই তাহাকে জাহান্নামে ঠেলিয়া দিবার অভ্যাস দেখিয়া আমি মাঝে মাঝে বিরক্ত হইতাম। আমার মধ্যে এই প্রতিক্রিয়াকে তাহার নিশ্চয়ই আমার বুজ্জিয়া পদ্ধতিতে শিক্ষা ও লালনপালনের ফল বলিয়া অভিহিত করিবে।

আমাদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সঙ্ঘের সভাগুলিতে ছোটখাট তর্কবিতর্কে আমি সাধারণতঃ স্যাংলো আমেরিকান সদস্যদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বসিতাম। ইহা আশ্চর্য্য মনে হইতে পারে, কিন্তু আমাদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর কতকটা সাদৃশ্য ছিল। অথবা অতিশয়োক্তিতে ভরা এবং আলঙ্কারিক আড়ম্বরপূর্ণ ভাষায় রচিত প্রস্তাবগুলি যখন প্রায় ঘোষণাপত্রের হ্রায় হইয়া উঠিত তখন আমরা সম্মিলিত ভাবে উহার প্রতিবাদ করিতাম। আমরা সংক্ষিপ্ত ও সরল প্রস্তাবের পক্ষপাতী ছিলাম, কিন্তু ইউরোপের প্রচলিত নীতি ঠিক ইহার বিপরীত। কখনও বা কমুনিষ্টদের সহিত অণ্ণাত্তের মতভেদ উপস্থিত হইত কিন্তু আমরা সহজেই আপোষ করিয়া ফেলিতাম। পরে আমরা দেশে ফিরিয়া আসায় আর এই সব সভায় যোগ দিতে পারি নাই। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বৈদেশিক ও ঔপনিবেশিক বিভাগগুলি কংগ্রেস দেখিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছিল। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র বিভাগের খাতনামা লেখক আনন্দের তাহার একখানি পুস্তকে এ বিষয়ে রোমাঞ্চকর এবং হাস্যোদ্দীপক বর্ণনা দিয়াছেন। কংগ্রেসের মধ্যেও বহু আন্তর্জাতিক গুপ্তচর ছিল, বিভিন্ন গোয়েন্দাবিভাগ হইতেও অনেকে প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছিলেন। একটি কৌতুককর দৃষ্টান্তের কথা

ক্রসেল্‌স-এ নির্ব্যাতিত সন্মেলন

আমার মনে আছে। আমার একজন আমেরিকান বন্ধু প্যারী থাকা-কালীন ফরাসী গুপ্তচর বিভাগের একজন ফরাসী ভদ্রলোক তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন। কতকগুলি বিষয়ে খবর লইবার জন্য বন্ধুভাবেই তিনি দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। কাজের কথা শেব হইলে তিনি আমেরিকান ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারেন কি না? পূর্বে তাঁহার সহিত যে দেখা হইয়াছিল তাহা কি স্মরণ আছে? আমেরিকান ভদ্রলোক অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া স্বীকার করিলেন যে, কোন কথাই আমার স্মরণ হইতেছে না। তখন গুপ্তচরটি বলিলেন যে, তিনি হাতে ও মুখে কাল রং মাখিয়া নিগ্রো প্রতিনিধিরূপে ক্রসেল্‌স কংগ্রেসে যোগ দিয়াছিলেন এবং সেইখানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

কোলনে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সন্মেলন এক সভায় আমি যোগ দিয়াছিলাম। সভার পর অদূরবর্তী ডুসেলডর্ফে, স্ট্রাকোভ্যানজিট সভায় যোগদানের জন্য আমাদের আহ্বান করা হইল। এই সভা হইতে আমরা ফিরিতেছি এমন সময় পুলিশ আমাদের ছাড়পত্র দেখিতে চাহিল। অনেকেরই সঙ্গে ছাড়পত্র ছিল, কিন্তু আমি কয়েক ঘণ্টার জন্য ডুসেলডর্ফে যাইতেছি মনে করিয়া ছাড়পত্রটি কোলনের হোটেলে ফেলিয়া আসিয়াছিলাম। আমাকে পুলিশ ষ্টেসনে লইয়া যাওয়া হইল। সোভাগাক্রমে এক ইংরাজদম্পতিও আমার সঙ্গে ছিলেন। সম্ভবতঃ ইহারও কোলনে পাসপোর্ট ফেলিয়া আসিয়াছিলেন। টেলিফোনে খোঁজখবর করার পর এক ঘণ্টা পরে পুলিশের বড় কর্তা সৌজন্য-সহকারে আমাদের মুক্তি দিলেন।

পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী-সম্মেলনের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াও অনেকটা কম্যুনিজম্-এর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। আমার সহিত কেবলমাত্র চিঠিপত্রে ইহার সহিত সম্পর্ক ছিল। ১৯৩১ সালে কংগ্রেসের সহিত গভর্নমেন্টের দিল্লী-চুক্তিতে আমি স্বাক্ষর করায় সম্মেলন আমার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং আমার টিকি, মালা, পৈতা কাড়িয়া লইয়া জাতিচ্যুত করিলেন। সাদা কথায়, একটি প্রস্তাব করিয়া আমাকে সম্মেলন হইতে বহিষ্কৃত করা হইল। একথা স্বীকার করিতে আমার দ্বিধা নাই যে, সম্মেলন পক্ষে বিরক্তির কারণ ঘটিয়াছিল। তথাপি ইহার আমাকে কৈফিয়ৎ দিবার সুযোগ দিতে পারিতেন। ১৯২৭-এর গ্রীষ্মকালে পিতা ইউরোপে আসিলেন, আমি ভিনিসে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তাহার পর কয়েকমাস আমরা এক সঙ্গেই ছিলাম। নভেম্বর

জওহরলাল নেহরু

মাসে সোভিয়েটের দশমবার্ষিক স্মৃতি উৎসব উপলক্ষে আমরা সকলে— পিতা, আমার স্ত্রী ও ছোট ভগ্নী মস্কো যাত্রা করিলাম। শেষমুহূর্তে ইহা ঠিক হইল এবং মস্কোতে আমরা মাত্র তিন চার দিন ছিলাম। তবুও আমরা সুখী হইলাম, কেন না এই চোখের দেখাটুকুরও দাম আছে। নূতন কৃষিয়া সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করার পক্ষে ইহা কিছুই নহে। তবুও কৃষিয়া সম্পর্কে কিছু পাঠ করিবার সময় ইহা হইতে সাহায্য পাই। পিতার নিকট সোভিয়েট এবং যৌথ ধারণাগুলি সম্পূর্ণরূপে নূতন। তিনি তাঁহার ব্যবহারশাস্ত্র ও নিয়মতান্ত্রিকতার কাঠামো হইতে সহজে বাহির হইয়া কিছু দেখিতে পারেন না। তথাপি মস্কোতে তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

আমরা মস্কো থাকিতেই সাইমন কমিশনের কথা প্রথম ঘোষণা করা হইল। মস্কোরই একথানা খবরের কাগজে ঐ সংবাদ আমরা প্রথম পাঠ করি। কয়েকদিন পরে লণ্ডনে স্মার জন সাইমনের সহযোগীরূপে পিতা একটি অপীলের মামলায় প্রিভি কাউন্সিলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহা একটি পুরাতন জমিদারীঘটিত মামলা। বহুবর্ষপূর্বে ইহার সূচনায় আমি এই মামলার ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। এ সম্বন্ধে আমার আর কোন স্বার্থ ছিল না কিন্তু স্মার জন সাইমনের অনুরোধে পিতার সহিত একবার তাঁহার চেম্বারে পরামর্শ করিতে গিয়াছিলাম। ১৯২৭ সাল শেষ হইয়া আসিল। আমরা ইউরোপে অনর্থক অনেক সময় নষ্ট করিলাম। পিতা ইউরোপে না আসিলে হয় ত আমরা পূর্বেই ফিরিয়া যাইতাম। ফিরিবার পথে দক্ষিণপূর্ব ইউরোপ, তুরস্ক এবং মিশরে কিছুকাল কাটাইবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু আর সময় করিয়া উঠিতে পারিলাম না। দড়দিনের সময় মাত্রাজ কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিবার জন্ত আমি তাড়াতাড়ি ফিরিবার সঙ্কল্প করিলাম। ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে আমি স্ত্রী, ভগ্নী ও কন্যাসহ মার্সাই হইতে কলম্বোগামী জাহাজে উঠিলাম। পিতা আরও তিন মাসের জন্ত ইউরোপে রহিয়া গেলেন।

ভারতে প্রত্যাবর্তন এবং রাজনীতিতে যোগদান

মানসিক ও শারীরিক পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য লইয়া আমি ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিলাম। আমার দ্বী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ না করিলেও তাঁহার স্বাস্থ্য অনেকটা ভাল হইয়াছিল। এজগৎ তাঁহার সম্বন্ধে আমার বিশেষ উৎকণ্ঠা রহিল না। ইতিপূর্বে দ্বিধা-সংশয়ে আমার মনের মধ্যে যে অবস্থা ছিল তাহা দূর হইয়া গেল, আমি নূতন শক্তি ও উদ্দীপনা অনুভব করিতে লাগিলাম। (আমার দৃষ্টি অনেক প্রসারিত হইয়াছে এবং জাতীয়তাবাদ আমার নিকট অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও অসম্পূর্ণ নীতি বলিয়া মনে হইল। রাজনৈতিক স্বাধীনতা, পর শাসন হইতে মুক্তি নিশ্চয়ই বড় কথা, কিন্তু উহার প্রকৃত পথে অগ্রসর হওয়া আবশ্যিক। সামাজিক স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্র ও সমাজকে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা ব্যতীত কি দেশ কি ব্যক্তিবিশেষ কোনটাই সম্যক পরিপুষ্ট লাভ করিতে পারে না।) আমি অনুভব করিলাম যে, জগতের ঘটনাপ্রবাহ সম্বন্ধে আমার পরিষ্কার ধারণা জন্মিয়াছে এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতের সমস্তাগুলি আমি অধিকতর আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারিয়াছি। আমার অধ্যয়ন কেবল সমসাময়িক ঘটনা ও রাজনীতির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিমূলক অগ্ন্যাগ্ন বিষয়ও অধ্যয়ন করিয়াছি। ইউরোপ ও আমেরিকায় যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিমূলক পরিবর্তন চলিয়াছে তাহা মুগ্ধনেত্রে দেখিবার বস্তু। নোভিয়েট রুশিয়ায় কোন কোন অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার থাকিলেও আমাকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিল। মনে হইল, ইহা জগতের সম্মুখে এক নূতন আশার বাণী প্রচার করিতেছে।) বিংশ দশকের মধ্যভাগে ইউরোপ আত্মস্থ হইবার চেষ্টা করিতেছে—বৃহৎ অর্থসঙ্কট তখনও উপস্থিত হয় নাই। আমি এই ধারণা লইয়া ফিরিয়া আসিলাম যে, আত্মস্থ হইবার চেষ্টা বাহ্য ব্যাপার মাত্র, ভিতরে ভিতরে ইউরোপে ও সমগ্র জগতে ভূমিকম্প ও ভয়াবহ পরিবর্তনের সম্ভাবনা অদূর ভবিষ্যতের জন্ত অপেক্ষা করিতেছে।

জগতের এই সকল ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত সম্পর্কে আমাদের স্বদেশবাসীকে অশিক্ষিত করিয়া ভবিষ্যতের সম্ভাবনার জন্ত প্রস্তুত রাখাই আমাদের

আমি কণ্ঠস্বা বলিয়া মনে হইল। এই প্রস্তাব করা বহুলাংশে সম্প্রতি মতবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আদর্শ প্রচারের উপর নির্ভর করে। রাজনৈতিক স্বাধীনতাই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত ইহা নিঃসন্দেহ। সম্প্রতি ও জটিল ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের প্রস্তাব হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক আমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য স্পষ্ট করিয়া বুঝা উচিত। তাহার পর সামাজিক লক্ষ্যও নির্দিষ্ট করিতে হইবে। কিন্তু এখনই কংগ্রেসের নিকট এই পথে চলিবার দাবী উপস্থিত করা আমার নিকট অত্যধিক প্রত্যাশা বলিয়া মনে হইল। (কংগ্রেসী রাজনীতি জাতীয়তাবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং ইহা অগ্রভাবে চিন্তা করিতে অনভ্যস্ত, তথাপি নূতন সূচনা করিতে হইবে। কংগ্রেসের বাহিরে শ্রমিক মহলে ও যুবকদের মধ্যে এই আদর্শ প্রচার করা যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে আমি কংগ্রেসের অফিস সংক্রান্ত কার্য হইতে মুক্তি চাহিলাম। কয়েক মাস পল্লী অঞ্চলে থাকিয়া জনসাধারণের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিব এইরূপ একটা ইচ্ছা আমার ছিল। কিন্তু তাহা হইল না, ঘটনাচক্রে আমি কংগ্রেসী রাজনীতির আবর্তে ভাসিয়া গেলাম।

মাদ্রাজে উপস্থিত হইয়াই আমি এক ঘূর্ণিপাকের মধ্যে পড়িয়া গেলাম। পূর্ণস্বাধীনতার প্রস্তাব সহ এক গোছা প্রস্তাব আমি ওয়াকিং কমিটির দরবারে পেশ করিলাম। যুদ্ধের আশঙ্কা, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সঙ্ঘের সহিত যোগ স্থাপন প্রভৃতি সমস্ত প্রস্তাবই কার্যকরী সমিতির সরকারী প্রস্তাব রূপে গৃহীত হইল। আমাকেই ঐগুলি কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে উপস্থিত করিতে হইল। ঐগুলি বিনা প্রতিবাদে গৃহীত হইল দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম। এমন কি, মিসেস আনি বোশাস্ত পর্যন্ত স্বাধীনতার প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। চারিদিক হঠাৎ এত সমর্থন পাওয়া আনন্দের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতে লাগিলাম। মনে হইল, হয় প্রস্তাবগুলিকেই বুঝিতে কেহ চেষ্টা করিলেন না, না হয় ভুল বুঝিলেন। কংগ্রেসের পরে যখন স্বাধীনতা প্রস্তাব লইয়া বাদানুবাদ উপস্থিত হইল, তখনই ইহা বুঝিলাম।

সাধারণতঃ কংগ্রেসে যে শ্রেণীর প্রস্তাব উপস্থাপিত হয় আমার প্রস্তাবগুলি অনেকাংশে তাহা হইতে পৃথক ছিল। এগুলির দৃষ্টিভঙ্গী ছিল নূতন। অনেক কংগ্রেসপন্থীই এগুলি পছন্দ করিলেন, অনেকের নিকট ইহা ভাল লাগিল না। কিন্তু কেহই বিশেষ প্রতিবাদ করিলেন না। সম্ভবতঃ তাঁহারা মনে করিলেন, এই প্রস্তাবগুলি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণামাত্র এবং ইহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না। অতএব ঐগুলি তাড়াতাড়ি পাশ

ভারতে প্রত্যাবর্তন

করিয়া দিয়া অল্প গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়াই ঐগুলি এড়ানোর প্রকৃষ্ট পন্থা। স্বাধীনতা প্রস্তাব লইয়া মাদ্রাজে বিশেষ কিছু চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় নাই, কিন্তু দুই-এক বৎসর পরেই উহা কংগ্রেসে মুখ্য হইয়া উঠিল এবং পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ লইয়া এক উদ্বেল জ্বালাবেগ জাগ্রত হইল।

গান্ধিজী মাদ্রাজ কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি কোন আলোচনায় যোগ দেন নাই। কার্য্যকরী সমিতির সদস্য হইলেও তিনি উহার অধিবেশনে যোগ দেন নাই। স্বরাজ্য দলের উদ্ভবের পর হইতে তিনি কংগ্রেসের প্রতি এইরূপ অনাসক্তির প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু সর্বদাই তাঁহার পরামর্শ লওয়া হইত এবং তাঁহার অগোচরে কোন প্রধান কাজ হইত না। আমি যে সকল প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলাম, সেগুলি তিনি অমুমোদন করিলেন কি না বুঝিতে পারিলাম না। আমার মনে হইল, প্রস্তাবগুলির মতামত না হউক, বলিবার ভঙ্গী তাঁহার ভাল লাগে নাই। অবশ্য পরেও তিনি ঐগুলির কোন সমালোচনা করেন নাই। পিতা তখন ইউরোপে ছিলেন, অতএব তাঁহার মতামত জানা গেল না।

সাইমন কমিশনের নিন্দা ও উহা বর্জন করিবার একটি প্রস্তাব কংগ্রেসের এই অধিবেশনেই উপস্থিত হইল এবং উহার আলোচনা প্রসঙ্গে স্বাধীনতা প্রস্তাবটিকে যে কেহই বিশেষ গুরুত্ব দেন নাই, তাহা বুঝা গেল। এই প্রস্তাবের পরিশিষ্ট হিসাবে ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার জন্ত এক সর্বদল সম্মিলনের প্রস্তাব হইল। ঐ প্রস্তাবে স্বাধীনতা ঘাহাদের ধারণার মধ্যে নাই, সেই মডারেটদের সহযোগিতা কামনা করা হইল। অথচ তাঁহারা বড়জোর একপ্রকার স্বায়ত্তশাসন পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারেন।

আমি আবার কংগ্রেসের সম্পাদক হইলাম। এই বৎসরের সভাপতির ব্যক্তিগত অভিপ্রায় অমুসারে ইহা ঘটিল। ডাঃ আর্নসারী আমার দীর্ঘকালের প্রিয় বন্ধু, তাঁহাকে এড়ান কঠিন। এবং আমার নির্দেশে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহাকে কার্য্যকরী করিতে হইলেও আমার সহযোগিতা আবশ্যক। কিন্তু সর্বদল সম্মিলনের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় আমার প্রস্তাবগুলির গুরুত্ব অনেকাংশে কমিয়া গেল। সর্বদল সম্মিলনের মধ্যস্থতায় এবং অত্যাশ্রয় কারণে মডারেটদের দিকে ঝুঁকিয়া কংগ্রেস নরমপন্থী হইয়া উঠিতে পারে, এই আশঙ্কা হইতেই আমি বিশেষভাবে সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলাম। কংগ্রেস তখন দোটারায় পড়িয়া দোল খাইতেছিল। মডারেটীয় নীতির দিকে কংগ্রেস ঝুঁকিয়া

জওহরলাল নেহরু

না পড়ে এবং স্বাধীনতা লাভের লক্ষ্য বাহাতে কংগ্রেস ধরিয়া থাকে, আমি সেজ্ঞা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম।)

জাতীয় রাষ্ট্র-মহাসভার অধিবেশনের সহিত আনুষ্ঠানিক আরও অনেক সভাসমিতি হইয়া থাকে। মাদ্রাজে এই বৎসর প্রথম (এবং শেষ) রিপাবলিক্যান কনফারেন্সের অধিবেশন হইয়াছিল। আমাকে সভাপতির পদ গ্রহণ করার জন্ত আহ্বান করা হইল। আমি নিজেকে একজন রিপাবলিক্যান বলিয়াই মনে করি, প্রস্তাবটি আমার ভাল লাগিল। কিন্তু এই সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের আমি চিনি না, তাহার উপর হঠাৎ ব্যাণ্ডের ছাতার মত গজাইয়া ওঠা এই শ্রেণীর ব্যাপারের সহিত জড়াইয়া পড়িতে আমার ইচ্ছা ছিল না। ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে আমি সভাপতি হইতে স্বীকৃত হইলাম; কিন্তু এজ্ঞা আমাকে পরে অনুতাপ করিতে হইয়াছে। অগ্গাণ্ড অনেক সমিতির মত রিপাবলিক্যান কনফারেন্সের স্মৃতিকাগারেই ধূত্ব হইল। এই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি পাইবার জন্ত আমি কয়েকমাস নিষ্ফল চেষ্টা করিলাম। আমাদের দেশে এমন অনেক লোক আছে, যাহারা উৎসাহের সহিত নূতন কাজ শুরু করে, কিন্তু কিছুকাল পরেই তাহা ছাড়িয়া অল্প কিছু নূতনের সন্ধানে বাহির হয়। আমরা কোন কাজে ধৈর্যের সহিত লাগিয়া থাকিতে পারি না বলিয়া যে অপবাদ আছে, তাহা অনেকাংশে সত্য।

মাদ্রাজ কংগ্রেস অবসান হইবার পূর্বেই দিল্লী হইতে হাকিম আজমল খাঁর মৃত্যুসংবাদ আসিল। তিনি কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি এবং অত্যন্তম প্রবীণ রাজনৈতিক ছিলেন। কংগ্রেসের নেতৃমণ্ডলীতে তিনি অনন্তসাধারণ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে প্রাচীন রক্ষণ-শীলতার মধ্যে লালিত পালিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যে কোন আধুনিকতা ছিল না। দিল্লীর মোগল আমলের শিক্ষাসভ্যতায় তিনি ভরপুর ছিলেন। তাঁহার অতিরিক্ত শিষ্টাচার, মন্ত্রর কথা বলিবার ভঙ্গী এবং নিরাভরণ রসিকতায় সকলেই আনন্দিত হইতেন। তাঁহার আচরণ ছিল প্রাচীনকালের অভিজাতদের মত। তাঁহার অবয়বেও মোগল সম্রাটদের প্রতিচ্ছতির ছাপ ছিল। এই শ্রেণীর মানুষ সচরাচর রাজনৈতির বন্ধুর পথে পদার্পণ করেন না। আধুনিক “এজিটেটর”দের জ্বালায় অন্ত্র হইয়া ইংরাজগণ যে সকল পুরাতন ধরণের মানুষের জন্ত বিলাপ করেন তিনি ছিলেন সেই শ্রেণীর মানুষ। প্রথম জীবনে হাকিম সাহেব রাজনৈতির দিকে ঘেঁসেন নাই। তিনি এক বৃহৎ চিকিৎসক পরিবারের কর্তা ছিলেন এবং তাঁহার বহুবিস্তৃত চিকিৎসা ব্যবসায়েরই ডুবিয়া থাকিতেন। যুদ্ধের শেষের দিকে তাঁহার পুরাতন বন্ধু ও

ভারতে প্রত্যাবর্তন

সহকারী ভাক্তার আনসারীর প্রভাবে তিনি কংগ্রেসের দিকে আকৃষ্ট হন। পরে পাঞ্জাবে সামরিক আইন ও খিলাফত সমস্যায় বিচলিত হইয়া তিনি গান্ধী নিদ্বিষ্ট অসহযোগ পদ্ধতি অহুমোদন করিয়াছিলেন। তিনি কংগ্রেসের মধ্যে প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে যোগসূত্রস্বরূপে ছিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে অনেক প্রাচীনপন্থী জাতীয় আন্দোলনের সমর্থক হইয়াছিলেন। এইভাবে উভয়দিকের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তিনি জাতীয়দলের অগ্রগামিগণের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে হিন্দুমুসলমানের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। তিনি উভয় সম্প্রদায়েরই সমান শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। গান্ধিজীও তাঁহাকে একজন বিশ্বস্ত বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং হিন্দুমুসলমান ব্যাপারে হাকিম সাহেবের পরামর্শই তিনি চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করিতেন। আমার পিতা ও হাকিমজীর মধ্যে সংস্কৃতিগত ঐক্য থাকায় তাঁহাদের মধ্যে এক স্বাভাবিক প্রীতির বন্ধন ছিল।

প্রায় এক বৎসর পূর্বে হিন্দু মহাসভার কোন কোন নেতা আমাকে এই অপবাদ দিয়াছিলেন যে, পারসীক সংস্কৃতির ভিত্তিতে আমার শিক্ষার দোষে হিন্দু মনোভাব সম্পর্কে আমার অজ্ঞতা গভীর। আমার মধ্যে কি সংস্কৃতি আছে, অথবা আদৌ আছে কি না, বলা আমার পক্ষে কিছু শক্ত। দুর্ভাগ্যক্রমে পারসীক ভাষা আমি একেবারেই জানি না। তবে আমার পিতা ভারতীয় ও পারসীক সংস্কৃতির মিশ্র আবহাওয়ায় বদ্ধিত হইয়াছিলেন, ইহা সত্য। প্রাচীন দিল্লী দরবার হইতে সমগ্র উত্তর ভারতই ইহা উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছে। এমন কি, এই অধঃপতনের যুগেও দিল্লী ও লঙ্কো এই সংস্কৃতির দুই প্রধান কেন্দ্র। কাম্বীরী ব্রাহ্মণদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধানের আশ্চর্য্য দক্ষতা ছিল। তাঁহারা যখন ভারতের সমতলক্ষেত্রে অবতরণ করেন তখন ভারতীয়-পারসীক সংস্কৃতিরই প্রাধান্য ছিল। তাঁহারা উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে পারসী ও উর্দু ভাষায় পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিমান হইয়াছিলেন। তারপর যখন ব্রিটিশ যুগ আসিল তখন তাঁহারা পূর্বের মতই অতি ক্রত ইংরাজী ভাষা ও ইউরোপীয়ান সভ্যতা ও সংস্কৃতি আয়ত্ত করিতে লাগিলেন। এখনও ভারতে পারসীক ভাষায় অনেক সুপণ্ডিত রহিয়াছেন—শ্রর তেজবাহাদুর সপ্ত এবং রাজা নরেন্দ্রনাথ এই দুই জনের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এই কারণে পিতা ও হাকিম সাহেবের মধ্যে অনেক ঐক্য ছিল, এমন কি, অতীতকালে উভয় পরিবারের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতা ছিল তাহার প্রমাণও তাঁহারা পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হইয়াছিল এবং তাঁহারা

পরম্পরকে 'ভাই সাহেব' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তাঁহাদের পারস্পরিক স্নেহবন্ধনের মধ্যে রাজনীতির স্থান অতি অল্পই ছিল। পারিবারিক জীবনে হাকিমজী অতিমাত্রায় রক্ষণশীল ছিলেন। তিনি ও তাঁহার পরিবারবর্গ কিছুতেই প্রাচীন অভ্যাস বর্জন করিতে পারিতেন না। তাঁহার পরিবারের মত পর্দাপ্রথার কড়াকড়ি আমি আর কোথাও দেখি নাই। অথচ হাকিমজী নিজে বিশ্বাস করিতেন, স্ত্রী-স্বাধীনতা ব্যতীত কোন জাতির উন্নতি অসম্ভব। স্বাধীনতা আন্দোলনে তুর্কী-নারীরা যোগ দেওয়ায় তিনি আমার নিকট তাঁহাদের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, তুর্কীর নারীদের জহাউ কামাল পাশা সাফল্য লাভ করিয়াছেন।

হাকিম আজমল খাঁর মৃত্যুতে কংগ্রেস প্রচণ্ড আঘাত পাইল এবং কংগ্রেসের একজন শক্তিশালী সমর্থকের অভাব ঘটিল। ইহার পর দিল্লীতে গেলেই আমরা একটা অভাব বোধ করিয়া থাকি, কেন না, দিল্লীর সহিত হাকিমজী এবং তাঁহার বিল্লীমারন মহল্লার বাড়ীর স্থিতি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

১৯২৮ সালে রাজনীতির দিক দিয়া দেশে প্রচুর কাজ চলিল। সর্বত্রই নূতন উৎসাহ ও নূতন উদ্দীপনা এবং জনসাধারণের মধ্যে অগ্রগতির আকাঙ্ক্ষা পরিলক্ষিত হইল। সম্ভবতঃ আমার অনুপস্থিতির সময় ধীরে ধীরে এই পরিবর্তন আসিয়াছে। আমি কিরিয়া আসিয়া ইহা লক্ষ্য করিলাম। ১৯২৬-এর প্রথম ভাগে ভারতবর্ষ ছিল নিষ্কর্ষ ও অবসন্ন, সম্ভবতঃ তখনও সে ১৯১৯-২২-এর পরের অবসাদ কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু ১৯২৮-এর ভারতবর্ষ সতেজ সক্রিয় এবং অবরুদ্ধ শক্তির চেতনায় জাগ্রত। কারখানার শ্রমিক, কৃষক, মধ্যশ্রেণীর যুবক এবং সাধারণভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়—সকলের মধ্যেই এই নবচেতনার লক্ষণ সুপরিষ্কৃত।

ট্রেড ইউনিয়ন (শ্রমিক) আন্দোলন বিশেষ বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল এবং সাত কি আট বৎসর পূর্বে স্থাপিত নিম্নলিখিত ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ইতিমধ্যে এক শক্তিশালী প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। ইহার শাখাপ্রশাখা ত বাড়িয়াছেই, উপরন্তু ইহার মতবাদ ক্রমশঃ সংগ্রামশীল ও চরম হইয়া উঠিতেছে। প্রায়ই ধর্মঘট লাগিয়া আছে এবং শ্রেণীস্বার্থবোধ জাগ্রত হইতেছে। বঙ্গশিল্প এবং রেলওয়ে শ্রমিকরাই সর্বাপেক্ষা অধিকতর সজ্জবদ্ধ হইয়াছিল। এবং ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিল বোম্বাই গিরনী কামগার ইউনিয়ন ও জি, আই, পি, রেলওয়ে ইউনিয়ন। শ্রমিক সঙ্ঘের পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে অপরিহার্যরূপে তাহার মধ্যে পাশ্চাত্য হইতে আভ্যন্তরীণ কলহ ও ধ্বংসের বীজও আসিল। ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন

ভারতে প্রত্যাবর্তন

আন্দোলন প্রতিষ্ঠালাভ না করিতে করিতেই ইহার মধ্যে দল ভাঙাভাঙি বিচ্ছেদ প্রতিযোগিতা এবং শত্রুতার আশঙ্কা উপস্থিত হইল। ইহাদের মধ্যে একদল ছিল দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ভক্ত, একদল তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অমুরাগী, একদল সংস্কারমূলক নরমপন্থী, অপরদল খোলাখুলি বৈপ্লবিক ও আমূল পরিবর্তনকামী। এই দুই দলের মাঝারি অনেক রকম মতের লোক এবং স্ববিধাবাদীরাও ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সকল গণপ্রতিষ্ঠানেই ইহাদের প্রাচুর্য্য ঘটে।

কৃষক সম্প্রদায়েও চাঞ্চল্য দেখা দিল। যুক্তপ্রদেশের অযোধ্যা অঞ্চলে ঘন ঘন কৃষকদের প্রতিবাদ সভা হইতে লাগিল। নূতন অযোধ্যা প্রজাসভা আইনে রায়তদের জীবনস্বত্ব ও অগ্রাংশ যে সকল অধিকার দিবার কথা ছিল, তাহার ফলে কার্য্যতঃ কৃষকদের অবস্থার কোন উন্নতি হইল না। গুজরাটে ভূমিকর বৃদ্ধি লইয়া গভর্নমেন্টের সহিত কৃষকদের সংঘর্ষ ব্যাপকভাবে দেখা দিল। গুজরাটে গভর্নমেন্টের সহিত কৃষকদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। এই সংঘর্ষ সরদার বল্লভভাই পাটেলের নেতৃত্বে বারদোলী সত্যাগ্রহরূপে দেখা দিল। এই আন্দোলনের পরিচালন-নৈপুণ্য ভারতবর্ষ প্রশংসমান দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। বারদোলী কৃষকেরা অনেকাংশে সাফল্যলাভ করিল। এই আন্দোলনে ভারতীয় কৃষকদের মনে যে নূতন আশার সঞ্চার হইল, সর্বোপেক্ষা বড় সাফল্য তাহাই। কৃষকদের দৃষ্টিতে বারদোলী আশা, সজ্জশক্তি এবং সাফল্যের প্রতীক হইয়া উঠিল।

১৯২৮-এর ভারতবর্ষে যুব আন্দোলন একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। দেশের সর্বত্র যুবক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং প্রায়ই নানা স্থানে সম্মেলন হইত। এই সকল যুবক সমিতির মধ্যে নানা স্তরভেদ ছিল। ধর্ম্ম হইতে বৈপ্লবিক মতবাদ ও পদ্ধতি পর্য্যন্ত এক এক দলে আলোচিত হইত। ইহাদের উদ্ভব ও কার্য্যপদ্ধতির পার্থক্য সত্ত্বেও যুবক সম্মেলনগুলিতে সর্বত্রই বর্ত্তমান সময়ের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলি আলোচিত হইত এবং বর্ত্তমান ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের আশ্রয় বিশেষভাবে দেখা যাইত।

কেবল রাজনীতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে, এই বৎসরে সাইমন কমিশন বয়কট এবং সর্বদল সম্মিলনই প্রধান ঘটনা। কংগ্রেসের বয়কট আন্দোলনে মডারেটগণ যোগ দেওয়ায় ইহা আশ্চর্য্য সাফল্যলাভ করিল। কমিশন যেখানেই উপস্থিত হইতেন সেখানেই বিরূপ অভ্যর্থনার জগ্ন সমবেত জনতা “গো ব্যাক্ সাইমন” (সাইমন ফিরিয়া যাও) বলিয়া চীৎকার করিত। ইহার ফলে ভারতের সাধারণ লোকের মধ্যে স্তর জন

জওহরলাল নেহরু

সাইর নাম সুপরিচিত হইয়া উঠিল এবং ইংরাজী ভাষার দুইটি শব্দ তাহা শিখিল। ক্রমাগত ঐ চীংকার শুনিয়া কমিশনের সদস্যরা নিশ্চয়ই বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। তাঁহারা যখন নয়া দিল্লীর গুয়েষ্টার্স হোটেলে ছিলেন, তখন এক অঙ্ককারে ঐ শব্দ ভাসিয়া আসিত, এইরূপ একটা গল্প শুনিয়াছিলাম। রাত্রেও তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ঐরূপ বিদ্রূপাত্মক ধ্বনির ফলে তাঁহারা নিশ্চয়ই অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করিতেন। কিন্তু আসলে সাম্রাজ্যের নূতন রাজধানীর পরিত্যক্ত প্রান্তরবাসী শৃগালদলের চীংকারকেই তাঁহারা জনতার ধিক্কার বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন।

(সর্বদল সম্মিলনীতে শাসনতন্ত্রের খসড়া রচনা করা বিশেষ কঠিন ছিল না।) গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টারী পদ্ধতির শাসনতন্ত্র যে কেহ সহজেই রচনা করিতে পারে। (কিন্তু প্রধান বিষয় অর্থাৎ একমাত্র বিষয় দেখা দিল, সাম্রাজ্য বা সংখ্যালঘিগণদের সমস্যা লইয়া।) সম্মেলনে চরম সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরাও ছিলেন; সকলকে সম্মত করান স্বকঠিন হইয়া উঠিল। ইহা যেন সেই পুরাতন ও নিফল একা সম্মেলনের পুনরাবতারণ। (পিতা বসন্তকালে ইউরোপ হইতে কিরিয়া উৎসাহের সহিত সম্মেলনে যোগ দিলেন। অবশেষে অগ্রপথ না পাইয়া পিতার সভাপতিত্বে একটি ক্ষুদ্র কমিটি গঠিত হইল। শাসনতন্ত্র রচনা এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের ভার এই কমিটির উপর অপিত হইল। এই কমিটি, নেহরু কমিটি) এবং ইহার প্রকাশিত সিদ্ধান্ত নেহরু রিপোর্ট রূপে সুপরিচিত হইয়াছিল। স্মরণ তেজবাহাদুর সফরও এই কমিটির সদস্য ছিলেন এবং রিপোর্টের অংশবিশেষ তাঁহারই রচনা।

আমি এই কমিটির সদস্য ছিলাম না, তবে কংগ্রেসের সম্পাদক হিসাবে আমাকে অনেক কিছুই করিতে হইত। কিন্তু যেখানে আসল সমস্যা—ক্ষমতা ও অধিকার—সেখানে কাগজে কলমে শাসনতন্ত্র রচনা নিষ্ফল পণ্ডিত্য মাত্র, ইহা ভাবিয়া আমি অত্যন্ত বিব্রত হইতাম। তাহার উপর কমিটি, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন, এমন কি, কার্যতঃ তাহা হইতেও অনেক কম লক্ষ্য স্থির করিয়াছিলেন, আমার উহা ভাল বোধ হয় নাই। (তবে যদি সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসা হয়, এই আশায় আমি কমিটির গুরুত্ব অল্পভব করিয়াছিলাম।) চুক্তি বা পারস্পরিক সম্মতি দ্বারা এই সমস্যার মীমাংসা আমি কখনও প্রত্যাশা করি নাই। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ না করিলে কোন মীমাংসাই সম্ভবপর নহে। তবে যদি অধিকাংশ ব্যক্তি সাময়িক ভাবেও কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হন, তাহা হইলে বর্তমান অসন্তোষ অনেকাংশে দূরীভূত হইবে এবং অগ্রগত সমস্যাগুলির প্রতি দৃষ্টি

ভারতে প্রত্যাশাবর্তন

দিবার অবসর পাওয়া যাইবে, এই কারণে কমিটির কাজে বাধা না দিয়া আমি যথাসাধ্য সাহায্য করিতে লাগিলাম।)

(সাক্ষ্য যেন মূঠার মধ্যে আসিয়াছে বলিয়া মনে হইল। দুই তিনটি ব্যাপারের মীমাংসা হইলেই সব চুকিয়া যায়। ইহার মধ্যে পাঞ্জাবের হিন্দু-মুসলমান-শিখ এই ত্রিধা বিভক্ত সমস্যাই হইল প্রধান। কমিটি এক অভিনব উপায়ে এই সমস্যার বিচার করিলেন; তাঁহারা সমগ্রভাবে পাঞ্জাবকে গ্রহণ না করিয়া পূর্ব (হিন্দুপ্রধান), পশ্চিম (মুসলমানপ্রধান) ও উত্তর-পূর্ব (শিখপ্রধান)—এই ভাবে ভাগ করিয়া সংশ্লিষ্টপক্ষে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিলেন। কিন্তু সমস্তই বার্থ হইল। পরস্পরের প্রতি ভয় ও অবিশ্বাস রহিয়াই গেল; আর যতটুকু অগ্রসর হইলে সমস্যা সমাধান হয়, কোন পক্ষই ততটুকু অগ্রসর হইলেন না।

কমিটির রিপোর্ট বিবেচনা করিবার জন্য লঙ্কো-এ সর্বদল সম্মেলন আহৃত হইল। আমাদের মধ্যে অনেকে আবার এক দোটানায় পড়িলাম। আমরা সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের প্রতিবন্ধকতা করিতে চাহি না, কিন্তু অত্র দিকে স্বাধীনতার আদর্শে জলাঞ্জলি দেওয়াও আমাদের পক্ষে কঠিন। আমরা সম্মেলনের নিকট প্রার্থনা করিলাম এ সম্পর্কে প্রত্যেক দলের স্বতন্ত্রভাবে কাজ করিবার স্বাধীনতা স্বীকার করা হউক।) অর্থাৎ কংগ্রেস তাহার স্বাধীনতার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখুক, অত্যাণ্ড মডারেটদল ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনই আদর্শরূপে গ্রহণ করুন। (কিন্তু পিতা রিপোর্ট হইতে একচুলও নড়িতে চাহিলেন না, অবস্থাবীনে তাঁহার পক্ষে উহা সম্ভবও ছিল না। তখন আমরা ‘ইণ্ডিপেন্ডেন্ট লীগ’-এর পক্ষ হইতে (সম্মেলনে আমাদের সংখ্যা কম ছিল না) এই মর্মে বিরূতি দিলাম যে, স্বাধীনতার আদর্শ অপেক্ষা হীন যে সকল সিদ্ধান্ত হইবে, আমরা তাহার সহিত কোন সম্পর্ক রাখিব না, তবে ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই যে, আমরা সম্মেলনের কার্যে কোন বাধা দিব না, সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় বিশ্ব উৎপাদনের ইচ্ছা আমাদের আদৌ নাই।

* এইরূপে প্রধান সমস্যায় এই শ্রেণীর মনোভাব অবশ্য বিশেষ কার্যকরী নয়। ইহা অনেকটা নিষ্ক্রিয় অবস্থা। আমাদের মনোভাবের কার্যকারিতা দেখাইবার জন্য আমরা সেইদিনই “ইণ্ডিপেন্ডেন্স লীগ অফ ইণ্ডিয়া” প্রতিষ্ঠা করিলাম।

প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রে মূল অধিকার সম্প্রদায় ব্যবস্থায় অযোধ্যার তালুকদারদের অহুরোধে সর্বদল সম্মেলন, তাঁহাদের তালুকের উপর কায়মী-স্বত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া একটি ধারা জুড়িয়া দিলেন। ইহাতে আমি

অত্যন্ত মর্দ্যাহত হইলাম। অবশ্য সমস্ত শাসনতন্ত্রই ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিরাপত্তার ভিত্তির উপর রচিত হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি এই সঙ্কল বৃহৎ অর্ধ-সামন্ততান্ত্রিক জমিদারীগুলির উপর ব্যক্তিগত অধিকার অব্যাহত ভাবে শাসনতন্ত্রে স্বীকার করিয়া লওয়া হইল, ইহা আমার নিকট অসহ্য বলিয়া বোধ হইল। স্পষ্ট বুঝা গেল যে, কংগ্রেসের নেতারা (অকংগ্রেসীরা ত বটেই) তাঁহাদের দলের অগ্রগামী অংশ অপেক্ষা বড় বড় ভূম্যধিকারীদের সাহচর্য্যই কামনা করেন। আমাদের অধিকাংশ নেতার সহিত আমাদের ব্যবধানি যে কত বেশী তাহা স্পষ্টই বুঝা গেল। এবং এই অবস্থায় আমার পক্ষে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে কাজ করা অযৌক্তিক মনে হইল। “ইণ্ডিপেন্ডেন্স লীগের” অগ্রতম স্থাপয়িতা বলিয়া আমি পদত্যাগ করিতে উদ্বৃত্ত হইলাম। কিন্তু কার্য্যকরী সমিতি ইহাতে সম্মত হইলেন না। তাঁহারা আমাকে এবং স্বভাব বস্তুকে (ইনিও একই কারণে পদত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন) বলিলেন যে, আমরা লীগের কাজ চালাইলেও তাহার সহিত কংগ্রেস-কার্য্যের কোন সংঘর্ষের সম্ভাবনা নাই। অবশ্য কংগ্রেস ইতিপূর্বেই স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এযাংকি কমিটির অনুরোধে আমি আবার স্বীকৃত হইলাম। আমাকে বুঝাইয়া পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করান কত সোজা তাহা ভাবিয়া আশ্চর্য্য হই। অনেকবার এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। আসলে কোন পক্ষই বিচ্ছেদের পক্ষপাতী ছিলেন না। এবং আমরা নানা ছলনায় বিচ্ছেদকে এড়াইয়া গিয়াছি।

গান্ধিজী সর্বদল সম্মেলন অথবা কমিটি মিটিং-এ কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই। এমন কি, লক্ষ্মী সম্মেলনেও তিনি উপস্থিত ছিলেন না।

ইতিমধ্যে সাইমন কমিশন ইতস্ততঃ ঘুরিতেছিলেন এবং তাঁহাদের পশ্চাতে ক্রুৎপতাকা ও বিপুল জনতার “গো-বাক” ধ্বনি সমানভাবেই চলিয়াছে। স্থানে স্থানে পুলিশের সহিত জনতার ছোটগাট সংঘর্ষ বাধিতেছিল। লাহোরের এই ঘটনা চরমে উঠিল এবং সহসা সে সংবাদে সমগ্র দেশ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সাইমন কমিশন-বিরোধী—সহস্র সহস্র নরনারীর জনতার পুরোভাগে রাস্তার ধারে লালাজপং রায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। জনৈক যুবক ইংরাজ পুলিশ কর্মচারী সকলের সম্মুখে তাঁহাকে প্রহার করে এবং তাঁহার বক্ষে বেটন দিয়া আঘাত করে। লালাজী ত নহেনই, জনতাও কোন হিংসামূলক উপায় অবলম্বন করে নাই। এমন কি, তিনি এবং তাঁহার বহু সঙ্গী শান্তভাবে দাঁড়াইয়া থাকিলেও পুলিশ কর্তৃক ভীষণভাবে প্রহৃত হইলেন। যদিও আমাদের মিছিলগুলি সর্বতোভাবে শান্তিপূর্ণ, তথাপি রাজপথে মিছিল পরিচালনকালে পুলিশের সহিত সংঘর্ষের

ভারতে প্রত্যাবর্তন

আশঙ্কা সর্বদাই থাকে। লালাজী ইহা জানিতেন এবং সেজন্য যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তথাপি অনাবশ্যক পাশবিক উপায়ে এই লালাজীর বিবরণ শুনেয়া ভারতবর্ষের বিশাল জনসম্মুখ বিক্ষুব্ধ হইল। তখনও আমরা পুলিশের লাঠি চালবায় অভিযুক্ত হইয়া উঠি নাই। এবং আমাদের আত্মাভিমানের তীক্ষ্ণত। তখনও পুনঃ পুনঃ পাশবিক অত্যাচারে ভোঁতা হইয়া যায় নাই। আমাদের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা এবং পাক্সাবের প্রধানতম ও জনপ্রিয় নেতার প্রতি এই শ্রেণীর দানবীয় ব্যবহারে সমগ্র দেশে, বিশেষ ভাবে উত্তর ভারতে, এক নিস্তক ক্রোধ ছড়াইয়া পড়িল। আমরা কত অসহায়, কত নীচ যে আমাদের সর্বজন-শ্রদ্ধেয় নেতাকেও রক্ষা করিতে পারি না!

লালাজী দীর্ঘকাল হৃদ-রোগে ভুগিতেছিলেন, তাহার উপর বৃকের এই আঘাতে তাঁহার দৈহিক অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিল। সম্ভবতঃ একজন সুস্থকায় যুবকের পক্ষে এই আঘাত তেমন মারাত্মক হইত না। কিন্তু লালাজী যুবকও নহেন, সুস্থকায়ও নহেন। কয়েক সপ্তাহ পরে তাঁহার মৃত্যুর সহিত এই আঘাতের সম্পর্ক কতখানি তাহা বলা কঠিন। কিন্তু চিকিৎসকেরা বলিয়াছিলেন, ইহার ফলে তাঁহার মৃত্যু নিকটবর্তী হইয়াছিল। কিন্তু আমার মতে দৈহিক আঘাতের সহিত মানসিক যন্ত্রণায় লালাজী অধিকতর মর্ষবেদনা অনুভব করিয়াছিলেন। ব্যক্তিগত অপমান অপেক্ষা এই প্রহারকে জাতীয় অবমাননা বলিয়া গ্রহণ করিয়া তিনি অত্যন্ত তিক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন।

এই জাতীয় অবমাননা ভারতবর্ষের বৃকে দুর্ব্বল বোঝার মত চাপিয়া বসিল। তাহার পরেই লালাজীর মৃত্যুসংবাদ অপরিহার্যরূপে ঐ প্রহারের বেদনার সহিত যুক্ত হইয়া দুঃখকে ক্রোধ ও ঘৃণায় পরিণত করিল। ইহা পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিলেই আমরা পরবর্তী ঘটনাগুলির মর্ম্মগ্রহণে সক্ষম হইব। ভগৎ সিং-এর আবির্ভাব এবং উত্তর ভারতে তাঁহার সহসা বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা আমরা দেখিয়াছি। অন্তর্নিহিত মূল কারণগুলি এবং ঘটনা-পরম্পরা বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া কোন কার্য অথবা ব্যক্তির নিন্দা করা অতি সহজ। ভগৎ সিংকে পূর্বে কেহ জানিত না, তাঁহার জনপ্রিয়তার কারণ হিংসামূলক কার্য অথবা “টেরোরিজম্”-এর জগু নহে। টেরোরিষ্টরা গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া কোন না কোন আকারে ভারতবর্ষে আছে। কিন্তু বাঙ্গলাদেশে প্রথম সূচনার কথা ছাড়িয়া দিলে আর কেহ ভগৎ সিং-এর শতাংশের এক অংশও জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই। ইহা প্রত্যক্ষ সত্য, ইহাকে অস্বীকার না করিয়া স্বীকারই করিতে হয়, এবং আরও একটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে যে, মাঝে মাঝে টেরোরিজম্ মাথা চাড়া দিয়া উঠিলেও

ইহাতে ভারতীয় যুবক সাধারণের আর কোন বাস্তব আকর্ষণ ছিল না। পনের বৎসরের অশ্রান্ত অহিংসা প্রচারের ফলে ভারতবর্ষের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, এবং রাজনৈতিক অঙ্গ হিসাবে টেরোরিজম্-এর প্রতি জনসাধারণ অধিকতর উদাসীন, এমন কি, বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন। সাধারণতঃ যে সকল শ্রেণী হইতে টেরোরিষ্ট সংগ্রহ করা হয় সেই নিম্ন-মধ্যশ্রেণী এবং শিক্ষিতসম্প্রদায়, হিংসামূলক উপায়ের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের প্রবল প্রচারকার্য দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। এই দলের অধীন কর্মীরা, যাহারা বৈপ্লবিক কার্যপদ্ধতির বিষয় চিন্তা করেন, তাঁহারাও এখন সম্পূর্ণরূপে বুঝিতেছেন যে, টেরোরিজম্ দ্বারা বিপ্লব আসিতে পারে না; “টেরোরিজম্” এক জরাজীর্ণ নিষ্ফল উপায় মাত্র এবং উহা প্রকৃত বৈপ্লবিক কার্যপদ্ধতির পথে বিঘ্নস্বরূপ। ভারতে ও অন্যান্য স্থানে “টেরোরিজম্” আজকাল মরণোন্মুখ। ইহা অবশ্যই গভর্নমেণ্টের দমননীতির ফল নহে। দমননীতি বড়জোর উহাকে চাপিয়া রাখিতে কিম্বা নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখিতে পারে কিন্তু উৎখাত করিতে পারে না। জাগতিক ঘটনাপ্রবাহের মূলকারণ হইতেই “টেরোরিজম্” মরিতেছে। “টেরোরিজম্” সাধারণতঃ কোন দেশের বৈপ্লবিক আগ্রহের শৈশবকাল সূচনা করে। এই স্তর উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রধান বাহ্যলক্ষণ হিসাবে “টেরোরিজম্”ও অন্তহিত হয়। স্থানীয় কারণ অথবা ব্যক্তিগত আক্রোশ হইতে মাঝে মাঝে ইহা ঘটিতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষ নিঃসন্দেহে সেই স্তর অতিক্রম করিয়াছে এবং আকস্মিক ঘটনার অভিব্যক্তিও যে ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, ভারতের সমস্ত অধিবাসী হিংসামূলক উপায়ের উপর বিশ্বাস হারায়াছে। ব্যক্তিগত হিংসামূলক কার্য বা টেরোরিজমের উপর আস্থা অনেকেরই নাই, কিন্তু অধিকাংশ লোক ভাবেন যে, এমন এক সময় আসিবে যখন স্বাধীনতার জ্ঞাত সশস্ত্র সজ্জাবদ্ধ সংঘর্ষের প্রয়োজন হইবে, যেমন অগ্ন্যন্ত দেশে হইয়াছে। অবশ্য অগ্ন্যন্তর দিনে ইহা কথার কথা মাত্র, কাণ্ডই তাহার একমাত্র পরীক্ষক, তবে টেরোরিষ্টদের পদ্ধতির সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। অতএব ভগৎ সিং তাঁহার হিংসামূলক কার্যের জ্ঞাত জনপ্রিয় হন নাই, সেই মুহূর্ত্তে তিনি লাল লাজপৎ রায়ের এবং জাতীয় সম্মান রক্ষা করিয়াছেন, জনসাধারণ ইহাই মনে করিতে লাগিল। লোকের নিকট তিনি একটি প্রতীকরূপে প্রতিভাত হইলেন। তাঁহার কাজ লোকে ভুলিয়া গেল। এবং কয়েকমাসের মধ্যে পাঞ্জাবের প্রতি পল্লী-নগর এবং কিয়দংশে উত্তর ভারতের অবশিষ্ট অঞ্চলেও তাঁহার নাম ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তাঁহার নামে অসংখ্য সঙ্গীত রচিত হইল এবং তিনি আশ্চর্য জনপ্রিয়তা লাভ করিলেন।

সাইমন কমিশন উপলক্ষ্যে গ্রহণের কিছু পরে লালাজী রায় দিল্লীতে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির একটি অধিবেশনে বোগ দেন। তাঁহার দেহে তখনও আঘাতের চিহ্ন ছিল এবং তিনি তখনও ভুগিতেছিলেন। লক্ষ্যে সর্বদল সম্মেলনের পর এই অধিবেশনে কোন না কোন আকারে স্বাধীনতার প্রশ্ন উঠিয়াছিল। আমার ঠিক ভাল করিয়া মনে নাই, তবে স্মরণ হয় ঐ বিষয়ে আমি বলিয়াছিলাম যে, এমন একটা সমস্যা আসিয়াছে যখন কংগ্রেসকে দুইটার একটা বাছিয়া লইতে হইবে। রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনমূলক বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী অথবা সংস্কারকামীর উদ্দেশ্য ও উপায়—এই দুই পক্ষ। এই বক্তৃতার কোন গুরুত্ব ছিল না, হয় ত আমি ইহা ভুলিয়াই যাইতাম। কিন্তু লালাজী ইহার কোন কোন অংশ সমালোচনা করায় উহা মনে আছে। তিনি আমাদিগকে সাবধান করিয়া বলিলেন যে, আমরা যেন ব্রিটিশ শ্রমিকদের নিকট কিছু প্রত্যাশা না করি, অন্ততঃ আমার নিকট এই সাবধান-বাণীর কোন প্রয়োজন ছিল না, কেন না, আমি কোন দিনই ব্রিটিশ শ্রমিকদের সরকারী নেতাদের অমুযোগী নহি। তাঁহারা যদি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সমর্থন করিতেন কিম্বা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কার্য্য অথবা সমাজতন্ত্রবাদ প্রবর্তনের চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলেই আমি আশ্চর্য্য হইতাম।

লাহোরে ফিরিয়া গিয়া লালাজী আমার বক্তৃতার বিভিন্ন বিষয় লইয়া তাঁহার সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘দি পীপল’-এ ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কেবল প্রথম প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছিল, দ্বিতীয় প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। সম্ভবতঃ ইহাই তাঁহার অসমাপ্ত সর্বশেষ প্রবন্ধ এবং আমি বিবাদময় আগ্রহের সহিত উহা পাঠ করিয়াছিলাম।

যশি সঞ্চালনের অভিজ্ঞতা

লালা লাজপৎ রায়ের লাঞ্ছনা ও তাঁহার মৃত্যুর পর, সাইমন কমিশন যেখানেই যাইতে লাগিলেন, বিরূপ অভ্যর্থনা অধিকতর প্রবল হইল। লক্ষ্মী-এ কমিশন আসিবার পূর্ক হইতেই স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি “অভ্যর্থনার” জগ্ৰ প্রস্তুত হইতে লাগিল। কয়েকদিন পূর্ক হইতেই বড় বড় মিছিল, সভা প্রভৃতি হইতে লাগিল, প্রচারকার্য ও বিরূপ অভ্যর্থনার মহলা চলিতে লাগিল। আমি লক্ষ্মী-এ গিয়া এই সকল ব্যাপারে যোগ দিলাম। আমাদের প্রাথমিক উদ্যোগ-পর্ক সূক্ষ্ম ও শাস্তিপূর্ণ হইলেও কর্তৃপক্ষ যে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন তাহা বুঝা গেল। তাঁহার বাধা দিতে লাগিলেন এবং কতকগুলি অঞ্চলে মিছিল নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। এই সম্পর্কে আমার জীবনে এক নূতন অভিজ্ঞতা লাভ হইল, আমার দেহে প্রথম পুলিশের লাঠি ও বেটনের আঘাত অনুভব করিলাম।

যানবাহন যাতায়াতের বাধার অজুহাত দেখাইয়া শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। আমরা স্থির করিলাম, এ সম্বন্ধে অভিযোগের কারণ না ঘটাইয়া অপেক্ষাকৃত জনবিরল রাস্তা দিয়া এক এক দলে বোল জন করিয়া সভাস্থলে যাইব। সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে, ইহাও আদেশ ভঙ্কের মধ্যে পড়ে; কেন না, পতাকাসহ বোল জনকে একটি মিছিল ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। আমি প্রথম বোল জনকে লইয়া অগ্রসর হইলাম, আমার বহু পশ্চাতে গোবিন্দবল্লভ পন্থ দ্বিতীয় দল লইয়া আসিতে লাগিলেন। জনহীন রাস্তা দিয়া আমি দল লইয়া দুই শত গজ অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময় পশ্চাতে অশ্বপদধ্বনি শুনিতে পাইলাম। আমরা পিছনে চাহিয়া দেখি প্রায় পঁচিশ জন অশ্বারোহী পুলিশ আমাদের দিকে অতি দ্রুত ঘোড়া চালাইয়া আসিতেছে। অশ্বারোহী পুলিশ আমাদের উপর পড়িয়া সেই বোল জনের ক্ষুদ্র মিছিল ছত্রভঙ্গ করিয়া দিল। তারপর তাহারা বড় বড় বেটন ও লাঠি দিয়া স্বেচ্ছাসেবকদিগকে প্রহার করিতে লাগিল। আশ্রয়ক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি চালিত হইয়া স্বেচ্ছাসেবকগণের কেহ রাস্তার ফুটপাথে উঠিল, কেহ বা ছোট ছোট দোকানে আশ্রয় লইল। পুলিশ তাহাদের পিছনে পিছনে গিয়া প্রহার করিতে লাগিল। যখন দেখিলাম, ঘোড়াগুলি

যষ্টি সঞ্চালনের অভিজ্ঞতা

আমাদের উপর আসিয়া পড়িতেছে, তখন আমার মনেও আশ্চর্য্যকার ইচ্ছা জাগ্রত হইল। ইহা অত্যন্ত নৈরাশ্রপ্রদ দৃশ্য। কিন্তু আমার মনে এক ভাবান্তর ঘটিল; আমার পশ্চাতের স্বৈচ্ছাসেবকদের উপর চোটি পড়িল, প্রথম আক্রমণে আমি অটল রহিলাম। সহসা আমি দেখিলাম রাস্তার মধ্যে আমি একা দাঁড়াইয়া আছি; আমার চারিদিকে পুলিশেরা স্বৈচ্ছাসেবকদিগকে প্রহার করিতেছে। একরূপ অজ্ঞাতসারে আমি একটু গা-ঢাকা দিবার জন্ত রাস্তার পাশের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম। পরমুহূর্ত্তেই খামিয়া মনে মনে বিচার করিয়া বুঝিলাম, আমার পক্ষে ইহা অত্যন্ত অশোভনীয়। ইহা কয়েক নিমেষের ব্যাপার মাত্র, কিন্তু সেই মানসিক ঘূর্ণের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে, সম্ভবতঃ কাপুরুষের মত ব্যবহারের বিরুদ্ধে আমার জাগ্রত আত্মাভিমানই কথিয়া দাঁড়াইল। তথাপি কাপুরুষতা ও সাহসের মধ্যে ব্যবধান অতি সামান্য, আমি যে কোন দিকে ঝুঁকিতে পারিতাম। এই চকিত সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গেই চক্ষু মেলিয়া দেখি, একজন অশ্বারোহী পুলিশ একটি নূতন দীর্ঘ বেটন ঘুরাইতে ঘুরাইতে আমার দিকে আসিতেছে। আমি তাহাকে সম্মুখে অগ্রসর হইতে বলিয়া মাথা ঘুরাইয়া লইলাম—আবার মাথা ও মুখ রক্ষা করিবার এক অনিবার্য্য আবেগ। সে আমার পৃষ্ঠদেশে ছুইবার কঠিন আঘাত করিল। আমার মাথা ঘুরিয়া গেল, সমস্ত দেহ কাঁপিতে লাগিল কিন্তু তবুও যে আমি সোজা দাঁড়াইয়া আছি ইহাতেই বিম্বিত আনন্দে আপ্ত হইলাম। অল্পক্ষণ পরেই পুলিশ সরিয়া গিয়া আমাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। আমাদের স্বৈচ্ছাসেবকেরা পুনরায় একত্রিত হইল, অনেকেরই দেহ রক্তাক্ত, কাহারও বা মাথা ফাটিয়াছে; এমন সময় পহ ও তাঁহার দল আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দিলেন। তাঁহারাও প্রহৃত হইয়াছিলেন। আমরা সকলে পুলিশের সম্মুখে বসিয়া পড়িলাম, সন্ধ্যার পূর্ক পর্য্যন্ত আমরা এক ঘণ্টা কি কিছু বেশী সময় বসিয়া রহিলাম। একদিকে বড় বড় সরকারী কর্মচারীরা আসিয়া দাঁড়াইলেন, অন্তর্দিকে সংবাদ পাইয়া ক্রমে বৃহৎ জনতা জড় হইল। অবশেষে সরকারী কর্মচারীরা আমাদের দিকে ঘাইতে দিতে সম্মত হইলেন। যে অশ্বারোহী পুলিশদল আমাদের উপর চড়াও হইয়া প্রহার করিয়াছিল, তাহারা আগে আগে আমাদের রক্ষীদের মত চলিতে লাগিল, পশ্চাতে আমরা অগ্রসর হইলাম। এই তুচ্ছ ঘটনা বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিবার কারণ—ইহা আমার মনের মধ্যে কিছু রেখাপাত করিয়াছিল। যষ্টি সঞ্চালনের সম্মুখীন হওয়ার এবং প্রহার সহ্য করিবার শারীরিক শক্তির অল্পভূতিতে আমার চিন্তে যে সন্তোষ জন্মিল

তাহাতেই আমি দৈহিক বেদনা ভুলিয়া গেলাম। এবং আমি আশ্চর্য হইলাম যে, ঘটনার সময় এমন কি প্রহৃত হইবার কালেও, আমার মন বেশ স্বচ্ছ ছিল এবং আমি সচেতনভাবে আমার মনোভাব বিশ্লেষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। এই প্রাথমিক মহলার পরদিন প্রভাতে অধিকতর পরীক্ষার ঋণুখীন হইতে অধিকতর দৃঢ়তা লাভ করিলাম। আগামী প্রভাতে সাইমন কমিশন আসিতেছে এবং আমাদের বৃহৎ মিছিল এবং বিরূপ অভ্যর্থনার জন্ত প্রস্তুত হইতে হইবে।

পিতা তখন এলাহাবাদে ছিলেন। আমার আশঙ্কা হইল যে, প্রভাতে সংবাদপত্রে আমার প্রহারের বিবরণ পাঠ করিয়া তিনি এবং পরিবারবর্গ বিচলিত হইবেন। সেজন্ত সন্ধ্যার পর টেলিফোনযোগে তাঁহাকে জানাইলাম যে, আমরা সকলে ভালই আছি, কোন চিন্তার কারণ নাই। কিন্তু তথাপি তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইলেন, শাস্ত হইয়া থাকা অসম্ভব বুঝিয়া তিনি মধ্য রাত্রিতে লঙ্কো যাত্রার সঙ্কল্প করিলেন। তখন শেষ ট্রেন ছাড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া তিনি মোটর যোগেই রওনা হইলেন। রাত্ৰায় কিছু বাধা বিঘ্ন পাইয়া তিনি ১৪৬ মাইল অতিক্রম করিয়া শ্রান্তক্লান্তভাবে ভোর পাঁচটায় লঙ্কো পৌছাইলেন।

তখন আমরা মিছিল করিয়া ষ্টেশনে যাওয়ার উদ্যোগ করিতেছি। আমরা যাহা পারিতাম না, পূর্বদিনের সন্ধ্যার ঘটনায় তাহাই হইয়াছিল, অর্থাৎ উত্তেজিত জনতা সূর্যোদয়ের পূর্বেই দলে দলে ষ্টেশনের দিকে চলিতে লাগিল। নগরের নানা মহল্লা হইতে অগণিত ছোট ছোট মিছিল বাহির হইল এবং কংগ্রেস আফিস হইতে চার জন করিয়া এক এক সারিতে কয়েক সহস্র লোকের প্রধান মিছিল। অগ্রসর হইল। আমরা এই প্রধান মিছিলে ছিলাম। ষ্টেশনের নিকটবর্তী হইবা মাত্র পুলিশ আমাদের আটক করিল। তখন ষ্টেশনের সম্মুখে প্রায় অর্ধ বর্গ মাইল পরিমিত খোলা জায়গা ছিল, (এখন এখানে নূতন ষ্টেশন নির্মিত হইয়াছে) আমরা সেখানে গিয়া সারি দিয়া দাঁড়াইলাম। সেই ময়দানে আমাদের মিছিল গাড়া দাড়াইয়া রহিল, আমরা অগ্রসর হইবার কোন চেষ্টা করিলাম না। অনেক পদাতিক ও অশ্বারোহী পুলিশ ও সৈন্যদলও চারিদিকে মোতায়েন ছিল। বহু উৎসুক দর্শকও আসিয়া ময়দান ভরিয়া ফেলিল। সহসা আমরা দেখিলাম যে, দূরে কাহারো যেন জনতা ঠেলিয়া আসিতেছে। দেখিলাম পর পর দুই-তিন ভ্রূণীতে বিভক্ত অশ্বারোহী পুলিশ বা সৈন্যদল আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে এবং সম্মুখের জনতা দলিত মথিত হইয়া ময়দানে লুটোপুটি খাইতেছে।

ষষ্টি সকালনের অভিজ্ঞতা

অশ্বারোহী সৈন্যদলের এই আক্রমণের দৃশ্য দেখিতে হৃদয়, কিন্তু অত্যন্ত আক্রমণে বিম্বিত নিরীহ দর্শকদিগকে অসম্পদ হইলে দলিত করার মত সৰুগু দৃশ্য খুব কমই আছে। যাহারা পক্ষান্তে পড়িয়া যাইতেছে তাহাদের মধ্যে কেহ বা উত্থানশক্তি রহিত, কেহ বা যন্ত্রণায় গড়াইতেছে। সমস্ত ময়দান যেন যুদ্ধক্ষেত্রের রূপ ধারণ করিল। কিন্তু এই দৃশ্য দেখিয়া চিন্তা করিবার অবসর আর মিলিল না। অশ্বারোহীরা দ্রুতবেগে আসিয়া পড়িল। তাহাদের প্রথম শ্রেণীর সহিত আমাদের ঘন-সন্নিবিষ্ট শোভাযাত্রার সংঘর্ষ হইল, আমরা আমাদের ভূমি ত্যাগ করিলাম না, সোজা দাঁড়াইয়া রহিলাম। শেষ মুহূর্ত্তে সহসা সংঘতরশ্মি অশ্বগুলি পিছনের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইল, তাহাদের সম্মুখের পা'গুলি আমাদের মাথার উপর শূন্তে কাপিতে লাগিল। তার পর লাঠি ও বেটন দিয়া অশ্বারোহী ও পদাতিক পুলিশ আমাদের প্রহার করিতে লাগিল। এই প্রচণ্ড প্রহারে পূর্ব দিনের সন্ধ্যার মত আমার স্পষ্ট ধারণা আর কিছু রহিল না, আমার কেবল এইটুকুই মনে রহিল, আমাকে এইখানেই দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে, কিছুতেই পিছনে হটিব না। প্রহারের ফলে আমি চক্ষু অন্ধকার দেখিলাম। এক অবরুদ্ধ ক্রোধে প্রতিঘাত করিবার বাসনা জাগিল, ঘোড়া হইতে আমার সম্মুখস্থ পুলিশ অফিসারকে টানিয়া নামাইয়া আমি অবলীলাক্রমে তাহারই অশ্বে আরোহণ করিতে পারি। কিন্তু দীর্ঘকালের শিক্ষা ও নিয়মাত্মকতার ফলে আমি সংযম রক্ষা করিলাম এবং আঘাত হইতে আমার মুখমণ্ডল রক্ষা করা ছাড়া আমি হস্ত সঞ্চালন করি নাই এবং আমি আরও জানিতাম যে, আমাদের পক্ষ হইতে বিন্দুমাত্র আক্রমণের ভাব দেখাইলে গুলীবর্ষণ আরম্ভ হইত এবং সেই পৈশাচিক বিমোগান্ত ঘটনায় আমাদের বহুলোক গুলীর আঘাতে প্রাণ হারাইত।

মনে হইতে লাগিল যেন দীর্ঘকাল অতিবাহত হইয়াছে। কিন্তু কার্যতঃ কয়েক মিনিট পরেই আমাদের প্রথম শ্রেণী শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে পিছু হটিতে লাগিল। ইহার ফলে আমি অন্ত্রাণ্ড সকল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া খোলা জায়গায় পড়িলাম। ফলে আরও লাঠির আঘাত পড়িতে লাগিল এবং সহসা বিরক্তির সহিত অমুভব করিলাম, আমাকে কাহারো যেন মাটি হইতে শূন্তে তুলিয়া পিছন দিক্কে লইয়া গেল। আমার কয়েকজন যুবক বন্ধু আমার উপর আক্রমণের প্রকোপ অত্যধিক দেখিয়া আমাকে এইভাবে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিল।

আমাদের মিছিলকারীরা প্রায় একশত ফুট হটিয়া গিয়া পুনরায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। পুলিশও সরিয়া গিয়া প্রায় পঞ্চাশ ফুট তফাতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আমরা এই ভাবে মুখোমুখি দাঁড়াইয়া রহিলাম

কিন্তু এই গোলমালের আমূল কারণ যাহারা সেই সাইমন কমিশন স্টেশন হইতে প্রায় এক মাইল দূরে গোপনে অবতরণ করিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহারা কক্ষপতাকাধারীদের হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন না। কিছুক্ষণ পর আমরা মিছিল সহ কংগ্রেস আফিসে ফিরিয়া গেলাম। সেখান হইতে যে যাহার গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল। আমি পিতার নিকট গেলাম। তিনি উৎকণ্ঠিত ভাবে আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

উত্তেজনার অবসানে আমি সর্বাঙ্গে বেদনা ও অত্যন্ত ক্লান্তি অনুভব করিলাম। আমার প্রতি অঙ্গ বিষাইয়া উঠিল। আমার শরীরের নানা স্থানে খেতলান আঘাত এবং প্রহারের চিহ্ন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমার কোন মৰ্মস্থানে আঘাত লাগে নাই। কিন্তু আমার অনেক দুর্ভাগ্য সঙ্গী গুরুতর আঘাত পাইয়াছিলেন। আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছয় ফুটের অধিক উঁচু গোবিন্দ বল্লভ পন্থই প্রহারকারীদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এবং তিনি এত গুরুতররূপে প্রহৃত হইয়াছিলেন যে, দীর্ঘকাল তিনি মেরুদণ্ড সোজা কিম্বা সাধারণ কাজকর্ম করিতে পারেন নাই। আমার সহ্য করিবার শক্তি এবং নিজের শরীর সম্পর্কে অহঙ্কারের জোরে এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম। কিন্তু প্রহার অপেক্ষাও ঐ সকল পুলিশের, বিশেষভাবে আক্রমণকারী উচ্চতর কর্মচারীদের অনেকগুলি মুখ আমার স্মরণে আছে। আসল বেপরোয়া প্রহার চালাইয়াছিল ইউরোপীয়ান মার্জেন্টরা, ভারতীয় কনেষ্টবলেরা অনেকটা মুহূর্তে আক্রমণ করিয়াছিল। সেই মুখগুলিতে ঘৃণা ও রক্তলোলুপতার উন্নততা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। লেশমাত্র সহ্যভূতি বা মনুষ্যত্বের চিহ্নও ছিল না। সম্ভবতঃ তখন আমাদের মুখগুলি দেখিলেও ঘৃণারই উদ্রেক হইত। কার্যতঃ যদিও আমরা নিষ্ক্রিয় ছিলাম, তাই বলিয়া আমাদের প্রতিপক্ষের প্রতি আমাদের হৃদয়ে নিশ্চয়ই প্রেমের আবেগ উছলিয়া উঠে নাই কিম্বা আমাদেরকে সুন্দরও দেখাইতেছিল না। অথচ আমাদের পরস্পরের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই, কোন বিদ্বেষ নাই, কোন ব্যক্তিগত কলহের কারণও নাই। সাময়িকভাবে আমরা যেন এক আশ্চর্য্য শক্তি দ্বারা অভিভূত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিলাম, আমাদের হৃদয় ও মনকে যেন ইহা সর্বলৈ চাপিয়া ধরিল। এবং আমাদের হৃদয়ে বহু বিমিশ্র ভাবের উদ্রেক করিয়া ইহা যেন আমাদেরকে তাহার হাতের অঙ্ক বন্ধ করিয়া তুলিল। অঙ্কেরই মত আমরা সংঘর্ষে মাতিলাম, কিন্তু কেন এই সংঘর্ষ, আমরা কোথায় চলিয়াছি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ঘটনার উত্তেজনায় আমরা যেন মত্তমুগ্ধ হইলাম, কিন্তু ইহা অবসানের অব্যবহিত পরেই প্রশ্ন জাগিল—ইহার পরিণাম কি? ইহার পরিণতি কোথায়?

ট্রেড্‌ ইউনিয়ন কংগ্রেস

এই বৎসর দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের মধ্যে সাইমন কমিশন বয়কট ও সর্বদল সম্মেলন প্রধানভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কিন্তু আমার নিজের কার্য্যপ্রণালী বৈশী ভাগ অগ্রাণ্য দিকে নিয়োজিত হইয়াছিল। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আমি কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠানগুলি শক্তিশালী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন-গুলির প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিবার দিকে ঝোঁক দিলাম। সর্বদল সম্মেলন আমাদের খুব নীচু করিবার জন্ত চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া মাদ্রাজের স্বাধীনতা প্রস্তাবটির প্রতি কংগ্রেসপন্থীদের লক্ষ্য যাহাতে স্থির থাকে, সেই উদ্দেশ্যে আমার ছিল। এই সকল কারণে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া আমি অনেক বিশিষ্ট সভায় বক্তৃতা দ্বারা প্রচারকার্য্য করিতে লাগিলাম। ১৯২৮ সালে আমি পাঞ্জাব, মালাবার, দিল্লী ও যুক্ত প্রদেশের চারিটি প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিয়াছি। এই বৎসর বাঙ্গলার যুবক সম্মেলনে এবং বোম্বাই-এর ছাত্রসম্মেলনে আমাকে সভাপতিত্ব করিতে হইয়াছে। মাঝে মাঝে যুক্ত প্রদেশের পল্লী অঞ্চলে এবং কদাচিৎ কারখানার শ্রমিকদের নিকটও আমাকে বক্তৃতা করিতে হইয়াছে। সর্বত্রই আমার বক্তৃতার বিষয়বস্তু একই ছিল, কেবল স্থানীয় অবস্থা এবং শ্রোতাদের লক্ষ্য করিয়া বলিবার ভঙ্গী পরিবর্তন করিয়া লইতাম। সর্বত্রই আমি রাজনৈতিক স্বাধীনতার সহিত সামাজিক স্বাধীনতার কথাও বলিতাম এবং এই শেষোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্তই রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজন, ইহা বলিতাম। সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রচার করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। অত্যন্ত সঙ্গীর্ণ অর্থে হইলেও যাহাদের অধিকাংশ জাতীয় আন্দোলনের মেরুদণ্ড, সেই সকল কংগ্রেসকর্মী ও শিক্ষিত জনগণের মধ্যে উহা প্রচারে আমি অধিকতর আগ্রহ দেখাইতাম। আমাদের জাতীয়তাবাদীরা বক্তৃতা-কালে অতীত মহিমা কীর্ত্তন করিতেন, বিদেশী শাসনে আমাদের আধ্যাত্মিক ও আর্থিক ক্ষতির কথা বলিতেন, জনসাধারণের দুঃখদুর্দশার কথা বলিতেন, আমাদের উপর পরশাসনের অপমানের কথা বুঝাইতেন, জাতীয় মর্যাদা উদ্ধারের জন্ত আমাদের স্বাধীনতা আবশ্যক এবং ইহার জন্ত দেশমাতৃকার

বেদীমূলে আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে, এই শ্রেণীর কথা বলিতেন। এই সকল পরিচিত কথায় প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয় উদ্বেলিত হইত। এবং একজন জাতীয়তাবাদী হিসাবে এই সকল কথায় আমার চিন্তেও আবেগ উপস্থিত হইত। (কিন্তু আমি কখনও প্রাচীন ভারত অথবা অল্প কোন প্রাচীনের অন্ধ অমুরাগী ছিলাম না) কিন্তু ইহার মধ্যে যদিও কিছু সত্য ছিল কিন্তু পুনঃ পুনঃ ঐ একই কথার পুনরাবৃত্তি করিতে করিতে উহা কিয়ৎপরিমাণে জীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল। এবং সকলের মুখে একই রূপ কথার প্রতিধ্বনির ফলে আমাদের সংঘর্ষের মর্ম্মকথা ও অগ্ন্যাগ্ন সমস্তা আলোচনা করিবার সুযোগ হইত না। ইহাতে কেবল ভাবাবেগ উথলিয়া উঠিত, চিন্তা জাগ্রত হইত না।

ভারতে সমাজতন্ত্রবাদের প্রথম প্রচারক আমি নহি, বস্তুতঃ আমি অনেকের পশ্চাতে ছিলাম এবং অতিকষ্টে এক এক পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছিলাম। তখন অগ্ন্যাগ্ন সকলে জলন্ত উদ্‌কাশিগের দ্বারা দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এবং যুবক সমিতিগুলির অধিকাংশই মতবাদের দিক দিয়া নিশ্চিতই সমাজতান্ত্রিক। আমি যখন ১৯২৭-এর ডিসেম্বরে ভারতে প্রত্যাবর্তন করি তখন চারিদিকে এক প্রকার অস্পষ্ট সমাজতন্ত্রবাদের কথা হাওয়ায় ভাসিতেছে। এবং তাহার পূর্বে অনেকে ব্যক্তিগতভাবে সমাজতান্ত্রিক ছিলেন। অধিকাংশ যদিও কল্লনারাজ্যে বিহার করিতেন তথাপি তাহারা ক্রমশঃ মার্কস্ মতবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতেছিলেন। মুষ্টিমেয় ব্যক্তি নিজেদের পুরাপুরি মার্কস্-পন্থী মনে করিতেন। সোভিয়েট ইউনিয়নের উন্নতি এবং বিশেষভাবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলে ইউরোপ আমেরিকার মতই ভারতেও এই ভাব শিকড় গাড়িতেছিল।

সমাজতন্ত্রী কর্ম্মরূপে আমার কিছু খ্যাতি রটিয়াছিল, তাহার কারণ আমি একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মী এবং কংগ্রেসের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলাম। আরও অনেক খ্যাতনামা কংগ্রেসকর্ম্মীও আমার মতই চিন্তা করিতেছিলেন। যুক্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে ইহা বিশেষভাবে দেখা গিয়াছিল, এমন কি, আমরা ১৯২৬ সালেই একটি মোলায়েম সমাজতান্ত্রিক কার্যপদ্ধতি প্রণয়ন করিয়াছিলাম। জমিদার ও তালুকদার অধ্যুষিত প্রদেশে ভূমির প্রশ্নই প্রধান। আমরা ঘোষণা করিলাম, ভূমি-সংক্রান্ত বর্ত্তমান ব্যবস্থা রহিত করিতে হইবে এবং কৃষক ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোন মধ্যস্থত্বভোগী থাকিবে না। অত্যন্ত সাবধানতার সহিত এ সকল কথা আমাদের বলিতে হইত, কেন না, তখনও লোকে এই শ্রেণীর কথা শুনিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠে নাই।

ঐত, ইউনিয়ন কংগ্রেস

১৯২২ সালে যুক্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি আরও কিছু অগ্রসর হইয়া এক সমাজতান্ত্রিক আদর্শে রচিত প্রস্তাব নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতিতে উপস্থিত করিল। গ্রীষ্মকালে উহার বোম্বাই অধিবেশনে যুক্ত প্রদেশের প্রস্তাবটির ভূমিকাটুকু গৃহীত হওয়ায় সমাজতন্ত্রবাদের মূলনীতি স্বীকৃত হইল, তবে যুক্ত প্রদেশ-নির্দিষ্ট কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করা সম্পর্কিত প্রস্তাব পরবর্তী কালের জন্য স্থগিত রাখা হইল। অনেকে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতি ও যুক্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এই প্রস্তাবের কথা ভুলিয়া গিয়া মনে করেন, সমাজতন্ত্রবাদ দুই-এক বৎসর হইল কংগ্রেসে আলোচিত হইতেছে। অবশ্য নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতি বিশেষ বিবেচনা না করিয়াই ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ সদস্যগণ কি করিলেন, তাহা বুঝিতেই পারেন নাই।

‘ইণ্ডিপেন্ডেন্ট লীগ’-এর যুক্ত প্রাদেশিক শাখা (এই প্রদেশের প্রধান কংগ্রেস কর্মীদের লইয়াই গঠিত) সর্বতোভাবে সমাজতান্ত্রিক ছিল; এবং বিভিন্ন মতাবলম্বী গঠিত কংগ্রেস কমিটি অপেক্ষা মতবাদের দিক দিয়া ইহা অনেক বেশী অগ্রগামী ছিল। ‘ইণ্ডিপেন্ডেন্ট লীগের’ অগ্রতম লক্ষ্য ছিল সামাজিক স্বাধীনতা। আমরা এই লীগকে সমস্ত ভারতে এক শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রবাদের অমূল্য প্রচারকার্য করার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে লীগের কাধ্যক্ষেত্র যুক্ত প্রদেশের বাহিরে বিশেষ বিস্তৃতিলাভ করিল না। দেশে সমর্থনের অভাব ইহার কারণ নহে। আমাদের অধিকাংশ সদস্যই কংগ্রেসেরও বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন এবং কংগ্রেস মতবাদের দিক দিয়া স্বাধীনতা প্রস্তাব গ্রহণ করায় তাঁহারা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়াই সর্বদা কাজ করিতেন। আর একটি কারণ এই যে, লীগের প্রাথমিক স্থাপয়িতাদের মধ্যে অনেকে পরে প্রতিষ্ঠানের পরিপুষ্টি ও বিকাশের দিকে ততটা মনোযোগ দিলেন না। তাঁহারা ইহাকে কংগ্রেসের কাধ্যাকরী সমিতির উপর চাপ দিবার এবং কাধ্যাকরী সমিতির নির্বাচনের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার অস্ত্র হিসাবে দেখিতে লাগিলেন। এই সকল কারণে লীগ শিথিল হইয়া পড়িল এবং ক্রমে কংগ্রেস প্রবল ও সংগ্রামশীল হইয়া উঠায় অধিকাংশ অগ্রগামী কর্মীই ঐ দিকে ঝুঁকিলেন, ফলে লীগ দুর্বল হইয়া পড়িল। ১৯৩০-এ নিরপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে লীগ কংগ্রেসের মধ্যে আত্মসমর্পণ করিয়া বিলুপ্ত হইল।

১৯২৮-এর শেষার্ধ্বে এবং ১৯২৯-এ আমি গ্রেফতার হইব, এই গুজব পুনঃ পুনঃ উঠিয়াছিল। সংবাদপত্রেও এই আশঙ্কা ব্যক্ত হইত এবং বন্ধু-বান্ধবদের

নিকট হইতেও এ বিষয়ে সাবধানবাণী-সম্বিত অনেক পত্র পাইতাম। আমার গ্রেফতার যে আসন্ন, অনেকে নিশ্চিত রূপে সন্ধান পাইয়াই তাহা আমাকে জানাইতেন। এই সকল লেখার প্রভাবে আমার মনেও এক অনিশ্চিত ভাবের উদয় হইল এবং আমিও প্রস্তুত হইয়াই থাকিতাম। জেলে যাওয়াটা জীবনের একটা স্থায়ী ব্যাপার নহে; ইহা ভাবিয়া ভবিষ্যতের জন্ত আমি বিশেষ চিন্তা করিতাম না। এই অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে আকস্মিক পরিবর্তন এবং জেলে যাওয়া অনেক ভাল। মোটের উপর আমি নিজেকে পূর্বে হইতে প্রস্তুত রাখিবার যথেষ্ট সময় পাইয়াছিলাম, (আমার পরিবারবর্গও ইহার জন্ত প্রস্তুত ছিলেন) এবং আহ্বান আসিলে আমি উহা সহজেই গ্রহণ করিতে পারিব। কাজেই এই শ্রেণীর গুজবে আমার লাভই হইল, ইহার ফলে প্রত্যেকটি দিন এক প্রকার উত্তেজনার মধ্যে কাটিত; একটি দিনের স্বাধীনতাও কত মূল্যবান, যেন একটি দিন লাভ হইল। কিন্তু কার্য্যতঃ ১৯২৮ এবং ১৯২৯ অতিক্রম করিয়া ১৯৩০-এর এপ্রিল মাসে আমি গ্রেফতার হইয়াছিলাম। ইহার পর হইতে কারার বাহিরে আমার জীবনের কোন বাস্তব সত্তা ছিল না; অল্পদিনের জন্ত বাহিরে আসিয়াও নিজের গৃহে অপরিচিত অতিথির মত কাটাওয়াছি, লক্ষ্যহীনভাবে ভ্রমণ করিয়াছি। কাল কি হইবে জানিতাম না এবং সর্বদাই কারাগারের আশ্বাসের জন্ত উৎকর্ষ হইয়া থাকিতাম।

১৯২৮-এর শেষভাগে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন আসন্ন হইল। নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন আমার পিতা। তিনি সর্বদল সম্মেলন এবং তাহার রিপোর্ট লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত এবং উহা কংগ্রেসে পাশ করাইয়া লইবার জন্ত উদগ্রীব। তিনি জানিতেন যে, উহাতে আমার সম্মতি নাই, কারণ স্বাধীনতা সম্পর্কে কোন আপোষ রক্ষা আমার পক্ষে অসম্ভব; ইহাতে তিনি বিরক্ত হইয়াছিলেন। আমরা এই বিষয়ে বড় একটা তর্ক করিতাম না, কিন্তু উভয়ের মানসিক সংঘর্ষ উভয়েই অনুভব করিতাম, দুই পৃথক পথে প্রস্থানের আবেগ অনুভব করিতাম। মতভেদ ইহার পূর্বেও বহু বার ঘটিয়াছে এবং গুরুতর মতভেদ হেতু আমরা দুই পৃথক রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়াছি, কিন্তু ইহার পূর্বে কিছা পরবর্ত্তীকালে এত অধিক মন কষাকষি কখনও হয় নাই। ইহাতে আমরা উভয়েই অত্যন্ত অন্থখী হইয়াছিলাম। কলিকাতায় আসিয়া অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে, পিতা জানাইয়া দিলেন, কংগ্রেসে যদি তাঁহার মতানুযায়ী কার্য্য না হয়,—অর্থাৎ সর্বদল-সম্মেলনের রিপোর্টের উপর রচিত প্রস্তাব যদি অধিকাংশের ভোটে গৃহীত না হয়, তাহা হইলে তিনি কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করিবেন না। তাঁহার

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস

পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত ও নিয়মতান্ত্রিক পথ। তাঁহার প্রতিপক্ষ এতখানির জ্ঞান প্রস্তুত ছিলেন না বলিয়া হতবুদ্ধি হইলেন। কংগ্রেস ও অগ্নিত্র ইহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমালোচনা করিব, নিন্দা করিব অথচ দায়িত্ব গ্রহণের বেলা পিছাইয়া বাইব। মনের মধ্যে আশা থাকে যে সমালোচনার ফলে প্রতিপক্ষ আমাদের সুবিধাজনকভাবে পথ পরিবর্তন করিয়া লইবে, আমাদের হাতে হাল ছাড়িয়া দিবে না। ভারত গভর্নমেন্টের ব্যবস্থার মত, যেখানে আমাদের হাতে কোন দায়িত্ব দেওয়া হয় নাই, শাসন পরিষদ যেখানে অনপসরণীয় ও স্বেচ্ছাচারী এবং যেখানে কেবলমাত্র সমালোচনার পথ খোলা, (অবশ্য কাণ্ডের কথা স্বতন্ত্র) সেখানে সমালোচনা নেতিবাচক হইতে বাধ্য। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও যদি নেতিবাচক সমালোচনাকেও কার্যকরী করিতে হয়, তাহা হইলেও মনের দিক দিয়া নিজেই এমন করিয়া প্রস্তুত রাখিতে হইবে যে, সুযোগ উপস্থিত হইলেই গভর্নমেন্টের সকল বিভাগের—শাসন ও সামরিক, আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক—দায়িত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা গ্রহণ করিতে কোন দ্বিধা থাকিবে না। কিন্তু আংশিক নিয়ন্ত্রণের আকাঙ্ক্ষা, (যেমন আমাদের মডারেটগণ সমর-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বলিয়া থাকেন) নিজেদের অক্ষমতা স্বীকারেরই নামান্তর এবং তাহাতে সমালোচনার কোন জোর থাকে না।

সমালোচনা ও নিন্দা অথচ তাহার স্বাভাবিক পরিণামের দায়িত্ব গ্রহণের বেলায় পিছাইয়া পড়া গান্ধিজীর সমালোচকদের মধ্যেও দেখা গিয়াছে। কংগ্রেসের মধ্যে একদল লোক আছেন যাহারা তাঁহার কার্যপ্রণালী পছন্দ করেন না এবং উহা তীব্রভাবে সমালোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারাও গান্ধিজীকে কংগ্রেস হইতে তাড়াইয়া দিতে প্রস্তুত নহেন। এই মনোভাব খুব দুর্বোধ্য নহে; কিন্তু ইহা কোন পক্ষের প্রতিই সুবিচার নহে।

কলিকাতা কংগ্রেসেও এই প্রকারের বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। উভয় পক্ষে কথাবার্তা হইয়া একটা আপোষ-প্রস্তাব খাড়া করা হইল বটে, কিন্তু তাহাও ভাঙ্গিয়া গেল। সমস্ত ব্যাপারটাই বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল—কোন দিকেই কিছু বৃদ্ধি গেল না। অবশেষে কংগ্রেসের মূল প্রস্তাব এইভাবে রচনা করা হইল যে, কংগ্রেস সর্বদল সম্মেলনের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে জানাইয়া দিবেন যে, এক বৎসরের মধ্যে ঐ শাসনতন্ত্র গৃহীত না হইলে কংগ্রেস পুনরায় স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ করিবে। ইহা এক বৎসরের সময় দিয়া এক সৌজন্যপূর্ণ চরমপত্রের মত। সর্বদল সম্মেলনের রিপোর্টে পূর্ণ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনও চাওয়া হয় নাই, অতএব এই প্রস্তাবে কংগ্রেসকে যে স্বাধীনতার আদর্শ হইতে অনেকখানি নামিয়া আসিতে হইল তাহাতে সন্দেহ নাই।

তথাপি এই প্রস্তাব দূরদর্শিতার পরিচায়ক, কেন না, ইহার ফলে সকলেরই অবাঞ্ছনীয় ভেদ নিবারিত হইল এবং ঐক্যবদ্ধ কংগ্রেস ১৯৩০-এর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যে এক বৎসরের মধ্যে সর্বদল সম্মেলনের প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন না, ইহা স্পষ্টই বুঝা গেল। সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিল এবং দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে বুঝা গেল, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব বাতীত ইহা কৃতকার্য হইবে না।

আমি কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে ঐ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিলাম; আমার প্রতিবাদ অবশ্য বিধা সঙ্কুচিত হইয়াছিল। তথাপি আমি পুনরায় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হইলাম। যাহাই ঘটুক না কেন, সম্পাদকের পদে আমি পাকেচক্রে আঠার মত লাগিয়া থাকি। কংগ্রেসী মহলে আমি যেন বিখ্যাত 'ভিকার অফ ব্রের' ভূমিকা অভিনয় করিতেছি। যে কোন সভাপতিই কংগ্রেসের সিংহাসনে উপবেশন করুন না কেন, আমাকে ঠিক সম্পাদকের পদে বসিয়া প্রতিষ্ঠান চালাইবার কার্যভার গ্রহণ করিতেই হইবে।

কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনের কয়েকদিন পূর্বে, ঝরিয়ায় (কয়লা খনি অঞ্চলে) নিঃ ভাঃ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। প্রথম দুই দিন আমি ইহার অধিবেশনে যোগদান করিয়া কলিকাতা চলিয়া যাই, ইহাই আমার প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে যোগদান। যদিও আমি ক্রবকদের মধ্যে দীর্ঘকাল এবং কিছুকাল শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলাম, তথাপি আমি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বাহিরেই ছিলাম। আমি দেখিলাম, বৈপ্লবিকদের সহিত সংস্কারকদের পুরাতন বিবাদ একই রূপ রহিয়াছে। কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত হওয়া, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সঙ্ঘ, প্যান প্যাসিফিক ইউনিয়ন এবং জেনেভার আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ— এইগুলিই মতভেদের মুখ্য বিষয় ছিল। ইহা ছাড়াও কংগ্রেসের উভয় দলের মূলনীতি সম্পর্কে দৃষ্টি-ভঙ্গীর যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। পুরাতন ট্রেড ইউনিয়ন পন্থীরা রাজনীতি ক্ষেত্রে মডারেট, এবং তাঁহারা শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের যোগাযোগ স্থাপনে সন্দিগ্ধচিত্ত। তাঁহারা অতি-সাবধানে শ্রমিকস্বলভ উপায়ে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিসাধনে বিশ্বাসী। এই দলের নেতা এন, এম, ঘোশী, ইনি অনেকবার জেনেভায় শ্রমিক সম্মেলনে গিয়াছেন। অল্প দল অধিকতর সংগ্রামশীল, রাজনৈতিক কার্যে বিশ্বাসী এবং প্রকাশ্যভাবে বৈপ্লবিক মতবাদ প্রচার করিয়া থাকেন। ইহাদের উপর কম্যুনিষ্ট অথবা কম্যুনিষ্টভাবাপন্ন ব্যক্তিদের কর্তৃত্ব না থাকিলেও ইহারা বহুল পরিমাণে ইহাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত। বোম্বাই-এর কাপড়ের কলের

ট্রেড্‌ ইউনিয়ন কংগ্রেস

শ্রমিকদল ইহাদের হাতে ছিল এবং ইহাদের নেতৃত্বে চালিত বোম্বাই-এ কাপড়ের কলে ধর্মঘট আংশিক সাফলা লাভ করিয়াছিল। গিরনী কামগার ইউনিয়ন নামক এক নূতন শক্তিশালী শ্রমিকসম্মেলন বোম্বাই-এর শ্রমিক মহলে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। জি, আই, পি রেলওয়ে ইউনিয়নের উপরও এই অগ্রগামী দলের যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

সূচনা হইতেই ট্রেড্‌ ইউনিয়ন কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি এবং আফিস, এন, এম, যোশী ও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত এবং যোশীই এই আন্দোলনের স্রষ্টা। অগ্রগামী দল শ্রমিক মহলে শক্তিশালী হইলেও, উপর হইতে নিয়ন্ত্রিত কার্যপ্রণালীর উপর তাহাদের কোন প্রভাব ছিল না। এই অসন্তোষজনক অবস্থা, শ্রমিকদের মনোভাব ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিবার প্রতিকূল। ইহার ফলে অসন্তোষ ও কলহ লাগিয়াই থাকিত; এবং অগ্রগামীদল ট্রেড্‌ ইউনিয়ন কংগ্রেসের ক্ষমতা হস্তগত করিতে চেষ্টা করিতেন। অল্প দিকে ইহা নইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করিতে গেলে দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িবার আশঙ্কাও ছিল। ভারতে শ্রমিক আন্দোলন তখনও যৌবনে পদার্পণ করে নাই; ইহার অনেক দৌর্বল্য ছিল এবং অ-শ্রমিক নেতারা ইহা পরিচালন করিতেন। এই অবস্থায় বাহিরের লোকেরা শ্রমিক আন্দোলনের সুযোগে স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করিবে ইহা স্বাভাবিক এবং ভারতে শ্রমিক কংগ্রেস ও ইউনিয়নে তাহাই দেখা যায়। এন, এম, যোশী অবশ্য দীর্ঘকাল শ্রমিক আন্দোলনে লিপ্ত থাকিয়া স্বীয় যোগ্যতা ও কুশলতা প্রমাণ করিয়াছেন, এমন কি যাহারা তাঁহাকে রাজনীতিক্ষেত্রে অনগ্রসর ও মডারেট বলিয়া মনে করেন, তাঁহারাও ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনে তাঁহার সেবার মহত্ব স্বীকার করেন। অত্যাগত কয়েকজন মডারেট ও অগ্রগামী ব্যক্তির সম্মুখেও ইহা বলা যাইতে পারে।

ঝরিয়াতে আমার সহানুভূতি অগ্রগামীদলের সহিতই ছিল, কিন্তু আমি নবাবগত এবং ইহাদের গৃহদ্বন্দ্বের মধ্যে প্রবেশের আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না বলিয়া আমি নিরপেক্ষ রহিলাম। আমার ঝরিয়া তাগের পর টি, উ, সি'র নূতন নির্বাচন হইয়াছিল। আমি কলিকাতায় আসিয়া শুনিলাম, আমাকে আগামী বর্ষের জগা সভাপতি নির্বাচিত করা হইয়াছে। মডারেট দল হইতেই আমার নাম প্রস্তাব করা হইয়াছিল, সম্ভবতঃ তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, অগ্রগামী দলের প্রস্তাবিত অগ্রতম প্রার্থী যিনি একজন খাটি শ্রমিক (রেলকর্মী), তাঁহাকে পরাজিত করিতে হইলে আমার নাম কাজে লাগিবে। যদি আমি সেদিন ঝরিয়ায় উপস্থিত থাকিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই শ্রমিক প্রার্থীর অতুলে স্বীয় নাম প্রত্যাহার করিতাম।

জওহরলাল নেহরু

একজন অ-শ্রমিক ও নবাগতকে সহসা একেবারে সভাপতির পদে বরণ করা আমার নিকট অত্যন্ত অশোভনীয় বলিয়া মনে হইয়াছিল। ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের শৈশব ও দৌর্বল্যের ইহাও একটি প্রমাণ।

১৯২৮-এ মে বহু শ্রমিক-চাকলা ও ধর্মঘট হইয়াছিল, ১৯২৯-এও তাহার জের চলিয়াছে। হতদরিদ্র অথচ সংগ্রামশীল বোম্বাই-এর কাপড়ের কলের শ্রমিকেরাই ধর্মঘটে অগ্রণী হইয়াছিল। বাঙ্গলার পাটকলগুলিতেও ব্যাপক ধর্মঘট হইয়াছিল। জামসেদপুরের লোহার কারখানায়, সম্ভবতঃ রেলও ধর্মঘট চলিতেছিল। জামসেদপুরের টিন-প্লেট ওয়ার্কসে কয়েকমাস ধরিয়া দীর্ঘকালস্থায়ী ধর্মঘট সাহসের সহিত পরিচালিত হইতেছিল। জনসাধারণের সহায়ত্বে সত্ত্বেও শক্তিশালী মালিক কোম্পানী (বর্ম্মা অয়েল কোম্পানীর সহিত সংশ্লিষ্ট) শ্রমিকদিগকে দলিত ও ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়াছিল।

দুই বৎসর ধরিয়া শ্রমিকদের মধ্যে অশান্তি চলিল এবং তাহার ফলে তাহাদের অবস্থা আরও খারাপ হইল। মহাযুদ্ধের পর ভারতবর্ষে কল-কারখানার প্রভূত প্রসার ও উন্নতি হইয়াছিল এবং প্রচুর লাভ হইয়াছিল। পাঁচ-ছয় বৎসর ধরিয়া পাটের কল ও কাপড়ের কলে শতকরা ১০০ টাকা হইতে ১৫০ টাকা পর্য্যন্ত লাভ হইয়াছে। এই অসম্ভব হারে লাভের অঙ্কের সবটাই মালিক অথবা অংশীদারদের পকেটে গিয়াছে, অথচ শ্রমিকদের অবস্থা পূর্ব্ববৎই ছিল। বেতনের হার যেমন কিঞ্চিৎ বাড়িয়াছিল, তেমনই আবার দ্রব্যমূল্যও বাড়িয়াছিল। যখন এই ভাবে হু হু করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জিত হইতেছিল, তখন দরিদ্র শ্রমিকেরা জরাজীর্ণ কুটারে বাস করিতেছিল, নারীদের লজ্জানিবারণের উপযোগী বস্ত্রও ছিল না। বোম্বাই শ্রমিকদের অপেক্ষাও কলিকাতার প্রাসাদমালা হইতে অনতিদূরবর্তী পাটকলের শ্রমিকদের অবস্থা অধিকতর শোচনীয় ছিল। অর্ধ-নগ্না শ্রীহীনা নারীরা উদরায়ের তাড়নায় উদয়াস্ত শ্রম করিত, এবং তাহাদের শ্রমে ডাণ্ডি ও গ্লাসগো এবং কিয়দংশে ভারতীয় পকেটে ঐশ্বর্যের স্রোতধারা অবিরাম প্রবাহিত থাকিত।

সুদিনে কলকারখানা উত্তমরূপে চলিলেও শ্রমিকদের অবস্থা পূর্ব্ববৎই ছিল এবং তাহারা বিশেষ লাভবান হয় নাই। কিন্তু সুদিনের অবসানে, যখন মোটা হারে লাভ করা কঠিন হইয়া উঠিল, তখন সমস্ত ভার গিয়া পড়িল শ্রমিকদের উপর। পুরাতন লাভের কথা সকলে ভুলিয়া গেল, কেন না, তাহা খরচ হইয়া গিয়াছে। প্রচুর লাভ না হইলে কলকারখানা চলিবে কিরূপে? অতএব কারখানার শ্রমিক মহলে অসন্তোষ ও অশান্তি দেখা দিল, বোম্বাই-এর ব্যাপক ধর্মঘট দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট ও মালিকগণ

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস

শক্তি হইলেন। সন্ধ্যা ও মতাদেশের দিক দিয়া শ্রমিক আন্দোলন, শ্রেণী-স্বার্থসচেতন সংগ্রামশীল ও ভাঙ্গর হইয়া উঠিল। রাজনৈতিক আন্দোলনও দ্রুত বিস্তারলাভ করিতেছিল; যদিও উভয় আন্দোলনই পাশাপাশি চলিতেছিল, তথাপি একের সহিত অপরো সম্পর্ক ছিল না। গভর্ণমেন্ট ইহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কিঞ্চিৎ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন।

১৯২২-এর মার্চ মাসে গভর্ণমেন্ট অগ্রগামী দলের কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মীকে গ্রেপ্তার করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনকে সহসা আঘাত করিলেন। বোম্বাই শিরণী কামগার ইউনিয়নের নেতারা এবং বাঙ্গলা, যুক্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবের শ্রমিক নেতারা গ্রেফতার হইলেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কমুনিষ্ট, কেহ বা কমুনিষ্টভাবাপন্ন এবং অগ্ণাত অনেক সাধারণ ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট ছিলেন। ইহাই বিখ্যাত মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার ঘটনা। এই মামলা সাড়ে চারি বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল।

মীরাটের আসামীদিগকে আদালতে সমর্থন করিবার জন্ত একটি কমিটি গঠিত হইল। আমার পিতা ঐ সমিতির সভাপতি এবং ডাঃ আনসারী, আমি ও অগ্ণাত অনেকে সভ্য হইলাম। আমাদের কাজ অত্যন্ত কঠিন হইল। টাকা সংগ্ৰহ করা সহজ হইল না, কেন না, বুঝা গেল—খনী ব্যক্তির কমুনিষ্ট, সোশ্যালিষ্ট এবং শ্রমিক আন্দোলনকারীদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন নহেন। আইনজীবীরা উপাখ্যান-কথিত পুরাপুরি এক পাউণ্ড নরমাংস না পাইলে কাজ করিবেন না বলিয়া কবুল জবাব দিলেন। আমাদের কমিটিতে আমার পিতা এবং অগ্ণাত বিখ্যাত আইনজ্ঞ ছিলেন। পরামর্শ এবং অগ্ণাত নির্দেশের জন্ত তাঁহারা সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। ইহাতে আমাদের এক পয়সাও ব্যয় হইত না। কিন্তু মাসের পর মাস মীরাটে বসিয়া কাজ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। অগ্ণাত যে সকল আইনজীবীর নিকট আমরা উপস্থিত হইলাম, তাঁহারা এই মামলাকে যতটা সম্ভব অর্থ উপার্জনের যন্ত্র স্বরূপ দেখিতে লাগিলেন।

মীরাট মামলা ছাড়াও আমি এম, এন, রায়ের মামলা ও অগ্ণাত কয়েকটি মামলার তদ্বির সমিতির সদস্য ছিলাম। সর্বত্রই আমি আমার সমব্যবসায়ীদের লোভ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। ১৯১৯-এ পাঞ্জাব সামরিক আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে আমি প্রথম আমন্ত্রিত হই। একজন বিখ্যাত নেতৃস্থানীয় আইনজীবী তাঁহার পূরা ফী, অর্থাৎ প্রভূত অর্থ দাবী করিয়াছিলেন। সামরিক আইনের হতভাগ্য আসামীদের মধ্যে একজন তাঁহার সমব্যবসায়ীও ছিলেন এবং অগ্ণাত অনেককে ধার করিয়া, সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া তাঁহাকে মজুরী দিতে হইয়াছিল। আমার সর্বশেষ অভিজ্ঞতা অধিকতর বেদনাবহ।

জওহরলাল নেহরু

আমরা দরিদ্রতম শ্রমিকদের নিকট পয়সায় আখলায় যে অর্থ সংগ্রহ করিতাম তাহা মোটা অঙ্কের চেক লিখিয়া আইনজীবীদের দিতে হইত। ইহা অত্যন্ত বিশ্বয়কর। অথচ এ সমস্ত আয়োজনই নিফল। কি রাজনৈতিক কি শ্রমিক-ঘটিত মামলায় আমরা যতই আত্মপক্ষ সমর্থন করি না কেন ফল প্রায় সমানই হয়। মীরট মামলার মত ব্যাপারে নানা কারণে আত্মপক্ষ সমর্থন অনিবার্যরূপে আবশ্যক হইয়াছিল।

মীরট মামলা তদ্বির সমিতি আসামীদিগকে লইয়া অত্যন্ত বিব্রত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক ছিলেন এবং এক এক জনের পক্ষ সমর্থন-প্রণালী এক এক প্রকার এবং তাঁহাদের মধ্যেও কোনও ঐক্য ছিল না। কয়েক মাসের মধ্যেই আমরা কমিটি তুলিয়া দিলাম এবং ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করিতে লাগিলাম। ক্রমে রাজনৈতিক ঘটনাবলী ঘনাইয়া উঠিল এবং ১৯৩০-এ আমাদের সকলেই কারাগারে উপনীত হইলাম।

২৭

ঝটিকার পূর্বাভাস

১৯২৯-এ লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশন। দশ বৎসর পরে পাঞ্জাবে পুনরায় কংগ্রেস ফিরিয়া আসিল। জনসাধারণের চিন্তে পূর্ণস্থিতি জাগ্রত হইল। জালিয়ানওয়ালাবাগ, সামরিক আইন ও তাহার লাঞ্ছনা, অমৃতসর কংগ্রেস এবং তাহার পর অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা। এই সময়ের মধ্যে অনেক কিছুই ঘটিয়াছে—ভারতে বহু পরিবর্তন হইয়াছে কিন্তু তবুও সৌসাদৃশ্যের অভাব নাই। রাজনৈতিক অসন্তোষ বাড়িতেছিল, সংঘর্ষ আসন্ন হইয়া উঠিতেছিল। সমগ্র দেশের উপর দৃষ্টিটের কৃষ্ণচ্ছায়া ঘনাইয়া উঠিতেছিল।

আইন সভার চক্রে ঘূর্ণায়মান মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ব্যতীত দেশের লোক ব্যবস্থা পরিষদ অথবা প্রাদেশিক আইন সভাগুলির প্রতি বীতশ্রু হইয়া উঠিতেছিল। গবর্নমেন্টের প্রভুত্বকামী ও স্বৈরাচারী প্রকৃতির উপর এই আইন সভার জরাজীর্ণ শতচ্ছিন্ন আবরণ নিক্ষেপ করিয়া তাঁহারা কোনও মতে কাজ চালাইয়া বাইতেছিলেন এবং ইহাকেই কতকগুলি লোক ভারতের পার্লামেন্ট বলিয়া শাঙ্কনা লাভ করিত এবং সদস্তরূপে

কটিকার পূর্বাভাস

ভাতা গ্রহণ করিত। ১৯২৮-এ সাইমন কমিশনের সহিত সহযোগিতা করিতে অস্বীকৃতিমূলক প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় ব্যবস্থা পরিষদ তাহার সর্বশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল।

পরে ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতির সহিত গভর্নমেন্টের বিরোধ বাড়িল। পরিষদের স্বরাজী সভাপতি বিঠলভাই প্যাটেল তাহার স্বাধীনতাপ্রিয়তার জন্য গভর্নমেন্টের পক্ষে কণ্টক হইয়া উঠিলেন এবং তাহার পক্ষচ্ছেদ করিবার আয়োজন হইল। এই ঘটনার প্রতি জনসাধারণ একবার চোখ মেলিয়া চাহিল মাত্র। কিন্তু মোটের উপর বাহিরের ঘটনাবলী জনমনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল। আমার পিতার কাউন্সিল-মোহ সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তিনি প্রায়ই বলিতেন, বর্তমান অবস্থায় আইন সভাগুলির কোনই সার্থকতা নাই। যে-কোন স্বযোগে তিনি উহা হইতে বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টায় ছিলেন। তাহার নিয়মতান্ত্রিকতায় অভ্যস্ত মন এবং আইনজীবীমূলভ কার্যপ্রণালীর উপর অল্পবয়সেও তিনি অত্যন্ত দুঃখের সহিত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে নিয়মতান্ত্রিক কার্যপদ্ধতি নিষ্ফল ও মূল্যহীন। তিনি তাহার আইনজ্ঞ মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতেন, ভারতবর্ষে বস্তুতঃ নিয়মতন্ত্র বলিয়া কিছু নাই এবং যেখানে ব্যক্তি বা প্রভুর দল যাহুকরের টুপির মধ্য হইতে খরগোস বাহির করিবার মত অপ্রত্যাশিতভাবে অর্ডিন্যান্স বাহির করিতে পারেন, সেখানে আইন প্রণয়নেরও কোন বৈধ নীতির অভাব। প্রবৃত্তি ও সংস্কারের দিক দিয়া তিনি বৈপ্লবিক ছিলেন না; যদি ভারতবর্ষে বুর্জোয়া-গণতন্ত্রের মত কোন শাসনপদ্ধতি থাকিত, তাহা হইলে তিনি নিঃসন্দেহে তাহার প্রধান সমর্থক হইতেন। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় এক নকল পার্লামেন্টের কৌতুকাভিনয় লইয়া ভারতবর্ষে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি তিনি ক্রমশঃ অধিকতর বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

কলিকাতা কংগ্রেসে আপোষ প্রস্তাবে যদিও গান্ধিজী হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি রাজনীতি হইতে দূরেই ছিলেন। অবশ্য তিনি ঘটনাবলীর পরিণতি লক্ষ্য করিতেছিলেন এবং কংগ্রেস নেতারাও প্রায়শঃই তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি প্রধানতঃ খাদি প্রচারেই ব্রতী ছিলেন। তিনি পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক প্রদেশে, প্রত্যেক জিলায়, প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য সহরে, এমন কি, সুদূর পল্লী অঞ্চলেও ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি যেখানেই যাইতেন, স্ববৃহৎ জনতা সমবেত হইত। এই জন্য পূর্বে হইতে শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা হইত, যাহাতে তাহার কার্যপ্রণালী

স্বনিয়ন্ত্রিতভাবে নির্বাহ হয়। এইরূপে বছবার ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্বাঞ্চলের গিরিমালা হইতে পশ্চিম সমুদ্রের তীর পর্য্যন্ত এই বিশাল দেশের প্রত্যেক অংশের পরিচয় তিনি লাভ করিয়াছিলেন। অগ্ৰ কোন মানুষ তাঁহার মত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছে কি না আমি জানি না।

অতীতকালে অনেক কোতূহলী বিখ্যাত ভ্রমণকারী তীর্থযাত্রীর আবেগ লইয়া দেশ পর্য্যটন করিয়াছেন; কিন্তু তখন যানবাহন ছিল মন্মথ এবং আজিকার দিনে রেল বা মোটরে এক বৎসরে যাহা দেখা সম্ভব তখন সারাজীবনেও তাহা দেখা সম্ভব হইত না। গান্ধিজী রেলে ও মোটরে ভ্রমণ করিতেন, তবে পদব্রজেও তিনি বহু ভ্রমণ করিয়াছেন। ইহার ফলে ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসী সম্পর্কে তাঁহার অভিজ্ঞতা অননুসাধারণ এবং এইভাবে লক্ষ লক্ষ নরনারীর সহিত তিনি ব্যক্তিগতভাবে মিলিয়াছেন। তিনিও তাঁহাদের চিনিয়াছেন, তাঁহারাও তাঁহাকে চিনিয়াছে। (১৯২৯-এ খাদি প্রচার উপলক্ষে তিনি কয়েক সপ্তাহের জন্য যুক্ত প্রদেশে ছিলেন।) তখন প্রচণ্ড গ্রীষ্মকাল। আমি কয়েকবার তাঁহার সাক্ষী হইয়াছিলাম এবং অল্প কয়েক দিন করিয়া তাঁহার সহিত ছিলাম। পূর্বে অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও বৃহৎ জনতা দেখিয়া আমি বিস্মিত না হইয়া পারি নাই, বিশেষভাবে আমাদের পূর্বাঞ্চলে গোরক্ষপুর প্রভৃতি জেলায় জনশ্রোত দেখিয়া দলে দলে পঙ্গপালের মত মনে হইত। পল্লী অঞ্চলে মোটরে যাইবার সময় আমরা কয়েক মাইল পরে পরেই দশ হইতে বিশ সহস্র জনতার সম্মুখীন হইতাম এবং ঐ দিবসের প্রধান সভায় লক্ষাধিক লোক সমবেত হইত। বড় বড় কয়েকটি বৃহৎ সহর ব্যতীত কোথাও বৈদ্যুতিক “লাউড স্পীকারের” ব্যবস্থা ছিল না এবং এই স্ববৃহৎ জনতার পক্ষে আমাদের কথা শোনা অসম্ভব ছিল। সম্ভবতঃ তাহারা বক্তৃতা শুনিতে আসিত না, মহাত্মাজীর দর্শন লাভই সঙ্কষ্ট হইত। অতিরিক্ত শ্রম না হয় এজন্য গান্ধিজী সাধারণতঃ অতি সংক্ষেপে বক্তৃতা করিতেন; অল্পখা দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই-ভাবে কাজ করা কঠিন।

(তাঁহার যুক্ত প্রদেশ ভ্রমণের সব সময় আমি তাঁহার সহিত ছিলাম না। আমাদের তাঁহার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল না। কাজেই তাঁহার দলের সংখ্যা বৃদ্ধি করা আমি সম্ভব বিবেচনা করি নাই। জনতায় আমার আপত্তি ছিল না; কিন্তু তাই বলিয়া ঠেলাঠেলি, গুঁতাগুঁতি, অপরের পায়ে তলায় পড়িয়া আহত হওয়া প্রভৃতি—বাহ গান্ধিজীর সঙ্গীদের অনিবার্য নিয়তি—তাঁহার প্রতি আমি কোন আকর্ষণ অনুভব করিতাম না। আমার হাতে অগ্ৰ কাজ ছিল এবং রাজনৈতিক অবস্থার দ্রুত

ঝটিকার পূর্বাভাব

পরিণতির ফলে তুলনায় খাদির কাজ আমার নিকট অতি সামান্য বোধ হইয়াছিল এবং সারাক্ষণ খাদির কাজে নিজেকে নিয়োজিত করিবার ইচ্ছাও আমার ছিল না। গান্ধিজী এই শ্রেণীর অ-রাজনৈতিক কাজে লিপ্ত থাকায় মাঝে মাঝে আমার রাগ হইত। তাঁহার মনের মধ্যে কি আছে, আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিতাম না। এই সময়ে তিনি খাদির জন্ত অর্থ সংগ্রহ করিতেন এবং প্রায়ই বলিতেন যে, “দরিদ্র নারায়ণ” সেবার জন্ত অর্থের আবশ্যক। ইহার অর্থ—কুটির শিল্পের মধ্য দিয়া কর্মসৃষ্টি তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু ঐ শব্দটির মধ্যে দারিদ্র্যকে মহিমান্বিত করিবার একটি ভাব আছে, যেন জীশ্বর বিশেষভাবে দরিদ্রদের প্রভু এবং দরিদ্ররাই তাঁহার বিশেষ প্রিয়। আমার মনে হয়, সর্বত্রই ধর্মভাবের এই সাধারণ মনোভাব আছে। কিন্তু আমার পক্ষে ইহা অসহ্য। আমার মতে, দারিদ্র্য অত্যন্ত ঘৃণ্য। উহার সহিত যুদ্ধ করিয়া উহাকে উন্মূলিত করাই কর্তব্য, উহাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে। কেন না, এই মনোভাব হইতে লোকে দারিদ্র্যকে আক্রমণ না করিয়া যে ব্যবস্থা হইতে দারিদ্র্যের উৎপত্তি হয়, লোক তাহা সমর্থন করে এবং তাহারা দারিদ্র্যের প্রতি যুদ্ধবিমুখ, তাহারা দারিদ্র্যের একটা সঙ্কত, শোভন ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করে। তাহারা অভাবপূর্ণ জগৎ চিন্তা করিতেই অভ্যস্ত, ইহজগতেই জীবনের সর্বপ্রকার প্রয়োজন প্রচুররূপে পাওয়া যায়, তাহা ধারণা করিতে পারে না, ইহাদেব মতে জগতে চিরকাল ধনী এবং দরিদ্র থাকিবে।

এই বিষয় লইয়া মাঝে মাঝে আমার গান্ধিজী সহিত আলোচনা হইয়াছে। তিনি জোরের সহিত বলেন যে, ধনীরা তাহাদের ধন দরিদ্রদের পক্ষ হইতে অছি স্বরূপ রক্ষা করিতেছে, ইহাই মনে করিবে। ইহা অতি প্রাচীন মত। ইউরোপীয় মধ্যযুগে এবং ভারতবর্ষে ইহা সচরাচর শোনা যায়। আমি অকপটে স্বীকার করি, আমি ইহা বুঝিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম যে, কেমন করিয়া একজন ব্যক্তি ধারণা করিতে পারে, এই উপায়ে সামাজিক সমস্যার সমাধান সম্ভবপর।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, ব্যবস্থা পরিষদ প্রায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, অতি অল্প লোকই ইহার নীরস কার্যপ্রণালী লক্ষ্য করিত। সহসা একদিন কঠিন জাগরণ আসিল, ভগৎ সিং এবং বি কে দত্ত দর্শকের আসন হইতে সভার মেঝেয় দুইটি বোমা নিক্ষেপ করিল। কেহ গুরুতর আহত হন নাই, সম্ভবতঃ বোমা নিক্ষেপের সে উদ্দেশ্যও ছিল না। অপরাধীরা পরে স্বীকার করিয়াছিল যে, কাহাকেও আহত করার ইচ্ছা তাহাদের ছিল না, একটা গোলমাল ও উত্তেজনা সৃষ্টিই তাহাদের লক্ষ্য ছিল।

জওহরলাল নেহরু

তাহারা ব্যবস্থা পরিষদ এবং বাহিরেও চাকলা সৃষ্টি করিয়াছিল। টেরোরিষ্টদের অগ্রাঙ্ক কাজ এরূপ নিরাপদ ছিল না। লালা লাজপৎ রায়েকে আঘাতকারী বলিয়া বর্ণিত একজন যুবক ইংরাজ পুলিশ কর্মচারীকে লাহোরে গুলী করিয়া হত্যা করা হয়। বাঙ্গালা ও অগ্রাঙ্ক স্থানেও টেরোরিষ্ট কার্যপ্রণালীর পুনরারম্ভের সূচনা দেখা গিয়াছিল। কতকগুলি ষড়যন্ত্রের মামলা দায়ের হইল এবং বিনা বিচারে বন্দী ও অন্তরীণের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় আদালতের মধ্যে পুলিশ কতকগুলি অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা করিল, যাহার ফলে জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে এই মামলার উপর পতিত হইল। আদালতে এবং কারাগারে এই শ্রেণীর দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদস্বরূপ অধিকাংশ বন্দী অনশন-ব্রত গ্রহণ করিল। ইহার সূচনার কারণ আমি ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু পরিণামে ইহা কয়েদীদের প্রতি ব্যবহার, বিশেষতঃ রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি ব্যবহারের সমস্তায ধর্ম্যবসিত হইয়াছিল। সপ্তাহের পর সপ্তাহ অনশন চলিতে লাগিল এবং দেশে যথেষ্ট চাকল্যের সৃষ্টি হইল। অভিযুক্তদের শারীরিক দুর্বলতার জন্য তাহাদিগকে আদালতে লইয়া যাওয়া সম্ভব হইল না এবং পুনঃ পুনঃ মর্মলা স্থগিত রাখিতে হইল। ফলে, ভারত গভর্নমেন্ট এক আইন করিয়া দিলেন যে, আদালতে অভিযুক্ত এবং তাহাদের উকীলদের অনুপস্থিতিতে তাহাদের বিচার চলিতে পারিবে। অল্প দিকে কারাগারের ব্যবহার সম্পর্কেও তাহারা বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

অনশন ধর্ম্যঘটের এক মাস পর আমি একবার লাহোরে গিয়াছিলাম। জেলে গিয়া কয়েকজন বন্দীর সহিত আমাকে সাক্ষাৎ করার অনুমতি দেওয়া হইল; এই সুযোগ আমি গ্রহণ করিলাম। এই প্রথম আমি ভগৎ সিং, যতীন দাস এবং আরও কয়েকজনকে দেখিলাম। ইহারা অত্যন্ত দুর্বল এবং শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাদের সহিত বৈশীক্ষণ কথাবার্তা বলা সম্ভব নহে। ভগৎ সিংয়ের মুখমণ্ডল কমলীয়, বুদ্ধি দীপ্ত এবং বিশেষভাবে প্রশান্ত মনে হইল। তাহার মুখে কোন ক্রোধের চিহ্ন ছিল না। তাহার ব্যবহার ও কথাবার্তা অত্যন্ত ভদ্র। অবশ্য আমার মনে হয় এক মাস উপবাসের পর সকলকেই এইরূপ শান্ত দেখায়। যতীন দাস অধিকতর নম্র, কুমারী কন্ঠার মত কোমল ও শান্ত। যখন আমি তাহাকে দেখি, তখন তাহার অত্যন্ত যন্ত্রণা ছিল। ইহার কিছুদিন পরেই এককটি দিন উপবাসের ফলে তাহার মৃত্যু হয়।

ভগৎ সিংয়ের কথায় মনে হইল, ১৯০৭ সালে লালা লাজপৎ রায়ে

কটিকার পূর্বভাব

সহিত নির্ধাসিত তাহার খুল্লতা সর্দার অজিৎ সিংহকে সে একবার দেখিতে চাহে, অন্ততঃপক্ষে তাহার সংবাদ চাহে। তিনি দীর্ঘকাল বিদেশে নির্ধাসিত। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস করিতেছেন এমন একটা শুজব ছিল বটে, কিন্তু আশি তাহার কোন সংবাদ পাই নাই; তিনি মৃত কি জীবিত, আমি জানি না।

যতীন দাসের মৃত্যুতে দেশব্যাপী চাঞ্চল্য সৃষ্টি হইল। ইহার ফলে রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি ব্যবহারের প্রশ্ন মুখ্য হইয়া উঠিল এবং গবর্ণমেন্ট ইহার অনুসন্ধানের জন্ত একটি কমিটি নিযুক্ত করিল। এই কমিটির সিদ্ধান্তের ফলে বন্দীদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইল। কিন্তু রাজনৈতিক বন্দীদের বিশেষ কোন শ্রেণী করা হইল না। এই সকল নূতন নিয়মের ফলে আশা করা গিয়াছিল যে, অবস্থার কিছু উন্নতি হইবে, কিন্তু কার্যতঃ অল্প পার্থক্যই হইয়াছে—যেমন ছিল তেমনি অসন্তোষজনকই রহিয়াছে। ক্রমে গ্রীষ্ম, বর্ষা গত হইয়া শরৎকালের উদয় হইল। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলি লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনে ব্যস্ত হইলেন। এই নির্বাচনের প্রশালী অত্যন্ত দীর্ঘ এবং ইহাতে আগষ্ট হইতে অক্টোবর পর্যন্ত সময় লাগিল। ১৯২৯ সালে সকলে একবাক্যে গান্ধিজীকেই সমর্থন করিতে লাগিল। গান্ধিজীকে দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের সভাপতিরূপে পাইবার এই আগ্রহ নিশ্চয়ই তাঁহাকে কংগ্রেসে অধিকতর সম্মানিত পদ দিবার জন্ত নহে; কেন না কয়েক বৎসর ধরিয়াই তিনি কংগ্রেসের মহা সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত আছেন। যাহা হউক, সকলের ধারণা হইল যে, সঙ্ঘর্ষ আসন্ন এবং কার্যতঃ তাঁহাকেই ইহার নেতৃত্ব করিতে হইবে। কাজেই এবার অন্ততঃ নামেও তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হউন। ইহা ছাড়া, তিনি ব্যতীত সভাপতি পদের যোগ্য ব্যক্তি অল্প কেহ ছিলেন না।

অতএব, প্রাদেশিক কমিটিগুলি গান্ধিজীকেই সভাপতি পদে মনোনীত করিলেন। কিন্তু তিনি রাজী হইলেন না। তাঁহার আপত্তি তীব্র হইলেও যুক্তি তর্ক দ্বারা বুঝাইলে তিনি পুনর্বিবেচনা করিবেন, এইরূপ আশা হইল। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্ত লক্ষ্যে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন হইল এবং আমাদের ধারণা ছিল যে, তিনি রাজী হইবেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজী হইলেন না এবং শেষ মুহূর্ত্তে আমার নাম উপস্থিত করিলেন। তাঁহার চূড়ান্ত আপত্তিতে সকলেই অবাক হইলেন এবং এই সম্বন্ধে পতিত হইয়া কিঞ্চিৎ বিরক্তও হইলেন। অল্প লোকের অভাবে অবশেষে বাধ্য হইয়া তাঁহারা আমাকেই নির্বাচিত করিলেন।

জওহরলাল নেহরু

এই নির্বাচনে আমি যত বিরক্ত ও অপমানিত বোধ করিলাম, পূর্বে কখনও তাহা করি নাই। আমি যে এই সম্মান সম্পর্কে সচেতন নহি এমন নহে; ইহা এক মহৎ সম্মান। সাধারণভাবে নির্বাচিত হইলে আমি আনন্দিত হইতাম। কিন্তু সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ না করিয়া, এমন কি সম্মুখের কোন দ্বার দিয়া প্রবেশ না করিয়া পশ্চাৎ দ্বার দিয়া হতভম্ব দর্শকবৃন্দের সম্মুখে আমি অপ্রত্যাশিতভাবে উপস্থিত হইলাম। তাহারা যথাসম্ভব ভব্যতা রক্ষা করিয়া তিব্বত ঔষধের মত আমাকে গলাধঃকরণ করিলেন। আমার আত্মাভিমান আহত হইল এবং এই সম্মান ফিরাইয়া দিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমি এইরূপ নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা না করিয়া আত্মসম্বরণ করিলাম এবং ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দূরে সরিয়া গেলাম।)

সম্ভবতঃ, এষ্ট সিদ্ধান্তে আমার পিতাই সর্বাপেক্ষা সুখী হইয়াছিলেন। আমার রাজনীতি তাঁহার সম্পূর্ণ ভাল না লাগিলেও আমাকে তিনি অতিরিক্ত ভালবাসিতেন এবং আমার কল্যাণে সুখী হইতেন। তিনি মাঝে মাঝে আমার সমালোচনা করিতেন এবং কর্কশ কথাও বলিতেন; কিন্তু অপরে তাঁহার সম্মুখে আমার নিন্দা করিলে তাঁহাকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না।

আমার নির্বাচন একদিকে যেমন বৃহৎ সম্মান, অত্য়দিকে তেমনি গভীর দায়িত্ব। পিতার অব্যবহিত পরেই পুত্রের সভাপতি পদ লাভ এক অভিনব ঘটনা। অনেকে বলেন যে, আমিই কংগ্রেসের সর্বকনিষ্ঠ সভাপতি—তখন আমার বয়স চল্লিশ বৎসর। কিন্তু ইহা সত্য নহে। আমার মনে হয়, গোখলের বয়সও এইরূপ ছিল এবং মোলানা আবুল কালাম আজাদ (যদিও আমি অপেক্ষা বয়সে কিছু বড়) যখন সভাপতি হইয়াছিলেন তখন তাঁহার বয়স সম্ভবতঃ চল্লিশের নীচে ছিল। গোখলের বয়স যখন ত্রিংশ-দশকের মধ্যে তখনই তিনি একজন প্রবীন রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া বিবেচিত হইতেন এবং আবুল কালাম আজাদ তাঁহার পাণ্ডিত্যের অনুরূপ শ্রদ্ধাজন ব্যক্তির মত অবয়ব গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। রাজনীতির পণ্ডিত বলিয়া আমার কোন খ্যাতি ছিল না এবং আমি একজন মহা পণ্ডিত ব্যক্তি এ অপবাদ কেহই আমাকে দেয় নাই। যদিও আমার চুল পাকিয়াছে, এবং আমার অবয়বের পরিবর্তন হইয়াছে, তথাপি বয়স্ক ব্যক্তি বলিয়া অপবাদের হাত হইতে এ যাবৎ নিষ্কৃতি পাইয়া আসিতেছি।

লাহোর কংগ্রেস নিকটবর্তী হইল। ইতিমধ্যে ঘটনারাজি যেন তাহার আভ্যন্তরীণ শক্তিতে সম্মুখে দৃঢ় পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে। যে যতই

বটিকার পূর্বাত্মক

সাহসিকতা দেখাক না কেন, ইহার উপর কাহারও হাত ছিল না। যেন এক বৃহৎ যন্ত্র অক্ষগতিতে চলিয়াছে এবং আমরা তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাকা মাত্র।

নিয়তির এই দুর্ব্বার গতি রোধ করিবার জগুই সম্ভবতঃ বৃটিশ গভর্ণমেন্ট এক পদ অগ্রসর হইলেন এবং বড়লাট লর্ড আকুইন গোল টেবিল বৈঠকের বার্তা ঘোষণা করিলেন। এই ঘোষণা-বাণী অতি কৌশলপূর্ণ ভাষার আবরণে প্রকাশিত হইল। ইহার অর্থ অনেক কিছু হইতে পারে অথবা কিছুই নহে এবং আমাদের নিকট ইহা অনিশ্চিত বলিয়াই প্রতিভাত হইল। এমন কি, যদি এই ঘোষণার মধ্যে সার পদার্থ কিছু থাকে, তাহা আমাদের প্রত্যাশা হইতে অনেক কম। বড়লাটের ঘোষণার অব্যবহিত পরেই অশোভনীয় বাস্তবতার সহিত দিল্লীতে এক “নেতৃ-সম্মেলনের” আয়োজন হইল। বিভিন্ন দলের ব্যক্তিরাই ইহাতে আহূত হইলেন। গান্ধিজী গেলেন, আমার পিতাও গেলেন; বিঠলভাই প্যাটেল (তখনও ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। স্তর তেজ বাহাদুর এবং অত্যাগত মডার্ট নেতারাও উপস্থিত হইলেন। একটি সম্মিলিত প্রস্তাব অথবা ইস্তাহার রচনা হইল এবং কতকগুলি সর্বো বড় লাটের ঘোষণা-পত্র গ্রহণ করা হইল। তবে ইহা উল্লেখ থাকিল যে, ঐগুলি জরুরী এবং উহা পূর্ণ করিতে হইবে। যদি গভর্ণমেন্ট ঐ গুলি গ্রহণ করেন, তবে সহযোগিতা করা হইবে। এই সর্বগুলি *অতি বাস্তব এবং দৃঢ় ছিল এবং ইহার ফলে বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন হইতে পারিত।

মডার্ট এবং অত্যাগত অগ্রগামী দলের প্রতিনিধিবর্গকে এই প্রস্তাবে সম্মত করান নিশ্চয়ই একটা সাফল্য। কিন্তু কংগ্রেসের দিক দিয়া ইহা অনেকাংশে অবতরণ; কিন্তু সম্মিলিত একামতের দিক দিয়া ইহা উর্দ্ধে অবরোহণ। কিন্তু ইহার মধ্যেও ধ্বংসের বীজ ছিল। এই সর্বগুলিকে লইয়া অন্ততঃ দুই পৃথক দৃষ্টিতে বিচার চলিল। কংগ্রেসপন্থীদের দৃষ্টিতে ইহা অত্যাশঙ্ক এবং অপরিহার্য—যাহার কমে সহযোগিতা চলিতে পারে না। কেন না, ইহাই তাহাদের সর্বনিম্ন প্রয়োজন। পরবর্তী কার্য্যকরী

সর্বগুলি এই—(১) পূর্ণ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তির উপর প্রস্তাবিত বৈঠকের আলোচনা হইবে; (২) বৈঠকে কংগ্রেসের প্রতিনিধি সংখ্যাই অধিক সংখ্যক হইবে; (৩) সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দিতে হইবে; (৪) এখন হইতেই বর্তমান অবস্থার সহিত ধ্বংসসম্ভব সম্মতি রক্ষা করিয়া ভারত গবর্ণমেন্ট ঔপনিবেশিক গবর্ণমেন্টের দ্বারায় কার্য্যপ্রণালী পরিচালন করিতে থাকিবেন।

সমিতির সভায় ইহা পরিষ্কার করিয়া ব্যাখ্যা করা হইল এবং আরও স্থির হইল যে, মাত্র আগামী কংগ্রেসের অধিবেশন পর্য্যন্ত এই সর্ব্ভগুলি বলবান থাকিবে। মডারেটগণের মতে ঐ সর্ব্ভগুলি হইল সর্ব্বোচ্চ কাম্য কিন্তু সহযোগিতা অস্বীকার করিয়া ঐ গুলির দাবী করা উচিত নহে। ঐ সর্ব্ভ-গুলিকে তাহারা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিলেন, কিন্তু ঠিক সর্ব্ভ হিসাবে দেখিলেন না।

পরে দেখা গেল, যদিও উহার একটি সর্ব্ভও পূরণ হয় নাই এবং অগ্রাগ্রহ সহস্র সহস্র ব্যক্তির সহিত আমরা কারাগারে নিষ্কিপ্ত হইলাম, তবুও আমাদের মডারেট ও রেসপন্সিভিটি বন্ধুরা—যাঁহারা আমাদের সহিত একত্রে ঘোষণা-পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন—তাঁহারা আমাদের কারাধ্যক্ষদের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিতে লাগিলেন। ইহা যে ঘটবে, আমাদের অধিকাংশের মনেই এ আশঙ্কা ছিল; তথাপি কেহই এতটা প্রত্যাশা করি নাই। সম্মিলিত কাৰ্য্যপদ্ধতির আশাতেই কংগ্রেসপন্থীরা নিজেদের এতখানি নত করিয়াছিলেন এবং তেমনি মডারেটরাও বৃটিশ গভর্নমেণ্টের সহিত নির্বিচার ও নির্বিবেক সহযোগিতা করিবার রিপূ দমন করিবেন, ইহাই কথা ছিল। কংগ্রেসের সৈন্ত-সামন্তবৃন্দকে সম্ভাবন রাখিবার প্রাণপণ চেষ্টায় আমাদের মধ্যে কেহ কেহ এই আপোষ প্রস্তাবের সম্পর্কে তীব্র আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলাম। একটা বৃহৎ সংঘর্ষের সম্মুখে আমরা কিছুতেই কংগ্রেসে ভেদ সৃষ্টি হইতে দিতে পারি না এবং আমাদের প্রদত্ত সর্ব্ভগুলি গবর্নমেণ্ট গ্রহণ করিবেন না, ইহা স্পষ্টই বুঝা গেল। ইহাতে আমাদের অবস্থা শক্তিশালী হইল এবং আমরা সহজেই কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের আমাদের সহিত টানিয়া লইয়া চলিলাম। আর কয়েক সপ্তাহ মাত্র বাকী, ডিসেম্বর এবং লাহোর কংগ্রেস অদূরবর্তী।

তথাপি সম্মিলিত ইস্তাহার আমাদের অনেকের নিকট তিক্ত বটিকার মত মনে হইতে লাগিল। স্বাধীনতার দাবী পরিত্যাগ করা—এমন কি কল্পনায় কিম্বা অল্প সময়ের জগ্গৎ—অত্যন্ত তুল এবং মারাত্মক। তাহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, লাভের আশায় উহা একটা কৌশল মাত্র, স্বাধীনতা যে আমাদের নিকট অপরিহার্য্য, উহা দ্ব্যতীত আমরা যে কিছুতেই স্থখী হইব না এমন ব্যাপার নহে। অতএব, আমি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম এবং ইস্তাহারে দস্তখৎ করিতে অস্বীকার করিলাম। (স্বভাষ বসু দৃঢ়তার সহিত স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিলেন) কিন্তু আমার পক্ষে ইহা নূতন কথা নহে; বলিয়া বহিয়া আমাকে রাজী করিয়া নাম দস্তখৎ লওয়া হইল। তাহার পরেও অত্যন্ত অশান্তি লইয়া আমি

কটিকার পূর্বাতাব

চলিয়া আসিলাম এবং স্থির হইলাম, পরদিন কংগ্রেসের সভাপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিব। এই মর্মে গান্ধিজীর নিকট একখানি পত্র দিলাম। যদিও আমি যথেষ্ট বিচলিত হইয়াছিলাম, তথাপি আমি যে এই কাজ দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত করিয়াছিলাম, এমন মনে স্থান না। গান্ধিজীর নিকট হইতে একখানি মধুর পত্র এবং তিন দিন চিন্তা করিয়া আমি শান্ত হইলাম।

লাহোর কংগ্রেসের অব্যবহিত পূর্বে আপোষের জগু আর একবার সর্বশেষ চেষ্টা করা হইল। বড়লাট লর্ড আর্কইনের সহিত সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হইল। কাহার মধ্যস্থতায় এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হইয়াছিল আমি জানি না, কিন্তু আমার মতে বিঠলভাই প্যাটেলই প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। সাক্ষাৎকারের সময় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে গান্ধিজী এবং আমার পিতা উপস্থিত ছিলেন এবং মনে হয়, মিঃ জিন্না, শ্রী তেজ বাহাদুর সফ্র এবং সভাপতি প্যাটেলও উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাৎকারে কোনও ফল হইল না, কোন সাধারণ ভূমি নির্দিষ্ট হইল না এবং গবর্ণমেন্ট ও কংগ্রেস—এই দুই প্রধান পক্ষ পরস্পর হইতে বহুদূরে প্রতিভাত হইলেন। অতএব, কংগ্রেসের পক্ষে অগ্রসর হওয়া ছাড়া গতাস্তর রহিল না। কলিকাতার প্রস্তাবানুযায়ী বর্ষ শেষ হইয়া আসিল; কংগ্রেসের চূড়ান্ত লক্ষ্যরূপে স্বাধীনতার আদর্শ ঘোষণা করিয়া উহা লাভের জগু সংঘর্ষ চালাইবার আবশ্যক উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

লাহোর কংগ্রেসের এই কয় সপ্তাহ পূর্বে ক্ষেত্রান্তরে আমাকে আর একটি গুরুতর কাজ করিতে হইল। নাগপুরে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে এই বৎসরের নির্দিষ্ট সভাপতিরূপে আমাকেই সভাপতিত্ব করিতে হইল। কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে একই ব্যক্তির পক্ষে জাতীয় কংগ্রেসে ও ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে যুগপৎ সভাপতিত্ব করা এক অনন্তসাধারণ ঘটনা। আমার আশা ছিল যে, যোগসূত্ররূপে আমি এই উভয় প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর ঘনিষ্ঠ করিব—জাতীয় কংগ্রেস অধিকতর সমাজতান্ত্রিক এবং অধিকতর গণ-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে এবং জাতীয় সংঘর্ষের জগু শ্রমিকদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া তুলিবে।

কিন্তু সম্ভবতঃ এ আশা নিফল, কেন না, জাতীয়তাবাদ নিজেই বিসর্জন দিয়াই সমাজতান্ত্রিক বা সর্বস্বকারাদের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। জাতীয় কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গী বুজোয়া হইলেও ইহাই দেশের বৈপ্লবিক শক্তির প্রতিনিধি। অতএব শ্রমিকশক্তি নিজেদের মতবাদ ও স্বাভাব্য

জওহরলাল নেহরু

সর্বতোভাবে রক্ষা করিয়াও ইহার সহিত সহযোগিতা ও ইহাকে সাহায্য করিতে পারে। আমি আশা করিয়াছিলাম যে, প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক কার্যপদ্ধতির গতিপথে কংগ্রেস অধিকতর চরম মতবাদ গ্রহণ করিয়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সম্মুখীন হইবে। গত কয়েক বৎসরে কংগ্রেস কৃষক ও পল্লীর দিকে অগ্রসর হইতেছিল। যদি এই গতি অব্যাহত থাকে তাহা হইলে একদিন কংগ্রেস বিরাট কৃষক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে, কিম্বা অন্ততঃপক্ষে কৃষকেরাও কংগ্রেসে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। আমাদের যুক্ত-প্রদেশের বহু জিলা কংগ্রেস কমিটির অধিকাংশ সদস্যই কৃষক; অবশ্য নেতৃত্ব মধ্যশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের হাতেই রহিয়াছে।

জাতীয় কংগ্রেস ও শ্রমিক কংগ্রেসের সম্পর্ক পল্লী ও নগরের অবিরত বিরোধের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবার সম্ভাবনা বিদ্যমান। কিন্তু ইহার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। বর্তমানে নগরী হইতে মধ্যশ্রেণীর লোকেরাই জাতীয় কংগ্রেস নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন এবং যে পর্যন্ত জাতীয় স্বাধীনতার সমাধান না হইতেছে ততদিন রাষ্ট্রক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের প্রাধান্য থাকিবে এবং দেশের চিত্রে জাতীয় ভাবই প্রবল শক্তিরূপে কার্য্য করিবে। তথাপি আমি কংগ্রেসের সহিত সংঘবদ্ধ শ্রমিকশক্তির ঘনিষ্ঠতার পক্ষপাতী ছিলাম। এমন কি আমরা শ্রমিক কংগ্রেসের প্রাদেশিক শাখা হইতে আমাদের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে প্রতিনিধি পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। অনেক কংগ্রেস-পন্থী শ্রমিক আন্দোলনে বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রমিক দলের অগ্রগামী অংশ কংগ্রেস হইতে দূরে থাকিতেই ভালবাসিতেন। তাঁহারা কংগ্রেস নেতাদের অবিশ্বাস করিতেন এবং শ্রমিকদের দিক হইতে তাঁহাদের মতবাদকে বুজ্জিয়া ও প্রগতিবিরোধী বলিতেন। কংগ্রেস যে জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান, তাহার নামেই সে প্রমাণ রহিয়াছে।

ভারতে শ্রমিকদের অবস্থা তদন্ত করিবার জন্ত নিযুক্ত রয়াল কমিশন, অর্থাৎ—হুইটলী কমিশন লইয়া ১৯২৯ সালে শ্রমিকমহলে অত্যন্ত বাকবিতণ্ডা হইয়াছিল। বামপন্থীরা কমিশন বয়কট করিতে চাহিলেন। দক্ষিণপন্থীরা সহযোগিতার পক্ষপাতী হইলেন। ইহার মধ্যে ব্যক্তিগত ব্যাপারও ছিল, কেন না দক্ষিণপন্থী নেতাদের কমিশনের সদস্যপদ গ্রহণ করিবার জন্ত আহ্বান করা হইয়াছিল। অগ্ৰাণ্ড ব্যাপারের মত এ ক্ষেত্রেও আমার সহানুভূতি ছিল বামপন্থীদের দিকে, বিশেষতঃ

বক্তিকার পূর্বাতাব

জাতীয় কংগ্রেসও বর্জননীতিই গ্রহণ করিয়াছিলেন। যখন আমরা প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক কার্যপদ্ধতি অবলম্বন করিতে যাইতেছি, তখন সরকারী কমিশনের সহযোগিতা করা হাশ্চক্র বলিয়াই মনে হইল।

নাগপুর শ্রমিক কংগ্রেসে ছুইটলী কমিশন বয়কট করার প্রস্তাব মুখ্য হইয়া উঠিল এবং এই বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়ে বামপন্থীরাই জয়লাভ করিলেন। এই কংগ্রেসে আমি উল্লেখযোগ্য কোন কাজ করি নাই। শ্রমিক আন্দোলনে আমি নবাগত এবং এখনও আমি ইহার আটঘাট বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই বলিয়া সঙ্কোচ অনুভব করিলাম। সাধারণতঃ আমি অগ্রগামীদের অন্তর্ভুক্ত মত প্রকাশ করিলেও কোন দলের সহিত যোগ দিয়া কাজ করিতে বিরত থাকিলাম এবং সভাপতির আসন হইতে নির্দেশ দিবার পরিবর্তে আমি নিরপেক্ষ বক্তার ভূমিকা গ্রহণ করিলাম। আমি নিষ্ক্রিয় দর্শকরূপে দেখিলাম, শ্রমিক কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হইল এবং এক নূতন মডারেট প্রতিষ্ঠান গঠিত হইল। ব্যক্তিগতভাবে আমি দক্ষিণপন্থীদের নূতন প্রতিষ্ঠান অর্থোডক্স বলিয়াই মনে করিলাম। কিন্তু বামপন্থী কয়েকজন নেতার জিদ এবং অপরকে বহিষ্কৃত করিবার কৌশলের ফলেই ইহা সম্ভব হইল। এই উভয় পক্ষের কলহের মধ্যে মধ্যপন্থীরা নিরুপায় হইয়া পড়িলেন। সম্ভবতঃ যোগা নেতা থাকিলে উভয় পক্ষকেই সংযত করিয়া ঐ বিচ্ছেদ নিবারণ করিতে পারিতেন এবং যদি বিচ্ছেদও হইত তাহা হইলেও তাহা পরবর্তী শোচনীয় ঘটনাবলীতে পর্যাবসিত হইত না।

ইহার ফলে শ্রমিক আন্দোলন যে প্রচণ্ড আঘাত পাইল, অতাপি তাহা সে কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই। গভর্ণমেণ্ট তখন অগ্রগামী দলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছেন এবং মীরাট মাগলা তাহার প্রথম ফল। সরকারী দমননীতি চলিল এবং মালিকেরাও সেই সুযোগে নিজেদের ঘর সামলাইতে লাগিল। ১৯২৯-৩০-এর শীতকালে জগদ্ব্যাপী অর্থসঙ্কট দেখা দিল; ইহাতে ব্যাহত হইয়া এবং চারিদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া ট্রেড ইউনিয়নগুলি দুর্বল হইয়া পড়িল। শ্রমিকেরা অসহায় দর্শকের মত নিজেদের অবস্থার ক্রমাবনতি লক্ষ্য করিতে লাগিল। আগামী দুই-এক বৎসরের মধ্যে শ্রমিক কংগ্রেস আরও বিচ্ছিন্ন হইল, একদল কম্যুনিষ্ট বাহিরে চলিয়া গেল। এইরূপে তিনটি শ্রমিক প্রতিষ্ঠান দেখা দিল; মডারেট দল, মূল শ্রমিক কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট দল। কার্যতঃ তিন দলই শক্তিহীন ও দুর্বল হইয়া পড়িল; এবং ইহাদের আত্মকলহের ফলে শ্রমিক সাধারণও বিরক্ত হইয়া উঠিল। ১৯৩০ হইতে আমি

অওহরলাল নেহরু

ইহার বাহিরে ছিলাম। কেন না ইহার পর অধিকাংশ সময় আমাকে কারাগারেই কাটাইতে হইয়াছে। আমার সংক্ষিপ্ত ও সাময়িক কারামুক্তির সময় শুনিতে পাইতাম যে বিরোধ-মীমাংসার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু তাহা সফল হয় নাই।* মডারেট ইউনিয়নগুলির সহিত রেলওয়ে শ্রমিকেরা যোগ দেওয়ায় উহা শক্তিশালী হইয়াছিল। অন্যান্য দল অপেক্ষা এই দলের আরও স্বেচ্ছা ছিল যে, গভর্ণমেন্ট এই দলকে গ্রাহ্য করিতেন এবং জেনেভার শ্রমিক সম্মেলনে এই দলের প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিতেন। জেনেভা যাইবার লোভে অনেক শ্রমিক নেতা স্ব স্ব ইউনিয়ন সহ এই দলে যোগ দিয়াছিলেন।

* পরবর্তী চেষ্টায় শ্রমিক ইউনিয়নগুলির মধ্যে একত্ব স্থাপনের চেষ্টা অধিকতর কার্যকরী হইয়াছিল এবং বর্তমানে সকল দলই সহযোগিতার সহিত কার্য করিতেছে।

স্বাধীনতা এবং তাহার পর

লাহোর কংগ্রেসের স্থিতি আমার চিত্তপটে উজ্জলরূপে অঙ্কিত রহিয়াছে। ইহা স্বাভাবিক। এখানে আমিই নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলাম এবং সাময়িকভাবে রক্তমণ্ডলের কেন্দ্রস্থল আমিই অধিকার করিয়াছিলাম। ঐ কর্মব্যস্ত দিন কয়েকটির অপূর্ব ভাবোন্মাদনা মাঝে মাঝে মনে পড়ে। লাহোরের অধিবাসীরা আমার অভ্যর্থনার জন্য যে বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহার সমারোহ আন্তরিকতা ও আনন্দোচ্ছ্বাস আমি জীবনে ভুলিব না। আমি জানি, আমার ব্যক্তিত্বের জন্য নহে, একটি আদর্শের প্রতীককে লক্ষ্য করিয়াই এই উৎসাহের উন্মাদনা; তথাপি ক্ষণকালের জন্য অগণিত নরনারীর দৃষ্টিতে ও হৃদয়ে সেই প্রতীকরূপে গৃহীত হওয়া ব্যক্তির পক্ষেও কম কথা নহে। আগার মন আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিল। কিন্তু যে বৃহৎ সমস্তা সম্মুখে, তাহার নিকট আমার ব্যক্তিগত মনোভাব অতি তুচ্ছ। গুরুত্ব ও গাভীধাভরা পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় যেন বজ্র ও বিদ্যুৎ স্তম্ভিত হইয়া আছে। এবার আমাদের সিদ্ধান্ত কেবল সমালোচনা নহে, প্রতিবাদ নহে, মত প্রকাশ নহে, এখন হইতে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের যে আহ্বান ধ্বনিত হইবে, তাহার ফলে সমস্ত দেশ আলোড়িত এবং লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবনে বিশাল বিপর্যয় উপস্থিত হইবে।

দূর ভবিষ্যতে আমাদের ও দেশের ভাগ্যে কি আছে, কেহই ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারে না। কিন্তু অদূর ভবিষ্যৎ স্পষ্ট—সেখানে সংঘর্ষ এবং নিজেদের প্রিয়জনদের দুঃখভোগ। এই চিন্তায় আমাদের উৎসাহের উচ্ছ্বাস প্রশান্ত হইল এবং আমাদের গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে আমরা সচেতন হইয়া উঠিলাম। আমাদের প্রত্যেকটি ভোট হইবে আরাম, আয়েস, পারিবারিক সুখশান্তি স্তব্ধ বন্ধু সম্মেলনের বিদায় অভিনন্দন এবং নিঃসঙ্গ দিবসারাত্রি, দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণার আমন্ত্রণ-লিপি।

পূর্ণ স্বাধীনতার মূল প্রস্তাব এবং স্বাধীনতা সংঘর্ষের কাঁচাপ্রণালী প্রায় সর্ববাদীসম্মতরূপে গৃহীত হইল, কয়েক সহস্রের মধ্যে একশতেরও কম ব্যক্তি বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন। মূল প্রস্তাবের একটি অংশ লইয়া একটি

সংশোধিত প্রস্তাবে প্রকৃত ভোট গ্রহণ করা হইয়াছিল। সংশোধক প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে ভোটসংখ্যা গণনা ও ঘোষণার পর উহা পরিত্যক্ত হইল। পরিশেষে ৩১শে ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে পুরাতন বর্ষ শেষে, নব বর্ষারম্ভের মুহূর্ত্তে, মূল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইল। ইহা যেন কাকতালীয়বৎ; কেন না কলিকাতা কংগ্রেস-নির্দিষ্ট এক বৎসর সময় ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই শেষ হইল এবং নূতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া সংঘর্ষের আয়োজন আরম্ভ হইল। কর্ম্মচক্র ঘুরিতে লাগিল; কিন্তু কখন, কি ভাবে, কোথায় আরম্ভ, তাহা আমরা অন্ধকারে তখনও বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। সংঘর্ষের কার্য্যক্রম নির্দেশ করিবার ভার নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির উপর অর্পিত হইল কিন্তু আমরা সকলেই বুঝিলাম, গান্ধিজীর উপরই সমস্ত নির্ভর করিতেছে।

লাহোর কংগ্রেসে পার্শ্ববর্ত্তী সীমান্ত প্রদেশ হইতে বহুসংখ্যক ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিল। এই প্রদেশ হইতে অল্পবিস্তর প্রতিনিধি কংগ্রেসে যোগ দিতেন এবং কয়েক বৎসর ধরিয়া খাঁ আব্দুল গফুর খাঁ কংগ্রেসে আসিয়া আলোচনায় যোগ দিতেছিলেন। লাহোরেই প্রথম সীমান্ত প্রদেশের বহু যুবক নিখিল ভারতীয় রাজনীতির সম্পর্কে আসিলেন। তাঁহাদের নবীন ও সতেজ মনে ইহা বেখাপাত করিল এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামে সমস্ত ভারতবর্ষের সহিত ঐক্যবোধ এবং উৎসাহ লইয়া তাঁহারা ফিরিয়া গেলেন। ইহারা সরল ও কর্ম্মকুশল; অগ্ন্যাগ্ন প্রদেশের লোক অপেক্ষা ইহারা কথাবার্ত্তা বাগবিত্তা কম করেন। তাঁহারা ফিরিয়া গিয়া নূতন ভাব প্রচার এবং জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা সাফল্যলাভ করিলেন। ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের নবাগত সৈনিকরূপে সীমান্তের নরনারীরা ১৯৩০-এর সংঘর্ষে অনগ্রসাধারণ নৈপুণ্য ও দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

লাহোর কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই আমার পিতা কংগ্রেসের নির্দেশানুসারে ব্যবস্থা পরিষদ ও প্রাদেশিক আইন সভাগুলির সদস্যপদে কংগ্রেসী সদস্যদিগকে ইন্তফা দিতে আহ্বান করিলেন। প্রায় সকলেই এই নির্দেশানুসারে কার্য্য করিলেন, অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই নির্বাচন-প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া পদত্যাগ করিতে অস্বীকার করিলেন।

ভবিষ্যৎ তখনও অনিশ্চিত। কংগ্রেসে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সত্ত্বেও, দেশ কি ভাবে সাদা দিবে সে সম্বন্ধে কাহারও কোন ধারণা ছিল না। আমরা ত তরী ডুবা ইয়া দিয়া সম্মুখে চলিয়াছি, কিন্তু কোন্ অপরিচিত

স্বাধীনতা এবং তাহার পর

অজানা রাজ্যে, কে জানে! সংগ্রামের সূচনার জন্ত এবং দেশবাসীর মনোভাব বৃদ্ধিবার জন্ত ২৬শে জাভুয়ারী স্বাধীনতা দিবস নির্দিষ্ট হইল। স্থির হইল, ঐ দিবস দেশের সর্বত্র পূর্ণ রাজ্য সঙ্কল্প গৃহীত হইবে।

আমাদের কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে সন্দেহ সন্দেহেও আশা ও উৎসাহ লইয়া আমরা ঘটনার গতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। জাভুয়ারী মাসের প্রথমভাগে আমি এলাহাবাদেই ছিলাম, পিতা বাহিরে ছিলেন! এই সময় প্রতি বৎসর মাঘ মেলা হয়, এ বৎসর কুস্তমেলা ছিল। লক্ষ লক্ষ নরনারী জলশ্রোতের মত এলাহাবাদে—তীর্থযাত্রীদের ভাষায় পবিত্র প্রয়াগতীর্থে—আসিতে লাগিল। ইহাদের অধিকাংশই কৃষক, তাহা ছাড়া শ্রমিক, দোকানদার, শিল্পী, ধনী, ব্যবসায়ী, বিভিন্ন বৃত্তিজীবী—এককথায়, হিন্দু-ভারতের সর্বশ্রেণীর সমাবেশ। অবিরত জনশ্রোত নদীতীরে যাইতেছে, আসিতেছে; দেখিতে দেখিতে আমি উন্মনা হইয়া ভাবিতাম—নিরুপদ্রব প্রতিরোধ অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের আহ্বানে ইহারা কিরূপ মাড়া দিবে! ইহাদের মধ্যে কয়জন লাহোর সিদ্ধাস্ত জানে বা জানিবার আগ্রহ রাখে? সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া অগণিত নরনারী ভারতের নানা প্রান্ত হইতে পবিত্র গঙ্গানীরে যে বিশ্বাস লইয়া অবগাহন করিতে আসিতেছে, তাহার কি আশ্চর্য্য শক্তি! এই অসামান্য শক্তির কিয়দংশ কি তাহারা নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্ত নিয়োজিত করিতে পারে না? অথবা ইহাদের মন ধর্মের অতুশাসন ও পরম্পরাগত আচারের জালে এমন ভাবে জড়াইয়া গিয়াছে যে সেখানে অণু চিন্তার ঠাই নাই!

অবশ্য আমি জানি, এ সকল চিন্তা তাহাদের চিত্তে উদয় হইতেছে এবং বহুযুগের প্রশান্ত বারিদি উদ্বেলিত হইতেছে। এই সকল অস্পষ্ট ধারণা ও আশা আকাঙ্ক্ষার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হইতেই জনসাধারণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহারই ফলে গত দ্বাদশ বৎসরের আলোড়নে ভারতবর্ষ দ্রুত পরিবর্তিত হইতেছে। নিশ্চয়ই ঐ সকল চিন্তা তাহাদের মনে আছে এবং তাহার পশ্চাতে সৃজনী শক্তিও কার্য্য করিতেছে। তবুও সন্দেহ জাগে, প্রশ্ন উঠে; সহসা উত্তর খুঁজিয়া পাই না। এই সকল নূতন ভাব কতটা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে? ইহাদের শক্তি কত, সংঘবদ্ধভাবে কার্য্য করিবার সামর্থ্য এবং সহশক্তি কতখানি?

আমাদের বাড়ীতেও যাত্রীর ভীড় হইতে লাগিল। আমাদের বাড়ীর অনতিদূরে ভরদ্বাজ আশ্রম—অতি প্রাচীনকালের বিদ্যায়তন। তীর্থযাত্রীরা

এই আশ্রয় দেখিবার অবসরে প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমাদের বাড়ীতেও আসিত। আমার মনে হয়, তাহারা বিখ্যাত যে সকল ব্যক্তির নাম শুনিয়াছে, তাহাদের এবং কোতূহলের বশবর্তী হইয়া বিশেষভাবে আমার পিতাকে দেখিতে আসিত। ইহাদের মধ্যে অনেকেই রাজনীতির খোঁজ খবর রাখিত। ইহারা কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের কথা, ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালীর কথা জিজ্ঞাসা করিত। অনেকেই অর্থনৈতিক পীড়ন অনুভব করিতেছিল, তাহারা কি করিতে হইবে জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করিত। আমাদের রাজনৈতিক ধ্বনিগুলি তাহাদের সুপরিচিত এবং আমাদের বাড়ী অহোরাত্র সেই সকল চাঁৎকারে প্রতিধ্বনিত হইত। সকাল হইতে আমি পচিশ, পঞ্চাশ অথবা একশ জনকে কিছু কিছু বলিতাম, এক দলের পর অপর দল; প্রত্যেক দলের সম্মুখে কিছু বলা অসম্ভব হইয়া উঠিত। অবশেষে নীরবে প্রত্যেক নবাগত দলকে অভিবাদন ছাড়া আর কিছুই করিতে পারিতাম না। কিন্তু ইহারও সীমা আছে, অবশেষে আমি লুকাইয়া থাকিতে চেষ্টা করিতাম। কিন্তু নিফল চেষ্টা। জয়ধ্বনি ক্রমশঃ গ্রামে গ্রামে উঠিয়া উচ্চতর হইত, দর্শনার্থীরা বারান্দা ভরিয়া ফেলিত; প্রত্যেক দরজা জানালায় দশ-বার জোড়া তুষিত চক্ষু উন্মুখ হইয়া থাকিত। এই অবস্থায় কথা বলা, খাওয়াদাওয়া করা, এমন কি, কোন কাজ করাই কঠিন। ইহা কেবল সঙ্কট নহে, এক বিরক্তিকর ঝকমারী। কিন্তু তথাপি তাহারা উজ্জ্বল স্নেহাঙ্গু দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া থাকে! পুরুষানুক্রমে বহুকাল দারিদ্র্য ও দুঃখে পিষ্ট হইয়াও, ইহাদের হৃদয় হইতে কৃতজ্ঞতা ও প্রেম উথলিয়া উঠিতেছে; ইহারা একটু সহানুভূতি ও আদর ছাড়া কোন প্রতিদান চাহে না। এই অপরিমিত ভক্তি ভালবাসার সম্মুখে হৃদয় আপনা হইতেই সন্ত্রমভরে নত হইয়া পড়ে।

এই সময় আমাদের এক প্রিয় বান্ধবী আমাদের আলয়ে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সহিত বসিয়া একটু আলাপ করিবারও সময় পাইতাম না। প্রতি চার পাঁচ মিনিট অন্তর আমাদের বাহিরে গিয়া জনতাকে দুই-চার কথা বলিতে হইত—আর জয়ধ্বনি ত সব সময় লাগিয়াই আছে। আমার বান্ধবী আমার এই অবস্থা দেখিয়া কোতুক অনুভব করিতে লাগিলেন এবং ভাবিলেন, জনসাধারণের উপর আমার অসামান্য প্রভাব। আসলে পিতার জগ্নু ইহারা আসিতেছিল এবং পিতার অনুপস্থিতির ফলেই আমাকে এই সঙ্গীতের সম্মুখীন হইতে হইতেছে। তিনি সহসা আমার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, এই

স্বাধীনতা এবং তাহার পর

বীরপূজা তোমার কেমন লাগিতেছে ? তোমার মনে কি অহঙ্কার হইতেছে না ? আমি উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করিতেছি দেখিয়া তিনি সম্ভবতঃ ভাবিলেন, একান্ত ব্যক্তিগত প্রশ্ন বলিয়া আমি বিবত বোধ করিতেছি। তিনি ক্ষমা চাহিলেন। কিন্তু তিনি আমাকে মোটেই বিব্রত করেন নাই। এরূপ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। আমার মন দূর-দূরান্তরে চলিয়া গেল এবং নিজের মনোভাব আমি বিশ্লেষণ করিতে লাগিলাম। সত্যই আমার মনে বিমিশ্র ভাবের উদ্বেগ হইয়াছিল।

ইহা সত্য যে, ঘটনাচক্রে আমি সাধারণের মধ্যে অনন্তসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছি। শিক্ষিত ব্যক্তিরা আমার অল্পরাগী; যুবক যুবতীদের নিকট আমি একজন বীর; তাহাদের দৃষ্টিতে আমার চারিদিকে 'রোমান্সের' পরিমণ্ডন। আমার নামে সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল এবং হাস্যকর বীরত্ব-কাহিনী চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি, আমার প্রতিপক্ষরা পর্যন্ত আমার প্রশংসা করিতেন এবং সহৃদয় মুকুবীর মত আমার যোগ্যতা ও আত্মবিশ্বাসের প্রশংসা করিতেন।

হয় মহা সাধু, নয় হৃদয়হীন দানব, ইহাতে অক্ষত ও অবিচলিত থাকিতে পারে; আমি দুইয়ের কোনটাই নহি। ইহা আমার মস্তিষ্কে উন্মাদনা সঞ্চার করিত এবং শক্তি ও আত্মবিশ্বাস জাগাইয়া তুলিত। আমি কাজে কর্মে (নিজেকে পরের দৃষ্টিতে দেখা সব সময়ই কঠিন) একটু 'ডিস্টেক্টর'-ধরণের প্রভু-প্রয়াসী হইয়া পড়িতেছি (আমার কল্পনা) বলিয়া মনে হইত। অথচ আমার অহঙ্কার দৃশ্যতঃ বাড়িয়াছিল, এমন মনে হয় না। আমার নিজের শক্তি সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট ধারণা আছে। এবং তাহা লইয়া আমি অনাবশ্যক বিনয় প্রকাশ করি না কিন্তু তাহা এমন কিছু অসাধারণ নহে এবং আমার দুর্বলতাগুলি সম্বন্ধেও আমি সর্বদা সচেতন। আত্মানুসন্ধানের অভ্যাসের ফলেই সম্ভবতঃ আমার মাথা ঠিক থাকে এবং নিজের সম্বন্ধে অনেক ঘটনা আমি অনাসক্তের মত গ্রহণ করিতে পারি। জনসাধারণের কার্যে অভিজ্ঞতা হইতে আমি দেখিয়াছি জনপ্রিয়তা অবাস্তবীয় লোকের হাতের পুতুল মাত্র; ইহা নিশ্চয়ই কোন গুণ বা বুদ্ধির নিদর্শন নহে। আমার অজ্ঞিত গুণের জন্ত, না, আমার দুর্বলতাগুলির জন্ত আমি জনপ্রিয়! কেন আমার এই জনপ্রিয়তা ?

আমার বুদ্ধি বা পাণ্ডিত্যের কোন বিশেষত্ব নাই এবং বুদ্ধি বা পাণ্ডিত্য থাকিলেই যে জনপ্রিয় হওয়া যায়, এমন নহে। তথাকথিত ত্যাগের জন্তই যে আমি জনপ্রিয় তাহাও নহে। আমাদের সমসাময়িক

জওহরলাল নেহরু

কালেই ভারতবর্ষের শত সহস্র নরনারী কত বেশী দুঃখ কষ্ট বরণ করিয়াছে, এমন কি আত্মত্যাগের শেষ সীমা পর্য্যন্ত গিয়াছে। আমার বীরখ্যাতি সম্পূর্ণরূপেই ভূয়া, আমি নিজের মধ্যে বীরত্বের কোন চিহ্নই দেখি না। এবং সাধারণতঃ বীরোচিত ভাবভঙ্গী এবং জীবনে বীরত্বের নাটকীয় আদবকায়দা আমার নিকট অত্যন্ত তুচ্ছ লঘুতা বলিয়াই মনে হয়। আর ‘রোমান্স’? সম্ভবতঃ আমি সর্বাধিক রোমান্স-হীন ব্যক্তি। অবশ্য আমার দৈহিক ও মানসিক সাহস আছে সত্য, কিন্তু তাহার ভিত্তি, সম্ভবতঃ ব্যক্তিগত, দলগত এবং জাতীয়তার অহঙ্কার এবং ভয় দেখাইয়া বা জোর করিয়া কাজ করিতে বাধ্য হওয়ার প্রতি আমার অনিচ্ছা।

কিন্তু ইহাও আমার প্রশ্নের সত্ত্বের নহে। তখন আমি অল্প দিকে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি দেখিলাম, আমার ও আমার পিতার সম্বন্ধে এই কাহিনীটি প্রচলিত আছে যে, আমরা প্রতি সপ্তাহে ভারত হইতে প্যারীর ধোবা বাড়ীতে কাপড় কাচিতে পাঠাইতাম। আমরা বারম্বার ইহার প্রতিবাদ করিয়াছি, কিন্তু কাহিনী মরে নাই। ইহা অপেক্ষা অসম্ভব ও অদ্ভুত কিছু কল্পনা করা যাইতে পারে কি-না জানি না। তবে যদি কেহ এত মূখ্য থাকে যে, এই শ্রেণীর বৈঠকী গাল-গল্প করিয়া অনাবশ্যক বাহাদুরী লয়, তাহা হইলে আমার মতে তাহাকে মূর্খোত্তম উপাধি দিয়া পুরস্কার দেওয়া উচিত।

এইরূপ আর একটি গল্প পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ সম্বন্ধে এখনও চলিতেছে। স্কুলে, ইংলণ্ডের যুবরাজ নাকি আমার সহপাঠী ছিলেন। ১৯২১ সালে আমি যখন জেলে ছিলাম, তখন যুবরাজ ভারতে আসিয়া আমার সহিত দেখা করিতে চাহিয়াছিলেন, এমন একটা কথাও রটনা আছে। কিন্তু কার্য্যতঃ আমি তাঁহার সহপাঠী ত ছিলামই না, এমন কি, তাঁহার সহিত আমার কখনও দেখা করার বা কথা বলার সুযোগই হয় নাই।

একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে যে, আমার যেটুকু খ্যাতি বা জনপ্রিয়তা আছে, তাহার ভিত্তি এই শ্রেণীর কাহিনী। হয় ত তাহার ভিত্তি আরও দৃঢ়; কিন্তু উপরে এই শ্রেণীর আহাম্মকীর রং আছে; নতুবা এরূপ গল্প সৃষ্টি হইত না। যাহাই হউক, অভিজাত সমাজে মেলামেশা, অলস বিলাসের প্রাচুর্য্যের মধ্যে জীবন যাপন এবং পরে ঐগুলি সর্বতোভাবে ত্যাগ;—এই ত্যাগের দ্বারা সহজেই ভারতীয় চিত্ত জয় করা যায়! কিন্তু খ্যাতির এই শ্রেণীর ভিত্তির উপর আমার অহুরাগ নাই।

স্বাধীনতা এবং তাহার পর

নেতিবাচক গুণ অপেক্ষা ইতিবাচক ক্রিয়াশীল গুণেরই আমি পক্ষপাতী।
ত্যাগের জন্তই ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ, আমার ভাল লাগে না। অল্প-
দিক হইতে আমি ত্যাগ ও সংঘের উপকারিতা স্বীকার করি।
মানসিক ও আত্মোন্নতি সাধনের জন্ত উহা আবশ্যিক। ব্যায়ামবীর
তাহার দেহ সবল ও সুস্থ রাখিবার জন্ত যেমন সাদাসিধে ও নিয়মিত
জীবন যাপন করিয়া থাকে, ইহা কতকটা সেই শ্রেণীর। যাহারা দুঃসাধ্য
সাধনে প্রবৃত্ত হয় তাহাদের কঠিন আঘাত সহ্য করিয়াও উদ্যমের
সহিত কাজ করার শক্তি আবশ্যিক। কিন্তু সন্ন্যাসীর মত জীবনকে
অস্বীকার, আনন্দ ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়াবৃত্তি সম্পর্কে আতঙ্ক ও কঠোরতার
প্রতি আমার আকর্ষণ নাই, উহা আমার ভালও লাগে না। যাহা
আমার কামনার বস্তু, তাহা কখনও ইচ্ছা করিয়া ত্যাগ করি নাই;
কিন্তু কাম্য বস্তুরও পরিবর্তন আছে।

কিন্তু ইহাতেও আমার বান্ধবীর প্রশ্নের উত্তর অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল;
জনতার এই বীরপূজা দেখিয়া আমি গর্ভ বোধ করি কি-না? আমার
ইহা ভাল লাগে না, দূরে পলাইয়া যাইতে ইচ্ছা হয়; তবু ইহাতে
আমি অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি। এই সম্মান না পাইলে অভাবও
বোধ হয়। কোন দিকেই পূর্ণ তৃপ্তি পাই না; তবে মোটের উপর
জনতা আমার মনের গভীর ফাঁক পূর্ণ করিয়াছে। আমি জনতাকে নুষ্ণ
করিয়া ইচ্ছামত অঙ্গুলী হেলনে চালিত করিতে পারি; এই ধারণা হইতে
তাহাদের মন ও হৃদয়ের উপর আমার প্রভুবোধ জাগ্রত হইয়াছে;
এবং ইহাতে আমার শক্তিনাভের আকাঙ্ক্ষা কতকাংশে চরিতার্থ হয়।
অল্পদিকে তাহারাও আমার উপর সূক্ষ্মভাবে অত্যাচার করে। আমার
প্রতি তাহাদের বিশ্বাস, নির্ভরতা ও ভালবাসায় আমার মর্ম্মস্থল
আলোড়িত হইয়া উঠে এবং উদ্বেলিত ভাবাবেগ তাহাদের প্রতি
উচ্ছ্বসিতভাবে ছুটিয়া যায়। আমি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী; কিন্তু সময় সময়
আমার ব্যক্তিত্বের বাধ গলিয়া ধসিয়া পড়ে; মনে হয়, আত্মরক্ষা
অপেক্ষা ইহাদের সহিত মিলিত হইয়া অভিশপ্ত জীবন যাপন করাও
শ্রেয়। কিন্তু ব্যবধান একেবারে বিলুপ্ত হয় না, দূর হইতে অহুসঙ্কিৎসু
দৃষ্টি লইয়া আমি যে দৃশ্য দেখি, তাহার মর্ম্ম সম্যক বুঝিতে পারি না।

আত্মাভিমান অনেকটা মেদ রোগের মত; অজ্ঞাতসারে ইহা স্তরে
স্তরে বৃদ্ধি পায় এবং প্রাত্যহিক বৃদ্ধি কেহ বুঝিতেও পারে না।
সৌভাগ্যক্রমে এই উন্নত জগতের কঠিন আঘাতে ইহা নত হয়; কখনও
বা একেবারেই ধরাশায়ী হয় এবং অধুনা ভারতবর্ষে আমাদের জন্ত

জওহরলাল নেহরু

এইরূপ কঠিন আঘাতের অভাব নাই। আমাদের পক্ষে জীবনের এই শিক্ষাগার অতি কঠিন স্থান, আর দুঃখ অতি নির্ধম শিক্ষক।

আমার আরও সৌভাগ্য যে আমার পরিজনবর্গ বন্ধু ও সহকর্মীরা আমাকে যথাস্থানে রাখিয়াই ব্যবহার করিতেন এবং আমার মাথা গরম করিয়া দিতেন না। জনসভা, অভ্যর্থনা সভা, মিউনিসিপালিটি, লোকাল-বোর্ড ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠান হইতে অভিনন্দনপত্র দান প্রভৃতি ব্যাপারে আমার মস্তিষ্ক ক্লান্ত এবং রসবোধ শুকাইয়া ওঠে। আলাঙ্কারিক ভাষায় অসম্ভব অতিশয়োক্তি শুনিয়া এবং চারিদিকে ভদ্রমহোদয়গণের গম্ভীর ও অমায়িক মূর্তি দেখিয়া আমার পক্ষে হাসি চাপিয়া রাখা দায় হইয়া উঠিত; জিভ বাহির করিয়া ভ্যাংচাইলে অথবা সভাস্থলে ডিগ্বাজী খাইলে এই সকল সভা ভব্য ভদ্রমহোদয়গণের কি অবস্থা হয়, তাহা দেখিয়া আমোদ উপভোগের ইচ্ছা হইত। সৌভাগ্যক্রমে আমার খ্যাতি এবং ভারতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে আমার দায়িত্ব স্বরণ করিয়া এই সকল উন্নত আকাজ্ঞা আমি দমন করিয়া বাহিরে শিষ্ট ব্যবহার করিতাম। কিন্তু সব সময় পারিতাম না। জনবহুল সভায় বিশেষতঃ শোভাযাত্রায় সময় সময় সহ্য করিতে না পারিয়া আমি উষ্ণ হইয়া উঠি। আমাদের সম্মানের জ্ঞেয় নির্দিষ্ট শোভাযাত্রা হইতে আমি অলক্ষ্যে সরিয়া জনতার ভীড়ে মিশিয়া পড়ি, আমার স্ত্রী কিম্বা অপর কেহ আমার স্থলে গাড়ীতে কিম্বা মোটরে বসিয়া শোভাযাত্রার সহিত গমন করেন।

সদা সর্বদাই নিজের মনের ভাব চাপিয়া রাখিয়া সাধারণের সম্মুখে অমায়িক হওয়ার দুঃখ অনেক, ফলে সভাসমিতিতে মুখভাব প্রায়ই বিরক্তিপূর্ণ ও গম্ভীর দেখায়। সম্ভবতঃ এই কারণে কোন হিন্দু মাসিক পত্রিকায় আমার সম্বন্ধে লেখা হইয়াছিল যে, আমি দেখিতে অনেকটা হিন্দু বিধবার মত। প্রাচীন ধরণের হিন্দু বিধবাদের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা সত্ত্বেও এই মন্তব্যে আমি আহত হইয়াছিলাম। লেখক সম্ভবতঃ আমাকে প্রশংসা করিবার জন্তই তাঁহার মনমত কতকগুলি গুণ আমাতে আরোপ করিতে চাহিয়াছিলেন, অর্থাৎ আমি যেন ত্যাগ ও আত্মবিলোপের প্রতীক এবং হস্তশিল্পশীল কর্তব্যপরায়ণতার আদর্শ। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমার এবং আমার মনে হয় হিন্দু বিধবাদেরও অনেক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যদীপ্ত গুণ, কর্মপ্রবণতা ও হস্তপরিহাসের শক্তি আছে। গান্ধিজী একবার একজনকে বলিয়াছিলেন, যদি তাঁহার হস্তপরিহাসের শক্তি না থাকিত, তাহা হইলে তিনি আত্মহত্যা বা ঐরূপ কিছু করিতেন। আমার অতদূর যাইবার ইচ্ছা

স্বাধীনতা এবং তাহার পর

না থাকিলেও একথা বলিতে পারি যে, যদি লোকে হাশুপরিহাস ও লঘু আমোদ না করিত, তাহা হইলে আমার নিকট জীবন নীরস ও অসহ্য হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই।

আমার জনপ্রিয়তা এবং আলঙ্কারিক ভাষায় শব্দাডম্বরপূর্ণ অভিনন্দন-পত্র (অভিনন্দনে অত্যাক্তি ও অতিশয়োক্তি করা ভারতের প্রথা) গুলি লইয়া আমার পরিবারবর্গ ও অন্তরঙ্গ বন্ধুরা মাঝে মাঝে পরিহাস করিয়া তুমুল হাস্যরোল তুলিতেন। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ভাষায় সচরাচর ব্যবহৃত বড় বড় বুলি ও বিশেষণ এবং উপাধিগুলি, অভিনন্দন-পত্র হইতে বাছিয়া লইয়া আমার স্ত্রী, ভগ্নীরা এবং অন্যান্য সকলে ব্যঙ্গ ও তাম্বিলের স্বরে পরিহাস করিতেন। প্রায়ই আমাকে ‘ভারত-ভূষণ’ ‘তাগমুন্ডি’ প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করা হইত, সভার ক্লাস্তির শেষে ঐ গুলি লইয়া বাড়ীতে হাশু পরিহাসে আমার হৃদয়ের ভার লঘু হইয়া যাইত, এমন কি, আমার ছোট মেয়েটি পর্য্যন্ত এই ব্যাপারে যোগ দিত। কেবল আমার মাতা ঐগুলি শ্রদ্ধার সহিত বিশ্বাস করিবার জগু জ্বিদ করিতেন এবং তাঁহার আদরের পুত্রকে লইয়া এইরূপ রঙ্গ পরিহাস তিনি সহ্য করিতেন না। পিতা আমোদ বোধ করিতেন। আমার প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ও স্বগভীর স্নেহ প্রকাশ করিবার এক প্রশান্ত ভঙ্গী ছিল।

কিন্তু জনতার জয়ধ্বনি, বিরস ও ক্লাস্তিকর অভিনন্দন-সভা প্রভৃতি, তর্ক যুক্তি, রাজনীতির ধূলি ধূম আমাকে বাহির হইতে স্পর্শ করিত মাত্র— ইহা কদাচিৎ তীব্র ও তীক্ষ্ণ হইত। প্রকৃত দ্বন্দ্ব চলিত আমার মনে— আদর্শের সংঘাত, কামনা ও আহুগত্যের সংঘাত, সচেতন অন্তঃপ্রকৃতির সহিত বাহ্য পারিপাশ্বিক অবস্থার বিরামহীন সংগ্রাম, এবং তাহার মধ্যে অন্তরের অতৃপ্ত ক্ষুধা। আমার মনের মধ্যে যেন একটা যুদ্ধক্ষেত্র এবং বিভিন্ন শক্তি পরস্পরকে পরাহত করিয়া প্রতুষ্ট স্থাপনপ্রয়াসী। ইহা হইতে পরিত্রাণের জগু মন উন্মুখ হইত; সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের জগু আমি উদগ্রীব হইতাম এবং এই চেষ্টার ফলেই নিজকে কর্মের মধ্যে ডুবাইয়া দিতাম। কর্মক্ষেত্রে কিছু শান্তি পাই। বাহিরের সংগ্রামে, ভিতরের সংঘর্ষ কতকটা প্রশমিত হয়।

নিমন্ত্রণ কারাগৃহে বসিয়া কেন এ সকল কথা লিখিতেছি? কি বাহিরে, কি কারাগারে, ঈঙ্গিতের আকাঙ্ক্ষা সমানই রহিয়াছে; শান্তি ও মানসিক আরাম লাভের আশায় আমি আমার অতীত মনোভাব ও অভিজ্ঞতা লিখিতে বাসিয়াছি!

আইন অমান্তের সূচনা

১৯৩০-এর ২৬শে জাহুয়ারী স্বাধীনতা দিবস আসিল। বিদ্যাম্ভকের মত আমরা দেশের আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখিতে পাইলাম। সর্বত্র বৃহৎ জনতা নিম্নলিখিত গান্ধীধর্মপূর্ণ, স্বাধীনতার সঙ্কল্পবাক্য * উচ্চারণ করিতেছে, সে এক মহান দৃশ্য। সেখানে কোন বক্তৃতা নাই, অহরোধ উপরোধ নাই। এই অহুষ্ঠান হইতে গান্ধীজী প্রেরণা লাভ করিলেন এবং দেশের নাড়ীর গতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বুঝিলেন, কার্য্য করার সময় উপস্থিত। রক্তমঞ্চে ঘটনার জ্বল সমাবেশে মহানাট্য জমিয়া উঠিল।

আইন অমান্ত আন্দোলনের সূচনায় দেশের আকাশ রোমাঞ্চিত। মনে পড়িল ১৯২১-২২-এর আন্দোলন এবং চাওরী-চাওরার পর তাহার আকস্মিক পরিসমাপ্তি! দেশ এখন অধিকতর সংহত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং এই শ্রেণীর সংঘর্ষ সম্পর্কে ধারণাও পূর্বাপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট। সংঘর্ষের কৌশল সম্পর্কে সকলের একটা মোটামুটি ধারণা থাকিলেও গান্ধীজী প্রত্যেককে অহিংসার মর্ম্মকথা অধিকতর পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু দশ বৎসর পূর্বের কথা অনেকেরই মনে পড়িল। এত সাবধানতা সত্ত্বেও যে স্বাভাবিকভাবে অথবা কোন বড়যন্ত্রের ফলে কোথাও হিংসামূলক কার্য্যের অহুষ্ঠান হইবে না, তাহার নিশ্চয়তা কি? যদি এইরূপ ঘটনা ঘটে, তবে আমাদের আইন অমান্ত আন্দোলনের কি হইবে? পূর্বের মত আবার কি আকস্মিকভাবে আন্দোলন স্থগিত থাকিবে? এরূপ সম্ভাবনা কত নৈরাশ্যজনক।

গান্ধীজী সম্ভবতঃ তাঁহার স্বকীয় ভাবে এই প্রশ্ন চিন্তা করিতেছিলেন এবং তাঁহার সাময়িক কথাবার্তা হইতে তিনি যে এই সমস্যা লইয়া বিব্রত তাহাও বুঝিতাম; তাঁহার মনোভাব আমার ভাষায় লিখিতেছি।

তাঁহার মতে, কোন অত্যাচারের প্রতিকার অথবা কল্যাণ-সাধনের জন্য অহিংসাই একমাত্র সত্যপথ এবং সম্যকভাবে প্রযুক্ত হইলে ইহা অব্যর্থ। তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে, ইহার পরিচালন ও সাফল্যের জন্য বিশেষ অঙ্কুল

* পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

আইন অমান্তের সূচনা

ক্ষেত্র আবশ্যক। কিন্তু যদি বাহিরের অবস্থা ইহার অনুকূল না হয় তাহা হইলে কি ইহা প্রয়োগ করা উচিত নহে? ইহার উত্তরে এই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, সমস্ত ক্ষেত্রই অহিংস উপায় প্রয়োগের শোণ্য নহে এবং ইহা সর্বজনীন বা অব্যর্থ উপায়ও নহে। কিন্তু গান্ধিজী এই সিদ্ধান্ত কিছুতেই গ্রহণ করেন না। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, ইহা সর্বত্র সমানভাবে প্রযোজ্য এবং ইহা অব্যর্থ। অতএব প্রতিকূল অবস্থা, এমন কি, হিংসাপূর্ণ সংঘর্ষের মধ্যেও এই উপায়ে কার্য্য করা যাইতে পারে। অবস্থা বিশেষে ইহার প্রয়োগ-কৌশলের অদল-বদল হইতে পারে; কিন্তু ইহা প্রত্যাহার করিলে তাহা ব্যর্থতা স্বীকারেরই নামান্তর মাত্র।

সম্ভবতঃ এইভাবে তিনি চিন্তা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাহা নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি না। তিনি আমাদিগকে এইটুকু বুঝিবার অবসর দিলেন যে, তাঁহার মতের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হইয়াছে এবং স্থানবিশেষে আকস্মিক হিংসার জগু আইন অমান্ত আন্দোলন প্রত্যাহার করিবার প্রয়োজন নাই। এই আশ্বাসে আমরা অনেকে সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রশ্ন—কেমন করিয়া? আমরা কি ভাবে আরম্ভ করিব? কি উপায়ে ইহা কার্য্যকরী অবস্থার উপযোগী এবং জনপ্রিয় হইবে? সে ইঙ্গিত দিলেন,—মহাত্মা!

সহসা লবণ শব্দটি অপূর্ব রহস্য ও শক্তিতে মণ্ডিত হইল। লবণকরকে আক্রমণ করিতে হইবে, লবণ আইন ভঙ্গ করিতে হইবে। আমরা হতভম্ব হইলাম। জাতীয় সংঘর্ষের সহিত অতি সাধারণ লবণের সম্পর্ক বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম মা। গান্ধিজী ‘এগার দফা দাবী’ ঘোষণা করায় আরও বিশ্বয় বাড়িয়া গেল। যদিও প্রস্তাবগুলি ভাল সন্দেহ নাই, তথাপি যখন আমরা পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলিতেছি, তখন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারমূলক কতকগুলি প্রস্তাবের স্বার্থকতা কি? পূর্ণ স্বাধীনতা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, গান্ধিজীও কি তাহাই বুঝেন, অথবা আমাদের বলিবার ভাষা স্বতন্ত্র? ঘটনার রথচক্র চলিতে লাগিল, তর্ক করার অবসর রহিল না। ভারতে রাজনৈতিক ঘটনা-প্রবাহ আমাদের চক্ষুর সম্মুখে আবর্তিত হইতে লাগিল; কিন্তু তখনও আমরা বুঝিতে পারি নাই, জগদ্ব্যাপী এক ভয়াবহ অর্থসঙ্কট ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দা ঘনাইয়া আসিতেছে। নগরবাসীরা ইহাতে প্রাচুর্যের দিন কিরিয়া আসিতেছে মনে করিয়া আনন্দিত হইল, কিন্তু পল্লীবাসী কৃষক ও রায়তেরা শস্তমূল্য হ্রাসের সম্ভাবনায় প্রমাদ গণিল।

তারপর গান্ধিজীর সহিত বড়লাটের পত্রবিনিময় হইল এবং সুরমতী আশ্রম হইতে ডাণ্ডী অভিযান আরম্ভ হইল। দিনের পর দিন এই

জওহরলাল নেহরু

তীর্থযাত্রীদের অগ্রসর জনসাধারণ উৎসুক দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল এবং দেশব্যাপী উৎসাহানল প্রদীপ্ত হইতে লাগিল। আসন্ন আন্দোলন পরিচালনার চূড়ান্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য আহম্মদাবাদে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন বসিল। আন্দোলনের নেতা অস্থগুস্থিত, তিনি তীর্থযাত্রীদের লইয়া সমুদ্রতীরে চলিয়াছেন এবং ফিরিয়া আসিতে অস্বীকৃত হইলেন। সকলে গ্রেফতার হইবার সম্ভাবনায় সভায় স্থির হইল, কমিটির সমস্ত ক্ষমতা সভাপতির থাকিবে, তিনি কার্য্যকরী সমিতির শূণ্যপদে অপরকে মনোনীত করিবেন এবং তিনি স্বয়ং গ্রেফতার হইলে পরবর্তী সভাপতি মনোনীত করিয়া যাইবেন, তাঁহারও অমুরূপ ক্ষমতা থাকিবে। প্রাদেশিক ও স্থানীয় কংগ্রেসকমিটিগুলিকেও অমুরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইল।

এইভাবে তথাকথিত 'ডিক্টেটরদের' রাজত্ব চলিল এবং ইহার কংগ্রেসের পক্ষ হইতে আন্দোলন পরিচালন করিতে লাগিলেন। ভারত সচিব, বড়লাট ও গভর্নরগণ দুই হাত উর্দ্ধে তুলিয়া শঙ্কিত তারস্বরে ঘোষণা করিতে লাগিলেন, কংগ্রেসের কি ভয়ঙ্কর ও শোচনীয় অধঃপতন হইয়াছে, ইহা ডিক্টেটরিজে বিশ্বাস করে! অথচ তাঁহার নিজেরাও ডিক্টেটরীর অমুরক্ত ভক্ত। এমন কি, ভারতের মডারেট সংবাদপত্র-গুলিও আমাদিগকে গণতন্ত্রের তত্বকথা শুনাইতে লাগিলেন। আমরা নীরবে (কেন না কারাগারে) বিশ্বাসের সহিত ঐ সকল উপদেশ শুনিতে লাগিলাম। নিম্নলিখিত ভণ্ডামীর চূড়ান্ত নিদর্শন! সমস্ত প্রকার ব্যক্তি-স্বাধীনতা দমন করিয়া অর্ডিন্যান্সীয় আইন দ্বারা ডিক্টেটরী নীতিতে বলপূর্ব্বক ভারতবর্ষকে শাসন করা হইতেছে অথচ আমাদের শাসকবর্গই মোলায়েম সুরে গণতন্ত্রের দোহাই দিতেছেন! এমন কি, সাধারণ অবস্থাতেই ভারতে গণতন্ত্রের ছায়া কোথায়? ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষে প্রভুত্ব ও কায়েমী স্বার্থ রক্ষা করা এবং তাঁহাদের প্রভুত্ব সম্পর্কে যাহারা প্রশ্ন করে, তাহাদের দমন করা স্বাভাবিক, কিন্তু এই সকল ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক উপায় বলিয়া তাঁহারা যে দাবী করেন, তাহা ভবিষ্যৎদংশধরদের চিন্তা ও প্রশংসার জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা কর্তব্য।

এমন অবস্থা শীঘ্রই আসিবে, যখন কংগ্রেসের পক্ষে স্বাভাবিক ভাবে কার্য্য করা সম্ভবপর হইবে না। ইহাকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করা হইবে; কোন পরামর্শ বা কার্য্যের জন্য কমিটির গোপনে ব্যতীত মিলিত হওয়া অসম্ভব হইবে। আমরা গোপনতার পক্ষপাতী ছিলাম না। আমরা জনসাধারণের উপর প্রভাব প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য প্রকাশ্য সংঘর্ষই স্থির করিয়াছিলাম। গোপন উপায়ে বেশী দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর

আইন অমাত্তের সূচনা

ছিল না। কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের, প্রাদেশিক ও জিলা কংগ্রেসের প্রধান প্রধান নর-নারীরা অনতিবিলম্বেই গ্রেফতার হইবেন ইহা নিশ্চিত। তখন সংঘর্ষ পরিচালন করিবে কাহার? আমাদের সম্মুখে একটি পথ খোলা ছিল। যুদ্ধরত সৈন্তদলের কেহ অক্ষম বা আহত হইলে যেমন নূতন লোক তাহাদের স্থান পূরণ কবে; আমাদেরও সেই রকম ব্যবস্থা করিতে হইবে, যুদ্ধক্ষেত্রে বসিয়া আমরা কমিটির সভা করিতে পারি না। ঐরূপ করিয়াও দেখিয়াছি, তাহার উদ্দেশ্য ও ফল এই দাঁড়ায় যে, সকলে মিলিয়া গ্রেফতার হইতে হয়। সৈন্তদলের পশ্চাত্তাগে নিরাপদ স্থানে বসিয়া সামরিক কর্তারা অথবা ততোধিক নিরাপদ স্থানে অসামরিক মন্ত্রিমণ্ডল বসিয়া পরামর্শ ও পরিচালনা করিতেছেন, আমাদের এ সুবিধাও ছিল না। আমাদের যুদ্ধের নীতি অনুসারে সেনাপতি ও সচিবমণ্ডলীই থাকেন পুরোভাগে এবং যুদ্ধের প্রারম্ভে তাঁহারা ই সর্বাগ্রে গ্রেফতার হন। এক্ষেত্রে আমরা ‘ডিক্টেটর’দের কতখানি ক্ষমতা দিয়াছিলাম? তাঁহার সংগ্রাম পরিচালনায় জাতীয় দুটসকলের প্রতীকরূপে পরিণত হইবার সম্মান লাভ করিতেন। কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহাদের ডিক্টেটরী ক্ষমতা নিজেদের কারাগারে প্রেরণ করিবার ক্ষমতাতেই পর্য্যবসিত ছিল। যেখানে বহিঃশক্তির প্রভাবে কমিটির সভা অসম্ভব হইত, সেইখানেই কমিটির প্রতিনিধিরূপে ‘ডিক্টেটর’ কার্য্য করিতেন; কিন্তু যখন যেখানে কমিটির অধিবেশন সম্ভবপর হইত, সেখানে ডিক্টেটরের কোন কর্তৃত্ব থাকিত না। তাঁহাদের মূলনীতি বা সমগ্রায় হস্তক্ষেপ করিবার কোন ক্ষমতা ছিল না; আন্দোলন পরিচালনের ছোটখাট ব্যাপারগুলিই ‘ডিক্টেটরেরা’ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিতেন। কংগ্রেসের ‘ডিক্টেটরশিপ’ কার্য্যতঃ কারাগারে যাইবার সোপান মাত্র ছিল; এবং দিনের পর দিন এই ভাবে একজনের স্থান অপরে গ্রহণ করিত।

অতএব এইভাবে ব্যবস্থা করিয়া আমরা আহাঙ্গদাবাদে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির সহকর্মীদের নিকট বিদায় লইলাম। কে জানে, কবে কোথায় কাহার সহিত কি ভাবে দেখা হইবে, হয়ত বা আমরা আর একত্র মিলিবই না। আমরা তাড়াতাড়ি নিজ নিজ স্থানে ফিরিয়া আসিয়া নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির নির্দেশানুযায়ী স্থানীয় ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম এবং সরোজিনী নাইডুর ভাষায় জেলে যাইবার জগ্গ দাঁতন হাতে করিয়া বসিয়া রহিলাম।

ফিরিবার পথে আমি ও পিতা গান্ধিজীর সহিত দেখা করিলাম। জাম্বুসারে তিনি ও তাঁহার দলবলের সহিত আমরা কয়েক ঘণ্টা ছিলাম।

জওহরলাল নেহরু

তিনি লবণসমুদ্র লক্ষ্য করিয়া তাঁহার পরবর্তী গন্তব্যস্থলে যাত্রা করিলেন। এবারের মত তাঁহার সহিত এই শেষ দেখা! যষ্টিহস্তে সকলের পুরোভাগে তিনি দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছেন—তাঁহার মুখমণ্ডল নির্ভীক প্রশান্ত। কি মহিমময় দৃশ্য!

জাম্বুসারে গান্ধিজীর সহিত পরামর্শ করিয়া আমার পিতা স্থির করিলেন তাঁহার এলাহাবাদের ভবন দেশের নামে উৎসর্গ করিবেন এবং উহার নূতন নাম রাখিবেন স্বরাজ ভবন। এলাহাবাদে ফিরিয়া আসিয়াই তিনি এই সঙ্কল্প ঘোষণা করিলেন এবং কংগ্রেস কর্মীদের হাতে উহা অর্পণ করিলেন। এই বৃহৎ ভবনের একাংশে হাসপাতাল স্থাপিত হইল। তখন তিনি আইনতঃ এই কার্য্য করিয়া যাইতে পারেন নাই, দেড়বৎসর পরে আমি তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী উপযুক্ত দলিল সম্পাদন করিয়া অছিদের হাতে উহা অর্পণ করিয়াছি।

এপ্রিল আসিল, গান্ধিজী ক্রমশঃ সমুদ্রের নিকটবর্তী হইতেছেন, আমরা লবণ আইন ভাঙ্গিয়া আইন অমান্যের জ্ঞান আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছি। এই কয়মাস আমাদের স্বেচ্ছাসেবকেরা কুচকাওয়াজ করিতেছিল এবং কমলা ও কৃষ্ণা (আমার স্ত্রী ও ভগ্নী) এজ্ঞা পুরুষের পোষাক পরিয়া ইহাদের দলে যোগ দিয়াছিল। স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে কোনও অস্ত্র, এমন কি কোন লাঠিও ছিল না। যাহাতে তাহারা অধিকতর কার্য্যকুশল হয় এবং বৃহৎ জনতা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, শিক্ষাদানের তাহাই উদ্দেশ্য ছিল। ৬ই এপ্রিল জাতীয় সপ্তাহের প্রথম দিবস, সত্যাগ্রহ হইতে জালিয়ানওয়ালাবাগ—১৯১২-এর সেই স্মৃতি স্মরণ করিয়া বাৎসরিক অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। গান্ধিজী ঐ দিবস ডাঙির বেলাভূমিতে লবণ আইন ভঙ্গ করিলেন। তিন-চারি দিন পরে সমস্ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্ব স্ব এলাকায় ঐরূপ করিবার নির্দেশ দিয়া আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিতে বলা হইল।

মনে হইল যেন বীধ ভাঙ্গিয়া অকস্মাৎ বন্যার জল আসিয়াছে। দেশের সর্বত্র, প্রতি পল্লী-নগরীতে লবণ তৈয়ারীর কথা আলোচিত হইতে লাগিল, এবং লবণ তৈয়ারীর নানারূপ অদ্ভুত উপায় আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। আমরা এ বিষয়ে অল্পই জানিতাম, পুঁথিপত্র খুঁজিয়া কিছু আবিষ্কার করা গেল। লবণ তৈয়ারীর নিয়ম ছাপাইয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করা হইল। আমরা হাঁড়ি কড়াই সংগ্রহ করিয়া অনেক কষ্টে লবণের মত একরকম পদার্থ তৈয়ারী করিলাম। তাহাতেই কত আনন্দ! এবং উহাই উচ্চ মূল্যে ফেরী করিয়া বিক্রয় হইতে লাগিল। লবণ ভাল হউক মন্দ হউক, কিছু

আইন আমাদের সূচনা

যায় আসে না, নিশ্চিন্ত লবণ আইন ভঙ্গ করাই প্রধান কথা। আমাদের লবণ খারাপ হইলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল। লবণ তৈয়ারী দাবানলের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, জনসাধারণের উৎসাহে অন্ত রহিল না। গান্ধিজী যখন প্রথম এই প্রস্তাব করেন, তখন তাঁহার কার্যকারিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলাম বলিয়া লজ্জা ও কুষ্ঠা অনুভব করিলাম। এই মনুষ্যটির জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া শৃঙ্খলিতভাবে কার্যে নিয়োগ করিবার কি আশ্চর্য্য শক্তি, আমরা বিস্মিত হইয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। ১৪ই এপ্রিল আমি গ্রেফতার হইলাম। মধ্যপ্রদেশের রামপুরে একটি সম্মেলনে বোগদিবার জন্ত ঐ দিবস আমি যাত্রা করিয়াছিলাম। ঐ দিনই কারাগারের মধ্যে আমার বিচার হইল, লবণ আইন ভঙ্গ করা জন্ত আমি ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলাম। গ্রেফতারের কথা পূর্বে হইতেই অনুমান করিয়া আমি (নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রদত্ত ক্ষমতামুসারে) গান্ধিজীকে আমার অস্থগতিস্থিতকালে কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত করিয়াছিলাম। তিনি প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, এই আশঙ্কায় পিতাকে দ্বিতীয় স্থানে মনোনীত করিয়াছিলাম। আমার প্রত্যাশাই সত্য হইল, গান্ধিজী অস্বীকার করায় পিতাই কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি হইলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, তথাপি প্রথম কয়মাস তিনি অসীম উৎসাহে কাধ্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃঢ় নির্দেশ এবং শৃঙ্খলা রক্ষার সাবধানতার ফলে আন্দোলন বহুল পরিমাণে উপকৃত হইল। আন্দোলনের লাভ হইল বটে; কিন্তু তাঁহার অবশিষ্ট শারীরিক শক্তি ও স্বাস্থ্য একেবারে নিঃশেষিত হইয়া গেল।

প্রতিদিন কি উৎসাহ কি উত্তেজনা, কত রোমাঞ্চকর সংবাদ—মিছিল ও যষ্টি প্রহার, গুলীবর্ষণ, বিখ্যাত নেতাদের গ্রেফতারে হরতাল, তাহার উপর পেশোয়ার দিবস, গাড়োয়ালী দিবস প্রভৃতি অনুষ্ঠান! সাময়িকভাবে বিদেশীবস্ত্র ও সর্ববিধ ব্রিটিশ পণ্য বর্জন সম্পূর্ণরূপে সাফল্য লাভ করিল। যখন আমি সংবাদ পাইলাম যে, আমার বৃদ্ধা জননী ও আমার ভগ্নিগণ প্রতাপ্ত গ্রীষ্ম মধ্যাহ্নে বিদেশী বস্ত্রের দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পিকেটিং করিতেছেন, তখন আমি বিচলিত হইলাম। কমলাও ইহা করিয়াছেন; কিন্তু তিনি আরও অধিক কিছু করিয়াছেন। তিনি এলাহাবাদ সহর ও জিলার আন্দোলনের মধ্যে কাঁপাইয়া পড়িলেন, তাঁহার শক্তি ও দৃঢ়তা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। তাঁহার সহিত আমার দীর্ঘকালের পরিচয়েও ইহা বুঝিতে পারি নাই। তিনি নিজের রোগের কথা ভুলিলেন, আকাশের রৌদ্র মাথায় করিয়া উদয়াস্ত ছুটাছুটি করিতেন এবং কণ্ঠনিয়ন্ত্রণ

জওহরলাল নেহরু

করিবার আশ্চর্য্য শক্তি দেখাইয়াছিলেন। জেলে এই সকল কথা আমার কানে আসিত। পরে পিতা যখন কারাগারে আমার সহিত মিলিত হইলেন তখন তাঁহার নিকট সব কথা শুনিলাম। তিনি কমলার কাজকর্ম, বিশেষভাবে সম্মানিয়ন্ত্রণকৌশলের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। কিন্তু তিনি আমার মাতা ও অগ্নাশ্র মেয়েদের রোদ্রে ছুটাছুটি করা পছন্দ করিতেন না। তবে সাময়িক ধমক দেওয়া ছাড়া তিনি বড় একটা বাধা দেন নাই।

সকলের চেয়ে বড় সংবাদ ২৩শে এপ্রিলের পেশোয়ারের এবং পরে সমস্ত সীমান্ত প্রদেশের ঘটনাবলী। ভারতের অগ্নি যে কোনও স্থানে ঘর্ষশিনগানের গুলীবর্ষণের সম্মুখে হুশ্রুঙ্খল এবং শাস্তিপূর্ণ সাহসিকতার দৃষ্টান্তে সমগ্র দেশে এইরূপ উত্তেজনার সঞ্চার হইত। সীমান্ত প্রদেশে এই ঘটনার আরও একটা বিশেষ দিক আছে। পাঠানদের সাহসী বলিয়া খ্যাতি আছে বটে; কিন্তু তাহারা শাস্ত ও নিরীহ বলিয়া খ্যাতি নাই। এই পাঠানেরাই ভারতবর্ষের সম্মুখে এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করিল। এবং এই সীমান্ত প্রদেশেই সেই ইতিহাস-স্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়াছে যাহাতে গাড়োয়ালী সৈনিকেরা নিরস্ত্র জনতার উপর গুলীবর্ষণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিল। সৈনিকেরা সাধারণতঃ নিরস্ত্র জনতার উপর গুলীবর্ষণ করিতে ঘৃণা বোধ করে, এবং নিঃসন্দেহে জনতার প্রতি সহানুভূতিবশতঃই তাহারা উহা অস্বীকার করিয়াছিল। সৈনিকের পক্ষে তাহার উদ্ধতন কর্মচারীর আদেশ পালনে অস্বীকৃতি কেবলমাত্র সহানুভূতির জন্মই সাধারণতঃ সম্ভব নহে, ভাবী পরিণাম কি সে তাহা উত্তমরূপেই জানে। সম্ভবতঃ ব্রিটিশ-শক্তি অবসানপ্রায়, এই ভ্রান্ত ধারণা হইতেই গাড়োয়ালীরা (অগ্নাশ্র স্থলেও আরও কয়েকটি সৈন্যদল এইরূপ অবাধ্যতা করিয়াছিল, কিন্তু সে খবর রটে নাই) এরূপ করিয়াছিল। অনুরূপ ধারণা মনে বদ্ধমূল হইলেই সৈনিকেরা নিজেদের সহানুভূতি ও অভিপ্রায় অনুযায়ী কার্য্য করিতে সাহসী হয়।

সম্ভবতঃ, কয়েকদিন অথবা সপ্তাহ ধরিয়া জনসাধারণের মধ্যে বিহ্বল উত্তেজনা এবং আইন অমান্য আন্দোলনের ফলে কতকগুলি ব্যক্তি মনে করিতেছিল যে, ব্রিটিশ শাসনের শেষ দিন সমাগত এবং ভারতীয় সৈন্যদলের একাংশের উপর ইহার প্রভাব বিসর্পিত হইয়াছিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই যখন বুঝা গেল, অদূরভবিষ্যতে এরূপ কোন ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, তখন সৈন্যদলে আর অবাধ্যতা দেখা যায় নাই। সৈন্যদল যাহাতে এরূপ অবস্থার মধ্যে গিয়া না পড়ে, তৎক্ষণ সাবধানতাও অবলম্বন করা হইয়াছিল।

আইন অমাত্যের সূচনা

এইকালে যে সকল আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার মধ্যে নারীদের দলে দলে জাতীয় সংঘর্ষে যোগদান এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাঁহারা দলে দলে অস্ত্রপুর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন; বাহিরের কাজে অনভ্যস্ত হইলেও তাঁহারা মহোৎসাহে কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। বিদেশী বস্ত্র ও আবগারী দোকানে পিকেটিং করা তাঁহারা একচেটিয়া করিয়া লইলেন। প্রত্যেক সহরে দলে দলে নারী মিছিল করিতে লাগিলেন এবং সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা নারীরা অধিক দৃঢ়তা প্রদর্শন করিতেন। অনেক মহিলা প্রাদেশিক ও স্থানীয় কংগ্রেসের ‘ডিক্টেটর’ হইয়াছিলেন।

লবণ আইন ভঙ্গের সহিত নিরুপদ্রব প্রতিরোধ অত্যন্ত ক্ষেত্রেও প্রসারিত হইল। বড়লাট কতকগুলি নিষেধাত্মক অর্ডিগ্যান্স জারী করিয়া ইহার সুরোধা করিয়া দিলেন। অর্ডিগ্যান্স ও নিষেধের সংখ্যা যত বাড়িতে লাগিল, ঐগুলি অমাত্য করিবার স্ত্রযোগও ততই বাড়িল। যে সমস্ত কাজ বন্ধ করিবার জন্ত অর্ডিগ্যান্স, সেইগুলি করাই নিরুপদ্রব প্রতিরোধের লক্ষ্য হইয়া উঠিল। কংগ্রেস ও জনসাধারণই আগু বাড়িয়া কাজ করিতে লাগিল, এবং গভর্ণমেন্ট যখন দেখিলেন, অর্ডিগ্যান্স কার্যকরী হইতেছে না, তখন নূতন অর্ডিগ্যান্স জারী করিতে লাগিলেন। কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির বহু সদস্য বন্দী হইলেন; কিন্তু নূতন সদস্যরা কাজ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। প্রত্যেক নূতন অর্ডিগ্যান্স জারীর সঙ্গে সঙ্গে কার্যকরী সমিতিও কি ভাবে উহার সম্মুখীন হইতে হইবে সে সম্বন্ধে নির্দেশ দিতেন। একমাত্র সংবাদপত্র ব্যতীত, এই সকল নির্দেশ অতি আশ্চর্য্য একোর সহিত সমগ্র দেশে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইত।

যখন সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের জন্ত জামীনের টাকা দাবী করিয়া অর্ডিগ্যান্স জারী হইল, তখন কার্যকরী সমিতি জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলিকে জামীনের টাকা না দিয়া প্রচার বন্ধ করিতে নির্দেশ দিলেন। সংবাদপত্র পরিচালকদের পক্ষে এই নির্দেশ পালন করা অতি কঠিন হইয়া উঠিল, কেন না তখন দেশবাসী সংবাদ জানিবার জন্ত অধিকতর ব্যাকুল। কতকগুলি মডারেট কাগজ ছাড়া অধিকাংশ কাগজ বন্ধ হইল; ফলে নানা প্রকার গুজব দেশে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু এভাবে বেশী দিন চলিল না, মডারেট কাগজগুলি এই স্লযোগে দাঁও মারিয়া লইতেছে দেখিয়া তাঁহারা বিরক্ত হইলেন। ফলে পুনরায় জাতীয়তাবাদী কাগজগুলি আত্মপ্রকাশ করিল।

এই মে গান্ধিজী গ্রেফতার হইলেন। পশ্চিম উপকূলে অধিকতর উৎসাহের সহিত লবণগোলা আক্রমণ ও লবণ সংগ্রহের কাজ চলিতে

জওহরলাল নেহরু

লাগিল। লবণ আইন অমান্যকারীদের উপর এইকালে পুলিশ-বর্ষরতার কতকগুলি বেদনাবহ ঘটনা ঘটিয়াছিল। বোম্বাই আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি হইয়া উঠিল এবং বড় বড় হরতাল, মিছিল এবং লাঠিচালনা চলিতে লাগিল। লাঠির আঘাতে আহতদের চিকিৎসার জন্ত কয়েকটি হাসপাতাল স্থাপিত হইল। বোম্বাই বৃহৎ সহর বলিয়া এখানের ঘটনাগুলি বহুল প্রচারলাভ করিয়াছিল। ছোটখাট সহর এবং পল্লীঅঞ্চলের ঘটনাগুলি মোটেই প্রচারিত হয় নাই।

জুন মাসের শেষভাগে পিতা আমার মাতা ও কমলাকে লইয়া বোম্বাই-এ গিয়াছিলেন। তাঁহারা বিপুলভাবে সম্বন্ধিত হন; তাঁহাদের অবস্থিতিকালে কয়েকবার প্রচণ্ড লাঠিচালনা হইয়াছিল। অবশ্য বোম্বাই-এ ইহা সচরাচর ঘটনা হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার পনের দিন পর, পুলিশ পথরোধ করায় বিশাল জনতাসহ কাণ্যকরী সমিতির সদস্যগণ এবং মালব্যাজী সমস্ত রাত্রি পুলিশের সম্মুখে পথে বসিয়া ছিলেন।

বোম্বাই হইতে ফিরিবার পর ৩০শে জুন পিতা বন্দী হইলেন; তাঁহার সহিত সৈয়দ মামুদকেও গ্রেফতার করা হইল। তাঁহারা বে-আইনীঘোষিত কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি ও সম্পাদকরূপে গ্রেফতার হইলেন। তাঁহাদের ছয় মাস কারাদণ্ড হইল। জনতার উপর গুলী চালাইবার আদেশ পাইলে পুলিশ বা সৈনিকের কর্তব্য কি, সে সম্বন্ধে এক বিবৃতি প্রচার করাই সম্ভবতঃ পিতার গ্রেফতারের কারণ। এই বিবৃতি ভারতে ব্রিটিশ আইন মোতাবেক সম্পূর্ণ বৈধভাবেই রচিত হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি উহা বিপজ্জনক ও আপত্তিকর বিবেচিত হইয়াছিল।

বোম্বাই-এ পিতাকে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। সকাল হইতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত তিনি কামরত থাকিতেন; প্রত্যেক জরুরী সিদ্ধান্তে তাঁহাকেই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইত। তাঁহার শরীর পূর্ব হইতেই অসুস্থ ছিল, অধিকতর অবসাদ লইয়া ফিরিয়া আসিয়া তিনি চিকিৎসকগণের পরামর্শে পূর্ণ বিশ্রামলাভের জন্ত মুসোরী যাত্রার আয়োজন করিয়াছিলেন। কিন্তু যাত্রার পূর্ব দিন তিনি মুসোরীর পরিবর্তে, নৈনী সেন্দ্রাল জেলে আমাদের ব্যারাকে উপনীত হইলেন।

নৈনী জেলে

সাত বৎসর পর আমি পুনরায় কারাগারে ফিরিয়া আসিলাম; কারাজীবনের পূর্বস্মৃতি অনেকাংশে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। এ প্রদেশে নৈনী সেন্ট্রাল জেল অত্যন্ত বৃহৎ কারাগার। এখানে আমি নিঃসঙ্গ কারাবাসের এক অভিনব অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম। জেলের বৃহৎ প্রাচীরের মধ্যে একশত হইতে ২৩০০ শত কয়েদী হইতে আমাকে পৃথক করিয়া এক ক্ষুদ্র স্থানে রাখা হইল। পনর ফিট উঁচু বৃত্তাকারে ঘেরা স্থান—পরিধি প্রায় একশত ফিট হইবে। ইহার মধ্যস্থলে এক বিবর্ণ, কুংসিত, চারিটি সেল-ওয়ারা দালান। আমাকে পাশাপাশি দুইটি সেল দেওয়া হইল—একটি বাসের, অপরটি স্নানাগাররূপে ব্যবহার করিবার জন্ত। অপর দুইটি সেল কিছুকাল খালি ছিল।

বাহিরের কর্মব্যবস্থা ও উত্তেজনার পর এখানে আসিয়া আমি নিঃসঙ্গ ও অবসন্ন বোধ করিতে লাগিলাম। আমি পরিশ্রান্ত ছিলাম, প্রথম দুই-তিন দিন খুব নিদ্রা গেলাম। তখন গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হইয়াছে, আমি বাহিরে শয়ন করিবার অনুমতি পাইলাম—সেলের বাহিরে প্রাচীর ও দালানের মধ্যবর্তী সঙ্কীর্ণ স্থানে শয়নের ব্যবস্থা হইল। আমার খাটখানি শক্ত করিয়া শিকল দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইল, কি জানি আমি যদি উহা লইয়া পলাইয়া যাই অথবা যাহাতে আমি দেওয়াল টপকাইবার মই হিসাবে উহা ব্যবহার করিতে না পারি সেইজন্তই এই সাবধানতা অবলম্বিত হইয়াছিল! সারারাত্রি নানাবিধ চীংকার চলিত। যাহারা প্রধান প্রাচীর পাহারা দিত, সেই সকল কয়েদী পাহারাদারেরা পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া সাক্ষেতিক চীংকার করিত, তাহাদের তীব্র প্লুতবর দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া দূরগত বায়ুর মর্ম্মরধ্বনির মত বোধ হইত। ব্যারাকে কয়েদী-মেট্রা, তাহাদের জিহ্বায় নির্দিষ্ট কয়েদীদের চীংকার করিয়া অবিরত গণনা করিত এবং মাঝে মাঝে উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিত, সব ঠিক আছে। জেলকর্ম্মচারীরাও রাত্রে কয়েকবার করিয়া ঘুরিতেন, আমার ব্যারাকেও আসিতেন এবং ওয়ার্ডারদের সহিত উচ্চৈঃস্বরে সংবাদ আদান-প্রদান করিতেন। অগ্ন্যান্ত স্থান হইতে আমার সেল দূরে ছিল

জওহরলাল নেহরু

বলিয়া এই সকল স্বর অস্পষ্টভাবে শুনিতাম এবং প্রথম প্রথম উহার অর্থ বুঝিতাম না। কখনও কখনও মনে হইত, যেন আমি কোন অরণ্যের পার্শ্বে রহিয়াছি এবং কুমকেরা চীৎকার করিয়া শব্দক্ষেত্র হইতে বহুপশু তাড়াইতেছে অথবা আমি যেন অরণ্যের মধ্যে রহিয়াছি এবং বহু জন্তুরা সকলে মিলিয়া তাহাদের নৈশ ঐক্যতান জুড়িয়া দিয়াছে।

চতুষ্কোণ অপেক্ষা বৃত্তাকার আবেষ্টনীর মধ্যেই বন্দীজীবন অধিকতর দুর্ব্বল—ইহা আমার কল্পনা না সত্য ঘটনা—আমি বিস্মিত হইয়া ভাবি। প্রাচীর কোণের ও অবকাশের অভাব নিরানন্দ আরও বাড়াইয়া তোলে। দিবাভাগে প্রাচীর আকাশকে অন্তরাল করিয়া রাখে,—অতি সঙ্গীর্ণ ক্ষুদ্র অংশ দৃষ্টিগোচর হয়। তৃষিত দৃষ্টি মেলিয়া আমি দেখি,—‘অতি ক্ষুদ্র নীল বস্ত্রাবাস, বন্দীরা যাহাকে আকাশ বলে,—তাহার মধ্যে রূপালী পাল তুলিয়া মেঘখণ্ডগুলি ভাসিয়া যাইতেছে।’ রাত্রে এই প্রাচীর আমাকে আরও ঘিরিয়া ফেলে, মনে হয় যেন আমি এক কূপের তলদেশে বসিয়া আছি। এখান হইতে তারকাখচিত আকাশের যে অংশ আমি দেখি তাহা আমার নিকট আর বাস্তব থাকে না। গ্রহতারকার কৃত্রিম মানচিত্রের অংশ বলিয়া মনে হয়।

আমার ব্যারাক ও আবেষ্টনীকে জেলের লোকেরা বলিত কুস্তাঘর। ইহা পুরাতন নাম, আমার সহিত ইহার কোন সংশ্রব নাই। ভয়ঙ্কর চরিত্রের আসামীদের স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবার জগুই ইহা বিশেষভাবে নিশ্চিত হইয়াছিল। পরে ইহা রাজনৈতিক বন্দী, অন্তরীণদিগকে জেলখানায় স্বতন্ত্রভাবে রাখিবার জগু ব্যবহৃত হইতেছে। প্রাচীরের সম্মুখে কিছু দূরে গম্বুজের মত একটা ইমারৎ দেখিয়া আমি প্রথমে বিরক্ত হইয়াছিলাম। জিনিষটা দেখিতে একটা বৃহৎ খাচার মত এবং তাহার মধ্যে কতকগুলি মানুষ অবিরত চক্রাকারে ঘুরিতেছে। পরে বুঝিতে পারিলাম যে, উহা জল তুলিবার পাম্প, এক এক সঙ্গে ঘোল জন করিয়া লোক লাগাইয়া জল তোলা হয়। মানুষের যেমন সবই অভ্যাস হইয়া যায়, আমিও তেমনই ইহাতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিলাম। তথাপি সন্দেহাই আমার মনে হইত, মানুষের শ্রমশক্তিকে এ ভাবে কাজে লাগান নির্বুদ্ধিতা ও বর্ব্বরতা মাত্র। উহার দিকে তাকাইলেই আমার চিড়িয়াখানার কথা মনে পড়িত।

কিছুদিন আমাকে আবেষ্টনীর বাহিরে ব্যায়ামের জগু বা অগু কোনও কারণে যাইতে দেওয়া হইত না। পরে অতি প্রত্যাষে অঙ্ককার থাকিতে আমাকে আধ ঘণ্টার জগু বাহিরে মূল প্রাচীরের নিকট হাঁটিতে বা দৌড়াইতে দেওয়া হইত। এই ব্যবস্থার কারণ যে অগু অগু কয়েদীরা যেন আমাকে

নৈনী জেলে

দেখিতে না পায় বা আমার সংস্পর্শে না আসে। বাহিরের খোলা হাওয়ায় ব্যায়াম করিবার এই সামান্য সময়টুকু আমি যথাসম্ভব সদ্যবহার করিতাম। আমি দৌড়াইতাম এবং ক্রমশঃ পাল্লাবৃদ্ধি করিয়া দুই মাইলের উপর দৌড়াইতাম।

আমি প্রভাতে চারিটা, এমন কি সাড়ে তিনটার সময় শয্যা ত্যাগ করিতাম। তখনও বেশ অন্ধকার থাকিত। আমাকে যে আলো দেওয়া হইত তাহা পাঠ করিবার জন্য পর্যাপ্ত নয় বলিয়া সকাল সকাল শুইয়া পড়িতাম। শেষরাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। তারা দেখিতে আমার ভাল লাগিত, পরিচিত কোনও তারকামণ্ডলের অবস্থিতি দেখিয়া আমি মোটামুটি সময় ঠিক করিতাম। আমার শয্যা হইতে আমি প্রাচীরের উপরে সর্বদাই ধ্রুবতারা দেখিতে পারিতাম—ইহা দেখিলেই আমার মন জুড়াইত। গতিশীল তারকামণ্ডলীর মধ্যে ধ্রুবনক্ষত্রটি মনে হইত যেন আনন্দের চিরস্থির অগ্নান প্রতীক।

এক মাস আমার কেহ সঙ্গী ছিল না। তবে আমাকে একাকী থাকিতে হইত না। ওয়ার্ডার ছিল, কয়েদী-ওভারশিয়ার ছিল, এবং আমার রান্না এবং অন্যান্য কাজের জন্য একজন কয়েদীও ছিল। দীর্ঘ কারাদণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদী-মেট্রা মাঝে মাঝে কাজকর্ম উপলক্ষে যাতায়াত করিত। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ‘লাইকার’ জেলে বহু ছিল। সাধারণতঃ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বলিতে বিশ বৎসর বা তাহার কম সময় বুঝায়। কিন্তু এই জেলে এমন অনেককে দেখিলাম, যাহারা বিশ বৎসরেরও অধিক কাল রহিয়াছে। নৈনীতে আমি একটি স্মরণীয় ব্যাপার দেখিয়াছিলাম। প্রত্যেক কয়েদীর কাঁধের কাছে কাপড়ের সহিত আটকানো একখানি ছোট কাঠের চাকুতি থাকে, তাহার মধ্যে তাহাদের নম্বর, কারাদণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, এবং মুক্তির তারিখ লেখা থাকে। একজন কয়েদীর কাঠের চাকুতিতে আমি দেখিলাম, মুক্তির তারিখ ১৯৯৬ সাল! ১৯৩০ সালেই কয়েক বৎসর তাহার জেলখাটা শেষ হইয়াছে, লোকটি মধ্যবয়সী। সম্ভবতঃ তাহার বিরুদ্ধে কতকগুলি কারাদণ্ডের বিধান হইয়াছে এবং সেইগুলি পর পর যোগ দিয়া ৭৫ বৎসর হইয়াছে।

এই ‘লাইকারেরা’ বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া শিশু, নারী, এমন কি, পশুপ্রাণীরও মুখ দেখিতে পায় না। বহির্জগতের সহিত তাহাদের যোগ ছিন্ন হইয়া যায় এবং মাহুষের সঙ্গ পায় না। তাহারা বসিয়া বসিয়া ভাবে; ভয়, প্রতিহিংসা ও ঘৃণাসম্ভ্রাত ক্রুদ্ধ চিন্তারানি তাহাদের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে—জগতে যে ভাল আছে, দয়া আছে, আনন্দ আছে, ইহা তাহারা

ভুলিয়া যায়। কেবলমাত্র মন্দের মধ্যে তাহারা বাস করে। ক্রমে তাহাদের ঘৃণার উগ্রতাও কমিয়া আসে, এবং জীবন ক্রমে প্রাণহীন যন্ত্রবৎ নিয়মাত্মবৃত্তিতায় পরিণত হয়। পরচালিত গতিতে তাহাদের দিন অতিবাহিত হয়। একজনের সহিত অপরের কোনও পার্থক্য থাকে না এবং একমাত্র ভয় ছাড়া তাহাদের আর কোন অমুভূতি থাকে না। নির্দিষ্ট সময়ে কয়েদীদের দেহ মাপা হয়, ওজন করা হয়, কিন্তু মন ও আত্মাকে ত ওজন করা যায় না। তাহা অবরুদ্ধ আবেগের মধ্যে নিখাতনের নিষ্ঠুর পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে ক্রমে জীর্ণ হইয়া যায়। লোকে মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়া থাকে, তাহাদের যুক্তিগুলি শুনিতে আমার ভালও লাগে। কিন্তু কারাগারে যখন দেখি, দীর্ঘকাল মানুষ একই বেদনা বহন করিতেছে, তখন আমার মনে হয় যে, মানুষকে এরূপ অল্পে অল্পে হত্যা করা অপেক্ষা মৃত্যুদণ্ড অনেক ভাল। একদিন একজন ‘লাইফার’ আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ‘আমাদের কি হইবে? স্বরাজ হইলে কি আমরা এই নরকের বাহিরে যাইতে পারিব?’

এই ‘লাইফার’ কাহারা? ইহারা অধিকাংশই ডাকাতি মামলার আসামী; পঞ্চাশ হইতে একশ জন একসঙ্গে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ অপরাধী হইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশই অপরাধী কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। এই শ্রেণীর মামলায় লোককে জড়াইয়া ফেলা অতি সহজ। একজন রাজসাক্ষীর (এপ্রভার) সাক্ষ্য এবং একটু সনাক্তকরণই যথেষ্ট। আজকাল ডাকাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে বৎসর বৎসর জেলের লোকসংখ্যাও বাড়িতেছে। লোকে খাইতে না পারিলে কি করিবে? জজ্ এবং ম্যাজিস্ট্রেটেরা অপরাধ বৃদ্ধির কথা রটনা করিতে মুখর হইয়া উঠেন; কিন্তু দৃশ্যমান অর্থনৈতিক কারণগুলি সম্বন্ধে অন্ধ।

তারপর কৃষকেরা আছে। হয় ত জমির অধিকার লইয়া দাঙ্গা করিয়াছে, বেপরোয়া লাঠি চালাইয়াছে, হয় ত কেহ মরিয়াছে এবং তাহার ফলে অনেকের যাবজ্জীবন অথবা দীর্ঘ কারাদণ্ড। এমনও ঘটিয়াছে যে, এক পরিবারের সমস্ত পুরুষকেই খ্রীলোকদিগকে ভাগ্যের হাতে সঁপিয়া দিয়া কারাগারে চলিয়া আসিতে হইয়াছে। ইহাদের একজনও অপরাধপ্রবণ শ্রেণীর মত নহে। এই সকল সুন্দর যুবক সাধারণ গ্রামবাসী অপেক্ষা কি শারীরিক কি মানসিক সকল দিক দিয়াই উন্নত। ইহাদিগকে কিছু শিক্ষা, বিষয়াস্তরে নিয়োগ করিবার চেষ্টা অথবা কোন বৃত্তি শিক্ষা দিলে ইহারা দেশের সম্পদরূপে গণ্য হইতে পারে।

নৈনী জেলে

অবশ্য ভারতীয় কারাগারে অপরাধে অভ্যস্ত, পরপীড়ক, সমাজের শত্রু, ভয়ঙ্কর চরিত্রের কয়েদীও আছে। কিন্তু জেলখানায় আমি দেখিয়া আশ্চর্য্য হই, এমন বহু সংখ্যক বালক, যুবক ও প্রৌঢ় আছে যাহাদিগকে আমি নির্বিচারে বিশ্বাস করিতে পারি। আমি জানি না, আসল অপরাধী এবং এই শ্রেণীর বন্দীর মধ্যে গড়পড়তা হার কত। এবং সম্ভবতঃ কারাবিভাগের কাহারও মনে এরূপ পার্থক্যের কথা উদয় হয় নাই। নিউ ইয়র্কের সিংসিং কারাগারের ওয়ার্ডেন লুইস্, ই, লজ্জ্ এ বিষয়ে অনেক উল্লেখযোগ্য তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মতে তাঁহার জেলখানার জনসংখ্যার শতকরা পঞ্চাশ জনই অপরাধপ্রবণ নহে। শতকরা পঁচিশ জন ঘটনাচক্রে ও অবস্থাবধীনে অপরাধ করিয়াছে। অবশিষ্ট পঁচিশ জনের অন্ততঃ অর্দ্ধেক সংখ্যক নিশ্চিতরূপে সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক। সফলেই জানেন যে, পল্লী অঞ্চল অগেগ্গা আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্র বৃহৎ নগরগুলিতে অপরাধপ্রবণতার প্রাবল্য অধিক। আমেরিকা সজ্জবদ্ধ দস্তাবেজের জন্ত বিখ্যাত। এবং এই শ্রেণীর ভয়ঙ্কর চরিত্র অপরাধীদের আবাসস্থলরূপে সিং সিং জেলও বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। তথাপি এই জেলের ওয়ার্ডেনের মতে মাত্র শতকরা সাড়ে বার জন কয়েদী প্রকৃত প্রস্তাবে মন্দ। আমার মতে ভারতীয় জেলে এই হার আরও কম, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। আরও ভাল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, অধিকতর কর্মপ্রাপ্তির ব্যবস্থা এবং শিক্ষা বিস্তার করিলে আমাদের জেলখানাগুলি শূন্য হইয়া যাইতে পারে। অবশ্য ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আবশ্যক, কিন্তু ইহার পরিবর্তে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট পুলিশের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং জেলখানাগুলির বিস্তার সাধন করিতেছেন। ভারতবর্ষে কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। নিখিল-ভারত-কয়েদী-সাহায্য-সমিতির সম্পাদক অধুনা যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯৩৩ সালে একমাত্র বোম্বাই প্রদেশেই একলক্ষ আটশ হাজার ব্যক্তি কারাগারে গিয়াছিল। ঐ বৎসর বাঙ্গলা দেশে কারাদণ্ডে দণ্ডিতের সংখ্যা একলক্ষ চব্বিশ হাজার।* অগ্গা প্রদেশের সংখ্যা আমি পাই নাই। তবে দুই প্রদেশের কয়েদীর সংখ্যা যদি প্রায় তিন লক্ষ হয়, তাহা হইলে সমগ্র ভারতে সম্ভবতঃ দণ্ডিতের সংখ্যা দশ লক্ষ হইবে। এই সংখ্যার মধ্যে অবশ্য স্থায়ী বাসিন্দাদের হিসাব ধরা হয় নাই। কয়েদীদের একটা বড় অংশ অল্পকালের জন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকে। জেলের স্থায়ী বাসিন্দাদের সংখ্যা তুলনায় কম হইলেও সংখ্যায় বড় কম নহে। ভারতের

* টেটপ্লাম—১১ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪।

কয়েকটি প্রধান প্রদেশে কারা বিভাগ জগতের মধ্যে সর্ববৃহৎ বলিয়া কথিত হয়। হয় ত বা উহাদের মধ্যে যুক্ত প্রদেশও এই সন্দেহজনক সম্মানের অগ্রতম অধিকারী। এবং এই প্রদেশের কারা-শাসনবিভাগ পূর্বের মতই এখনও বহুল পরিমাণে পশ্চাৎপদ ও প্রতিক্রিয়াশীল। কয়েদীকে কখনও মানুষ বলিয়া বিবেচনা করা হয় না। কিম্বা তাহার যে ব্যক্তিগত আছে ইহাও গণনার মধ্যে আনা হয় না; কাজেই তাহার মানসিক উন্নতি বিধানের কোন ব্যবস্থা নাই। কিন্তু যুক্ত-প্রদেশের কারাবিভাগ কয়েদীদিগকে বন্ধ করিয়া রাখিবার ব্যবস্থায় সকলের সেবা। এই কড়াকড়ির মধ্যে অল্পলোকই পলাইতে চেষ্টা করে এবং প্রতি দশ হাজারে এক জন সক্ষম হয় কি না সন্দেহ।

পনের বা তদুর্দ্ধ বয়স্ক বহুতর বালক কয়েদী, জেলের অগ্রতম বিবাদময় দৃশ্য। অধিকাংশই বুদ্ধিমান বালক এবং স্বেযোগ পাইলে ইহারা অনায়াসে ভাল হইতে পারে। অধুনা ইহাদিগকে প্রাথমিক লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে বটে, কিন্তু জেলের অগ্নাগ্র ব্যবস্থার মত ইহাও অত্যন্ত অসম্পূর্ণ এবং নিষ্ফল। ইহারা খেলাধুলার স্বেযোগ খুব কমই পায়, কোন প্রকার সংবাদপত্রও পড়িতে পায় না, বইও পড়িতে দেওয়া হয় না। বার ঘণ্টা বা তাহারও অধিক কাল সমস্ত বন্দীকে তালা দিয়া আটক রাখা হয়—দীর্ঘ অপরাহ্নে এবং এই সময়ে তাহাদের কিছুই করিবার থাকে না।

তিন মাস অন্তর একবার আত্মীয় স্বজনের সহিত দেখা করিতে বা পত্রাদি দেওয়া হয়—এইরূপ দীর্ঘকাল বিলম্ব অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবস্থা। এমন কি, অনেক কয়েদী ইহারও স্বেবিধা হইতে বঞ্চিত হয়। তাহারা যদি নিরক্ষর হয় (অধিকাংশই নিরক্ষর) তাহা হইলে পত্র লিখাইবার জন্য কোন জেল কর্মচারীর উপর নির্ভর করিতে হয়, ইহারা সাধারণতঃ কাজ না বাড়াইবার জন্য কৌশলে ইহা এড়াইয়া থাকে। পত্র লেখা হইলেও ঠিকানা ভাল করিয়া লেখা হয় না বলিয়া অনেক পত্র পৌছায় না। দেখা শুনা করা আরও কঠিন। কোন জেল কর্মচারীকে কিছু দিয়া সম্বলিত না করিতে পারিলে এ স্বেযোগ অনেকের অদৃষ্টেই জোটে না। কয়েদীরা প্রায়ই এক জেল হইতে অগ্র জেলে বদলী হয়, তাহাদের আত্মীয়বর্গ কোন খোঁজ পায় না। আমি এমন অনেক কয়েদীকে জানি, বহু বর্ষ পরিবারবর্গের সহিত তাহাদের যোগসূত্র ছিল হইয়াছে এবং তাহাদের কি হইয়াছে তাহাও জানে না। তিন মাস বা তাহার পর যখন দেখাশুনা হয়,—তাহাও এক আশ্চর্য ব্যাপার। একদল কয়েদী এবং তাহাদের সহিত সাক্ষাৎকারীদের তারের বেড়ার দুই পাশে দাঁড় করান হয় এবং সকলে একসঙ্গে চীৎকার

নৈমী জেলে

করিয়া কথা বলিতে থাকে। এক সঙ্গে এতগুলি লোকের যুগপৎ দেখা করার ব্যবস্থায়—হৃদয়ের আদান প্রদানের সুবিধা থাকে না।

অতি অল্পসংখ্যক কয়েদী (ইউরোপীয়ান ছাড়া হাজার করা একজনের বেশী নহে) ভাল খাওয়া, ঘন ঘন সাক্ষাৎকার বা পত্র লেখার বিশেষ সুবিধা পায়। রাজনৈতিক নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় যখন হাজার হাজার রাজনৈতিক বন্দীতে জেলখানা ভরিয়া যায়, তখন ঐ সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পায়। রাজনৈতিক বন্দীদের কি স্ত্রী কি পুরুষ, শতকরা পঁচানব্বই জনকেই সাধারণ কয়েদীর মত ব্যবহার করা হইয়া থাকে, এবং কোন বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয় না।

বৈপ্লবিক কার্যের অপরাধে যে সকল ব্যক্তি দীর্ঘ কারাদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, তাহাদিগকে দীর্ঘকাল নির্জন কারাগৃহে রাখা হয়। স্বাভাবিক বিশ্বাস, যুক্তপ্রদেশে এই শ্রেণীর বন্দীকে সাধারণতঃই নির্জন 'সেলে' আবদ্ধ রাখা হয়। কিন্তু নিয়মানুযায়ী, কারাবিধি ভঙ্গ করিবার বিশেষ শাস্তিস্বরূপ নির্জন কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল বন্দী, যাহাদের অধিকাংশই তরুণবয়স্ক,—তাহাদিগকেও এভাবে বন্দী থাকিতে হয়; অথচ জেলখানায় তাহাদের আচরণ আদর্শ-স্থানীয় হইতে পারিত। এইরূপে আদালত প্রদত্ত শাস্তির সহিত জেল কর্তৃপক্ষ একান্ত অধোক্তিকভাবে আর এক ভয়াবহ শাস্তি যোগ করিয়া দেন। ইহা আশ্চর্য্য, কোন কারাবিধির সহিত ইহার সামঞ্জস্য নাই। নির্জন কারাবাস, অল্পদিনের জগৎ অত্যন্ত বেদনাজনক ব্যাপার; ইহাকে বৎসরের পর বৎসর চালাইলে তাহা এক দারুণ নিষ্ঠুরতা হইয়া পড়ে, ইহাতে ধীরে ধীরে মানসিক অবনতি হইতে থাকে, ক্রমে পাগল হইবার উপক্রম হয়, মুখে এক নৈরাশ্রময় শূন্যতার ভাব ফুটিয়া উঠে; দৃষ্টি ভীত পশুর মত হয়। ইহা ধাপে ধাপে মানুষের তেজ ও বীৰ্য্যকে হত্যা করা, জীবন্ত জীবদেহে ছুরিকাচালনার গ্রায়ে ইহা আত্মার উপর অবিরত মস্তুর আঘাত। ইহা কাটাইয়া উঠিলেও, মানুষ অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে, সমাজজীবনের সহিত সে আর সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারে না। এই ব্যক্তি কোন কাজ বা অপরাধের জগৎ দায়ী কি না? এ চিরন্তন প্রশ্ন ত আছেই। ভারতে পুলিশের পদ্ধতি সকলেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে; রাজনৈতিক ব্যাপারে উহা আরও অধিক।

ইউরোপীয়ান অথবা ইউরেশিয়ান কয়েদীদের অপরাধ যাহাই হউক এবং সামাজিক মর্যাদা যাহাই হউক, নির্বিচারে সকলেই উচ্চশ্রেণীর কয়েদী হয় এবং ভাল খাওয়া, কম কাজ, অধিকতর ঘন ঘন দেখাশুনা ও

চিঠিপত্র পাইয়া থাকে। সপ্তাহে একবার করিয়া পাত্রীদের সহিত দেখাশুনার কলে তাহারা বাহিরের ঘটনাবলীর সহিত যোগ রাখিতে পারে। পাত্রীরা তাহাদের বিদেশী সচিত্র পত্রিকা বা ব্যঙ্গ কৌতুকের কাগজ আনিয়া দেন এবং প্রয়োজন মত পরিবারবর্গের নিকট সংবাদাদি দিয়া থাকেন।

ইউরোপীয়ান কয়েদীদের বিশেষ সুবিধার জ্ঞাত কেহ তাহাদের ঈর্ষা করে না, কেননা তাহারা সংখ্যায় অতি অল্প। কিন্তু জীপুক্ষণনির্কিঁষে অগ্ন্যাগ্ন বন্দীদের প্রতি ব্যবহারে মানবোচিত মানদণ্ডের অভাব দেখিয়া চিন্তা পীড়িত হয়। কোন কয়েদীকেই ব্যক্তিবিশেষ মানুষ হিসাবে বিবেচনা করা হয় না এবং তাহাদের সহিত সেভাবে ব্যবহারও করা হয় না। রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্রের দুর্ব্বল দমননীতির অমানুষিক দিক কত কদর্যা, তাহা কারাগারে আসিলে দেখা যায়। এই চিন্তাহীন ক্রক্ষেপহীন যন্ত্র অবিরাম গতিতে যাহাকে পাইতেছে, তাহাকেই পিষ্ট করিতেছে—এই যন্ত্রটিকে অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্য লইয়াই কারাবিধিগুলি রচিত। আত্মমর্যাদাজ্ঞান-সম্পন্ন নরনারীরা এই হৃদয়হীন যন্ত্রের রাজত্বের মধ্যে সতত পীড়া ও মনোবেদনা অনুভব করে। আমি দেখিয়াছি, এই নিরানন্দ নিষ্ঠুর ব্যবস্থায় দীর্ঘকাল দণ্ডিত কয়েদী সময় সময় ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং অসহায় ক্ষুদ্র শিশুর মত ক্রন্দন করে। যাহাতে তাহাদের মুখে একটু হাসি, আনন্দ দীপ্তি বা কৃতজ্ঞতার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিতে পারে, এমন সামান্য সহায়ভূতির বাণী, একটু উৎসাহ এই কারাগারে কত দুর্লভ !

তবুও কয়েদীদের নিজেদের মধ্যে দয়া-দাক্ষিণ্য ও বন্ধুত্বের অনেক মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। একবার একজন “পেশাদার” অন্ধ কয়েদী তের বৎসর পর মুক্তিলাভ করে। দীর্ঘকাল পরে সে বাহিরে যাইতেছে, সেই বন্ধুহীন বহির্জগতে তাহার কোন আশ্রয় নাই। তাহার সহ-কয়েদীরা তাহাকে সাহায্য করিবার জ্ঞাত বাস্তব হইল; কিন্তু তাহাদের সাধ্যই কতটুকু! একজন তাহাকে জেল কার্যালয়ে জমা দেওয়া সাটটি দান করিল, আর একজন দুই চারিখানা কাপড় দিল। তৃতীয় ব্যক্তি সেইদিন প্রভাতেই একজোড়া নূতন ‘শ্রাণ্ডাল’ পাইয়াছিল এবং গব্বের সহিত আমাকে দেখাইয়াছিল। জেলে ইহা এক দুর্লভ সম্পদ। যখন সে দেখিল, তাহার বহুবর্ষের এই অন্ধ সঙ্গী নয়নপদে বাহিরে যাইতেছে; সে স্বেচ্ছায় তাহার নূতন ‘শ্রাণ্ডাল’ জোড়া তাহাকে দিয়া দিল। আমার তখন মনে হইল, বহির্জগত অপেক্ষা এই কারাগারে দয়া-দাক্ষিণ্য অনেক বেশী।

১৯৩০ সাল বহু নাটকীয় এবং প্রাণপ্রদ, জীবনপ্রদ ঘটনাপ্রবাহে পরিপূর্ণ। সমগ্র জাতিকে উৎসাহে অল্পপ্রাণিত করিয়া তুলিতে গান্ধিজীর আশ্চর্য

নৈলী জেলে

শক্তি কি বিস্ময়াবহ! ইহার মধ্যে যেন বাতু আছে; মনে পড়িল, গোথ্লে একবার তাঁহার সখকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি ধূলি হইতেও বীর সৃষ্টি করিতে পারেন। জাতীয় মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়স্বরূপ শাস্তিপূর্ণ নিরুপদ্রব প্রতিরোধনীতির কার্যকারিতায় যেন সকলের আস্থা জন্মিল, দেশের চিন্তে আত্মবিশ্বাস দৃঢ়তর হইল, শত্রু মিত্র সকলেই একথা স্বীকার করিলেন। যাহারা আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল, তাহারা আশ্চর্য্য উন্মাদনায় বিভোর হইল—এই উন্মাদনা কারাগারেও দেখা গেল। সাধারণ কয়েদীরাও বলিতে লাগিল, “স্বরাজ আসিতেছে।” উহার জন্ত তাহারা স্বার্থপর সুবিধার আশা লইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ওয়ার্ডারেরা বাজারের গল্প শুনিয়া আসিয়া স্বরাজ অদূরবর্তী বলিয়া মনে করিত—জেলের ছোটখাট কক্ষচারীরাও একটু চঞ্চল হইয়া পড়িল।

আমরা কারাগারে কোন দৈনিক পত্রিকা পাইতাম না, একখানি হিন্দী সাপ্তাহিক পত্রিকা আসিত,—তাহাতে যতটুকু সংবাদ পাইতাম, তাহাই আমাদের কল্পনাকে দীপ্ত করিয়া তুলিত। প্রত্যহ যষ্টি সঞ্চালন, কখন বা গুলীবর্ষণ, শোলাপুরে সামরিক আইন এবং জাতীয় পতাকা বহনের জন্ত দশ বৎসর কারাদণ্ড। আমাদের জনসাধারণ, বিশেষতঃ নারীরা সমগ্র দেশে যে ভাবে কার্য্য করিতেছে, তাহাতে আমরা গর্ভ বোধ করিতাম। আমরা মাতা, স্ত্রী ও ভগ্নী এবং সম্প্রকৃতা ভগ্নী ও বান্ধবীদের কার্য্যকলাপে আমি অধিকতর সন্তোষ লাভ করিতাম। যদিও আমি কারাগারে তাহাদের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া আছি তথাপি আমরা যেন অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইতেছি; এক মহৎ উদ্দেশ্যের কৰ্ম্মসূত্র যেন আমাদেরিগকে নূতন স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ করিল। পরিবার বৃহত্তম গোষ্ঠীর মধ্যে যেন মিলিয়া গেল। অথচ পুরাতন স্নেহ মমতা টান সমানই রহিয়া গেল। নিজের শারীরিক অন্তঃস্থতা অগ্রাহ্য করিয়া কমলা অন্ততঃ কিছুকালের জন্ত যে ভাবে কার্য্য করিতেছিল, সে সংবাদে আমার বিশ্বাসের সীমা রহিল না।

আমি কারাগারে অনেকটা নিশ্চিন্তে কালযাপন করিতেছি অথচ বাহিরে অনেকে কত বিঘ্ন বিপদের সম্মুখীন হইয়া বহু কষ্ট সহ্য করিতেছে, এই চিন্তা আমার নিকট দুৰ্ভহ হইয়া উঠিল। বাহিরে যাইবার জন্ত আমার প্রাণ ব্যাকুল, অথচ উপায় নাই। অবশেষে আমি কারার মধ্যেই কঠোর জীবন যাপন করিতে লাগিলাম। আমি প্রত্যহ তিন ঘণ্টাকাল আমার নিজের চরকায় সূতা কাটিতাম এবং জেলকর্তৃপক্ষের অহুমতি লইয়া আরও ২১০ ঘণ্টা কাল “নেওয়ার” (চওড়া ফিতা) বুনিতাম। এই কাজগুলি আমার ভাল লাগিত। ইহাতে অতিরিক্ত পরিশ্রমও হইত না, বিশেষ মনোযোগও

দিতে হইত না অথচ মনের উত্তেজনা অনেকটা প্রশান্ত হইত। আমি পড়াশুনা খুব বেশী করিতাম। সময়ান্তরে ঝাড়ু দেওয়া, নিজের কাপড়-চোপড় কাচা প্রভৃতিও করিতাম। আমি ইচ্ছা করিয়াই শারীরিক পরিশ্রম করিতাম, কেন না আমার কারাদণ্ড বিনাশ্রম ছিল।

বাহিরের ঘটনাবলীর চিন্তা এবং জেলের নিত্য নৈমিত্তিক কাজ, ইহা লইয়াই নৈনী জেলে আমার দিন কাটিতে লাগিল। ভারতীয় কারাব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে আমার মনে হইল, ইহা যেন ভারতে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের মত। শাসনযন্ত্রে যোগ্যতা ও কুশলতার অভাব নাই, দেশের উপর গভর্ণমেন্টের ক্ষমতা ইহা অক্ষুণ্ণ রাখিতেছে, অথচ দেশের মানুষগুলির সম্বন্ধে প্রায় কোন চৈতন্যই নাই। বাহির হইতে দেখিলে জেলখানার কাজকর্ম বেশ যোগ্যতার সহিত নিয়ন্ত্রিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়। এবং কতকাংশে ইহা সত্যও বটে : কিন্তু যে সকল হতভাগ্য এখানে আসে, তাহাদের উন্নতির জন্য সাহায্য করা যে জেলের প্রধান উদ্দেশ্য, সে কথা কেহ ভাবে বলিয়া মনে হয় না। জল কর, শিষিয়া ফেল—এই ভাব সর্বত্র বিরাজিত। যেন তাহারা যখন বাহিরে যাইবে, তখন কাহারও যেন তেজ বীৰ্য্য অবশিষ্ট না থাকে। কি ভাবে কারাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়, কয়েদীদিগকে সংযত করা ও শাস্তি দেওয়া হয়? প্রধানতঃ কয়েদীদিগের দ্বারাই তাহাদিগকে শাসনে রাখা হয়। কতকগুলি কয়েদীকে কয়েদী মেট প্রভৃতি কবিয়া দেওয়া হয় এবং কতক ভয়ে এবং কতক পুরস্কার পাইবার আশায়, মেয়াদ কম হইবার আশায় কর্তৃপক্ষের সহিত সহযোগিতা করে। বেতনভোগী বাহিরের ওয়ার্ডারের সংখ্যা অত্যন্ত কম। জেলের ভিতরে সাধারণতঃ কয়েদী মেটরাই পাহারা দিয়া থাকে। ইহা ছাড়া, জেলখানায় গোয়েন্দাগিরি প্রবলভাবে চলিয়া থাকে। কয়েদীদিগকে পরস্পরের উপর নজর রাখিতে উৎসাহ দেওয়া হয়, যাহাতে কয়েদীরা দলবদ্ধ হইয়া কাজ না করিতে পারে সেজন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। এই ভাবে তাহাদের মধ্যে ভেদ রক্ষা করিলে তাহাদের সংযত রাখা যাইতে পারে; অতএব, ইহার অর্থ সহজেই বুঝা যায়।

বাহিরে আমাদের দেশের গভর্ণমেন্টেও এই ব্যবস্থাই ব্যাপক ও বৃহত্তররূপে দেখিতে পাই, তবে সেখানে তাহা কিঞ্চিৎ আবৃত। এখানে কয়েদী মেট ও কয়েদী ওয়ার্ডারদের নাম স্বতন্ত্র। ইহাদের বড় বড় উপাধি আছে, ইহাদের তক্কা চাপরাসও বেশ জাঁকজমকপূর্ণ। এবং তাহার পশ্চাতে কারাগারের মতই অস্ত্রধারী রক্ষীদল প্রস্তুত হইয়াই আছে।

আধুনিক রাষ্ট্রে জেলখানাগুলির প্রয়োজনীয়তা কত অপরিহার্য!

মৈলী জেলে

অন্ততঃপক্ষে কয়েকটা চিন্তা করিতে থাকে যে, গভর্ণমেন্টের বহুতর বিভাগ ও অস্ত্রান্ত দায়িত্ব, পুলিশ কি সৈন্তদল, কারাগারের কার্যপ্রণালীর তুলনায় নিতান্ত বাহ্য ব্যাপার মাত্র। যে দলের হাতে গভর্ণমেন্টের পরিচালন-ক্ষমতা থাকে, সেই দলের ইচ্ছা অপরের উপর প্রয়োগ করিবার পীড়নমূলক যন্ত্রই হইল রাষ্ট্র—এই মার্কসীয় মতবাদের ষাথার্থ্য কারাগারে বসিয়াই বুঝিতে পারা যায়।

আমার ব্যারাকে আমি এক মাস একাকীই ছিলাম। তারপর নন্দাপ্রসাদ সিংহকে সঙ্গীরূপে পাইয়া অনেকটা শান্তি পাইলাম। আড়াই মাস পরে ১৯৩০ সালের জুন মাসের শেষদিন আমাদের ক্ষুদ্র আবেষ্টনীর মধ্যে সহসা হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। অপ্রত্যাশিত ভাবে অতি প্রত্যুষে আমার পিতা ও ডাঃ সৈয়দ মামুদ সেখানে আসিলেন। তাঁহারা উভয়েই আনন্দভবনে অতি প্রত্যুষে শয্যায় থাকিতেই গ্রেফতার হইয়াছিলেন।

এরোডায় আপোষের কথাবার্তা

আমার পিতার গ্রেফতারের সঙ্গে সঙ্গেই অথবা অব্যবহিত পরেই কংগ্রেসের কার্যাকরী সমিতিতে বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত করা হইল। ইহার ফলে বাহিরে এক নূতন অবস্থার উদ্ভব হইল—অধিবেশন হইলেই সমস্ত সদস্য একসঙ্গে ধরা পড়িতেন। পূর্বপ্রাপ্ত ক্ষমতানুসারে অস্থায়ী সভাপতিরা স্থলাভিষিক্ত সদস্য মনোনীত করিতেন। এইভাবে অনেক নারী অস্থায়ী সদস্য হইয়াছিলেন। কমলাও তাঁহাদের অন্ততম।

জেলে আসিবার সময় পিতার স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ ছিল এবং যে অবস্থায় তাঁহাকে রাখা হইল, তাহাতে তিনি অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে লাগিলেন। ইহা অবশ্য গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছাকৃত নহে। কেন না, তাঁহার স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য তাঁহার সাধ্যমত চেষ্টা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু নৈনী জেলে বেশী কিছু করিবার উপায় ছিল না। আমার ব্যারাকে চারিটি ক্ষুদ্র সেলে চারজনের পক্ষে স্থানের অত্যন্ত অকুলান হইল। জেল-সুপার আসিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, পিতাকে জেলের অন্য অংশে লইয়া গেলে তিনি অপেক্ষাকৃত খোলা জায়গায় থাকিতে পারিবেন। কিন্তু আমরা একত্রে থাকিতেই ভাল বোধ করিলাম। তাহা হইলে আমরা তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে পারিব।

তখন বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের ভাদ দিয়া মাঝে মাঝেই নানাস্থানে টপ টপ করিয়া জল পড়ে। সেলের অভ্যন্তরভাগ শুষ্ক রাখা কঠিন। রাত্রে পিতার বিছানা লইয়া সমস্তায় পড়িতে হইত। বৃষ্টি বাঁচাইবার জন্য সেল-সংলগ্ন ক্ষুদ্র বারান্দায় (১০×৫ ফুট) তাঁহার খাট পাতা হইত। কখনও কখনও তাঁহাব জ্বর হইত। অবশেষে জেল কর্তৃপক্ষ একটি অতিরিক্ত বারান্দা তৈরী করিতে মনস্থ করিলেন। আমাদের সেল-সংলগ্ন এই প্রশস্ত সুন্দর বারান্দাটি তৈয়ারী হওয়ায় আমাদের অনেক সুবিধা হইল। কিন্তু ইহাতে পিতার পক্ষে বিশেষ লাভ হয় নাই, কেন না বারান্দা তৈয়ারী হওয়ার অল্পদিন পর তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইল।

আর তেজ বাহাদুর সপ্ত ও মিঃ এম আর জয়াকর কংগ্রেসের সহিত গভর্ণমেণ্টের শাস্তি স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন, জুলাই মাসের শেষ

এরোডায় আপোষের কথাবার্তা

ভাগে ইহা লইয়া তুমুল আলোচনা চলিতে লাগিল। আমার পিতাকে দয়া করিয়া যে দৈনিক সংবাদপত্র দেওয়া হইত, তাহাতেই আমরা ইহা পড়িতাম। সংবাদপত্রে প্রকাশিত বড়লার্ট লর্ড আকুইন ও সপ্ত-জয়াকরের প্রকাশিত পত্রাবলী হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, তথাকথিত “শান্তিদূতেরা” গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। আমরা বুঝিতে পারিলাম না যে কেন তাঁহারা এই কাণ্ডে ব্রতী হইলেন অথবা তাঁহাদের উদ্দেশ্য কি। পরে আমরা তাঁহাদের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, গ্রেফতারের কয়েকদিন পূর্বে বোম্বাইয়ে পিতা যে বিবৃতি * দিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহারা উৎসাহিত হইয়া এই কার্য্য করিয়াছিলেন। লণ্ডন “ভেবী হেরাল্ড”-এর প্রতিনিধি মিঃ শ্লোকস (তখন ভারতে ছিলেন) আমার পিতার সহিত আলাপ-আলোচনার পর ঐ বিবৃতির মুসাবিদা করেন এবং পিতা উহা অন্তঃস্বাদন করিয়াছিলেন। ঐ বিবৃতিতে ইহা উল্লেখ ছিল যে, গভর্ণমেন্ট যদি কতকগুলি সর্ব্বোত্তম হন, তাহা হইলে কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করিতে পারেন এইরূপ সম্ভাবনা আছে। ইহা কতকাংশে অস্পষ্ট ও পৰ্য্যায়মূলক প্রস্তাব মাত্র এবং উহাতে এ কথাও স্পষ্ট ছিল যে, এমন কি গান্ধিজী এবং আমার সহিত পরামর্শ না করিয়া পিতা ঐ অস্পষ্ট সর্ব্বগুলি সম্পর্কে কোন কথাই বলিতে পারিবেন না। সে বৎসর আমি কংগ্রেসের সভাপতি, অতএব, আমাকে গণনা করিতেই হয়। গ্রেফতারের পর নৈনৌ জেলে পিতা আমাকে এ কথা বলিয়াছিলেন এবং ইহাও বলিয়াছিলেন যে, তাড়াতাড়িতে এরূপ

* ১৯৩০-এর ২৫শে জুন তারিখে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু অনুমোদিত বিবৃতি—
 “গোলটেবিল বৈঠক স্বাধীনভাবে যে সকল প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ঐ প্রস্তাবগুলি কি ভাবে গ্রহণ করিবেন, সে সম্বন্ধে কোন পূর্ব্ব ধারণা না করিয়াও, যদি ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ও ভারত গভর্ণমেন্ট কোন বিশেষ অবস্থায় ব্যক্তিগতভাবে এরূপ আশ্বাস দেন যে, তাঁহারা ভারতে পূর্ণ দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র সমর্থন করিবেন,—অবশ্য ভারতের সহিত ব্রিটেনের দীর্ঘকালের সন্ধা এবং ভারতের বর্তমান অবস্থার জ্ঞান প্রয়োজনমত পারস্পরিক আপোষ বাহা পরে গোলটেবিল কড়ক স্থির হইবে—তাহা হইলে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ব্যক্তিগত ভাবে সে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন অথবা দায়িত্বশীল কোন তৃতীয়পক্ষের মাধ্যমে যদি সেরূপ প্রতিশ্রুতি মিঃ গান্ধী বা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নিকট আসে, তাহা দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করিবেন। যদি সেরূপ প্রতিশ্রুতি আসে এবং গৃহীত হয়, তাহা হইলে আপোষের সম্ভাবনা হইতে পারে—বাহাতে একদিকে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত হইবে, অশুদ্ধিত গভর্ণমেন্ট বর্তমান দমননীতি প্রত্যাহার করিবেন এবং সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে ছাড়িয়া দিবেন। পরে পারস্পরিক সর্ভানুসারে কংগ্রেস গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে পারেন।”

জওহরলাল নেহরু

অস্পষ্ট বিবৃতি দেওয়াতে তিনি দুঃখিত, কেননা উহাতে তুল ধারণা উদ্ভব হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কার্যতঃ হইয়াছিলও তাহাই। তবে যে সকল লোক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করে, তাহারা অতি-নির্দিষ্ট ও সরল বিবৃতির মধ্যেও খুঁৎ বাহির করিয়া থাকে।

স্মার তেজ বাহাদুর সফ্র এবং মিঃ জয়াকর ২৭শে জুলাই সহসা নৈনী জেলে গান্ধিজীর পত্রসহ আসিয়া আমাদের সহিত দেখা করিলেন। সেদিন এবং তার পরদিন তাঁহাদের সহিত আমাদের দীর্ঘ আলোচনা হইল। পিতার জরভাব ছিল, তিনি অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ করিলেন। আমরা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তর্ক করিলাম, আলোচনা করিলাম, কিন্তু রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের জগ্ৰ, পরস্পরের ভাষা ও চিন্তা অল্পই বুঝিতে পারিলাম। তবে ইহা বুঝিলাম, বর্তমান অবস্থা ধেরূপ তাহাতে কংগ্রেসের ও গভর্নমেন্টের মধ্যে শান্তিস্থাপনের সম্ভাবনা অতি অল্প। আমরা কায্যকরী সমিতির সদস্যগণ বিশেষভাবে গান্ধিজীর সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন প্রস্তাব করিতে অস্বীকার করিলাম এবং এই মর্মে গান্ধিজীর নিকট পত্র লিখিলাম।

এগার দিন পর ডাঃ সফ্র পুনরায় বড়লাটের উত্তর লইয়া আমাদের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। আমাদের এরোডা যাওয়ার প্রস্তাবে (পুণার যে জেলে গান্ধিজী ছিলেন) বড়লাট আপত্তি করেন নাই। তবে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, মোলানা আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি যে সকল সদস্য তখনও বাহিরে থাকিয়া আন্দোলন পরিচালনা করিতেছিলেন, তাঁহাদের সহিত সাক্ষাতের প্রস্তাবে সপরিষদ বড়লাট সম্মত হন নাই। এই অবস্থায় আমরা এরোডা বাইতে সম্মত কিনা, ডাঃ সফ্র জানিতে চাহিলেন। আমরা বলিলাম, গান্ধিজীর সহিত যে কোন সময়ে দেখা করিতে আমাদের কোন আপত্তি নাই, কিন্তু আমাদের অগ্ৰাণ্য সহকর্মীদের সহিত আলোচনা ব্যতীত কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা নাই। সেইদিন (অথবা তাহার পূর্কদিন) সংবাদপত্রে আমরা দেখিলাম, বোম্বাই-এ অতি প্রচণ্ড লাঠিচালনা হইয়া গিয়াছে এবং মালবাজী, বল্লভভাই প্যাটেল, তাসাদ্দুক সেরওয়ারী ও অগ্ৰাণ্য স্থায়ী অস্থায়ী কার্য্যকরী সমিতির সদস্যরা গ্রেফতার হইয়াছে। আমরা ডাঃ সফ্রকে বলিলাম, এই সকল ঘটনা মোটেই অল্পকূল নহে, তিনি বাহাতে আমাদের মনোভাব বড়লাটকে বুঝাইয়া বলেন, সে অহুরোধও আমরা করিলাম। ডাঃ সফ্র বলিলেন, যথাসম্ভব শীঘ্র আমাদের গান্ধিজীর সহিত দেখা করায় কোন অনিষ্ট হইবে না। আমরা পূর্ক হইতেই তাঁহাকে

এরোডায় আপোষের কথাবার্তা

বলিয়াছিলাম যে, যদি আমাদের এরোডা যাইতেই হয়, তাহা হইলে নৈনী জেলে আমাদের সঙ্গী এবং কংগ্রেসের সম্পাদক ডাঃ সৈয়দ মামুদও আমাদের সঙ্গে যাইবেন।

দুই দিন পর ১০ই আগষ্ট আমি, মামুদ ও পিতা—এই তিন জন স্পেশাল ট্রেনে নৈনী হইতে পুণা যাত্রা করিলাম। আমাদের গাড়ী অবশ্যই বড় বড় স্টেশনে থামে নাই—ছোটখাট স্টেশনে মধ্যে মধ্যে গাড়ী থামিত। তবুও সংবাদ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, গাড়ী থামুক আর নাই থামুক, প্রত্যেক স্টেশনে জনতার ভীড় হইত। ১১ই তারিখ আমরা গভীর রাত্রে পুণার নিকটবর্তী কিরকীতে পৌঁছিয়াছিলাম।

আমরা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, আমাদিগকে গান্ধিজীর ব্যারাকে রাখা হইবে, অন্ততঃ সহরই তাঁহার সহিত দেখা করিতে দেওয়া হইবে। এরোডা জেলের অধ্যক্ষ সেই ব্যবস্থাই করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ মুহূর্তে আমাদের সহিত যে পুলিশ কর্মচারী আসিয়াছিলেন, তাহার মারফৎ সংবাদ পাওয়া এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হয়। কারাধ্যক্ষ লেঃ কর্নেল মার্টিন আমাদের নিকট গুপ্ত কথা ভাঙিলেন না; কিন্তু পিতার স্ত্রীকোণল প্রস্নে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, সপ্ত-জ্যাকরের উপস্থিতি ব্যতীত আমাদিগকে গান্ধিজীর সহিত দেখা (অন্ততঃ প্রথম বার) করিতে দেওয়ার অভিপ্রায় নাই। পূর্বে দেখা হইলে আমাদের মনোভাব দৃঢ় হইতে পারে এবং আমরা ঐক্যমত দৃঢ়তার সহিত বাক্ত করিতে পারি, এরূপ আশঙ্কা করা হইয়াছিল। সে রাত্রি এবং পরদিন দিবারাত্রি আমাদের পৃথক ব্যারাকে রাখা হইল, পিতা মহা বিরুদ্ধ হইলেন। যাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্ত আমরা নৈনী হইতে আসিলাম, সেই গান্ধিজীর সহিত দেখা করিতে দেওয়া হইতেছে না, অথচ আশায় আশায় রাখা হইতেছে, ইহা অত্যন্ত ক্লেশকর। ১৩ই তারিখ মধ্যাহ্নের পূর্বে আমাদিগকে জানান হইল, স্যার তেজবাহাদুর ও মিঃ জ্যাকর আসিয়াছেন এবং গান্ধিজীও তাঁহাদের সহিত জেলের অফিস ঘরে বসিয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন, আমাদিগকেও সেইখানে যাইবার জন্ত আহ্বান করা হইল। পিতা প্রথমে যাইতে অস্বীকার করিলেন। তার পর অনেক কৈফিয়ৎ ও ক্ষমাপ্রার্থনার পর তিনি এই সর্তে যাইতে সম্মত হইলেন যে, তিনি প্রথম নির্জনে গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। বল্লভভাই প্যাটেল ও জয়রামদাস দৌলতরামকে এরোডাতেই আনা হইয়াছিল, সরোজিনী নাইডুও এরোডা জেলের নারীদের জন্ত নির্দিষ্ট অংশে ছিলেন; আমাদের সম্মিলিত অহুরোধে তাঁহাদিগকেও আমাদের সম্মিলনে যোগ দিতে

দেওয়া হইল। সেই দিন সন্ধ্যায় আমাকে, পিতাকে ও মামুদকে গান্ধিজীর ব্যারাকে লইয়া যাওয়া হইল, অবশিষ্ট কয়দিন আমরা তাঁহার সহিতই ছিলাম। বল্লভভাই ও জয়রামদাসকেও ঐ কয়দিন পরামর্শের জন্য আমাদের নিকট রাখা হইয়াছিল।

১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই আগষ্ট, এই তিন দিন সপ্ত-জয়াকরের সহিত আলোচনা করিবার পর আমরা আমাদের মতামত লিপিবদ্ধ করিয়া পত্র বিনিময় করিলাম, ঐ পত্রে আমরা যে সকল নিম্নতম সর্বোচ্চ আইন অস্বীকার আন্দোলন প্রত্যাহার এবং গভর্নমেন্টের সহিত সহযোগিতা করিতে পারি, তাহা লিখিয়া দিলাম। এই সকল পত্র পরে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।*

এই সকল বৈঠক ও আলোচনায় পিতা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। ১৬ই তারিখ সহসা তাঁহার প্রবল জ্বর হইল। ইহাতে আমাদের ফিরিতে বিলম্ব হইল। ১২ শে তারিখ রাতে আমরা পুনরায় স্পেশাল ট্রেনে নৈনী যাত্রা করিলাম। পিতার যাহাতে পথে কোন ক্লেশ না হয়, সেজন্য বোম্বাই গভর্নমেন্ট যথোচিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এরোডা জেলেও তাঁহার বিশেষ যত্ন লেওয়া হইত। আমরা যে রাতে এরোডা জেলে উপস্থিত হই, সেদিনের একটি কৌতুককর ঘটনার কথা মনে আছে। কারাধক্ষক কর্ণেল মার্টিন পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি শ্রেণীর খাণ্ড তিনি পছন্দ করেন? পিতা তাঁহাকে বলিলেন, তিনি সাধারণতঃ লঘু পথ্যই গ্রহণ করেন। তারপর তিনি প্রভাতে শয্যায় চা হইতে নৈশভোজন পর্যন্ত খাণ্ডের খুঁটি নাটি তালিকা দিতে লাগিলেন। (নৈনী জেলে বাড়ী হইতে পিতার খাণ্ড আসিত)। পিতা সরলভাবে তাঁহার লঘু পথ্যের যে তালিকা দিলেন, তাহা গুরুতর বোধ হইল। লণ্ডনের রিটুজ বা স্ত্রভয় হোটেলে ইহা অবশ্যই অতি সাধারণ ও লঘু খাণ্ড বলিয়া বিবেচিত হয়, পিতারও অবশ্য তাহাই ধারণা। কিন্তু এরোডা জেলে ইহা আশ্চর্য্য, দুর্লভ এবং অতিরিক্ত বিবেচিত হইল। পিতার বহুতর ব্যয়বহুল ফর্দ শুনিতে শুনিতে কর্ণেল মার্টিনের মুখভাব লক্ষ্য করিয়া আমি ও মামুদ অত্যন্ত কৌতুক বোধ করিতে লাগিলাম। কেন না, বহুকাল ধরিয়া তিনি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ও খ্যাতনামা নেতার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন; তাঁহার জন্য ছাগলের দুধ, খেজুর ও কচিং কমলালেবু ব্যতীত আর কিছুই দরকার হয় নাই। কিন্তু পৃথক ধরণের নেতার সহিত তাঁহার এই প্রথম পরিচয়।

* পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

এরোডায় আপোষের কথাবার্তা

পূণ্য হইতে নৈনীতে ফিরিবার পথেও বড় বড় ষ্টেশনে গাড়ী না থামাইয়া ছোট ছোট ষ্টেশনে গাড়ী থামিতে লাগিল। এবার জনতা আরও বেশী মনে হইল; প্রায় প্রত্যেক ষ্টেশনে, বিশেষভাবে হারদা, ইটারসি এবং সোহাগপুরে ষ্টেশন প্লাটফর্ম এমন কি রেললাইনের উপর জনতা ভীড় করিয়াছিল। অল্পের জন্ত কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই।

পিতার শারীরিক অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতে লাগিল। তাঁহার নিজের চিকিৎসকগণ এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের চিকিৎসকগণ তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। স্পষ্টই বুঝা গেল, জেলখানায় তাঁহার উপযুক্ত চিকিৎসা অসম্ভব। তাঁহার অস্থির জন্ত কারামুক্তি হওয়া উচিত, সংবাদপত্রে জনৈক বন্ধুর এইরূপ মন্তব্য দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন; তাঁহার মনে হইল, জনসাধারণ ভাবিবে যে, প্রস্তাবটি তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে প্রকাশিত হইয়াছে। এমন কি, তিনি লর্ড আক্কাইনকে তারযোগে জানাইলেন যে, কারামুক্তির অতুগ্রহ তিনি চাহেন না। কিন্তু দিনে দিনে তাঁহার অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল, তাঁহার ওজন কমিয়া গেল; শরীর অত্যন্ত শীর্ণ হইতে লাগিল। দশ সপ্তাহ কারাগারে থাকিয়া তিনি ৮ই সেপ্টেম্বর মুক্তিলাভ করিলেন।

পিতা চলিয়া গেলে আমাদের ব্যারাক প্রাণহীন ও শূন্যময় মনে হইতে লাগিল। আমি, নরমদাপ্রসাদ ও মামুদ তিনজনই আনন্দের সহিত সারাক্ষণ তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিতাম। তাঁহার ছোটখাট কাজগুলি করিয়া কত আনন্দ হইত! আমি নেওয়ার বুনা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, চরকা অল্পই কাটিতাম, পড়াশুনাও বেশী করিতাম না। তাঁহার প্রস্থানের পর আমরা ভারাক্রান্ত হৃদয় লইয়া পুনরায় পুরাতন নিয়মে কাজ করিতে লাগিলাম। পিতার মুক্তির পর দৈনিক সংবাদপত্রও বন্ধ হইয়া গেল। চার কি পাঁচ দিন পর আমার ভগ্নীপতি রণজিৎ পণ্ডিত গ্রেফতার হইয়া আমাদের ব্যারাকে আসিলেন।

ছয় মাস কারাদণ্ড শেষ হওয়ায় ১১ই অক্টোবর আমি জেল হইতে মুক্তি পাইলাম। বাহিরে তখন সংঘর্ষ তীব্রভাবে চলিতেছে, আমার এই স্বাধীনতা ক্ষণস্থায়ী। ‘শান্তিদূত’ সপ্ত-জ্যাকরের চেষ্ঠা ব্যর্থ হইয়াছিল। আমার কারামুক্তির দিনই আরও দুই কি ততোধিক অর্ডিন্যান্স দ্রাবী হইল। কারার বাহিরে আসিয়া আমি আনন্দিত হইলাম এবং যে কয়দিন বাহিরে থাকি যথাসম্ভব কাজ করিবার সঙ্কল্প করিলাম।

কমলা তখন এলাহাবাদে কংগ্রেসের কাজ লইয়া ব্যস্ত ছিল। পিতা মূর্সোরীতে চিকিৎসাধীন ছিলেন, আমার মাতা ও ভগ্নী তাঁহার সহিত

জওহরলাল নেহরু

ছিলেন। আমি দেড় দিন এলাহাবাদে কংগ্রেসের কাজকর্মের ব্যবস্থা করিয়া কমলাকে লইয়া মুসৌরী যাত্রা করিলাম। পল্লী অঞ্চলে খাজনা ও ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন আরম্ভ করা হইবে কিনা আমরা তখন এই বিষয় চিন্তা করিতেছিলাম। খাজনা আদায়ের নিদিষ্ট সময় তখন নিকটবর্তী; কিন্তু যাহাই হউক, কৃষিপণ্যের মূল্য অসম্ভব হারে কমিয়া যাওয়ায় খাজনা আদায় করা কঠিন হইবে। এই সময় ভারতবর্ষেও জগতের বাজারের মন্দা প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

আইন অমাত্র আন্দোলনের অংশরূপেই হউক বা পৃথক আন্দোলনরূপেই হউক, ট্যাক্সবন্ধ আন্দোলনের ইহাই উপযুক্ত অবসর। এই বৎসরের আয় হইতে কি জমিদার কি প্রজা কাহারও পক্ষে পুরা খাজনা আদায় দেওয়া অসম্ভব। জমিদারদের সাধারণতঃ কিছু সংস্থান আছে, তাহাদের পক্ষে ঋণ পাওয়াও সহজ। কিন্তু প্রজারা অধিকাংশই হতদরিদ্র, কোন সঞ্চয় সঞ্চিত তাহাদের নাই। যে কোন গণতান্ত্রিক দেশে, যেখানে কৃষকেরা সজ্জবদ্ধ ও প্রভাবশালী, সেখানে বর্তমান অবস্থায় তাহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা অসম্ভব হইত। কিন্তু ভারতবর্ষে কৃষকদের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রায় কিছুই নাই। কোন কোন অঞ্চলে কংগ্রেসের সহায়তায় কৃষিবল একটু সজ্জবদ্ধ; অবশ্য অবস্থা সহ্য করিতে না পারিয়া যদি কৃষকেরা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে, এ আশঙ্কা সর্বদাই আছে। তবে ইহার বংশানুক্রমিক অপ্রতিবাদে সমস্ত দুঃখ নীরবে সহ্য করিতেই অভ্যস্ত।

গুজরাট এবং অন্ধ্রা অঞ্চলে খাজনাবন্ধ আন্দোলন চলিতেছিল, তবে তাহা আইন অমাত্র আন্দোলনের অংশরূপে রাজনৈতিক আন্দোলন-রূপেই পরিচালিত হইতেছিল। সেখানে রাষ্ট্রতান্ত্রিক প্রথা প্রচলিত এবং তাহার গভর্ণমেন্টকে খাজনা দিয়া থাকে। তাহার খাজনা না দিলে গভর্ণমেন্ট প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। কিন্তু যুক্তপ্রদেশে জমিদারী ও তালুকদারী প্রথা প্রচলিত; গভর্ণমেন্ট ও কৃষকের মধ্যে বহু মধ্যস্থত্বভোগী বিদ্যমান। এখানে প্রজারা খাজনা না দিলে মুখ্যভাবে জমিদারেরা বিপন্ন হন। অতএব, এক্ষেত্রে শ্রেণীর প্রশ্ন স্বতঃই আসে। কিন্তু কংগ্রেস নিছক জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান; ইহার মধ্যে অনেক মাঝারি এবং কয়েকজন বড় জমিদারও আছেন। শ্রেণীস্বার্থের প্রশ্ন উঠে কিম্বা জমিদারেরা বিরক্ত হন এমন কিছু করিতে কংগ্রেসের নেতারা সর্বদাই ভীত; এই কারণে আইন অমাত্র আন্দোলনের প্রথম ছয় মাস অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তাহার পল্লী অঞ্চলে খাজনা বন্ধ আন্দোলন ঘোষণা করিলেন না।

এরোডায় আপোষের কথাবার্তা

আমার মতে তখন উহার উপযুক্ত অবসর ছিল সন্দেহ নাই। যে কোন ভাবেই হউক, শ্রেণীস্বার্থের কথা তুলিতে আমার নিজের কোন ভয় ছিল না; তবে আমি ইহা মানিতে বাধ্য যে, তখন কংগ্রেসের নিয়ম যেসকল তাহাতে উহা শ্রেণীসংঘর্ষ অল্পমোদন করিতে পারে না। অবশ্য কংগ্রেস জমিদার ও প্রজা উভয়কেই খাজনা দিতে নিষেধ করিতে পারে। জমিদারেরা সম্ভবতঃ গভর্নমেন্ট দাবী করিলেই খাজনা চুকাইয়া দিবেন; কিন্তু সে দোষ তাঁহাদেরই হইবে।

অক্টোবরে যখন আমি জেল হইতে বাহিরে আসিলাম তখন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি দেখিয়া আমি নিঃসন্দেহ বুঝিলাম, খাজনাবন্ধ আন্দোলনের ইহাই উপযুক্ত অবসর। কৃষকদের অর্থকষ্ট প্রায় চরমে উঠিয়াছে। আমাদের রাজনৈতিক নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন যদিও সর্বত্র পুরাদমে চলিতেছিল, তথাপি উহা একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছিল। তখনও লোকে অল্পাধিক দলে দলে জেলে যাইতেছিল বটে, কিন্তু সে উৎসাহ-উদ্দীপনা আর ছিল না। নগরবাসী ও মধ্যশ্রেণীর লোকেরা পুনঃ পুনঃ হরতাল ও মিছিলে অনেকটা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাকে চাঙ্গা করিয়া তুলিবার জগু নূতন কিছু চাই, নূতন মাছুষ চাই। একমাত্র কৃষক সম্প্রদায় ছাড়া আর কোথায় তাহা পাওয়া যাইবে? এইখানেই সমষ্টিবল সঞ্চিত রহিয়াছে। এইখানেই জনসাধারণের স্বার্থের ভিত্তিতে বিরাট গণ-আন্দোলন জাগ্রত করা যাইতে পারে এবং আমার মতে উহার দ্বারাই অতি গুরুতর সামাজিক প্রশ্নগুলিও সমাধানের অল্পকূল অবস্থার সৃষ্টি হইবে।

আমি এলাহাবাদে যে দেড় দিন ছিলাম, এই বিষয় লইয়া সহকর্মীদের সহিত আলোচনা করিলাম। সময় সংক্ষিপ্ত হইলেও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যকরীসভা আহৃত হইল। অনেক তর্কবিতর্কের পর আমরা স্থির করিলাম, খাজনা বন্ধ আন্দোলন আরম্ভ করিতে হইবে; তবে আমরা প্রদেশের কোন অংশে উহা ঘোষণা করিলাম না, প্রত্যেক জিলার উপর ভার দেওয়া হইল। কার্যকরী সমিতি শ্রেণীসংঘর্ষ বাঁচাইবার জগু জমিদার ও প্রজা উভয়কেই সমানভাবে আহ্বান করিলেন। অবশ্য আমরা জানিতাম যে, প্রজারাই ইহাতে বেশী সাড়া দিবে।

এই সিদ্ধান্তের পর আমাদের এলাহাবাদ জিলাই প্রথম আন্দোলন আরম্ভ করিতে প্রস্তুত হইল। নূতন আন্দোলনে শক্তিসঞ্চার করিবার জগু আমরা প্রতিনিধি স্থানীয় কৃষকদের লইয়া একটি সম্মেলনের ব্যবস্থা করিলাম। কারামুক্তির প্রথম দিনই আমি যতখানি কাজ করিলাম, তাহাতে সুখী

জওহরলাল নেহরু

হইলাম। ইহার সহিত এলাহাবাদে এক বৃহৎ জনসভা আহ্বান করিয়া আমি বক্তৃতা করিলাম। এই বক্তৃতার জন্ত আমার পুনরায় কারাদণ্ড হইল।

সে যাহা হউক, ১৩ই অক্টোবর আমি কমলাকে লইয়া মুসোরী গেলাম এবং পিতার সহিত তিন দিন অবস্থান করিলাম। তাঁহাকে অনেকটা ভাল বোধ হইল, এ যাত্রা তিনি সারিয়া উঠিবেন, ইহা ভাবিয়া আমি আনন্দিত হইলাম। পরিবারবর্গের সহিত তিনটি দিন যে আনন্দে কাটিল, তাহা আমার স্মরণ আছে। আমার কন্যা ইন্দিরা ও তিনটি ছোট ভাগিনেয়ী সেখানে ছিল। আমি শিশুদের লইয়া খেলা করিতাম। কখনও আমরা মিছিল করিয়া বীরদর্পে বাড়ীর চারিদিকে ঘুরিতাম; সর্বকনিষ্ঠা (৩৪ বৎসর বয়স্ক) জাতীয় পতাকা হস্তে আগে চলিত, পাছে পাছে আমরা চলিতাম এবং “ঝাণ্ডা উচা রহে হামারা” গানটি গাহিতাম। এই তিন দিনই পিতার সহিত আমার সর্বশেষ একত্র অবস্থান। তারপর যখন চরম রোগ তাঁহাকে আমার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়া গেল, তখন একবার দেখিয়াছিলাম মাত্র।

আমার পুনরায় গ্রেফতার অনুমান করিয়া এবং সম্ভবতঃ আমাকে আরও কিছুকাল নিকটে দেখিবার জন্ত পিতা সহসা এলাহাবাদে প্রত্যাবর্তনের সঙ্কল্প করিলেন। এলাহাবাদে ১৯শে তারিখ কৃষক সম্মেলনে যোগ দিবার জন্ত আমি ও কমলা ১৭ই তারিখ মুসোরী হইতে যাত্রা করিলাম। পিতা অগ্রাগ্রহ সকলকে লইয়া তাহার পরদিন এলাহাবাদ যাত্রা করিলেন।

ফিরিবার পথে আমি ও কমলা উভয়েই কিছু উত্তেজনা অনুভব করিয়াছিলাম। আমরা দেরাহুন ছাড়িতেছি, এমন সময় আমার উপর ১৪৪ ধারা জারী করা হইল। লঙ্কো-এ আমরা কয়েক ঘণ্টা ছিলাম, এখানে আসিয়া শুনিলাম আর একটি ১৪৪ ধারার নোটিশ অপেক্ষা করিতেছে, কিন্তু বৃহৎ ও ঘনসন্নিবিষ্ট জনতা ভেদ করিয়া পুলিশ কর্মচারীটি আমার নিকট পৌঁছিতে পারিলেন না। স্থানীয় মিউনিসিপালিটি আমাকে একখানি মানপত্র প্রদান করিলেন। তারপর আমরা মোটর গাড়ীতে এলাহাবাদ যাত্রা করিলাম; পথে স্থানে স্থানে গাড়ী থামাইয়া কৃষকসভায় বক্তৃতা করিতে হইল। আমরা ১৮ই তারিখ রাত্রে এলাহাবাদে পৌঁছিলাম।

১৯শে তারিখ সকালবেলা আমার উপর আর একখানি ১৪৪ ধারার নোটিশ জারি হইল। বুঝিলাম, গভর্ণমেন্ট আমার পিছু লইয়াছেন এবং আমার সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে। আমি পুনরায় গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে কিষণ কনফারেন্সে যোগ দেওয়ার জন্ত বাস্তব হইয়া পড়িলাম। আমরা কেবল প্রতিনিধিদের সভা আহ্বান করিয়াছিলাম। বাহিরের লোকদিগকে এখানে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। এলাহাবাদ জিলার প্রতিনিধিস্থানীয় প্রায়

এরোডায় আপোষের কথাবার্তা

ষোল শত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। আমাদের জিলায় খাজনাবন্ধ আন্দোলন আরম্ভ করিবার প্রস্তাব উৎসাহের সহিত সম্মেলনে গৃহীত হইল। আমাদের বিশিষ্ট কর্মীরা কিছু ইতস্ততঃ করিলেন। অনেকের মনেই ইহার সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহ উপস্থিত হইল। বড় জমিদারেরা গভর্নমেন্টের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রজাদিগকে ভীত করিয়া তুলিবেন। তাহার। সেই আঘাত সহ করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর সেই ষোল শত কৃষক প্রতিনিধির মনে কোনও সংশয় বা সন্দেহ ছিল না। অন্ততঃ তাহার। তাহা প্রকাশ করে নাই। আমি কনফারেন্সে এক বক্তৃতা করিলাম। তাহার ফলে আমি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিলাম কিনা, বুঝিতে পারিলাম না। কেন না উক্ত নোটিশে আমাকে সাধারণে বক্তৃতা করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল।

সেখান হইতে আমি ষ্টেশনে পিতা ও অগ্রাগ্র পরিবারমণ্ডলীকে আনিতে গেলাম। ট্রেন দেরীতে আসিল এবং তাঁহাদের আগমনের অব্যবহিত পরেই আমি কৃষক ও নাগরিকদের এক মিলিত জনসভায় যোগ দিতে চলিয়া গেলাম। সভার শেষে অত্যন্ত ক্লান্তদেহে রাত্রি ৮টার সময় আমি ও কমলা বাড়ীতে ফিরিতেছিলাম। পিতা ফিরিবার পর আমরা কথা বলার কোনও সুযোগই পাই নাই। আমি জানি, তিনি আমার জগ্ন অপেক্ষা করিতেছিলেন এবং আমিও তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জগ্ন ব্যগ্র হইয়াছিলাম। কিন্তু ফিরিবার পথে আমাদের বাড়ীর নিকট আমাদের গাড়ীখানা থামাইয়া ফেলা হইল এবং আমাকে গ্রেফতার করিয়া তখনই যমুনা নদীর উপর দিয়া নৈনীতে আমার পুরাতন বাসস্থানে লইয়া যাওয়া হইল। কমলা একাকী আনন্দভবনে প্রতীক্ষ্যমান পরিবারবর্গকে সংবাদ দিতে চলিয়া গেল এবং আমি যখন নৈনী জেলের বৃহৎ সিংহদ্বার দিয়া পুনরায় প্রবেশ করিলাম, তখন ঢং ঢং করিয়া ঘড়িতে ৯টা বাজিয়া উঠিল।

যুক্ত প্রদেশে করবন্ধ আন্দোলন

আট দিন অস্থিত্বের পর আমি পুনরায় নৈনীতে ফিরিয়া সেই পুরাতন ব্যারাকে সৈয়দ মামুদ, নস্বদাপ্রসাদ এবং রণজিৎ পণ্ডিতের সহিত মিলিত হইলাম। কয়েকদিন পরে জেলের মধ্যেই আমার বিচার হইল। মুক্তির পরদিন আমি এলাহাবাদে যে বক্তৃতা দিয়াছিলাম তাহার ভিত্তিতে কয়েকটি অভিযোগ উপস্থিত করা হইল। বলাবাহুল্য, আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করিলাম না। কেবলমাত্র আদালতের সম্মুখে একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিলাম। আমাকে সিভিসিয় ১২৪ (ক) ধারায় ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা জরিমানা করা হইল, ১৮৮২ সালের লবণ আইন অনুসারে ছয় মাস কারাদণ্ড ও এক শত টাকা জরিমানা করা হইল এবং ১৯৩০-এর ৬নং অডিনান্স (কি বিষয় তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি) অনুসারে আরও ছয় মাস কারাদণ্ড এবং এক শত টাকা জরিমানা হইল। শেষোক্ত কারাদণ্ড দুইটি একসঙ্গে চলিবে। মোটমোট আমার দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইল এবং জরিমানার টাকা না দিলে আরও পাঁচ মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। এইবার লইয়া আমার পাঁচ বার কারাদণ্ড হইল।

আমার গ্রেফতার ও কারাদণ্ডের ফলে আইন অমান্ত আন্দোলনে সাময়িকভাবে কিছু শক্তিসঞ্চার হইল ও কিছু উৎসাহ লক্ষ্য করা গেল। পিতার জন্মই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। যখন কমলা গিয়া তাঁহার নিকট আমার গ্রেফতারের সংবাদ বাক্ত করিল তখন তিনি আহত হইলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি উঠিয়া ঠাড়াইয়া সম্মুখের টেবিলে করাঘাত করিয়া বলিলেন যে, তিনি এভাবে রোগশয্যায় পড়িয়া থাকিবেন না। তিনি ভাল হইবেন এবং মানুষের মত কাজ করিবেন, এমন দুর্বলভাবে রোগের নিকট আত্মসমর্পণ করিবেন না। এ সঙ্কল্প সাহসিক, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইচ্ছাশক্তি যত প্রবলই হউক না কেন, যে রোগ তাঁহার অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহাকে জীর্ণ করিতেছে, তাহাকে পরাহত করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত নহে। কিন্তু কয়েকদিন আশ্চর্য্য পরিবর্তন দেখা গেল। লোকে তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। তিনি যখন

যুক্ত প্রদেশে করবন্ধ আন্দোলন

এরোডা জেলে ছিলেন তখন হইতে কয়েকমাস ধরিয়া তাঁহার খুতুর সহিত রক্ত পড়িতেছিল। তাঁহার এই সঙ্কল্পের পর সহসা রক্ত বন্ধ হইয়া গেল। কয়েকদিন আর রক্ত পড়িল না। তিনি ইহাতে খুসি হইলেন এবং জেলে আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়া গব্বের সহিত এই ঘটনা বলিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইহা ক্ষণস্থায়ী হইল, কয়েক দিন পরেই বেলীমাট্রায় রক্ত পড়িতে লাগিল এবং তাঁহার রোগ পুনরায় মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। কিন্তু ঐ অল্পকালেই তিনি তাঁহার পুরাতন শক্তি লইয়া নিখিল ভারতীয় আইন অমান্ত আন্দোলনে এক নূতন বেগ সঞ্চার করিলেন। বিভিন্ন প্রদেশের কম্মীরা আসিয়া তাঁহার সহিত পরামর্শ করিলেন এবং তিনি সর্বত্র প্রয়োজন মত উপদেশাদি প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তিনি একটি বিশেষ দিন নির্দিষ্ট করিলেন (নভেম্বর মাসে, উহা আমার জন্মদিন)। যে বক্তৃতার জন্ত আমার কারাদণ্ড হইয়াছে, ঐ বক্তৃতাটি ভারতের সর্বত্র জনসভায় ঐদিন পঠিত হইবে স্থির হইল। নির্দিষ্ট দিনে বহুস্থানে লাঠি চলিল, জোর করিয়া মিছিল ও সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল এবং কেবলমাত্র ঐদিনে দেশের সর্বত্র প্রায় পাঁচ হাজার লোক গ্রেফতার হইল। জন্মদিনের কি চমৎকার অহুষ্ঠান!

পীড়িত পিতার পক্ষে এই ভাবে দায়িত্ব লইয়া শক্তিক্ষয় করা অত্যন্ত অগ্ৰায়। আমি তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইবার প্রার্থনা জানাইলাম। কিন্তু আমি জানিতাম, ভারতে থাকিয়া তাঁহার পক্ষে এরূপ বিশ্রাম অসম্ভব। আন্দোলনের গতির সহিত তাঁহার মনও সর্বদা আলোড়িত থাকিবে এবং লোকেও উপদেশের জন্ত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবে। আমি সেই জন্ত তাঁহাকে রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর এবং জাভা প্রভৃতি অঞ্চলে ছোটখাট সমুদ্র যাত্রার পরামর্শ দিলাম। তিনিও প্রস্তাবটি পছন্দ করিলেন। ঠিক হইল, সমুদ্রযাত্রায় একজন ডাক্তার বন্ধু তাঁহার সঙ্গে থাকিবেন। এই উদ্দেশ্য লইয়া তিনি কলিকাতায় গেলেন এবং সেখানে তাঁহার অবস্থা আরও খারাপ হইল, তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। কলিকাতার উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বরে তিনি কয়েক সপ্তাহ অবস্থান করিলেন, পরিবারস্থ সকলে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। কেবল কমলা কংগ্রেসের কাজের জন্ত এলাহাবাদে রহিয়া গেলেন।

খাজনাবন্ধ আন্দোলনের সহিত আমার সংশ্রবের জন্তই আমাকে পুনরায় তাড়াতাড়ি গ্রেফতার করা হইল। কিন্তু কার্যতঃ কিষণ সম্মেলনের অব্যবহিত পরেই, কৃষক প্রতিনিধিরা এলাহাবাদে থাকিতে থাকিতেই আমাকে গ্রেফতার করার ফলে আন্দোলন যেরূপ সাফল্য লাভ করিল,

আর কিছুতেই তেমন হইতে পারিত না। ইহার ফলে তাঁহাদের উৎসাহ হ্রাস হইল এবং সম্মেলনের সিদ্ধান্তের কথা তাহারা জিলার প্রত্যেক গ্রামে প্রচার করিতে লাগিল। দুই দিনের মধ্যেই জিলার সকলে জানিল,, খাজনাবন্ধ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, এবং সর্বত্রই আনন্দের সহিত ইহা সমর্থিত হইল।

এইকালে আমরা কি করিতেছি, জনসাধারণের নিকট আমরা কি চাহি, এই সম্পর্কিত সংবাদ আদান-প্রদানের বিশেষ বাধা আমরা অনুভব করিতে লাগিলাম। গভর্ণমেন্ট কর্তৃক দণ্ডিত এবং কাগজ বন্ধ হইবার ভয়ে কোন সংবাদপত্রই আমাদের সংবাদ প্রকাশ করিত না। ছাপাখানাগুলি আমাদের বিজ্ঞাপন নোটিশাদি ছাপিত না। চিঠি ও টেলিগ্রাম সেঙ্গর করা হইত এবং প্রায়ই বন্ধ করা হইত। লোক মারফৎ সংবাদ আদান-প্রদানই একমাত্র নির্ভরযোগ্য পন্থা ছিল; কিন্তু তাহাতেও আমাদের সংবাদবাহীরা প্রায়ই গ্রেফতার হইত। এই উপায় অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং ইহাতে শৃঙ্খলাবদ্ধ বহু ব্যবস্থার প্রয়োজন। তবুও এই ব্যবস্থা অনেকাংশে সফল হইল। প্রাদেশিক কেন্দ্র ও জিলা কেন্দ্রের সহিত প্রধান কেন্দ্রের সংবাদ যোগরক্ষা করা সম্ভব হইয়াছিল। সহরে সংবাদ প্রচার করা বিশেষ কঠিন নয়। সাইক্লোষ্টাইল যন্ত্রে মুদ্রিত বহু সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকা বে-আইনীভাবে প্রচারিত হইত এবং লোকে তাহা আগ্রহসহকারে পাঠ করিত। নগরে ঢোলসহরৎ দ্বারা আমাদের ঘোষণা-পত্রগুলি প্রচারিত হইত এবং প্রায়ই ঢুলিকে গ্রেফতার করা হইত। ইহা কেহ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিত না; কেন না, লোকে গ্রেফতার হইতেই চাহে, পলাইতে চাহে না। কিন্তু নাগরিক উপায়গুলি পল্লী অঞ্চলে প্রয়োগ করা চলে না। দূত প্রেরণ করিয়া অথবা বে-আইনী নোটিশ বিলি করিয়া প্রধান প্রধান পল্লীকেন্দ্রের সহিত কতকটা যোগ রাখা সম্ভব হইলেও ব্যবস্থা খুব সন্তোষজনক ছিল না। দূর গ্রামে সংবাদ ছড়াইয়া পড়িতে দেরী হইত।

কিন্তু এলাহাবাদে কিয়ৎ কনফারেন্সের পর এই অসুবিধা অনেকটা দূর হইল। জিলার প্রায় প্রত্যেক প্রধান গ্রাম হইতেই রুষক প্রতিনিধি আসিয়াছিল, তাঁহারা রুষকদের সম্পর্কিত নূতন প্রস্তাব এবং তাহার জগু আমার গ্রেফতারের সংবাদ লইয়া জিলার সর্বত্র ছড়াইয়া দিল। অর্থাৎ খাজনাবন্ধ আন্দোলনের ষোল শত উৎসাহী প্রচারকারী এক দিনেই সমস্ত প্রান্তে সংবাদ প্রচার করিল। আন্দোলনের প্রাথমিক সাফল্য দেখা গেল। সর্বত্রই বুঝা গেল যে, বল প্রয়োগ না করিলে কেহই স্বেচ্ছায় খাজনা দিবে

যুক্ত প্রদেশ করবন্ধ আন্দোলন

না। অবশ্য কি জমিদার কি শাসকবর্গ বল প্রয়োগ করিয়া ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিলে তাহারা সহ্য করিতে পারিবে কি না, তাহা কাহারও পক্ষে বলা কঠিন।

আমরা জমিদার ও প্রজা উভয়কেই খাজনা বন্ধ করিতে বলিয়াছিলাম। মতবাদের দিক দিয়া ইহা শ্রেণী-আন্দোলন নহে, কিন্তু কার্যতঃ জমিদারেরা স্ব স্ব রাজস্ব দিলেন, এমন কি, জাতীয় আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন জমিদারেরাও তাহাই করিলেন। চাপও তাহাদের উপর বেশী এবং ক্ষতির সম্ভাবনা অধিক। যাহা হউক, প্রজারা অটল রহিল এবং খাজনা দিল না। এবং আমাদের সংঘর্ষ কার্যক্ষেত্রে খাজনা বন্ধের আন্দোলনে পর্য্যবসিত হইল। এলাহাবাদ জিলা হইতে ইহা যুক্ত প্রদেশের আরও কয়েকটি জিলায় ছড়াইয়া পড়িল। অত্যাগ্ৰ জিলায় ইহা বিধিবদ্ধভাবে গৃহীত ও ঘোষিত না হইলেও প্রজারা খাজনা দেওয়া বন্ধ করিল অথবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শস্যমূল্য কমিয়া যাওয়ায় অক্ষমতাবশতঃই তাহারা খাজনা দিতে পারিল না। কিন্তু কয়েক মাস ধরিয়া কি জমিদার কি গভর্নমেন্ট কেহই অবাধ্য প্রজাদিগকে ভয় দেখাইবার কোনই চেষ্টা করিলেন না। তাহারা অত্যন্ত অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে পড়িয়াছিলেন। একদিকে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ-নীতি লইয়া রাজনৈতিক সংঘর্ষ, অত্রদিকে অর্থনৈতিক মন্দার জগ্ৰ পল্লী অঞ্চলে কৃষকদের ক্রেশ। এই দুইয়ের মিলিত মুষ্টি দেগিয়া গভর্নমেন্ট কৃষক বিদ্রোহের আশঙ্কায় ভীত হইলেন। লণ্ডনে তখন গোলটেবিল বৈঠক চলিতেছিল, ভারতে অধিকতর অশান্তির সৃষ্টি করা অথবা গভর্নমেন্টের 'প্রতাপ' দেখাইবার বিশেষ আগ্রহ তাহাদের ছিল না।

যুক্ত প্রদেশে করবন্ধ আন্দোলনের এক প্রত্যক্ষ ফল দেখা গেল যে, ইহা আন্দোলনের কেন্দ্রে সহর হইতে পল্লীতে লইয়া গেল এবং ইহা অধিকতর ব্যাপক ও দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপিত হইল। যদিও আমাদের নগরবাসীরা বিরক্ত ও ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং আমাদের মধ্যশ্রেণীর কর্ম্মীরা নিষ্ক্ৰী় হইয়া পড়িতেছিলেন, তথাপি যুক্ত প্রদেশের আন্দোলন শক্তিশালী, এমন কি, পূর্বাপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিল। অত্যাগ্ৰ প্রদেশে আন্দোলনের সহর হইতে পল্লীতে, রাজনীতি হইতে অর্থনীতিতে পরিবর্তিত গতি এতটা দেখা যায় নাই। তাহার ফলে নগর হইতেই আন্দোলন পরিচালিত হইতে লাগিল এবং মধ্যশ্রেণীর কর্ম্মীদের ক্লান্তির জগ্ৰ আন্দোলন অনেকাংশে শিথিল হইয়া পড়িল। এমন কি, যে বোম্বাই সহর আন্দোলনের প্রথম হইতে প্রধান কেন্দ্ররূপে কার্য্য করিতেছিল, তাহার উৎসাহ দীপ্তিও কমিয়া আসিল। কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি অবজ্ঞা, গ্রেফতার প্রভৃতি নানাস্থানে চলিতেছিল বটে, কিন্তু

ইহা কৃত্রিম মনে হইতে লাগিল। সে জীবন্ত ভাব আর রহিল না। ইহা স্বাভাবিক, কেন না, জনসাধারণকে কোন নিষ্টিষ্ট বৈপ্লবিক উচ্চ-গ্রামে দীর্ঘকাল ধরিয়া রাখা কঠিন। সাধারণতঃ ইহা কয়েকদিনের ব্যাপার মাত্র। কিন্তু নিরুপদ্রব প্রতিরোধ-নীতি কয়েকমাস ধরিয়া সমান উৎসাহে কার্য্য করিয়া আশ্চর্য্য শক্তি প্রদর্শন করিয়াছে। এমন কি, অপেক্ষাকৃত নিম্নগ্রামে ইহা অনিশ্চিত কালের জন্ত চালান যাইতে পারে।

গভর্নমেন্টের দমননীতি প্রবল হইল। স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি, যুবক সমিতি প্রভৃতি যাহা এতদিন আশ্চর্য্যভাবে চলিতেছিল, তাহা বে-আইনী ঘোষণা করিয়া দমন করা হইল। রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি জেলখানার ব্যবহার আরও খারাপ হইল। কারামুক্তির অল্পদিন পরেই লোকে পুনরায় কারাদণ্ড লইয়া জেলে ফিরিয়া আসে, এই ব্যাপার দেখিয়া গভর্নমেন্ট বিষম বিরক্ত হইলেন। শাস্তি সত্ত্বেও লোকের তেজ কমে না; ইহাতে শাসকগণের আত্মাভিমান আহত হইতে লাগিল। ১৯৩০-এর নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে জেল-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার অপরাধের চলনায় যুক্ত প্রদেশের জেলসমূহে কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দীকে বেত্রদণ্ড দেওয়া হইল। নৈনী জেলে এই সকল সংবাদ পাইয়া আমরা অত্যন্ত বিচলিত হইলাম। আমি নিজে বেত্রদণ্ডকে অত্যন্ত গণিত বলিয়া মনে করি, আমার মতে অতি দুর্ব্বল অপরাধীকেও এই দণ্ড দেওয়া উচিত নহে। কিন্তু ক্রমে ইহাতে এবং ভারতে ইহাপেক্ষাও শোচনীয় অনেক ব্যাপারে আমরা অভ্যস্ত হইয়া উঠিলাম। তথাপি যুবক ও অল্পবয়স্ক বালকদিগকে সামান্য শৃঙ্খলাভঙ্গের অজুহাতে বেত্রদণ্ড দেওয়া বর্করতা মাত্র। আমাদের ব্যারাকের আমরা চারজন এ বিষয়ে গভর্নমেন্টের নিকট পত্র লিখিলাম। কিন্তু দুই সপ্তাহকাল অপেক্ষা করিয়াও কোন উত্তর পাইলাম না। বেত্রদণ্ডের প্রতিবাদ এবং যাহারা এই বর্কর দণ্ড লাভ করিয়াছে, তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্ত একটা কিছু করা উচিত বলিয়া মনে হইল। আমরা তিনদিন বাহ্যন্তর ঘণ্টা পূর্ণ উপবাস করা স্থির করিলাম। দিনের সংখ্যার দিক দিয়া এই উপবাস কিছুই নহে, কিন্তু আমরা কেহই উপবাসে অভ্যস্ত ছিলাম না, কাজেই আমরা কতদূর পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারিব বুঝিতে পারিলাম না। আমি ইতিপূর্বে কখনও চব্বিশ ঘণ্টার বেশী উপবাস করি নাই।

উপবাসের দিন কয়টা ভালয় ভালয় কাটিল, যতটা ভয় পাইয়াছিলাম, ব্যাপারটা তত গুরুতর নহে। আমি নীরোধের মত ঐ তিন দিনও দোড় ঝাঁপ প্রভৃতি ব্যায়াম করিয়াছিলাম। আমি পূর্বে একটু অস্থস্থ ছিলাম, কাজেই ইহার ফল ভাল হইল না। তিন দিনে আমাদের প্রত্যেকের

যুক্ত প্রদেশ করবন্ধ আন্দোলন

ওজন সাত-আট পাউণ্ড করিয়া কমিয়া গেল। ইহার পূর্বে কয়েক মাসে নৈনৌ জেলে আমাদের প্রত্যেকের ওজন পনের হইতে ছাব্বিশ পাউণ্ড পর্যন্ত কমিয়াছিল।

আমাদের উপবাস ছাড়াও বাহিরে বেত্রদণ্ডের বিরুদ্ধে কিছু আন্দোলন হইয়াছিল। এবং আমার বিশ্বাস, যুক্ত প্রদেশের গভর্ণমেন্ট ভবিষ্যতে বেত্রদণ্ড না দেওয়ার জন্য কারাবিভাগের উপর আদেশ জারী করিয়াছিলেন। কিন্তু এই আদেশ দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। এক বৎসরের কিছু পরেই যুক্ত প্রদেশ ও অন্যান্য প্রদেশের জেলখানায় বেত্রদণ্ডের অপ্রতুল ছিল না।

এই শ্রেণীর সাময়িক চাকল্যের কথা ছাড়িয়া দিলে জেলে আমরা অনেকটা শান্তিতেই বাস করিয়াছি। আবহাওয়া চমৎকার ছিল। এলাহাবাদে শীতকাল অতি মনোরম। আমাদের ব্যারাকে রণজিৎ পণ্ডিতের আগমনে আমাদের ভালই হইল। তিনি বাগান-রচনায় অভিজ্ঞ; অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের ব্যারাকের নীরস প্রাক্ষণ বিবিধ ফুলে ও রঙ্গে ভরিয়া উঠিল। মন কি, তিনি সেই অপরিসর স্থানের মধ্যে একটি গল্ফ খেলিবার গান তৈয়ারী করিলেন।

নৈনৌ জেলে আর একটি দৃশ্য আমাদের চিত্ত হরণ করিত; তাহা হইল এরোপ্লেন। পূর্ব ও পশ্চিমগামী আকাশপথের এলাহাবাদ অন্ততম ঠাঁটি। অষ্ট্রেলিয়া, যাতা, ফরাসী, ইন্দো-চীন প্রভৃতি দেশগামী বড় বড় বিমানপোত নৈনৌতে একেবারে আমাদের ঠিক মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যাইত। সর্বাপেক্ষা বাটাভিয়া যাতায়াতকারী ডাচ বিমানপোতগুলি দেখিতে মনোহর ছিল। যেদিন আমাদের ভাগ্য ভাল, সেদিন শীতের অন্ধকার প্রভাতে আমরা তারকামণ্ডিত আকাশে বিমানপোতের সাক্ষাৎ পাইতাম। উজ্জ্বল আলোকিত পোতের সম্মুখ ও পশ্চাত্তাগে রক্তবর্ণ আলো জ্বলিত। প্রত্যাসন্ন প্রভাতের কৃষ্ণবর্ণ আকাশের পটভূমিকায় ভাসমান বিমানপোত কত সুন্দর দৃশ্য!

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যও অত্র জেল হইতে বদলী হইয়া নৈনৌতে আসিলেন। তাঁহাকে আমাদের ব্যারাক হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হইল, কিন্তু প্রত্যাহই তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইত। বাহিরে তাঁহাকে ত না দেখিয়াছি, এখানে তাঁহাকে বিশেষভাবে দেখিতে পাইলাম। তাঁহার সঙ্গ অত্যন্ত আনন্দের; তাঁহার জীবনের দীপ্তি ও সর্ববিষয়ে যৌবনোচিত উৎসাহ লক্ষ্য করিবার বিষয়। এমন কি, তিনি রণজিতের সাহায্যে জার্মান ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহার স্বত্বশক্তি দেখিয়া আমরা অবাক হইলাম। তাঁহার নৈনৌ থাকা কালেই বেত্রদণ্ডের সংবাদ

আসিয়াছিল, তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া প্রাদেশিক অস্থায়ী গভর্ণরের নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন। কিছু পরেই তিনি পীড়িত হইয়া পড়িলেন। জেলের আবহাওয়ার ঠাণ্ডা তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহার পীড়া কঠিন হইয়া উঠায় তাঁহাকে সহরের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইল; এবং কারাদণ্ড শেষ হইবার পূর্বেই তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইল। সৌভাগ্যক্রমে তিনি হাসপাতালেই আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন।

নববর্ষের প্রথমদিন ১৯৩১-এর ১লা জানুয়ারী সংবাদ পাইলাম, কমলা গ্রেফতার হইয়াছে। তিনি তাঁহার কারারুদ্ধ সহকর্মীদের সহিত মিলিত হইবার জন্য অনেকদিন হইতেই অপেক্ষা করিতেছিলেন বলিয়া এই সংবাদে আমি হুটু হইলাম। আমার স্ত্রী, ভগ্নী ও অন্যান্য নারীরা যদি পুরুষ হইতেন, তাহা হইলে বহু পূর্বেই তাঁহারা গ্রেফতার হইতেন। তৎকালে গভর্ণমেন্ট স্ত্রীলোকদিগকে গ্রেফতার করা যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিতেন বলিয়াই ইহারা এতদিন ধরা পড়েন নাই। এখন তাঁহার আশা পূর্ণ হইল! আমি ভাবিলাম, তিনি নিশ্চয়ই আনন্দিতা হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার শারীরিক অবস্থা স্মরণ করিয়া আশঙ্কা হইল, জেলখানায় তাঁহার বিশেষ কষ্ট হইবে।

তাঁহার গ্রেফতারের সময় একজন সাংবাদিক আসিয়া তাঁহার নিকট একটি ‘বাণী’ চাহিলেন। তিনি মুহূর্তের উত্তেজনায় আত্মহারা হইয়া যে কথা বলিলেন, তাহা তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে অমূরঞ্জিত। ‘আজ আমি আনন্দে বিহ্বল এবং আমার স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছি বলিয়া গর্বিতা। আমি আশা করি, সকলে জাতীয় পতাকা উচ্চে তুলিয়া রাখিবে।’ তিনি যদি একটু চিন্তা করিবার সময় পাইতেন, তাহা হইলে এমন কথা বলিতেন না, কেন না, তিনি পুরুষের অত্যাচার হইতে নারীকে রক্ষা করার একজন নেত্রী ছিলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে পতিব্রতা হিন্দুনারী তাঁহার মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল; এমন কি, পুরুষের অত্যাচারের কথাও তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

কলিকাতায় আমার অস্থস্থ পিতা কমলার গ্রেফতার ও কারাদণ্ডের সংবাদে অতিমাত্রায় বিচলিত হইয়া এলাহাবাদ ফিরিবার সঙ্কল্প করিলেন। তিনি তখনই আমার ভগ্নী কৃষ্ণাকে এলাহাবাদে পাঠাইয়া দিলেন; এবং কয়েক দিন পরে পরিবারবর্গ সহ স্বয়ং এলাহাবাদ যাত্রা করিলেন। ১২ই জানুয়ারী তিনি আমাকে নৈনীতে দেখিতে আসিলেন। দুই মাস পরে আমি তাঁহাকে দেখিলাম। আমার ব্যথিত চিত্তের বেদনা অতি কষ্টে সংবরণ করিলাম।

যুক্ত প্রদেশ করবন্ধ আন্দোলন

তাঁহার চেহারা দেখিয়া আমার মনে যে বিবাদের উদয় হইল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, কলিকাতায় তিনি অনেকটা ভাল হইয়াছেন। তাঁহার মুখ ফুলিয়াছিল; কিন্তু তাঁহার ধারণা, ইহা সাময়িক কারণে ঘটিয়াছে।

তাঁহার সেই মুখখানি বারম্বার মনে পড়িতে লাগিল; উহা তাঁহার স্বাভাবিক মুখ হইতে কত স্বতন্ত্র। জীবনে এই প্রথম আমার মনে তাঁহার জ্ঞাত আশঙ্কা জাগিল—বিপদ সম্মুখে ঘনাইয়া আসিতেছে। আমি চিরদিন তাঁহাকে স্বাস্থ্য শক্তির প্রতীক বলিয়া মনে করিতাম, তাঁহার মৃত্যু আমি চিন্তাই করিতে পারিতাম না। মৃত্যুর কথা লইয়া তিনি হাস্ত-পরিহাস করিতেন এবং আমাদিগকে বলিতেন, আমি আরও দীর্ঘকাল বাঁচিব। শেষদিকে তিনি যৌবনের কোন বন্ধুর মৃত্যুসংবাদ পাইলেই বিয়োগব্যথায় নিজেকে নিঃসঙ্গ বোধ করিতেন এবং উহা প্রত্যাসন্ন অমঙ্গলের ইঙ্গিত বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু অল্পকালেই এই বিষাদ কাটিয়া যাইত, তাঁহার জীবনের প্রাচুর্য্য উছলিয়া উঠিত। তাঁহার তেজস্বী ব্যক্তিত্ব ও সকলের প্রতি মজ্জস্ত স্নেহধারায় আমরা এমন ডুবিয়াছিলাম যে, তাঁহাকে বাদ দিয়া জগৎ ভাবিতেই পারিতাম না।

তাঁহার মুখ স্মরণ করিয়া আমি উদ্বিগ্ন হইলাম, আমার মনে নানা অমঙ্গলের আভাষ ভাসিয়া উঠিল। তথাপি অদূর ভবিষ্যতেই তাঁহার কোন বিপদ ঘটিতে পারে, ইহা ভাবিতে পারিলাম না। কোন অজ্ঞাত কারণে একালে আমার শরীরও ভাল ছিল না।

এইকালে প্রথম গোল টেবিল বৈঠকের শেষ দৃশ্যের অভিনয় চলিতেছিল। আমরা একটু কোতুকের সহিত,—আমার আশঙ্কা হয়, ঘৃণামিশ্রিত কোতুকের সহিত—সেই সকল নাটকীয় উচ্ছ্বাস ও ভঙ্গী দেখিতেছিলাম। ঐ সকল বক্তৃতা, বড় বড় কথা, হুগন্তীর আলোচনা যেমন কৃত্রিম, তেমনই নিষ্ফল। কিন্তু ইহার মধ্যে একটি বাস্তব ঘটনা ছিল। যখন আমাদের দেশে অগ্নি-পরীক্ষা চলিতেছে, অগণিত নরনারী প্রশংসার সহিত কার্য্য করিতেছেন, সেই সময় আমাদেরই কতিপয় স্বদেশবাসী এই সংগ্রামের কথা ভুলিয়া গিয়া বিপক্ষে যোগ দিলেন। জাতীয়তার ছলনাময় আবরণে স্ববিরোধী অর্থনৈতিক স্বার্থগুলি কি ভাবে কার্য্য করিতেছে, কায়েমী স্বার্থবিশিষ্ট লোকেরা কি ভাবে ভবিষ্যতের জ্ঞাত উহা রক্ষা করিবার আশায় জাতীয়তাবাদের নাম উচ্চারণ করিতেছেন, তাহা আমরা স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করিলাম। ইহাদের অনেকে আমাদের সংঘর্ষের বিরোধিতা করিয়াছিলেন; অনেকে নিরপেক্ষভাবে দূরে দাঁড়াইয়া সময় সময় আমাদের

সুনাইতেন, 'যাহারা দূরে দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করে, তাহারাও এক প্রকারে সাহায্য করিতেছে।' কিন্তু লণ্ডন যখন হাতছানি দিল, তখন তাঁহারা, আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, নিজেদের স্বার্থ নিরাপদ করিতে এবং আরও কিছু ভাগ পাইবার আশায় গুটি গুটি গিয়া জমায়েৎ হইলেন। কংগ্রেস ক্রমেই বামপন্থী হইয়া উঠিতেছে এবং জনসাধারণের উপর তাহার প্রভাবও বাড়িতেছে, এই আশঙ্কা অল্পভব করিয়া লণ্ডনে সকলে একসঙ্গে সারি দিয়া দাঁড়াইলেন। যদি ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থার কোন আমূল পরিবর্তন হয়, তাহা হইলে গণ-প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা যাইবে, অন্ততঃপক্ষে তাহারা প্রভাবশালী হইয়া উঠিবে, এবং তাহারা সমস্ত সামাজিক ব্যবস্থা ওলট-পালট করিবার জন্য এমন সব দাবী উপস্থিত করিবে, যাহার ফলে কায়েমী স্বার্থগুলি বিপন্ন হইয়া পড়িবে। এই আতঙ্কজনক সম্ভাবনা অল্পমান করিয়া ভারতীয় কায়েমী স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তির পিছাইয়া গেলেন এবং কোন দূরপ্রসারী রাজনৈতিক পরিবর্তনের বিরোধিতা করিতে লাগিলেন। বর্তমান সামাজিক কাঠামো রক্ষা ও কায়েমী স্বার্থরক্ষার জন্য ব্রিটিশ কর্তৃত্ব থাকা আবশ্যক, এই ধারণা হইতে তাঁহারা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের কথা বলিতে লাগিলেন। একবার একজন দিখাত মডারেট নেতার সহিত আমার কথা হইয়াছিল। আমি বলিয়াছিলাম যে, গ্রেট ব্রিটেনের সহিত আপোষের একটা প্রধান সর্ত এই হওয়া উচিত যে, ব্রিটিশ সৈন্য অতি সম্ভব সরাইয়া লইতে হইবে এবং ভারতীয় সৈন্যদলকে ভারতীয় গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে স্থাপন করিতে হইবে। ইহাতে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন, যদি ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এমন প্রস্তাবে রাজী হন, তাহা হইলে তিনি সর্বান্তঃকরণে তাহার বিরোধিতা করিবেন। যে কোন প্রকার জাতীয় স্বাধীনতার উহাই মূল কথা। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় উহা অসম্ভব বলিয়া নহে, অবাঞ্ছনীয় বলিয়াই তিনি চাহেন না। অবশ্য ইহা ভাবা যাইতে পারে যে, বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কায় তিনি আমাদিগকে রক্ষা করার জন্য ব্রিটিশ সৈন্যের অবস্থিতি চাহেন। এইরূপ বহিঃআক্রমণের আশঙ্কা থাকুক আর নাই থাকুক, যে ভারতীয়ের মধ্যে একটু তেজও অবশিষ্ট আছে তাহার নিকট বিদেশীর আশ্রয় ভিক্ষার চিন্তা কি মর্যাদাসিক রূপে অপমানজনক। কিন্তু আমার মতে ব্রিটিশ বাহুবল ভারতে রাখিবার আগ্রহের অন্তরালে অভিপ্রায় অন্তরূপ। ভারতীয়দের হস্ত হইতেই ভারতীয় কায়েমী স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য, খাটি গণতন্ত্র হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং জনসাধারণের বিদ্রোহ দমনের জন্যই ভারতে ব্রিটিশের অবস্থিতি আবশ্যক।

যুক্ত প্রদেশ করবন্ধ আন্দোলন

এই কারণেই গোল টেবিল বৈঠকের ভারতীয় প্রতিনিধিরা—কেবল প্রগতিবিরোধী ও সাম্প্রদায়িকতাবাদীরাই নহেন—যাঁহারা নিজেদের প্রগতিবাদী ও জাতীয়তাবাদী বলেন, তাঁহারাও নিজেদের সহিত ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের স্বার্থের এক্য আবিষ্কার করিলেন। ন্যাসনালিজম বা জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা ব্যাপক ও বহু প্রকারের। ভারতে যাঁহারা স্বাধীনতার সংঘর্ষে কারাগারে যাইতেছে তাঁহারাও জাতীয়তাবাদী,—আবার যাঁহারা আমাদের কারাধ্যক্ষদের সহিত করমর্দন করিয়া এক সাধারণ পদ্ধতির কথা আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারাও জাতীয়তাবাদী। ইহা ছাড়াও আমাদের দেশে আর একশ্রেণীর সাহসী জাতীয়তাবাদী আছেন, যাঁহারা অনর্গল বক্তৃতা করেন, সকল দিক দিয়া স্বদেশী আন্দোলনে উৎসাহ দেন, বলেন উহাই স্বরাজের মর্ম্মকথা এবং তাঁহাদের স্বদেশবাসীকে ত্যাগ স্বীকার করিয়াও স্বদেশীর পোষকতা করিতে বলেন। সৌভাগ্যক্রমে এই আন্দোলনে তাঁহাদের কোনই ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় না। ইহাতে তাঁহাদের ব্যবসায় ফাঁপিয়া উঠে এবং লাভের অঙ্ক বাড়িয়া যায়। যখন বহুলোক জেলে যায়, লাঠীর আঘাত সহ্য করে, তখন তাঁহারা নিরাপদে কোষাগারে বসিয়া পয়সা গণিয়া তোলেন। পরে যখন উগ্র জাতীয়তাবাদ বিপ্লবস্কুল হইয়া উঠে, তখন তাঁহাদের বক্তৃতাব সুর নরম হয়, তাঁহারা ‘চরমপন্থীদের’ নিন্দা করেন এবং অগ্রপক্ষের সহিত চুক্তি ও আপোষ করেন।

কার্য্যতঃ গোল টেবিল বৈঠকে কি হইল না হইল, তাহা আমরা গ্রাহ্যও করি নাই। উহা বহুদূরের অস্পষ্ট ও কৃত্রিম ব্যাপার মাত্র—আসল সংঘর্ষ আমাদের পল্লী ও নগরে। আমাদের সংঘর্ষ সহজে জয়ী হইবে, এরূপ কোন অসম্ভব প্রত্যাশাও আমাদের মনে ছিল না। সম্মুখের বিপদ সম্বন্ধেও আমাদের স্পষ্ট ধারণা ছিল, কিন্তু ১৯৩০-এর ঘটনাবলীতে জাতীয় সাহস ও শৌর্ধোর উপর আমাদের বিশ্বাস জন্মিল এবং সেই বিশ্বাস লইয়াই আমরা ভবিষ্যতের সম্মুখীন হইলাম।

ডিসেম্বর কি জানুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে একটি ঘটনায় আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। মিঃ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী এডিনবরায় (মনে হয় ; এখানে তাঁহাকে ‘ফ্রিডম অফ্ দি সিটি’ উপহার দেওয়া হইয়াছিল) একটি বক্তৃতায়, ভারতে যাঁহারা আইন অমান্য আন্দোলনে কারাবরণ করিতেছে, তাঁহাদের প্রতি ঘৃণাসূচক উক্তি করিয়াছিলেন। সেই বক্তৃতা এবং যে উদ্দেশ্যে সেই বক্তৃতা করা হইয়াছিল, তাহাতে আমরা মর্ম্মাহত হইলাম। কেন না, রাজনৈতিক মতভেদ সত্ত্বেও আমরা মিঃ শাস্ত্রীকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকি।

গোল টেবিল বৈঠকের উপসংহারে মিঃ রামজে ম্যাকডোনাল্ড তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভ্রাতৃত্বীতির উচ্ছ্বাসে ভরা এক বক্তৃতা করিলেন। এই বক্তৃতার মধ্যে পরোক্ষভাবে কংগ্রেসকে অগ্রায় কার্য্য হইতে বিরত হইয়া স্থখী ও তৃপ্ত বৈঠকী দলের সহিত মিলিত হইবার একটা ইঙ্গিত ছিল। ঠিক এই সময় ১৯৬১-এর জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগে এলাহাবাদে কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির এক বৈঠক হয়; ইহাতে অগ্রায় বিষয়ের সহিত ঐ বক্তৃতার অনুরোধও আলোচিত হইয়াছিল। আমি তখন নৈনী জেলে ছিলাম এবং আমার কারামুক্তির পর ঐ অধিবেশনের বিবরণী পাঠ করিয়াছিলাম। পিতা তখন সদ্য কলিকাতা হইতে ফিরিয়াছেন। তিনি অস্থস্থতা সত্ত্বেও জিদ করিলেন, তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সদস্যদিগকে ঐ বিষয় আলোচনা করিতে হইবে। কে একজন প্রস্তাব করিলেন, মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করা উচিত। এই প্রস্তাবে পিতা উত্তেজিত হইয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, যে পর্য্যন্ত না জাতীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, ততদিন তিনি কিছুতেই আপোষ করিবেন না, যদি আর কেহ না থাকে, তাহা হইলে তিনি একাই আন্দোলন পরিচালন করিবেন। এই উত্তেজনা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত মন্দ, তাঁহার জরের উত্তাপ বাড়িয়া গেল; চিকিৎসকগণ তাঁহাকে একাকী রাখিয়া সদস্যগণকে অনেক কষ্টে অগ্রায় লইয়া গেলেন।

বিশেষভাবে পিতার নির্দেশে কার্য্যকরী সমিতি আপোষের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। এই প্রস্তাব প্রকাশের পূর্বেই শ্রম তেজ বাহাদুর সপ্র এবং মিঃ শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর নিকট হইতে পিতার নিকট একখানি তার আসিল। উহাতে তাঁহার মধ্যস্থতায় কংগ্রেসকে অনুরোধ করা হইয়াছে যে; তাঁহাদের সহিত আলোচনার পূর্বে যেন কোন সিদ্ধান্ত করা না হয়। তখন সদস্যেরা অধিকাংশই স্ব স্ব স্থানে রওনা হইয়া গিয়াছেন। উত্তরে তাঁহাদিগকে জানান হইল যে, কার্য্যকরী সমিতি ইতিপূর্বেই একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। তবে সপ্র ও শাস্ত্রী উপস্থিত হইলে এবং তাঁহাদের সহিত আলোচনার পূর্বে উহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবে না।

জেলের মধ্যে আমরা এই ব্যাপারের কিছুই জানিতাম না। তবে একটা কিছু হইতেছে জানিয়া বরং একটু চিন্তিত হইয়াছিলাম। আমরা তখন আগতপ্রায় ২৬শে জানুয়ারী—স্বাধীনতা দিবসের প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠানের কথাই চিন্তা করিতেছিলাম। পরে আমরা জানিতে পারিলাম যে, দেশের সর্বত্র সভাসমিতি হইয়াছে এবং পূর্বের স্বাধীনতা-সঙ্কল্প সহ

পিতৃ-বিয়োগ

একটি ‘স্মারক প্রস্তাব’* গৃহীত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠান এক স্মরণীয় ঘটনা, কেন না, সংবাদপত্র ও ছাপাখানার সহায়তা পাওয়া যায় নাই, ডাক ও তার বিভাগের মারফতেও কাজ করা সম্ভব হয় নাই। তথাপি একই প্রস্তাব বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় একই সময় দেশের সমস্ত পত্রী-নগরে প্রকাশ জনসভায় গৃহীত হইয়াছিল। অবশ্য অধিকাংশ সভাই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া হইয়াছিল এবং পুলিশও বলপূর্ব্বক উহাদের ভাঙ্গিয়া দিতে চেষ্টার ক্রটি করে নাই।

২৬শে জানুয়ারী নৈনী জেলে বসিয়া আমরা বিগত বৎসর এবং আগামী বৎসরের কথা ভাবিতেছিলাম, এমন সময় দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বকই অকস্মাৎ আমাকে সংবাদ দেওয়া হইল যে, আমার পিতার অবস্থা সঙ্গীন এবং আমাকে এখনই বাড়ী যাইতে হইবে। অনুসন্ধান জানিলাম যে আমাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে। রণজিৎও আমার সঙ্গী হইল।

সেই দিন সন্ধ্যাবেলা সমগ্র ভারতে বিভিন্ন জেলখানা হইতে অনেককে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ইহারা সকলেই কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির মূল সদস্য অথবা স্থলাভিষিক্ত সদস্য। গভর্ণমেন্ট আমাদেরকে অবস্থা বিবেচনা করিবার জন্য সুযোগ দিলেন। অতএব যে ভাবেই হউক আমি সেদিন অপরাহ্নে মুক্তি লাভ করিতামই। পিতার অবস্থার জ্ঞাত কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে মুক্তি পাইলাম মাত্র। কমলাও মাত্র ছাব্বিশ দিন কারাগারে থাকার পর লক্ষ্ণৌ জেল হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। তিনিও কার্য্যকরী সমিতির স্থলাভিষিক্ত সদস্য ছিলেন।

৩৩

পিতৃ-বিয়োগ

দুই সপ্তাহ পর পিতাকে দেখিলাম। ১২ই জানুয়ারী নৈনী জেলে তিনি যখন আমাকে দেখিতে গিয়াছিলেন তখন তাঁহার মুখ দেখিয়া আমি ব্যথিত হইয়াছিলাম। ইতিমধ্যে তাঁহার অবস্থা আরও খারাপ হইয়াছে, মুখ আরও ফুলিয়াছে। কথা বলিতে তাঁহার কষ্ট হয় এবং মনও মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাঁহার প্রবল ইচ্ছাশক্তি কোনমতে দেহ ও মনের কাজ চালাইয়া লইতেছিল।

তিনি আমাকে ও রণজিৎকে দেখিয়া সুখী হইলেন। দুই-এক দিন পর

* পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

রণজিৎকে (সে কার্য্যকরী সমিতির সদস্যতালিকাভুক্ত নহে বলিয়া) নৈনী জেলে ফিরাইয়া লওয়া হইল।

ইহাতে পিতা অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইলেন। তিনি বারে বারে, অভিযোগ করিতে লাগিলেন যে, ভারতের নানা দেশ হইতে লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিতেছে অথচ তাঁহার নিজের জামাতাকে কেন দূরে রাখা হইবে। ডাক্তারেরা ইহাতে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং বুঝিলেন যে ইহাতে পিতার স্বাস্থ্য অধিকতর মন্দ হইবে। তিন-চার দিন পর যুক্ত প্রদেশের গভর্ণমেন্ট রণজিৎকে মুক্তি দিলেন। আমার ধারণা ডাক্তারদের অনুরোধেই ইহা সম্ভব হইল।

২৬শে জানুয়ারী—যেদিন আমি মুক্তি পাইলাম সেই দিনই গান্ধিজীও এরোডা জেল হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। তাঁহাকে এলাহাবাদে পাইবার জন্ত আমি ব্যাকুল হইলাম এবং পিতার নিকট এই সংবাদ দেওয়ায় তিনিও গান্ধিজীর দর্শনলাভের জন্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলেন। মুক্তির পরদিবস বোম্বাই সহরে এক বিশাল জনসভায় গান্ধিজী অভাখিত হইলেন। অত বড় সভা বোম্বাইতে কখনও ইতিপূর্বে কেহ দেখেনাই। ঐদিনই বোম্বাই হইতে যাত্রা করিয়া তিনি গভীর রাত্রে এলাহাবাদে উপস্থিত হইলেন। পিতা তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় জাগিয়া রহিলেন। এবং তাঁহাকে দেখিয়া এবং তাঁহার কয়েকটি কথা শুনিয়া পিতা শান্তি বোধ করিলেন। আমার মাতাও গান্ধিজীর আগমনে আশা-ভরসা পাইলেন।

কার্য্যকরী সমিতির সকল প্রকার সদস্যগণের মুক্তির পর সভার অধিবেশনের নির্দেশের জন্ত তাহারা অপেক্ষা করিতেছিলেন। অনেকে পিতার জন্ত ব্যস্ত হইয়া অবিলম্বে এলাহাবাদে আসিতে চাহিতেছিলেন। এই সকল কারণে এলাহাবাদেই সভার অধিবেশন স্থির হইল। দুই দিনের মধ্যেই প্রায় চল্লিশ জন আসিয়া পৌঁছিলেন, আমাদের বাড়ীর পার্শ্ববর্তী স্বরাজ্যভবনে সভা আরম্ভ হইল। আমি মাঝে মাঝে এই সভায় যোগ দিয়াছি বটে কিন্তু মানসিক দুশ্চিন্তা ও উদ্ভ্রান্তভাবে জন্ত আলোচনায় যোগ দিতে পারি নাই। কি কি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল তাহাও এখন আমার ভাল করিয়া মনে নাই। বোধ হয় তাহারা আইন অমান্ত আন্দোলন চালাইয়া যাইবার অন্তর্কূলেই মত দিয়াছিলেন।

যে সকল পুরাতন বন্ধু এবং সহকর্মী আসিয়াছিলেন তাহারা প্রায় সকলেই সজ্জ কারামুক্ত এবং পুনরায় হয়ত শীঘ্রই কারাগারে ফিরিয়া যাইবেন। তাহারা পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন, অর্থাৎ

পিড়-বিয়োগ

শেষবার দেখা অথবা চিরবিদায় লইবার জন্য উদ্গ্রীব হইলেন। তাঁহার সকালে ও সন্ধ্যায় দুই-তিন জন করিয়া এক এক দলে আসিতেন এবং পিতা একখানি ইজিচেয়ারে বসিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য জিৎ করিতেন। তাহাই হইল, তিনি উঠিয়া বসিলেন। কিন্তু তাঁহার মুখ ভাবলেশহীন, কেন না, মুখ ফুলিয়া উঠায় তাহাতে কোন ভাবের চিহ্ন ফুটিত না। একজনের পর একজন পুরাতন বন্ধু ও সহকর্মী আসিতে লাগিলেন, চিনিবা মাত্র তাঁহার চক্ষু দীপ্ত হইল। তিনি যুক্তকরে মন্তক ঈষৎ নত করিয়া নমস্কার করিতে লাগিলেন। যদিও বেশী কথা বলার সাধ্য তাঁহার ছিল না, তবুও কাহারও সহিত দুই-চারিটি কথা বলিলেন। তাহাতেও তাঁহার অভ্যস্ত রসিকতার অভাব ছিল না। তিনি মরণাহত বুদ্ধ সিংহের মত বসিয়া আছেন, তাঁহার দৈহিক শক্তি একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে, তথাপি সেই সিংহ-গ্রীব পুরুষ আপন গরিমায় অটল। আমি তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিতাম, বিস্মিত হইয়া ভাবিতাম এখন তাঁহার মস্তিষ্কে কি চিন্তা খেলিতেছে; তিনি কি আমাদের আন্দোলনের বিষয় আর ভাবেন না? তিনি যেন নিজের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, ঘটনাস্থলগুলি তিনি সাম্রাজ্যী গুচ্ছাইয়া ধরিতে যান কিন্তু তাঁহার শিথিল মুষ্টি হইতে তাহা খসিয়া পড়ে। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত হতাশ না হইয়া তিনি দেহের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, কখনও বা আমাদের সহিত পরিস্কারভাবে কথা বলিয়াছেন। এমন কি, যখন তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া কথা বলিবার শক্তি বিলুপ্ত হইল তখনও তিনি কাগজে লিখিয়া আমাদের মনোভাব জানাইতেন।

আমাদের ঘরের পাশেই কায্যকরী সমিতির অধিবেশনে তিনি কোনও কৌতূহল প্রদর্শন করিলেন না। পনের দিন পূর্বে ইহা ঘটিলে তিনি কতই না উত্তেজিত হইতেন। কিন্তু এখন তিনি বুঝিলেন যে, এই সকল ঘটনা হইতে তিনি অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছেন। একদিন তিনি গান্ধিজীকে বলিলেন, ‘মহাত্মাজী, আমি শীঘ্রই চলিয়া যাইতেছি, আমি স্বরাজ চক্ষে দেখিব না, কিন্তু আমার বিশ্বাস আপনি স্বরাজ লাভ করিবেন এবং শীঘ্রই উহা পাইবেন।’

অন্যান্য নগর ও প্রদেশ হইতে সমাগত ব্যক্তিরা চলিয়া গেলেন। গান্ধিজী ও কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং নিকটাত্মীয়েরা রহিলেন, আর রহিলেন তিন জন বিখ্যাত চিকিৎসক। ইহারা পিতার পুরাতন বন্ধু। ইহাদের সম্বন্ধে পিতা বলিতেন যে তাঁহাদের হস্তেই তিনি স্বীয় দেহ সমর্পণ করিয়াছেন—ডাঃ আন্দারী, বিধানচন্দ্র রায় এবং জীবরাজ মেহতা। ৪ঠা

ক্ষেত্রয়ারী প্রভাতে তাঁহার অবস্থা একটু ভাল বোধ হইল। এই সুযোগে আমরা তাঁহাকে লক্ষ্মী স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করিলাম। কেন না, এলাহাবাদে এক্স-রে চিকিৎসার ভাল ব্যবস্থা ছিল না। সেই দিনই মোটর গাড়ী করিয়া আমরা তাঁহাকে লইয়া যাত্রা করিলাম। গান্ধিজী ও এক বৃহৎ দল আমাদের পশ্চাতে আসিতে লাগিলেন। আমরা খুব ধীরে চলিতেছিলাম তথাপি তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। পরদিন তাঁহার ক্লান্তি না থাকিলেও কতকগুলি মন্দ উপসর্গ দেখা দিল। তার পরদিন ৬ই ক্ষেত্রয়ারী প্রভাতে আমি তাঁহার শঙ্কাপূর্ণ বসিয়া আছি, সমস্ত রাত্রি তিনি যন্ত্রণা ও অশান্তিতে কাটাইয়াছেন, সহসা আমি লক্ষ্য করিলাম তাঁহার মুখ প্রশান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল, জীবনযুদ্ধের শেষ রশ্মি যেন মিলাইয়া গেল। আমি ভাবিলাম তিনি নিদ্রিত হইলেন। আমি একটু আশ্বস্ত হই হইলাম কিন্তু আমার মাতার পর্যবেক্ষণ-শক্তি তীক্ষ্ণ। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, আমি মুহূর্ত্তে তাঁহাকে সাহুনা দিয়া বলিলাম, পিতা ঘুমাইতেছেন, তাঁহাকে বিরক্ত করিও না। কিন্তু সেই ঘুমই তাঁহার শেষ ঘুম, যাহা আর কখনও ভাঙ্গে না।

আমরা সেইদিনই তাঁহার দেহ লইয়া মোটর গাড়ীতে এলাহাবাদ যাত্রা করিলাম। গাড়ীতে আমি ও পিতার প্রিয় ভৃত্য রহিলাম, রণজিৎ গাড়ী চালাইতে লাগিল। আমাদের গাড়ীর পিছনের গাড়ীতে মাকে লইয়া গান্ধিজী আসিতে লাগিলেন, তৎপশ্চাতে অগ্ন্যাত্ত গাড়ী। সমস্ত দিন আমি আবিষ্টবৎ রহিলাম, কি যে ঘটিল কিছুই বুঝিতে পারিলাম না—পরবর্ত্তী কাজকর্ম এবং বৃহৎ জনতার মধ্যে কিছু ভাবা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। দুঃসংবাদ শুনিয়া সমবেত বিরাট জনতা ভেদ করিয়া দ্রুত লক্ষ্মী হইতে এলাহাবাদ যাত্রা—জাতীয় পতাকায় আবৃত দেহের পার্শ্বে আমি বসিয়া, গাড়ীর উপর জাতীয় পতাকা উদ্ভীন; এলাহাবাদে আগমন, তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্ত দূর দূরান্তর হইতে সমাগত বৃহৎ জনসমষ্টি!

বাড়ীতে শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকাণ্ডের পর শবযাত্রা গঙ্গাতীরে অভিমুখে চলিল, পশ্চাতে চলিল বিশাল জনতা। শীতের সন্ধ্যায় নদীতীরে অন্ধকার নামিয়া আসিল, চিতাঘ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল। যে দেহ আমাদের সর্বস্ব ছিল, যাহা ভারতের কোটি কোটি নরনারীর প্রিয় ছিল, তাহা দেখিতে দেখিতে অগ্নিশিখা ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। গান্ধিজী আবেগময়ী ভাষায় জনতাকে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলিলেন, তারপর আমরা সকলে নীরবে গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। সেই শ্রীহীন শূণ্যতার উল্কে আকাশে তারকারাজি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পিতৃ-বিয়োগ

আমার মাতা ও আমার নিকট সহস্র সহস্র সমবেদনাজ্ঞাপক তার ও পত্র আসিতে লাগিল। লর্ড এবং লেডী আকুইন মাতার নিকট সৌজন্যপূর্ণ সহবেদনাজ্ঞাপক পত্র লিখিলেন। দেশের চারিদিক হইতে অজ্ঞাত সহায়ভূতি ও কল্যাণকামনায় আমাদের দুঃখ অনেকাংশে প্রশমিত হইল। কিন্তু সর্বোপরি গান্ধিজীর উপস্থিতির ফলেই আমার মাতা এই শোকান্বেগ সহ্য করিতে পারিলেন এবং আমরা জীবনের এই সঙ্কটের মুহূর্ত্তে বললাভ করিলাম।

তিনি যে চলিয়া গিয়াছেন এ কথা আমি ভাবিতেই পারি না। তিন মাস পর সিংহলের নিউয়ারা ইলিয়া নামক স্থানে আমি স্ত্রী ও কন্যাসহ কিছুদিন ছিলাম। স্থানটি আমার ভাল লাগিল, সহসা মনে পড়িল এখানকার জলহাওয়া পিতার পক্ষেও ভাল হইবে। তাঁহাকে এখানে আনিলে কেমন হয়? আমি তাঁহাকে এলাহাবাদে তার করিতে উত্তত হইয়াছিলাম।

সিংহল হইতে এলাহাবাদে ফিরিয়া আমি একদিন একখানি আশ্চর্য্য পত্র পাইলাম। খামের উপর পিতার হস্তাক্ষরে নাম ঠিকানা লেখা, এবং পত্রখানির সর্বোঙ্গে বিভিন্ন পোষ্টাফিসের ছাপ। আমি আশ্চর্য্য হইয়া পত্রখানি খুলিয়া দেখি, ১৯২৬-এর ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে পিতাই আমাকে ঐ পত্র লিখিয়াছিলেন। ১৯৩১-এর গ্রীষ্মকালে অর্থাৎ সাড়ে পাঁচ বৎসর পরে সেই পত্র আমার হাতে আসিল! ১৯২৬-এ আমার ও কমলার ইউরোপ যাত্রার প্রাক্কালে পিতা ঐ পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, উহাতে বোম্বাই-এর ইটালীয়ান লয়েড ষ্টিমারের ঠিকানা ছিল। উহা সময়মত আমাদের হাতে না আসায় বহুস্থান ঘুরিয়াছে; বহু পোষ্টাফিসের খোপের মধ্যে অনেকদিন বিশ্রাম করিয়াছে, তারপর হয়ত কোন উৎসাহী কর্মচারী উহা আমার নিকট ফেরৎ পাঠাইয়াছেন। আশ্চর্য্য এই, উহা আশিস-লিপি।

দিল্লী-চুক্তি

আমার পিতার যে দিন মৃত্যু হয়, সেই দিন ঠিক সেই সময়ে গোল টেবিল বৈঠকের একদল ভারতীয় প্রতিনিধি বোম্বাই বন্দরে অবতরণ করিলেন। শ্রুত তেজবাহাদুর সফ্র ও মিঃ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী এবং আরও কয়েকজন (আমার ভাল মনে নাই) সোজা এলাহাবাদ চলিয়া আসিলেন। গান্ধিজী ও কার্য্যকরী সমিতির কয়েকজন সদস্য তখন এলাহাবাদে ছিলেন। আমাদের বাড়ীতে কয়েকটি ঘরোয়া বৈঠকে গোল টেবিল বৈঠকে কতদূর কি হইয়াছে, তাহা আলোচনা হইল। আরম্ভে একটি ঘটনা ঘটিল। মিঃ শাস্ত্রী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এডিনবরায় যাহা বলিয়াছিলেন, সে জগৎ দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তিনি আরও বলিলেন যে তিনি সর্বদাই পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা প্রভাবান্বিত হন এবং তাঁহার ‘উচ্ছ্বসিত বাগাড়ম্বরের’ বাধ থাকে না।

প্রতিনিধিরা গোলটেবিল বৈঠক সম্বন্ধে এমন নূতন কিছু বলিতে পারিলেন না, যাহা আমরা পূর্বে হইতে জানিতাম না। তাঁহারা আমাদেরকে যবনিকার অন্তরালে নানা ষড়যন্ত্রের কথা বলিলেন, অমুক লর্ড অথবা অমুক শ্রুত ব্যক্তিগতভাবে কি কি বলিয়াছেন, তাহাও আমরা শুনিলাম। আমাদের মডারেট বন্ধুরা সর্বদাই মূলনীতি কিম্বা ভারতের বাস্তব অবস্থা অপেক্ষা বড় বড় সরকারী কর্মচারীদের ব্যক্তিগত কথাবার্তা গল্পগুজবকে বেশী গুরুত্ব দিয়া থাকেন। মডারেট নেতাদের সহিত ঘরোয়া আলোচনায় কোন কিছু মীমাংসা হইল না এবং গোল টেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্তগুলি যে মূল্যহীন, আমাদের সেই পূর্বে ধারণাই অধিকতর বদ্ধমূল হইল। একজন প্রস্তাব করিলেন, কে তাহা হুগিয়া গিয়াছি, যে, গান্ধিজী বড়লাটের নিকট পত্র লিখিয়া সাক্ষাৎ প্রার্থনা করুন এবং খোলাখুলি ভাবে সব বিষয় আলোচনা করুন। তিনি সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু বুঝা গেল, ফল সম্বন্ধে বেশী আশান্বিত হইলেন না। নিজের ভূমি তাগ করিয়াও প্রতিপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ ও যে কোন বিষয় আলোচনা করা তাঁহার চিরাচরিত নীতি। নিজের দাবীর সত্যতা সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দেহ বলিয়া

দিল্লী-চুক্তি

অপর পক্ষকে তাহা বুঝাইবার জন্য তিনি সততই প্রস্তুত। সম্ভবতঃ তাঁহার লক্ষ্য কেবল মাহুষের বৃদ্ধি নহে, তিনি হৃদয়ের পরিবর্তনে বিশ্বাসী; ক্রোধ ও অবিশ্বাসের বাধা অতিক্রম করিয়া তিনি অপরের শুভেচ্ছা ও সংপ্রসূতির নিকট আবেদন উপস্থিত করেন। তিনি বিশ্বাস করেন, এই পরিবর্তন সাধনের দ্বারাই নিজের মত অপরকে বুঝান সহজ। যদি তাহা সম্ভব না হয়, তাহা হইলেও বিরুদ্ধতার উগ্রত, কমিয়া যায় এবং সংঘর্ষের মধ্যে তীব্রতা থাকে না। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এই উপায়ে তাঁহার অনেক বিরুদ্ধবাদীকে নিরস্ত করিয়া কেবলমাত্র ব্যক্তিত্বের প্রভাবে জয়লাভ করিয়াছেন। অনেক সমালোচক ও নিন্দুক তাঁহার বিশাল ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে থাকিয়া তাঁহার গুণানুরাগী হইয়াছেন এবং তাহার পরও সমালোচনা করিলে সে সমালোচনা আর বন্ধ থাকিত না।

নিজের এই শক্তি সম্পর্কে সচেতন গান্ধিজী সর্বদাই ভিন্নমতাবলম্বীদের সহিত সাক্ষাতের সুযোগ পাইলে আনন্দিত হন। কিন্তু ছোটখাট ব্যাপার লইয়া ব্যক্তিবিশেষের সহিত বুঝাপড়া কবা এক কথা, আর নৈর্ব্যক্তিক, বিজয়ী সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে দাঁড়ান আর এক কথা। ইহা অনুভব করিয়াই গান্ধিজী লর্ড আর্কইনের সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্কে বেশী আশাব্যিত হন নাই। আইন অমান্য আন্দোলন তখনও চলিতেছিল; তবে গভর্নমেন্টের সহিত আপোষ প্রস্তাব আলোচনা হইতেছিল বলিয়া তাহার গতিবেগ মন্দীভূত হইয়াছিল।

অল্প সময়ের মধ্যেই সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইল, গান্ধিজী দিল্লী চলিয়া গেলেন; আমাদেরকে বলিয়া গেলেন যে, যদি বড়লাটের সহিত আলোচনায় কোন সাময়িক আপোষের অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তিনি কার্য্যকরী সমিতির সদস্যদিগকে ডাকিয়া পাঠাইবেন। কয়েকদিন পরেই আমরা দিল্লী হইতে আহ্বান পাইলাম। সুদীর্ঘ ও ক্লান্তিজনক আলোচনায় আমরা দিল্লীতে তিন সপ্তাহ অতিবাহিত করিলাম। গান্ধিজী প্রায়ই লর্ড আর্কইনের সহিত দেখা করিতে লাগিলেন, মাঝে মাঝে তিন-চার দিন আলোচনা বন্ধ থাকিত। সম্ভবতঃ ভারত গভর্নমেন্ট ঐ সময় লণ্ডনে ভারত সচিবের দপ্তরের সহিত কথাবার্তা চালাইতেন। কখনও বা অতি সামান্য বিষয় কি একটি শব্দ লইয়া মতভেদের ফলে কথাবার্তা অগ্রসর হইত না। আইন অমান্য আন্দোলন 'স্বগিত' রাখা ঐরূপ একটি শব্দ। গান্ধিজী এই কথাটা প্রথম হইতে স্পষ্ট করিয়া লইয়াছিলেন যে, নিরুপদ্রব প্রতিরোধ নীতি চূড়ান্তভাবে বন্ধ বা প্রত্যাহার করা যাইতে পারে না, কেন না, জনসাধারণের হস্তে ইহাই একমাত্র অস্ত্র। তবে অবশ্যই ইহা

স্বগিত রাখা যাইতে পারে। লর্ড আর্কইন এই শব্দটিতে আপত্তি করিলেন, গান্ধিজী রাজী হইলেন না। অবশেষে ‘আপাততঃ প্রত্যাহার’ শব্দটি গৃহীত হইল। বিদেশী বস্ত্রের দোকান এবং আবগারী দোকানে পিকেটিং সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা হইল। অধিকাংশ সময়ই চুক্তির সর্ভগুলি আলোচনায় ব্যস্ত হইল। কিন্তু মূল বিষয়ে বিশেষ কোন কথা হইল না। সম্ভবতঃ মনে করা হইয়াছিল যে, চুক্তি হইয়া গেলে এবং সংঘর্ষ বন্ধ হইলে অধিকতর অল্পকূল আবহাওয়ায় ঐ সব বিষয় আলোচনা করা যাইবে। আমরা ইহাকে যুদ্ধ-বিরতির সন্ধি রূপেই দেখিলাম। যাহার ফলে আসল ব্যাপারগুলি পরে আলোচিত হইতে পারিবে।

এই কালে দিল্লীতে নানা শ্রেণীর ব্যক্তি আসিয়াছিলেন। অনেক বিদেশী সাংবাদিকও উপস্থিত ছিলেন। ইহাদের অধিকাংশ আমেরিকান। ইহারা আমাদের নীরবতা দেখিয়া বিরক্ত হইতেন এবং বলিতেন যে, গান্ধী-আর্কইন কথাবার্তা সম্পর্কে তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা নয়াদিল্লীর দপ্তরখানা হইতে বেশী সংবাদ পাইয়া থাকেন। কথাটা সত্য। অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বাস্তবসম্মত হইয়া গান্ধিজীর নিকট শ্রদ্ধানিবেদন করিতে আসিতেন, কেন না, মহাত্মাজীর যে তখন দিন কিরিয়াছে। যাহারা গান্ধিজী ও কংগ্রেস হইতে দূরে সরিয়া থাকিতেন, এমন কি, মাঝে মাঝে সিদ্ধান্ত করিতেন, আজ তাঁহারাই আসিয়া পূর্বের ভুল সংশোধন করিতেছেন। এ এক কৌতুককর দৃশ্য! কংগ্রেস যেন ভাল কাজই করিয়াছে, এবং ভবিষ্যতে আরও কি করিবে কে জানে? যাহাই হউক, এখন কংগ্রেস ও তাঁহার নেতাদের সহিত সম্ভাব রক্ষা করাই নিরাপদ। এক বৎসর পরে ইহারা পুনরায় বদলাইলেন। কংগ্রেসের প্রতি এবং ইহাব সকল কাজের প্রতি তাঁহাদের তীব্র ঘৃণা উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যে কংগ্রেসের ত্রিসীমারেও নাই তাহাও প্রচার করিতে ভুলিলেন না।

এমন কি, সাম্প্রদায়িকতাবাদীরাও ঘটনা দেখিয়া উত্তেজিত হইলেন। হয়ত ইহার পর তাঁহাদের আর গুরুত্ব থাকিবে না ভাবিয়া শঙ্কিত হইলেন। তাঁহাদের অনেকে মহাত্মার নিকট আসিয়া বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহারা সাম্প্রদায়িক সমস্যা মিটাইয়া কেলিবার জুগ সর্বদাই প্রস্তুত। তিনি যদি স্বয়ং এ বিষয়ে উদ্যোগী হন তাহা হইলে আপোষ মীমাংসার কোন বিষয়ই হইবে না।

ছোট-বড় সর্বশ্রেণীর মানুষ অবিশ্রান্ত শ্রোতের মত ডাঃ আম্ভারীর বাড়ীতে আসিতে লাগিল। এইখানে গান্ধিজী ও আমরা অধিকাংশই ছিলাম। আমরা অবসরকালে এই সকল ব্যক্তিকে কৌতুকের সহিত

দিল্লী-চুক্তি

লক্ষ্য করিতাম এবং অনেক অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করিতাম। কয়েক বৎসর ধরিয়া আমরা সহর ও পল্লীর গরীব লোক এবং জেলের বাসিন্দাদের সংস্পর্শে আসিয়াছি। গান্ধিজীর দর্শনার্থী দলী ভ্রমহোদয়গণের মধ্যে আমরা মানব-চরিত্রের আর একটি দিক দেখিলাম। যেখানে শক্তি ও সাক্ষ্য সেই স্থানেই এই সকল ব্যক্তি নত হইয়া সহাস্ত মুখে অভিবাদন জ্ঞাপন করেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই ভারতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের অতি বিখন্ত স্তম্ভ। ইহা শুনিয়া আমরা সুখী হইলাম যে বৃষ্টি, ভারতে যে কোনও গভর্ণমেণ্টেরই তাঁহারা অল্পরূপ বিখন্ত স্তম্ভ হইতে পারেন।

এই সময়ে আমি নয়া দিল্লীতে প্রাতঃভ্রমণের সময় গান্ধিজীর সঙ্গী হইতাম। এই সময় ছাড়া তাঁহার সহিত কথা বলিবার অবসর ঘটিত না। বাকী সমস্ত দিন টুকরা টুকরা করিয়া ব্যক্তি ও বিষয়ের জন্ত পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট হইয়া থাকিত। এমন কি, কোন বিদেশী দর্শনার্থী অথবা ব্যক্তিগত উপদেশপ্রার্থী বন্ধুর জন্ত প্রাতঃভ্রমণেরও সুবিধা হইয়া উঠিত না। আমরা অতীত, বর্তমান এবং বিশেষভাবে ভবিষ্যতের অনেক ব্যাপার লইয়া আলোচনা করিতাম। আমার মনে আছে, কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁহার ধারণা শুনিয়া আমি অবাক হইয়াছিলাম। স্বাধীনতা আসিবার সঙ্গে সঙ্গে অধুনাতন কংগ্রেসও স্বাভাবিকভাবে বিলুপ্ত হইবে আমি এইরূপ কল্পনা করিতাম। কিন্তু তাঁহার মতে কংগ্রেস চলিবে—কিন্তু একটি সত্ত্ব। কংগ্রেস স্বেচ্ছায় এই ত্যাগ বরণ করিয়া লইবে যে, ইহার কোনও সদস্য রাষ্ট্রের অঙ্গীনে বেতন লইয়া চাকুরী স্বীকার করিবে না। যদি কেহ এরূপ করিতে চাহে, তাহা হইলে তাহাকে কংগ্রেস পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিভাবে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন আমি এখন তাহা স্মরণ করিতে পারিতেছি না, তবে ইহার অন্তরালে আসলে এই ভাব ছিল যে, কংগ্রেস যদি নিঃস্বার্থ বৃদ্ধি লইয়া মুক্ত থাকে, তাহা হইলে শাসন বিভাগ ও অগ্ন্যাগ্ন বিভাগের উপর নৈতিক চাপ দিতে পারিবে, যাহার ফলে ঐগুলি গ্রাযপথ হইতে দ্রষ্ট হইবে না।

কিন্তু এই আশঙ্কা ভাবের আমি কোনও মশ্ম গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বিশ্লেষণ করিতে গেলে প্রশ্নটি আরও জটিল হইয়া উঠে। আমার মনে হয় যে, যদি এরূপ কোনও সম্মেলন স্থাপন করা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে তাহাকে কোন না কোনও কায়েমী স্বার্থবাদী নিজের সুবিধার জন্ত প্রয়োগ করিবে। ইহার কার্যকারিতা বাদ দিলেও ইহা হইতে গান্ধিজীর চিন্তাধারার মূল ভিত্তি কতক পরিমাণে বৃষ্টিবার সুবিধা হয়। কতকগুলি পূর্বনির্দিষ্ট আদর্শ লইয়া রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ঢালিয়া সাজিবার

জওহরলাল নেহরু

জগৎ রাষ্ট্রের ক্ষমতা গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যেই দল গঠন করিবার যে আধুনিক ধারণা, গান্ধিজীর ধারণা তাহার বিপরীত। অথবা যাহারা এখনও অধিকসংখ্যক গাধার জগৎ সর্বাধিক গাজর দিবার (মিঃ আর, এইচ, টনি কথিত) মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া দল গঠন করেন, ইহা তাহারও বিপরীত।

গণতন্ত্র সম্পর্কে গান্ধিজীর ধারণা দৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সাধারণতঃ প্রতিনিধিত্ব, সংখ্যাগরিষ্ঠ অথবা জনসংখ্যার সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক নাই। ইহার ভিত্তি হইল ত্যাগ ও সেবা, ইহার শক্তি নৈতিক। সম্প্রতি এক বিবৃতিতে * তিনি গণতন্ত্রীর সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি নিজেকে ‘আজন্ম গণতন্ত্রী’ বলিয়া দাবী করেন। ‘যদি কেহ মনুষ্য জাতির দরিদ্রতমদের সহিত সম্পূর্ণ একাত্মবোধ করিতে পারে, তাহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জীবনে প্রলুব্ধ না হয়, এবং নিজের শক্তি সামর্থ্য অহুসারে তাহাদের স্তরে থাকিবার জগৎ সচেতনভাবে চেষ্টা করে, তাহা হইলেই সে গণতন্ত্রী হইতে পারে ; আমি ইহাই বলিতে চাই।’ গণতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন,—

‘কংগ্রেস যে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানরূপে মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে তাহার কারণ বাৎসরিক অধিবেশনে সমাগত প্রতিনিধি ও দর্শকবৃন্দ নহে।’ পরন্তু তাহার ক্রমবদ্ধিত সেবার দ্বারাই উহা লাভ করিয়াছে। পাশ্চাত্য গণতন্ত্র যদি এখনও ব্যর্থ না হইয়া থাকে তবুও ইহা এক মহাপরীক্ষার সম্মুখীন। প্রকৃত গণতন্ত্র-বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়া জগতের সম্মুখে তাহার সাফল্য প্রমাণ করিবার ভার ভারতবর্ষের উপরই অর্পিত।’

‘গণতন্ত্র হইতে দুর্নীতি যে অপরিহার্যরূপে উদ্ভূত হইবে এমন কোন কথা নাই, অবশ্য বর্তমানে ঐগুলি আছে নিঃসন্দেহ। সংখ্যার গুরুত্ব গণতন্ত্রের প্রকৃত মাপকাঠি নহে। অল্পসংখ্যক লোকও যদি জনসাধারণের আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং উদ্দেশ্যকে যথাযথ ভাবে ব্যক্ত করিতে পারে তবে তাহার সহিত গণতন্ত্রের কোন অসঙ্গতি নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, গণতন্ত্র কখনও বলপূর্বক প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে না। গণতন্ত্রের আদর্শ কখনও বাহির হইতে বলপূর্বক চাপাইয়া দেওয়া যায় না, ইহা ভিতর হইতেই মূর্ত্ত হয়।’ ইহা নিশ্চয়ই পাশ্চাত্য গণতন্ত্র নহে, তিনি নিজেও তাহা বলিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কম্যুনিষ্টদের গণতন্ত্রের ধারণার সহিত ইহার কিছু সাদৃশ্য আছে, কেন না, তাহাতেও কিঞ্চিৎ

দিল্লী-চুক্তি

দার্শনিকতার রেশ বিद्यমান। জনসাধারণ জাহুক আর নাই জাহুক মুষ্টিমেয় কমানিষ্ট তাহাদের প্রকৃত অভাব ও আকাজক্ষার প্রতিনিধিত্ব দাবী করিতে পারে। জনসাধারণ তাঁহাদের নিকট একাট দার্শনিক অহুভূতি মাত্র এবং এই কারণেই তাঁহারা প্রতিনিধিত্বের দাবী করেন। বাহা হউক, এই সাদৃশ্য এত অল্প যে, ইহা আমাদেরকে অধিক দূরে লইয়া যায় না। দৃষ্টিভঙ্গী ও বিষয় বিচার করিবার প্রণালীর মধ্যে গুরুতর পার্থক্য বিद्यমান। কার্যপদ্ধতি ও বাহুবল সম্পর্কে পার্থক্যও স্মরণীয়।

গান্ধিজী গণতন্ত্রী হউন আর নাই হউন, তিনি ভারতের কৃষক-সাধারণের প্রতিনিধি, এই কোটি কোটি নর-নারীর চেনন ও অচেনন আকাজক্ষার তিনিই ঘনীভূত মূর্তি। তাঁহাকে প্রতিনিধি বলিলে ঠিক বলা হয় না,—তিনি বিশাল জনসংখ্যার দৃষ্টিতে আদর্শের দেহধারী প্রতীক। অবশ্য তিনি সাধারণ কৃষকের মত নহেন। তিনি তীক্ষ্ণ হৃদয় অহুভূতিপ্রবণ স্বকচিসম্পন্ন ও দূরদর্শী। মানবস্থলভ কোমলতা সত্ত্বেও তিনি কঠোর তপস্বী; ইচ্ছিয় পরতন্ত্রতা ও বিষয়ভোগ স্পৃহাকে তিনি সংযত করিয়া উহা উন্নততর অধ্যাত্ম সাধনায় নিয়োজিত করিয়াছেন। তাঁহার অবশ্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব কৃষকের মত সকলকে আকর্ষণ করে, মানুষ স্বেচ্ছায় তাঁহার নিকট আত্ম-সমর্পণ করে, আলুগতা স্বীকার করে। এই সকল গুণ সাধারণ কৃষকের দৃষ্টি লইয়াই তিনি ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ্য করেন, জীবনের কতকগুলি ব্যাপারে কৃষকদের মতই তাঁহার স্বক আনুরক্তি আছে। ভারতের অধিকাংশই কৃষক এবং তিনি তাঁহার ভারতবর্ষকে উত্তমরূপে জানেন, উহার নাড়ীর প্রত্যেক চাঞ্চল্য তাঁহার অহুভূতিতে প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করে, প্রত্যেকটি ব্যাপারে তাঁহার অনুমান ভ্রমহীন এবং সময় অহুকূল বুঝিবামাত্র কাজ করিবার তাঁহার দক্ষতা অহুপম।

কেবল ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের দৃষ্টিতে নহে, অনেক ভারতবাসী এবং তাঁহার ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের দৃষ্টিতেও তিনি দুর্বোধ্য প্রহেলিকা। অগ্র কোন দোষ জন্মিলে হয় ত কেহ তাঁহাকে আমলেই আনিত না; কিন্তু ভারতবর্ষ অবতারকল্প ধার্মিক পুরুষ, যিনি পাপমুক্তি, অহিংসার কথা বলেন, তাহাকে গ্রহণ করিতে, বরণ করিতে পারে। ভারতের পুরাণসমূহ ঋষি মুনি তপস্বীদের কাহিনীতে পূর্ণ, যাঁহারা তপঃপ্রভাবে বাহু জগতের ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন, রাজ্য ও রাজ্য ভাঙিয়াছেন, গড়িয়াছেন। গান্ধিজীর আশ্চর্য উৎসাহ ও অন্তর্নিহিত শক্তি দেখিয়া আমার বিশ্বয়মুক্ত চিত্তে ঐ সকল পৌরাণিক কাহিনীর কথা উদয় হইত; মনে হইত যেন এক অফুরন্ত অধ্যাত্ম-শক্তির ভাণ্ডার হইতে উহা উৎসারিত হইতেছে। জগতের সাধারণ ছাঁচে

তিনি গঠিত নহেন ; তিনি স্বতন্ত্র, তিনি অস্থপম ; মাঝে মাঝে তাঁহার দৃষ্টিতে অজানার আভাষ ফুটিয়া উঠে ।

ভারতের নব-নাগরিক সভ্যতা ও কল-কারখানার আধুনিক জীবনের উপরও কৃষক-ভারতের সুস্পষ্ট ছাপ রহিয়াছে । যিনি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট হইয়াও ভারতবর্ষেরই সন্তান তাঁহাকে এই নবীন ভারতও আদর্শ ও নেতাক্রমে গ্রহণ করিয়াছে, তিনি বিন্দুতপ্রায় প্রাচীন স্মৃতি জাগ্রত করিয়াছেন, ভারতবাসীর দৃষ্টির সম্মুখে ভারতের আত্মাকে উন্মুক্ত করিয়াছেন । বর্তমানের দুঃখভারজর্জরিত ভারত যখন অতীত ও ভবিষ্যতের অস্পষ্ট স্বপ্ন লইয়া নৈরাশ্রুক বিলাপের মাঝে সাস্থনা খুঁজিতেছিল, তখন তিনি আসিয়া আশার বাণী শুনাইলেন, দেশ ও মনে শক্তি সঞ্চার করিলেন,— তাঁহার দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ রঙ্গীন হইয়া উঠিল । একদিকে অতীত, অগ্নাদিকে ভবিষ্যৎ ; বর্তমান এ ভারত দুইকেই একত্র করিবার চেষ্টা করিতে উদ্যত হইল ।

ভারতের এই কৃষক-জীবনধারা হইতে আমরা অনেকেই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি ; প্রাচীন ধারার চিন্তা, প্রথা, নিয়ম, ধর্ম আমাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে । আমরা আত্মদিককে বলি আধুনিক ; আমরা ‘উন্নতিতে’ বিশ্বাসী, বৈজ্ঞানিক কল-কারখানার বিস্তার, জীবনযাত্রার উন্নততর ব্যবস্থা, সমবায় ও যৌথভাবে কার্যনিয়ন্ত্রণে বিশ্বাসী । আমরা অনেকে কৃষক-জীবনের রক্ষণশীলতাকে প্রগতিবিরোধী বলিয়া জানি এবং অনেকেই সোশ্যালিজম, কমুনিজম-এর অনুরাগী । আমরা কেমন করিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধিজীর সহিত মিলিত হইয়াছি এবং নানা ঘটনায় তাঁহার বিংশত অনুচরের মত কার্য করিয়াছি ! এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন এবং যে গান্ধিজীকে জানে না, সে কোন উত্তরেই সন্তুষ্ট হইবে না । ব্যক্তিত্বকে ব্যাখ্যা করা যায় না, ইহার আশ্চর্য্য শক্তি মানুষকে মুগ্ধ করে । এবং এই শক্তি তাঁহার মধ্যে প্রচুর পরিমাণেই আছে । ষাঁহারা তাঁহার নিকট আসিয়াছেন, তাঁহার তাঁহার এক এক দিক গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি মানুষকে আকর্ষণ করেন,— কিন্তু তাহা অন্ধ আলুরক্তি নহে, যুক্তি বিচার দ্বারাই অনেকে তাঁহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন । তাঁহার গান্ধিজীর জীবন সম্পর্কে দার্শনিক ব্যাখ্যা বা তাঁহার অনেক আচরণ ও আদর্শ গ্রহণ করেন নাই । অনেক সময় তাঁহার তাঁহাকে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না । কিন্তু তাঁহার নির্দেশিত কার্যপ্রণালীর যৌক্তিকতা সহজেই বুঝা যায় । দীর্ঘকাল কর্মহীন, মেরুদণ্ডহীন রাজনীতির পর তিনি যখন তাঁহার নৈতিক বিভার দীপ্ত সাহসিক ও আসল কার্য পদ্ধতি উপস্থিত করিলেন, তখন তাহার আহ্বান সহজেই অনিবার্য হইয়া

দিল্লী-চুক্তি

উঠিল এবং সকলে কি বুদ্ধি কি ভাবাবেগের দিক দিয়া তাহা বরণ করিল। প্রত্যেক পদক্ষেপে তিনি তাঁহার কার্যপদ্ধতির অভ্রান্ততা প্রতিপন্ন করিলেন এবং আমরা তাঁহার অধ্যাত্ম দর্শন গ্রহণ না করিয়াও অল্পগামী হইলাম। ভাব হইতে কার্যকে পৃথক করিয়া দেখা সম্ভবতঃ সম্যক দর্শন নহে, এবং উহার ফলে পরিণামে মানসিক সংঘাত ও ক্লেশ উপস্থিত হয়। গান্ধিজী কর্মী পুরুষ এবং অবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে সর্বদা সচেতন, এই কারণে আমরা আশা করিয়াছিলাম, আমরা বাহ্য সত্য বলিয়া জানি, সেই দিকেই তিনি অগ্রসর হইবেন। যে ভাবেই হউক, তিনি যত দিন সত্যপথে চলিতেছেন, তত দিন ভবিষ্যতে বিচ্ছেদ ঘটিতে পারে, পূর্ব হইতে একরূপ ধারণা করা নির্ভুক্তিতা মাত্র।

এই সকল হইতে বুঝা যাইবে, আমাদের মনে কোন স্পষ্ট বা নিশ্চিত ধারণা ছিল না। আমরা অধিকতর যুক্তিবাদী হইলেও গান্ধিজী ভারতবর্ষকে আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী জানেন, এবং যিনি জনসাধারণের এমন অসামান্য শ্রদ্ধা, ভক্তি ও অনুরাগ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহা জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার দোলনায় অনুরঞ্জিত। যদি আমরা তাঁহাকে বুঝাইতে পারি, তাহা হইলে জনসাধারণও আমাদের দলে আসিবে। মনে হইয়াছিল, তাঁহাকে বুঝান সম্ভবপর। কেন না, তাঁহার কৃষকোচিত দৃষ্টিভঙ্গী সবেও তিনি আজ্ঞায় বিদ্রোহী। এই বিপ্লবী এক বৃহৎ পরিবর্তন চাহেন, কোন ভয়েই তিনি স্তব্ধ হইবেন না।

আমাদের অলস ও অধঃপতিত জনমণ্ডলীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তিনি কি ভাবে কর্মে প্রবৃত্ত করিয়াছেন! বল প্রয়োগ করিয়া নহে, ঐহিকের কোন লোভ দেখাইয়া নহে। প্রশান্ত দৃষ্টি, মধুর বচন এবং সর্বোপরি ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত দ্বারাই ইহা সম্ভব হইয়াছে। ভারতে সত্যগ্রহের প্রথম সূচনা কালে ১৯১৯-এ বোম্বাই-এর ওমর শোভানী তাঁহাকে বলিতেন, ‘ক্রীতদাসগণের প্রিয়তম প্রভু’, ইহা আমার মনে আছে। তারপর অনেক কিছুই ঘটিয়াছে। আজ ওমর বাচিয়া নাই, সৌভাগ্যক্রমে ১৯৩১-এর সূচনা হইতে আমরা আনন্দ ও গর্বের তাঁহাকে দেখিয়াছি। ১৯৩০ আমাদের জীবনের এক অপূর্ব বৎসর। গান্ধিজী তাঁহার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে সমস্ত দেশে এক অভূত-পূর্ব পরিবর্তন আনিলেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের উপর আমরা জয়লাভ করিয়াছি, একথা ভাবিবার মত মুখ কেহ ছিল না। আমাদের গর্ব ও গৌরবের সহিত গভর্ণমেণ্টের সম্পর্ক অতি অল্পই ছিল। এই আন্দোলনে আমাদের নারীরা, যুবকেরা, সন্তানসন্ততিরা যে ভাবে কাজ করিয়াছে, তাহা লইয়াই আমাদের গর্ব ও গৌরব। ইহা আমাদের সমৃদ্ধি। যে কোন সময়ে,

জওহরলাল নেহরু

যে কোন জাতির পক্ষে ইহা দুর্লভ সম্পদ, পরাধীন ও পদদলিত আমরা আমাদের নিকট ইহার মূল্য আরও বেশী।

ব্যক্তিগত ভাবে আমি চিরদিনই গান্ধিজীর অসামান্য দয়া ও হৃদয়বোধনাভ করিয়াছি; পিতার মৃত্যুর পর হইতে তিনি আমার প্রতি অধিকতর স্নেহশীল হইয়াছেন। তিনি আমার কথা সর্বদাই ধৈর্যের সহিত শুনে এবং আমার ইচ্ছাপূরণের জন্ত সর্বতোভাবে চেষ্টা করেন। ইহার ফলে আমি ভাবিতাম যে, আমি ও আমার সহকর্মীরা তাঁহাকে প্রভাবিত করিয়া ক্রমে সমাজতান্ত্রিক পথে আনিতে পারিব এবং তিনি নিজেও বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইলে তিনি ধীরে ধীরে ঐ দিকে অগ্রসর হইবেন। আমার মনে হইয়াছিল যে, তিনি নিঃসন্দেহে সমাজতন্ত্রবাদের মূলনীতিগুলি গ্রহণ করিবেন, কেন না, আমার দৃষ্টিতে বর্তমান ব্যবস্থার অবিচার, হিংসা, অপচয় ও দুঃখের হাত হইতে মুক্তির অন্য পথ নাই। উপায় লইয়া তাঁহার মতভেদ হইতে পারে, কিন্তু আদর্শে তিনি একমত হইতেন। তখন ঐরূপ ভাবিলেও এখন আমি স্পষ্টভাবে বুঝিয়াছি যে, গান্ধিজীর আদর্শের সহিত সমাজতান্ত্রিক আদর্শের মূলগত পার্থক্য বিद्यমান।

এইবার ১৯৩১-এর ফেব্রুয়ারী মাসে দিল্লীর কথায় ফিরিয়া আসা যাউক। গান্ধী-আরুইন আলোচনা চলিতেছে এমন সময় সহসা তাহা বন্ধ হইয়া গেল। কয়েক দিন ধরিয়া বড়লাট গান্ধীজীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন না; মনে হইল কথাবার্তা ভাঙ্গিয়া গেল। কার্য্যকরী সমিতির সদস্যরা দিল্লী ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব প্রদেশে ফিরিবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। প্রস্থানের পূর্বে আমরা ভবিষ্যৎ কায্য-পদ্ধতি ও আইন অমান্য আন্দোলন (যাহা তখনও জারী ছিল) সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্ত মিলিত হইলাম। আমরা বুঝিলাম, আপোষ আন্দোলন ভাঙ্গিয়া গেল, ইহা ঘোষণার পরেই আমরা আর একত্র মিলিত হইয়া পরামর্শ করিবার সুযোগ পাইব না। আমরা গ্রেফতার হওয়ার প্রত্যাশা করিতে লাগিলাম এবং আরও শুনিলাম, গভর্নমেন্ট প্রচণ্ডভাবে কংগ্রেসকে দমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, যে চণ্ডনীতি পূর্দাপেক্ষা অধিকতর ভীষণ হইবে। অতএব, আমরা সর্বশেষবার মিলিত হইলাম, এবং ভবিষ্যতে আন্দোলন পরিচালনার জন্ত কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করিলাম। এবারের প্রস্তাবে একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। পূর্বে নিয়ম ছিল যে, সভাপতি গ্রেফতারের পূর্বে অস্থায়ী সভাপতি এবং কার্য্যকরী সমিতির সদস্যের শূন্য পদ মনোনয়ন দ্বারা পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া যাইবেন। স্থলাভিষিক্ত কার্য্যকরী সমিতি প্রকৃত প্রস্তাবে কোন কার্য্যই করিতে পারে নাই। কোন

দিল্লী-চুক্তি

ব্যাপারে নতুন কিছু নির্দাণ করিবার অধিকার ইহার ছিল না। সদস্যরা কেবল জেলে যাইতে পারিতেন। যাহা হাঁক, এইরূপ একজনের পর একজন মনোনয়নের প্রথার বিপদও ছিল। ইহার ফলে কংগ্রেসের মর্যাদাহানিকর ব্যাপারও ঘটিতে পারিত। এই আশঙ্কা করিয়া দিল্লীতে কার্যকরী সমিতি সিদ্ধান্ত করিলেন যে ভবিষ্যতে আর অস্থায়ী সভাপতি ও স্থলাভিষিক্ত সদস্য মনোনয়ন করা হইবে না। যে সকল মূল সদস্য কারাগারের বাহিরে থাকিবেন তাঁহারা সমিতির পূর্ণ ক্ষমতায় ক্ষমতাবান হইয়া কার্য করিবেন। যখন সকলে দিল্লীয়া কারাগারে যাইবেন, তখন সমিতির কোন কাজ থাকিবে না। তবে আমরা একটু আড়ম্বর করিয়া বলিলাম যে, সে অবস্থায় কার্যকরী সমিতির ক্ষমতা দেশের প্রত্যেক নর নারীর উপর ন্যস্ত হইবে। আমরা সর্বসাধারণকে উৎসাহের সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইতে আহ্বান করিলাম।

এই প্রস্তাবে সংঘর্ষ পরিচালকের সাহসিকতাপূর্ণ নির্দেশ দেওয়া হইল এবং আপোষের সর্বপ্রকার পথ ইহাতে বন্ধ করা হইল। আমাদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সহিত দেশের অন্যান্য অংশের যোগাযোগ রক্ষা করা এবং নিয়মিতভাবে নির্দেশাদি প্রদান করা ক্রমশঃ কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। আমাদের পুরুষ ও মহিলা কর্মীরা সকলেই সুপরিচিত এবং তাঁহারা প্রকাশে কাজ করিতেন বলিয়া ইহা অনিবার্য ছিল। তাঁহাদের গ্রেফতারের সম্ভাবনা সর্বদাই থাকিত। ১৯৩০-এ গুপ্ত সংবাদবাহীদল গঠন করিয়া নির্দেশ প্রচার, পরিদর্শন ও রিপোর্টাদি আনয়নের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইহাতে কাজ ভালই চলিয়াছিল এবং আমরা বুঝিয়াছিলাম যে, এইরূপে গুপ্তভাবে সংবাদ সংগ্রহের কাজ সাফল্যের সহিত পরিচালনা করা যাইতে পারে। কিন্তু আমাদের প্রকাশ্য আন্দোলনের সহিত ইহা কিয়ৎপরিমাণে সামঞ্জস্যহীন। এবং গান্ধিজীও ইহার বিরোধী ছিলেন। কেন্দ্র হইতে নির্দেশের অভাবে কাজ চালাইবার দায়িত্ব আমরা স্থানীয় লোকের উপর অর্পণ করিলাম। অন্তথা তাঁহারা উপর হইতে নির্দেশ পাইবার জন্ত অপেক্ষা করিবে অথবা কিছুই করিবে না। অবশ্য সম্ভবমত নির্দেশ দেওয়া যাইতে পারে।

এইভাবে একটি প্রস্তাব ও অন্যান্য প্রস্তাব পাশ করিয়া আমরা যাত্রার জন্ত প্রস্তুত হইলাম। (পরবর্তী ঘটনাব এই সকল প্রস্তাব প্রকাশ করা হয় নাই।) এমন সময় লর্ড আক্কাইনের নিকট হইতে পুনরায় আহ্বান আসিল এবং আপোষ প্রস্তাব আলোচনা স্তব্ধ হইল।

৪ঠা মার্চ মধ্যরাত্রি পর্যন্ত বড়লাটের বাড়ী হইতে গান্ধিজীর প্রত্যাগমনের আশায় আমরা অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। তিনি রাত্রি

জওহরলাল নেহরু

দুইটার সময় ফিরিয়া আসিলেন। এবং আমাদেরকে জাগাইয়া সংবাদ দেওয়া হইল যে, আপোষ প্রস্তাবগুলি নির্ধারিত হইয়াছে। আমরা খসরাখানি দেখিলাম। পূর্বে আলোচনা-প্রসঙ্গে আমি অধিকাংশ ধারাগুলি জানিতাম, কিন্তু দুই নম্বর ধারার * রক্ষাকবচ ইত্যাদি দেখিয়া আমি অত্যন্ত মন্থাহত হইলাম। ইহার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। আমি সে রাত্রে মত আর কিছু বলিলাম না, সকলেই স্ব স্ব শয়ান ফিরিয়া গেলাম।

অবশ্য বলিবার বিশেষ কিছু ছিল না। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, আমাদের নেতা স্বয়ং কথা দিয়া আসিয়াছেন। এখন আমরা তাহার সহিত ভিন্নমত অবলম্বন কি করিয়া করিতে পারি? তাঁহাকে পরিত্যাগ করা? তাঁহার সহিত বিচ্ছিন্ন হওয়া? আমাদের অনৈক্য ঘোষণা করা? ইহাতে ব্যক্তিগত ভাবে কাহারও সন্তোষ হইতে পারে কিন্তু তাহাতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কিছু আসিয়া যাইবে না। অন্ততঃ সাময়িক ভাবেও তখনকার মত আইন অমান্য আন্দোলন শেষ হইল। এবং কার্যকরী সমিতির পক্ষেও ইহা পরিচালনা করা সম্ভবপর নহে। কেন না, গভর্ণমেন্ট ঘোষণা করিয়া দিবেন, মিঃ গান্ধী আপোষ করিতে সম্মত হইয়াছেন। আমি এবং আমাদের অন্যান্য সহকর্মীরা আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখিয়া গভর্ণমেন্টের সহিত সাময়িক আপোষে ইচ্ছুক ছিলাম। আমাদের সহকর্মীদেরকে পুনরায় কারাগারে প্রেরণ এবং যে সহস্র সহস্র ব্যক্তি জেলে রহিয়াছেন তাঁহাদিগকে সেইখানে রাখার নিমিত্তের ভাগী হওয়া কাহারও পক্ষে সহজ নহে। যদিও আমরা অনেকে নিজেদের কারাজীবনের উপযুক্ত করিয়া প্রস্তুত করিয়াছিলাম এবং উহার পীড়াদায়ক দৈনন্দিন কার্যপদ্ধতি লইয়া হাস্য পরিহাস করিতাম, তথাপি আমাদের জীবনের দিবারাত্রগুলি কাটাউবার জন্য কারাগার নিশ্চয়ই মনোরম স্থান নহে। তাহা ছাড়া যে তিন সপ্তাহের অধিককাল ধরিয়া গান্ধিজী ও লর্ড আর্কইনের মধ্যে আপোষের কথাবার্তা চলিতেছিল সেই সময় আসন্ন আপোষের প্রত্যাশায় সমগ্র দেশ অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। কথাবার্তা ভাঙিয়া গেলে

* দিল্লী-চুক্তির দুই নম্বর সর্ব (১৯৩৫, ৫ই জুলাই) 'শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত প্রেরণ। হিজ ম্যাজেস্টিজ গভর্ণমেন্টের সম্মতিক্রমে, ভাঃ ১৭৭ আয়োজনর সীমা এই ভাবে নির্দিষ্ট হইবে যে, গোল টেবিল বৈঠকে ভারতে নিয়মতান্ত্রিক গভর্ণমেন্টের যে খসড়া আলোচিত হইয়াছে, তাহাই পুনরায় বিচার করা হইবে। প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় বৃক্তরাষ্ট্র একটি অপরিহার্য অংশ হইবে এবং ভারতের দায়িত্ব, সংরক্ষিত বিষয় ও রক্ষাকবচগুলি ভারতের স্বার্থের দিক হইতে নিরূপণ করা হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, যথা—দেশরক্ষা, বৈদেশিক ব্যাপার, সংখ্যালঘুদের অবস্থা, ভারতের স্বর্ণ এবং পূর্ব প্রতিশ্রুতি পূরণ।'

দিল্লী-চুক্তি

দেশে নৈরাশ্রের সঞ্চার হইত সন্দেহ নাই। এই কারণে আমরা (কার্য্যাকরী সমিতির সদস্যগণ) অস্থায়ী সন্ধির প্রস্তাবে (ইহা যে অস্থায়ী তাহা সুস্পষ্ট) সম্মতি দিলাম। কিন্তু সন্ধে সন্ধে আমরা ইহাও বলিলাম, এই সন্ধির দ্বারা আমরা কোনও মূল নীতি প্রত্যাহার করিলাম না।

পরে বিভিন্ন বিষয় লইয়া যে তুমুল তর্কের তুফান উঠিয়াছিল ব্যক্তিগত-ভাবে আমি এগুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেই নাই। আমার দুইটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য ছিল। প্রথম কথা, আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যকে কিছুতেই খাট করা হইবে না, দ্বিতীয়তঃ, এই সন্ধির প্রভাব আমাদের যুক্ত প্রদেশের কৃষক আন্দোলনের উপর কি ভাবে পতিত হইবে। আমাদের করবন্ধ অথবা খাজনাবন্ধের আন্দোলন এ পর্য্যন্ত বেশ সাফল্য লাভ করিয়াছিল এবং কোন কোন অঞ্চলে একেবারেই কিছু আদায় হয় নাই। কৃষকদের মেরুদণ্ড সোজা ছিল এবং সমগ্র জগতের কৃষিকার্য্যের অবস্থা এবং কৃষিপণ্যের মূল্যের মন্দার দরুণ তাহাদের পক্ষে খাজনা দেওয়া কঠিন ছিল। আমাদের করবন্ধ আন্দোলন একাধারে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। যদি গভর্ণমেণ্টের সহিত একটা সন্ধি হয় তাহা হইলে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত হইবে এবং করবন্ধ আন্দোলনের কোনও রাজনৈতিক ভিত্তি থাকিবে না। কিন্তু মূল্য হ্রাস হওয়ায় অধিকাংশ কৃষকের পক্ষে দাবীর অনুরূপ অর্থ দিবার অক্ষমতায় ফলে যে অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার কি হইবে? গান্ধিজী লর্ড আক্কাইনের নিকট এই বিষয়টা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, করবন্ধ আন্দোলন প্রত্যাহার করা হইলেও আমরা কৃষকদিগকে তাহাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত খাজনা দিবার উপদেশ দিতে পারিব না। এই ব্যাপারটি প্রাদেশিক বলিয়া ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত বিশদভাবে আলোচনা করা সম্ভব হয় নাই। আমাদের কাছে এই আশ্বাস দেওয়া হইল যে, প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট আনন্দের সহিত এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কৃষকদের দুর্দশা মোচনকল্পে সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন। ইহা অনির্দিষ্ট আশ্বাস মাত্র। কিন্তু সে অবস্থায় ইহা অপেক্ষা নির্দিষ্ট কোন প্রতিশ্রুতি পাওয়া কঠিন ছিল। কাজেই তখনকার মত এই ব্যাপারের এই খানেই শেষ হইল।

আমাদের স্বাধীনতা লাভের ও আমাদের উদ্দেশ্যের মুখ্য প্রাশ্ণটি রহিয়া গেল। এবং আমি সন্ধির দুই নং ধারাটিতে দেখিলাম যে, এই উদ্দেশ্যকেও স্বর্ক করা হইয়াছে। ইহারই জন্ত কি এক বৎসর কাল এত লোক এত দুঃখ বরণ করিল? আমাদের গর্কিত উক্তি এবং

জওহরলাল নেহরু

দুঃসাহসিক কার্যের কি এই পরিণাম? কংগ্রেসের স্বাধীনতা প্রস্তাব ২৬শে জানুয়ারীর সঙ্কল্প এবং তাহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখের ফল কি ইহাই? মাচ্চ মাসের সেই রাত্রিতে আমি শয্যায় শুইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম, কোনও মহার্ঘ্য সম্পদ চিরদিনের মত হারাইয়া গেলে যে রূপ মনোভাব হয়, আমার স্বপ্নও সেইরূপ শূন্যতায় পূর্ণ হইয়া উঠল।*

৩৫

করাচী কংগ্রেস

গান্ধিজী পরোক্ষভাবে আমার মানসিক চাকল্যের কথা জানিতে পারিলেন। পরদিন প্রভাতে প্রাতভ্রমণে যাইবার সময় আমাকেও সঙ্গে যাইতে বলিলেন। আমাদের মধ্যে দীর্ঘকাল আলোচনা হইল। তিনি আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, কোন গুরুতর বিষয় অথবা মূলনীতি প্রত্যাহার করা হয় নাই। তিনি সন্ধির দুই নম্বর ধারাটিকে, ‘ভারতের স্বার্থ’ এই কথাটির উপর জোর দিয়া এমনভাবে ব্যাখ্যা করিলেন যে, উহার সহিত আমাদের স্বাধীনতার দাবীর ঐক্যই রহিয়াছে। এই ব্যাখ্যা আমার নিকট কষ্টকল্পনা বলিয়া মনে হইল; তাঁহার যুক্তিতর্ক আমি মানিয়া লইতে পারিলাম না, তবে তাঁহার কথায় আমার মন অনেকটা শান্ত হইল। আমি তাঁহাকে বলিলাম, চুক্তিনামার গুণাগুণ ছাড়িয়া দিলেও তাঁহার আকস্মিক কার্যগুলি দেখিয়া আমরা ভয় পাই। তাঁহার মধ্যে এমন এক অজ্ঞাত বস্তু আছে, যাহা চোদ্দ বৎসরের ঘনিষ্ঠতাতেও আমি বুঝিতে পারিলাম না বলিয়া সর্বদাই শঙ্কিত থাকি। তিনি নিজেদের মধ্যে এই অজ্ঞাত বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিলেন এবং বলিলেন যে, তিনি নিজেও ইহার জন্ত দায়ী নহেন, এবং ইহা যে তাঁহাকে কোথায় লইয়া যাইবে, তাহাও পূর্ন হইতে বলিতে পারেন না।

দুই-এক দিন আমি সন্দেহ-দোলায় তুলিতে লাগিলাম, কি করিব বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ঐ সন্ধির বিরুদ্ধতা করা অথবা উহা বন্ধ করার প্রশ্ন তখন আর উঠিতে পারে না। আমি বড় জোর কল্পনার দিক হইতে উহার সহিত সংশ্লব না রাখিতে পারি, কিন্তু বাস্তব ঘটনারূপে উহা আমাকে মানিয়া লইতে হইবেই। ইহাতে আমার ব্যক্তিগত অহমিকা চরিতার্থ হইতে পারে ;

* “অগতে এলর দিক মুখরিত করিয়া আসে না, নিঃশব্দ পদনকারেই আসে।”

করাচী কংগ্রেস

কিন্তু বৃহত্তর সমস্তার তাহাতে কি সাহায্য হইবে? অতএব ইহাকে সৌজ্ঞেয় সহিত মানিয়া লইয়া, গান্ধিজীর মতই অমুকুল ব্যাখ্যা করাই ভাল নহে কি? সন্ধির পরেই সংবাদপত্রের জগ্ন তিনি যে বিবৃতি দিলেন, তাহাতে ঐ ব্যাখ্যার উপর জোর দিয়া বলিলেন যে, আমরা স্বাধীনতার দাবী একটুও বর্জন করি নাই। তাহাতে তখন এবং ভবিষ্যতে কোন ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব না হয়, এজগ্ন তিনি লর্ড আর্কইনের নিকট গিয়া বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া বলিয়া আসিলেন। গান্ধিজী তাঁহাকে বলিলেন, যদি কংগ্রেস গোল টেবিল বৈঠকে কোন প্রতিনিধি প্রেরণ করে, তাহা হইলে এই ভিত্তির উপরই দাবী উপস্থিত করা যাইবে। লর্ড আর্কইন অবশ্য এই দাবী স্বীকার করিয়া লইতে পারেন না, তবে ইহা দাবী করিবার অধিকার কংগ্রেসের আছে, তিনি ইহা স্বীকার করিলেন।

মানসিক দ্বন্দ্ব ও বেদনা সত্ত্বেও আমি ঐ সন্ধি অস্বীকার করিয়া উহার অমুকুলে কার্য্য করিবার সঙ্কল্প করিলাম। কোন মধ্যপথ আমি খুঁজিয়া পাইলাম না।

লর্ড আর্কইনের সহিত আলোচনা কালে, সন্ধির পূর্বে ও পরে গান্ধিজী বহুবার আইন অমান্য আন্দোলন ছাড়াও অগ্ন্যাগ্ন রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির জগ্ন অমুরোধ করিয়াছিলেন। আইন অমান্যের বন্দীদের মুক্তির কথা সন্ধিপত্রের মধ্যেই ছিল। তাহা ছাড়া, কারাদণ্ডে দণ্ডিত অথবা বিনা বিচারে অপরাধ না জানিতে দিয়া আটক বন্দীও সহস্র সহস্র ছিল। অন্তরীণে আবদ্ধদের মধ্যে অনেকেই বহু বর্ষ আটক ছিলেন। ইহা লইয়া সমস্ত ভারতে, বিশেষভাবে বাঙ্গলা দেশে অত্যন্ত অসন্তোষের সঞ্চার হইয়াছিল। বিনা বিচারে আটক নীতির ফলে বাঙ্গলা দেশই বেশী বিব্রত হইয়াছে। পেঙ্গুইন দ্বীপের বড় কর্তার মতই (অথবা ডেকাস্ মামলায়?) ভারত গভর্নমেন্ট বিশ্বাস করিতেন যে, প্রমাণের অভাবই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। প্রমাণ যে নাই, ইহা খণ্ডন করা যায় না। গভর্নমেন্টের অভিযোগ এই যে, অন্তরীণে আবদ্ধ ব্যক্তির অত্যন্ত উগ্র বিপ্লবী অথবা বৈপ্লবিক অপরাধপ্রবণ। সন্ধির অংশ স্বরূপ, গান্ধিজী এই মুক্তির দাবী করেন নাই। বাঙ্গলার আবহাওয়া স্বাভাবিক এবং রাজনৈতিক অসন্তোষ নিরাকরণের জগ্ন তিনি উহা অত্যাশঙ্কক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু গভর্নমেন্ট ইহাতে রাজী হইলেন না।

গান্ধিজীর ব্যাকুল অমুরোধ উপরোধেও গভর্নমেন্ট ভগৎ সিংয়ের মৃত্যুদণ্ড মকুব করিতে রাজী হইলেন না। ইহার সহিত সন্ধির অবশ্যই কোন সম্বন্ধ ছিল না; কিন্তু এই বিষয়ে দেশব্যাপী যে মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার

জগদ্বন্দ্বলাল মেহর

জগদ্বন্দ্বলাল মেহর এই অল্পবয়সে উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নিরাশ হইলেন।

এই কালে একটি ঘটনায় ভারতীয় টেররিষ্ট দলের মনোভাব জানিবার আমার সুবিধা হইয়াছিল। আমার কারামুক্তির পরে, পিতার মৃত্যুর পূর্বে কিশোর কয়েকদিন পর এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। একজন অপরিচিত ব্যক্তি আমার সহিত দেখা করিবার জন্য আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, গুনিলাম, তাহার নাম চন্দ্রশেখর আজাদ। আমি তাঁহাকে পূর্বে কখন দেখি নাই। গুনিয়াছিলাম, দশ বৎসর পূর্বে, ১৯২১ সালে স্থল ত্যাগ করিয়া তিনি অসহযোগ আন্দোলনে কারাগমন করিয়াছিলেন। সেখানে জেলশৃঙ্খলা ভঙ্গ করিবার অপরাধে এই পনের বৎসরের বালককে বেত্রদণ্ড দেওয়া হয়। ইহার পর তিনি টেররিষ্ট দলে যোগদান করেন এবং উত্তর ভারতে ঐ দলের একজন প্রতিপক্ষশালী সদস্য হইয়া উঠেন। এই সকল কথা আমি পূর্বেই গুনিয়াছিলাম, তবে এই শ্রেণীর গুজবে আমার বড় কোতূহল ছিল না। অতএব, তাঁহাকে দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম। আমাদের কারামুক্তির ফলে কংগ্রেসের সহিত গভর্নমেন্টের আপোষের প্রত্যাশা সকলের মনেই জাগিয়াছিল, এই কারণেই তিনি আমার সহিত দেখা করেন। তিনি জানিতে চাহিলেন, যদি আপোষ হয়, তাহা হইলে তাঁহার দলের লোকদের সেখানে কোন ঠাই হইবে কি-না? তাহার কি এমনইভাবে নির্বাসিত জীবন যাপন করিবে, প্রত্যাড়িত হইয়া এক স্থান হইতে অল্পদূর ভ্রমণ করিবে, তাহাদের মন্তকের জন্য পুরস্কার ঘোষিত থাকিবে এবং সম্মুখে থাকিবে ফাঁসির সম্ভাবনা? অথবা তাহাদিগকে শাস্তিতে জীবনযাপনের সুযোগ দেওয়া হইবে? তিনি আমাকে বলিলেন, তিনি এবং তাঁহার অনেক সহকর্মী বৃষ্টিতে পারিয়াছেন যে, কেবলমাত্র টেররিষ্ট কার্য্যপদ্ধতি নিষ্ফল, ইহার দ্বারা কোন কল্যাণ হইবে না। অবশ্য, তিনি কেবলমাত্র শাস্তিপূর্ণ উপায়ে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিবে ইহা বিশ্বাস করিতেও প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহার বিশ্বাস, ভবিষ্যতে ভীষণ সংঘর্ষ ঘটিতে পারে, তবে তাহা টেররিজম নহে। টেররিজম দ্বারা ভারতবর্ষ স্বাধীন হইতে পারিবে না, একথাও তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিলেন। কিন্তু তাঁহাকে শাস্তিতে বসবাস করিতে না দিয়া যদি এইভাবে তাড়াইয়া লওয়া চলিতে থাকে, তবে কি হইবে? তাহার মতে ইদানীং যে সকল টেররিষ্ট ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা নিছক আত্মরক্ষার জন্য।

টেররিজমের উপর বিশ্বাস ক্রমে অস্তিত্ব হইতেছে, আজাদের নিকট এই কথা গুনিয়া আমি আনন্দিত হইলাম, পরেও আমি ইহার প্রমাণ পাইয়াছি। দলের নীতি হিসাবে, টেররিজম-এর কার্য্যতঃ কোন অস্তিত্ব নাই।

ব্যক্তিগত বা আকস্মিক ঘটনার সম্ভবতঃ বিশেষ কারণ আছে। ইহা প্রতিশোধমূলক কার্য অথবা ব্যক্তিগত বিকৃতির ফল; কোন সাধারণ বিশ্বাসজনিত কার্য নহে। অবশ্য তাই বলিয়া পুরাতন টেররিষ্ট ও তাঁহাদের সঙ্গিগণ অহিংসামত্রে দীক্ষা লইয়াছেন অথবা ব্রিটিশ শাসনের অন্তরাগী হইয়া উঠিয়াছেন, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু টেররিজম সম্বন্ধে তাঁহাদের পূৰ্ব্ব ধারণা আর নাই। আমার বোধ হয়, ইহাদের অনেকেই নিশ্চিতরূপে ফাসিস্ত মনোবৃত্তিসম্পন্ন।

আমার রাজনৈতিক কাধের মতবাদ বুঝাইয়া দিয়া আমি চন্দ্রশেখরকে স্বমতে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তাঁহার মূল প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিলাম না, তিনি এখন কি করিবেন? এমন কিছুই ঘটবার সম্ভাবনা নাই যাহাতে তিনি এবং তাঁহার মত ব্যক্তির শাস্তি পাইতে পারেন। আমি কেবল তাঁহাকে অন্তরোধ করিলাম যে, তিনি যেন তাঁহার দলের ব্যক্তিদিগকে ভবিষ্যতে হিংসামূলক কার্য হইতে বিরত রাখিবার চেষ্টা করেন, কেন না, তাহাতে তাঁহাদের দলেরও ক্ষতি, দেশের স্বার্থেরও ক্ষতি।

দুই-তিন সপ্তাহ পরে, যখন গান্ধী-আরুইন কথাবার্তা চলিতেছিল, তখন দিল্লীতে শুনিলাম যে, চন্দ্রশেখর আজাদ এলাহাবাদে পুলিশের গুলীতে নিহত হইয়াছেন। দিবাভাগে কোন উজানে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া পুলিশ বাহিনী চারিদিক ঘিরিয়া কেল। তিনি একটি গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া আত্মরক্ষা করিতে থাকেন। উভয় পক্ষ হইতে গুলীবর্ষণ চলিয়াছিল। নিহত হইবার পূর্বে তাঁহার গুলীতেও দুই-একজন পুলিশ আহত হইয়াছিল।

সন্ধিপত্র গৃহীত হওয়ার পরই আমি দিল্লী ত্যাগ করিয়া লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিলাম। আমরা অবিলম্বে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করিলাম; সমস্ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান অপূৰ্ব্ব শৃঙ্খলার সাহিত আমাদের নির্দেশ পালন করিল। আমাদের দলের অনেকেই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং অনেকে উগ্রপন্থী ছিলেন, তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করার মত কোন শক্তি আমাদের হাতে ছিল না। যদিও অনেকে সমালোচনা করিলেন, তথাপি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক ব্যক্তিই এই সন্ধি মানিয়া লইলেন। একজনও অবজ্ঞা করিয়াছেন, এমন সংবাদ আমি পাই নাই। আমাদের প্রদেশের কোন কোন অঞ্চলে তখন খাজনাবন্ধের আন্দোলন চলিতেছিল বলিয়া নূতন ঘটনায় যে প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হইল, আমি তাহাই লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। আমাদের প্রথম কাজ হইল, আইন অমান্য আন্দোলনের প্রত্যেক বন্দীকে ছাড়িয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা। দিনের পর দিন হাজার হাজার বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইল। যাহাদের অপরাধ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা আছে এরূপ কয়েকজন মাত্র

জওহরলাল নেহরু

জেলে রহিয়া গেল। অবশু সহস্র সহস্র অন্তরীণে আবদ্ধ এবং হিংসামূলক কার্যের জন্য দণ্ডিত ব্যক্তির মুক্তি পাইল না।

কারামুক্ত বন্দীরা যখন স্ব স্ব নগরে উপস্থিত হইলেন তখন জনসাধারণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগকে সন্মিলন করিল। এই উপলক্ষে পুষ্প, পল্লব, পতাকা দ্বারা গৃহসজ্জা, শোভাযাত্রা, সভা, বক্তৃতা ও মানপত্র প্রদান ইত্যাদি হইত। ইহা স্বাভাবিক, কিন্তু পুলিশের লাঠি চালনা, বলপ্রয়োগে সভা ও শোভাযাত্রা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার ব্যাপারের মধ্যে এই পরিবর্তন অতি আকস্মিক, পুলিশ অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে লাগিল। এবং সম্ভবতঃ কারাগ্রস্তাগত ব্যক্তিদের মনেও একটু জয়ের অহঙ্কার হইয়াছিল। অবশু ইহাতে জয়গর্বের বিশেষ কোন কারণ ছিল না। তবে জেল হইতে বাহির হইলে স্বভাবতঃই ক্ষুণ্ণতার কারণ ঘটে, অবশু জেলে একেবারে উপবিষ্ট না হইলে এবং দলে দলে জেল হইতে বাহির হইলে আনন্দের ত কথাই নাই।

এই ঘটনা উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, কয়েকমাস পরে 'এই জয়োসবে' গবর্ণর তীব্র আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। এবং আমাদের বিরুদ্ধে ইহাও একটা অভিযোগরূপে উপস্থিত করা হইয়াছিল। সর্বদা প্রভুত্বের পরিমণ্ডলে বাস করিতে অভ্যস্ত গভর্ণমেন্ট সম্পর্কে সাময়িক ধারণা পোষণকারী জনসাধারণের সহিত সংযোগ অথবা সম্পর্কহীন শাসকবর্গের দৃষ্টিতে তাহাদের ধারণারূপ মর্যাদার কোনও দৌর্বল্য অত্যন্ত বেদনানায়ক। এবিষয়ে আমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে, সিমলার তুঙ্গশৃঙ্গ হইতে সমতল ক্ষেত্র পর্য্যন্ত সর্বত্র সরকারী কর্মচারীরা জনসাধারণের এই ঔদ্ধত্য দেখিয়া ক্রোধে কম্পান্বিত হইতেছিলেন। যে সকল সংবাদপত্রে তাহাদের মত প্রতিধ্বনিত হয়, তাহারা সেকথা ভুলিতে পারেন নাই। এবং সাড়ে তিন বৎসর পরে এখনও তাহারা সেই দুঃসাহসিক দুদ্দিনের কথা চিন্তা করিয়া শিহরিয়া উঠেন। তাহাদের মতে কংগ্রেসপন্থীরা যেন বৃহৎ জয়লাভ করিয়াছে এমনই ভাব দেখিয়া অহঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল। গভর্ণমেন্ট এবং তাহাদের সংবাদপত্রবন্ধুগণের এই উদ্ভ্রা দেখিয়া আমাদের দৃষ্টি খুলিয়া গেল। তাহাদের মানসিক অবস্থা এবং তাহারা কতখানি দমনও সঙ্ঘ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা দেখিতে পাইলাম। আমাদের সৈন্তসামন্তদের কয়েকটি বক্তৃতা ও গোটাকয়েক শোভাযাত্রাই তাহাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইয়া ফেলিয়াছিল, ইহা এক আশ্চর্য্য দৃশ্য।

কার্য্যতঃ, সাধারণ কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যে ত নহেই, নেতাদের মধ্যেও

করাচী কংগ্রেস

ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টকে 'হারাইয়া দিয়াছি' এমন কোন মনোভাব ছিল না। কিন্তু আমাদের নিজেদের লোকের সাহস ও আত্মোৎসর্গ দেখিয়া আমরা গর্বিত হইয়াছিলাম। ১৯৩০ সালে দশ যাত্রা করিয়াছে, তাহাতে আমরা গর্ব বোধ করিয়াছি, আমাদের আত্মপ্রত্যয় ও আত্মমর্যাদা বাড়িয়াছে, এমন কি, আমাদের কনিষ্ঠতম স্বেচ্ছাসেবক পর্যন্ত এই গর্বের সোজা হইয়া মাথা উচু করিয়া চলিত। আমরা আরও বুঝিয়াছিলাম যে, এই বৃহৎ সংঘর্ষ সমগ্র জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের উপর অত্যধিক চাপ দিয়াছে এবং আমাদের লক্ষ্যের নিকটবর্তী করিয়াছে। কিন্তু ইহার সহিত গভর্ণমেন্টকে পরাজিত করিবার কথাই কোন সংশ্রব ছিল না, বরং দিল্লী সন্ধি করিয়া গভর্ণমেন্ট যে সুবিবেচনা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে আমরা অনেকেই সম্যক্রূপে সচেতন ছিলাম। আমাদের মধ্যে যাহারা বলিতেন যে, আমাদের লক্ষ্য এখনও বহুদূরে এবং সম্মুখে অধিকতর কঠোর সংঘর্ষ অপেক্ষা করিতেছে, তাহাদিগকে গভর্ণমেন্টের বন্ধুরা সংগ্রামলোলুপ এবং দিল্লীচুক্তিবিরোধী বলিয়া অভিযুক্ত করিতেন।

যুক্ত প্রদেশে আমাদের লক্ষ্য সমস্তার সম্মুখীন হইতে হইল। যতদূর সম্ভব, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্ত আমরা অবিলম্বে যুক্ত প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের সংশ্রবে আসিলাম। দীর্ঘকাল পরে—ছয় বৎসর সরকারী মহলে আমাদের কোন আনাগোনা ছিল না—কৃষক সমস্তা লইয়া আমি কয়েকজন উচ্চকর্মচারীর সহিত দেখা করিলাম। আমাদের মধ্যে দীর্ঘ পত্রবিনিময়ও চলিতে লাগিল। প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি গভর্ণমেন্টের সহিত কথাবার্তা চালাইবার মুখপাত্র হিসাবে গোবিন্দবল্লভ পণ্ডকে নিযুক্ত করিলেন। পল্লী-অঞ্চলের দুঃখ, কৃষিপণ্যের মূল্য হ্রাস এবং চাহিদা অল্পরূপ খাজনা দিবার সাধারণ কৃষকদের অক্ষমতা তাঁহারা স্বীকার করিলেন, প্রশ্ন হইল কি পরিমাণ খাজনা মাপ দেওয়া যাইতে পারে, এবং তাহার মীমাংসা সম্পূর্ণরূপে প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের উপরেই নির্ভর করে। সাধারণতঃ গভর্ণমেন্ট জমিদারের সহিতই বুঝাপড়া করিয়া থাকেন, প্রত্যক্ষভাবে প্রজাদের সহিত কিছু করেন না। অতএব খাজনা কমানোর অথবা মাপ দিবার ভার প্রধানতঃ জমিদারের। যতদিন গভর্ণমেন্ট তাঁহাদের দেয় রাজস্বের অংশবিশেষ মাপ না করিতেছেন ততদিন তাঁহারা ঐরূপ করিতে রাজী হইলেন না। যাহাই ঘটুক, তাঁহারা স্বভাবতঃই রায়তদের খাজনা

জওহরলাল নেহরু

মাপ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কাজেই সমস্তার মীমাংসার ভার গভর্নমেন্টের উপর নির্ভর করিতে লাগিল।

প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি কৃষকদিগকে জানাইয়া দিলেন যে, খাজনা-বন্ধ আন্দোলন প্রতাহার করা হইয়াছে, এখন তাহারা সাধ্যমত খাজনা দিতে পারে। কিন্তু তাহারা কৃষকদের প্রতিনিধিরূপে মোটারকম খাজনা মকুবের দাবী করিলেন। দীর্ঘকাল গভর্নমেন্ট কিছুই করিলেন না, সম্ভবতঃ ছুটি অথবা বিশেষ কর্তব্যের জন্য গভর্নর সার ম্যালকম হেলীর অস্থপস্থিতির জন্য তাহারা বাধা অল্পভব করিতেছিলেন। দ্রুত ও বহুদূরপ্রসারী ব্যবস্থার তখন আবশ্যক ছিল। কিন্তু অস্থায়ী গভর্নর ও তাহার সহযোগীরা ইতস্ততঃ করিয়া কিছুই করিলেন না এবং গ্রীষ্মকালে সার ম্যালকম হেলীর প্রত্যাগমনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই অনিশ্চিত অবস্থা ও বিলম্বের ফলে অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইল এবং প্রজাদের দুর্দশা বাড়িয়া গেল।

দিল্লী সন্ধির অব্যবহিত পরেই আমার স্বাস্থ্য একটু ভাঙ্গিয়া পড়িল। জেলেই আমার শরীর খারাপ হইয়াছিল, তারপর পিতার মৃত্যু এবং দিল্লীতে দীর্ঘকাল আলোচনার ক্লান্তি আমার দেহ সস্থ করিতে পারিল না। তবু কোন প্রকারে একটু ভাল হইয়া করাচী কংগ্রেসের কাজ চালাইয়া লইলাম।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের করাচী বন্দর অত্যন্ত দুর্গম স্থান; বিস্তৃত মরুভূমি দ্বারা ইহা অবশিষ্ট ভারত হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন। তথাপি বহু দূরবর্তী স্থান হইতে অনেক লোক এখানে সমবেত হইয়াছিলেন এবং দেশের তৎকালীন মনোভাব করাচীতে স্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। জাতীয় আন্দোলনের ক্রমবদ্ধিত শক্তি দেখিয়া সকলেই সন্তুষ্ট; কংগ্রেস সূশ্রুতার সহিত অসামান্য ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে; যথানিয়মে নির্দেশমত কার্য করিয়াছে, ইহাতে জনসাধারণের শক্তি ও সামর্থ্যের উপর সকলেরই বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে। সর্বত্রই কংগ্রেসের জন্য গর্ব ও সংবত উৎসাহ লক্ষিত হইল। সম্মুখে বৃহৎ সমস্তা ও বিপ্লবগুলির জন্য গভীর দায়িত্ববোধেরও অভাব ছিল না। আমাদের বক্তব্য ও প্রস্তাব লক্ষ্যভাবে ব্যক্ত করা বা গ্রহণ করা সম্ভব নহে, কেন না, উহার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সমস্ত জাতীয় কর্মপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত করিবে। দিল্লী সন্ধি যদিও অধিকাংশ ব্যক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি জনমত উহার অন্তর্কূল ছিল না, এ জন্য আমাদের কিছু অস্থবিধায় পড়িতে হইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা ছিল। ইহার ফলে

করাচী কংগ্রেস

দেশের মুখ্য সমস্তাগুলি একটু ঘোলাইয়া গিয়াছিল। তাহার উপর কংগ্রেসের প্রাক্কালে ভগৎ সিংহের ফাঁসি লইয়া এ নূতন অসন্তোষ দেখা গেল। এই অসন্তোষের প্রাবল্য উত্তর ভারতেই লক্ষ্য করা গেল, এবং করাচীতে (নিকটবর্তী বলিয়া) পঞ্চাব হইতে বহুসংখ্যক লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন।

অগ্রাগ্র কংগ্রেস অপেক্ষাও করাচীতে গান্ধিজী ব্যক্তিগত ভাবে অধিকতর জয়লাভ করিলেন। সভাপতি ছিলেন শক্তিমান ও জনপ্রিয় গুজরাটের যশস্বী জননায়ক, সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল; কিন্তু এই রঙ্গক্ষেত্রে মহাত্মাই প্রধান নায়ক। আবদুল গফুর খাঁর নেতৃত্বে সীমান্ত প্রদেশ হইতে শক্তিশালী 'লালকুর্ভাদল' কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিলেন। লালকুর্ভাদল কংগ্রেসে সকলের প্রশংসা ও জয়ধ্বনি লাভ করিলেন। ১৯৩০-এর এপ্রিল হইতে তাঁহারা ক্রোধের বহু কারণ সত্ত্বেও শান্তিপূর্ণ সাহসের সহিত কর্তব্যপালন করিয়া সারা ভারতের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। রেড্ শার্ট বা লালকুর্ভা নাম দেখিয়া অনেকে ভ্রান্তভাবে মনে করেন যে, ইহারা কম্যুনিষ্ট অথবা বামপন্থী শ্রমিকদল। তাহাদের আসল নাম হইল খুদাই বিদ্‌মদগার এবং ইহা কংগ্রেসের সহিত যুক্তভাবে কাজ করিত। (পরে ১৯৩১ হইতে ইহা কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।) তাহাদের প্রাচীনকালের পোষাক রক্তবর্ণ ছিল বলিয়া তাহাদের 'লালকুর্ভা' বলা হইত। তাহাদিগের কার্যতালিকায় জাতীয় ও সমাজ-সংস্কারের প্রস্তাব ছিল, কিন্তু কোন অর্থনৈতিক কার্যপদ্ধতি ছিল না।

করাচীতে মুখ্য প্রস্তাব ছিল দিল্লী সন্ধি ও গোলটেবিল বৈঠক লইয়া। কার্যকরী সমিতির রচিত ও নিষ্কারিত প্রস্তাবে আমি সায় দিলাম। কিন্তু গান্ধিজী যখন আমাকেই উহা প্রকাশ্য অধিবেশনে উপস্থিত করিতে বলিলেন, তখন আমি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। প্রস্তাবটি আমার মনমত নহে বলিয়া আমি প্রথমে অস্বীকার করিলাম, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, ইহা দুর্বলতা ও অব্যবস্থিতিচিন্তার পরিচায়ক; হয় আমাকে ইহা সমর্থন করিতে হইবে, নয় বিরুদ্ধতা করিতে হইবে, দোটানায় পড়িয়া লোককে কল্পনা ও অহুমান করিবার সুযোগ দেওয়া উচিত নহে। শেষ মুহূর্ত্তে, কংগ্রেসে প্রস্তাব উপস্থিত করিবার কয়েক মিনিট পূর্বে আমি রাজী হইলাম। সেই বৃহৎ জনমণ্ডলীর সম্মুখে আমি সরলভাবে আমার মনোভাব ব্যক্ত করিলাম, যে কারণে এই প্রস্তাব আমি সর্বাস্তঃকরণে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে সমর্থন করিতে অহুরোধ করিতেছি, তাহাও বলিলাম। মুহূর্ত্তের উত্তেজনাপ্রসূত আমার সেই বক্তৃতায়, কোন আল-

জওহরলাল নেহরু

কারিক শব্দচাতুৰ্য্য ছিল না, ভাবিয়া চিন্তিয়াও কিছু বলি নাই। আমার স্বপ্ন হইতে স্বতঃউৎসারিত এই বক্তৃতার ফল আমার পূৰ্বে হইতে প্রস্তুত করা বক্তৃতা অপেক্ষা ভাল হইয়াছিল।

আরও কয়েকটি প্রস্তাবে আমি বক্তৃতা করিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে ভগৎ সিংহ এবং মৌলিক অধিকার ও অর্থনৈতিক কার্য্যপদ্ধতি সম্পর্কিত প্রস্তাব, এই দুইটি উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত প্রস্তাবে আমি অধিকতর উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিলাম, কেন না, ইহার বিষয়গুলিতে আমার সম্মতি ছিল, দ্বিতীয়তঃ ইহাতে কংগ্রেস এক অভিনব নীতি ও উদ্দেশ্য স্বীকার করিল। এতদিন কংগ্রেস খাঁটি জাতীয়তাবাদের আদর্শেই চলিয়াছে, কুটীরশিল্প ও স্বদেশীর উৎসাহ প্রদান ছাড়া অগ্রাগ্রহ অর্থনৈতিক সমস্যাগুলিকে পরিহার করিয়াই চলিয়াছে। করাচী প্রস্তাবে কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক পথে প্রথম পদার্পণ করিয়া একটু অগ্রসর হইল—প্রধান প্রধান ব্যবসায় ও লোকহিতকর ব্যবসায়গুলি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা, ধনীদিগের ট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়া গরীবদিগের ট্যাক্সের বোঝা লাঘব ইত্যাদি। অবশ্য ইহা মোটেই সোশ্যালিজম নহে, যে কোন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রও এই সকল ব্যবস্থা সহজেই গ্রহণ করিতে পারে।

এই মোলায়েম ও নিরস প্রস্তাবটিতে ভারত গভর্নমেন্টের ধুরন্ধরগণের হুচিন্তা বাড়িয়া গেল। সম্ভবতঃ তাঁহারা তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ দূরদৃষ্টির বলে দেখিতে পাইলেন যে, বলশেভিকদের স্বর্ণ গোপনপথে করাচীতে আসিয়া কংগ্রেস নেতাদের বিগড়াইয়া দিতেছে। এক প্রকার রাজনৈতিক অন্তঃপুরবাসী, বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন গোপনতার আবহাওয়ায় অভ্যস্ত শাসকগণের কোতূহলী মন সর্বদাই রহস্যময় কল্পিত কাহিনী নির্ঝিঁচারে গ্রহণ করিয়া থাকে। তারপর এই কাহিনীগুলি এক রহস্যময় উপায়ে অল্পে অল্পে অহুগৃহীত সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হইতে লাগিল। তাহাতে এমন ইন্ধিতও করা হইল যে, যবনিকা উন্মোচিত হইলে আরও অনেক কিছু ঘটনা প্রকাশিত হইতে পারে। এইভাবে মূল নীতি সম্পর্কিত করাচী প্রস্তাবকে অভ্যস্ত উপায়ে ঐ সকল কাহিনীর সহিত জড়িত করিতে দেখিয়া আমি সিদ্ধান্ত করিলাম যে, উহা সরকার পক্ষেরই মত। গল্প রটিয়াছিল যে, একজন রহস্যময় ব্যক্তি (কমুনিষ্ট দলের) ঐ প্রস্তাব বা উহার অধিকাংশ ভাগ রচনা করিয়া করাচীতে আমার হাতে গুঁজিয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর আমি মিঃ গান্ধীকে সাক্ষাৎ বলিয়া দিলাম যে, হয় ইহা গ্রহণ করুন, নহিলে আমি দিল্লী চুক্তির বিরোধিতা করিব, এবং মিঃ গান্ধী আমাকে হাতে রখিবার

করাচী কংগ্রেস

জন্ম উহা গ্রহণ করিলেন ও কংগ্রেসের শেষ দিন পরিশ্রান্ত বিষয়-নিরীচন-সমিতিকে উহা গ্রহণ করিতে বাধ্য করিলেন।

সেই 'রহস্যময় ব্যক্তির' নাম যদিও খোলাখুলি উল্লেখ করা হয় নাই, কিন্তু বহু প্রকার ইঙ্গিতের মধ্য দিয়া কাহাকে লক্ষ্য করা হইতেছে তাহা আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম। আমি স্বয়ং রহস্তপূর্ণভাবে বা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কথা বলিতে অভ্যস্ত নহি। অতএব আমি সোজাসজি বলিতেছি যে, এম, এন, রায়কেই লক্ষ্য করা হইয়াছিল। কিন্তু ঐ নিরীহ করাচী প্রস্তাব সম্পর্কে এম, এন, রায় অথবা অন্য কোন 'কমুনিষ্ট মনোভাবাপন্ন' ব্যক্তির ধারণা কি তাহা জানিলে দিল্লী সিমলার বড়কর্তাদের কিছু চোখ খুলিত। তাঁহারা শুনিয়া আশ্চর্য হইতেন যে, ঐ শ্রেণীর লোক প্রস্তাবটির প্রতি ঘৃণাই প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহার মতে উহা বুর্জোয়া সংস্কারপন্থী মনোবৃত্তির বিশেষ নিদর্শন।

মিঃ গান্ধী সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে, আমি গত সত্তর বৎসর ধরিয়া তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। আমার পক্ষে তাঁহার উপর জোর জবরদস্তি করা এবং তাঁহার সহিত দর কষাকষি করার কথা কল্পনাভীত। আমরা পরস্পরের মত মানিয়া লইতে পারি অথবা কোন বিশেষ ব্যাপারে ভিন্ন মতও অবলম্বন করিতে পারি, কিন্তু আমাদের পারস্পরিক আদান-প্রদানের মধ্যে কেনাবেচার মনোভাব আসিতে পারে না।

এই শ্রেণীর প্রস্তাব কংগ্রেসে উপস্থিত করিবার কল্পনা অনেক দিন হইতেই ছিল। যুক্ত প্রদেশের কংগ্রেস কমিটি কয়েক বৎসর ধরিয়া এই বিষয়ে আন্দোলন করিতেছিলেন এবং একটি সমাজতান্ত্রিক প্রস্তাব নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতিকে গ্রহণ করাইবার জন্ম চেষ্টা করিতেছিলেন। ১৯২৯ সালে উহার মূল নীতি নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতিকে কতকটা গ্রহণ করাইতে পারা গিয়াছিল। তাহার পর আইন অমান্ত আন্দোলন আসিল। ১৯৩১-এর ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে দিল্লীতে গান্ধিজীর সহিত আমার প্রাতঃভ্রমণ কালীন আলাপ আলোচনায় আমি ঐ বিষয় তাঁহাকে জানানই এবং তিনিও অর্থনৈতিক ব্যাপার সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব গ্রহণের অল্পকূলে মত দেন। তিনি আমাকে ঐ প্রস্তাব করাচীতে উপস্থিত করিতে এবং উহা রচনা করিয়া তাঁহাকে দেখাইতে বলিলেন। আমি করাচীতে তাঁহাকে প্রস্তাবটি দেখাইলে তিনি উহার অনেক অদলবদল করিলেন। তিনি বলিলেন যে, কার্য্যকরী সমিতিতে প্রস্তাবটি উপস্থিত করিবার পূর্বে আমাদের উভয়ের এক মত হওয়া উচিত। আমাকে কয়েকটি খসড়া প্রস্তাব রচনা করিতে হইল এবং আমরা অগ্রাগ্র কাজে ব্যস্ত

জওহরলাল নেহরু

ছিলাম বলিয়া কয়েকদিন দেৱী হইয়া গেল। অবশেষে গান্ধিজী ও আমি একমত হইয়া প্রস্তাবটি কার্য্যকরী সমিতির সম্মুখে এবং পরে বিষয়-নিৰ্দ্ধাচনী সমিতিতে উপস্থিত করিলাম। ঐ সমিতির সম্মুখে ইহা এক অভিনব প্রস্তাব, এবং অনেক সদস্য যে বিস্মিত হইয়াছিলেন তাহা সত্য। যাহা হউক, ইহা সহজেই সমিতিতে ও কংগ্রেসে গৃহীত হইল এবং ইহার ব্যাখ্যা ও প্রয়োগবিধি সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার জন্ত নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির উপর ভার দেওয়া হইল।

যখন আমি এই প্রস্তাবটি রচনা করিতেছিলাম তখন নানাপ্রণীত লোক আমার তাঁবুতে আসিতেন। অনেকের সহিত আমি এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়াছি। কিন্তু এম, এন, রায়ের সহিত ইহার কোন সংশ্লিষ্ট ছিল না। আমি ভাল করিয়াই জানি যে, তিনি এই প্রস্তাব দেখিলে হাসিতেন এবং ইহা অনুমোদন করিতেন না।

আমি করাচী যাত্রা করিবার কয়েকদিন পূর্বে এম, এন, রায়ের সহিত এলাহাবাদে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। একদিন সন্ধ্যায় তিনি অকস্মাৎ আমাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি যে ভারতে আসিয়াছেন সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা ছিল না। আমি তাঁহাকে দেখিবামাত্রই চিনিলাম। কেন না ১৯২৭ সালে মস্কোতে তাঁহার সহিত আমার দেখা হইয়াছিল। করাচীতেও তিনি আমার সহিত দেখা করেন, কিন্তু পাঁচ মিনিটের অধিক কাল তাঁহার সহিত আলাপ হয় নাই। অতীতে কয়েক বৎসর ধরিয়া রায় আমার কার্য্যপ্রণালীর নিন্দা করিয়া অনেক কিছুই লিখিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিন্দায় আমি অনেক সময় আঘাতও পাইয়াছি। তাঁহার ও আমার মধ্যে প্রচুর পার্থক্য সত্ত্বেও আমি তাঁহার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিয়া থাকি এবং পরে যখন তিনি গ্রেফতার হইয়া বিপদাপন্ন হইলেন তখন আমি তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য (অত্যন্ত অল্প) করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য আমাকে আকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহার সর্বজন-পরিভাষ্য নিঃসঙ্গ একাকৌতুহল আমাকে আকর্ষণ করিয়াছিল। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের দীর্ঘ হস্ত তাঁহার দিকে প্রসারিত, জাতীয়তাবাদী ভারত তাঁহার প্রতি উদাসীন এবং তাহার নিজেদের কমানিষ্ট বলিয়া পরিচয় দেন তাঁহাদের নিকট তিনি আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার জন্ত নিন্দিত। আমি জানিতাম, তিনি দীর্ঘকাল রুশিয়ায় ছিলেন এবং কোমিউটাণ্ডের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পরে তিনি তাহাদের ছাড়িয়াছেন, অথবা সম্ভবতঃ তাহারাই তাঁহাকে ছাড়িয়াছে। কেন ইহা ঘটিল, আমি জানি না। তাঁহার বর্তমান মত কি, গোঁড়া কমুনিষ্টদের সহিত তাঁহার মতভেদ কোথায়, সে বিষয়ে অস্পষ্ট ধারণা ছাড়া আমার ভাল জানা নাই।

করাচী কংগ্রেস

কিন্তু সর্বজন-পরিত্যক্ত এই মানুষটির জন্য আমি ব্যথিত হইয়াছিলাম। এবং আমার সাধারণ অভ্যাসের বিরুদ্ধেও আমি তাঁহার মামলা-পরিচালন কমিটিতে যোগ দিয়াছিলাম। সেই ১৯৩১ সালের গ্রীষ্মকালের পর হইতে তিন বৎসর তিনি জেলে আছেন, অসুস্থ দেহ লইয়া তাঁহাকে প্রকৃতপক্ষে নির্জনে দিন কাটাইতে হইতেছে।

করাচীতে কংগ্রেসের সর্বশেষ কাজ নূতন কার্য্যকরী সমিতি নির্বাচন। নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতি কর্তৃক ইহা নির্বাচিত হয়। কিন্তু নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতি, সেই বৎসরের নির্বাচিত সভাপতির মত-ই (গান্ধিজী ও অগ্ণাত সহকর্মীদের সহিত পরামর্শক্রমে) অল্পমোদন করেন, ইহা প্রথায় পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু করাচীতে কার্য্যকরী সমিতির নির্বাচন লইয়া এমন অবাঞ্ছিত ব্যাপার ঘটিল, বাহা পূর্বে কেহ ধারণা করিতে পারেন নাই। কয়েকজন মুসলমান সদস্য এই নির্বাচনে, বিশেষভাবে একজনের (মুসলমান) নির্বাচনে আপত্তি প্রকাশ করিলেন। তাঁহাদের দল হইতে কাহাকেও মনোনীত করা হয় নাই বলিয়া সম্ভবতঃ তাঁহার অসন্তুষ্টি হইয়াছিলেন। মাত্র পনের জন সদস্য লইয়া যে নিখিল ভারতীয় কমিটি গঠিত, সেখানে সকল শ্রেণীর স্বার্থকে প্রতিনিধিত্ব দেওয়া অসম্ভব। বর্তমান আপত্তি ব্যক্তিগত ও পঞ্জাবের ঘরোয়া ব্যাপার মাত্র, বাহার সম্বন্ধে আমরা কিছু জানিতাম না। ইহার ফলে পঞ্জাবের প্রতিবাদকারীরা কংগ্রেস হইতে দূরে সরিয়া ‘অহর দল’ অথবা ‘মজলিস-ই-অহরের’ সহিত যোগদান করিলেন। পঞ্জাবের কয়েকজন কর্মী ও জনপ্রিয় মুসলমান কংগ্রেসপন্থী উহাতে যোগ দিলেন এবং অনেক পাঞ্জাবী মুসলমান উহার সদস্য হইলেন। ইহা বিশেষভাবে নিম্ন মধ্যশ্রেণীর প্রতিষ্ঠান এবং নানাদিক দিয়া ইহার মুসলমান জনসাধারণের সহিত যোগ ছিল। এইরূপে ইহা শক্তিশালী হইয়া উঠিল। মূলহীন অস্তিত্বহীন বৈঠকখানায় সীমাবদ্ধ উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদের জরাজীর্ণ সাম্প্রদায়িক সভাগুলি অপেক্ষা এই নবীন দল অধিকতর প্রতিষ্ঠালাভ করিল। অহর দলও অনিবার্যরূপেই সাম্প্রদায়িকতার দিকে বুঁকিয়া পড়িল, কিন্তু মুসলমান জনসাধারণের সহিত ইহার যোগ থাকায় এক প্রকার অস্পষ্ট অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীও ইহাতে ছিল। এই দল দেশীয় রাজ্যে, বিশেষভাবে কাশ্মীর মুসলমান আন্দোলনে বড় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল; তবে ইহা বিশ্বয় ও দুঃখের কথা যে, অর্থনৈতিক দুর্গতির সহিত সাম্প্রদায়িক ভেদনীতিও একত্রে মিশ্রিত করা হইয়াছিল। অহর দলের কতিপয় নেতা কংগ্রেস ত্যাগ করায় পঞ্জাবে কংগ্রেস ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু করাচীতে আমরা ইহা অল্পমান করিতে পারি নাই, কয়েকমাস পরে ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। করাচীতে,

কার্যকরী সমিতির নির্বাচন লইয়া অসন্তোষই তাঁহাদের কংগ্রেস ত্যাগের কারণ নহে। উহাতে কেবল বুঝা গিয়াছিল যে, হাওয়া কোন্ দিকে বহিতেছে; প্রকৃত কারণ আরও গভীর!

আমরা করাচীতে থাকিতেই কাণপুর হইতে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সংবাদ আসিল। তার পরেই সংবাদ পাওয়া গেল যে, গণেশশঙ্কর বিজ্ঞার্থী যাহাদিগকে সাহায্য করিতে গিয়াছিলেন, সেই উন্নত জনতা তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। এই শ্রেণীর দাঙ্গায় পাশবিক বর্বরতা প্রায়শই দেখা যায়, কিন্তু গণেশজীর মৃত্যুতে আমরা উহার ভীষণতা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিলাম। তিনি এই কংগ্রেস শিবিরের সহস্র সহস্র ব্যক্তির পরিচিত ছিলেন এবং যুক্ত প্রদেশে তিনি আমাদের সকলেরই প্রিয় সহকর্মী ও বন্ধু ছিলেন। সাহসী ও উৎসাহী, দূরদর্শী ও স্ববিজ্ঞ, নৈরাশ্রহীন, সদাকর্মরত, যশে নির্লোভ বিজ্ঞার্থী সকলেরই প্রিয় ছিলেন। যৌবনের উৎসাহে তিনি আদর্শের সেবা করিতে গিয়া জীবন উৎসর্গ করিলেন, নির্বোধ হস্ত তাঁহাকে আঘাত করিয়া কাণপুর ও যুক্ত প্রদেশকে তাহাদের উজ্জল মণিখণ্ড হইতে বঞ্চিত করিল। করাচীতে সংবাদ আসিবার পর যুক্ত প্রদেশের শিবিরে বিষাদের ছায়া ঘনাইয়া উঠিল। যেন গৌরবরবি অন্তমিত হইল। যিনি অকম্পিতভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াছেন এবং সগৌরবে মৃত্যু বরণ করিয়াছেন, শোকের মধ্যেও তাঁহার জন্ত গর্বের কারণ ছিল।

৩৬

দক্ষিণ ভারতে বিশ্রাম

আমার চিকিৎসকগণ বিশ্রাম ও বায়ুপরিবর্তনের উপদেশ দিলেন। আমি এক মাসের জন্ত সিংহলে যাওয়া মনস্থ করিলাম; ভারতবর্ষ বিশাল দেশ কিন্তু ইহার কোন স্থানেই আমার মানসিক শান্তির অবকাশ নাই। কেন না, যেখানেই আমি যাইব, রাজনৈতিক সহযোগীদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে এবং একই সমস্যা সর্বদা আমার পশ্চাতে লাগিয়া থাকিবে। সিংহল দ্বীপই ভারতের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী স্থান, সেইজন্য কমলা ও ইন্দিরাকে লইয়া আমি সিংহল যাত্রা করিলাম। ১৯২৭ সালে ইউরোপ হইতে ফিরিবার পর এই আমার প্রথম বিশ্রাম এবং জীবনে এই প্রথম স্ত্রী ও কন্যার সহিত সমস্ত

দক্ষিণ ভারতে বিশ্রাম

কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শান্তিতে বিশ্রাম করিবার সময় পাইলাম।
জীবনে আর পুনরায় ইহা ঘটে নাই, ঘটিবে কি-না তাহাও জানি না।

নিউয়ারা ইলিয়ায় দুই সপ্তাহ ব্যতীত সিংহলেও আমরা বিশেষ বিশ্রাম
করিতে পারি নাই। এখানেও সকল শ্রেণীর লোকের আতিথেয়তা ও
প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে আমরা অভিভূত হইলাম। এই সকল শুভেচ্ছা
আনন্দদায়ক হইলেও সময় সময় বড় অসুবিধায় পড়িতে হয়। নিউয়ারা
ইলিয়ায় মজুরেরা, চা-বাগানের শ্রমিকেরা এবং অন্যান্য অনেকে কয়েক মাইল
দূর হইতে প্রত্যাহ দল বাদিয়া আসিত এবং বক্স ফুল, শাকসব্জী এবং গৃহে
প্রস্তুত মাখন ইত্যাদি মনোহর উপহার দিয়া যাইত। আমরা পরস্পরের
সহিত কথা কহিতে পারিতাম না, কেবল মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতাম।
আমাদের ক্ষুদ্র গৃহ এই সকল মূল্যবান উপহারে ভরিয়া উঠিতে লাগিল।
তাহারা দরিদ্র, তবুও এইগুলি সংগ্রহ করিত। আমরা ঐগুলি স্থানীয়
হাসপাতালে ও অনাথালয়ে পাঠাইয়া দিতাম।

আমরা অনেক ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ, বৌদ্ধ বিহার এবং মনোহর
অরণ্যরাজি দর্শন করিলাম, অম্বুরাধাপুরে বুদ্ধদেবের এক প্রাচীন উপবিষ্ট
মূর্ত্তি দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। এক বৎসর পরে যখন আমি দেৱাডুন
জেলে তখন সিংহল হইতে আমার এক বন্ধু এই মূর্ত্তির একখানি চিত্র
প্রেরণ করেন। আমি আমার সেলের মধ্যে ছোট টেবিলের উপর উহা
স্থাপন করিয়াছিলাম। বুদ্ধমূর্ত্তির দৃঢ় ও প্রশান্ত অবয়ব আমার মনকে
স্বিষ্ট করিত, এবং নৈরাশ্রের মূর্ত্তিতে ইহা আমাকে চিন্তা স্থির করিবার
বল প্রদান করিত।

বুদ্ধের প্রতি আমি চিরদিনই গভীরভাবে অমুরাগী। ইহার কারণ
বিশ্লেষণ করা কঠিন, তবে ইহা ধর্ম্মামুরাগ নহে। বৌদ্ধধর্ম্মের চারিদিকে
কালে কালে যে সকল অমুরাসন সৃষ্টি হইয়াছে তৎসম্পর্কেও আমার
কোনও কোতূহল নাই। ইহা মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি আমার আকর্ষণ।
এমনইভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের ব্যক্তিত্বের প্রতিও আমার আকর্ষণ আছে।

আমি রাজপথে এবং বিহারে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু দেখিয়াছি, সকলেই
তাহাদিগকে শ্রদ্ধা করে। তাহাদের প্রায় সকলের মুখেই ধীর শান্তির
আভাষ, জগতের দুঃখ, হুশিয়ার প্রতি এক অনাসক্তির ভাব। ইহাদের
মুখমণ্ডলে বুদ্ধির দীপ্তি নাই, মানসিক তীব্র সংগ্রামের কোনও চিহ্ন নাই,
ইহাদের জীবন যেন স্বচ্ছন্দগতি তটিনীর মত মৃদুভাবে মহাসমুদ্রে বহিয়া
চলিয়াছে। আমি তাহাদিগকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখিতাম, ঐরূপ প্রশান্তির
জন্ম আকাঙ্ক্ষা হইত, কিন্তু আমি নিশ্চিতরূপেই জানি যে, আমার ভাগ্য

জওহরলাল নেহরু

ভিন্নরূপ, ঝটিকা ও উত্তাল তরঙ্গমালার উপাদানে আমি গঠিত। আমার জন্ম এতটুকু শাস্তি নাই, বাহিরের মতই আমার অন্তরে ঝটিকা গজিয়া উঠে, তরঙ্গমালা ছুলিতে থাকে। যদি দৈবক্রমে আমি নিরাপদ অন্তরাল খুঁজিয়া পাই, যেখানে উন্নত বায়ু প্রবেশ করিতে পারিবে না, তাহা হইলেই কি আমি আত্মতৃপ্ত ও সুখী হইব ?

কিছুকালের জন্ম নিরালা গৃহকোণ অতি প্রীতিপ্রদ, নিশ্চিন্তে শুইয়া স্বপ্নবিলাসিতা, প্রকৃতির মোহময় যাত্নমন্ত্রে ভুলিয়া থাকা ভাল লাগে। আমার মনোভাবের সহিত সিংহল যেন মিশিয়া গিয়াছিল। এই দ্বীপের সৌন্দর্য্যে আমি মুগ্ধ হইলাম। আমাদের ছুটির মাস ফুরাইয়া গেল, অত্যন্ত দুঃখের সহিত আমরা বিদায় লইলাম। সেই মনোরম ভূমির এবং অধিবাসিগণের কত স্মৃতি এই কারাগারের দীঘ শূন্যময় দিনগুলিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মনে পড়ে। জাফ্নার একটি ক্ষুদ্র ঘটনার স্মৃতি মনে আছে। একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রেরা আমাদের গাড়ী থামাইয়া কয়েকটি সদয় বচনে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। উদগ্রীব ও উজ্জল মুখে বালকেরা দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের মধ্য হইতে একজন অগ্রসর হইয়া আমার হস্ত ধারণ করিল, সে প্রশ্ন করিল না, তর্ক তুলিল না, আমার মুখের দিকে চাহিয়া কেবল বলিল,—‘আমি টলিব না।’ সেই কমনীয় কিশোর মুখ, উজ্জল চক্ষু, দৃঢ়তাব্যঞ্জক ভঙ্গী আমার মনে মুদ্রিত রহিয়াছে। সে কে, আমি জানি না, তাহার পরিচয়ও পরে খুঁজিয়া পাই নাই। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে তাহার কথা রক্ষা করিবে এবং যখন জীবনের কঠিন সমস্যাগুলির সম্মুখীন হইবে তখন সে টলিবে না।

সিংহল হইতে আমরা কন্যাকুমারী হইয়া দক্ষিণ ভারতে আসিলাম। তারপর ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, মালাবার, মহীশূর, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি দেখিলাম। এগুলি অধিকাংশই দেশীয় রাজ্য, কতকগুলি উন্নতিশীল, কতকগুলি এখনও বহুলাংশে পশ্চাৎপদ। ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন শিক্ষার দিক দিয়া ব্রিটিশ ভারত হইতেও অগ্রসর। মহীশূর ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়া অগ্রগামী। হায়দ্রাবাদ সামন্ততন্ত্রের নিখুঁত দৃষ্টান্ত। আমরা সর্বত্রই কর্তৃপক্ষ ও জনসাধারণের নিকট হইতে সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার ও অভ্যর্থনা পাইয়াছি। কিন্তু আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, কর্তৃপক্ষের বাহ্যসৌজন্যের অন্তরালে একটু চিন্তাও ছিল, বুঝি-বা আমাদের সংস্পর্শে আসিয়া লোকে বিপজ্জনক-ভাবে চিন্তা করিতে আরম্ভ করে। মনে হইল, মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুরে তখন জনসাধারণকে কিছু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক কার্য্য করিবার স্বযোগ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু হায়দ্রাবাদে ইহা কিছুমাত্র নাই। এবং

দক্ষিণ ভারতে বিজ্ঞান

আমাদের চারিদিকে সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারের মধ্যেও অনুভব করিলাম যে, হায়দ্রাবাদ রুদ্ধকণ্ঠ, শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলিতেও ভীত। পরে অবশ্য মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুর গভর্নমেন্টও তাঁহাদের পূর্বদত্ত ব্যক্তিস্বাধীনতা ও রাজনৈতিক কার্যের অধিকার প্রত্যাহার করিয়াছিলেন।

মহীশূর রাজ্যের বাঙ্গালোরে বৃহৎ জনতার সম্মুখে আমি এক স্মৃ-উচ্চ লৌহদণ্ডের উপর জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলাম। আমার প্রশ্বাসের কিছুদিন পরেই সেই লৌহদণ্ডটি টু করা টু করা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছিল এবং মহীশূর গভর্নমেন্ট জাতীয় পতাকা উড্ডীন করা অপরাধ বলিয়া নির্দোষ করিয়াছেন। আমি যে পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলাম তাহার প্রতি দুর্ব্যবহার ও অপমানে আমি অত্যন্ত অপমানিত হইয়াছিলাম।

ত্রিবাঙ্কুরে এখনও কংগ্রেস বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষিত এবং কেহ কংগ্রেসের সমস্ত হইতে পারে না। যদিও আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত হইবার পর ব্রিটিশ ভারতে ইহা বৈধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এইরূপে মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুরে সাধারণ শাস্তিপূর্ণ রাজনৈতিক কার্য্যও দমন করা হইয়াছে এবং পূর্বপ্রদত্ত কিছু সুরবিধা পুনরায় কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। ইহারা পিছু হটিয়া চলিয়াছে। হায়দ্রাবাদের পক্ষে অবশ্য পিছু হটিবার কি সুরবিধা কাড়িয়া লইবার কোনও কথাই উঠে না। কেন না, ইহা কোন দিনই একপদও অগ্রসর হয় নাই কিম্বা কোনও সুরবিধা জনসাধারণকে দেয় নাই। হায়দ্রাবাদে রাজনৈতিক সভা বলিয়া কেহ কিছু জানে না, এমন কি, সামাজিক ও ধর্মবিষয়ক সম্মেলনগুলিও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হয় এবং ঐ গুলির জ্ঞানও পূর্ব হইতে বিশেষ অন্তর্মতি লইতে হয়। সংবাদপত্র বলিতে যাহা বুঝায় তাহার একখানিও এখানে নাই এবং ভারতের অগ্ন্যাশ্রয় অঞ্চল হইতেও বহু সংবাদপত্র দূষিতভাবে আমদানী হইবার ভয়ে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। এই নিয়ম এত কঠোর যে, মডারেটগণ-পরিচালিত কাগজেরও প্রবেশাধিকার নাই। কোচিনে আমরা 'শ্বেতকায় ইন্দুদেব' অঞ্চল এবং তাহাদের এক প্রাচীন উপাসনালয়ে প্রার্থনাদি দেখিলাম। এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায় অতি প্রাচীন এবং অনন্তসাধারণ। ইহাদের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। আমরা শুনিলাম, কোচিনের যে অংশে ইহারা বাস করেন তাহার সহিত প্রাচীন জেকুজালেমের সাদৃশ্য আছে। ইহা যে প্রাচীন তাহা দেখিলেই বুঝা যায়।

মালাবারের কয়েকটি সহরে আমরা প্রাচীন সিরিয়ান খৃষ্টানদিগের সংখ্যাধিক্য লক্ষ্য করিলাম। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেই ইউরোপ খৃষ্টান হইবার বহু পূর্বেই ভারতে খৃষ্ট ধর্ম আসিয়াছিল এবং দক্ষিণ ভারতে

উহা স্বপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অতি অল্প লোকেরই এ বিষয়ে ধারণা আছে। যদিও এই সকল খৃষ্টানের ধর্মগুরু এটিয়ং বা সিরিয়ার অন্ত কোনও স্থানে থাকেন, তথাপি ইহাদের খৃষ্টান ধর্ম কার্য্যতঃ লৌকিক ব্যাপার এবং, বাহিরের সঙ্গে কোন সম্পর্কই নাই।

দক্ষিণ ভারতে নোষ্টারিয়ানদের একটি উপনিবেশ দেখিয়া আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলাম। তাহাদের বিশপের নিকট শুনিলাম যে, ইহারা সংখ্যায় দশ সহস্র হইবে। আমার ধারণা ছিল, নোষ্টারিয়ানরা অগ্নাগ্ন সম্প্রদায়ের সহিত অনেক দিন মিশিয়া গিয়াছে, ভারতে যে তাহাদের অস্তিত্ব আছে, আমার এ ধারণাও ছিল না। আমি শুনিলাম, এক সময় ভারতে তাহাদের সংখ্যা অনেক বেশী ছিল, এমন কি, উত্তর ভারতের কাশী পর্য্যন্ত তাহারা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

আমরা! শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু এবং তাঁহার কন্যাদ্বয় পদ্মজা ও নীলমণির সহিত দেখা করিবার জন্যই হায়দ্রাবাদ গিয়াছিলাম। তাঁহাদের গৃহে অবস্থানকালীন পর্দানবীন মহিলাদের একটি ছোট বৈঠক আহূত হয়। আমার স্ত্রীর সহিত সকলের পরিচয় করাইয়া দেওয়াই এই বৈঠকের উদ্দেশ্য। কমলা এই বৈঠকে কিছু বলিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি নারীজাতির স্বাধীনতা ও মনুষ্য রচিত আইন ও প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ (তাঁহার প্রিয় আলোচ্য বিষয়) সম্পর্কে বক্তৃতা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, স্ত্রীলোকের পক্ষে কখনও পুরুষের অতিরিক্ত বাধ্য হওয়া ভাল নয়। দুই কি তিন সপ্তাহ পর এই বক্তৃতার এক কৌতুককর পরিণতির সংবাদ পাইয়াছিলাম। একজন বিভ্রান্ত স্বামী হায়দ্রাবাদ হইতে কমলার নিকট পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, ‘তিনি ঐ নগরে আসার পর হইতে আমার স্ত্রীর ব্যবহার অতি দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। তিনি আমার কথা শুনে ন, পূর্ব্বের মত আমার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করেন না বরং উন্টী তর্ক শুরু করেন এবং সময় সময় অত্যন্ত উগ্রা হইয়া উঠেন।’

যে বোম্বাই হইতে সমুদ্রপথে সিংহল গিয়াছিলাম, সেই বোম্বাই-এ এই সাত সপ্তাহ পরে ফিরিয়া আসিলাম এবং তৎক্ষণাৎ কংগ্রেসের রাজনীতিতে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশন হইতে লাগিল। ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর দ্রুত পরিবর্তন, যুক্ত প্রদেশের কৃষক-অসন্তোষ, আব্দুল গফুর খানের নেতৃত্বে সীমান্ত প্রদেশে লালকুর্ভা দলের অভূতপূর্ব্ব বিস্তার, বাঙ্গলার রুদ্ধ অসন্তোষ অশান্তি ও প্রবল মানসিক উত্তেজনা, নিত্য বর্তমান সাম্প্রদায়িক সমস্যা, স্থানীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলহ, কংগ্রেসকর্ম্মী ও গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদের মধ্যে নানা বিষয় লইয়া মতভেদ এবং পরস্পরের

সন্ধিকালের সংঘর্ষ

প্রতি দিল্লী-চুক্তি ভঙ্গ করিবার অভিযোগ। আলোচনার বিষয়ের অভাব ছিল না। তার পর সেই পৌনঃপুনিক প্রশ্ন, কংগ্রেস দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে প্রতিনিধি প্রেরণ করিবে কি-না? মহাত্মার কি যাওয়া উচিত?

৩৭

সন্ধিকালের সংঘর্ষ

গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করিবার জন্ত গান্ধিজী লগুনে যাইবেন কি-না? পুনঃ পুনঃ এই প্রশ্ন উঠিতে লাগিল, কোন সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত হইল না। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কি ঘটবে, তাহা কার্য্যকরী সমিতি, এমন কি, গান্ধিজীও জানিতেন না। ঘটনারাজীর সংঘাতে অবস্থার নিত্য নূতন পরিবর্তন এবং আরও অনেক বিষয়ের উপর এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে। অতি জটিল সমস্যাগুলিও এই প্রশ্নোত্তরের সহিত জড়িত ছিল।

ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে এবং তাঁহাদের বন্ধুগণ আমাদেরকে বারংবার বলিতে লাগিলেন যে, গোল টেবিল বৈঠকে, শাসনতন্ত্রের কাঠামো তৈয়ারী করা হইয়াছে; প্রধান প্রধান সীমারেখাগুলিও টানা হইয়াছে; এখন উহার মধ্যে যেখানে যাহা আঁকিতে হইবে তাহাই বাকী। কিন্তু কংগ্রেসের মনে একরূপ ধারণা ছিল না, তাঁহাদের বিশ্বাস প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পুনরায় নূতন করিয়া আঁকিতে হইবে। দিল্লী-সন্ধি অমুসারে যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তি ও কিছু কিছু রক্ষাকবচ স্বীকার করা হইয়াছে, ইহা সত্য, আমরা অনেকেই মনে করিতাম যে, ভারতের শাসনতন্ত্রগত সমস্তার যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মীমাংসা; কিন্তু তাহার অর্থ ইহা নহে যে, প্রথম গোল টেবিল বৈঠক নির্দিষ্ট যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করিব। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সামাজিক পরিবর্তনের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের সম্পূর্ণ সঙ্গতি রহিয়াছে। কিন্তু রক্ষাকবচগুলির সহিত উহার সঙ্গতি রক্ষা করা অতি কঠিন; কেন না, সাধারণভাবেই উহা রাষ্ট্রের স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করিবে, যদিও 'ভারতের স্বার্থের জন্ত' কথাটি জুড়িয়া দেওয়ায় কিছু সুবিধা হইয়াছে, তথাপি সম্ভবতঃ উহা বিশেষ কার্য্যকরী হইবে না। যাহা হউক, করাচী কংগ্রেস স্পষ্ট নির্দেশ দিয়াছিল যে, নূতন শাসনতন্ত্রে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি, রাজস্ব ও অর্থনৈতিক

জওহরলাল নেহরু

ব্যবস্থার উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব দিতে হইবে। ভারতের বৈদেশিক ঋণ (অধিকাংশই ব্রিটিশ) সমস্তা পরীক্ষা ও আলোচনার পর উহার দায়িত্ব গ্রহণ করা হইবে। এতদ্ব্যতীত মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত প্রস্তাবে ঈক্ষিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রস্তাব ছিল। এ সকলই গোল টেবিল বৈঠকের অনেক সিদ্ধান্ত ও ভারতের প্রচলিত শাসনব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্যহীন। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ও কংগ্রেসের মতের দ্বন্দ্বের ব্যবধান ছিল; এই অবস্থায় উহার সংযোগসাধন সম্ভবপর নহে বলিয়াই অস্বীকৃত হইল। গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের সহিত গভর্নমেন্টের ঐক্যমত হইতে পারে, এমন প্রত্যাশা কংগ্রেসপন্থীদের মনে প্রায় ছিল না। গান্ধিজীর মত আশাবাদীও অধিক প্রত্যাশার কিছু দেখিলেন না। কিন্তু তিনি নিরাশ হইলেন না, শেষ পর্যন্ত দেখিবার জ্ঞান প্রস্তুত হইলেন। আমরাও মনে করিলাম সফল হই আর নাই হই দিল্লী-সন্ধি অল্পসারে আমাদের কাছে চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু এমন দুইটি প্রধান বিবেচ্য বিষয় দেখা দিল, যাহার ফলে আমাদের গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের বিষয় উপস্থিত হইতে পারে। আমাদের মতামত সমগ্রভাবে বৈঠকে উপস্থিত করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা পাইলে আমরা যাইতে পারি, পূর্বেই বৈঠকে উহা আলোচনা হইয়াছে এইরূপ অজুহাত বা অগাধ কারণ দর্শাইয়া আমাদের কাছে কোন প্রস্তাব উপস্থিত করিতে বাধ্য দেওয়া না হয়। ভারতের অবস্থাও এরূপ দাঁড়াইতে পারে যে, আমাদের বৈঠকে যাওয়া ঘটিয়া উঠিবে না। এমন হইতে পারে যে, গভর্নমেন্টের সহিত আমাদের সংঘর্ষ বাড়িয়া উঠিবে এবং আমরা তীব্র দমননীতির সম্মুখীন হইব। যদি ঘরে আগুন লাগিয়া উঠে, তবে তাহা তুলিয়া আমাদের প্রতিনিধি লণ্ডনে বসিয়া শাসনতন্ত্র লইয়া তত্ত্বালোচনায় ব্রতী থাকিবেন, ইহা অসম্ভব।

ভারতে অবস্থা অতি দ্রুত মন্দ হইতে লাগিল। দেশের সর্বত্র, বিশেষভাবে বাঙ্গলা, যুক্ত-প্রদেশ ও সীমান্ত প্রদেশে ইহা প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। বাঙ্গলায় দিল্লী-সন্ধির ফলে বিশেষ কোন পরিবর্তনই হয় নাই; মন কষাকষি ক্রমেই গুরুতর হইতে লাগিল। আইন অমান্য আন্দোলনের অনেক বন্দীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কিন্তু সহস্র সহস্র রাজনৈতিক বন্দীকে সামগ্রিক কারণে আইন অমান্য আন্দোলনের বন্দা নহে বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল না। অন্তরীণে আবদ্ধ ব্যক্তির বাহিরে নির্দিষ্ট স্থানে অথবা বন্দীশালায় আটক রহিল। ‘সিদ্দিসানী’ বক্তৃতা বা অগাধ রাজনৈতিক কার্যের জ্ঞান গ্রেফতার চলিতে লাগিল এবং গেল, গভর্নমেন্টের আক্রমণ সমানভাবেই চলিতেছে। টেরোরিজম্-এর অস্তিত্বের জ্ঞান বাঙ্গলার সমস্ত

সম্মিলনের সংঘর্ষ

কংগ্রেসের নিকট অধিকতর কঠিন হইয়া উঠিল। আইন অমান্য আন্দোলন ও সাধারণ রাজনৈতিক কার্যের তুলনায়, গুরুত্ব ও বিস্তৃতির দিক দিয়া টেরোরিষ্ট কার্যপ্রণালী অতি তুচ্ছ। কিন্তু ইহা উৎসর্গে ঘোষিত হওয়ায় লোকের বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। এবং ইহার ফলে অগ্রগত প্রদেশ অপেক্ষা এখানে কংগ্রেসের কার্য-পরিচালন করা বিঘ্নসঙ্কুল ছিল, কেন না, টেরোরিজম-এর আবহাওয়া, প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক শাস্তিপূর্ণ কার্যপ্রণালীর প্রতিকূল। ইহার ফলে গভর্ণমেণ্ট দমননীতিকে তীব্র করিয়া তুলিলেন এবং তাহার আঘাত নিরপেক্ষভাবে টেরোরিষ্ট, অ-টেরোরিষ্ট সকলের উপরই পড়িতে লাগিল।

কংগ্রেসপন্থী, শ্রমিক ও কৃষক কর্মী এবং যাহাদের কার্য গভর্ণমেণ্ট পছন্দ করেন না, তাহাদের বিরুদ্ধে বিশেষ আইন ও অর্ডিন্যান্সগুলি (টেরোরিষ্টদের উদ্দেশ্যে রচিত) প্রয়োগ না করিয়া আত্মসম্বরণ করা পুলিশ ও স্থানীয় কর্মচারীদের পক্ষে কঠিন হইল। যে সকল বন্দী দীর্ঘকাল যাবৎ বিনা অভিযোগে, বিচার বা দণ্ড ব্যতিরেকেও আটক আছেন, তাহাদের অপরাধ সম্ভবতঃ টেরোরিজম সংক্রান্ত নহে, অল্প প্রকার কার্যকরী রাজনৈতিক প্রচেষ্টার জগুই তাঁহারা বন্দী। তাঁহাদিগকে কোন কিছু প্রমাণ বা অপ্রমাণ করিবার সুবিধা দেওয়া হয় নাই, অথবা তাঁহাদের অপরাধ কি তাহাও জানিতে দেওয়া হয় নাই। তাঁহাদিগকে প্রকাশ্য আদালতে বিচারের জগু উপস্থিত করা হয় নাই, সম্ভবতঃ পুলিশ এমন সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারে নাই, যাহার ফলে তাঁহাদের দণ্ড হইতে পারে। অথচ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অপরাধ সম্প্রসিক্ত, ব্রিটিশ ভারতের আইনগুলি এত নিখুঁত ও সর্বব্যাপী যে তাহার কবল হইতে মুক্তি পাওয়া কঠিন। এমন ঘটনাও ঘটে যে, কারাগার হইতে মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ তাহাকে ধরিয়া অন্তরীণে আবদ্ধ করে।

বঙ্গলার এই জটিল সমস্যা লইয়া কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি নিজেদের অত্যন্ত অসহায় বোধ করিতে লাগিলেন। ইহা লইয়া তাঁহারা বিব্রত হইলেন, তাহার উপর বঙ্গলা হইতে আরও অনেক বিষয় নানারূপে তাঁহাদের সম্মুখে আসিতে লাগিল। তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা জানিতেন যে, প্রকৃত সমস্যার তাঁহারা কিছুই করিতে পারিতেছেন না। অতএব তাঁহারা দুর্বলভাবে ঘটনার গতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; তখন তাঁহাদের যে অবস্থা, তাহাতে তাঁহারা আর কি করিতে পারিতেন বলা কঠিন। কার্যকরীসমিতির এই মনোভাবে বঙ্গলার চিত্তে অসন্তোষের সঞ্চার হইল এবং তাঁহারা মনে করিতে লাগিলেন,

জওহরলাল নেহরু

কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য প্রদেশ বাঙলার প্রতি উদাসীন। বিপদের সময় যেন বাঙলাকে সকলে পরিত্যাগ করিয়াছে। এই ধারণা সম্পূর্ণরূপেই ভ্রান্ত; সমস্ত ভারতের সহানুভূতি বাঙলার প্রতি ছিল; কিন্তু তাহা কার্যে পরিণত করিবার পথ ছিল না। তাহা ছাড়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও নিজেদের বিহ্ব বিপদ ছিল।

যুক্ত প্রদেশে কৃষক সমস্যা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিল। প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট সমস্যা লইয়া প্রথমতঃ গা ভাসান দিলেন, রাজস্ব ও খাজনা মাপের সিদ্ধান্তে বিলম্ব করিতে লাগিলেন, তারপর জোর করিয়া আদায় শুরু হইল। পাইকারীভাবে উচ্ছেদ ও ক্রোক চলিল। আমরা যখন সিংহলে ছিলাম, তখন জোর করিয়া খাজনা আদায় লইয়া দুই-তিন জায়গায় হাঙ্গামা হইল। ইহা অত্যন্ত ক্ষুদ্র ব্যাপার হইলেও দুর্ভাগ্যক্রমে একস্থলে তাহার ফলে জমিদার অথবা তাহার গোমস্থার মৃত্যু হইল। গান্ধিজী নৈনীতালে গিয়া (আমি তখন সিংহলে) যুক্ত প্রদেশের গভর্নর শ্রী ম্যালকম হেলীর সহিত কৃষক সমস্যার আলোচনা করিলেন, কিন্তু বিশেষ ফল হইল না। গভর্নমেন্ট খাজনা মকুব ঘোষণা করিলেন বটে, কিন্তু তাহা প্রত্যাশা অপেক্ষা অনেক কম এবং ক্রমাগত ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বাড়িতে লাগিল। জমিদার ও গভর্নমেন্ট একত্র হইয়া কৃষকদের উপর চাপ দিতে লাগিলেন, সহস্র সহস্র কৃষককে জরি হইতে উচ্ছেদ করা হইল, তাহাদের সামান্য সম্পত্তি ক্রোক করা হইল, যে অবস্থা হইল, তাহা অন্য দেশে হইলে এক বৃহৎ কৃষক বিদ্রোহে পর্যাবসিত হইত। আমার বিশ্বাস, প্রধানতঃ কংগ্রেসের চেষ্টার ফলেই কৃষকেরা বলপ্রয়োগে বিরত ছিল। কিন্তু তাহাদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ ও জবরদস্তীর অন্ত ছিল না।

কৃষকদের অসন্তোষ ও দুঃখ দুর্দশার একটা ভাল দিকও ছিল। শস্তের মূল্য বহুল পরিমাণে হ্রাস হওয়ায় দরিদ্রশ্রেণীর ব্যক্তিরা এবং কৃষকেরা (যাহাদের জমি হইতে উচ্ছেদ করা হয় নাই) দীর্ঘকাল পর পেট ভরিয়া দুটি খাইতে পাইত।

বাঙলার মতই সীমান্ত প্রদেশও দিল্লী-সন্ধির ফলে শান্তি পাইল না। উভয় পক্ষের মনোমালিঙ্গ সর্বদাই প্রবল, কেন না, এখানে গভর্নমেন্ট সমর বিভাগীয় ব্যাপার; বহুতর বিশেষ আইন ও অভিজ্ঞানের ছড়াছড়ি এবং সামান্য অপরাধেও গুরুদণ্ড হয়। এই অবস্থার বিরুদ্ধে আব্দুল গফুর খাঁ আন্দোলন করিতে লাগিলেন, ফলে তিনি গভর্নমেন্টের চক্ষুশূল হইয়া উঠিলেন। সেই ছয় ফিট তিন ইঞ্চি উচ্চ দীর্ঘ সমুন্নত পাঠান-পোকুষের মূর্তি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পদব্রজে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং সর্বত্র

সন্ধিকালে সংঘর্ষ

লালকুর্ভা বাহিনীর কেন্দ্র স্থাপন করিলেন। তিনি : তাঁহার কর্মীরা দেশের সর্বত্র “খুদাই খিদমতগার”-এর শাখা-প্রশাখা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইহাদের আন্দোলন সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ, অস্পষ্ট অভিযোগ ছাড়া একটিও বলপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত কেহ দেখাইতে পারেন নাই। ইহারা শান্তিকামী হউক আর নাই হউক ; যুদ্ধ ও হিংসার পারস্পর্য পাঠানদের আছে ; তাহার উপর অতি নিকটেই দুর্দর্শ পাঠান উপজাতির রহিয়াছে ; কাজেই ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের সহিত বোগহুত্র রক্ষা করিয়া এই সুশৃঙ্খলিত আন্দোলন দেখিয়া গভর্ণমেন্ট বিচলিত হইলেন। ইহাদের শান্তি ও অহিংসার আদর্শ গভর্ণমেন্ট বিশ্বাস করিয়াছিলেন, আমার এরূপ মনে হয় না। যদি তাঁহারা বিশ্বাসও করিতেন, তাহা হইলেও তাঁহারা প্রতিক্রিয়ার মুখে বিরক্ত ও ভীত হইতেন। এই আন্দোলনের বর্তমান ও ভাবী শক্তির সম্ভাবনা দেখিয়া তাঁহাদের মাথা ঠিক রাখা কঠিন হইল।

এই বিরাট আন্দোলনের অবিসম্বাদী নেতা আব্দুল গফুর খাঁ—“ফকর-ই-আফগান,” “ফকর-ই-পাঠান,” (পাঠান গৌরব) “গান্ধী-ই-সারহাদ” অর্থাৎ সীমান্ত গান্ধী নামে—সর্বসাধারণের নিকট পরিচিত। বিদ্রোহবাদ ও গভর্ণমেন্টের বিরোধিতায় অটল থাকিয়া তিনি ধীরতা ও অধ্যবসায়ের সহিত কার্য করিয়া সীমান্ত প্রদেশে অপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছেন। রাজনীতিক বলিতে সচল্যচর যাহা বুঝায় তিনি তাহা ছিলেন না, রাজনীতির ছলা-কলা তাঁহার অজ্ঞাত। দীর্ঘকায় সরল মানুষ, দেহ ও মন দুই-ই সরল, তিনি ছদ্মগু ও বাচালতা দুই-ই ঘৃণা করেন ; তিনি ভারতের স্বাধীনতার সহিত সীমান্তপ্রদেশের স্বাধীনতা চাহেন ; কিন্তু শাসনতন্ত্র-ঘটিত খাটনের জটিল প্রশ্নের প্রতি উদাসীন। তবে কিছু লাভ করিতে হইলে কার্য আবশ্যক, তাই তিনি মহাত্মা গান্ধীর অনুগামী হইয়া শান্তিপূর্ণ উপায় গ্রহণ করিয়াছেন। কার্যের জ্ঞান সজ্ঞ আবশ্যক, যুক্তিতর্ক নিয়মকানুন রচনা লইয়া মাথা না ঘামাইয়া তিনি সোজা-সুজি সজ্ঞ গঠন আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং সাফল্য লাভ করিলেন।

গান্ধিজীর প্রতি তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। প্রথম প্রথম তিনি স্বাভাবিক লজ্জা ও বিনয়বশতঃ কোন ব্যাপারেই সম্মুখে আসিতেন না এবং গান্ধিজী হইতে দূরে থাকিতেন। পরে নানা বিষয় আলোচনার মধ্য দিয়া তাঁহাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে। আমাদের অনেকের অপেক্ষাও অধিকতর নিষ্ঠার সহিত এই পাঠান যে অহিংসার আদর্শ গ্রহণ করিলেন, ইহা অতীব বিস্ময়কর। এই আত্মবিশ্বাস বলেই তিনি পাঠানদিগকে উত্তেজনার কারণের সম্মুখেও শান্তিপূর্ণ থাকিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তবে

সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসীরা হিংসা বা বলপ্রয়োগের ভাব একেবারেই ত্যাগ করিয়াছে একথা বলা হাশ্বকর ; অত্যাচার প্রদেশের সাধারণ লোকদের সম্বন্ধেও ঐরূপ কথা বলা হাশ্বকর। জনতা ভাবাবেগেই চালিত হয়, উত্তেজনার মুহূর্তে তাহারা কি করিয়া বসিবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। তথাপি ১৯৩০-এ এবং পরে সীমান্তের অধিবাসীরা অতি আশ্চর্য্য সংযম ও শৃঙ্খলা দেখাইয়াছিল।

সরকারী কর্মচারীরা এবং আমাদের দেশের নিরীহ ভদ্রলোকেরা ‘সীমান্ত-গান্ধীকে’ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখের কথা কেহই বিশ্বাস করিলেন না, একটা গভীর ষড়যন্ত্র কল্পনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু গত কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি এবং সীমান্তের সহকর্মীরা ভারতের অত্যাচার প্রদেশের কংগ্রেসকর্মীদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছেন ; ফলে সকলের মধ্যে প্রীতি ও সহযোগিতার বন্ধন দৃঢ় হইয়াছে। কংগ্রেস মহলে আব্দুল গফুর খাঁ সুপরিচিত ও জনপ্রিয়। একজন ব্যক্তিবিশেষ সহকর্মীরূপে নহে, ভারতের দৃষ্টিতে তিনি আমাদের সহিত একই সংগ্রামে লিপ্ত এক সাহসী ও তুর্দৃষ্ণ জাতির শৌর্য ও ত্যাগের প্রতীকমূর্তিরূপে প্রতিভাত।

আব্দুল গফুর খাঁর কথা শুনিবার বহুপূর্বে আমি তাঁহার ভ্রাতা ডাঃ খাঁ সাহেবকে চিনিতাম। আমি যখন কেমব্রিজে, তিনি তখন লণ্ডন সেন্ট-টমাস হাসপাতালের ছাত্র। পরে যখন আমি ইনার টেম্পলে ব্যারিষ্টারীর থানা খাইতে সুরু করিলাম, তখন তাঁহার সহিত আমার বন্ধুত্ব হয়। লণ্ডনে প্রায় প্রত্যহই আমরা মিলিত হইতাম। আমি ভারতে ফিরিবার পরও তিনি অনেক বৎসর ইংলণ্ডে ছিলেন, যুদ্ধের সময় চিকিৎসকরূপে কাজ করিয়াছিলেন। পরে নৈনী জেলে আমাদের পুনরায় সাক্ষাৎ হয়।

সীমান্তের ‘লাল কুর্ভাদল’ কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করিলেও তাহাদের প্রতিষ্ঠান স্বতন্ত্র ছিল। কংগ্রেস ও তাহাদের মধ্যে আব্দুল গফুর খাঁ ছিলেন যোগসূত্র। সীমান্তের জননায়কদের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্যকরী সমিতি ১৯৩১-এর গ্রীষ্মকালে ‘লাল কুর্ভাদল’কে কংগ্রেসের অঙ্গীভূত করিবার সিদ্ধান্ত করিলেন। তাহার পর হইতে ‘লাল কুর্ভা’ আন্দোলন কংগ্রেসের অংশরূপে পরিগণিত হইল।

করাচী কংগ্রেসের পর গান্ধিজী সীমান্ত প্রদেশে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু গভর্ণমেন্ট ইহাতে উৎসাহ প্রদর্শন করিলেন না; পরে কয়েকমাস ধরিয়া সরকারী কর্মচারীরা লাল কুর্ভাদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে ক্রমাগত যখন অভিযোগ করিতে লাগিলেন, তখনও গান্ধিজী বারম্বার সীমান্ত প্রদেশ প্রবেশের অনুমতি চাহিয়া ব্যর্থকাম হইলেন। আমাকেও সেখানে যাইতে দেওয়া হইল না। দিল্লী-সন্ধি অনুযায়ী, গভর্ণমেন্টের স্পষ্ট

সঙ্গিকালে সংঘর্ষ

অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে সীমান্ত প্রদেশে যাওয়া আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম না।

এ সকল ছাড়াও সাম্প্রদায়িক সমস্তা কার্যকরী সমিতির সম্মুখে এক প্রধান সমস্তা। যদিও ইহা নানা অদ্ভুত বেশে ও রূপে বারবার আবির্ভূত হয়, তথাপি ইহার মধ্যে নূতন কিছুই নাই। গোলটেবিল বৈঠকে ইহার মর্যাদা কিছু বাড়িয়াছিল; ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট অত্যাশ্চর্য বিষয় অপেক্ষা ইহাকেই মুখ্য করিয়া সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন। বৈঠকের সদস্যগণ সকলেই গভর্নমেন্ট কর্তৃক মনোনীত। এই মনোনয়ন এমন ভাবে করা হইয়াছিল যে, সকলেই স্ব স্ব সম্প্রদায়ের কথা, বিশিষ্ট স্বার্থের কথা এবং সাধারণ বৃহত্তর স্বার্থের পরিবর্তে পরস্পরের মতভেদের কথাই তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন, গভর্নমেন্ট কোন জাতীয়তাবাদী মুসলমানকে প্রতিনিধি মনোনীত করিতে নিতান্ত উগ্রভাবে সোজাসৃজি অস্বীকার করিয়াছিলেন। গান্ধিজী অমুভব করিলেন, যদি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের নির্দেশে বৈঠক প্রথম হইতেই সাম্প্রদায়িক সমস্তার জালে জড়াইয়া পড়ে, তাহা হইলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্তাগুলি লইয়া সম্যক আলোচনা সম্ভবপর হইবে না। এই অবস্থায় তাঁহার বৈঠকে যোগদান করার বিশেষ কোন ফল হইবে না। তিনি কার্যকরী সমিতির সম্মুখে প্রস্তাব করিলেন যে, বিভিন্ন দলের মধ্যে পূর্বে হইতে সাম্প্রদায়িক সমস্তার সমাধান ও ব্যাপড়া হইলে তিনি লগুনে যাইতে পারেন। তিনি ঠিক সিদ্ধান্তই করিয়াছিলেন; কিন্তু কার্যকরী সমিতি বলিলেন, তিনি সাম্প্রদায়িক সমস্তার সমাধান করিতে পারেন নাই বলিয়া লগুনে যাইবেন না। এরূপ হইতে পারে না, এখন তাঁহার অস্বীকার করা উচিত নহে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের লইয়া সমাধানের একটা খসড়া তৈয়ারীর চেষ্টা হইল বটে, কিন্তু বিশেষ সাফল্য লাভ করা গেল না।

১৯৩১-এর গ্রীষ্মকালে ঐ সকল প্রধান সমস্তা ছাড়াও অনেক ছোট খোট ব্যাপার লইয়া আমাদের বিরত হইতে হইল। দেশের নানাস্থান হইতে স্থানীয় কংগ্রেস কমিটিগুলি আমাদেরিগকে ক্রমাগত সংবাদ দিতে লাগিলেন যে, স্থানীয় কর্মচারীরা দিল্লী-চুক্তি ভঙ্গ করিতেছেন। ইহার মধ্যে প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি বাছিয়া লইয়া আমরা গভর্নমেন্টকে জানাইতে লাগিলাম। গভর্নমেন্ট আবার কংগ্রেসপন্থীদের বিরুদ্ধে সন্ধি-বিরোধী কার্যের পান্টা অভিযোগ করিতে লাগিলেন। এরূপ পরস্পরের দোষ প্রদর্শন চলিতে লাগিল, পরে উহা সংবাদপত্রে প্রচারিত হইয়াছিল। বলাবাহুল্য, ইহাতে কংগ্রেস ও গভর্নমেন্টের সম্পর্কের কোন উন্নতি হইল না।

জওহরলাল নেহরু

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার লইয়া এই কলহের বাহ্যতঃ কোন গুরুত্ব নাই। কিন্তু ইহার মূলে রহিয়াছে এক গভীর সংঘর্ষ, যাহার উপর ব্যক্তির কোন হাত নাই। যাহার উৎপত্তি আমাদের জাতীয় আলোড়ন হইতে, পল্লীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিপর্যয় হইতে; মূল ভিত্তিতে পরিবর্তন না করিয়া তাহার নিরসন অসম্ভব। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের প্রথম মূহুর্ত হয়, মধ্যশ্রেণীর আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ খুঁজিবার আগ্রহ হইতে, তাহার পশ্চাতে ছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেরণা। ইহা পরে নিম্নমধ্যশ্রেণীতে প্রসারিত হইয়া শক্তিশালী হইল। তারপর যেখানে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য চরমসীমায় পৌছিয়াছে, সেই জনসাধারণের মধ্যে ইহা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিল। পল্লীর প্রাচীন আত্মতৃপ্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বহুদিন লুপ্ত হইয়াছে। কৃষিকার্যের পরিপূরক কুটির-শিল্প, যাহার ফলে জমির উপর এত চাপ পড়িত না, তাহা কতক পরিমাণে শাসননীতির জন্ত, বেশীর ভাগ আধুনিক যুগের কলকারখানার প্রতিযোগিতায় টিকিতে না পারিয়া বিলুপ্ত হইয়াছে। জমির উপর চাপ বাড়িয়াছে, কিন্তু সেই তুলনায় ভারতে কল-কারখানা গড়িয়া উঠে নাই বলিয়া অবস্থার বিশেষ তারতম্য হয় নাই। আত্মরক্ষার উপযুক্ত উপকরণহীন, দুর্ব্বল-ভার পীড়িত পল্লীগুলি জগতের পণ্যশালার আঘাতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। সমান সূত্রে ইহা প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। পল্লীর উৎপাদন প্রণালী আদিম যুগের এবং ভূমিসংক্রান্ত প্রচলিত ব্যবস্থার ফলে তাহা এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে পরিণত হইয়াছে যে, কোন উন্নততর ব্যবস্থার প্রবর্তন অসম্ভব। কাজেই কৃষির উপর নির্ভরশীল ব্যক্তির—জমিদার রায়তের অবস্থা (কয়েক বৎসরের তেজী বাজার ছাড়িয়া দিলে) দিন দিন শোচনীয় হইতেছে। জমিদার তাহার বোঝা রায়তদের ঘাড়ে চাপাইতেছেন এবং কৃষকদের ক্রমবর্দ্ধিত দারিদ্র্য—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকদার, জোতদার ও রায়ত—সকলকেই জাতীয় আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট করিতেছে। পল্লী-অঞ্চলের বহুসংখ্যক ভূমিহীন কৃষি-মজুরও ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। এই সকল পল্লীবাসীরা ‘জাতীয়তা’ ও ‘স্বরাজ’ বলিতে ভূমি-ব্যবস্থার পরিবর্তন বুঝে;—অর্থাৎ তাহাদের খাজনা ও ট্যাক্স কমিবে এবং ভূমিহীনেরা জমি ফিরিয়া পাইবে। অবশ্য, কি কৃষক সম্প্রদায় কি জাতীয় আন্দোলনের মধ্যশ্রেণীর নেতাগণ, কাহারও মনে এই আকাঙ্ক্ষার কোন স্পষ্ট ধারণা নাই।

১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গেই জগদ্ব্যাপী কৃষি ও বাণিজ্য সঙ্কট দেখা দিল। এই মন্দার প্রথম চোট পড়িল পল্লীবাসীদের উপর, তাহারা কংগ্রেস ও আইন অমান্যের দিকে ঝুঁকিল। তাহাদের

সন্ধিকালে সংঘর্ষ

নিকট ইহা লগুন বা অগ্ন্যত্র বসিয়া সূর্য শাসনতন্ত্র রচনার সমস্তা নহে, তাহারা ভূমিব্যবস্থার অমূল পরিবর্তন (বিশেষতঃ জমিদারী অঞ্চলে) প্রত্যাশা করিতে লাগি। জমিদারী প্রথার দিন গিয়াছে, ইহার আর নিজের পায়ে দাঁড়াইবার সামর্থ্য নাই। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বর্তমান অবস্থায় ভূমিসংক্রান্ত ব্যবস্থার অমূল পরিবর্তন করিতে সাহস পান না। যখন কৃষি তদন্তের জন্ত রয়াল কমিশন নিযুক্ত হয়, তখন জমির স্বত্ব স্বামিত্ব এবং ভোগদখলের ব্যবস্থা ইত্যাদি আলোচনা ও অনুসন্ধান করিবার ভার দেওয়া হয় নাই।

অতএব ভারতবর্ষে সংঘর্ষের সমস্ত কারণই বিদ্যমান এবং ইহাকে কোন মন্তব্যে অথবা আপোষ করিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ভূমিসংক্রান্ত মুখ্য ব্যবস্থার পরিবর্তন (অগ্ন্যত্র জরুরী জাতীয় সমস্তা ছাড়াও) ব্যতীত এই সংঘর্ষ দূর হইবে না। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের মারফৎ ইহার সমাধানের কোন সম্ভাবনাই নাই। সাময়িক ব্যবস্থায় কিয়ৎকালের জন্ত দুর্দশার লাঘব হইতে পারে, তীব্র দমননীতির ফলে ভীতি উৎপাদন করিয়া ইহার বহিঃপ্রকাশ বন্ধ করা গাইতে পারে,—কিন্তু তাহাতে সমস্তা সমাধানের কোন সুবিধা হয় না।

আমার ধারণা, অগ্ন্যত্র গভর্নমেন্টের মতই ব্রিটিশ গভর্নমেন্টও মনে করেন, ভারতের অধিকাংশ অশান্তি উপদ্রবের জন্ত “এজিটের” বা আন্দোলনকারীরাই দায়ী। ইহার মত ভ্রান্ত ধারণা আর নাই। গত পনের বৎসর ধরিয়া ভারত এমন একজন নেতা পাইয়াছে, যিনি কোট কোটি লোকের ভালবাসা ও শ্রদ্ধালাভ করিয়াছেন এবং যিনি অনায়াসে নিজের স্বতন্ত্র ইচ্ছা দ্বারা ভারতবর্ষকে চালিত করিতে পারেন। তিনি ভারতের বর্তমান ইতিহাস রচনা করিতেছেন, কিন্তু এই ইতিহাসে তাঁহা অপেক্ষা যাহারা তাঁহার ইঙ্গিত প্রায় অন্ধভাবে গ্রহণ করিয়াছে, সেই জনসাধারণের গুরুত্ব অধিক। জনসাধারণই প্রধান অভিনেতা, ঐতিহাসিক প্রয়োজনের প্রেরণাই তাহাদিগের মধ্যে অগ্রগতি সঞ্চার করিয়াছে, তাহাদিগকে তাহাদের নেতার বিষণ্ণধ্বনি শুনিবার জন্ত প্রস্তুত করিয়াছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার পট-ভূমিকায় ঐতিহাসিক ঘটনার সমাবেশ না হইলে কোন নেতা কোন “এজিটের” তাহাদিগকে কর্ণে প্রবৃত্ত করিতে পারিত না। নেতা হিসাবে গান্ধিজীৱ এক প্রধান গুণ এই যে, তিনি জনসাধারণের নাড়ীর গতি উত্তমরূপে বুঝেন এবং জানেন যে, কখন কার্য আরম্ভ করিবার সুসময়।

১৯৩০-এ ভারতের জাতীয় নেতাদের অজ্ঞাতসারে আন্দোলন দেশের

বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই আবির্ভূত হইয়াছিল এবং সেই সকল শক্তির বাস্তব অহুভূতির ফলেই ইহা ইতিহাসের সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া অগ্রসর হইয়াছিল। কংগ্রেসই জাতীয় আন্দোলনের প্রতিনিধিরূপে কার্য্য করিয়াছে এবং ইহার শক্তি-সামর্থ্যের স্বরূপ কংগ্রেসের বহুবদ্ধিত মর্যাদার মধোই প্রতিকলিত হইয়াছে। জাতীয় আন্দোলনে বিভিন্ন শক্তির সমাবেশ স্পষ্ট দেখা যায় না, হিসাব করা যায় না, নির্দিষ্ট সংজ্ঞার মধো প্রকাশ করা যায় না, তথাপি ইহা সর্বত্রই প্রকটিত। রুষক সম্প্রদায় কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া ইহার শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছিল, নিম্নমধ্যশ্রেণী ছিল কংগ্রেসের মেরুদণ্ড এবং ইহার সৈন্যসামন্ত। এমন কি উচ্চশ্রেণীর বুর্জোয়ারা নূতন অবস্থায় পড়িয়া কংগ্রেসের সহিত বন্ধুতা রক্ষা করাই নিরাপদ মনে করিয়াছিলেন। ভারতের অধিকাংশ কাপড়ের কলওয়ালারাই কংগ্রেসের নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন; কংগ্রেস অসম্ভব হয় এমন কার্য্য করিতেন না।

যখন পণ্ডিতেরা লওনে গোলটেবিল বৈঠকে বসিয়া আইনের সূক্ষ্ম তর্কে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধিরূপে কংগ্রেস অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল, কংগ্রেসের শক্তি সম্পর্কে এই ধারণা দিল্লী-সন্ধির পরেও বাড়িয়াছে, তাহার কারণ শূন্যগর্ত আক্ষালনপূর্ণ বন্ধুতা নহে; ১৯৩০ এবং তাহার পরবর্ত্তী ঘটনাতেই তাহা সম্ভব হইয়াছিল। একমাত্র কংগ্রেসের নেতারা ই সমুখের আগতপ্রায় বিঘ্ন ও বিপদ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন; এবং কোনটিই তাঁহারা ছোট করিয়া দেখেন নাই।

দেশের মধো পাশাপাশি দুইটি কর্তৃত্ব স্থাপিত হইতে চলিয়াছে, এই অস্পষ্ট ধারণায় গভর্নমেন্ট বিরক্তি বোধ করিতে লাগিলেন। এই ধারণার কোন বাস্তব ভিত্তি ছিল না, কেন না বাহবল সম্পূর্ণরূপে কর্তৃপক্ষের আয়ত্তে; তবে মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া ইহার অস্তিত্ব ছিল নিঃসন্দেহ। প্রভুত্বপ্রবণ ও জনমতের নিকট দায়িত্বহীন গভর্নমেন্টের নিকট ইহা অসম্ভব; এবং তাঁহাদের স্নায়বিক উত্তেজনা ইহাতে বাড়িয়া গেল ও পরে তাঁহারা যে কতকগুলি গ্রাম্য বন্ধুতা বা শোভাযাত্রার দোষ দিয়াছিলেন তাহা কথার কথা মাত্র। ফলে সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। কংগ্রেসও আত্মহত্যা করিতে পারে না, গভর্নমেন্টও দ্বৈত কর্তৃত্বের আবহাওয়া বরদাস্ত করিতে না পারিয়া কংগ্রেসকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের জন্ম সংঘর্ষ মূলতুবী

সন্ধিকালে সংঘর্ষ

রাখা হইল। যে কোন কারণেই হউক, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট গান্ধিজীকে লগুনে লইয়া যাইবার জন্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন, ইহার বিরূপ হয় এমন কিছু কাজ তাঁহারা যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিতে লাগিলেন।

ক্রমে বিরোধের ভাব বাড়িতে লাগিল, গভর্ণমেন্ট যে ক্রমশঃ কঠিন হইতেছেন ইহা আমরা বুঝিতে পারিলাম, দিল্লী-সন্ধির অব্যবহিত পরেই লর্ড আকটন ভারত ত্যাগ করিলেন, এবং লর্ড উইলিংডন বড় লাট হইয়া আসিলেন। গুজব প্রচারিত হইল, নূতন বড়লাট অত্যন্ত কড়া ও শক্ত-লোক এবং তাঁহার পূর্বগামীর মত আপোষপ্রবণতা তাঁহার নাই। নীতির দিক হইতে না দেখিয়া ব্যক্তির দিক হইতে রাজনীতি চিন্তা করিবার মডারেটীয় অভ্যাস, আমাদের অনেক রাজনৈতিক উত্তরাধিকার-সূত্রে পাইয়াছেন। তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের প্রশস্ত সাম্রাজ্যনীতি বড়লাটের ব্যক্তিগত মতের উপর নির্ভর করে না। বড়লাটের পরিবর্তনে কোন পার্থক্য হয় নাই, হইতও না; ঘটনার গতিপথেই গভর্ণমেন্টের নীতি পরিবর্তিত হইয়াছে। সিভিলিয়ন তত্ত্ব কখনও এই সকল সন্ধি-চুক্তি, কংগ্রেসের সহিত আদানপ্রদান অনুমোদন করেন নাই। কেন না তাঁহাদের শিক্ষা দীক্ষা, প্রভুত্বমূলক গভর্ণমেন্ট সম্পর্কিত ধারণা ইহার বিরোধী। তাঁহাদের ধারণা হইল যে, সমকক্ষ ভাবে ব্যবহার করিয়া তাঁহারা কংগ্রেস ও গান্ধিজীর প্রভাব ও মর্যাদা বাড়াইয়া দিয়াছেন, এখন দুই এক ধাপ নামাইয়া দিবার প্রয়োজন হইয়াছে। এই ধারণা অত্যন্ত নির্বোধ; কিন্তু তাহা না হইলে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের ধারণার মৌলিকতার খ্যাতি থাকে কি করিয়া। যে কোন কারণেই হউক, গভর্ণমেন্ট খাড় হইয়া কোমর বাঁধিলেন, এবং আমাদের কাছে প্রাচীন আত্মপুরুষের ভাষায় যেন বলিতে লাগিলেন—দেখ আমার কনিষ্ঠাঙ্গুলী আমার পিতার কটিদেশ অপেক্ষাও স্থূল; তিনি তোমাদের চাবুক দিয়া শাসন করিতেন, আমি তোমাদের বৃশ্চিক দিয়া শিক্ষা দিব।

কিন্তু শাসন করিবার সময় তখনও আসে নাই। সম্ভব হইলে গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের প্রতিনিধি পাঠাইতে হইবে। বড়লাট ও অগ্রাণু প্রধান কর্মচারীদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত গান্ধিজী দুইবার সিমলা গেলেন। তাঁহারা অনেক বিষয় আলোচনা করিলেন। বাঙ্গলার কথা ছাড়া, সীমান্তের লাল কুর্ভা-আন্দোলন ও যুক্ত প্রদেশের কৃষক সমস্তারও আলোচনা হইল—এই সকল ব্যাপারে গভর্ণমেন্ট অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন।

জওহরলাল নেহরু

গান্ধিজীর আহ্বানে আমি সিমলায় গিয়া ভারত গভর্নমেন্টের কয়েক জন প্রধান কক্ষচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। আমার কথাবার্তা যুক্ত প্রদেশ লইয়াই সীমাবদ্ধ ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের পশ্চাতে যে আসল বিরোধ, তাহা খোলাখুলি ভাবে আলোচিত হইল। কথাপ্রসঙ্গে শুনিলাম যে, ১৯৩১-এর ফেব্রুয়ারী মাসে গভর্নমেন্ট অন্ততঃ তিন মাসের মধ্যেই আইন অমান্য আন্দোলন ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহারা দমননীতির যত্ন এমনভাবে সন্নিবেশ করিয়াছিলেন যে, কেবল ইঙ্গিত করিলেই হইত। কিন্তু বল প্রয়োগের পরিবর্তে, আপোষে কথাবার্তা দ্বারা কার্যাসিদ্ধিই তাঁহারা ভাল মনে করিয়া পরস্পরের মধ্যে আলোচনার ব্যবস্থা করিলেন, যাহার ফলে দিল্লী-সন্ধি সম্ভবপর হইয়াছিল। চুক্তি না হইলে অতৃদিকে অঙ্গুলী সঞ্চালন করিতে তিলান্নি বিলম্ব হইত না। এই কথার মধ্যে এমন ইঙ্গিতও হয় ত ছিল যে, যদি আমরা বুঝিয়া না চলি, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতেই দমননীতির কল চলিবে। এই সকল কথা অত্যন্ত দোজ্ঞপূর্ণ সরলতার সহিতই বলা হইল এবং আমরা উভয়েই বুঝিলাম, আমাদিগকে বাদ দিলেও এবং আমরা যাহা বলি আর করি না কেন, সংঘর্ষ অনিবার্য।

আর একজন উচ্চ কক্ষচারী কংগ্রেসের প্রশংসা করিলেন। আমরা রাজনীতি ছাড়া অগাধ সমস্যাগুলি আলোচনা করিতেছি, এমন সময় তিনি বলিলেন, রাজনীতি ছাড়িয়া দিলেও কংগ্রেস ভারতের এক বৃহৎ কল্যাণ সাধন করিয়াছে। ভারতবাসীরা সংগঠনমূলক কাথো অপটু, সচরাচর এই অপবাদ তাহাদিগকে দেওয়া হয়; কিন্তু ১৯৩০ সালে কংগ্রেস বিপুল বাধাবিঘ্নের মধ্যেও সজ্জবদ্ধ কার্যে অপূর্ণ কৃশলতা দেখাইয়াছে।

গান্ধিজীর প্রথমবার সিমলায় গিয়া আলোচনার ফলে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করার কোন স্থির সিদ্ধান্ত হইল না। আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহে তিনি দ্বিতীয় বার সিমলায় গেলেন। যে কোন দিকেই হউক, একটা কিছু স্থির করা আবশ্যক, কিন্তু ভারত ত্যাগ করিতে তখনও তাঁহার মন সরিতেছিল না। তিনি দেখিলেন, বাঙ্গলা, সীমান্ত প্রদেশ ও যুক্ত প্রদেশে বিবাদ ঘনাইয়া আসিতেছে। ভারতে শান্তির প্রতিশ্রুতি না পাইলে তিনি যাইতে চাহিলেন না। কয়েকখানি চিঠির আদান-প্রদানের পর, অবশেষে গভর্নমেন্টের সহিত বুঝাপড়া হইল এবং ঐ মর্মে এক বিবৃতি প্রচারিত হইল। এই রফা একেবারে শেষ মুহূর্ত্তে হইল। কোন প্রকারে তাড়াতাড়ি গান্ধিজী গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধিদের জগ্ন নিদ্রিষ্ট জাহাজ ধরিলেন। তখন শেষ ট্রেনও ছাড়িয়া গিয়াছিল,

গোলটেবিল বৈঠক

সিমলা হইতে কলিকাতা পর্যন্ত স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যবস্থা করা হইল এবং যোগাযোগ স্থাপনের জন্তু পথে অগ্রাগ্র ট্রেন থামাইয়া রাখা হইল।

আমি তাঁহার সহিত সিমলা হইতে বোম্বাই গেলাম। আগষ্ট মাসের শেষে একদিন প্রভাতে আমি তাঁহাকে বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলাম; অর্ধবপোত তাঁহাকে লইয়, আরব সমুদ্রের মধ্য দিয়া পাশ্চাত্য দেশে যাত্রা করিল। দুই বৎসরের মত আমাদের এই শেষ দেখা।

৩৮

গোলটেবিল বৈঠক

যিনি মিঃ গান্ধীকে ভারতে ও লণ্ডনের গোলটেবিল বৈঠকে ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখিয়াছেন, এমন একজন ইংরাজ সাংবাদিক সম্প্রতি একখানি পুস্তকে লিখিয়াছেন,—

“মূলতান জাহাজেই নেতৃবৃন্দ জানিতেন যে, কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতিতে মিঃ গান্ধীকে বিরুদ্ধে ঘড়ঘন্ত্র রহিয়াছে। তাঁহারা আরও জানিতেন যে, সময় উপস্থিত হইলেই কংগ্রেস তাঁহাকে তাড়াইয়া দিবে। কিন্তু কংগ্রেস মিঃ গান্ধীকে বাহির করিয়া দিলে সম্ভবতঃ তাঁহার সহিত অর্ধেক সদস্যও বাহির হইয়া যাইবে। এই অর্দ্ধাংশকেই স্মরণ তেজ বাহাহুর সঞ্চার এবং মিঃ জয়াকর লিবারেল দলে ভিড়াইতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাদের ভাষায় মিঃ গান্ধী “বিদ্রাস্তবুদ্ধি,” ইহা তাঁহারা গোপন করিতেন না। একজন “বিদ্রাস্তবুদ্ধি” নেতাকে হাত করা ভাল, কেন না তাঁহার সহিত কোটি কোটি “বিদ্রাস্তবুদ্ধি” অহুচরও পাওয়া যাইবে।”*

* গ্লেরনি বোলটনের “দি ট্রাজেডি অব গান্ধী” হইতে। উদ্ধৃত অংশ অস্মি ঐ পুস্তকের সমালোচনা হইতে লইয়াছি; কেন না তখনও উহা আমার পড়িবার হ্রবিধা হয় নাই। আমার বিশ্বাস, ইহাতে গ্রন্থকার বা উদ্ধৃত অংশে উল্লিখিত ব্যক্তিদের প্রতি আমি কোন অবিচার করি নাই।.....এই লেখা শেষ হইবার পর আমি পুস্তকখানা পড়িয়াছি। মিঃ বোলটনের অনেক বর্ণনা ও প্রতিপাত্ত বিষয় আমার মতে সম্পূর্ণ অসৌজিক। কার্য্যকরী সমিতি দিল্লী-সন্ধির আলোচনাকালে এবং পরে কি করিয়াছিল না করিয়াছিল, তাহা লইয়া বিশেষভাবে এবং অগ্রাগ্র ব্যাপারের বর্ণনাতোও অনেক ভুল আছে। আর একটি কৌতুককর বলনা এই যে, মিঃ বল্লভভাই প্যাটেল, ১৯৩১-এ কংগ্রেসের সভাপতি পদ ও নেতৃত্বের জন্ত মিঃ গান্ধী

আমি জানি না, উক্ত বাক্যাংশের মধ্যে স্তর তেজ বাহাদুর সফ্র-মি: জয়াকর অথবা ১৯৩১-এ গোলটেবিল বৈঠকে যাত্রী অগ্নাগ্র প্রতিনিধিদের মতামত কতখানি আছে। ভারতীয় রাজনৈতিক ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট, যে কোন ব্যক্তি, তিনি সাংবাদিকই হউন আর নেতাই হউন, এই শ্রেণীর বর্ণনা দিতে পারেন, তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। কিন্তু বিবরণটি পড়িয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। আমি পূর্বে কখনও এরূপ অদ্ভুত কথা ঘুণাক্ষরেও শুনি নাই, যদিও তাহা বুঝা কঠিন নহে, কেন না পরে অধিকাংশ সময়ই আমি কারাগারে ছিলাম।

প্রতিবন্ধিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যতঃ গত ১৫ বৎসর ধরিয়া কংগ্রেসে (এবং সমগ্র দেশেও) মি: পাকীই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী, কংগ্রেসের কোন সভাপতিই সে স্থান পাইতেন না। তিনি সভাপতি হুগি করিতেন, তাঁহার নির্দেশেই নির্বাচন হইত। বহুবার তিনি সভাপতির পদ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন এবং তাঁহার কোন সহকর্মী অথবা অনুপায়ীর নাম প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহার জগুই আমি কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলাম, তিনি স্বয়ং নির্বাচিত হইয়াও, তাঁহার পরিবর্তে আমাকেই নির্বাচিত করেন। সাধারণ অবস্থায় মি: বলভভাই প্যাটেলের নির্বাচন হয় নাই। তখন আমরা সত্ত্ব কারাগার হইতে বাহিরে আসিয়াছি, অধিকাংশ কংগ্রেস কমিটি তখন বে-আইনী, কাজেই সাধারণভাবে কাজ চলিতে পারে না। সেই জন্ত কার্য্যকরী সমিতি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনের ভার লইয়াছিলেন। মি: বলভভাই প্যাটেল স্বয়ং এবং অগ্নাগ্র সমস্ত সদস্য একযোগে মি: পাকীকে সভাপতি হইবার জন্ত অনুরোধ করিলেন। তিনি যদিও কার্য্যতঃ কংগ্রেসের মাথা, তথাপি নামেও তিনি অন্ততঃ এই সঙ্কটের সময় সভাপতি হউন, ইহা সকলের ইচ্ছা ছিল। তিনি রাজী হইলেন না এবং মি: বলভভাই প্যাটেলকে গ্রহণ করিবার জন্ত স্পষ্ট দেখাইলেন। আমার মনে আছে, এই সময় একজন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি মুসোলিনীর মত একজনকে সাময়িকভাবে রাজা বা বড়কর্তা করিয়া রাখিতে চাহেন।

পাদটীকায় মি: বোলটনের নানা শ্রেণীর ভুল ধারণার আলোচনা সম্ভবপর নহে। তাঁহার ধারণা যে, পিতা কোন ইংরাজ ক্লাবের সদস্য না হইতে পারিয়াই রাজনৈতিক সত্ত্ব পরিবর্তন করেন; তিনি চরমপন্থী হইলেনই, এমন কি, ইংরাজ সমাজের নিকটেও ঘেঁসিতেন না। বহুবার কণিত হইলেও, এই কাহিনী আগাগোড়া মিথ্যা। আসল ঘটনা অতি তুচ্ছ, তবে রহস্য নিরসনের জন্ত আমি উহা উল্লেখ করিতেছি। তিনি আইন ব্যবসায় আরম্ভ করিবার সময় এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্তর জন এন্স'এর প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। স্তর জন তাঁহাকে এলাহাবাদ (ইউরোপীয়ান) ক্লাবের সদস্য হইতে বলিলেন এবং স্বয়ং তাঁহার নাম প্রস্তাব করিতে চাহিলেন। আমার পিতা তাঁহাকে এই সদস্য উপদেশের জন্ত ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, ইহাতে পোলমাল হইতে পারে। অনেক ইংরাজ তিনি ভারতীয় বলিয়া আপত্তি করিবেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে ভোট দিবেন। যে কোন সাময়িক কর্মচারী হয় ত পরোক্ষে তাঁহার নিন্দা করিবেন; এই অবস্থায় তিনি নির্বাচনপ্রার্থী হইতে চাহেন না। স্তর জন তখন বলিলেন যে, তাঁহার নাম প্রস্তাব হইলে তিনি তাহা এলাহাবাদ বিভাগের

গোলটেবিল বৈঠক

কাহারা ষড়যন্ত্রকারী এবং তাহাদের উদ্দেশ্য কি ছিল? কেহ কেহ বলিতেন আমি ও সভাপতি বল্লভভাই প্যাটেল কার্যকরী সমিতিতে সর্বাপেক্ষা উগ্রপন্থী ছিলাম। অতএব, আমার ধারণা, আমাদিগকেই ষড়যন্ত্রের নেতারূপে গণনা করা হইয়া থাকিবে। সম্ভবতঃ সমগ্র ভারতে বল্লভভাই অপেক্ষা গান্ধিজীর অধিক বিশ্বস্ত সহযোগী আর কেহ নাই। শক্তিশালী ও অদম্য কর্মী, হইয়াও বল্লভভাই গান্ধিজীর ব্যক্তিত্ব, আদর্শ ও কর্মনীতির একান্ত ভক্ত। আমি সে ভাবে গান্ধিজীর আদর্শ গ্রহণ না করিলেও দীর্ঘকাল তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করিয়াছি; তাঁহার বিরুদ্ধে আমি ষড়যন্ত্রের চিন্তা পর্য্যন্ত করিতে পারি, এই ধারণা কত মিথ্যা! সমগ্র কার্যকরী সমিতি সম্পর্কেই এই কথা বলা চলে। এই সমিতি কার্যতঃ তাঁহার নিজের সৃষ্টি, তিনি সহকর্মীদের সহিত পরামর্শ করিয়া সদস্য মনোনীত করিয়াছেন, নির্বাচন তাহার পরে আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র। এই সমিতির মেরুদণ্ড যাহারা, তাঁহারা বহু বৎসর ধরিয়াই কার্যতঃ স্থায়ী সদস্যরূপেই রহিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে রাজনৈতিক মতভেদ ছিল, দৃষ্টিভঙ্গী ও ব্যক্তিগত মেজাজের পার্থক্যও ছিল, কিন্তু দীর্ঘকাল ধবিয়া একই কর্মক্ষেত্রে একই দায়িত্ব স্বীকার করিয়া, একই বিঘ্নবিপদ বরণ করিয়া তাঁহারা পরস্পরের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা পরস্পরের বন্ধু সখা সহকর্মী এবং একে অণ্ডের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন। তাঁহারা বিভিন্ন ব্যক্তির সমবায় নহেন, পরস্পর অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে আবদ্ধ। অতএব, এখানে একের বিরুদ্ধে অপরের ষড়যন্ত্রের কথা ধারণারও অতীত। গান্ধিজীই সমিতির পরিচালক এবং সকলেই তাঁহার পরামর্শের অপেক্ষা রাখেন। বহুবর্ষ ধরিয়া ইহাই চলিতেছে; বরং ১৯৩০-এর আন্দোলনের সাফল্যে, ১৯৩১ সালে উহা আরও বেশী হইয়াছিল।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেলকে দিয়া সমর্থন করাইবেন। যাহা হউক অবশেষে ব্যাপারটা চাপা পড়িল, আমার পিতার নাম প্রস্তাব করা হইল না, তিনি ইচ্ছা করিয়া অপমানের দায়িত্ব লইতে প্রস্তুত হইলেন না। এই ঘটনায় ইংরাজদের এত তাঁহার মন তিক্ত হওয়া ত দূরের কথা, স্তর জন এবং পরে বহুবর্ষ ধরিয়া অগাধ অনেক ইংরাজের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব বৃদ্ধি হইয়াছিল। এই ঘটনা বিগত শতাব্দীর শেষ দশকে ঘটে, এবং তাহার পঁচিশ বৎসর পর তিনি রাষ্ট্রক্ষেত্রে অগ্রগামী ও অসহযোগী হন। তাঁহার এই পরিবর্তনও আকস্মিক নহে। পাঞ্জাবের সামরিক আইন ও মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবেই ইহা সম্ভবপর হইয়াছিল। ইহার পরেও তিনি ইচ্ছা করিয়া ইংরাজ সমাজের সংগ্রহ বঞ্জন করিতেন না। কিন্তু যেখানে ইংরাজগণ অধিকাংশই সরকারী কর্মচারী, সেখানে অসহযোগ ও আইন অমান্যের জন্ত সামাজিক মিলন সম্ভবপর হয় নাই।

জওহরলাল নেহরু

“উগ্রপন্থীদের” তাঁহাকে কাৰ্য্যকরী সমিতি হইতে “বহিষ্কৃত” করিবার কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে? তিনি সৰ্ব্বদাই আপোষ করার জ্ঞাত অল্পকূল, অতএব ভারস্বরূপ, হয় ত এইরূপ ধারণা ছিল। কিন্তু তাঁহাকে বাদ দিলে আমাদের সংগ্রামের মূল্য কি, কোথায় থাকিত আইন অমান্য আর কোথায় থাকিত সত্যগ্রহ? এই আন্দোলনের তিনি জীবন্ত অংশ, অথবা তিনিই বিগ্রহরূপী আন্দোলন। আমাদের সংগ্রামের প্রত্যেক ব্যাপারই তাঁহার উপর নির্ভর করিয়াছে। অবশ্য জাতীয় আন্দোলন তাঁহার সৃষ্টি নহে, কোন ব্যক্তি-বিশেষের উপর তাহা নির্ভর করে না, তাহার মূল গভীর। কিন্তু বৃহৎ আন্দোলনের কোন এক বিশেষ প্রকাশ, যেমন নিরুপদ্রব প্রতিরোধ তাঁহারই সৃষ্টি। তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র হওয়ার অর্থ বর্তমান আন্দোলন বর্জন করিয়া আবার নূতন ভিত্তির উপর তাহা গড়িয়া তোলা। এরূপ কাজ সব সময়েই কঠিন, ১৯৩১-এ কেহ একথা চিন্তাও করিতে পারিত না।

কোন কোন লোকের মতে আমরা ১৯৩১-এ তাঁহাকে কংগ্রেস হইতে তাড়াইয়া দিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলাম একথা ভাবিতেও কৌতুক বোধ হয়। ষাঁহাকে সামান্য ইঙ্গিত করিলেই সরিয়া দাঁড়াইবেন, তাহার জ্ঞাত ষড়যন্ত্রের আবশ্যক কি! তিনি অবসর গ্রহণ করিবেন এমন প্রস্তাব মাত্রই কাৰ্য্যকরী সমিতি, এমন কি, সমগ্র দেশ ক্ষুদ্র হইয়া উঠে। তিনি আমাদের আন্দোলনের সহিত এমন ভাবে জড়িত যে, তিনি আমাদের পরিত্যাগ করিবেন এ চিন্তা পর্য্যন্ত অসহনীয়। আমরা তাঁহাকে লগুনে পাঠাইতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলাম, কেন না তাঁহার অনুপস্থিতিতে সমস্ত ভার আমাদের উপর পড়িত এবং আমরা তাহার পরিণাম ভাল বোধ করি নাই। তাঁহার স্বক্ষেই সমস্ত ভার নিক্ষেপে আমরা অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। কাৰ্য্যকরী সমিতি এবং তাহার বাহিরে আমাদের অনেকের সহিত গাঙ্কিজীর সম্পর্ক এরূপ যে, কোন ব্যাপারে তাঁহার নিকট সাময়িক সুবিধা আদায় করা অপেক্ষা ব্যর্থ হওয়াই আমরা ভাল বিবেচনা করিতাম।

গাঙ্কিজী “বিভ্রান্তবুদ্ধি” কি না সে বিচারের ভার আমরা মডারেট বন্ধুদেরই দিলাম। একথা সত্য যে, তাঁহার রাজনীতি অনেক সময়েই দার্শনিক এবং বৃথা কঠিন। কিন্তু তিনি যে কাজের মানুষ, তাঁহার সাহস যে অনন্তসাধারণ, একমাত্র তিনিই যে জাতির পক্ষ হইতে প্রতিশ্রুতি দিতে সক্ষম, ইহা বহুবার প্রমাণিত হইয়াছে। এবং “বিভ্রান্তবুদ্ধির” যদি ইহাই কৰ্ম্মপরিণত ফল হয়, তাহা হইলে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যে যাহার আরম্ভ ও শেষ, কেবল আলোচনাতেই পর্য্যবসিত সেই “বাস্তব

গোলটেবিল বৈঠক

রাজনীতির” সহিত তুলনায় নিশ্চয়ই উহা মন্দ নহে। তাঁহার বোটি কোটি অল্পগামীও যে “বিভ্রান্তবুদ্ধি” একথাও সত্য, কেন না তাহার রাজনীতিও বুঝে না শাসনতন্ত্রও বুঝে না; তাহার দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন অশন, বসন, “দাচ্ছাদন জমি-জিরাতের দিক দিয়াই চিন্তা করিতে পারে।

খাতনামা বিদেশী সাংবাদিক, যাহারা মানবপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিতে নিপুণ, তাঁহারা ভারতে আসিলেই ঘুলাইয়া যান, ইহা আমাব নিকট সর্বদাই আশ্চর্য্যবোধ হয়। প্রাচ্য একেবারেই স্বতন্ত্র এবং সাধারণ মাপকাঠিতে তাহার বিচার হইতে পারে না; শৈশবের এই বদ্ধমূল ধারণাই কি ইহার কারণ? অথবা ইংরাজের ক্ষেত্রে ইহা কি সাম্রাজ্যের বজ্রবন্ধন, যাহা তাঁহাদের দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত এবং মন্তক বিকৃত করিয়া ফেলে! যত অসম্ভব কথাই হউক না কেন, কিছুমাত্র আশ্চর্য্য না হইয়া তাঁহারা বিশ্বাস করিয়া বসেন, কেন না রহস্যময় প্রাচ্যে সকলই সম্ভব। সময় সময় তাঁহাদের রচিত পুস্তকে সত্য বিবরণ লিখিবার দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়, কথোপকথনের নিহুল বিবরণও থাকে, কিন্তু মাঝে মাঝে অতি বিশ্বয়কর ভ্রান্তি উহার সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয়।

১৯০১-এ গান্ধিজীর ইউরোপ যাত্রার পরেই লণ্ডনের কোন সংবাদপত্রের প্যারীর বিখ্যাত সংবাদদাতার রচিত একটি পবন্ধ পড়িয়াছিলাম বলিয়া স্মরণ হয়। এই প্রবন্ধটি ভারতের বিষয় লইয়া রচিত, প্রসঙ্গতঃ লেখক একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, ১৯২১-এ অসহযোগ আন্দোলনের সময় যখন যুবরাজ ভারতে আসিয়াছিলেন, তখন ঐ ঘটনা ঘটিয়াছিল। তিনি লিখিতেছেন, কোন এক স্থানে (সম্ভবতঃ দিল্লী) মহাত্মা গান্ধী অপরের অজ্ঞাতসারে একান্ত নাটকীয় ভাবে যুবরাজের সম্মুখে আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন এবং যুবরাজের পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া রোদন করিতে করিতে তাঁহার নিকট এই নিরানন্দ দেশের জন্ত শান্তি ভিক্ষা চাহিলেন। আমরা কেহ, এমন কি গান্ধিজীও কখনও এই চমৎকার গল্পটি শোনে নাই। আমি উক্ত সাংবাদিক মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিয়া সব জানাইলাম। পত্রোত্তরে তিনি দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু লিখিয়াছিলেন যে, তিনি বিশ্বস্তসূত্রে উহা অবগত হইয়াছেন। আমার নিকট আশ্চর্য্য এই যে, এমন একটা আজগুबी গল্প তিনি অমুসন্ধান না করিয়াই বিশ্বাস করিলেন, অথচ যিনি গান্ধী, কংগ্রেস, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু জানেন, তিনি কিছুতেই ইহা বিশ্বাস করিবেন না। দুর্ভাগ্যক্রমে একথা সত্য যে, অনেক ইংরাজ দীর্ঘকাল

জওহরলাল নেহরু

ভারতে থাকিয়াও কংগ্রেস, গান্ধী অথবা এদেশ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। কেম্‌টারবেরীর আর্ক-বিশপ সহসা মুসোলিনীর মাথার উপর চড়িয়া বসিয়া পা দোলাইতে দোলাইতে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন, সেই কল্পিত গল্পের সহিত ঐ অবিশ্বাস্ত্র ও হাস্যকর গল্পটির তুলনা চলিতে পারে।

সম্প্রতি সংবাদপত্রে অগ্রপ্রকার একটি গল্প প্রচারিত হইয়াছে। গান্ধিজীর হাতে কোটি কোটি টাকা আছে, এগুলি তিনি গোপনে বন্ধুদের নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছেন; কংগ্রেস এই টাকার লোভে তাঁহার অনুগত থাকে। কংগ্রেসের সর্বদাই ভয়, গান্ধিজী সমস্তপদ ত্যাগ করিলে এই টাকা হাতছাড়া হইবে। এই গল্পটিও হাস্যকর, কেন না তিনি কখনও নিজের হাতে বা বন্ধুদের কাছে টাকা গচ্ছিত রাখেন না, যাহা তিনি সংগ্রহ করেন, তাহা সাধারণ প্রতিষ্ঠানে দিয়া দেন। তাঁহার স্বাভাবিক 'বানিয়া' বুদ্ধিবশতঃ তিনি সাবধানতা সহকারে হিসাব রাখেন এবং তাঁহার সংগৃহীত সমস্ত টাকার হিসাব, হিসাব-পরীক্ষকগণ কর্তৃক পরীক্ষান্তে সাধারণে প্রচার করা হয়।

১৯২১ সালে কংগ্রেসের জন্ম যে এক কোটি টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল, সেই স্মরণীয় কাহিনী হইতে এই শ্রেণীর গল্প প্রচারিত হইয়াছে। টাকার অঙ্কটা শুনিতে বড়, কিন্তু সমস্ত ভারতের নানাকাঙ্গে ছড়াইয়া দিলে কিছুই নয়—জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল, কুটির-শিল্পের উন্নতি, খন্ডর প্রচার, অস্পৃশ্যতা বর্জন এবং অগ্রাগ্র গঠনমূলক কাজে ইহা বায় হইয়াছে। অধিকাংশ টাকাই বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্ম দেওয়া হইয়াছিল, তাহা এখনও বিশেষ কাজের রক্ষিত ধনভাণ্ডাররূপে রহিয়াছে, বাদবাকী টাকা স্থানীয় কমিটিগুলি কংগ্রেসের গঠনমূলক ও রাজনৈতিক কার্যে ব্যয় করিয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনে এবং পরবর্তী কয়েক বৎসরের কংগ্রেসের কাজে ইহা ব্যয় হইয়াছে। আমাদের এই দরিদ্র দেশে গান্ধিজীর শিক্ষাগুণে আমরা অতি অল্প খরচে রাজনৈতিক আন্দোলন চালাইয়া থাকি। আমাদের অধিকাংশ কাজই সকলে স্বেচ্ছায় করিয়া থাকেন; যেখানে অর্থ দেওয়া হয়, তাহা কায়ক্লেশে জীবনধারণ করিবার বেশী নহে। আমাদের ভাল ভাল কর্ম্মীরা, যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত যুবক এবং যাহাদের পরিবার প্রতিপালন করিতে হয়, তাহারাও ইংলণ্ডে বেকারেরা যে ভাতা পায়, তদপেক্ষাও কম ভাতা লইয়া থাকেন। গত পনের বৎসর কংগ্রেসের আন্দোলন যত অল্প ব্যয়ে চালান হইয়াছে, কোন দেশের রাজনৈতিক বা শ্রমিক আন্দোলন তত কম খরচে চলে কিনা সন্দেহ। কংগ্রেসের সমস্ত টাকার যথাযথ

গোলটেবিল বৈঠক

হিসাব রাখা হয় এবং প্রতি বৎসর পরীক্ষিত হিসাব প্রকাশ করা হয়। ইহার মধ্যে কিছু গোপন করা হয় না। তবে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় যখন কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষিত হইয়াছিল, তখন ইহা সম্ভবপর হয় নাই।

গান্ধিজী কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিবার জন্ত লণ্ডনে চলিয়া গেলেন। আমরা দীর্ঘ আলোচনার পর স্থির করিলাম যে, আর কোন প্রতিনিধি পাঠান হইবে না। এই সঙ্কটের সময় যাহারা স্বকোশলে কাজ করিতে পারিবেন, তাঁহাদের ভারতে রাখারও আবশ্যক ছিল। লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠক বসিলেও আসল কেন্দ্র ভারতে এবং এখানকার ঘটনা লণ্ডনেও অনিবার্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠানগুলি যথাযথ ভাবে রক্ষা করিয়া যাহাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সে জন্ত আমরা সাবধানতা অবলম্বন করিলাম। অবশ্য একজন মাত্র প্রতিনিধি প্রেরণের ইহাই প্রধান কারণ নহে। যদি আমরা প্রয়োজন বুঝিতাম, তাহা হইলে আমরা আরও প্রতিনিধি পাঠাইতাম। বিশেষ বিবেচনা করিয়াই আমরা তাহা করি নাই।

শাসনতন্ত্রের খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলি আলোচনার জন্ত আমরা বৈঠকে প্রতিনিধি প্রেরণ করি নাই। শাখাপ্রশাখা লইয়া চিন্তা করার আমাদের অভিপ্রায় ছিল না, কেন না মূল বিষয়গুলি লইয়া ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সহিত কোন বুঝাপড়া হইয়া গেলে ঐগুলি আলোচনা করার যথেষ্ট অবসর পাওয়া যাইবে। আসল প্রশ্ন, কতখানি ক্ষমতা গণতান্ত্রিক ভারতকে দেওয়া হইবে; উহার মীমাংসা হইয়া গেলে যে কোন আইনজীবী বিস্তারিত ব্যাপারের খসড়া রচনা করিতে পারেন। মূল বিষয়গুলি সম্পর্কে কংগ্রেসের ধারণা অতিশয় স্পষ্ট ছিল, তর্ক ও আলোচনার ইহাতে বিশেষ অবকাশ ছিল না। কংগ্রেসের পক্ষের কথা বলিবার জন্ত আমাদের একজন প্রতিনিধি—আমাদের নেতাকে প্রেরণ করাই একমাত্র মর্যাদার পথ। তিনি আমাদের দাবীর অপরিহার্য যৌক্তিকতা দেখাইবেন এবং সম্ভব হইলে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে তাহা স্বীকার করাইতে চেষ্টা করিবেন। আমরা জানিতাম, ইহা স্বকঠিন কাজ, কিন্তু অবস্থানুসারে উহা ছাড়া অন্য পথ ছিল না। আমাদের আদর্শ ও নীতি যাহা আমরা সঙ্কল্প করিয়া গ্রহণ করিয়াছি, এবং যেগুলি আমরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি, কোন অবস্থাতেই তাহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। যদি কোন আশ্চর্য উপায়ে ঐ সকল মূলনীতির ভিত্তিতে আপোষ সম্ভব হয়, তাহা হইলে অবশিষ্ট বিষয় স্থির করিতে কোনই বেগ পাইতে হইবে না।

আমরা নিজেদের মধ্যে স্থির করিয়াছিলাম যে, যদি আপোষ সম্ভব হয়, তাহা হইলে গান্ধিজী আমাদের কয়েকজনকে অথবা কার্য্যকরী সমিতির সমস্ত সদস্যকে লগুনে আহ্বান করিবেন, আমরা গিয়া বিস্তৃত আলোচনায যোগ দিব। আমরা এই আহ্বানের জ্ঞ প্রস্তুত হইয়া রহিলাম; প্রয়োজন হইলে বিমান পথে গিয়াও আমরা দশ দিনের মধ্যে তাঁহার সহিত যোগ দিতে পারি।

আর যদি মূল বিষয়েই আপোষ না হয়, তাহা হইলে বিস্তারিত আলোচনার প্রসঙ্গ উঠে না; এবং বৈঠকে অধিকসংখ্যক কংগ্রেসের প্রতিনিধি প্রেরণের কথাও উঠে না। শ্রীযুক্ত সরোজিনী নাইডু বৈঠকে যোগ দিয়াছিলেন। তবে তিনি কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে যান নাই। তিনি ভারতের দ্বী-জাতির প্রতিনিধিরূপে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, এবং কার্য্যকরী সমিতি তাঁহাকে যোগ দিবার অহুতি দিয়াছিলেন।

যাহা হউক এই ব্যাপারে আমাদের ইচ্ছামত কাজ করিবার অভিপ্রায় ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের ছিল না। মূল বিষয়গুলির আলোচনা স্থগিত রাখিয়া তাঁহারা বৈঠকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং অবাস্তব বিষয়ের আলোচনার কৌশল অবলম্বন করিলেন। এমন কি, যখন কোন মূল প্রশ্ন উঠে, তখন গভর্ণমেন্ট কোন নিশ্চিত মত প্রকাশ করিতে অস্বীকার করেন; কেবল প্রতিশ্রুতি দেন যে, এ বিষয়ে পাকাপাকি ঠিক হইলে তাহার পর গভর্ণমেন্ট মত ব্যক্ত করিবেন। অবশ্য তাহাদের হাতে প্রধান অস্ত্র ছিল সাম্প্রদায়িক সমস্যা—এই অস্ত্র তাঁহারা ভালভাবেই প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহাই সম্মেলনে সর্ব্বাপেক্ষা মুখ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

বৈঠকের অধিকাংশ ভারতীয় সদস্যই অনেকে স্বেচ্ছায়, কেহ বা অনিচ্ছায় এই সরকারী কৌশলজালের মধ্যে পড়িলেন। বৈঠকে সকলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন, অধিকাংশই “আপুকে ওয়াস্তে”—প্রকৃত প্রতিনিধি অল্প। দুই চার জন যোগা ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন, অধিকাংশ সম্পর্কে এ কথা বলা চলে না। মোটের উপর, ইহারা ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রগতিবিরোধী অংশের প্রতিনিধি। ইহারা এত পশ্চাদ্দপদ ও প্রতিক্রিয়াশীল যে, ইহাদের মধ্যে অতি সাবধানী ও ধীরপ্রকৃতি ভারতীয় মডারেটদিগকেও উন্নতিশীল বলিয়া মনে হইত। যাহারা উন্নতি ও আশ্রয়ের জন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যনীতির সহিত সমস্বার্থসূত্রে সম্বন্ধ, ভারতীয় সেই সকল বিভিন্ন কায়েমী স্বার্থের উহার প্রতিনিধি। ইহা ছাড়া, সাম্প্রদায়িক দিক হইতে ‘সংখ্যা গরিষ্ঠ’ ‘সংখ্যা লঘিষ্ঠ’ ইত্যাদি দলের প্রতিনিধিও ছিল। এই সকল উচ্চ শ্রেণীর ঐক্যবিরোধী ব্যক্তিয়া

গোলটেবিল বৈঠক

কিছুতেই নিজেদের মধ্যে কোন আপোষ রক্ষা না করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ইহারা পুরাপুরি প্রতিক্রিয়াশীল; রাজনৈতিক অধিকার বর্জন করিয়াও সাম্প্রদায়িক স্ববিধালাভই ইহাদের একমাত্র লভ্য। অবশ্য ইহারা মুখে ঘোষণা করিতে লাগিল যে, তাহাদের সাম্প্রদায়িক দাবী সন্তোষজনক ভাবে পূর্ণ না হইলে তাহারা আর এক দফা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিতে সম্মত হইবেন। ইহা এক অভূতপূর্ব দৃষ্ট! পরাধীন জাতির যে কত অধঃপতন হইতে পারে, তাহারা কি ভাবে নিজেদের সাম্রাজ্য-নীতির দ্যুতক্রীড়ারূপগুরুপে অবাদে ব্যবহার করিতে পারে, ইহা তাহার এক অতি শোচনীয় দৃষ্টান্ত। অবশ্য এই সকল হাইনেসগণ, লর্ডগণ, নাইটগণ বা অগ্রাগ্র খেতাবধারীরা নিশ্চয়ই ভারতের প্রকৃত প্রতিনিধি নহেন। গোলটেবিল বৈঠকের এই সকল প্রতিনিধি সকলেই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের মনোনীত এবং তাহাদের স্বার্থের দিক হইতে গভর্নমেণ্ট ভাল লোকই বাছিয়া লইয়াছিলেন। তথাপি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আমাদের এইভাবে ব্যবহার ও কাজে লাগাইতে পারেন, ইহা আমাদের দুর্বলতারই পরিচায়ক। কত সহজে তাহাদিগকে ভুলাইয়া পরস্পরের কাজ পণ্ড করিবার কাজে লাগাইয়া দেওয়া যায়! আমাদের উচ্চশ্রেণী এখন সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের মতবাদে আচ্ছন্ন এবং তাহাদের ইঞ্জিতেই চালিত হইয়া থাকে। তাহারা কি ইহা দেখিতে ও বুঝিতে পারেন না? অথবা তাহারা স্পষ্টভাবে সব বুঝিয়াই গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার ভয়েই উহা জ্ঞাতসারে গ্রহণ করেন?

কায়েমী স্বাধীনবাদীদের এই বৈঠকে, যেখানে সাম্রাজ্যবাদী, সামন্ততন্ত্রী মূলধনী বণিক, ধান্মিক, সাম্প্রদায়িকতাবাদী সকল শ্রেণীর সমাবেশ, সেখানে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব আগা থার ছায়া যোগ্যপাত্রেরই অধীন হইয়াছিল। কেন না তাহাতে একাধারে কমবেশী ৩০ সকল বিভিন্ন স্বার্থের সমাবেশ আছে। আজীবন তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছেন। তিনি অধিকাংশ কাল ইংলণ্ডেই বাস করেন, কাজেই আমাদের শাসকগণের স্বার্থ ও মত তিনি ভালভাবেই ব্যক্ত করিতে পারেন। গোলটেবিল বৈঠকে তিনি সাম্রাজ্যবাদী ইংলণ্ডের একজন যোগ্য প্রতিনিধি হইতে পারিতেন; কিন্তু অদৃষ্টের এমনি নিষ্ঠুর পরিহাস যে, তিনিই যেন ভারতের যথার্থ প্রতিনিধি।

বৈঠকে আমাদের বিরুদ্ধ পাল্লাই অতিমাত্রায় ভারী, উহাতে আমাদের প্রত্যাশার কিছুই রহিল না, দৈনন্দিন আলোচনার সংবাদে আমরা ক্রমশঃ

বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। আমরা দেখিলাম, জাতীয় ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি লইয়া অসম্বন্ধ ও অক্ষম আলোচনার ভাণ, চুক্তি, ষড়যন্ত্র ও প্রলোভনদ্বারা বিস্তার, ব্রিটিশ রক্ষণশীল দলের অতিমাত্রায় প্রগতিবিরোধীদের সহিত আমাদের কতিপয় স্বদেশবাসীর মিলন, সামান্য ব্যাপার লইয়া বিরামহীন আলোচনা, প্রকৃত কাজের কথা ইচ্ছা করিয়া স্থগিত রাখা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও বৃহৎ কায়েমী স্বার্থের ইজিতে ক্রমাগত যন্ত্রের মত পরিচালিত হওয়া, পরস্পরের দোষদর্শন এবং মাঝে মাঝে খানাপিনা ও পরস্পরের গুণকীর্তন। ইহা কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা—বড় চাকুরী, ছোট চাকুরী, চাকুরী ও আইন সভার আসন হিন্দু, মুসলমান, শিখ, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, ইউরোপীয়ান কে কত পাইবে তাহার ভাগাভাগি; কিন্তু সমস্তই উচ্চশ্রেণীর ভাগে পড়িবে, জনসাধারণের ইহাতে কিছুই নাই। স্ববিধাবাদীদের পোয়াবার, বিভিন্ন দল যেন ক্ষুধিত নেকড়ের মত নতুন শাসনতন্ত্রের মাংসখণ্ড পাইবার জন্য বিচরণ করিতেছে। স্বাধীনতার অর্থ ইহাদের নিকট ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির ক্ষেত্র প্রসারিত করা, ইহার নাম “ভারতীয় করণ” অর্থাৎ সমর বিভাগ ও সিভিল সার্ভিস ইত্যাদিতে অধিকসংখ্যায় ভারতীয়দের চাকুরীর ব্যবস্থা। স্বাধীনতার কথা, গণতান্ত্রিক ভারতের হস্তে ক্ষমতা অর্পণের কথা, ভারতীয় জনসাধারণের অতি মর্যাস্তিক অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি সমাধানের কথা কেহই চিন্তা করিলেন না। ইহার জগুই কি ভারত এমন সাহসের সাহত সংগ্রাম করিয়াছে? আদর্শবাদ ও আত্মোৎসর্গের নির্মল আলোক হইতে কি আমরা এই তমসাবৃত রাজ্যে প্রবেশ করিব?

সেই স্বরঞ্জিত জনপূর্ণ কক্ষে গান্ধিজী বসিয়া—নিঃসঙ্গ, একক। তাঁহার পোষাক অথবা পোষাকের একান্ত অভাব অগ্ন্যাগ্ন সকলের সহিত তাঁহার পার্থক্য ঘোষণা করিতেছিল; কিন্তু ঐ সকল উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য পরিহিত ব্যক্তিগণের সহিত চিন্তায় ও দৃষ্টিভঙ্গীতে তাঁহার পার্থক্য ছিল আরও বেশী। বৈঠকে তিনি এক অসম্ভব কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়িলেন, আমরা দূর হইতে বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, তিনি সহ্য করিতেছেন কি করিয়া। কিন্তু তিনি ধৈর্যের সহিত কর্তব্য পালন করিতে লাগিলেন এবং আপোষের সূত্র আবিষ্কারের জন্য বারবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ একটি ইজিতে দেখাইয়া দিলেন যে, সাম্প্রদায়িকতা আসলে রাজনৈতিক প্রগতিবিরোধিতা মাত্র। মুসলমান প্রতিনিধিদের পক্ষ হইতে যে সকল সাম্প্রদায়িক দাবী উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাহার অনেকগুলিই তিনি ভাল মনে করেন নাই। তাঁহার ও তাঁহার সহকর্মী মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের ধারণা যে, ঐগুলি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের

গোলটেবিল বৈঠক

বিরোধী। তথাপি তিনি প্রশ্ন না করিয়া তর্ক না করিয়া ঐগুলি সমগ্রভাবে গ্রহণ করিতে চাহিলেন, সর্ভ দিলেন যে, রাজনৈতিক ব্যাপারে অর্থাৎ স্বাধীনতার জন্ত মুসলমান প্রতিনিধিগণকে তাঁহার ও কংগ্রেসের সহিত যোগ দিতে হইবে।

তিনি নিজের দায়িত্বেই এই সর্ভ দিলেন, কেন না তখন কংগ্রেসকে কোন প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু তিনি নিজে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, কংগ্রেসকে তিনি রাজী করাইতে পারিবেন। কংগ্রেসে তাঁহার অসামান্য প্রভাব ষাঁহারাজানেন। তাঁহাদের মনে গান্ধিজী যে কংগ্রেসের অল্পমোদন লাভ করিতে পারিবেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু গান্ধিজীর এই সর্ভ গৃহীত হইল না, আগা খাঁ ভারতের স্বাধীনতার দাবী করিবেন, ইহা কল্পনা করাও কঠিন। ইহা হইতে বুঝা গেল যে, বৈঠকে সাম্প্রদায়িকতাকে খুব বড় করিয়া তোলা হইলেও, সাম্প্রদায়িকতা প্রধান সমস্যা নহে। সাম্প্রদায়িকতার আবরণে রাজনৈতিক প্রগতিবিরোধীরাই সমস্ত প্রকার উন্নতির বাধা। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট সাবধানতা সহকারে এই সকল প্রগতিবিরোধীদের বৈঠকের জন্ত বাছিয়া লইয়াছিলেন, এবং বৈঠকের কার্যপ্রণালী সুকৌশলে নিয়ন্ত্রণ করিয়া সাম্প্রদায়িক সমস্যাকেই প্রধান প্রশ্নে পরিণত করিয়াছিলেন। এই প্রশ্নের মীমাংসায় ষাঁহারাজ কিছুতেই রাজী হইবেন না, তাঁহাদের সহিত আপোষ অসম্ভব।

ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের এই চেষ্টা সফল হইল। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, সাম্রাজ্য রক্ষার জন্ত কেবল বাহুবলই নহে, পরস্পরাগত সাম্রাজ্যবাদের কৌশল ও কূটনীতি দ্বারাও আরও বহুকাল তাঁহারাজ সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবেন। ভারতের জনসাধারণ ব্যর্থকাম হইল। অবশ্য গোলটেবিল বৈঠকে তাঁহাদের প্রকৃত প্রতিনিধিরা ছিলেন না এবং ইহা উদ্ভয় পক্ষের বলাবলের পরীক্ষাও নহে। তাহারাজ ব্যর্থকাম হইল, কেন না তাহাদের দাবীর পশ্চাতে কোন মতবাদের দৃঢ়ভূমি ছিল না এবং ইহাদের বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করা অতি সহজ। উন্নতির পরিপন্থী কায়েমী স্বার্থগুলিকে সরাইয়া ফেলিবার মত শক্তি তাহাদের ছিল না বলিয়া তাহারাজ ব্যর্থকাম হইল। অতিরিক্ত ধর্মপ্রবণতার জন্ত সাম্প্রদায়িক ভেদ বৃদ্ধি প্রবল করিয়া তোলা সহজ বলিয়া তাহারাজ ব্যর্থকাম হইল। অর্থাৎ তাহারাজ যথোচিত অগ্রসর ও শক্তিমান নহে বলিয়াই ব্যর্থ হইল।

এই গোলটেবিল বৈঠকে সাফল্য বা ব্যর্থতার কোন প্রশ্ন ছিল না। ইহাতে আশা করিবার অল্পই ছিল, তথাপি অশ্রুদিক দিয়া এই বৈঠক

একটু স্বতন্ত্র ধরণের। আইন অমাত্য আন্দোলনের প্রতি সকলের দৃষ্টি ছিল বলিয়া প্রথম বৈঠকের প্রতি ভারতের বা অন্যান্য দেশের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। ১৯৩০-এ গোলটেবিল বৈঠকে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের মনোনীত ইহা যাহারা গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে কৃষ্ণ পতাকার ও ধিকার-ধ্বনির বিরূপ বিদ্যায়তিনন্দন সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৩১ সালের ঘটনা স্বতন্ত্র, কেন না কংগ্রেসের প্রতিনিধি এবং কোটি কোটি লোকের নেতা গান্ধিজী বৈঠকে যোগদান করিলেন। ইহাতে বৈঠকের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইল এবং ভারতবর্ষ আগ্রহ সহকারে ইহার কার্যকলাপ দেখিতে লাগিল। যে কোন কারণেই হউক না কেন, প্রত্যেক ব্যর্থতায় ভারতের অখ্যাতি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আমরা বুঝিতে পারিলাম, কেন গান্ধিজীকে বৈঠকে লইয়া যাইবার জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এতটা ব্যগ্র হইয়াছিলেন।

সমস্ত চক্রান্ত, স্ববিধাবাদ ও নিষ্ফল কুটিল গতি লইয়া এই বৈঠক ভারতের পক্ষে কোন ব্যর্থতার নিদর্শন নহে। যাহাতে ব্যর্থ হয়, সেই ভাবেই ইহা গঠিত হইয়াছিল, এবং তাহার জন্য ভারতবাসীকে কোন মতেই দায়ী করা যায় না। কিন্তু ভারতের প্রধান সমস্যাগুলি ইহাতে জগতের দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে ইহা কৃতকার্য হইল এবং ভারতেও ইহা আশাভঙ্গ, নৈরাশ্র এবং অপমান বোধ সৃষ্টি করিল। ইহার সুযোগ লইয়া প্রগতিবিরোধী শক্তিগুলি পুনরায় মাথা তুলিয়া দাড়াইল।

দেশবাসীর সাফল্য ও ব্যর্থতা ভারতবর্ষের ঘটনার উপরই নির্ভর করে। সুদূর লগুনের কৌশলপূর্ণ চাতুর্যে, শক্তিশালী জাতীয় আন্দোলন মিলাইয়া যাইবে না। মধ্যশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের প্রকৃত ও আশু অভাব-গুলি জাতীয়তাবাদের মধ্যেই প্রকাশিত এবং উহা দ্বারাই তাহারা সমস্যা সমাধান করিতে চাহে। এই আন্দোলন হয় সাফল্য লাভ করিবে অথবা ইহার প্রয়োজন শেষ হইলে ইহার স্থলে অন্য কোন আন্দোলন জনসাধারণকে উন্নতি ও স্বাধীনতার দিকে চালিত করিবে, অথবা সাময়িক ভাবে বলপূর্ব্বক ইহাকে দমন করা যাইতে পারে। ভারতে সেই সংঘর্ষ কিছুকাল পরেই উপস্থিত হইল, তাহার ফলে সাময়িক অবসাদ দেখা দিল। এই সংঘর্ষের উপর দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের কোন প্রভাব না থাকিলেও, ইহা সংঘর্ষের পক্ষে প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছিল।

যুক্ত-প্রদেশে কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা

কংগ্রেসের অগ্রতম সাধারণ সম্পাদক এবং কার্য্যকরী সমিতির সাধারণ সদস্যরূপে নিখিল ভারতীয় রাজনীতির সহিত আমার সর্ব্বদাই যোগ ছিল; সময় সময় আমাকে নানা স্থানে যাইতে হইত, তবে যথাসম্ভব আমি ইহা এড়াইয়া চলিতাম। কাজের চাপ ও দায়িত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশনও দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইতে লাগিল, এমন কি ক্রমাগত দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত অধিবেশন হইত। ইহার কাজ এখন আর সমালোচনাপূর্ণ প্রস্তাব পাশ করা নহে; এক বৃহৎ ও বহুমুখী প্রতিষ্ঠানের বিবিধ গঠনমূলক কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করা, দিনের পর দিন কঠিন ও জটিল সমস্যাগুলি সমাধান করা, যাহার একটু এদিক ওদিক হইলেই সংঘর্ষ দেশব্যাপী হইয়া উঠিতে পারে।

যুক্ত-প্রদেশের কৃষক সমস্যাই কংগ্রেসের ও আমার প্রধান কাজ হইয়া উঠিল, যুক্ত-প্রদেশের কংগ্রেস কমিটি ১৫০শত সদস্য লইয়া গঠিত, দুই তিন মাস পর ইহার অধিবেশন হইত। ইহার কার্য্যকরী সমিতিতে ১৫জন সদস্য ছিলেন; ইহারা ঘন ঘন সভা করিতেন, কৃষক আন্দোলনের ভার ইহাদেরই হাতে গুস্ত ছিল।

১৯৩৩ সালের দ্বিতীয়ার্দ্ধে এই কার্য্যকরী সমিতি এক বিশেষ কৃষক কমিটি নিযুক্ত করিলেন। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে কতিপয় জমিদারও আসিয়া কার্য্যকরী সমিতির সহিত যোগ দিলেন এবং তাঁহাদের অনুমোদন লইয়াই কৃষক সমিতির কাজ চলিতে লাগিল। আমাদের প্রাদেশিক কংগ্রেসের সে বৎসরের সভাপতি (অতএব কার্য্যকরী সমিতি ও কৃষক কমিটিরও সভাপতি) তাসাদ্দুক আহম্মদ খাঁ শেরোয়ানী একজন বিখ্যাত জমিদার বংশের সন্তান। সাধারণ সম্পাদক শ্রীপ্রকাশ এবং কয়েকজন প্রধান সদস্য জমিদার অথবা জমিদারবংশীয়, অবশিষ্ট সদস্যগণ মধ্যশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী। আমাদের প্রাদেশিক কার্য্যকরী সমিতিতে একজনও রায়ত অথবা গরীব কৃষকের প্রতিনিধি ছিল না। জিলা কমিটিতে অবশ্য কৃষক সদস্য ছিল; কিন্তু নানাস্তরের নির্বাচনের মধ্য দিয়া যখন প্রাদেশিক কার্য্যকরী সমিতি গঠন হইত, তখন তাহার সমস্ত সদস্যই মধ্যশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী এবং জমিদার

জওহরলাল নেহরু

শ্রেণীর হইতেন। অতএব ইহাকে কোনমতেই চরমপন্থী বলা চলেনা ; কৃষকসমস্যা লইয়া ত নহেই।

প্রাদেশিক ব্যাপারে আমি কার্য্যকরী সমিতি ও কৃষক কমিটির একজন সদস্যমাত্র, তাহার বেশী কিছু নহি। আলোচনা ও অগ্রাগ্র কাজে আমি বিশেষভাবে যোগ দিতাম বটে, কিন্তু কখনও নেতার আসন গ্রহণ করি নাই। অবশ্য আমাদের প্রদেশে কেহই নেতার আসন গ্রহণ করিতেন না, আমরা সহযোগিতা ও একত্র কাজ করিতে বহুদিন হইল অভ্যস্ত। আমরা ব্যক্তি অপেক্ষা প্রতিষ্ঠানকেই বড় করিয়া দেখিতাম। বাৎসরিক সভাপতি সাময়িক ভাবে আমাদের প্রধান বা প্রতিনিধি হইতেন, তবুও তাঁহার কোন বিশেষ ক্ষমতা ছিল না।

আমি এলাহাবাদ জিলা কংগ্রেস কমিটিরও সদস্য ছিলাম। এই কমিটি সভাপতি পুরুষোত্তমদাস ট্যাঙনের নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলনে কৃতিত্বের সহিত কাজ করিয়াছে। ১৯৩০ সালে এই কমিটিই যুক্ত-প্রদেশে করবন্ধ আন্দোলনে প্রথম অগ্রণী হইয়াছিল। অবশ্য এলাহাবাদ জিলা অপেক্ষা অযোধ্যার তালুকদারী অঞ্চলের অবস্থা কৃষিপণ্যের মন্দার দরুণ অধিকতর শোচনীয় হইয়াছিল,—তথাপি এলাহাবাদ হইতে আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার কারণ, এই জিলা অধিকতর সম্ভবন্ধ এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে অগ্রসর। এলাহাবাদ সহর রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি, এখান হইতে প্রধান প্রধান কর্ম্মীরা প্রায়ই পল্লী অঞ্চলে যাইতেন।

১৯৩১-এর মার্চমাসে দিল্লী-সন্ধির পরেই আমরা পল্লী অঞ্চলে কর্ম্মীদিগকে পাঠাইয়া এবং মুদ্রিত ইস্তাহার বিলি করিয়া কৃষকদের জানাইয়া দিলাম যে, আইন অমান্য ও করবন্ধ আন্দোলন বন্ধ হইয়াছে। রাজনৈতিক কারণে খাজনা দেওয়ার আর কোন বাধা নাই ; আমরা তাহাদিগকে খাজনা দিবার উপদেশ দিলাম। তবে ইহাও জানাইলাম যে, দ্রব্যমূল্য অতিরিক্ত হারে হ্রাস পাওয়ার ফলে, তাহাদের খাজনাও মাপ পাওয়া উচিত ; আমরা তাহাদের সহিত একযোগে ঐ দাবী করিব বলিয়া প্রস্তাব করিলাম। এমন কি, সাধারণ অবস্থাতেও খাজনা এক দুর্ব্বহ বোঝা, দ্রব্য মূল্য কমিয়া যাওয়ায় পূর্ণ খাজনা বা তাহার কাছাকাছি কিছু দেওয়া অসম্ভব। আমরা কৃষকদের প্রতিনিধিদের লইয়া সম্মেলন আহ্বান করিলাম এবং আপোষ রফার আলোচনার ভিত্তি হিসাবে প্রস্তাব করিলাম—সাধারণভাবে অর্দ্ধেক, বিশেষ ক্ষেত্রে তাহা অপেক্ষাও কম খাজনা লওয়া হউক।

আমরা কৃষক সমস্যাতে আইন অমান্য আন্দোলন হইতে পৃথক করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলাম। অন্ততঃ ১৯৩১ সালে আমরা রাজনীতি-বর্জিত

যুক্তপ্রদেশে কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা

নিছক অর্থনৈতিক সমস্যারূপেই উহা বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। ইহা অবশ্য কঠিন, কেন না উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ বিद्यমান, এবং অতীতে ইহা একত্রই ছিল। কংগ্রেসের কর্মী হিসাবে আমাদের লক্ষ্য অবশ্যই রাজনৈতিক ছিল। আপাততঃ আমরা এক প্রকার কৃষক সমিতির মধ্য দিয়া কাজ করিতে লাগিলাম (অ-কৃষক এবং এমন কি জমিদারদের নিয়ন্ত্রণে); কিন্তু রাজনীতি আমরা একেবারে বিসর্জন দিতে পারি নাই, সে ইচ্ছাও ছিল না; কিন্তু গভর্নমেন্ট আমাদের প্রত্যেক কার্যের মধ্যেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দেখিতে লাগিলেন। আমরা সম্মুখে ভবিষ্যতের আইন অমান্ত আন্দোলনের ছায়া দেখিতেছিলাম, এবং উহা যখন আসিয়া পড়িবে, তখন রাজনীতি ও অর্থনীতি পুনরায় একত্রে অগ্রসর হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ।

এই শ্রেণীর বাধা সত্ত্বেও আমরা দিল্লী-সন্ধির পর হইতে বরাবর কৃষক সমগ্রকে রাজনৈতিক সংঘর্ষ হইতে পৃথক রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি। দিল্লী-চুক্তিতে এই সমস্যার যে সমাধান হয় নাই, তাহা গভর্নমেন্ট ও জনসাধারণকে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করাইবার জগুই আমরা উহা করিয়াছি। দিল্লীতে আলোচনা কালে, আমার বিশ্বাস, গান্ধিজী লর্ড আর্কুইনকে এই আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, যদি তিনি দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে নাও যান, তাহা হইলেও বৈঠকের অধিবেশন কালে আইন অমান্ত আন্দোলন পুনরায় আরম্ভ করিবেন না। পক্ষান্তরে, তিনি কংগ্রেসকেও গোলটেবিল বৈঠকের বিঘ্ন না ঘটাইয়া ফলাফলের জগু অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনই গান্ধিজী ইহা পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি স্থানীয় কোন অর্থনৈতিক সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইতে আমাদের বাধ্য করা হয়, তাহার সহিত এই প্রতিশ্রুতির সম্বন্ধ নাই। যুক্ত-প্রদেশের কৃষক সমগ্রা তখন আমাদের সম্মুখে ছিল এবং সম্ভবত্বভাবে কিছু কাজও হইয়াছিল, তবে কার্যতঃ সমস্ত ভারতেই কৃষকগণের একই প্রকার দুর্দশা হইয়াছিল। সিমলায় আলোচনা কালে গান্ধিজী এই প্রসঙ্গ পুনরায় উত্থাপন করেন,—উভয় পক্ষের প্রকাশিত পত্রের ইহার উল্লেখ ছিল। * ইউরোপ যাত্রার প্রাক্কালে তিনি স্পষ্টভাবে বলিয়াছিলেন

* ১৯৩১-এর ২৭শে আগষ্টের সিমলা চুক্তিনামার এই পত্র দুইখানিও অবিলম্বে অংশ:—
সিমলা, ২৭শে আগষ্ট. ১৯৩১

প্রিয় মিঃ ইয়ার্সন,

ধন্যবাদ সহকারে নতুন থসডাসহ আপনার পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। আপনি যে সমস্ত সংশোধনের প্রস্তাব করিয়াছেন, স্তর কাওয়ারাসজী জাহাজীর অনুগ্রহপূর্বক তাহা

জওহরলাল নেহরু

যে, গোলটেবিল বৈঠক অথবা রাজনৈতিক সমস্যা ছাড়াও, জনসাধারণের, বিশেষভাবে কৃষকদের অর্থনৈতিক আন্দোলন, তাহাদের পক্ষ সমর্থন করা কংগ্রেসের পক্ষে প্রয়োজন হইতে পারে। এই শ্রেণীর সংঘর্ষে প্রশ্রয় দেওয়া তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। তিনি উহা পরিহার করিতেই চাহিয়াছিলেন। কিন্তু অপরিহার্য হইয়া উঠিলে দায়িত্ব গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর কি। আমরা জনসাধারণকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। তাঁহার কথা এই যে দিল্লী-সন্ধি সাধারণভাবে রাজনৈতিক নিরুপদ্রব প্রতিরোধেই প্রযোজ্য, এই শ্রেণীর আন্দোলনের বাধা নহে।

আমাকে জানাইয়া দিয়াছেন। আমি এবং আমার সহকর্মীগণ বিশেষ মনোযোগ সহকারে সংশোধিত খসড়াখানি বিবেচনা করিয়াছি। নিম্নলিখিত মন্তব্যের সহিত উক্ত খসড়া আমরা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। যথা—

চতুর্থ দফায় গভর্ণমেন্ট যে সন্তু দিয়াছেন, তাহা কংগ্রেসের পক্ষ হইতে গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। কারণ, আমাদের মনে হয় যে, যদি কোন ক্ষেত্রে চুক্তির সর্ব ভঙ্গ সম্পাদিত কোন অভিযোগের প্রতিকার না হয়, তবে সে ক্ষেত্রে তদন্ত আবশ্যক। কেন না দিল্লীর চুক্তি যতদিন বলবৎ থাকিবে, নিরুপদ্রব প্রতিরোধ ততদিন স্থগিত থাকিবে। যদি একাত্তাই ভারত সরকার তথা প্রাদেশিক সরকারগণ তদন্ত মঞ্জুর করিতে সম্মত না থাকেন, তবে আমার বা আমার সহকর্মীদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু তাহার ফল এই হইবে যে, এ পর্য্যন্ত অজ্ঞাত যে সমস্ত বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, সে সমস্ত বিষয় তদন্তের জন্য কংগ্রেস পীড়াপীড়ি করিবে না বটে, কিন্তু যদি কোন ক্ষেত্রে অভিযোগ এমন গুরুতর বলিয়া মনে হয় যে, তদন্তের অভাবে প্রতিকারের অভাববশতঃ কংগ্রেসকে প্রতিকারার্থ আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেই হইবে, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে কংগ্রেস নিরুপদ্রব প্রতিরোধ স্থগিত থাকা সম্বন্ধে সেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবে। বাহুল্য হইলেও আমি নিশ্চিতরূপে গভর্ণমেন্টকে জানাইয়া রাখিতেছি যে, কংগ্রেস সর্বদাই প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ হইতে বিরত থাকিবার চেষ্টা করিবে এবং আলোচনা অনুরোধ প্রভৃতি দ্বারা প্রতিকারের চেষ্টা করিবে। ভবিষ্যতে কোন মতান্তর উপস্থিত না হইতে পারে এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ না আসা যাইতে পারে, এই জগুই এই কথাটা বলিয়া রাখা। যদি আমাদের এই আলোচনা সফল হয়, তাহা হইলে প্রস্তাবিত ইস্তাহার, এই চিঠি এবং আপনায় উত্তর একদিকে প্রকাশিত হইবে বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি।

ভবদীয়

এম, কে, গান্ধী

দি গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া

বরাট্ট বিভাগ, সিমলা, ২৭শে আগষ্ট, ১৯৩১

প্রিয় মিঃ গান্ধী,

কয়েকটি মন্তব্যসহ খসড়া ইস্তাহারখানি গ্রহণ করিয়া আপনি অগ্ৰ তারিখে যে পত্র লিখিয়াছেন, তজ্জু আপনাকে ধন্যবাদ। কংগ্রেস এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত অভিযোগ করিয়াছে,

যুক্তপ্রদেশে কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা

আমি ইহা উল্লেখ করিতেছি, কেন না যুক্ত-প্রদেশের কংগ্রেস কমিটি ও তাহার নেতাদের বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ এই অভিযোগ করা হইয়াছে যে, তাঁহারা দিল্লী-সন্ধি ভঙ্গ করিয়া করবন্ধ আন্দোলন পুনরায় আরম্ভ করিয়াছেন। ঐহাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ, তাঁহারা ইহার উত্তর দিতে পারিতেন। কিন্তু যখন তাঁহারা কারারুদ্ধ এবং সংবাদপত্র ও ছাপাখানার উপর কঠোর অনুশাসন, তখনই সুবিধা মত ঐ সকল অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছিল। যুক্ত-প্রদেশের কমিটি ১৯৩১ সালে করবন্ধ আন্দোলন করেই নাই, কিন্তু সে কথা আলাদা, আমি এইটুকু বলিতে চাই যে, আইন অমান্য হইতে স্বতন্ত্র, অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য লইয়া কোন আন্দোলন নিশ্চয়ই দিল্লী-সন্ধি ভঙ্গ করা নহে। ইহার যৌক্তিকতা ও অযৌক্তিকতার বিচার স্বতন্ত্র বিষয়, অর্থনৈতিক অসন্তোষের প্রতিবিধানের জন্য কারখানার শ্রমিকদের ধর্মঘট করিবার যতখানি অধিকার আছে, কৃষকদেরও ঠিক ততখানি অধিকার রহিয়াছে। দিল্লী-সন্ধি হইতে সিমলা আলোচনা পর্য্যন্ত আমাদের মনোভাব এইরূপই ছিল এবং গভর্নমেন্ট কেবল ইহা যে বুঝিয়াছিলেন তাহা নহে, ইহাকে যথোচিত মধ্যাদা দিয়াছিলেন।

৭০ দ্রবস্থা পূর্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল, ১৯২৯ এবং তাহার পবন্বর্তী কৃষিপণ্যের মন্দা তাহাকে চরম করিয়া তুলিল। কয়েক বৎসর পূর্বে জগতে সর্বত্র কৃষিপণ্যের দর চড়া ছিল, জগতের বাজারের সহিত একসূত্রে গ্রথিত ভারতের কৃষিজীবীরাও উহার অংশ পাইয়াছে। কিন্তু দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতে গভর্নমেন্টের রাজস্ব ও জমিদারের খাজনাও বাড়িয়াছে,—কাজেই প্রকৃত চাষী এই চড়ার বাজারে বিশেষ লাভবান

তাহার তদন্তের জন্য পীড়াপীড়ি করিবার অভিপ্রায় কংগ্রেসের নাই, তাহা সপরিষদ বড়লাট স্বগত হইলেন। আপনি এ কথাও জানাইয়াছেন যে, তাহাতে কোন সংঘর্ষ না হয়, তজ্জন্ত কংগ্রেস সত্তত চেষ্টিত থাকিবে এবং আলোচনা ও অমুরোধ প্রভৃতি দ্বারা প্রতিকারের চেষ্টা করিবে। কংগ্রেসকে ভবিষ্যতে যদি কোন ব্যবস্থা করিতেই হয়, তাহা হইলে আপনি কংগ্রেসের কথা পূর্ব হইতেই পরিকল্পনা করিয়া রাখিয়াছেন। আমি আপনাকে জানাইতেছি যে কোন প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের আবশ্যক হইবে না বলিয়াই সপরিষদ বড়লাটের ধারণা। গভর্নমেন্টের সাধারণ নীতি সম্বন্ধে, বড়লাট আপনাকে ১৯শে আগষ্ট তারিখে যে পত্র লিখিয়াছেন, সেই পত্র দেখুন।

সরকারী ইস্তাহার, আপনার অদ্য তারিখের চিঠি এবং এই উত্তর গভর্নমেন্ট একসঙ্গে প্রকাশ করিবেন।

ভবদীয়

এইচ, ডব্লিউ, ইমার্সন

জওহরলাল নেহরু

হইতে পারেন নাই। মোটের উপর কয়েকটি সুবিধাজনক অঞ্চল ব্যতীত ভারতীয় কৃষিজীবীদের অবস্থা মন্দই হইয়াছে। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ত্রিশ বৎসর সরকারী রাজস্ব অপেক্ষা জমিদারের খাজনা তুলনায় অনেক বেশী বাড়িয়াছে। এই বৃদ্ধির হার (যতদূর স্মরণ হয়) এক টাকায় পাঁচ টাকা; ইহাতে সরকারী রাজস্বও যেমন মোটা হারে বাড়িয়াছে, তেমনি জমিদারদের আয়ও অনেক বেশী বাড়িয়াছে; কৃষকদের অবস্থা পূর্বের মতই অনশনের কাছাকাছি। এমন কি যেখানে দ্রব্যমূল্য কমিয়াছে, অথবা অনাবৃষ্টি, বহা, পঙ্গপাল, ঝড়, তুষান প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা ঘটয়াছে, সেখানেও অত্যন্ত ইতস্ততঃ করিয়া সেই বৎসরের জন্য কিছু খাজনা মাপ করা হইয়াছে। ভাল বৎসরে খাজনার হার অত্যন্ত বেশী, এবং অল্প সময়েও খাজনার হার এত বেশী যে, মহাজনের নিকট ধার না করিয়া পরিশোধের উপায় থাকিত না। এইভাবে কৃষি-ঋণ বাড়িয়াছে।

জমিদার, তালুকদার, কৃষক-মালিক, রায়ত কৃষির উপর নির্ভরশীল সকল শ্রেণীই মহাজনের নিকট ঋণের দায়ে আবদ্ধ। বর্তমান ব্যবস্থায় পল্লীর আদিম অর্থনৈতিক জীবনে এই মহাজন শ্রেণীর অস্তিত্ব অপরিহার্য, এই মহাজন শ্রেণী অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া জমির উপর এবং জমির সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উপর যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। তাহাকে সংযত করিবার কোন ব্যবস্থাই নাই। আইন তাহার সহায়, সে তাহার ঋণপত্রে লিখিত সর্ব অল্পায়াসী তাহার প্রাপ্য 'অর্দ্ধসের মাংস' ঠিক বুঝিয়া পায়। ক্রমে ছোট ছোট জমিদার হইতে কৃষক পর্য্যন্ত সকলের জমি তাহার হাতে আসিতে থাকে; এইরূপে মহাজন বিপুল ভূ-সম্পত্তির মালিক হইয়া নিজেই বড় জমিদার-বাবু হইয়া বসে। যে কৃষক নিজের জমি চাষ করিত, সে বেনিয়া জমিদার অথবা সাহকারের ক্রীতদাসে (ভূমিশূন্য বর্গাদার) পরিণত হয়। রায়তের অদৃষ্ট আরও মন্দ। সে হয় সাহকারের ক্রীতদাস, নয় ক্রমবর্দ্ধিত ভূমিশূন্য দিন মজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। যে মহাজন বা কুসীদজীবী এইরূপে জমির মালিক হয়, তাহার সহিত জমি বা প্রজাদের কোন প্রাণগত যোগ নাই। সে সাধারণতঃ সহরে থাকিয়া সুদী কারবার চালায়, খাজনাপত্র আদায়ের জন্য গোমস্তা নিয়োগ করে; ইহারায় যন্ত্রের মত নিষ্ঠুর ও অমানুষিক উপায়ে নিজেদের কর্তব্য পালন করে।

ক্রমবর্দ্ধিত কৃষি ঋণ হইতেই বুঝা যায়, ভূমিসংক্রান্ত ব্যবস্থা কত যুক্তিবিহীন, কত শিথিল, অধিকাংশ ব্যক্তিরই কোন সঞ্চয়, কোন

যুক্তপ্রদেশে কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা

সঞ্চিত অশ্বাবর সম্পত্তি নাই, দুর্দিনে আশ্রয়ক্ষার উপায় নাই, সর্বদাই তাহারা অগ্ন্যভাবের বিভীষিকার মধ্যে বাস করে। দুর্যোগ বা আকস্মিক বিপদ হইতে তাহারা আশ্রয়ক্ষা করিতে পারে না। সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিলে দলে দলে মৃত্যুমুখ পতিত হয়। ১৯২৯-৩০-এ গভর্ণমেন্ট-নিয়োজিত ব্যাঙ্কিং-তদন্ত কমিটি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, ভারতে (ব্রহ্মদেশ সহ) মোট কৃষি-ঋণের পরিমাণ ৮৬০ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে জমিদার, কৃষক-মালিক ও রায়ত সকলের ঋণই ধরা হইয়াছে, কিন্তু ইহার বড় অংশ হইল চাষীদের ঋণ। গভর্ণমেন্টের মুদ্রাবিনিময় বাট্টা-নীতি মহাজন শ্রেণীর পক্ষেই সুবিধাজনক, ইহাও ঋণভার বৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছে। টাকার বিনিময়হার এক শিলিং চার পেন্স না করিয়া এক শিলিং ছয় পেন্স করায় (ভারতবাসীদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও) কৃষিঋণের পরিমাণ শতকরা ১২৫০ টাকা অর্থাৎ ১০৭ কোটি টাকা বাড়িয়াছে।*

মহাযুদ্ধের পর সহসা স্বল্পস্থায়ী মূল্য বৃদ্ধি এবং পরে ক্রমাগত বাজার পড়িয়া বাওয়ায় কৃষকদের অবস্থা মন্দ হইতেছিল। ১৯২৯-এ জগদ্ব্যাপী অর্থসঙ্কট তাহার উপর আসিয়া পড়ায় মহাসঙ্কট দেখা দিল।

কৃষি-পণ্যের মূল্যের সহিত হারা-হারিস্থত্রে খাজনা ধাৰ্য্য হউক, ১৯৩১ সালে যুক্তপ্রদেশে আমাদের প্রস্তাব ছিল ইহাই। অর্থাৎ ১৯৩১ সালে কৃষিপণ্যের যে মূল্য, অতীতে ঐরূপ মূল্য থাকাকালীন যে হারে খাজনা লওয়া হইত, বর্তমানেও তাহাই লওয়া হউক। মোটামুটি ভাবে ত্রিশ বৎসর পূর্বে ১৯০১ সালে ঐ অবস্থা ছিল। ইহা মোটামুটি হিসাব হইলেও, ইহার প্রয়োগ সহজ ছিল না; কেন না, দখলীস্বত্ববিশিষ্ট, দখলীস্বত্বহীন, চুকানদার, দরচুকানদার প্রভৃতি নানাশ্রেণীতে রায়তগণ বিভক্ত। আর এক উপায় ছিল, এবং নিঃসন্দেহ

* ভারতের কৃষি-ঋণের পরিমাণ ৮৬০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে; আমার মতে ইহা অত্যন্ত কম করিয়া ধরা হইয়াছে। প্রকৃত ঋণের পরিমাণ অনেক বেশী। যাহা হউক, এই চার পাঁচ বৎসরে উহা আরও বাড়িয়াছে সন্দেহ নাই। পঞ্জাব প্রদেশের ঋণের পরিমাণ, পঞ্জাব ব্যাঙ্কিং-তদন্ত-কমিটির (১৯২৯) হিসাবে ১৩৫ কোটি টাকা। পঞ্জাবের ঋণ-লাঘব আইন প্রণয়নে সিলেক্ট কমিটির (অক্টোবর, ১৯৩৪) রিপোর্টে প্রকাশ, “পঞ্জাবে কৃষকদের ঋণের বোকা অত্যন্ত বেশী, খুব কম করিয়া হিসাব ধরিলেও ২০০ কোটি টাকার কম হইবে না।” এই নূতন হিসাবে, পূর্বের তদন্ত-কমিটি অপেক্ষা শতকরা ৫০ টাকা বেশী ধরা হইয়াছে। এই বৃদ্ধিত হার যদি অগ্ন্যভাব প্রদেশ সম্বন্ধেও ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে বর্তমানে (১৯৩৪) ভারতের কৃষি-ঋণের পরিমাণ ১২০০ কোটি টাকারও অধিক দাঁড়াইবে।

তাহাই সদুপায় যে, কৃষিকার্যের ব্যয় ও জীবনধারণোপযোগী মজুরী বাদ দিয়া প্রত্যেকের খাজনা দিবার ক্ষমতানুযায়ী ব্যবস্থা করা। যাহা হউক, এই শেষোক্ত উপায়েও জীবনযাত্রার ব্যয় যথাসম্ভব কম করিয়া ধরিলেও দেখা গিয়াছে যে, ভারতে অধিকাংশ জমি ও জমা মোটেই লাভজনক নহে; এবং আমরা ১৯৩১ সালে যুক্ত-প্রদেশেও ইহার বহুতর দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছি। অনেক রায়তের পক্ষেই সম্পত্তি বিক্রয় না করিয়া (যদি বিক্রয় করিবার কিছু থাকে) অথবা উচ্চহারে স্বদ কবুল করিয়া ঋণ করা বাস্তবীকৃত খাজনা শোধ করিবার উপায় নাই।

যুক্ত-প্রদেশের কংগ্রেস কমিটির প্রাথমিক ও পরীক্ষামূলক প্রস্তাব ছিল যে, দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের খাজনা শতকরা পঞ্চাশ টাকা কম করা হউক এবং তদতিরিক্ত অধিকতর দুর্দশাপন্ন প্রজাদের খাজনা আরও কম লওয়া হউক। ১৯৩১ সালের মে মাসে যখন গান্ধিজী যুক্ত-প্রদেশে আসিয়া গভর্নর সার ম্যালকম হেলীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিল; তাহারা একমত হইতে পারিলেন না। ইহার পরই গান্ধিজী যুক্ত-প্রদেশের জমিদার ও প্রজাদের নিকট এক আবেদনপত্র প্রচার করিলেন, তিনি প্রজাদিগকে সাধ্যানুযায়ী খাজনা দিবার অনুরোধ করিলেন। তিনি যে সংখ্যা নির্দেশ করিলেন, তাহা আমাদের পূর্বনির্দিষ্ট হার অপেক্ষা অনেক বেশী। আমাদের প্রাদেশিক কমিটি গান্ধিজীর সংখ্যা মানিয়া লইলেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ স্ববিধা হইল না, কেন না, গভর্নমেন্ট রাজী হইলেন না।

প্রাদেশিক গভর্নমেন্টের অবস্থাও সন্দ্বীন ছিল। ভূমিরাজস্বই তাঁহাদের প্রধান আয়, ইহা একেবারে ছাড়িয়া দিলে বা বহুল পরিমাণে কমানিয়া দিলে দেউলিয়া হইতে হয়। অত্যাধিক কৃষক-চাকল্য সম্পর্কে তাঁহাদের ভীতিও ছিল, যথাসম্ভব খাজনা মকুব করিয়া তাহারা কৃষকদিগকে শাস্ত করিতে প্রয়াসী হইলেন। কিন্তু দুইকূল রক্ষা করা যায় না। কৃষক ও রাষ্ট্রের মধ্যে আছেন জমিদারগণ, অর্থনৈতিক দিক হইতে ইহারা অকর্মণ্য ও অপ্রয়োজনীয় পরগাছা। রাষ্ট্র ও কৃষকের হিতকল্পে ইহাদের ক্ষতি করিয়াও কিছু করা সম্ভব ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বর্তমানে যে ভাবে গঠিত, তাহাতে রাজনৈতিক কারণে, এখনও যে অল্পসংখ্যক শ্রেণী তাঁহাদের হাতে আছে, তাহার অন্ততম এবং নির্ভরশীল জমিদার শ্রেণীকে তাহারা স্নেহবঞ্চিত করিতে পারেন না।

অবশেষে প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট জমিদার ও প্রজাদের খাজনা হ্রাসের ব্যবস্থা ঘোষণা করিলেন। এই ব্যবস্থা এত জটিল যে, সহজে কিছু

যুক্তপ্রদেশে কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা

বুঝিবার উপায় নাই। তবে প্রয়োজনের তুলনায় ইহা যে অনেক কম, তাহা স্পষ্টই বুঝা গেল। ইহার মধ্যে চলতি সালের খাজনার কথাই উল্লেখ ছিল, প্রজাদের বাকি বকেয়া খাজনা ও দেনার কথা উল্লেখ ছিল না। যদি প্রজারা চলতি বৎসরের প্রথম ছয় মাসের কিস্তীর টাকা দিতে না পারে, তাহা হইলে বাকী বকেয়া ও পুরাতন দেনা কিরূপে শোধ দিবে। জমিদারদের প্রচলিত প্রথা এই যে, তাহারা বকেয়া খাজনা ওয়াশীল না করিয়া হাল খাজনা লয় না। প্রজাদের দিক হইতে এই নিয়ম অত্যন্ত বিপজ্জনক, কেন না, যে কোন সময়ে কিস্তী খেলাপের দায়ে তাহার জমি নিলামে বিক্রয় হইতে পারে।

প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি মহা অহবিধার মধ্যে পড়িলেন। আমরা বুঝিলাম যে, রায়তদের প্রতি অবিচার করা হইল, কিন্তু আমরা কোন প্রতিকার করিতে পারিলাম না। রায়তদিগকে খাজনা না দিবার পরামর্শ দেওয়ার দায়িত্ব লইবার আমাদের ইচ্ছা ছিল না। আমরা তাহাদের যথাসাধ্য খাজনা দিবার পরামর্শ দিতে লাগিলাম, এবং তাহাদের দুর্ভাগ্যের সহিত সহানুভূতিজ্ঞাপন ও আশাভরসা দিতে লাগিলাম। খাজনা মাপ দেওয়ার পরও তাহাদের নিকট সাধের অতিরিক্ত দাবী করা হইল।

আইনী ও বে-আইনী পীড়ন-যন্ত্র চলিতে আরম্ভ করিল। হাজার হাজার উচ্ছেদের মামলা দায়ের হইল; গরু, বাছুর, অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক, জমিদারের গোমস্তাদের মারধর চলিতে লাগিল। অনেক রায়ত অংশতঃ খাজনা পরিশোধ করিল, তাহাদের মতে, তাহারা যথাসাধ্য দিতে কষ্ট করিল না। সম্ভবতঃ কোন কোন স্থলে কেহ কেহ কিছু বেশী দিতে পারিত, কিন্তু অধিকাংশ প্রজার পক্ষেই ইহা অত্যন্ত বেশী। আংশিক খাজনা দিয়া তাহারা রেহাই পাইল না। আইনের জগদ্বল পাথর গড়াইয়া চলিল, যাহাকে সম্মুখে পাইল তাহাকেই নির্দয়ভাবে পিষ্ট করিল। আংশিক খাজনা দেওয়া সত্ত্বেও, উচ্ছেদের মামলাগুলি ডিক্রী হইতে লাগিল, গরু, বাছুর, ব্যক্তিগত অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও নীলামে বিক্রয় হইতে লাগিল। খাজনা না দিলেও রায়তদের অবস্থা ইহার চেয়ে মন্দ হইত না। বরং তাহাদের ভালই হইত, কেননা অন্ততঃ ঐ পরিমাণ টাকা তাহারা বাঁচাইতে পারিত।

তাহারা দলে দলে আসিয়া আমাদের নিকট দুঃখের সহিত অহুযোগের সুরে বলিতে লাগিল, আমাদের কথামত খাজনা দিয়াও তাহাদের এই দশা হইল। এক এলাহাবাদ জিলাতেই হাজার হাজার কৃষক জমি

হারাইল, আরও বহু সহস্র কৃষকের নামে মামলা চলিতে লাগিল। জিলা কংগ্রেসের কার্যালয়ে সারাদিন উত্তেজিত জনতা ভীড় করিয়া থাকিত। আমার বাড়ীর অবস্থাও তদ্রূপ—সময় সময় এই অবস্থা হইতে নিষ্কৃতির, জন্ত আমার পলায়ন করিবার, লুকাইয়া থাকিবার ইচ্ছা হইত। অনেক রায়ত আসিয়া শরীরে প্রহারের চিহ্ন দেখাইয়া বলিত, জমিদারের গোমস্তা, পাইকেরা মারিয়াছে। আমরা হাসপাতালে তাহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতাম। তাহারাই বা কি করিবে? আমরাই বা কি করিব? আমরা অবস্থা বর্ণনা করিয়া প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের নিকট দীর্ঘ পত্র লিখিতে লাগিলাম। নৈনীতাল ও লক্ষ্ণৌয়ে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের সহিত কথাবার্তার আদান-প্রদানের জন্ত কংগ্রেস কমিটি গোবিন্দবল্লভ পন্থকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনিও গভর্ণমেণ্টের নিকট সর্বদা পত্র লিখিতে লাগিলেন। আমাদের সভাপতি তাসাদু ক, এ, কে, শেরওয়ানী এবং আমিও মাঝে মাঝে পত্র লিখিতাম।

জুন ও জুলাই মাসে বর্ষাকালে আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। এখন চাষ আবাদ ও বীজ বন্নিবার সময়। যে সমস্ত প্রজাকে উচ্ছেদ করা হইয়াছে, তাহারা অলসভাবে বসিয়া তাহাদের পতিত জমি দেখিবে? কৃষকের পক্ষে ইহা কঠিন, ইহা তাহাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। আইনতঃ উচ্ছেদ সাব্যস্ত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে জমি বে-দখল হয় নাই। আদালতের ডিক্রীর পর বিশেষ কিছু করা হয় নাই। এখন যদি তাহারা জমিতে লাঙ্গল দেয়, তাহা ফৌজদারী আইনে অনধিকার প্রবেশ হইবে, ছোটখাট দাঙ্গা হাঙ্গামাও হইতে পারে। অপরে আসিয়া তাহার জমি চাষ করিবে, ইহা সহ করাও কৃষকের পক্ষে কঠিন। তাহারা আমাদের উপদেশ চাহিল। আমরা কি উপদেশ দিতে পারি?

গ্রীষ্মকালে আমি যখন গান্ধিজীসহিত সিমলায় গিয়াছিলাম, তখন ভারত সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর নিকট এই অসুবিধার কথা বলিয়াছিলাম এবং আমাদের মত অবস্থায় তিনি পড়িলে কি করিতেন, তাহাও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাঁহার উত্তরে আমার চৈতন্য হইল। তিনি বলিলেন, যে রায়তকে জমি হইতে উচ্ছেদ করা হইয়াছে, সে এই প্রশ্ন করিলে আমি কোন উত্তরই দিতাম না। যদিও আইনতঃ সে উচ্ছেদ হইয়াছে, তথাপি তিনি তাহাকে এমন কথাও বলিতেন না যে, জমি চষিও না। সিমলার উচ্চশ্রেণী বসিয়া তাঁহার পক্ষে একথা বলা সহজ। কিন্তু ইহা ফাইলের উপর লুক্কায়িত লেখা বা অঙ্ক কষিয়া ফল বাহির করার মত ব্যাপার নহে। তিনি অথবা নৈনীতালের বড়-

মুক্তপ্রদেশে কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা

কর্তাগণ কখনও মাহুষের সংস্পর্শে আসেন না, মাহুষের দুঃখ-বেদনা তাহাদের চক্ষে পড়ে না।

সিমলায় আগাদিগকে বলা হইল যে, আমরা কৃষকদিগকে একটি মাত্র উপদেশ দিতে পারি যে তাহাদের পুরা খাজনা দেওয়া কর্তব্য, একান্ত নিরুপায় হইলে যথাসাধ্য দেওয়া উচিত। এককথায় আমরা দিগকে জমিদারের গোমস্তার কাজ করিতে বলা হইল। কার্যতঃ আমরাও তাহাদের যথাসাধ্য খাজনা দেওয়ার কথা বলিয়াছি। অবশ্য তাহাদিগকে আমরা গৃহপালিত পশু বিক্রয় করিতে বা পুনরায় ঋণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম; এবং ফল কি হইল, তাহাও দেখিলাম।

সে বারের প্রচণ্ড গ্রীষ্মে আমাদের শ্রান্তি ক্লান্তির অন্ত ছিল না। ভারতীয় কৃষকদের দুঃখ-দুর্ভাগ্য সহ্য করিবার এক আশ্চর্য্য শক্তি আছে। দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ব্যাধি, মড়ক, চিরদারিদ্র্যের পেষণ—এ সকলের অধিকাংশই তাহাদের স্বক্ষে পড়ে; যখন আর সহ্য করিতে পারে না, তখন নীরবে, কাহাকেও দোষ না দিয়া হাজারে হাজারে মৃত্যু আলিঙ্গন করে। তাহাদের সম্মুখে এই পথই খোলা আছে। অতীতের দুঃখ-কষ্টের অভিজ্ঞতাব তুলনায় ১৯৩১ সালে নূতন কিছু ঘটে নাই। কিন্তু যে কোন প্রকারেই হউক, এ বৎসর সে দেখিল যে, ইহা কোন দুর্ভোগ্য প্রাকৃতিক দুর্ভোগ্য নহে যে নিরুপায় ভাবে সহ্য করিতে হইবে; এই দুর্দশা মাহুষের রচনা দেখিয়াই তাহারা ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের অভিনব রাজনৈতিক শিক্ষা ফলপ্রসূ হইল। আমাদের নিকটও ১৯৩১-এর ঘটনাবলী অত্যন্ত বেদনাবহ; কেন না, ইহার জন্ত আমরাও অংশতঃ দায়ী—কৃষকেরা কি আমাদের পরামর্শানুসারে কাজ করে নাই? এবং আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, আমরা সদাসর্বদা সাহায্য না করিলে অবস্থা আরও শোচনীয় হইত। আমরাই তাহাদের সম্ব্যবস্থা করিয়া শক্তিশালী করিয়াছিলাম বলিয়াই তাহারা বর্দ্ধিতহারে খাজনা মাপ পাইয়াছিল, অন্যথা ইহা সম্ভব হইত না। জোরজুলুম ও অসহ্যবহার যাহা তাহারা পাইয়াছে, তাহা যতই মন্দ হউক, এই হতভাগ্য লোকদের নিকট তাহা নূতন নহে। কেবল প্রয়োগের তারতম্য (বর্তমানে ইহা আরও বেশী) এবং প্রচারের উপরই ইহা নির্ভর করে। সাধারণতঃই গ্রামে জমিদারের গোমস্তার দুর্ব্যবহার ও পীড়ন সচরাচর ঘটনা, যদি হতভাগ্য ব্যক্তি মারা না যায়, তাহা হইলে অল্পলোকেই তাহা শুনিতে পায়। বর্তমানে ইহার কিছু পরিবর্তন হইয়াছে, কেন না আমাদের সম্ব্যবস্থা এবং কৃষকদের নবজাগরণের ফলে সকল প্রকার দুর্ব্যবহারের সংবাদই কংগ্রেসের কার্যালয়ে আসে।

জওহরলাল নেহরু

গ্রামী বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বলপূর্বক খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা শিথিল হইল, অত্যাচারও কমিল। ভূমি হইতে বঞ্চিত বহুসংখ্যক রায়তকে লইয়া আমরা বিব্রত হইয়া উঠিলাম। ইহাদের কি করা যায়? অধিকাংশ জমি পতিত পড়িয়াছিল বলিয়াই আমরা উহাদিগকে জমি ফিরাইয়া দিবার জন্ত গভর্নমেন্টকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলাম। ভবিষ্যতের প্রশ্ন আরো জরুরী। যে খাজনা মাপ হইয়াছে, তাহা অতীত কিস্তীর জন্ত, ভবিষ্যতের কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। অক্টোবর হইতে নূতন কিস্তীর খাজনা আদায় আরম্ভ হইবে। তখন কি ঘটিবে? আবার কি পূর্বের মতই পীড়নের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে? ইহা বিবেচনা করিবার জন্ত প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট সরকারী কর্মচারী ও কয়েকজন জমিদার লইয়া একটি কমিটি গঠন করিলেন। কৃষকদের কোন প্রতিনিধি ইহাতে লওয়া হইল না। শেষ মুহূর্ত্তে যখন কমিটির কাজ শুরু হইয়াছে, তখন আমাদের পক্ষ হইতে গোবিন্দবল্লভ পন্থকে গভর্নমেন্ট কমিটিতে যোগ দিবার অনুরোধ করিলেন। তখন জরুরী বিষয়গুলির আলোচনা শেষ হইয়া গিয়াছে, অতএব এত বিলম্বে কমিটিতে যোগ দেওয়া তিনি সম্মত বিবেচনা করিলেন না।

যুক্ত-প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিও কৃষিসম্পর্কিত অতীত ও বর্তমান তথা সংগ্রহ করিয়া বর্তমান অবস্থা নির্ণয়ের জন্ত একটি ছোট কমিটি নিযুক্ত করিলেন। এই কমিটি যুক্ত-প্রদেশে কৃষকদের বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনা করিয়া এক সুদীর্ঘ বিবরণী রচনা করিলেন; কৃষি-পণ্যের মূল্য হ্রাস হওয়ায় অবস্থা কতদূর শোচনীয় হইয়াছে, তাহাও বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্তগুলি ব্যাপক। গোবিন্দবল্লভ পন্থ, রফি আহম্মদ কিদোয়াই এবং বেকটেশ নারায়ণ তেওয়ারীর স্বাক্ষরিত এই বিবরণী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

এই রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার বহুপূর্বেই গান্ধিজী গোলটেবিল বৈঠকের জন্ত লণ্ডনে গিয়াছিলেন। প্রস্থানের পূর্বে তিনি ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন, এবং ইহার অন্ততম কারণ যুক্ত-প্রদেশের কৃষক সমস্যা। এমন কি, তিনি স্থির করিয়াছিলেন, যদি লণ্ডনে না যাওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি যুক্ত-প্রদেশে আসিয়া এই জটিল সমস্যা সমাধানে আত্মনিয়োগ করিবেন। সিমলায় গভর্নমেন্টের সহিত সর্বশেষ আলোচনায় অন্ত্যন্ত বিষয়ের সহিত যুক্তপ্রদেশের কথাও আলোচিত হইয়াছিল। তিনি ইংলণ্ডে প্রস্থানের পর, আমরা নিয়মিতভাবে তাঁহাকে সংবাদ দিতাম। প্রথম দুই মাস, আমি নিয়মিতরূপে প্রতি সপ্তাহে, সাধারণ ও বিমান ডাকে তাঁহার নিকট পত্র দিতাম। শেষের দিকে শীঘ্রই তাঁহার প্রত্যাবর্তন

যুক্তপ্রদেশে কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা

প্রত্যাশা করিয়া নিয়মিতভাবে পত্র দিতাম না। তিনি আমাদেরকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি তিন মাসের মধ্যেই কিরিয়া আসিবেন। নভেম্বর মাসে তিনি না ফেরা পর্য্যন্ত ভারতে কোন সফট উপস্থিত হইবে না আমরা এইরূপ আশা করিয়াছিলাম। তাঁহার অল্পপস্থিতিতে গভর্নমেন্টের সহিত কোন সংঘর্ষ না হয়, সেজন্য আমরা সাবধান ছিলাম। যাহা হউক তাঁহার ফিরিবার বিলম্ব হইতে লাগিল এবং কৃষক সমস্যাও অতি দ্রুত সঙ্গীন হইয়া উঠিল। আমরা তারবোণে বিস্তারিত সংবাদ তাঁহাকে জানাইলাম, এবং কর্তব্য সম্পর্কে উপদেশ চাইলাম। তিনি তারে উত্তর দিলেন যে, এ বিষয়ে তিনি নিজেকে অসহায় বোধ করিতেছেন, এবং আমাদেরকে নিজেদের বিবেচনানুযায়ী কাজ করিবার উপদেশ দিলেন।

প্রাদেশিক কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ কার্য্যকরী সমিতিতেও সমস্ত অবস্থা জানাইলেন। আমি নিজে তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষভাবে সংবাদ দিতে লাগিলাম। অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া কার্য্যকরী সমিতি আমাদের প্রাদেশিক সভাপতি তাসাদক শেরোয়ানী এবং এলাহাবাদ জিলার সভাপতি পুরুষোত্তমদাস ট্যাগোরের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

গভর্নমেন্ট কৃষি-কমিটির রিপোর্ট কতকগুলি মন্তব্যসহ শীঘ্রই প্রকাশিত হইল। জটিল ও অস্পষ্ট ব্যবস্থার ভার বহুল পরিমাণে স্থানীয় কর্মচারীদের উপর অর্পিত হইল। বিগত কিস্তি অপেক্ষা এবারে আরও কিছু বেশী খাজনা মাপের প্রস্তাব হইল। কিন্তু আমাদের মতে তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। সরকারী ব্যবস্থার নীতি ও প্রয়োগ পদ্ধতি—এই উভয় ব্যাপারেই আমরা আপত্তি প্রকাশ করিলাম। সরকারী রিপোর্টে কেবল ভবিষ্যতের কথাই ধরা হইয়াছিল; বকেয়া খাজনা, দেনা এবং অগণিত ভূমিহীন কৃষকের বিষয়, কৃষকের কথার কোন উল্লেখ ছিল না। এখন আমরা কি করিব? গত বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে আমরা যে-ভাবে কৃষকদের যথাসাধ্য খাজনা দিবার উপদেশ দিয়াছি, তাহাই করিব? কিন্তু তাহার পরিণাম কি একই প্রকার হইবে না? আমরা পূর্ব-অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি যে, এরূপ নির্কোষ উপদেশের পুনরাবৃত্তি বাঞ্ছনীয় নহে। হয় কৃষকেরা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া নির্দিষ্ট ও সংশোধিত দাবী অনুযায়ী পূরা খাজনা আদায় দিক, অথবা বর্তমানে কিছুই না দিয়া ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করুক। আংশিক খাজনা দিলে এদিক ওদিক কোনদিকই রক্ষা হয় না। কৃষকেরা সর্বস্বাস্ত হইয় এবং তাহাদের জমি হস্তান্তরিত হইয়া যায়।

প্রাদেশিক কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ ধীরভাবে বিচার করিয়া দেখিলেন যে সরকারী প্রস্তাবগুলি ঐ আকারে গ্রহণ করার পক্ষে অসম্ভব নহে;

জওহরলাল নেহরু

তবে বিগত গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা এবার কিছু অধিক হারে খাজনা মাপের ব্যবস্থা হইয়াছে। সরকারী প্রস্তাবগুলি কৃষকদের পক্ষে অধিকতর স্ববিধাজনক করিবার সম্ভাবনা ছিল বলিয়া আমরা গভর্নমেন্টের নিকট অল্পরোধ উপরোধ করিতে লাগিলাম। কিন্তু আশার বিশেষ লক্ষণ দেখিলাম না। এবং যে সংঘর্ষ আমরা এড়াইতে চাহি, তাহাই দ্রুতগতিতে আমাদের সম্মুখীন হইতে লাগিল। কংগ্রেসের প্রতি প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট তথা ভারত গভর্নমেন্টের মনোভাব ক্রমশঃ কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া উঠিল। আমাদের বড় বড় চিঠিগুলির উত্তরে অতি সংক্ষেপে স্থানীয় কৃষকারীদের নিকট জানাইবার নির্দেশ দেওয়া হইত। স্পষ্টই বুঝা গেল যে, গভর্নমেন্ট কোনমতেই আমাদের উৎসাহ দিতে রাজী নহেন। কৃষকদিগকে খাজনা মাপ দিবার দরুণ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা বাড়িবার সম্ভাবনা আছে, ইহা গভর্নমেন্টের নিকট অসম্ভোষজনক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দীর্ঘকালের অভ্যাসবশতঃ তাঁহারা সরকারী মধ্যাদার দিক দিয়া সকল বিষয় ভাবিতে অভ্যস্ত। জনসাধারণ খাজনা মাপের জগ্ন কংগ্রেসকে বাহাদুরী দিবে, ইহা তাঁহাদের নিকট অসহ্য বোধ হইয়াছিল। এবং যাহাতে এরূপ ধারণার উদ্ভব না হয়, সেজগ্ন তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে দিল্লী ও অগ্নাগ্ন স্থান হইতে আমরা সংবাদ পাইতে লাগিলাম যে, ভারত গভর্নমেন্ট কংগ্রেসী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে দমননীতি অবলম্বনের জগ্ন প্রস্তুত হইতেছেন। একটী কনিষ্ঠাঙ্গুলীর সঙ্কেতে আমাদের দৃষ্টিক দ্বারা শাসন করিবার ব্যবস্থা আরম্ভ হইবে। সরকারী সঙ্কল্পের বিস্তৃত বিবরণও আমরা পাইতে লাগিলাম। নভেম্বর মাসের কোন সময়, আমার মনে আছে, ডাঃ আশ্মারী আমাকে (স্বতন্ত্রভাবে কংগ্রেসের সভাপতি বল্লভভাই প্যাটেলকে) সংবাদ দিলেন যে, আমরা পূর্বে যে সকল সংবাদ পাইয়াছি, তাহা সত্য, সীমাস্ত-প্রদেশে ও যুক্ত-প্রদেশে কি শ্রেণীর অর্ডিন্যান্স জারী হইবে, তাহারও বিস্তৃত বিবরণ জানাইলেন। বাঙ্গলাদেশ, আমার বিশ্বাস ইতিমধ্যেই নূতন অর্ডিন্যান্স পুরস্কারস্বরূপ পাইয়াছে কিংবা শীঘ্রই পাইবে। দুই মাস পরে যখন নূতন অর্ডিন্যান্সগুলি জারী হইল, তখন দেখা গেল যে, ডাঃ আশ্মারীর বিবরণ বর্ণে বর্ণে সত্য। গোলটেবিল বৈঠকের অপ্রত্যাশিত দৈর্ঘ্যের দরুণ গভর্নমেন্ট নূতন অর্ডিন্যান্স প্রয়োগ করিতে বিলম্ব করিতেছিলেন। যখন গোলটেবিল বৈঠকের সদস্তগণ আশার কথায় পরস্পরের কর্ণে মধুবর্ণ করিতে-

যুক্তপ্রদেশে কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা

ছিলেন, তখন ভারতে পাইকারী ভাবে দমন-নীতি প্রয়োগ গভর্ণমেন্ট যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই। অতএব মনকষাকষি বাড়িতে লাগিল; আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ঘটনার গতি ঘুরিতে লাগিল। ইহার অপরিহার্য গতি বেগ নিয়ন্ত্রিত করা আমাদের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির সাধ্যাত্ত ছিল না। আমাদের পক্ষে ইহার সম্মুখীন হইয়া ব্যক্তিগতভাবে বা সম্মিলিতভাবে জীবন-নাট্যের এই বিয়োগান্তক অভিনয়ের ভূমিকা গ্রহণ করা ছাড়া গতাত্ত ছিল না। কিন্তু আমরা প্রত্যাশা করিতেছিলাম যে, যবনিকা উত্তোলিত হইয়া অপের ঝঙ্কনা আরম্ভ হইবার পূর্বেই গান্ধিজী আসিয়া সমস্ত দায়িত্ব নিজের স্বন্ধেই লইবেন, যুদ্ধ না শান্তি তিনিই নির্ণয় করিবেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব স্বন্ধে লইবার শক্তি আমাদের কাহারও ছিল না।

যুক্ত-প্রদেশে গভর্ণমেন্ট আর একটি এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন যে পল্লী অঞ্চলে ভীতির সঞ্চার হইল। খাজনা মাপের যে সকল পরোয়ানা প্রজাদের মধ্যে বিলি করা হইল, তাহাতে খাজনা মাপের পরিমাণ উল্লিখিত ছিল। এবং ইহার সহিত এই ভীতিপূর্ণ সাবধানবাণী ছিল যে, একমাসের মধ্যে (কোথাও বা তাহারও কম সময় উল্লেখ ছিল) সম্পূর্ণ টাকা আদায় না দিলে খাজনা মাপ প্রত্যাহার করা হইবে এবং পরা টাকা আদায় করিবার জন্য আইন-সম্মত উপায় অবলম্বন করা হইবে। ইহার অর্থ জমি হইতে উচ্ছেদ, অস্তাবর সম্পত্তি ক্রোক ইত্যাদি। সাধারণ বৎসরে রায়তেরা ২১০ মাসে কিস্তিতে কিস্তিতে টাকা দিয়া খাজনা শোধ করে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে সে সময়টুকুও দেওয়া হইল না। সমস্ত পল্লী অঞ্চল অকস্মাৎ সঙ্কটের মধ্যে পড়িল, প্রজারা পরোয়ানা হস্তে ইতস্ততঃ ছটাছুটি করিয়া প্রতিবাদ ও অভিযোগ করিতে লাগিল এবং পরামর্শ চাহিল। গভর্ণমেন্ট অথবা তাহাদের স্থানীয় কর্মচারীদের পক্ষে এই ভীতি প্রদর্শন—অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতার কাজ হইয়াছিল। আমরা পরে শুনিলাম যে ইহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। কিন্তু ইহার ফলে শান্তিপূর্ণ সমাধানের সম্ভাবনা বহুল পরিমাণে হ্রাস হইল এবং ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়া ইহা সংঘর্ষকে অপরিহার্য করিয়া তুলিল।

কি কৃষকগণ, কি কংগ্রেস অনুভব করিল যে শীঘ্রই কার্য স্থির করার প্রয়োজন, গান্ধিজীর প্রত্যাবর্তনের আশায় আমরা ইতিকর্তব্য নির্ধারণ স্থগিত রাখিতে পারি না। আমরা কি করিব, কি উপদেশ দিব? আমরা জানি যে এত অল্প সময়ের মধ্যে কৃষকদের পক্ষে দাবীর অতরূপ খাজনা দেওয়া সম্ভব নহে; এই অবস্থায় কি করিয়া আমরা তাহাদিগকে ঐরূপ উপদেশ

দেই ? এবং বকেয়া খাজনারই বা কি হইবে ? যদি তাহারা দাবীর সম্পূর্ণ অথবা অধিকাংশ পরিশোধও করে তাহা হইলে তাহা বকেয়া বাকীতে জমা হইয়া তাহাদের উচ্ছেদের সম্ভাবনাও থাকিয়া যাইবে নাকি ?

এলাহাবাদ জিলা কংগ্রেস কমিটি শক্তিশালী কৃষকদের লইয়া বিরুদ্ধতায় প্রবৃত্ত হইল। ইহারা স্থির করিলেন যে কৃষকদিগকে খাজনা আদায় দিবার উপদেশ দেওয়া যায় না। যাহা হউক, কথা উঠিল যে প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ তথা নিখিল ভারত কার্যকরী সমিতির সম্মতি ব্যতীত এরূপ আক্রমণশীল উপায় অবলম্বন করা যায় না। অতএব জিলা ও প্রদেশের পক্ষ হইতে পুরুষোত্তমদাস টাণ্ডন ও তাসাদু ক শেরওয়ানী কার্যকরী সমিতির নিকট তাঁহাদের বক্তব্য পেশ করিলেন। সমস্তা কেবলমাত্র এলাহাবাদ জিলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ইহা সম্পূর্ণরূপে অর্থনৈতিক প্রশ্ন হইলেও রাজনৈতিক অসন্তোষের দরুণ ইহার পরিণাম বহুদূর পর্য্যন্ত যাইতে পারে, ইহা আমরা অনুভব করিলাম। এলাহাবাদ জিলা কমিটি কি সাময়িক ভাবে কৃষকদিগকে খাজনা প্রদান বন্ধ রাখিবার উপদেশ দিয়া স্থবিধাজনক সন্তের জন্ত পুনরায় গভর্নমেণ্টের সহিত কথাবার্তা চালাইবে ? এই প্রশ্ন লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিলাম, কিন্তু আমরা কি করিতে পারি ? কার্যকরী সমিতি গান্ধিজীর প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই গভর্নমেণ্টের সহিত সংঘর্ষ নিবারণের জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অর্থনৈতিক সমস্তা শ্রেণী সমস্তায় পরিণত না হইতে পারে সেদিকেও তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। কার্যকরী সমিতি রাজনৈতিক দিক দিয়া যথেষ্ট অগ্রসর হইলেও সমাজনৈতির দিক দিয়া ততটা ছিলেন না। এবং রায়ত বনাম জমিদার প্রশ্ন উত্থাপন করা তাহারা অপছন্দ করিতেন।

আমার সমাজতান্ত্রিক মনোবৃত্তির জন্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যাপারে আমার পরামর্শ লওয়া তাহারা নিরাপদ মনে করিতেন না। কিন্তু কার্যকরী সমিতি যুক্ত-প্রদেশের সমস্তা সম্যকরূপে উপলব্ধি করুন, আমার এই ইচ্ছা ছিল। কেন না আমাদের মধ্যে অধিকতর চরমপন্থী এবং দক্ষিণপন্থী সদস্যেরাও নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ঘটনাচক্রে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেছিলেন। কাজেই আমাদের কার্যকরী সমিতির সভায় শেরওয়ানী ও আমাদের প্রদেশের অগ্নাত্তের উপস্থিতিতে আমি আনন্দিত হইলাম। শেরওয়ানী (আমাদের প্রাদেশিক সভাপতি) কোন মতেই উগ্রপন্থী ছিলেন না। কি রাজনীতি কি অর্থনীতি উভয় দিক হইতেই তিনি কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী ছিলেন। এবং বৎসরের আরম্ভ হইতেই তিনি যুক্ত-প্রদেশের কংগ্রেস কমিটির কৃষক আন্দোলনের বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু তিনি সভাপতি হইয়া যখন দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন তখন বুদ্ধিতে পারিলেন যে আমাদের

যুক্তপ্রদেশে কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা

সম্মুখে অত্র কোন পথ ছিল না। পরবর্তী প্রত্যেক কাজে প্রাদেশিক কমিটি তাঁহার ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা লাভ করিয়াছে। এমন কি সভাপতি হিসাবে তিনিও কমিটিকে পরিচালিত করিয়াছিলেন।

তাসাদ্দুক শেরোয়ানীর যুক্তিপূর্ণ মন্তব্যে কার্যকরী সমিতির সদস্যগণ প্রভাবান্বিত হইলেন—আমিও এতখানি করিতে পারিতাম না। অনেক ইতস্ততঃ করিয়া যখন তাঁহারা আর অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না তখন তাঁহারা প্রাদেশিক কমিটিকে যে কোন অঞ্চলে খাজনা ও রাজস্ব প্রদান বন্ধ রাখিবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহারা যুক্ত-প্রদেশের জনসাধারণকে সাধ্যমত এই উপায় অবলম্বন না করিয়া প্রাদেশিক গভর্নমেন্টের সহিত আলোচনা চালাইবার জন্ত অনুরোধ করিলেন।

কিছুকাল এই আলোচনা চলিল, কিন্তু বিশেষ ফল হইল না। আমার বিশ্বাস এলাহাবাদ জিলায় খাজনা মাপের পরিমাণ কিছু বাড়িয়াছিল। সাধারণ অবস্থায় একটা আপোষ, অন্ততঃ পক্ষে প্রকাশ্য সংঘর্ষ নিবারণ সম্ভবপর হইত। মতভেদের কারণ অল্পই থাকিত। কিন্তু অবস্থা ছিল ভিন্নরূপ। দুইপক্ষই—গভর্নমেন্ট ও কংগ্রেস—আগতপ্রায় সংঘর্ষের অপরিহার্য সম্ভাবনা চিন্তা করিতেছিলেন; কাজেই আমাদের পারস্পরিক আলোচনার মধ্যে আন্তরিকতা ছিল না। উভয় পক্ষের আচরণের মধ্যেই কৌশলদ্বারা স্ব স্ব ভূমি দৃঢ় করিবার প্রয়াস পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। গভর্নমেন্ট গোপনে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন। আমাদের শক্তি সম্পূর্ণরূপেই জনসাধারণের চরিত্রবল ও দৃঢ়তার উপর নির্ভর করে। এবং তাহা কোন গোপন উপায়ে গড়িয়া তোলা যায় না। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ—আমিও সেই অপরাধীদের একজন—সাধারণের সম্মুখে বক্তৃতায় বলিতাম যে স্বাধীনতার সংঘর্ষ শেষ হইতে এখনও বহু বাকী এবং আমাদের অদূর ভবিষ্যতেই বহু পরীক্ষা ও বিপ্লবের সম্মুখীন হইতে হইবে। আমরা জনসাধারণকে নিজেদের প্রস্তুত রাখিতে উপদেশ দিতাম বলিয়া আমাদেরকে যুদ্ধের গুজব সৃষ্টিকারী বলিয়া সমালোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু কাষ্যতঃ আমাদের মধ্যশ্রেণীর কংগ্রেসকর্মীরা বাস্তব ঘটনার প্রতি ওদাসীগ্রহ প্রকাশ করিতেন। এবং তাহারা আশা করিতেন যে, যে কোন প্রকারেই হউক সংঘর্ষ আর হইবে না। লগুনে গান্ধিজীর উপস্থিতির ফলে সংবাদ-পত্রের পাঠকশ্রেণীর মন বিষয়াস্তরে নিবিষ্ট হইয়াছিল। তথাপি দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিরপেক্ষতা সত্ত্বেও ঘটনার গতি অগ্রসর হইল, বিশেষ ভাবে বাঙ্গলা, সীমান্ত প্রদেশ ও যুক্ত-প্রদেশে নভেম্বর মাসে অনেকেই বুঝিতে পারিলেন যে সঙ্কট ঘনাইয়া আসিতেছে।

ঘটনার গতি দেখিয়া যুক্ত-প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ভীত হইলেন এবং যদি সংঘর্ষ বাধিয়া উঠে সেজন্য পূর্ব হইতেই কতকগুলি ঘরোয়া ব্যবস্থা করিলেন। এলাহাবাদ কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক এক রুযক সম্মিলনী আহূত হইল। এই সম্মেলনে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তি স্বরূপ একটি প্রস্তাব এই ভাবে গ্রহণ করা হইল যে, অধিকতর সুবিধাজনক সর্ব না পাইলে তাঁহারা রুযকদিগকে খাজনা বা রাজস্ব বন্ধ রাখিবার উপদেশ দিবেন। এই প্রস্তাবে প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট মহাবিরক্ত হইলেন এবং ইহাতে সন্ধির সর্ব ভঙ্গ করা হইয়াছে এই অভ্যুহাত দেখাইয়া আমাদের সহিত আর কোন আলাপ আলোচনায় অসম্মত হইলেন। এদিকে উহাই আবার প্রতিক্রিয়া মুখে ঝটিকার পূর্বাভাস মনে করিয়া প্রাদেশিক কংগ্রেস নিজেদের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। এলাহাবাদে আর একটি রুযক সম্মেলনে পূর্বাপেক্ষা দৃঢ় ও মিলিত ভাবে আর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া রুযকদিগকে অধিকতর সুবিধাজনক সর্ব না পাইলে খাজনা বন্ধ রাখিবার উপদেশ দেওয়া হইল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত “খাজনা বন্ধ” আন্দোলন করা হয় নাই, বরং “গায্য খাজনা” প্রদানের আন্দোলন করা হইয়াছিল। এবং আমরা কথাবার্তা চালাইবারই প্রস্তাব করিতেছিলাম, যদিও প্রতিপক্ষ জাঁক দেখাইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। এলাহাবাদ প্রস্তাবে যদিও জমিদার এবং প্রজা সকলের কথাই সমান ভাবে উল্লেখ ছিল, কিন্তু আমরা জানিতাম কার্য্যতঃ ইহা রায়ত এবং ছোট জমিদারেরাই মাণ্ড করিবে।

১৯৩১-এ নভেম্বর মাসের শেষে এবং ডিসেম্বরের প্রারম্ভে যুক্ত-প্রদেশের অবস্থা এইরূপ ছিল। ইতিমধ্যে বাঙ্গলা ও সীমান্ত-প্রদেশের ঘটনা সঙ্গীন হইয়া উঠিল, এবং বাঙ্গলায় এক নতুন, ভয়ঙ্কর সর্বগ্রাসী অভিনাশ জারী করা হইল। শান্তির পরিবর্তে এই যুদ্ধের আভাষ দেগিয়া সর্বত্র এই প্রশ্ন উঠিতে লাগিল, গান্ধিজী কখন ফিরিবেন? যে আক্রমণের জন্ত গভর্নমেন্ট পূর্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া আছেন, তাহা আরম্ভ হইবার পূর্বেই কি তিনি ফিরিয়া আসিতে সক্ষম হইবেন? অথবা তিনি ফিরিয়া আসিয়া দেখিবেন যে তাঁহার সহকর্মীরা কারাগারে এবং সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া গিয়াছে? আমরা সংবাদ পাইলাম, তিনি বাত্মা করিয়াছেন এবং বৎসরের শেষ সপ্তাহে বোম্বাই উপস্থিত হইবেন। আমরা প্রত্যেক কংগ্রেসের প্রত্যেক বিশিষ্ট কর্ম্মী কি কেন্দ্রীয় আফিসে কি প্রদেশে তাঁহার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত সংঘর্ষ এড়াইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এমন কি সংঘর্ষ আরম্ভ করিতে হইলেও তাঁহার পরামর্শ ও নির্দেশের জন্ত তাঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হওয়া আবশ্যক। এই অসম প্রতিযোগিতায় আমরা নিজেদের অসহায় বোধ করিতে লাগিলাম। আরম্ভ করিবার দায়িত্ব ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের হাতে।

সন্ধির অবসান

যুক্ত-প্রদেশের কাজ লইয়া ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘকাল যাবৎ অগ্নাত অসন্তোষের কেন্দ্র, বাঙ্গলা ও সীমান্ত প্রদেশে যাইবার জন্য আমি উৎকণ্ঠিত ছিলাম। প্রত্যক্ষভাবে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা এবং পুরাতন বন্ধুদের সহিত মিলিত হওয়ার আগ্রহও ছিল, অনেকের সহিত দুই বৎসর সাক্ষাতের সুযোগ পাই নাই। সর্বোপরি, ঐ প্রদেশদ্বয়ের জনসাধারণের সাহস ও জাতীয় সংগ্রামে তাঁহাদের ত্যাগস্বীকারের শক্তির প্রতি আমার হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেও আমি উন্মুখ হইয়াছিলাম। সাময়িকভাবে সীমান্ত প্রদেশে প্রবেশের উপায় ছিল না, কোন খ্যাতনামা কংগ্রেসপন্থীর তথায় গমন ভারত গভর্নমেন্ট অনুমোদন করিতেন না; এই আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া কলহ সৃষ্টির অভিপ্রায় আমাদের ছিল না।

বাঙ্গলার অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। এই প্রদেশের প্রতি আমার গভীর আকর্ষণ সত্ত্বেও আমি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। আমি অনুভব করিলাম, সেখানে গিয়া নিজেকে অসহায়ই মনে করিব এবং হয়ত কোন উপকারেই লাগিব না। এই প্রদেশে কংগ্রেসপন্থীদের দুই দলের দীর্ঘস্থায়ী শোচনীয় কলহের দরুণ, বাহিরের কংগ্রেসপন্থীরা ভয়ে দূরে সরিয়া থাকিতেন, পাছে কোন পক্ষের সহিত জড়াইয়া পড়েন। ইহা উট পাখীর আত্মগোপনের নিষ্ফল চেষ্টার মত দুর্বল নীতি। বাঙ্গলাকে আশ্বাস ও সাহুনা দেওয়াও হয় না, তাহার সমস্যাগুলি সমাধানেরও সুবিধা হয় না। গান্ধিজী লগুনে যাওয়ার কিছুকাল পরেই দুইটি ঘটনায় সহসা বাঙ্গলার প্রতি সারা ভারতের দৃষ্টি আকর্ষিত হইল। ঘটনা দুইটি হিজলী ও চট্টগ্রামে ঘটিয়াছিল।

হিজলীতে বিনা বিচারে আটক ব্যক্তিদের একটি বিশেষ বন্দিশালা ছিল। সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইল যে, বন্দিশালার ভিতরে দাঙ্গা হান্ধায়া হইয়া গিয়াছে; বন্দীরা সিপাহীদিগকে আক্রমণ করায় তাহারা গুলি করিতে বাধ্য হইয়াছে। ফলে একজন নিহত ও অনেকে আহত হইয়াছে। স্থানীয় সরকারী অনুসন্ধান সমিতি অব্যবহিত পরেই ঘটনার তদন্ত করিয়া গুলিবর্ষণ ও তাহার ফলাফলের নিন্দা হইতে কারারক্ষীদের

জওহরলাল নেহরু

অব্যাহতি দিলেন। কিন্তু দাঙ্গার বর্ণনার মধ্যে অনেক কৌতূহলজনক ব্যাপার ছিল, ক্রমে দুই একটি করিয়া ঘটনা প্রকাশ পাইতে লাগিল, যাহা সরকারী বিবৃতির বিপরীত এবং পূর্ণ তদন্তের জন্ত তীব্র দাবী উত্থাপিত হইল। ভারতে সাধারণ সরকারী প্রথার ব্যতিক্রম করিয়া, বান্দলা-সরকার বিচার বিভাগের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের লইয়া এক তদন্ত-কমিটি গঠন করিলেন। ইহা সম্পূর্ণ সরকারী কমিটি; এই কমিটি-সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করিয়া ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিলেন এবং ইহাদের সিদ্ধান্ত বন্দিশালার কর্মচারীদের বিরুদ্ধে গেল। তাঁহাদের মতে বন্দিশালার রক্ষীদেরই দোষ অনেক বেশী এবং গুলি করা অত্যন্ত অযৌক্তিক হইয়াছে। কাজেই পূর্ব প্রচারিত সরকারী ইস্তাহার একেবারেই মিথ্যা প্রমাণিত হইল।

হিজলীর ঘটনার মধ্যে অত্যাশ্চর্য্য কিছুই ছিল না। দুর্ভাগ্যক্রমে এই শ্রেণীর ঘটনা অথবা দুর্ঘটনা ভারতে বিরল নহে। প্রায়ই সংবাদ-পত্রে ‘জেল হান্ধামার’ কথা পাঠ করা যায়। সশস্ত্র ওয়ার্ডার ও প্রহরীরা কি আশ্চর্য্য বীরত্বের সহিত নিরস্ত্র ও অসহায় কয়েদীদের দমন করিয়া ফেলে, তাহার বিবরণও উহাতে থাকে। হিজলীতে অভিনবত্ব এই যে, সরকারী কমিটিই গভর্ণমেন্ট ইস্তাহারের একদেশদর্শিতা, এমন কি, ঘটনার মিথ্যা বিবৃতির কথা উদ্ঘাটন করিলেন। অতীতেও এই সকল সরকারী ইস্তাহারে লোকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিত না, এ ক্ষেত্রে ত হাতে নাতে ধরা পড়িয়া গেল।

হিজলীর ঘটনার পরেও সমস্ত ভারতবর্ষে জেলে অনেক “ঘটনা” ঘটিয়াছে। কোথাও গুলি চলিয়াছে অথবা জেল কর্মচারীরা অত্যাধিক বল প্রয়োগ করিয়াছে। বিশ্বয়ের বিষয় এই যে এই শ্রেণীর “জেল দাঙ্গায়” কেবল মাত্র কয়েদীরাই আহত হয়। সরকারী প্রচারিত ইস্তাহারে কয়েদীদের অনেক অপকার্য্যের কথা উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং কারাকর্মচারীর নিদোষিতা প্রতিপন্ন হয়। তদন্তের দাবী সরাসরি অস্বীকার করা হয়, এবং বিভাগীয় তদন্তই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। হিজলীর ঘটনা হইতে গভর্ণমেন্ট এই শিক্ষা লাভ করিলেন যে, সম্যক ও নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক, এবং অভিযোক্তা স্বয়ংই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিচারক। হিজলীর দৃষ্টান্ত হইতে জনসাধারণের এই শিক্ষালাভ করা উচিত যে সরকারী ইস্তাহারগুলিতে প্রকৃত ঘটনার বিবরণ থাকিবে না, গভর্ণমেন্ট জনসাধারণকে যাহা বিশ্বাস করিতে বলিবেন, তাহাই থাকিবে।

সজ্জির অবসান

চট্টগ্রামের ব্যাপার আরও গুরুতর। এক জন টেরোরিষ্ট কোন মুসলমান পুলিশ ইনস্পেক্টরকে গুলী করিয়া হত্যা করে, তারপর যাহা ঘটিল তাহাকেই হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা বলিয়া অভিহিত করা হইল। যাহা হউক, আসলে ইহা সচাচর অল্পদ্রুত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং উহার গুরুত্বও অধিক। টেরোরিষ্টদের কার্যের সহিত সাম্প্রদায়িকতার কোন সম্পর্ক নাই, ইহা সর্বজনবিদিত, পুলিশ কর্মচারীই তাহাদের লক্ষ্য, সে হিন্দুই হউক, মুসলমানই হউক কিছু যায় আসে না। তথাপি ইহা সত্য যে, পরে হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা হইয়াছিল। কেন ইহা ঘটিয়াছিল, ইহার কি কারণ ছিল তাহা কখনও স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয় নাই, যদিও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির অনেক গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন। এই দাঙ্গার একটি বিশেষত্ব ছিল। অগ্ন্যাগ্ন শ্রেণীর ব্যক্তির, এংলো-ইণ্ডিয়ানগণ, প্রধানতঃ রেল কর্মচারী এবং গভর্নমেন্ট কর্মচারীরাও ব্যাপকভাবে প্রতিশোধ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। জে, এম, সেনগুপ্ত এবং বাঙ্গলার অগ্ন্যাগ্ন বিখ্যাত নেতারা চট্টগ্রামের ঘটনা সম্বন্ধে কতকগুলি নির্দিষ্ট অভিযোগ উপস্থিত করিয়া তদন্তের দাবী করিয়াছিলেন; অত্যাধা তাহাদের নামে মানহানির মামলা করা হউক, ইহাও বলিয়াছিলেন। কিন্তু গভর্নমেন্ট কোনটাই করিলেন না।

চট্টগ্রামের এই অভূতপূর্ব ঘটনার মধ্যে দুইটা বিপজ্জনক সম্ভাবনা সম্বন্ধে ভাবিবার অনেক কিছু আছে। বহু দিক হইতে বিচার করিয়া টেরোরিজম যে নির্দোষ, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। এমন কি, আধুনিক বৈপ্লবিক কম্ব-কৌশলের মধ্যেও উহার স্থান নাই। কিন্তু আকস্মিক সাম্প্রদায়িক হিংসা-নীতি ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িতে পারে, উহার এই সম্ভাবনার কথা চিন্তা করিলে আমি বিশেষভাবে ভীত হই। আমি একজন “নিরীহ হিন্দু” নহি যে, হিংসা দেখিয়া ভয় পাইব। যদিও আমি নিশ্চয়ই ইহা পছন্দ করি না, কিন্তু আমি জানি যে, ভারতে অনেকা ও আত্মকলহের বহুতর কারণ বিद्यমান, এবং এখানে ওখানে অল্পদ্রুত হিংসা-নীতির ফলে ঐ গুলি প্রবল হইবে। ইহাতে ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃঙ্খলিত জাতিগঠনকার্য অধিকতর কঠিন হইয়া উঠিবে। যখন লোকে ধর্মের নামে অথবা বেহেশ্তে স্থান সংগ্রহ করিবার জন্ত নরহত্যা করে, তখন তাহাদিগকে টেরোরিজম সংশ্লিষ্ট হিংসা-নীতিতে অভ্যস্ত করিয়া তোলা অত্যন্ত বিপজ্জনক। রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডও মন্দ; কিন্তু রাজনৈতিক টেরোরিষ্টকে যুক্তিতর্ক দ্বারা বুঝাইয়া অন্য পথে আনা

জওহরলাল নেহরু

যাইতে পারে, কেন না তাহার উদ্দেশ্য একান্ত পার্থক্য এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা জাতীয় উদ্দেশ্যেই সে চালিত হয়। পক্ষান্তরে, ধর্মের জন্ত নরহত্যা অধিকতর মন্দ। কেন না ইহার সহিত সম্পর্ক পরলোকেবু এবং এই শ্রেণীর ঘটনায় যুক্তিতর্কের অবতারণা করিবার চেষ্টাও বৃথা। এই বিবিধ হত্যাকাণ্ডের মধ্যে পার্থক্য এত সূক্ষ্ম যে, সময় সময় উহা অন্তর্হিত হয় এবং রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড দার্শনিক ব্যাখ্যায় প্রায় ধর্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে পরিণত হয়।

এক জন টেরোরিষ্ট কতৃক চটগ্রামে পুলিশ কর্মচারী হত্যা এবং তাহার পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি উজ্জ্বল অঙ্গুলী দিয়া দেখাইয়া দিল যে, টেরোরিষ্টদের কার্যপ্রণালীর মধ্যে কত বিপজ্জনক সম্ভাবনা লুক্কায়িত আছে, এবং ভারতের ঐক্য ও স্বাধীনতার ইহা কি বিপুল অনিষ্ট সাধন করিতে পারে। ইহার পরবর্ত্তী প্রতিশোধমূলক কার্যগুলি হইতে আমরা দেখিলাম যে, ভারতে ফাসিস্ত পদ্ধতির উদ্ভব হইয়াছে। ইহার পর এই শ্রেণীর প্রতিশোধমূলক অগ্ন্যস্ত্র দৃষ্টান্ত হইতে, বিশেষভাবে বাঙ্গলা দেশের ঘটনাগুলি হইতে বুঝা গিয়াছে যে, ইউরোপীয়ান ও এংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ে ফাসিস্ত মনোভাব নিশ্চিতরূপে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল কতকগুলি ভারতীয়ও ঐ ভাবে অল্পপ্রাণিত হইয়া পড়িয়াছিল।

ইহা আশ্চর্য্য যে, টেরোরিষ্টগণেরও, অন্ততঃ তাহাদের অনেকের দৃষ্টিভঙ্গীও এই শ্রেণীর ফাসিস্ত ভাবাপন্ন, তবে ইহার প্রকৃতি স্বতন্ত্র। তাহাদের জাতীয় ফাসিজম, ইউরোপীয়ান, এংলো-ইণ্ডিয়ান ও কতকগুলি উচ্চ শ্রেণীর ভারতীয়ের সাম্রাজ্যনৈতিক ফাসিজমের বিরোধী।

১৯৩১-এর নভেম্বর মাসে আমি কয়েকদিনের জন্ত কলিকাতা গিয়াছিলাম। এই কয়দিন আমার উপর অত্যন্ত কাজের চাপ পড়িয়াছিল। ব্যক্তিবিশেষের সহিত দেখা শুনা, বিভিন্ন দলের সহিত ঘরোয়া বৈঠক ছাড়াও আমি কতকগুলি জনসভায় বক্তৃতা করিয়াছিলাম। এই সকল সভায় আমি টেরোরিজম-এর প্রশ্ন আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছিলাম যে, ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে ইহা কত অগ্ন্যস্ত্র, নিষ্ফল ও অনিষ্টকর। আমি টেরোরিষ্টদের গালাগালি করি নাই, কিম্বা আমাদের এক শ্রেণীর স্বদেশবাসীর ফাসানের অত্মকরণ করিয়া তাহাদিগকে “কাপুরুষ” বা “ভীকু”ও বলি নাই। এ কথা তাঁহারা ব বলেন যাহারা দুঃসাহসিক কাজ করিবার কি নিজেকে বিপন্ন করিবার প্রলোভন সর্বদাই জয় করেন। যে নর কিংবা নারী, সর্বদা নিজের জীবনকে বিপন্ন করিতেছে, তাহাকে

সন্ধির অবসান

‘কাপুরুষ’ বা ‘ভীকু’ বলা আমার মতে অত্যন্ত নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি নিজে কিছু করিতে পারে না অথচ দূর হইতে চীৎকার করে, সেই নিরীহ সমালোচককে তাহারা প্রতিক্রিয়ার মুখে ঝুগাই --রিয়া থাকে।

আমার কলিকাতায় অবস্থিতির সর্বশেষ সন্ধ্যায়, ষ্টেশনে ঘাইবার কিছুকাল পূর্বে দুইজন যুবক আমার সহিত দেখা করিতে আসিল। তাহাদের বয়স ২০-এর বেশী হইবে না, তাহাদের বিবর্ণ মুখমণ্ডলে উদ্বেগের চিহ্ন, চক্ষুগুলি উজ্জ্বল। আমি তাহাদের চিনিতাম না: কিন্তু শীঘ্রই তাহাদের আশ্রমের কারণ বুঝিতে পারিলাম। আমার টেরোরিষ্ট হিংসা-নীতির বিরুদ্ধে প্রচারকার্যে তাহারা ক্রোধ প্রকাশ করিল। তাহারা বলিল যে, ইহাতে যুবকদের চিন্তে অত্যন্ত খারাপ দারণা হইতেছে, এবং তাহারা আমার এই অধিকার চর্চা কিছুতেই সহ্য করিবে না। আমরা কিয়ৎকাল তর্ক করিলাম, আমার যাত্রার সময় নিকটবর্তী বলিয়া অতি তাড়াতাড়ি কথা শেষ করিতে হইল। কথায় কথায় আমাদের কণ্ঠস্বর উচ্চ এবং নেজাজ্জ রুক্ষ হইয়া উঠিল। আমি তাহাদের কয়েকটি কড়া কথা শুনাইয়া দিলাম। বিনায়েত প্রাকালে তাহারা আমাকে বলিয়া গেল যে, যদি ভবিষ্যতে আমি এই প্রকার দুর্ব্যবহার করিতে থাকি, তাহা হইলে অগ্ন্যাগ্নকে তাহারা যে ভাবে শিক্ষা দিয়াছে আমাকেও তদ্রূপ শিক্ষা দিবে।

কলিকাতা ত্যাগ করিবার পর রাত্রে ট্রেনের বার্থে শুইয়া শুইয়া আমার মনে সেই বালকদ্বয়ের উত্তেজিত মুখ দুইটা ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। জীবনের প্রাচুর্য্য ও দৃঢ় স্নায়ুপুঞ্জ তাহাদের ছিল; ইহারা যদি সত্য পথে চলিত, তাহা হইলে কত ভাল কাজ হইতে পারিত! অতিদ্রুত এবং কতকটা রুঢ়ভাবে তাহাদের সহিত কথাবার্তার জন্য আমি দুঃখ বোধ করিলাম; মনে হইল, তাহাদের সহিত দীর্ঘকাল আলোচনার স্বেযোগ পাইলে সম্ভবতঃ আমি তাহাদের বুঝাইতে পারিতাম যে, তাহাদের উৎসাহপূর্ণ তরুণ জীবনের সার্থকতার অল্প পথও আছে। ভারতবর্ষের উন্নতি ও স্বাধীনতার সেই সকল পথেও সেবা ও আত্মোৎসর্গের স্বেযোগের অভাব নাই। কয়েক বৎসর পরে এখনও তাহাদের কথা আমার মনে পড়ে। আমি তাহাদের নাম খুঁজিয়া পাই নাই, তাহারা কোথায় আছে তাহাও জানি না। এবং সময় সময় বিস্মিত হইয়া ভাবি, হয় তাহারা মৃত নয় আন্দামানের কোন ‘সেলে’ কাল কৰ্ত্তন করিতেছে।

ডিসেম্বর মাস। এলাহাবাদে দ্বিতীয় রুক্ষ সম্মেলন হইয়া গেল। আমার পুরাতন সহকর্মী হিন্দুস্থানী সেবাদলের ডক্টর এন, এস, হার্দিকারের

নিকট প্রদত্ত পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমি তাড়াতাড়ি দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটকে যাত্রা করিলাম। সেবাদল স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হইলেও ইহার জাতীয় আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক এবং কংগ্রেসের সৈন্য দল। যাহা হউক, ১৯৩১-এর গ্রীষ্মকালে কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি হিন্দুস্থানী সেবাদলকে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের অংশরূপে গ্রহণ করিয়া ইহাকে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বিভাগে পরিণত করিল। আমার ও হাদ্দিকারের উপর ইহার ভার অপিত হইল। দলের প্রধান কার্য্যালয় কর্ণাটক প্রদেশের ছবিলীতেই রহিল এবং হাদ্দিকার আমাকে দল সম্পর্কিত কতকগুলি কার্য্য পরিদর্শনের জন্ত আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত কয়েক দিন আমি কর্ণাটকের নানাস্থানে ভ্রমণ করিলাম, এবং সর্বত্রই জনসাধারণের অসীম উৎসাহ দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। ফিরিবার পথে আমি সাময়িক আইনের জন্ত বিখ্যাত শোলাপুর পরিদর্শন করিয়া আসিলাম।

কর্ণাটক ভ্রমণ আমার নিকট বিদায় অভিনন্দনের অল্পভ্রমণের মত হইয়াছিল। আমার বক্তৃতাগুলিতেও শেষ সঙ্গীতের সুরের রেশ দেখা দিত, তাহার মধ্যে উন্মাদনা থাকিলেও আমার আশঙ্কা হয়, সঙ্গীতের মাধুর্য্য ছিল না। যুক্ত-প্রদেশ হইতে নিশ্চিত ও স্পষ্ট সংবাদ আসিল যে, গভর্নমেন্ট আঘাত করিয়াছেন এবং অতি কঠিন আঘাত করিয়াছেন। এলাহাবাদ হইতে কর্ণাটকে যাইবার পথে আমি কমলাকে লইয়া বোম্বাইয়ে গিয়াছিলাম। সে পুনরায় পীড়িত। হইয়াছিল বলিয়া বোম্বাইয়ে আমাকে তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। এই বোম্বাইয়েই, এলাহাবাদ হইতে আমাদের আগমনের অব্যবহিত পরেই আমরা জানিতে পারিলাম, ভারত গভর্নমেন্ট যুক্ত-প্রদেশের জন্ত এক বিশেষ অভিগ্ৰাণ জারী করিয়াছেন। তাঁহারা গান্ধিজীর আগমনের জন্ত অপেক্ষা না করাই স্থির করিয়াছিলেন, যদিও তখন তিনি সমুদ্রে জাহাজে আছেন এবং সীত্বই বোম্বাইয়ে প্রত্যাবর্তন করিবেন। যদিও অভিগ্ৰাণটি কৃষক আন্দোলন উপলক্ষেই জারী হইয়াছিল, তথাপি ইহার ধারাগুলি এত ব্যাপক, সর্বগ্রাসী যে, সর্ববিধ রাজনৈতিক ও জনসাধারণের কাজ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। এমন কি, ইহাতে সম্ভান-সমুত্তিদের অপরাধে পিতামাতা ও অভিভাবক-দিগেরও শাস্তির ব্যবস্থা হইল—প্রাচীন বাইবেলীয় প্রথার পুনরাবৃত্তি।

এই সময় আমরা রোমে ‘গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাৎকারের বর্ণনা’ বলিয়া ‘জিওর্গালে তু’ ইতালীয়’য় প্রকাশিত একটি বিবরণ পাঠ করিলাম। রোমে এই শ্রেণীর বিবৃতি তিনি দিতে পারেন, ইহাতে আমরা আশ্চর্য্য হইলাম; কেন না, ইহা তাঁহার সুপরিচিত মতবাদ হইতে পৃথক্। গান্ধিজী প্রতিবাদ

সন্ধির অবসান

ফিরিবার পূর্বেই আমরা উহার শব্দবিশ্বাস এবং রচনাভঙ্গী পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, প্রকাশিত বিবৃতি তাঁহার নহে। আমাদের মনে হইল, তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা বহুল পরিমাণে বিকৃত করা হইয়াছে। তাহার পর তিনি তীব্র প্রতিবাদ করিলেন এবং একটা বিবৃতি দিয়া জানাইলেন যে, রোমে কাহারও সহিত তাঁহার ঐক্য আলোচনা হয় নাই। স্পষ্টই বুঝা গেল যে, কোন ব্যক্তি তাঁহার সহিত এই চাতুরী করিয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে, ব্রিটিশ সংবাদপত্র এবং জননেতাগণ তাঁহার কথা বিশ্বাস করিলেন না, এবং অত্যন্ত অবজ্ঞার সহিত তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিতে লাগিলেন। ইহাতে আমরা আহত ও ক্রুদ্ধ হইলাম।

কর্ণাটক ভ্রমণ ত্যাগ করিয়া আমি এলাহাবাদে ফিরিবার জন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলাম। আমার যুক্ত-প্রদেশে গিয়া সহকর্মীদের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হওয়া উচিত। যখন গৃহে দুর্দ্দৈব উপস্থিত, তখন দূরে সরিয়া থাকা অত্যন্ত যত্নপ্রদ। যাহা হউক কর্ণাটকের নিদ্রিষ্ট কাজ আমাকে শেষ করিতেই হইবে। আমি বোম্বাইয়ে ফিরিয়া আসিবার পর কয়েকজন বন্ধু আমাকে গান্ধিজীর আগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পরামর্শ দিলেন। তাঁহার আগমনের ঠিক এক সপ্তাহ বিলম্ব ছিল। কিন্তু ইহা অসম্ভব। এলাহাবাদ হইতে পুরুষোত্তমদাস ট্যাগুন ও অন্যান্যের গ্রেফতারের খবর আসিল। তাহা ছাড়া, এই সপ্তাহেই এটোয়্যায় আমাদের প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশনের দিন নিদ্রিষ্ট ছিল। কাজেই আমি এলাহাবাদ যাত্রা এবং ছয়দিন পরে পুনরায় বোম্বাইয়ে ফিরিবার সঙ্কল্প স্থির করিলাম। যদি আমি মুক্ত থাকি, তাহা হইলে তখন আমি গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাৎ এবং কার্য্যকরী সমিতির সভায় যোগদান করিতে পারিব। কমলাকে রোগশয্যায় রাখিয়া আমি বোম্বাই পরিত্যাগ করিলাম।

আমি এলাহাবাদ পৌঁছিবার পূর্বেই চিওকী স্টেশনে আমার উপর নূতন অভিযান্স অল্পসারে এক হুকুমনামা জারী করা হইল। এলাহাবাদ স্টেশনে পুনরায় ঐ হুকুমনামাই আমার উপর জারী করার চেষ্টা হইল। আমার বাড়ীতে তৃতীয় ব্যক্তি আসিয়া তৃতীয়বার ঐ চেষ্টা করিলেন। এই আদেশপত্রে কোন বিপদের ইঙ্গিত ছিল না। আমার উপর হুকুম দেওয়া হইল যে, আমি এলাহাবাদ মিউনিসিপালিটির সীমার বাহিরে যাইতে পারিব না, কোনও সাধারণ সভা-সমিতিতে বা অল্পসানে যোগ দিতে পারিব না, বক্তৃতা করিতে পারিব না, সংবাদপত্রে বা পুস্তিকায় কিছু লিখিতে পারিব না ইত্যাদি ও প্রভৃতি। আমি

জওহরলাল নেহরু

দোন্ডিলাম, তাসাদুক শেরওয়ানী ও অন্যান্য সহকর্মীদের উপরও অত্যাচার আদেশ জারী হইয়াছে। পরদিন প্রভাতে আমি জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট (যিনি আদেশপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন) হুকুমনামা প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া এক পত্র দিলাম এবং তাঁহাকে জানাইয়া দিলাম যে, আমি কি করিব না করিব, সে সম্বন্ধে তাঁহার হুকুম মত চলিতে প্রস্তুত নহি। আমি সাধারণভাবে সাধারণ কাজ করিয়া যাইব এবং ইতিমধ্যে আমাকে বোম্বাই গিয়া মিঃ গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে এবং সম্পাদক হিসাবে আমাকে কার্যকরী সমিতির সভায় যোগ দিতে হইবে।

এক নূতন সমস্তা দেখা দিল। ঐ সম্বন্ধে এটোয়ায় আমাদের প্রাদেশিক সম্মেলনের দিন নির্দিষ্ট ছিল। গান্ধিজীর আগমন দিবসে, গভর্ণমেন্টের সহিত সংঘর্ষ না ঘটে, এইজন্ত আমি উহা স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার এলাহাবাদে উপস্থিতির পূর্বেই আমাদের সভাপতি শেরওয়ানী যুক্ত-প্রদেশের গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে এক বার্তা পাইয়াছিলেন, তাহাতে গভর্ণমেন্ট জানিতে চাহিয়াছিলেন যে, সম্মেলনে কৃষক সমস্তা আলোচিত হইবে কি না। যদি হয়, তাহা হইলে তাঁহারা সম্মেলন বন্ধ করিয়া দিবেন। যে বিষয় লইয়া সমস্ত প্রদেশ উত্তেজিত, সেই কৃষক সমস্তা আলোচনা করাই সম্মেলনের মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সম্মেলন আহ্বান করিয়া তাহাতে ঐ বিষয় আলোচনা না করা অযৌক্তিক এবং আত্মপ্রভাষণ মাত্র। যে কোন কারণেই হউক, আমাদের সভাপতি বা অন্য কাহারও সম্মেলনের আলোচনা সীমাবদ্ধ করিবার অধিকার ছিল না। গভর্ণমেন্ট ভীতি প্রদর্শন না করিলেও আমরা সম্মেলন স্থগিত করিবার ইচ্ছাই করিয়াছিলাম, কিন্তু এই ভীতিপ্রদর্শনের ফল অগ্নিরূপ হইল।

আমাদের মধ্যে অনেকেই এই ব্যাপারে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন, গভর্ণমেন্টের নির্দেশ মত চলা, কোনদিক দিয়াই কচিকর মনে হইল না। দীর্ঘ আলোচনার পর আমরা আমাদের গর্ব পরিপাক করিয়া ফেলিলাম, এবং সম্মেলন স্থগিত রহিল। গভর্ণমেন্ট পক্ষ হইতে আরম্ভ হইলেও আমরা গান্ধিজীর আগমন পর্য্যন্ত, যে কোন ত্যাগ ও ক্ষতি স্বীকার করিয়াও সংঘর্ষ এড়াইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। তিনি আসিয়া হাল ধরিতে অক্ষম হইবেন, এমন অবস্থা সৃষ্টি করা আমাদের আদৌ ইচ্ছা ছিল না। আমরা প্রাদেশিক কনফারেন্স স্থগিত রাখা সত্ত্বেও, পুলিশ ও সৈন্যদল লইয়া এটোয়ায় খুব আড়ম্বর করা হইল, কয়েকজন একক প্রতিনিধিকে গ্রেফতার করা হইল, স্বদেশী প্রদর্শনী সৈন্যদল দখল করিল।

২৬শে ডিসেম্বর প্রভাতে আমি ও শেরওয়ানী বোম্বাই যাত্রার জন্ত প্রস্তুত

সঙ্কির অবসান

হইলাম। যুক্তপ্রদেশের অবস্থা জ্ঞাত হইবার জন্ত কাং করী সমিতি বিশেষ ভাবে শেরোয়ানীকে আহ্বান করিয়াছিলেন। এলাহাবাদ সহর পরিভ্রমণ না করিবার হুকুমনামা আমাদের উভয়ের উপরই জারী ছিল। এলাহাবাদের পল্লী-অঞ্চলে ও যুক্ত-প্রদেশের অগ্রাগ্র দ্বিতীয় খাজনা ও কর বন্ধ আন্দোলন বন্ধ করিবার জন্তই বিশেষভাবে ঐ অডিগ্যান্স জারী হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। গভর্ণমেন্ট আমাদেরিগকে পল্লী অঞ্চলে বাইতে দিবেন না, ইহা আমরা সহজেই বুঝিলাম। কিন্তু বোম্বাই সহরে গিয়া আমরা যে কৃষক আন্দোলন করিব না, ইহাও স্পষ্টভাবেই বুঝা যায়; এবং অডিগ্যান্সের উদ্দেশ্য যদি কৃষক আন্দোলনই হইত, তাহা হইলে আমাদের যুক্তপ্রদেশ হইতে প্রস্থানে তাঁহারা আনন্দিতই হইতেন। অডিগ্যান্স জারী হইবার পর হইতে আমরা সংঘর্ষ এড়াইয়া আত্মরক্ষার নীতিই অবলম্বন করিয়াছিলাম। ব্যক্তিগতভাবে আদেশ অমান্যের দুই চারিটি দৃষ্টান্ত অবশ্য ছিল। যুক্ত-প্রদেশের কংগ্রেস কমিটি, গভর্ণমেন্টের সহিত সংঘর্ষ এড়াইতে অথবা স্থগিত রাখিবার জন্ত অন্ততঃ তখনকার মত চেষ্টা করিয়াছিল, ইহাও স্পষ্ট। শেরোয়ানী ও আমি এই সকল বিষয় লইয়া গান্ধিজী ও কার্ধ্যকরী সমিতির সহিত পরামর্শ করিবার জন্তই বোম্বাই যাত্রার উত্তোগ করিলাম; কেন না, কেহই জানিত না—আমি তো নিশ্চয়ই জানিতাম না যে, তাঁহারা কি সিদ্ধান্ত করিবেন।

এই সকল বিবেচনা করিয়া আমি ভাবিয়াছিলাম যে, আমাদেরিগকে বোম্বাই যাত্রার অনুমতি দেওয়া হইবে। অন্ততঃ এই ক্ষেত্রে অন্তরীণের তথাকথিত আদেশ অমাত্র গভর্ণমেন্ট সহ করিবেন। কিন্তু ইহাতে আমার অন্তরাখ্যা সায় দিল না।

সকালবেলায় ট্রেনে বসিয়া সংবাদপত্রে পাঠ করিলাম, সীমান্ত প্রদেশে নূতন অডিগ্যান্স জারী হইয়াছে, এবং আবদুল গফুর খাঁ, ডাক্তার খাঁ সাহেব প্রভৃতি গ্রেফতার হইয়াছেন। হঠাৎ আমাদের ট্রেন (বোম্বাই মেইল) ইরাদংগঞ্জ নামে একটি ছোট ষ্টেশনে থামিয়া গেল, পুলিশ কর্মচারীরা আমাদের কামরায় গ্রেফতার করিবার জন্ত প্রবেশ করিল। রেল লাইনের পাশ্বে পুলিশের কাল গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। আমি ও শেরোয়ানী সেই রুদ্ধদ্বার কয়েদীগাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। গাড়ী আমাদেরিগকে লইয়া নৈনী জেলে ছুটিয়া চলিল। সেদিন প্রভাতে ঔষ্টমাস পর্ব উপলক্ষে মুষ্টিযুদ্ধের খেলা ছিল। আমাদেরিগকে গ্রেফতার করিবার জন্ত আগত ইংরাজ পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টকে অত্যন্ত বিষন্ন ও নিরানন্দ দেখাইতেছিল। আমাদের জন্ত বেচারার বড়দিনের আমোদটা নষ্ট হইল।

আবার কারাগার!

গ্রেফতার, বাজেয়াপ্ত, অডিগ্যান্স

আমাদের গ্রেফতারের দুইদিন পর গান্ধিজী বোম্বাইয়ে অবতরণ করিলেন এবং সমস্ত সংবাদ অবগত হইলেন। বাঙ্গলার অডিগ্যান্সের কথা তিনি লগুনে থাকিতেই শুনিয়াছিলেন এবং অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন। বোম্বাইয়ে নামিয়া বড়দিনের উপহারস্বরূপ যুক্ত-প্রদেশ ও সীমান্ত প্রদেশের অডিগ্যান্স লাভ করিলেন এবং শুনিলেন, উক্ত দুই প্রদেশের তাঁহার ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরা গ্রেফতার হইয়াছেন। ভাগ্যের চক্র ঘুরিয়াছে, শাস্তির আর কোন সম্ভাবনাই নাই; তথাপি শেষবার চেষ্টা করিবার জন্ত তিনি বড়লাট লর্ড উইলিংডনের সাক্ষাৎ প্রার্থী হইলেন। নয়াদিল্লী হইতে তাঁহাকে জানান হইল যে, কতকগুলি সর্বো সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইতে পারে। তাহার মধ্যে এই সর্ব ছিল যে, তিনি বাঙ্গলা, যুক্ত-প্রদেশ ও সীমান্ত প্রদেশের নূতন অডিগ্যান্সগুলি ও তদানুসঙ্গিক গ্রেফতারের বিষয় আলোচনা করিতে পারিবেন না (আমি স্মৃতি হইতে লিখিতেছি, বড়লাটের উত্তরের প্রতিলিপি এক্ষণে আমার নিকট নাই)। যে বিষয় লইয়া সমস্ত দেশ উত্তেজিত, তাহাই যদি নিষিদ্ধ হয়, তাহা হইলে আর কি বিষয় লইয়া গান্ধিজী ও কংগ্রেসের নেতাগণ বড়লাটের সহিত আলোচনা করিতে পারেন, তাহা কল্পনাভীত। ইহা স্পষ্টই বুঝা গেল যে, কোন কথা না শুনিয়াই কংগ্রেসকে ধ্বংস করিতে ভারত গভর্নমেন্ট দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছেন, কার্য্যকরী সমিতির পক্ষে নিকপদ্রব প্রতিরোধ নীতি অবলম্বন ছাড়া গতান্তর রহিল না। তাঁহার প্রতীমূহুর্তে গ্রেফতার প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন, এবং কারাগারে ঘাইবার পূর্বে দেশকে কণ্ঠ নিদ্দেশ দিবার জন্ত ব্যগ্র হইলেন। তথাপি আপোষের পথ খোলা রাখিয়া নিকপদ্রব প্রতিরোধের প্রস্তাব গৃহীত হইল। এবং গান্ধিজী বড়লাটের সহিত দেখা করিবার জন্ত আর একবার চেষ্টা করিলেন। তিনি তাহার দ্বিতীয় তারে বিনা সর্বো সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলেন। উত্তরে গভর্নমেন্ট গান্ধিজীর ও কংগ্রেসের সভাপতিকে বন্দী করিলেন এবং সমগ্র দেশে দমননীতিকে উগ্র ও তীব্র করিয়া তুলিলেন। তুমি সংঘর্ষ চাও আর নাই চাও, গভর্নমেন্ট ব্যগ্রভাবে সেজ্ঞ প্রস্তুত।

গ্রেফতার, বাজেয়াপ্ত, অভিজ্ঞান

আমরা তখন জেলে, অসংলগ্ন ও অস্পষ্টভাবে এই সকল সংবাদ আমরা পাইতে লাগিলাম। নববর্ষের জন্ত আমাদের বিচার স্থগিত ছিল বলিয়া বিচারাদীন বন্দী হিসাবে আমরা দেখা সাক্ষাতের অধিকতর সুযোগ পাইতাম। আমরা শুনিলাম, বড়লাট দেখা করিবেন কি করিবেন না, ইহা লইয়া তুমুল আলোচনা চলিতেছে; যেন বর্তমান অবস্থায় উহাই একমাত্র গুরুতর ব্যাপার।

এই সাক্ষাতের প্রশ্ন মূখ্য হইয়া অগ্ৰাণ্য ব্যাপার চাপা পড়িবার উপক্রম হইল। কথা উঠিল, লর্ড আর্লইন থাকিলে সাক্ষাতে রাজী হইতেন এবং তাঁহার সহিত গান্ধিজীর দেখা হইলে সম্ভাবজনক মীমাংসা হইত। বাস্তব ঘটনা উপেক্ষা করিয়া ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির এই অনশ্বাসধারণ পল্লবগ্রাহিতা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ—এই দুই চিরবিরুদ্ধ শক্তির অনিবার্য সংঘাতের কারণ বিশ্লেষণ করিলে কি এই বুঝা যায় যে, ইহা কাহারও ব্যক্তিগত খেয়ালের উপর নির্ভর করে? দুইটি ঐতিহাসিক শক্তির সংঘাত কি পরস্পরের হস্ত ও মৌজন্তে অবসান হয়? অতি গুরুতর ব্যাপারে, বৈদেশিক নির্দেশ স্বেচ্ছায় মান্য করিয়া লইয়া ভারতের জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রক্ষেত্রে আত্মহত্যা করিতে পারে না। ভারতের ব্রিটিশ বড়লাটও জাতীয়তাবাদের এই স্পর্ধিত দ্বন্দ্ব হইতে ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্ত তাঁহাদের বিশিষ্ট উপায়ে চেষ্টা করিবেন; সে বড়লাট যিনিই হউন কিছু আসে যায় না। লর্ড উইলিংডন যাহা করিয়াছেন, লর্ড আর্লইনকেও তাহাই করিতে হইত, কেন না তাঁহারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-নীতির যন্ত্র মাত্র, মূলনীতির অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংশোধন বা পরিবর্তন ব্যতীত, তাঁহারা আর কিছুই করিতে পারেন না। ভারতে ব্রিটিশ নীতির জন্ত ব্যক্তিবিশেষ বড়লাটকে প্রশংসা বা নিন্দা করা আমার মতে অত্যন্ত অযৌক্তিক, যাহারা ইহা করেন তাঁহারা হয় অজ্ঞ, নয় ইচ্ছা করিয়া মূল বিষয়টি এড়াইয়া যান।

১৯৩২-এর ৪ঠা জানুয়ারী এক স্মরণীয় দিবস। সমস্ত তর্ক ও আলোচনার অবসান হইল। অতি প্রত্যুষে গান্ধিজী ও কংগ্রেসের সভাপতি বল্লভভাই প্যাটেল গ্রেফতার হইলেন, তাঁহাদিগকে রাজবন্দীরূপে বিনা বিচারে আটক রাখা হইল। চারিটি নূতন অভিজ্ঞান জারী করিয়া ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের হাতে অপরিমিত ক্ষমতা দেওয়া হইল। ব্যক্তি স্বাধীনতা বলিয়া কিছু রহিল না, কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে যাহাকে খুসী গ্রেফতার এবং যে কোন দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন। সমস্ত ভারতবর্ষ যেন সামরিক শক্তিদ্বারা অवरুদ্ধবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল; কোথায় কি ভাবে কি

জওহরলাল নেহরু

ব্যবস্থা প্রযুক্ত হইবে, তাহার ভার স্থানীয় কর্মচারীদের উপর অর্পিত হইল। *

৪ঠা জানুয়ারী নৈনী জেলের ভিতরে যুক্ত-প্রদেশের জরুরী কমতামূলক অর্ডিন্স অল্পসারে আমাদের বিচার হইল। শেরওয়ানীর ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও দেড়শত টাকা অর্থদণ্ড হইল; আমার দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও পাঁচশত টাকা (অনাদায়ে ছয় মাস অধিক) অর্থদণ্ড হইল। আমাদের উভয়ের অপরাধ এক, আমাদের উপর একই হুকুমনামা দিয়া আমাদের এলাহাবাদ নগরে অন্তরীণ থাকিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল; আমরা উভয়ে একত্রে বোম্বাই যাত্রা করিয়া একই ভাবে আদেশ ভঙ্গ করিয়াছি; আমাদের একসঙ্গে গ্রেফতার করিয়া একই ধারায় বিচার করা হইল, তথাপি দণ্ডদেশের মধ্যে এই পার্থক্য। অবশ্য একটি পার্থক্য ছিল, আমি আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া বোম্বাই যাইব, ইহা পূর্বেই জিলা ম্যাজিস্ট্রেটকে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিলাম। শেরওয়ানী সেরূপ কিছু করেন নাই। কিন্তু তাঁহার যাত্রার সঙ্কল্পও সকলে জানিত, কেন না সংবাদপত্রে উহা প্রকাশিত হইয়াছিল। দণ্ডদেশ প্রদানের অব্যবহিত পরেই শেরওয়ানী যখন বিচারক ম্যাজিস্ট্রেটকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, দণ্ডদেশের এই পার্থক্য সাম্প্রদায়িক কারণে কিনা; তখন উপস্থিত ব্যক্তিগণ কৌতুক অনুভব করিলেন এবং বিচারক অপ্রস্তুত হইলেন।

৪ঠা জানুয়ারীর স্মরণীয় দিবসে দেশের সর্বত্র অনেক ঘটনা ঘটিল। আমাদের কারাগারের অদূরে এলাহাবাদ নগরে বিশাল জনতার সহিত পুলিশ ও সৈন্যদলের সংঘর্ষ হইল, লাঠিচালনার ফলে অনেক হতাহত হইল। নিরুপদ্রব প্রতিরোধকারী বন্দীদের আসিয়া কারাগার পূর্ণ করিতে লাগিল। প্রথমে জিলার জেলগুলি পূর্ণ হইল, তাহার পর নৈনী ও অগ্নাগ্র সেন্ট্রাল জেলে বন্দী আসিতে লাগিল। যখন স্থায়ী জেলগুলিতে আর স্থান সঙ্কুলান হয় না, তখন কতকগুলি অস্থায়ী বন্দিনিবাস স্থাপিত হইল।

নৈনীতে আমাদের ছোট ব্যারাকে বড় বেশী লোক আসেন নাই। আমার পুরাতন বন্ধু নরসিংদা প্রসাদ, রণজিত পণ্ডিত এবং আমার জ্ঞাতিব্রাতা মোহনলাল নেহরু এখানে ছিল। একদিন সহসা আমাদের ৩নং ব্যারাকে আমার সিংহলী যুবক বন্ধু বারনার্ড আলুবিহার আসিয়া উপস্থিত হইল। সে সবে মাত্র বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া ফিরিয়াছে। আমার

* ভারতসচিব শ্রী শ্রীমুয়েল হোর ১৯৩২-এর ২৪শে মার্চ পার্লামেন্টে বলিয়াছিলেন,—
“আমরা যে সকল অর্ডিন্স অমুমোদন করিয়াছি, তাহা অত্যন্ত প্রচণ্ড ও কঠোর তাহা আমি স্বীকার করি। ভারতীয় জীবনের সর্ববিধ কর্ম তাহার আওতায় আইসে।”

গ্রেকতার, বাজেয়াপ্ত, অভিজ্ঞান

ভগ্নীর নিষেধ সত্ত্বেও মুহূর্তের উত্তেজনায় সে কংগ্রেসের শোভাযাত্রায় যোগদান করে এবং তাহার কলে পুলিশের কাল গাড়ীতে উঠিয়া জেলে আসিয়াছে।

কংগ্রেস বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইল—কার্য্যকরী সমিতি হইতে প্রাদেশিক, জিলা, তালুক, সর্ব্ববিধ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান বে-আইনী ঘোষিত হইল। তাহা ছাড়া, কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট বা সহায়ভূতিসম্পন্ন কিম্বা অগ্রগামী বহুতর কৃষক-সভা, প্রজা-সমিতি, যুদক-সমিতি, ছাত্র-সঙ্ঘ, প্রগতিশীল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল, হাসপাতাল, স্বদেশী ভাণ্ডার, ব্যায়ামশালা, পুস্তকাগার কত যে বে-আইনী ঘোষিত হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহার তালিকা সূদীর্ঘ, প্রত্যেক প্রদেশে এই বে-আইনী ঘোষিত প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা কয়েক শত করিয়া হইবে। ভারতে কয়েক সহস্র প্রতিষ্ঠান বে-আইনী হইয়া কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলনের গৌরব ঘোষণাই করিল।

আমার স্ত্রী বোম্বাই-এ রোগশয্যায় শায়িতা, তিনি নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দিতে পারিলেন না বলিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন। আমার মাতা ও ভগ্নীদ্বয় উৎসাহের সহিত আন্দোলনে যোগ দিলেন। শীঘ্রই আমার ভগ্নীদ্বয় প্রত্যেকে এক বৎসর করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত ও জেলে প্রেরিত হইল। কারাগারে নবাগতদের নিকট এবং জেলে আমাদের যে সাপ্তাহিক পত্রিকা পড়িতে দেওয়া হইত, তাহা হইতে আমরা বাহিরের কিছু কিছু সংবাদ পাইতাম। আমরা বাহিরের ঘটনা অনুমান ও কল্পনা করিতাম মাত্র, কেন না সংবাদপত্র ও সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের উপর কঠোর নীতি অবলম্বিত হইয়াছিল; প্রচুর অর্থদণ্ড ও বাজেয়াপ্তের ভীতি দ্বারা আন্দোলন সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। কোন কোন প্রদেশে বন্দী অথবা কারাদণ্ডিত ব্যক্তির নাম পর্য্যন্ত প্রকাশ করাও দণ্ডনীয় হইয়াছিল।

এই ভাবে বাহিরের সংবাদ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আমরা নৈনী জেলে বসিয়া নানাভাবে সময় কাটাইতাম। চরকায় সূতাকাটা, লেখাপড়া, কোন বিষয়ে আলোচনা প্রভৃতি চলিত; কিন্তু সব সময় এক চিন্তা থাকিত—কারা-প্রাচীরের বাহিরে কি ঘটিতেছে। আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়াও আন্দোলনের সহিত জড়িত ছিলাম। সময় সময় আমরা প্রত্যাশায় অধীর হইতাম, কখনও বা কোন ভুল-ত্রুটির জন্ত ক্রুদ্ধ হইতাম এবং দুর্বলতা ও স্থূলকৃটি দেখিয়া বিরক্ত হইতাম। কখনও বা অত্যন্ত অনাসক্ত হইয়া পড়িতাম এবং ধীর ও অমূর্ত্তিজিত ভাবে আলোচনা করিয়া দেখিতাম, এই বিশাল শক্তি-সংঘাত ও বৃহৎ পেষণযন্ত্রের মধ্যে ব্যক্তিগত ত্রুটি ও দৌর্বল্য কত তুচ্ছ। আমি বিন্মিত হইয়া আগামী দিনের কথা ভাবিতাম। এই সংঘর্ষ-সংঘাত এই কল-কোলাহল, এই দুঃসাহসী উৎসাহ, এই নিষ্ঠুর দমননীতি ও স্বপ্না

কাপুরুষতা—ইহার পরিণাম কি? আমরা কোথায় চলিয়াছি? ভবিষ্যৎ নেপথ্যের যবনিকায় আবৃত। ভবিষ্যৎ আবৃত, মন্দ কি! বর্তমানের উপরেও অস্পষ্টতার আবরণ। কিন্তু আমি নিশ্চয় করিয়া জানি, কি বর্তমান কি ভবিষ্যৎ—সংঘর্ষ, দুঃখ, আত্মত্যাগ আমাদের নিত্য সঙ্গী।

“ঐ সমতল ক্ষেত্রে কলা পুনরায় সংগ্রাম আরম্ভ হইবে; জানথাস পুনরায় শোণিতে অমুরঞ্জিত হইবে। হেক্টর ও আজান্স পুনরায় আবির্ভূত হইবেন; হেলেন প্রাচীরের উপর আসিয়া সে দৃশ্য দেখিবেন।”

“তখন আমরা হয় ছায়ায় বিশ্রাম করিব, নয় সংগ্রামের মধ্যে দীপ্যমান হইয়া উঠিব। অন্ধ আশা ও অন্ধ নৈরাশ্যের মধ্যে আমাদের মন তুলিতে থাকিবে; কল্পনা করিব, আমাদের এই জীবনদান কি সম্পদ আনিবে, তাহা আমরা কখনও জানিতে পারিব না। *

৪২

আত্মপ্রচারের ধুম

১৯৩২ সালের প্রথম কয়েক মাস ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মধ্যে এক অতি আশ্চর্য আত্মপ্রচারের ধুম পড়িয়া গেল। ছোট ও বড় সকলশ্রেণীর সরকারী কর্মচারীরা চীৎকার করিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন যে, তাঁহারা কত শান্তিপ্রিয় ও ধার্মিক, আর কংগ্রেস কত পাপী, কত কলহপ্রিয়। তাঁহারা চাহেন গণতন্ত্র, আর কংগ্রেস চাহে ডিক্টেটরী। কংগ্রেসের সভাপতিকে কি ডিক্টেটর বলা হয় না? মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের উৎসাহে তাঁহারা অভিন্যাস, ব্যক্তিস্বাধীনতাহরণ, সংবাদপত্র ও ছাপাখানা দলন, বিনাবিচারে আটক, টাকাকড়ি ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, এবং দৈনন্দিন আরও অনেক ঘটনা,—এই সকল তুচ্ছ ঘটনা একেবারেই ভুলিয়া গেলেন। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মূল প্রকৃতিও তাঁহারা ভুলিয়া গেলেন। গভর্নমেন্টের মস্তিগণ (আমাদেরই স্বদেশবাদী) ক্রমে মুখর হইয়া উঠিলেন। বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে, কংগ্রেসের লোকেরা যখন কারাগারে বসিয়া নিজের স্বার্থের দিকে দেখিতেছেন, তখন তাঁহারা মাসে অতি সামান্য কয়েক সহস্র মূদ্রা বেতন লইয়া

* ম্যাথু আর্নল্ড।

আন্দোলনের ধুম

জনসাধারণের হিতের জন্ত গুরুতর পরিশ্রম করিতেছেন। অধস্তন ম্যাজিস্ট্রেটেরা আমাদের গুরু দণ্ড দিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, রায়দান প্রসঙ্গে আমাদের বক্তৃতা শুনাইতেন, কখনও বা কংগ্রেস বা তৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিন্দা করিতেন। এমন কি স্ত্রীর স্ত্রামুয়েল হোর পর্য্যন্ত ভারত সচিবের মহিমায়িত পদে অধিষ্ঠিত হইয়া ঘোষণা করিলেন যে, কুকুর চীংকার করিলেও সার্থবাহ উষ্ট্রদল অগ্রসর হইবে। তিনি সাময়িক ভাবে ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, কুকুরগুলি সবাই জেলে আবদ্ধ, সেখান হইতে চীংকার করা সহজ নহে; এবং যাহারা বাহিরে আছে, তাহাদের মুখও উত্তমরূপে বদ্ধ।

সর্বাধিক আশ্চর্য্য এই যে, কানপুর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সমস্ত অপবাদ কংগ্রেসের স্বক্ষে নিক্ষেপ করা হইল। সেই ভয়াবহ পৈশাচিক দাঙ্গার নিষ্ঠুর অহুষ্ঠানগুলি প্রচার করিয়া পুনঃ পুনঃ বলা হইতে লাগিল যে এই গুলির জন্ত কংগ্রেসই দায়ী; কিন্তু কার্য্যতঃ কংগ্রেস মহা ও করুণার সহিত উহা নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিল এবং ইহার জন্ত সে তাহার একজন সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানকে বলি দিয়াছিল, যাহার জন্ত কানপুরের সর্বশ্রেণীর লোকই শোকসন্তপ্ত হইয়াছিল। করাচী কংগ্রেসে দাঙ্গার সংবাদ পৌছিবামাত্র এক তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা হয়; এই কমিটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সব বিষয় অনুসন্ধান করেন। কয়েক মাস পরিশ্রমের পর তাঁহাদের স্ববৃহৎ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। কিন্তু গভর্নমেন্ট তাড়াতাড়ি উহা বাজেয়াপ্ত করিয়া মুদ্রিত পুস্তকগুলি হস্তগত করিয়া ফেলেন। আমার ধারণা, তাঁহারা সে গুলি নষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু তদন্তের ফল এইভাবে চাপিয়া দিয়াও তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন না, আমাদের সরকারী সমালোচক এবং ব্রিটিশ কর্তৃত্বে পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি সময় ও সুবিধামত পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন যে, কংগ্রেসের কার্য্যের ফলেই দাঙ্গা ঘটয়াছে।

অবশ্য এই ক্ষেত্রে এবং অন্ত্রও পরিণামে সত্যই জয়ী হইবে; কিন্তু সময় সময় মিথ্যার রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয়। “মিথ্যা তাহার কার্য্য শেষ হইলে আপনা হইতেই ধ্বংস হইবে। যখন কেহ সত্যের জয় কি পরাজয়ের কথা ভাবিবে না, তখন মহান সত্য জয়ী হইবে।”

সংগ্রামক্ষিপ্ত মানসিক বিকারের এই বহিঃপ্রকাশ অতি স্বাভাবিক। পারিপাশ্বিক অবস্থা যেরূপ, তাহাতে কেহই সত্য ও সংযম প্রত্যাশা করিতে পারে না, ইহাই আমার ধারণা। কিন্তু ইহার তীব্রতা ও প্রাচুর্য্য অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত এবং আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ইহা ভারতীয় শাসক সাম্প্রদায়ের মানসিক অবস্থার নিদর্শন এবং কিছুকাল পূর্বে তাঁহারা কি ভাবে নিজেদের দমন করিয়া রাখিয়া-

ছিলেন তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ, আমাদের কোন কথা বা কাজের জন্ত ক্রোধের উৎপত্তি হয় নাই। তাঁহাদের সাম্রাজ্য হারাইবার পূর্বতন ভীতি হইতেই ইহার উদ্ভব। যে সমস্ত শাসক নিজেদের শক্তি সম্পর্কে বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁহারা এরূপ আচরণ করেন নাই। উভয় পক্ষের বৈষম্যও অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। অপর দিকে নিস্তরুতার রাজত্ব; এই নিস্তরুতা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত অথবা আত্মমর্যাদাসূচক সম্ভবের ত্রোতক নহেন, ইহা কারাগার, ভীতি এবং সর্ববিধ প্রচারণা বন্ধ করার ব্যবস্থাজনিত নিস্তরুতা। এইভাবে বলপূর্বক কণ্ঠরোধ করিয়া অপর পক্ষ বিকারক্ষিপ্ত উচ্ছ্বাস, অতিরঞ্জন ও কুংসা প্রচারের চূড়ান্ত দেখাইতে লাগিলেন। যাহা হউক, প্রকাশের একমাত্র পথ ছিল—বিভিন্ন সহর হইতে মাঝে মাঝে বে-আইনী-সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত।

ব্রিটিশ কর্তৃত্বে পরিচালিত এংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলি এই আত্মপ্রচারের ধুমধামে যোগ দিয়া মনের আনন্দে রসাস্বাদ করিতে লাগিল। দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহারা মনের গোপন অন্ধকারে যে সকল আক্রোশ দমন করিয়া রাখিয়াছিল, এতদিনে সেই সকল চিন্তা ও কথা প্রকাশিত হইতে লাগিল। সাধারণ সময়ে তাহারা নিজেদের মনোভাব সাবধানতা সহকারে ব্যক্ত করে, কেন না ইহাদের অধিকাংশ পাঠকই ভারতীয়; কিন্তু ভারতের এই সঙ্কট কালে এই সংযম আর রহিল না, ইংরাজ ও ভারতীয় নির্বিশেষে সকলের মনোভাবই আমরা বুঝিতে পারিলাম। এংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র ভারতে অতি অল্পই আছে, একে একে সে গুলি বিলুপ্ত হইতেছে। অবশিষ্টগুলির মধ্যে কয়েকখানি কি সংবাদের দিক দিয়া, কি বাহ্য সৌষ্টবের দিক দিয়া অতি উচ্চ শ্রেণীর পত্রিকা। তাঁহাদের আন্তর্জাতিক ব্যাপারের উপর লিখিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি রক্ষণশীল মনোবৃত্তি লইয়া লিখিত হইলেও উহার মধ্যে কুশলতা, জ্ঞান ও মর্মগ্রহণের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। সংবাদপত্র হিসাবে এই গুলি নিঃসন্দেহ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা। কিন্তু ভারতীয় রাজনৈতিক সমস্তা সম্পর্কে তাঁহাদের আলোচনা অত্যন্ত নিম্নস্তরের এবং অতি আশ্চর্যরূপে একদেশদর্শী। এবং সঙ্কটের সময়ে তাঁহাদের পক্ষপাতিত্ব, বিকারের প্রলাপ ও স্থূলরুচির পরিচায়ক হইয়া উঠে। তাঁহারা বিশ্বস্তভাবে ভারত সরকারের মনোভাব প্রচার করেন এবং সতত এই সরকারী প্রচারকার্যের মধ্যেও প্রগল্ভ উচ্ছ্বাসের অভাব নাই।

আন্দোলনের ধুম

এই সকল এংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রের সহিত তুলনায় ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি অতি দরিদ্র। তাহাদের আর্থিক অবস্থাও ভাল নহে এবং কাগজের উন্নতি করিবার জন্ত মালিকেরাও বড় বেশী চেষ্টা করেন না। অতি কষ্টে তাঁহারা দৈনন্দিন অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলেন, এবং মন্দভাগ্য সম্পাদকীয় বিভাগের লোকেরা অতি কষ্টে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন। এগুলির কাগজ ও মুদ্রণ শ্রীহীন, অনেক আপত্তিজনক বিজ্ঞাপন প্রায়শঃই প্রকাশিত হয়, রাজনীতি বা জাতীয় জীবন সম্পর্কে তাঁহাদের মনোভাব অত্যন্ত ভাবপ্রবণ ও উচ্ছ্বাসময়। আমার ধারণা, ইহার আংশিক কারণ এই যে, আমরা ভাবপ্রবণ জাতি, আরও কারণ এই যে, বিদেশী ভাষায় (ইংরাজী কাগজগুলি) সরল অথচ জোরের সহিত লেখা সহজ নহে। কিন্তু আসল কারণ, দীর্ঘকালের পরাধীনতা ও দমননীতির প্রতিক্রিয়া হইতে যে মনোভাব গড়িয়া উঠে, তাহা সহজেই প্রকাশের পথে ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

ভারতীয় পরিচালিত ইংরাজী সংবাদপত্রগুলির মধ্যে সম্ভবতঃ মাদ্রাজের “দি হিন্দু”ই সংবাদসংগ্রহ, ছাপা ও কাগজের দিক দিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ। ‘হিন্দু’ দেখিলেই আমার মনে হয়, এ যেন শুচিশুদ্ধ প্রবীণা বিধবা মহিলা; অত্যন্ত গম্ভীর ও রাসভারি, ষাঁহার সম্মুখে একটি চপল কথা উচ্চারণ করিলেই তিনি মর্ম্মাহত হইবেন। ইহা স্বচ্ছল অবস্থার বুজোয়া কাগজ; জীবনযুদ্ধের সংঘর্ষ, কল্কশ কোলাহল বা তুচ্ছিত্ব ইহার নাই। আরও কয়েকখানি মডারেট মতাবলম্বী সংবাদপত্রও এই “প্রবীণা বিধবা”র আদর্শে চালিত হয়। কিন্তু তাঁহারা ‘হিন্দুর’ মত বৈশিষ্ট্য লাভ করিতে পারেন নাই, এবং সকল দিক দিয়াই বৈচিত্র্যহীন।

গভর্নমেন্ট আঘাত করিবার জন্ত বহু পূর্ব হইতেই আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং প্রথম সূচনাতেই যথাসাধ্য প্রচণ্ড আঘাত করিবার অভিপ্রায় তাঁহাদের ছিল। ১৯৩০ সালে নব নব অর্ডিন্যান্স দিয়া ঘটনার স্রোত রুদ্ধ করিতেই তাঁহারা চেষ্টা করিতেছিলেন। সে বার কংগ্রেসই প্রথম আরম্ভ করিয়াছিল। ১৯৩২-এর উপায় স্বতন্ত্র এবং গভর্নমেন্টই সকল দিক দিয়া প্রথম আক্রমণ করিয়া বসিলেন। কতকগুলি সর্বভারতীয় ও প্রাদেশিক অডিগ্যান্স দ্বারা যত প্রকার সম্ভব ক্ষমতা গ্রহণ ও প্রদান করা হইল। বহু সভা-সমিতি বে-আইনী হইল, বাড়ী, সম্পত্তি, মোটর গাড়ী, ব্যাঙ্কে আমানতী টাকা দখলে লওয়া হইল ও জনসভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ হইল। সংবাদপত্র ও ছাপাখানা সম্পূর্ণ রূপে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হইল। অল্প দিকে এই সময় গান্ধিজী নিরুপদ্রব

জওহরলাল নেহরু

প্রতিরোধ নীতি এড়াইবার জগ্ন অত্যন্ত আগ্রহীল ছিলেন। কার্যকরী সমিতির প্রায় সকল সদস্যের মনোভাবও ঐ রূপ ছিল। আমি ও আর দুই এক জন ভাবিয়াছিলাম যে, আমাদের যতই অনিচ্ছা থাকুক না কেন, সংঘর্ষ অবশ্যজ্ঞাবী। অতএব, পূর্ব হইতে প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। যুক্ত-প্রদেশ এবং সীমান্ত প্রদেশে ক্রমবর্দ্ধিত মনোমালিন্যের ফলে জনসাধারণ বুঝিতে পারিতেছিল যে, সংঘর্ষ আসিতেছে। কিন্তু মোটের উপর মধ্যশ্রেণী ও শিক্ষিত ব্যক্তির যদিও সংঘর্ষের সম্ভাবনা অস্বীকার করিতে পারিতেছিলেন না, তথাপি তাঁহারা তৎকালে সে ভাবে চিন্তা করিতেন না। তাঁহাদের আশা ছিল, গান্ধিজী ফিরিয়া আসিলেই যে কোন প্রকারে সংঘর্ষ নিবারণ করিবেন—এই আশাই পূর্বোক্ত প্রকার চিন্তার প্রসূতি।

এই ভাবে ১৯৩২-এর প্রথম ভাগে গভর্ণমেন্টই আক্রমণ করিলেন এবং কংগ্রেস আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। অডিটাল ও নিরুপদ্রব প্রতিরোধের যুগপৎ দ্রুত আবির্ভাবে অনেক স্থানীয় কংগ্রেস-নেতা বিহ্বল হইলেন। তথাপি কংগ্রেসের আহ্বানে দেশ আশ্চর্যরূপে সাড়া দিল এবং নিরুপদ্রব প্রতিরোধকারীর অভাব হইল না। আমার বিবেচনায় ১৯৩০ অপেক্ষাও ১৯৩২-এ ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট অধিকতর প্রতিরোধের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। এবার সর্বত্র, বিশেষভাবে বৃহৎ নগরীগুলিতে ১৯৩০-এর মত বাহ্য আন্দোলন ও প্রচার ছিল না। ১৯৩২-এ যদিও জনসাধারণ অধিকতর সাহস-শীলতা দেখাইয়াছিল এবং শান্তিপূর্ণ ছিল, তথাপি ১৯৩০-এর মত উৎসাহের প্রেরণা ছিল না। ইহা যেন অনিচ্ছায় যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিতির মত। ১৯৩০ সালে ইহার যে গৌরব ছিল, দুই বৎসর ব্যবধানে তাহা অনেকাংশে ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল। গভর্ণমেন্ট তাঁহাদের সমস্ত শক্তি লইয়া কংগ্রেসের সম্মুখীন হইলেন। ভারতে কার্যতঃ সামরিক আইন প্রবর্তিত হইল। কংগ্রেস স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কিছু করিবার স্বেচ্ছা অথবা কোন কাজ করিবার কোন স্বাধীনতা পাইল না। প্রথম আঘাতেই ইহা মুহূর্ত্তানুহীত হইল, অতীতে কংগ্রেসের প্রধান সমর্থক বুজ্জোয়া সদস্যগণই অধিকতর শক্তিত হইলেন। তাঁহাদের পকেটে হাত পড়িল এবং ইহা বুঝা গেল যে, যাহারা নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগদান করিবে অথবা ইহাকে সাহায্য করিতেছে বলিয়া জানা যাইবে, তাহারা কেবল স্বাধীনতা হারাইবে না, সম্পত্তি হস্তচ্যুত হওয়ার আশঙ্কাও রহিয়াছে। যুক্ত-প্রদেশে ইহাতে আমরা বিশেষ চিন্তিত হই নাই; কারণ এখানে কংগ্রেস-পন্থীরা সকলেই দরিদ্র। কিন্তু বোম্বাই প্রভৃতি বৃহৎ সহরে অবস্থা ছিল ভিন্নরূপ।

আন্দোলনের ধুম

ইহাতে ব্যবসায়ী শ্রেণীর সর্বনাশ এবং বৃত্তিজীবী শ্রেণীর বহুল ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল। কেবলমাত্র ভীতি প্রদর্শনেই (কোন কোন স্থানে প্রয়োগ করাও হইয়াছে) সহরের ধনী ও স্বচ্ছল শ্রেণী পঙ্খ হইয়া পড়িলেন। আমি পরে শুনিয়াছি, একজন ভীকু কিন্তু ধনী ব্যবসায়ী যিনি কদাচিৎ চাঁদা দেওয়া ছাড়া রাজনীতির ত্রি-সীমানায় আসেন নাই, তাঁহাকে পুলিশ পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা ও দীর্ঘ কারাদণ্ডের ভয় দেখাইয়াছিল। এই প্রকার ভীতি প্রদর্শন সচরাচর ঘটনায় পরিণত হইয়াছিল, এবং ইহা ফাঁকা কথা ছিল না, কেন না পুলিশের হাতে তখন অপরাধী ক্ষমতা এবং প্রতাহই মৌখিক ভীতি অসুখায়ী কার্যের দৃষ্টান্ত দেখা যাইত।

গভর্নমেন্ট যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাতে আমার মতে কোন কংগ্রেস কক্ষীর আপত্তি করিবার অধিকার নাই। অবশ্য সম্পূর্ণরূপে অহিংসা আন্দোলনের বিরুদ্ধে গভর্নমেন্ট যে পীড়ন ও হিংসামূলক কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন, সভ্যতার নাপকাঠিতে তাহা নিশ্চয়ই আপত্তিজনক। যদি আমরা বৈপ্লবিক প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক উপায় অবলম্বন করি, তাহা যত অহিংসই হউক না কেন আমাদের সর্ববিধ বাধার জগৎ প্রস্তুত থাকিতেই হইবে। বৈঠকখানায় বসিয়া বৈপ্লবিক খেলা খেলা যায় না; কিন্তু আগাদের মধ্যে অনেকে দুইয়েরই সন্নিবিষ্ট চাহেন। যে ব্যক্তি বৈপ্লবিক পদ্ধতি লইয়া নাড়া-চাড়া করিতে চায়, তাহাকে সর্বদা হারাইবার জগৎ প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ধনী এবং সম্পন্ন ব্যক্তির কদাচিৎ বিপ্লবী হইয়া থাকেন, কেহ এইরূপ হইলে সেই নির্দোষকে বিষয়ী ব্যক্তির তাঁহাদের শ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতক বলিয়া অভিহিত করেন।

অবশ্য জনসাধারণকে দমন করিবার জগৎ স্বতন্ত্র পদ্ধতি আবশ্যক। ইহাদের মোটর গাড়ী, বাগ্গে আমানতী টাকা অথবা বাজেয়াপ্ত করিবার মত কোন সম্পত্তি নাই; অথচ ইহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে আন্দোলনের ভার বহন করিতেছে। সকল দিক দিয়া সরকারী কঠোরতার আর একটা ফল দেখা গেল যে, একদল লোক সহসা কর্তৃত্বপর হইয়া উঠিল, কোন সত্ত্ব প্রকাশিত পুস্তকের ভাষায় ইহাদিগকে “গভর্নমেন্টেরিয়ানস্” অর্থাৎ সরকার পক্ষীয় লোক বলা যাইতে পারে। কতকগুলি লোক ভবিষ্যতে কি হইবে বুঝিতে না পারিয়া কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল। কিন্তু গভর্নমেন্ট ইহা সহ্য করিলেন না। তাঁহারা কেবল নিষ্ক্রিয় রাজভক্তি চাহেন না। সিপাহী বিদ্রোহের খ্যাতিনামা ফ্রেডারিক ক্রুপারের ভাষায় কর্তৃপক্ষ, “সম্পূর্ণ ক্রিয়ালীল এবং সুস্পষ্ট রাজভক্তির কম কিছু সহ্য করিবেন না। গভর্নমেন্ট প্রজাবৃন্দের

কেবলমাত্র নৈতিক বশত। স্বীকারের উপর নির্ভর করিতে সম্মত হইবেন না।” এক বৎসর পূর্বে যখন ব্রিটিশ উদারনৈতিক দলের নেতারা গ্রাশনাল গভর্নমেন্টে যোগ দিয়াছিলেন, তখন সেই সকল প্রাচীন সহকর্মীকে লক্ষ্য করিয়া মিঃ লয়েড্ জর্জ বলিয়াছিলেন, “যাহারা পারিপার্শ্বিক অবস্থাহুসারে গায়ের রং বদলায় ইহারা সেই জাতীয় সরীষ্প।” ভারতের নূতন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় কোন নিরপেক্ষ রং সহ্য করা হইত না এবং আমাদের কতিপয় স্বদেশবাসী শাসকগণের নয়নানন্দকর উজ্জ্বল বর্ণে অল্পরঞ্জিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন। সঙ্গীত, শোভাযাত্রা, ভোজসভা প্রভৃতি দ্বারা তাঁহারা শাসকবৃন্দের প্রতি অল্পরক্তি ও প্রেম জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। অর্ডিন্যান্স, বহুতর বাধা-নিষেধ, সূর্যাস্ত আইন প্রভৃতি হইতে তাঁহাদের কোনই ভয় নাই; কেন না সরকারী ভাবে ঘোষণাই করা হইয়াছিল যে, ঐগুলি কেবল অবাধা সিডিসান প্রচারকারীদের জ্ঞাত, রাজভক্তদের উহাতে চিন্তিত হইবার কিছুই নাই। কাজেই তাঁহাদের স্বদেশবাসীর আতঙ্ক, সংঘর্ষ ও সংঘাতের মধ্যেও তাঁহারা নির্বিকার চিত্তে উহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহারা স্নো লিখিত বিশ্বাসী মেমপালিকার সহিত একমত হইবেন। সে বলিয়াছিল, “একটি ভয়ের কারণ হইতে আমি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, আমাকে বলাংকার করা অসম্ভব, কেন না আমি সর্বদাই সম্মত।”

গভর্নমেন্টের মনে কোন প্রকারে এই ধারণা জন্মিল যে, কংগ্রেস স্ত্রীলোকদিগকে আন্দোলনে আনিয়া জেলখানা পূর্ণ করিতেছে। কংগ্রেসের আশা যে, নারীরা লঘুদণ্ড পাইবে ও সম্ভাবহার পাইবে। ইহা অত্যন্ত আজগুবি ধারণা, যেন লোকে ইচ্ছা করিয়া পরিবারস্থ নারীদের কারাগারে পাঠায়! সাধারণতঃ নারীরা যখন আন্দোলনে যোগদান করেন, তখন পিতা, ভ্রাতা ও স্বামীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই করেন, অন্ততঃ তাঁহাদের পূর্ণ সহানুভূতি পান না। যাহা হউক, গভর্নমেন্ট দীর্ঘ কারাদণ্ড এবং জেলে খারাপ ব্যবহার দ্বারা স্ত্রীলোকদিগকে নিরুৎসাহ করিবার সংকল্প করিলেন। আমার ভগ্নীর গ্রেফতার ও কারাদণ্ড হইবার পর পনের বোল বৎসর বয়স্ক কতকগুলি তরুণী বালিকা কর্তব্য নির্ধারণের জ্ঞাত সমবেত হইয়াছিল। তাহাদের উৎসাহ ছিল, কিন্তু অভিজ্ঞতা ছিল না। তাহারা পরামর্শ করিতেছিল। এমন সময় রুদ্ধদ্বার গৃহের মধ্যেই তাহাদিগকে গ্রেফতার করা হইল এবং প্রত্যেককে দুই বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। ভারতে প্রত্যহ অল্পভিত্তি ইহা একটি ক্ষুদ্র ঘটনা মাত্র। অধিকাংশ বালিকা ও নারী কারাগারে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছে, এমন কি সময় সময় পুরুষদের অপেক্ষাও নির্দ্যাতন

আত্মপ্রচারের ধুম

সহিয়াছে। আমি অনেক বেদনাবহ দৃষ্টান্তের কথা শুনিয়াছি। বোম্বাই জেলে অন্তান্ত সত্যাগ্রহী নারীবন্দিনীদের সহিত মীরাবেন (মেডিলিন ব্লেড্) যে অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমি তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি।

যুক্ত-প্রদেশে আমাদের আন্দোলন পল্লী-অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। কৃষকদের প্রতিনিধিরূপে কংগ্রেস ক্রমগত চাপ দেওয়ার ফলে বেশ মোটা রকম খাজনা মাপের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, যদিও আমরা তাহা উপযুক্ত বিবেচনা করি নাই। আমাদের গ্রেফতারের অব্যবহিত পরেই আরও খাজনা মাপের কথা ঘোষণা করা হইল। ইহা আশ্চর্য্য যে কিছু পূর্বে এই ঘোষণা হইলে অবস্থার অনেক পার্থক্য হইত। তাহা হইলে আমাদের পক্ষে উহা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা কঠিন হইত; কিন্তু কংগ্রেস যাহাতে এই খাজনা মাপের কুতিত্বের প্রশংসা না পায়, সেজন্য গভর্ণমেন্ট বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন, এই জ্ঞান একদিকে তাঁহারা কংগ্রেসকে পিষিয়া মারিবার জন্য সঙ্কল্প করিলেন, অত্র দিকে কৃষকদিগকে ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য যথাসম্ভব খাজনা মাপ দিতে লাগিলেন। যেখানেই কংগ্রেসের চাপ অত্যধিক হইয়াছে, সেই খানেই তাঁহারা সর্বোচ্চহারে খাজনা মাপ দিয়াছেন, ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

এই খাজনা মাপের পরিমাণ অনেক বেশী হইলেও ইহাতে কৃষক সমস্যার সমাধান হইল না বটে, কিন্তু অবস্থা অনেক শান্ত হইল। কৃষকদের প্রতিরোধের জোর কমিয়া গেল এবং আমাদের বৃহত্তর আন্দোলনের দিক দিয়া আমরাও সাময়িকভাবে দুর্বল হইয়া পড়িলাম। এই আন্দোলনে যুক্ত-প্রদেশের সহস্র সহস্র কৃষক দুর্দশাগ্রস্ত হইল, অনেকে সর্বস্বান্ত হইল। কিন্তু এই আন্দোলনের চাপে লক্ষ লক্ষ কৃষক সর্বোচ্চ হারে খাজনা মাপ পাইয়া (আইন অমাত্র আন্দোলন ও তৎসংশ্লিষ্ট ব্যাপার ছাড়া) বহুতর বিরক্তিকর হয়রানির হাত হইতে অব্যাহতি পাইল। সাময়িক ভাবে এক বৎসরের জন্য এই খাজনা মাপ পাওয়া কৃষকদের পক্ষে অবশ্য খুব বড় কথা নয়। কিন্তু ইহাও কৃষকদের পক্ষ হইতে যুক্তপ্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অবিরত চেষ্টার ফলেই সম্ভবপর হইয়াছিল, সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সাধারণ কৃষকগণ সাময়িক ভাবে ইহাতে লাভবান হইলেও এই আন্দোলনের আঘাত তাহাদের মধ্যে সাহসী ব্যক্তিরাই সহ্য করিয়াছে।

১৯৩১-এর ডিসেম্বরে যখন যুক্ত-প্রদেশে বিশেষ অর্ডিন্যান্স জারী হয়, তাহার সহিত একটি বিবৃতিমূলক পরিশিষ্টও ছিল। এই বিবৃতি অথবা অন্তান্ত অর্ডিন্যান্সের সহিত প্রকাশিত বিবৃতিগুলিতে প্রচার

জওহরলাল নেহরু

কার্যের সুবিধার জন্ত অনেক অর্ধসত্য ও অসত্য ছিল। ইহাও সেই আত্মপ্রচারের কৌশলমাত্র এবং আমাদের পক্ষে উহার উত্তর দেওয়া অথবা ভুলগুলির প্রতিবাদ করার উপায় ছিল না। শেরওয়ানী সম্পর্কে একটি মিথ্যা ঘটনা প্রচারের চেষ্টায়, তিনি গ্রেফতার হইবার প্রাকালে প্রতিবাদ করেন। গভর্ণমেন্টের বিবৃতি ও ক্রটিস্বীকারমূলক প্রত্যাহার-পত্রগুলি অত্যন্ত কৌতুককর। উহাতে বুঝা যায়, গভর্ণমেন্ট কত বিচলিত এবং তাঁহাদের মানসিক অস্থিরতা কত বেশী। স্পেনের রাজা বোর্বোবংশীয় তৃতীয় চার্লস তাহার রাজত্ব হইতে জেজুইটদের নির্বাসিত করিবার যে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছিলেন, একদিন তাহা পাঠ করিতে গিয়া ভারতে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের ঘোষণাপত্র অডিগ্লাম ও তাহার যুক্তিগুলি বিশেষভাবে মনে পড়িল। ১৭৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশিত ঐ ঘোষণাপত্রে রাজা তাহার কার্যের বৈধতা প্রতিপন্ন করিবার জন্ত বলিয়াছেন,—“আহুগতা, শাস্তি ও সুবিচার প্রজাবৃন্দের মধ্যে রক্ষা করিবার জন্ত আমার কর্তব্যের সহিত সংশ্লিষ্ট কতকগুলি গুরুতর কারণে ইহার আবশ্যক হইয়াছে। এবং অগ্রাগ্র জরুরী, বিচারসঙ্গত এবং প্রয়োজনীয় যুক্তি, তাহা আমার রাজ হৃদয়ে আবদ্ধ রহিল।”

ঠিক এইরূপেই অডিগ্লামের প্রকৃত কারণগুলি বড়লাটের হৃদয়ে অথবা তাহার পরামর্শদাতাদের সাম্রাজ্যবাদী হৃদয়ে আবদ্ধ রহিল, যদিও উহা স্পষ্ট করিয়াই বুঝা গিয়াছিল। সরকারীভাবে যে সকল যুক্তি ঘোষণা করা হইল, তাহা হইতে আমরা ভারতে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের প্রচারকার্যের অভিনব কৌশলগুলির সর্বাঙ্গবৃন্দর ব্যবস্থা বুঝিতে পারিলাম। কয়েকমাস পরে আমরা জানিতে পারিলাম, আধা-সরকারী ভাবে বহু পুত্রিকা ও বিজ্ঞাপনী পল্লী-অঞ্চলে প্রচার করা হইতেছে; ঐ গুলি অতি আশ্চর্য্য ভ্রান্ত বিবৃতিতে পূর্ণ এবং বিশেষভাবে কংগ্রেসের জগ্গই যে ভ্রাম্যমূল্য হ্রাস পাইয়া কৃষকদের দুর্দশা হইয়াছে, তাহাও ঐ গুলিতে উল্লিখিত হইত। কংগ্রেসই জগদ্ব্যাপী মন্দা ঘটাইয়াছে, কংগ্রেসের শক্তির প্রতি কি অসামান্য শ্রদ্ধাজ্ঞাপন! কিন্তু কংগ্রেসের মর্যাদা নষ্ট করার আশায়, এই মিথ্যা কথাটা অক্লান্তভাবে পুনঃ পুনঃ প্রচার করা হইতে লাগিল।

ইহা সত্ত্বেও যুক্তপ্রদেশের প্রধান প্রধান জিলার কৃষকগণ নিরুপদ্রব প্রতিরোধের আস্থানে (যাহা অনিবার্য্যরূপে খাজনা মকুবের আন্দোলনের সহিত মিশ্রিত হইয়াছিল) চমৎকার সাড়া দিয়াছিল। ইহা ১৯৩০ হইতে অধিকতর ব্যাপক এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ। ইহার মধ্যে খোস

আত্মপ্রচারের ধুম

মেজাজ ও রক্ত রহস্তের অভাব ছিল না। রায়বেরিলী জিলার বাকুলিয়া গ্রামে পুলিশ দলের আগমন সম্পর্কে একটি হাসির গল্প গুনিয়েছিলাম। বাকী খাজনার দায়ে তাহারা মালপত্র ক্রোক করিতে গিয়াছিল। গ্রামবাসীদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল এবং তাহারা অনেকটা তেজস্বী প্রকৃতির। তাহারা দেওয়ানী আদালতের কর্মচারী ও পুলিশদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বাড়ীর দরজা কপাট খুলিয়া দিল এবং তাহাদিগকে যেখানে থুসী প্রবেশ করিবার জন্য আহ্বান করিল। কিছু গরু বাছুর প্রভৃতি ক্রোক করা হইল। তারপর গামবাসীরা তাহাদের ‘পান শুপারী’ দিয়া সম্মানের সহিত বিদায় দিল। তাহারা সলজ্জভাবে যেন জল হইয়া চলিয়া গেল! কিন্তু ইহা অতি বিরল ঘটনা। অল্পদিন পরেই রক্ত রহস্ত বা দয়া-দাক্ষিণ্যের লেশমাত্রও রহিল না। বাকুলিয়ার বেচারা গ্রামবাসীরা তাহাদের বান্ধুপ্রিয়তা ও বেপরোয়া সাহসের শাস্তি অনেকখানিই পাইয়াছিল।

এই সকল জিলায় কয়েকমাস ধরিয়া প্রজারা খাজনা দেওয়া বন্ধ রাখিল এবং সম্ভবতঃ গ্রীষ্মকালের প্রারম্ভ হইতে খাজনা আদায় শুরু হইল। গভর্ণমেন্টের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বহু লোককে গ্রেফতার করিতে হইল। সাধারণতঃ, বিশেষ কর্মী কিংবা গ্রামের নেতাদের গ্রেফতার করা হইত, বাদ বাকী সকলকে প্রহার করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত। কারাদণ্ড দেওয়া অথবা গুলি চালনা অপেক্ষা প্রহার করাকেই তাহারা উৎকৃষ্টতর পন্থা বলিয়া মনে করিতেন। যেখানে যতবার ইচ্ছা প্রয়োজন মত ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে এবং দূরবর্তী পল্লীগ্রাম হইতে ইহা বাহিরে প্রচারের সম্ভাবনাও অতি কম ছিল এবং ইহাতে জেলে বন্দীর সংখ্যাও বাড়িত না। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছেদ, ক্রোক, গরু-বাছুর, সম্পত্তি নীলাম প্রভৃতিও চলিতেছিল। নামমাত্র মূল্যে কৃষকদের যথাসর্বস্ব বিক্রয় তাহারা অসহায় বেদনায় নিরীক্ষণ করিত।

অগ্রাগ্র অনেক বাড়ীর মতই গভর্ণমেন্ট ‘স্বরাজ ভবন’ও দখল করিয়াছিলেন। স্বরাজ ভবনে অবস্থিত কংগ্রেস হাসপাতালের অনেক মূল্যবান সাজ-সরঞ্জাম ও আসবাবপত্রও দখল করা হইল। কয়েকদিন হাসপাতালের কাজ বন্ধ রহিল, তারপর নিকটস্থ উদ্যানে খোলা জায়গায় চিকিৎসালয় স্থাপিত হইল। ইহার পর উহা স্বরাজ ভবনের সংলগ্ন একটি ছোট বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়। সেই হাসপাতাল বা চিকিৎসালয় এখানে আড়াই বৎসর ছিল।

আমাদের আবাস গৃহ ‘আনন্দ ভবন’ও গভর্ণর দখল করিতে পারেন ইহা লইয়া কথা উঠিতে লাগিল, কেন না আমি আয়করের

জওহরলাল নেহরু

একটা মোটা টাকা দিতে অস্বীকার করিয়াছিলাম। ১৯৩০ সালে আমার পিতার উপর যে আয়কর ধাৰ্য্য হইয়াছিল আইন অমান্য আন্দোলনের জন্ত তিনি তাহা প্রদান করেন নাই। ১৯৩১ সালে দিল্লী সন্ধির পর আয়কর বিভাগের কর্তৃপক্ষের সহিত অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়া অবশেষে আমি উহা কিস্তিবন্দী হারে পরিশোধ করিতে সম্মত হইয়াছিলাম এবং এক কিস্তীর টাকাও দিয়াছিলাম। অর্ডিগ্যান্স জারী হওয়ার পর আমি টাকা না দিবার সংকল্প করিলাম। কৃষকদিগকে খাজনা বন্ধ করিবার পরামর্শ দিব অথচ নিজে আয়কর দিব, ইহা আমার নিকট অত্যন্ত অগ্ৰায় এবং দুর্নীতিপূর্ণ বলিয়া মনে হইয়াছিল। অতএব, আমাদের বাড়ী গভর্ণর ক্রোক করিবেন, আমি ইহা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম! যে ধারণা আমার নিকট মর্যাদাসিক্ত হইয়াছিল তাহা এই যে, আমার মাতা গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইবেন, আমাদের পুঁথি পুস্তক, কাগজ পত্র, আসবাব ও অনেক অস্থাবর সম্পত্তি—যে গুলির প্রতি আমাদের ব্যক্তিগত আসক্তি রহিয়াছে এবং অনেক স্মৃতি যাহার সহিত জড়াইয়া আছে—সে গুলি পরহস্তগত হইবে অথবা বিনষ্ট হইবে, আমাদের জাতীয় পতাকা নামাইয়া লইয়া সেখানে ইউনিয়ন জ্যাক উড্ডীন করা হইবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী হারাইবার ধারণা আমার নিকট ভালই লাগিল; ইহার ফলে জমি হইতে বঞ্চিত বহুকৃষকের সহিত আমি সমান হইব এবং তাহারাও বল ও সাহসনা লাভ করিবে। আমাদের আন্দোলনের দিক হইতে বিচার করিলে ইহা হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু গভর্ণমেন্ট অগ্ররূপ সিদ্ধান্ত করিলেন। সম্ভবতঃ আমার মাতার প্রতি স্মৃতিবেচনা বশতঃ অথবা ইহার ফলে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন বলশালী হইবে এই আশঙ্কায় তাঁহারা নিরস্ত হইলেন। বহুদিন পরে আমার কতকগুলি রেল কোম্পানীর শেয়ার আবিষ্কৃত হইল এবং আয়কর না দেওয়ার দরুণ সেগুলি বাজেয়াপ্ত করা হইল। আমার এবং আমার ভগ্নীপতির মোটর গাড়ী ইতঃপূর্বেই বাজেয়াপ্ত করিয়া বিক্রয় করা হইয়াছিল।

এই কালের আর একটি ব্যাপারেই আমি অত্যন্ত মর্যাদাহত হইয়াছিলাম। বহু মিউনিসিপালিটি ও অগ্ৰায় প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষভাবে যেখানে কংগ্রেস সদস্যরাই সংখ্যাধিক বলিয়া প্রকাশ, সেই কলিকাতা কর্পোরেশনের বাড়ী হইতেও জাতীয় পতাকা টানিয়া নামান হইয়াছিল। গভর্ণমেন্ট ও পুলিশ আদেশ অমান্য করিলে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে এই ভীতি প্রদর্শনের চাপ দিয়া পতাকা সরাইয়া ফেলিয়াছিলেন। কঠোর

আত্মপ্রচারের ধুম

ব্যবহার অর্থ সম্ভবতঃ মিউনিসিপালিটি দখল করিয়া লওয়া অথবা তাহার সদস্যদিগকে দণ্ড দেওয়া। কায়েমী স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট এরূপ ভীকৃত স্বাভাবিক এবং তাঁহাদের হয়ত এরূপ করা ছাড়া গতান্তর ছিল না; কিন্তু তথাপি আমি আহত হইলাম। আমাদের যাহা কিছু প্রিয় ও মহান এই পতাকা তাহার প্রতীকে পরিণত হইয়াছিল এবং পতাকার নীচে দাঁড়াইয়া আমরা কতবার ইহার মর্যাদা রক্ষার শপথ গ্রহণ করিয়াছি। নিজ হস্তে পতাকা অবনমিত করা অথবা অগ্ৰে উহা করিতে আদেশ দেওয়া কেবল মাত্র শপথ ভঙ্গ করা নহে। পরন্তু পবিত্রতার অপহরণসূচক ইহা মিথ্যার প্রবলতর দৈহিক বলের নিকট অবনতি স্বীকার, ইহা সত্যকে অস্বীকার, ইহা দুর্বল আত্মগত্যা। যাহারা এই ভাবে আত্মগত্যা স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা জাতীয় চরিত্রের মেরুদণ্ড বক্র করিয়াছেন এবং তাহার আত্মসম্মানে আঘাত করিয়াছেন।

তাঁহারা বীরের মত ব্যবহার করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিবেন, কেহই তাহা প্রত্যাশা করেন নাই। কেহ সম্মুখের সারিতে আসিয়া কারাবরণ করেন নাই অথবা অগ্নিবিশি দুঃখ ও ক্ষতি স্বীকার করেন নাই বলিয়া তাহার নিন্দা করা অগায় ও গহিত। প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত কর্তব্য ও দায়িত্ব আছে, কাহারও তাহা লইয়া বিচার করিবার অধিকার নাই। কিন্তু পিছনে বসিয়া থাকা বা কাজ করা এক কথা, আর সত্যকে—একজন যাহাকে নিজে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে—তাহা অস্বীকার করা আর এক কথা। জাতীয় স্বার্থের বিরোধী কোন কার্য করিতে আদিষ্ট হইলে মিউনিসিপালিটির সদস্যগণের পক্ষে পদত্যাগ করার পথ খোলাই ছিল। কিন্তু তাঁহারা স্ব স্ব আসনে অধিষ্ঠিত থাকাই সুবিবেচনার কাণ্ড বলিয়া মনে করিলেন।

“মোমাছি ফুলের উপর বসিলে আর গুঞ্জন করে না—তেমনি স্ব স্ব আসনে বসিয়া ছইগগণ মোনৌ রহিলেন।”—টমাস মুর।

আকস্মিক দরুণের মুহূর্ত্তে বিস্তর হইয়া কেহ যখন কোন কাজ করে, তখন তাহার সমালোচনা করা সম্ভবতঃ অবিচার। অতি সাহসী ব্যক্তিও ঘটনার মুহূর্ত্তে স্বায়ত্বিক দৌরবল্যে অভিভূত হয়, ইহা গত মহাযুদ্ধে বহুবার দেখা গিয়াছে। তাহার পূর্বে ১৯১২ সালে সেই স্মরণীয় টাইটানিক জাহাজ ডুবিবার সময় অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি, ঐহাদিগকে কাপুরুষ মনে করা ধারণারও অতীত, তাঁহারা অপরকে ফেলিয়া রাখিয়া মাঝি মাল্লাদের ঘুষ দিয়া পলাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছেন। অল্পদিন পূর্বে মোরো ক্যাসল্ জাহাজে অগ্নিকাণ্ডে অত্যন্ত লজ্জাকর ঘটনা ঘটিয়াছিল। দরুণের মুহূর্ত্তে কে কিরূপ

আচরণ করিবে, তাহা কেহই জানিতে পারে না, কেন না তখন যুক্তি ও সংযমের উপর আত্মরক্ষার আদিম সংস্কারই প্রবল হইয়া উঠে। অতএব, আমাদের দোষ দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ সত্য পথ হইতে ভ্রষ্ট না হইতে পারে তৎসম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করিব না, এমন কোন কথা নাই। জাতীয় তরঙ্গীর হাল যে ধরিবে, তাহার হস্ত যেন কম্পিত না হয়, প্রয়োজনের মুহূর্ত্তে তাহা পঙ্গু না হইয়া যায়, সে বিষয়ে ভবিষ্যতের জ্ঞান নিশ্চয়ই সাবধান হইতে হইবে। অক্ষমতার অহুকূলে যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া তাহাকে যথাযোগ্য ব্যবহার বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা অধিকতর গর্হিত। ব্যর্থতা অপেক্ষাও তাহা অধিকতর গুরু অপরাধ।

বিভিন্ন শক্তির সংঘর্ষ সংঘাত বহুল পরিমাণে নৈতিক শক্তি ও মস্তিষ্কের বলের উপর নির্ভর করে। এমন কি রুধির-রঞ্জিত সংগ্রাম সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। মার্সাল ফোস্ বলিয়াছেন, “সমরক্ষেত্রে চরম মুহূর্ত্তে মস্তিষ্ক বলেই জয়লাভ হইয়া থাকে।” অহিংস সংঘর্ষে চরিত্র ও মস্তিষ্কের বল আরও অধিক আবশ্যক এবং যে তাহার আচরণের দ্বারা এই চরিত্র বল কলঙ্কিত করে; এবং জাতির মনে নৈরাশ্র আনিয়া দেয়, সে আন্দোলনের অতি গুরুতর ক্ষতি করিয়া থাকে।

মাসের পর মাস যাইতে লাগিল, কত হুসংবাদ, দুঃসংবাদ শুনিলাম, এবং আমরা কারাজীবনের নীরস ও একঘেয়ে কর্মপদ্ধতিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিলাম। জাতীয় সপ্তাহ আসিল—৬ই হইতে ১৩ই এপ্রিল—আমরা জানিতাম এই সপ্তাহে অনেক কিছুই ঘটবে। ঘটিয়াছিলও অনেক। তাহার মধ্যে একটি ঘটনা আমার নিকট মুখ্য হইয়া উঠিল। এলাহাবাদে আমার মাতা কর্তৃক পরিচালিত একটি শোভাযাত্রার গতি পুলিশ রোধ করিল এবং পরে যষ্টি চালনা করিল। মিছিল থামিয়া গেলে একজন আমার মাতার জ্ঞান একখানি চেয়ার লইয়া আসিল। তিনি মিছিলের পুরোভাগে রাস্তার উপর উপবেশন করিলেন। আমার খাস মুন্সী ও অগ্নাগ্র ঠাহার। তাঁহাকে দেখিতেছিলেন, তাঁহা-দিগকে গ্রেফতার করিয়া সরাইয়া ফেলা হইল এবং তারপর পুলিশ চড়াও করিল। আমার মাতা ধাক্কা খাইয়া চেয়ার হইতে পড়িয়া গেলেন এবং তাঁহার মস্তকে পুনঃ পুনঃ বেত্রাঘাত করা হইল। মাথা কাটিয়া রক্ত ঝরিল, তিনি অজ্ঞান হইয়া রাস্তার ধারে পড়িয়া রহিলেন। ততক্ষণে রাজপথ হইতে শোভাযাত্রাকারী ও অগ্নাগ্র জনসাধারণকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে একজন পুলিশ কর্মচারী তাঁহাকে কুড়াইয়া লইয়া নিজের গাড়ীতে করিয়া ‘আনন্দ ভবনে’ রাখিয়া যান।

বেরিলী ও দেৱাডুন জেল

সেই ৰাত্ৰে এলাহাবাদে এক মিথ্যা গুজব ৱটিল যে, আমাৰ মাতাৰ মৃত্যু হইয়াছে। ক্ৰুদ্ধ জনতা দলবদ্ধ হইল, শাস্তি ও অহিংসাত কথাতুলিয়া গিয়া পুলিচকে আক্ৰমণ কৰিয়া বসিল এবং পুলিচৰ গুলি বৰ্ণণে কয়েকজনৰ মৃত্যু হইল।

ঘটনাৰ কয়েকদিন পৰা আমি এই সকল সংবাদ (আমাৰিগকে সাপ্তাহিক সংবাদপত্ৰ দেওয়া হইত) পাইলাম। আমাৰ বৃদ্ধা দুৰ্ব্বলা জননী বক্তান্ত দেহে ধূলিমলিন ৰাজপথে পড়িয়া আছেন, এই কল্পনা আমাকে উন্নত কৰিয়া তুলিল। আশ্চৰ্য্য, আমি সেখানে উপস্থিত থাকিলে না জানি কি কৰিতাম! আমাৰ অহিংসাত কতখানি অটুট থাকিত? আমাৰ আশঙ্কা হয়, সেই দৃশ্য দেখিয়া সহজেই দীৰ্ঘ দ্বাদশ বৰ্ষৰ শিক্ষা-ও অভিজ্ঞতা তুলিয়া বাইতাম এবং কি ব্যক্তিগত কি জাতীয় ফলাফল আমি অল্লই চিন্তা কৰিতাম।

তিনি অল্ল অল্ল আৰোগ্য লাভ কৰিলেন, যখন পৰেৰ মাসে তিনি বেরিলী জেলে আমাকে দেখিতে আসিলেন, তখন তাঁহাৰ মাথায় পটি বাঁধা ছিল। কিন্তু তিনি আমাদেৰ স্নেহাসেবিক! ও কৰ্মীদের সহিত একত্ৰে যষ্টিচালনা ও বেড়াঘাতের অংশ গ্রহণ কৰিয়াহেন বলিয়া অত্যন্ত গৰ্ব ও হৰ্ষ প্ৰকাশ কৰিলেন। যাহা হউক, আৰোগ্য লাভ কৰিলেও সেই বয়সে এই গুরুতৰ আঘাতবেদনা তাঁহাৰ দেহ-যন্ত্ৰকে বিকল কৰিয়াছিল; এবং এক বৎসৰ পৰে উহাৰ গভীৰতৰ লক্ষণ-গুলি অত্যন্ত সঙ্কটজনক আকাৰে দেখা দিয়াছিল।

৪৩

বেরিলী ও দেৱাডুন জেল

ছয় সপ্তাহ পৰে আমাকে নৈনী জেল হইতে দেৱাডুন জেলে বদলী কৰা হইল। আমাৰ স্বাস্থ্য পুনৰায় খাৰাপ হইল এবং প্ৰত্যহ একটু জ্বৰ হইতে লাগিল, ইহাতে আমি অত্যন্ত বিৰক্ত হইলাম। চাৰ মাস বেরিলীতে কাটাইলাম। গ্ৰীষ্ম প্ৰচণ্ড হইয়া উঠিলে আমাকে অপেক্ষাকৃত শীতল হিমালয়ের পাদদেশে দেৱাডুন জেলে বদলী কৰা হইল। এখানে আমি, আমাৰ দুই বৎসৰ কাৰাদণ্ডেৰ প্ৰায় শেষ পৰ্য্যন্ত অৰ্থাৎ একাদিক্ৰমে সাড়ে

জওহরলাল নেহরু

চৌদ্দমাস ছিলাম। দেখা শুনা, চিঠিপত্র ও নির্বাচিত সংবাদ-পত্র হইতে কিছু কিছু সংবাদ পাইতাম বটে, কিন্তু বাহিরের ঘটনাবলীর সহিত আমার যোগসূত্র ছিল হইয়া গেল, কেবল প্রধান ঘটনাগুলি অস্পষ্টভাবে মনে আছে মাত্র।

আমার কারামুক্তির পর ব্যক্তিগত ব্যাপার ও তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি লইয়া কার্যে আত্মনিয়োগ করিলাম। কিন্তু পাঁচমাসের কিছু অধিককাল স্বাধীনতা ভোগ করিয়া পুনরায় আমাকে কারাগারে আসিতে হইল, তদবধি এইখানেই আছি। এইরূপে তিন বৎসরের অধিকাংশ সময় কারাগারে কাটিয়াছে,—ফলে ঘটনাবলীর সহিত আমার যোগ ছিল না, এবং এই কালের ব্যাপারগুলি বিশদভাবে জানিবার আমি বিশেষ স্ত্রযোগ পাই নাই। যে বৈঠকে গান্ধিজী যোগ দিয়াছিলেন, সেই দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক সম্বন্ধেও আজ পর্য্যন্ত আমার ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট। এ বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার কোন কথা বলিবারই স্ত্রযোগ হয় নাই, তিনি অথবা অন্য কাহারও সহিত পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি আলোচনা করিতে পারি নাই।

১৯৩২ ও ১৯৩৩—এই দুই বৎসর কালে আমাদের জাতীয় সংঘর্ষের গতিপথ আলোচনা করিবার মত আমি বিশেষ কিছুই জানি না। কিন্তু আমি রক্তমঞ্চ জানি, ইহার নেপথ্যভূমি ও অভিনেতাগণ আমার সুপরিচিত, কাজেই আমি সহজাত বুদ্ধি হইতে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনারও মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি। প্রথম চারিমাসকাল নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন দৃঢ়তার সহিত চলিল, তারপর ক্রমশঃ তাহা শিথিল হইয়া আসিল। মাঝে মাঝে কোথাও বা কদাচিৎ স্থানীয় সংঘর্ষ দেখা দিত। কোনও প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ-মূলক আন্দোলন বৈপ্লবিক উচ্চ গ্রামে অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না। ইহা স্থিতিশীল নহে বলিয়াই হয় উপরে উঠিবে নয় নীচে নামিবে। নিরুপদ্রব প্রতিরোধ, প্রথম উৎসাহের অবসানে দীর্ঘে দীর্ঘে নীচে নামিয়া আসিল। কিন্তু মন্দীভূত অবস্থায়ও ইহা দীর্ঘকাল চলিতে পারে। বে-আইনী ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও নিম্নলি ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান অনেকাংশে সাফল্যের সহিত কার্য্য চালাইতে লাগিল। ইহার সহিত প্রাদেশিক কর্ম্মীদের যোগ ছিল, কর্ম্ম-নির্দেশাদি প্রেরণ, আন্দোলনের সংবাদাদি আদান-প্রদান এবং কখনও বা আর্থিক সাহায্যও প্রদান করা হইত।

প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলিও অল্পবিস্তর সাফল্যের সহিত কাজ চালাইতেছিল। যে কয় বৎসর আমি জেলে ছিলাম, অন্ত্যন্ত প্রদেশের তখনকার খবর আমি বেশী জানি না, তবে আমি কারামুক্তির পর কার্য্যপ্রণালীর কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলাম। যুক্ত-প্রদেশের কংগ্রেস কার্যালয় নিয়মিত ভাবে ১৯৩২ সালে কার্য্য পরিচালনা করিয়াছে; এবং গান্ধিজীর পরামর্শে কংগ্রেসের অস্থায়ী

বেরিলী ও দেয়াতুন জেল

সভাপতি আইন অমান্ত আন্দোলন প্রথম স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া পর্যন্ত (১৯৩৩ সালের মধ্যভাগ) ইহা বরাবর কাজ চালাইয়া গিয়াছে। এই কালের মধ্যে ইহা প্রত্যেক জিলায় সর্বদাই কর্মনির্দেশ প্রদান করিয়াছে, মুক্তিত অথবা সাইক্লোষ্টাইল যন্ত্রে ছাপা ইস্তাহারাদি নিয়মিত ভাবে প্রকাশ করিয়াছে, মাঝে মাঝে জিলার কার্য পরিদর্শন করিয়াছে, এবং আমাদের কর্ম্মীদিগকে যথা নিয়মে ভাতা দিয়াছে। অবশ্য ইহার অধিকাংশই গোপনে করিতে হইত, কিন্তু প্রাদেশিক কমিটির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সর্বদাই প্রকাশ্যে কাজ করিতেন এবং তিনি গ্রেফতার হইলে অপরে তাঁহার স্থান গ্রহণ করিত।

১৯৩০ ও ৩২-এর অভিজ্ঞতা হইতে আমরা দেখিয়াছি, সমস্ত ভারতবর্ষে গুপ্তভাবে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা অতি সহজ। বাধা সত্ত্বেও বিশেষ চেষ্টা না করিয়াও এবিষয়ে আমরা কৃতকার্য হইয়াছিলাম। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকে মনে করিতেন যে, নিরুপদ্রব প্রতিরোধের আদর্শের সহিত এই গোপনতা খাপ খায় না এবং এই কারণে জনসাধারণ নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল। বৃহৎ প্রকাশ্য গণ-আন্দোলনের অতি ক্ষুদ্র অংশ রূপে ইহা অনেকাংশে কার্যকরী কিন্তু ইহার একটা আশঙ্কার দিকও আছে। বিশেষ ভাবে যখন আন্দোলন মন্দীভূত হইয়া আসে তখন কিছু কিছু নিফল গুপ্ত প্রচেষ্টা গণ-আন্দোলনের স্থান গ্রহণ করে। ১৯৩৩ সালের জুলাই মাসে গান্ধিজী সর্ববিধ গোপনতার নিন্দা করিয়াছিলেন।

যুক্তপ্রদেশ ছাড়াও গুজরাট ও কর্ণাটকে কিছুকাল যাবৎ কৃষকদের মধ্যে খাজনা বন্ধ আন্দোলন চলিয়াছিল। গুজরাট ও কর্ণাটকে কৃষক-জমিদারেরা গভর্ণমেন্টকে খাজনা দিতে অস্বীকার করায় অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে সম্পত্তি ও জমি হইতে বঞ্চিত দুর্দশাগ্রস্ত কৃষকদিগকে সাহায্য করিবার চেষ্টা হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাহা সামান্য। যুক্তপ্রদেশের ভূমিবঞ্চিত রায়তদের, প্রাদেশিক কংগ্রেস সাহায্য করিবার কোন চেষ্টাই করেন নাই। এখানে সমস্তা অনেক বৃহত্তর (কৃষক-জমিদার অপেক্ষা রায়তদের সংখ্যা বহুগুণে অধিক); এবং অঞ্চলও অধিকতর বিস্তীর্ণ। প্রাদেশিক কংগ্রেসের সাহায্য করিবার ক্ষমতাও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এই আন্দোলনে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এমন সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে সাহায্য করা আমাদের সাধ্যাতীত ছিল, অর্দ্ধশনক্লিষ্ট সাহায্যপ্রার্থী কৃষকগণ হইতে পূর্বোক্ত শ্রেণীকে পৃথক করিয়া দেখাও অতি কঠিন। মাত্র কয়েক সহস্রকে সাহায্য করিতে গেলেই বিব্রত হইতে হইত এবং মনোমালিন্য দেখা দিত। এই কারণে

জওহরলাল নেহরু

আমরা প্রথম হইতেই অর্থ সাহায্য না করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম এবং তাহা সর্বসাধারণকে জানাইয়া দিয়াছিলাম। কৃষকেরাও আমাদের অবস্থা ও মনোভাব সহানুভূতির সহিত গ্রহণ করিয়াছিল। কোন অভিযোগ না করিয়া বা অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া তাহারা যে কতদূর সহ্য করিয়াছিল, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে, বিশেষতঃ কারারুদ্ধ কর্মীদের স্ত্রীপুত্রদিগকে কিছু কিছু সাহায্য দানের চেষ্টা আমরা করিয়াছি। এই হতভাগ্য দেশের দারিদ্র্য এত অধিক যে, মাসিক একটাকা সাহায্য করিলেও লোকে তাহা দৈব প্রেরিত বলিয়া মনে করে।

এই আন্দোলনকালে যুক্তপ্রাদেশিক কমিটি (বে-আইনী প্রতিষ্ঠান) কর্মীদের নিয়মিতভাবে যৎসামান্য ভাতা দিয়াছে এবং তাহারা জেলে গেলে তাহাদের পরিবারবর্গকে ভরণপোষণ করিয়াছে। ইহা একটা মোটা খরচের অঙ্ক, তারপর ছাপার খরচ, পুস্তিকা ও বিজ্ঞাপন সাইক্লোষ্টাইল যন্ত্রে ছাপাইবার খরচও একটা মোটা অঙ্ক। ইহা ছাড়া, যাতায়াত খরচ ছিল এবং অপেক্ষাকৃত গরীব জেলাগুলিকে সাহায্য করিতে হইত। এতং সত্ত্বেও এক শক্তিশালী সম্ভবন্ধ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন পরিচালনা করিতে গিয়া যুক্তপ্রাদেশিক কমিটি ১৯৩২-এর জানুয়ারী হইতে ১৯৩৩-এর আগষ্ট পর্য্যন্ত এই বিশ মাসে মাত্র ৬৩,০০০ টাকা অর্থাৎ মাসে ৩১৪০ টাকা করিয়া ব্যয় করিয়াছে। (এই হিসাবে অবশ্য শক্তিশালী ও অধিকতর স্বচ্ছল এলাহাবাদ, আগ্রা, কাণপুর ও লঙ্কৌ জেলা কংগ্রেস কমিটির ব্যয় ধরা হয় নাই।) প্রদেশ হিসাবে ১৯৩২ ও ৩৩-এ যুক্তপ্রদেশ বরাবর সংঘর্ষের পুরোভাগেই ছিল এবং আমার বিবেচনায় ফল দেখিয়া বিচার করিলে তুলনায় ব্যয় অতি সামান্যই হইয়াছে। আইন অমান্য আন্দোলন বিনষ্ট করিবার জন্ত প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট যে বিশেষ ব্যয় করিয়াছেন, তাহার সহিত এই সামান্য ব্যয় তুলনা করিলে অনেক শিক্ষা লাভ করা যাইতে পারে। আমার ধারণা (যদিও আমার ভাল জানা নাই), আরও কয়েকটি প্রধান কংগ্রেস প্রদেশে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী ব্যয় হইয়াছিল। কংগ্রেসের দৃষ্টিতে বিহার তাহার প্রতিবেশী যুক্তপ্রদেশের তুলনায় অধিকতর দরিদ্র হইলেও আমাদের সংঘর্ষে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত কাজ করিয়াছিল।

যাহা হউক, নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিল, তবুও ইহা কোন মতে চলিতে লাগিল, অবশ্য তাহাতেও কৃতিত্বের অভাব ছিল না। কিন্তু গতিপথে ইহা আর গণ-আন্দোলন রহিল না। গভর্নমেন্টের তীব্র দমন নীতি ছাড়াও ১৯৩২-এর সেপ্টেম্বরে ইহা এক প্রচণ্ড আঘাত

বেরিলী ও দেৱাভন জেল

পাইল। গান্ধিজী হরিজন সমস্তা লইয়া এই প্রথমবার অনশনব্রত গ্রহণ করিলেন। এই অনশন লইয়া জনসাধারণ চঞ্চল হইয়া উঠিল; কিন্তু তাহাদের চিন্তার মোড় অতৃদিকে ঘুরিয়া গেল। অবশেষে, ১৯৩৩-এর মে মাসে আন্দোলন স্থগিত হওয়ায় কার্যাতঃ নিরুপদ্রব প্রতিরোধের মৃত্যু হইল। পরে কার্যালেশহীন মতবাদ রূপে উহা কিছুকাল চলিয়াছে মাত্র। অবশ্য ইহা সত্য যে, ঐরূপে স্থগিত না করা হইলেও ইহা ক্রমে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত। দমন নীতির কঠোরতা ও পীড়নে ভারতবর্ষ মূচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। জাতির মানসিক শক্তি সাময়িক ভাবে নিঃশেষিত হইল, পুনরায় তাহা ভরিয়া তোলা গেল না। ব্যক্তিগত ভাবে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ করিতে পারেন এমন ব্যক্তি অনেকেই ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা এক প্রকার কৃত্রিম পারিপাশ্বিক ব্যবস্থার মধ্যে কাজ করিতেছিলেন।

জেলে বসিয়া এক মহান আন্দোলনের ক্রমশঃ শোচনীয় পরিণতির সংবাদ পাওয়া আমাদের পক্ষে আনন্দের ব্যাপার ছিল না। তবে আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই একটা দৃষ্টমান সাফল্য প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। যদি জন-জাগরণ অদম্য হইয়া উঠে, তাহা হইলে অঘটন ঘটিলেও ঘটিতে পারে, এমন প্রত্যাশাও ছিল বটে, কিন্তু তাহার উপর নির্ভর করা চলে না। কখনও নীচে, কখনও উপরে, কখনও বা স্তব্ধ হইয়া দীর্ঘকাল সংঘর্ষ চলিবে এবং ইহাশ মধ্যেই জনসাধারণকে স্থগ্ধালিত, ঐক্যবদ্ধ কাষাপ্রণালী ও সম্প্রষ্ট মতবাদে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে, আমরা এইরূপ ভাবিতে লাগিলাম। ১৯৩২-এর প্রথমভাগে একসময়ে আমি দ্রুত দৃষ্টমান সাফল্যের আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তাহার ফলে আপোষ অনিবাধ্য হইয়া উঠিত এবং ‘সরকার পক্ষীয়’ ও স্ববিধাবাদীরাই তাহার পূর্ণ স্বযোগ গ্রহণ করিত। ১৯৩১-এর অভিজ্ঞতায় আমাদের চোখের পর্দা খুলিয়া গিয়াছিল। যখন জনসাধারণ দৃঢ় থাকে এবং তাহাদের ধারণা স্পষ্ট থাকে, তখন সাফল্য আসিলেই তাহারা তাহার স্ববিধা গ্রহণ করিতে পারে। অত্যাচার জনসাধারণ যুদ্ধ করে, ত্যাগ স্বীকার করে এবং স্বযোগের মুহূর্তে, অত্যাচার ব্যক্তির দ্বিবা আরায়ে বাহিরে আসিয়া তাহাদের অজ্ঞিত সম্পদ হস্তগত করে। এই আশঙ্কা পূর্ণমাত্রায় বিচ্যমান ছিল, কংগ্রেসের মধ্যেও অনেকে শিথিলভাবে চিন্তা করিতেন, আমরা কি প্রণালীর গভর্ণমেন্ট বা সমাজ চাহি, সে সম্বন্ধে অনেকেরই কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। অনেক কংগ্রেসপন্থী, বর্তমান গভর্ণমেন্টের বিশেষ পরিবর্তন চাহেন না, কেবল ব্রিটিশ বা বিদেশীয় পরিবর্তে স্বদেশী-মার্কী শাসক হইলেই তাঁহারা যথেষ্ট মনে করেন।

জওহরলাল নেহরু

আদি ও অকৃত্রিম ‘সরকার-পন্থী’দের অবশ্য গণনার মধ্যেই আনা উচিত নহে, কেন না তাঁহাদের জীবনের প্রথম ও প্রধান মূলনীতি—রাষ্ট্রের ক্ষমতা যাহার হাতে থাকিবে, তাহারই আনুগত্য স্বীকার। এমন কি, মডারেট ও রেসপনসিভিটিয়ারী ও গভর্ণমেণ্টের মতবাদ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কলে, তাঁহাদের সাময়িক সমালোচনাগুলি নিষ্ফল ও তুচ্ছ হইয়া যাইত। ইহারা সর্বদা সকল ক্ষেত্রে অত্যন্ত আইননিষ্ঠ, ইহা সকলেই জানেন, এবং এই কারণে ইহারা কখনও নিরুপদ্রব প্রতিরোধ সমর্থন করিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহারা আরও অগ্রসর হইয়া গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সারি দিয়া দাঁড়াইলেন। সর্ববিধ ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে দমন করিবার উদ্যম তাঁহারা ভয়চকিত নীরব দর্শকের মত দেখিতে লাগিলেন। ইহা কেবল গভর্ণমেণ্টের আইন অমান্য আন্দোলনের সম্মুখীন হইয়া উহাকে দমন করার প্রস্ন নহে, সর্ববিধ রাজনৈতিক কার্য্যই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, অথচ ইহার বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারিত হইল না। ইহারা সাধারণতঃ ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা করেন, তাঁহারা আন্দোলনের সহিত জড়িত হইয়া পড়িলেন এবং সরকারী পীড়নের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে অস্বীকার করিবার শাস্তিও গ্রহণ করিলেন; অগ্নাগ্ন সকলে ভয়ান্ত হইয়া হীনভাবে বশুতা স্বীকার করিলেন; কোন সমালোচনা তাঁহাদের কণ্ঠস্বরে ফুটিল না। মুহূ সমালোচনাকালেও কত অহুনয় বিনয় এবং তাহার সহিত কংগ্রেস এবং সংঘর্ষ পরিচালনাকারীদের তীব্র নিন্দা যোগ করিয়া দেওয়া হইত।

পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ব্যক্তিস্বাধীনতার অহুকূলে শক্তিশালী জনমত গড়িয়া উঠিয়াছে, উহা সঙ্কুচিত করিবার এতোকটি চেষ্টার ত্রুড় প্রতিবাদ হয়। (সম্ভবতঃ ইহা এখন অতীত ইতিহাসের কথা।) এমন বহু ব্যক্তি আছেন, ইহারা নিজেরা কোন প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক আন্দোলনে যোগ দিতে চাহেন না, অথচ বক্তৃতা ও লিখিবার স্বাধীনতা, সভ্য ও সমিতি গঠন, ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে অবিরত আন্দোলন করিয়া থাকেন। ভারতীয় উদারনীতিকগণ ব্রিটিশ উদারনীতিকদের মত ও আদর্শ অহুকরণ করিয়া চলিবার দাবী করেন (যদিও এক নাম ছাড়া ইহাদের মধ্যে আর কোন সাদৃশ্য নাই)। এই সকল স্বাধীনতা সঙ্কোচের অন্ততঃ বাচনিক প্রতিবাদও তাঁহাদের নিকট প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, কেন না ইহাতে তাঁহাদেরও অস্ববিধা হয়। কিন্তু তাঁহারা সেরূপ কিছুই করেন না। ইহারা ভলতেয়ারের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া বলিতে পারেন না . যে,—

বেরিলী ও দেয়াতুন জেল

“আমি তোমার বক্তব্যের সহিত সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন মতাবলম্বী ; কিন্তু তোমার উহা বলিবার অধিকার আমি মৃত্যুবরণ করিয়াও রক্ষা করিব।”

সম্ভবতঃ ইহার জগৎ তাঁহাদের দোষ দেওয়া উচিত নহে, কেন না তাঁহারা কখন নিজেদের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার সমর্থক বলিয়া ঘোষণা করেন নাই। তাঁহারা এমন অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছিলেন যে, একটি শিথিল বাক্যের ফলে বিপদে পড়িতে হইত। ভারতে দমন নীতি, স্বাধীনতার প্রাচীন উপাসক ব্রিটিশ লিবারেলগণ এবং ব্রিটিশ শ্রমিকদলের নূতন সমাজতন্ত্রীদের উপর যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা আলোচনা করা অধিকতর প্রাসঙ্গিক। দুঃখের হইলেও তাঁহারা যথাসম্ভব ধীরতা রক্ষা করিয়া ভারতীয় দমন নীতির অচ্যুতানগুলি দেখিতেন, এবং ‘মাঞ্চেস্টার গাডিয়ানের’ জনৈক পত্র লেখকের ভাষায়, “দমন নীতির বৈজ্ঞানিক প্রয়োগের” সাফল্য দেখিয়া সন্তোষলাভ করিতেন। সম্প্রতি গ্রেট ব্রিটেনের গ্রাশনাল গভর্নমেন্ট একটি সিডিসান বিল পাশ করাইতে উদ্যোগী হওয়ায় তাহার অনেক কিছু সমালোচনা হইয়াছে। বিশেষভাবে লিবারেল ও শ্রমিকদলের সদস্যগণ, অগাধ ক্রোধের সহিত এই আপত্তি প্রকাশ করেন যে, ইহার ফলে বক্তৃতা করিবার স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটদিগকে খানাতল্লাসীর পরোয়ানা জারী করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইবে। এই সকল সমালোচনা পাঠ করিলে আমার চিত্তে সহানুভূতির উদ্রেক হয়, সঙ্গে সঙ্গে ভারতের কথাও মনে পড়ে, এখানে অধুনা যে সকল আইন প্রচলিত রহিয়াছে, প্রস্তাবিত ব্রিটিশ সিডিসান বিল অপেক্ষা তাহা অস্তুতঃ শতগুণে অধিক মন্দ। যে সকল ব্রিটেনবাসী ইংলণ্ডে একটি মশা দেখিয়া ভীত হন, তাঁহারা ভারতে অগ্নান বদনে উট গিলিয়া ফেলেন, ইহা দেখিয়া আমি বিস্মিত হই। প্রত্যেক সাম্রাজ্যনৈতিক উদ্দেশ্যের মধ্যোই সাধুতা দেখা, বৈষয়িক স্বার্থের অল্পপাতে নৈতিক আদর্শ ঠিক করিয়া লওয়ার ব্রিটিশ জাতির আশ্চর্য্য দক্ষতা আমি প্রশংসমান দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি। গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার অপহৃৎকারী বলিয়া তাঁহারা সরল বিশ্বাস ও নৈতিক ক্ষোভের সহিত হিটলার ও মুসোলিনীকে নিন্দা করিয়া থাকেন। আবার অল্পরূপ সরল বিশ্বাস লইয়া তাঁহারা ভারতে স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করিবার ব্যবস্থাগুলি নির্বিকার চিত্তে দর্শন করেন। উহা যে অপরিহার্য্য প্রয়োজন, তাহা উচ্চাঙ্গের নৈতিক যুক্তি দিয়া তাঁহারা বুঝাইয়া দেন। প্রকৃত নিরপেক্ষ ব্যবহার করিতে হইলে উহা করা ছাড়া তাঁহাদের গতাস্তর নাই !

যখন ভারতে বহু নরনারী অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন, তখন স্বদূর লণ্ডনে বাছা বাছা ব্যক্তির মিলিত হইয়া ভারতের জগৎ শাসনতন্ত্র রচনা

জওহরলাল নেহরু

করিতে লাগিলেন। ১৯৩২ সালে তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক এবং বহুস্তর কমিটির ব্যবস্থা হইল, ব্যবস্থা পরিষদের বহু সদস্যকে ঐ সকল কমিটির সদস্য করা হইল যাহাতে তাহারা কর্তব্য পালনের সহিত ব্যক্তিগত আনন্দও উপভোগ করিতে পারেন। সরকারী খরচায় এক বৃহৎ জনতা লগুনে গেল। ১৯৩৩ সালে ভারতীয় এসেসরদের লইয়া জয়েন্ট কমিটি বসিল, আবার উদার গভর্ণমেন্ট সাক্ষ্য দিবার জন্ত একদল লোককে রাহাখরচ দিয়া বিলাতে পাঠাইলেন। ভারতের সেবা করিবার আন্তরিক আগ্রহে জনসাধারণের অর্থে অনেকে আবার সমুদ্র পাড়ি দিলেন। শোনা যায়, রাহাখরচের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্ত অনেকে দরকষাকষি করিয়াছিলেন।

ভারতে গণ-আন্দোলন দেখিয়া ভীত কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধিগণ লগুনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হুশীতল ছায়ায় আশ্রয়ে সমবেত হইবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। কিন্তু যখন মাতৃভূমি জীবন মরণ সংঘর্ষে প্রবৃত্ত, তখন কোন ভারতীয়ের এই শ্রেণীর ব্যবহার দেখিলে আমাদের জাতীয়তাবোধ আহত হয়। কিন্তু একটি কারণে আমাদের অনেকের নিকট ইহা শুভ লক্ষণ বলিয়াই মনে হইয়াছিল, আমরা ভাবিলাম (এখন দেখিতেছি, ভুল) ইহা চূড়ান্তভাবে ভারতের প্রগতিবিরোধীদের সহিত প্রগতিপন্থীদের বিচ্ছেদ ঘটিল। এই ভাগাভাগির ফলে জনসাধারণ রাজনৈতিক শিক্ষালাভ করিবে এবং সকলেই স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিবে যে, কেবলমাত্র স্বাধীনতা দ্বারাই আমরা সামাজিক সমস্যাগুলি সমাধান ও জনসাধারণকে দুর্ভিক্ষ ভারমুক্ত করিতে পারি।

কিন্তু এই সমস্ত ব্যক্তির কেবল তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় নহে, চিন্তা ও চরিত্রের দিক হইতেও ভারতীয় জনসাধারণ হইতে যে কতখানি পৃথক হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইহাদের মধ্যে কোন যোগসূত্র নাই। এত ত্যাগ স্বীকার, এত দুঃখবরণ যে কিসের প্রেরণায়, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। এই সমস্ত খ্যাতিনামা রাজনৈতিকের নিকট একটি মাত্র বাস্তব সত্য—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শক্তি—যাহার বিরুদ্ধতা করিয়া কোন লাভ নাই, অতএব ভাল হউক মন্দ হউক ইহাকে স্বীকার করাই কর্তব্য। একথা তাঁহাদের চিন্তে কখনও উদয় হয় না যে, জনসাধারণের শুভেচ্ছা ব্যতীত ভারতের কোন সমস্যার সমাধান অথবা প্রকৃত জীবন শাসনতন্ত্র রচনা করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব। মিঃ জে, এ, স্পেন্ডার তাঁহার সত্ত্ব প্রকাশিত “সমসাময়িক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস”—এ লিখিয়াছেন যে, কিরূপে নিয়মতান্ত্রিক সঙ্কটের অবসানকল্পে আহূত ১৯১০ সালের আইরিশ জয়েন্ট কন্ফারেন্স বার্থ হইয়াছিল। তিনি

বেরিলী ও দেৱাছন জেল

বলিয়াছেন যে, যে শ্রেণীর লোক বাড়ীতে আগুন লাগিলে তাহা বীমা করিবার জন্ত ব্যস্ত হয়, সেই শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতারাও সঙ্কটের সময় শাসনতন্ত্র রচনার জন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়ে। ১৯১০ সালের আয়ারলণ্ডের অপেক্ষাও ১৯৩২—৩৩ সালে ভারতবর্ষে অধিকতর অগ্নি ছিল এবং যদিও শিখা নিবিয়া গিয়াছে তথাপি ভস্মাচ্ছাদিত জলস্ত অন্ধাব বহুদিন বিজ্ঞান থাকিবে, তাহা ভারতের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার মতই উত্তপ্ত ও অতৃপ্ত।

ভারতবর্ষে শাসকদের মধ্যে হিংসাপ্রবৃত্তি অতি আশ্চর্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবশ্য ইহার ধারা পুরাতন এবং এই দেশ ব্রিটিশ কড়ক প্রধানতঃ পুলিশ রাষ্ট্ররূপেই শাসিত হইয়া আসিতেছে। এমন কি সিভিলিয়ান শাসকবৃন্দের প্রভুত্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গীও সামরিক ধরণের: যেন বিজিত দেশ বলপূর্বক দখলকারী সৈন্যদলের শত্রুতামূলক মনোভাব। বর্তমান ব্যবস্থার ঝিকড়ে গুরুতর দ্বন্দ্বের অবতারণা হওয়ায় এই মনোভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাঙ্গলা ও অন্যান্য অন্তর্গত টেরোরিজমের ফলে আমলাতান্ত্রিক হিংসাবৃত্তির খোরাক জুটে এবং ইহা হইতে তাঁহারা নিজেদের কার্যের বৈধতা প্রতিপন্ন করেন। বহুতর অভিলাস্ত এবং গভর্ণমেণ্টের নীতির ফলে শাসক ও পুলিশদের হাতে এত প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে, কার্যতঃ ভারতবর্ষ পুলিশরাজের অধীন হইয়া পড়িয়াছে এবং ইহার কোন প্রতিষেধক ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে।

অল্পবিস্তর ভারতের প্রত্যেক প্রদেশকেই তীব্র দমন নীতির অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছে; কিন্তু সীমান্তপ্রদেশ ও বাঙ্গলাই হুঃখ ভোগ করিয়াছে সর্বাধিক। সংযুক্ত প্রদেশ সর্বদাই প্রধান সামরিক কেন্দ্র এবং ইহার শাসন কার্যও অর্দ্ধ সামরিক নিয়ম প্রণালীতে হইয়া থাকে। ইহার সামরিক গুরুত্ব অধিক থাকায় ‘লালকুর্ভা’ আন্দোলনে গভর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণরূপে বিচলিত হইলেন। এই প্রদেশকে ‘শান্ত’ করিবার জন্ত সৈন্যদল কুচকাওয়াজ করিতে লাগিল এবং “হুদ্দাস্ত গ্রামগুলিকে” সায়েস্তা করিতে লাগিল। সমস্ত ভারতবর্ষে গ্রামগুলির উপর অত্যধিক পাইকারী জরিমানা ধাৰ্য্য করা এবং কখনও কখনও সহরেও (বিশেষতঃ বাঙ্গলায়) উহা ধাৰ্য্য করা সচরাচরের ব্যবস্থা হইয়া উঠিল। কোথাও বা পিটুনী পুলিশ বসান হইত এবং যাহাদের অপরিমিত ক্ষমতা অথচ সংঘমের ব্যবস্থা নাই সেখানে পুলিশের অতিশাসন অনিবার্য। শান্তি ও শৃঙ্খলার নামে বিশৃঙ্খলা ও বে-আইনী ঘটনার দৃষ্টান্ত আমরা বহু দেখিয়াছি।

বাঙ্গলার কোন কোন অংশে এক আশ্চর্য্য দৃশ্যের অবতারণা হইল। গভর্ণমেণ্ট সমস্ত অধিবাসীদিগকে (অথবা ঠিক ঠিক বলিতে হইলে হিন্দু

জওহরলাল নেহরু

অধিবাসীদিগকে) শত্রু বলিয়া ধরিয়া লইলেন এবং প্রত্যেককে—বার হইতে পচিশ বৎসর বয়স্ক নর ও নারী, বালক-বালিকা—পরিচয়পত্র রাখিতে হইবে এই ব্যবস্থা হইল। বহিষ্কার, অন্তরীণ, পোষাক সম্পর্কে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা, স্কুলগুলি নিয়ন্ত্রণ অথবা বন্ধ, বাইসাইকেল চড়া নিষেধ, পুলিশ গতিবিধির সংবাদ দান, সাক্ষ্য আইন, সামরিক রুটমার্চ, পিটুনী পুলিশ, পাইকারী জরিমানা এবং অগ্নাশ্রু আরও অনেক বিধিনিষেধ প্রবর্তিত হইয়াছিল। বিস্তৃত অঞ্চল যেন সামরিক বল দ্বারা অবরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল এবং অধিবাসীরা, নরনারী প্রত্যেকেই কঠোর নজরবন্দী হইয়া যেন ছুটির ছাড়পত্র হাতে করিয়া অবস্থান করিতেছিল। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের মতে এই সকল আশ্চর্য্য ব্যবস্থা ও বিধিনিষেধ প্রয়োজন হইয়াছিল কি না সে বিচারের অধিকার আমার নাট। যদি ইহার প্রয়োজন না হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করার, অপমানিত করার, পীড়ন করার গুরুতর অপরাধে গভর্ণর নিশ্চয়ই দোষী সাব্যস্ত হইবেন। যদিও এইগুলির প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইহা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বার্থতার চূড়ান্ত প্রমাণ।

এই হিংসামূলক মনোভাব আমাদের পিছু পিছু কারাগারে গিয়াও উপস্থিত হইল। কারাগারে শ্রেণীবিভাগ একটা গ্রহসন মাত্র। যাহারা উচ্চশ্রেণী ভুক্ত হইলেন, তাঁহাদের পক্ষেও উহা এক পীড়ন হইয়া উঠিল। অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিকেই উচ্চশ্রেণী ভুক্ত করা হইয়াছিল এবং বহু সূক্ষ্ম অহুভূতিপ্রবণ নরনারী এমন অবস্থার মধ্যে পতিত হইলেন, যাহা অবিরাম এক মানসিক যন্ত্রণাবিশেষ। গভর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিয়াই রাজনৈতিক বন্দীদের অবস্থা সাধারণ কয়েদীদের অপেক্ষাও কঠোর ও দুঃখপূর্ণ করিতে লাগিলেন। কারাবিভাগের জৈনিক ইনসপেক্টর জেনারেল সমস্ত কারাগারে এক গুপ্ত ইস্তাহার দ্বারা আইন অমান্য আন্দোলনের বন্দীদিগকে “কঠোর ব্যবহার” করিবার অহুজ্জা প্রচার করিয়াছিলেন।* জেলে বেত্রদণ্ড সচরাচরের শাস্তি হইয়া উঠিল। ১৯৩৩-এর ২৭শে এপ্রিল পার্লামেন্টে সহকারী ভারতসচিব বলিয়াছিলেন যে, “১৯৩২-এ আইন

* এই ইস্তাহার ১৯৩২-এর ৩০শে জুন প্রচারিত হয়। ইহাতে ইহাও লিখিত ছিল যে, “ইনসপেক্টর জেনারেল, জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্টগণ ও অধস্তন কর্মচারীদের এই ঘটনাটা বুঝাইয়া দিতে চাহেন যে, আইন অমান্য ঘটিত বন্দীদের প্রতি পক্ষপাতমূলক ভাৱ ব্যবহার করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। এই শ্রেণীর কয়েদীদিগকে যথাস্থানে রাখিয়া কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।”

বেরিলী ও দেৱাতুল জেল

অমাত্ৰ আন্দোলন সংগ্ৰিষ্ট অপৰাধে ৫০০ জন বেত্ৰদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, ইহা স্তাৱ শ্ৰামুয়েল হোৱ অবগত আছেন।” জেল-শৃংখলা ভঙ্গ কৰিবাৰ অপৰাধে বাহাৰা বেত্ৰদণ্ড পাইয়াছে, সেই সংখ্যা ইহাৰ মধ্যে ধৰা হইয়াছে কিনা পৰিষ্কাৰ ভাবে বুঝিবাৰ উপায় নাই। ১৯৩২ সালে আমৰা জেলে প্ৰায়ই বেত্ৰদণ্ডেৰ সংবাদ পাইতাম। একটী কি দুইটি বেত্ৰদণ্ডেৰ প্ৰতিবাদস্বৰূপ আমৰা ১৯৩০-এৰ ডিসেম্বৰে তিনদিন অনশন কৰিয়াছিলাম, তাহা মনে আছে। তখন আমি এই পাশবিক দণ্ডে ব্যাখিত হইয়াছিলাম। এখনও আমি একুপ সংবাদে মম্বাহত হই এবং সৰ্বদা বেদনা অনুভব কৰি; কিন্তু প্ৰতিবাদস্বৰূপ অনশন কৰিবাৰ কথা মনে উদয় হয় না। কালক্ৰমে পাশবিকতাৰ বিৰুদ্ধে অনুভূতিৰ তীব্ৰতাও কমিয়া আসে। অগ্ৰায় বাবস্থাও দীৰ্ঘস্থায়ী হইলে জগত উহাতে অভ্যস্ত হইয়া উঠে।

আমাদেৰ কৰ্ম্মদিগকে জেলখানায় ঘানি, খাতা প্ৰভৃতি কঠিন পৰিশ্ৰমেৰ কাজ দেওয়া হইত, কাজকৰ্ম্ম ও বাবস্থা তাহাদেৰ পক্ষে এত অসহ্য কৰিয়া তোলা হইত, বাহাতে তাহাৰা ক্ষমা-প্ৰাৰ্থনা কৰিয়া ও গৰ্ভণমেণ্টেৰ নিকট প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া মুক্তি প্ৰাৰ্থনা কৰিতে বাধ্য হয়। জেল কৰ্ত্তৃপক্ষ ইহা একটা প্ৰকাণ্ড জয় বলিয়া বিবেচনা কৰিতেন।

বাহাৰা পীড়ন ও অপমানে ক্ষুব্ধ হইত, সেই সকল বালক ও যুবকদেৰ ভাগ্যেই এই শ্ৰেণীৰ কঠিন পৰিশ্ৰম জুটিত। এই সমুদায় সুন্দৰ সুন্দৰ বালক, আত্মমৰ্য্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন ও চুৰাকাঙ্ক্ষায় দুঃসাহসী,—যে শ্ৰেণীৰ বালক ব্ৰিটিশ বিত্তালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্ৰশংসা ও উৎসাহ পাইত, ইহাৰা সেই শ্ৰেণীৰ। কিন্তু ভাৰতে তাহাদেৰ যৌবনোচিত আদৰ্শবাদ ও গৰ্ব্বেৰ জগ্ৰ তাহাৰা পায় শৃংখল, নিৰ্জ্জন কাৰাবাস ও বেত্ৰদণ্ড!

আমাদেৰ নাৰীৰা কাৰাগাৰে যে কঠোৰ বাবহাৰ পাইয়াছেন, তাহা চিন্তা কৰিতেও ক্লেশ হয়। ইহাৰা অধিকাংশই মধ্য শ্ৰেণীৰ এবং অন্তঃপুৰে থাকিতে অভ্যস্ত। পুৰুষেৰ সুবিধাৰ জগ্ৰ ৰচিত অনেক সামাজিক প্ৰথাৰ পীড়ন ও অপমান ইহাৰা সহ কৰিয়া থাকেন। স্বাধীনতাৰ আত্মজ্ঞান তাহাদেৰ নিকট দ্ব্যৰ্থক,—যে উৎসাহ ও শক্তি লইয়া তাহাৰা আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাৰ পশ্চাতে গাৰ্হস্থ্যজীবনেৰ দাসত্ব হইতে মুক্তিৰ একটা অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষাও ছিল, ইহা নিঃসন্দেহ। অল্প কয়েকজন ছাড়া, অধিকাংশকেই সাধাৰণ কয়েদী শ্ৰেণীভুক্ত কৰা হইয়াছিল এবং অসচ্চৰিত্ৰা সন্ধিনীদেৰ মধ্যে, অতি ভয়াবহ পাৰিপাশ্বিক অবস্থাৰ মধ্যে তাহাদিগকে ৰাখা হইয়াছিল। একবাৰ আমি নাৰীদেৰ জগ্ৰ নিৰ্দিষ্ট ওয়াৰ্ডেৰ পাৰ্শ্বেৰ ব্যাৰাকে ছিলাম; আমাদেৰ মধ্যে একটা প্ৰাচীৰেৰ ব্যবধান ছিল। সেই

জওহরলাল নেহরু

ব্যারাকে কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দিনীর সহিত সাধারণ কয়েদীরাও ছিল। ঝাঁহার গৃহে আমি একবার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম, যিনি আমাকে সবিশেষ আদর যত্ন করিয়াছিলেন, তিনিও ঐ ব্যারাকে ছিলেন। উচ্চ দেওয়ালের ব্যবধান সত্ত্বেও, জীলোক কয়েদীদের কুংসিত ভাষায় ভীতি প্রদর্শন ও ভৎসনাগুলি আমার কাণে আসিত এবং আমাদের বান্ধবীরা কি সহ্য করিতেছেন, তাহা ভাবিতেও আমার হৃদকম্প হইত।

দুই বৎসর পূর্বে ১৯৩০ সালের সহিত তুলনায় ১৯৩২ এবং ১৯৩৬-এ রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি ব্যবহার যে অধিকতর মন্দ হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা ব্যক্তিবিশেষ কর্মচারীর খেয়াল বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই; অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে এই ধারণায় উপনীত হইতে হয় যে, ইহা গভর্ণমেণ্টের পূর্বসংকল্পিত নীতিরই ফল। রাজনৈতিক বন্দীদের কথা ছাড়িয়া দিলেও এই কালে যুক্তপ্রদেশের জেলকর্মচারীরা যাহা কিছু মনুষ্যোচিত ও মানবতার দ্বোতক, তাহারই উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। আমরা ইহার একটি চিন্তাক্ষক দৃষ্টান্তের অতি নির্দোষ প্রমাণ পাইয়াছি। একজন খ্যাতনামা জেল পরিদর্শক একবার আমাদের জেলে পরিদর্শন করিতে আসেন। ইনি একজন মাননীয় নাইট (স্তার) আমাদের মত বিদ্রোহী বা সিদিসান প্রচারকারী নহেন; ইহাকে আনন্দের সহিত গভর্ণমেণ্ট সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। ইনি আমাদের বলিলেন যে, কয়েকমাস পূর্বে তিনি অগ্র এক জেল পরিদর্শন করিতে গিয়া পরিদর্শন-পুস্তকে মন্তব্য লিখিতে গিয়া জেলরকে “সহৃদয় শৃঙ্খলারক্ষাকারী” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, ইহাতে উক্ত জেলর তাঁহাকে সবিনয়ে অভ্যর্থনা করিয়া বলেন যে, তাঁহার দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি মনুষ্যোচিত গুণাবলীর কথা উল্লেখ না করিলেই ভাল হয়, কেন না কর্তৃপক্ষ উহা বড় পছন্দ করেন না। কিন্তু স্যার মহোদয় স্বীকার করিলেন না যে, ঐ বর্ণনায় জেলরের কোন ক্ষতি হইতে পারে, তিনি ইচ্ছামত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেন। ফল হইল, কিছুদিন পরেই উক্ত জেলরকে এক দূরবর্তী দর্গম স্থানে বদলী করা হইল, যাহা তাঁহার নিকট একপ্রকার শাস্তি।

কয়েকজন জেলর ঝাঁহাদের ভয়ঙ্কর ও অবিবেচক বলিয়া খ্যাতি আছে, তাঁহাদের পদোন্নতি হইল, খেতাব দেওয়া হইল। অবৈধ উপায়ে চাকুরী লাভের চেষ্টা ও পাওয়া জেলে এত সচরাচর ঘটনা যে, প্রায় কেহই ইহা হইতে মুক্ত নহে। কিন্তু আমার নিজের এবং

জেলে মানব প্রকৃতি

আমার অনেক বন্ধুবান্ধবের অভিজ্ঞতা এই যে, যে সকল কারাকর্মচারী নিজেদের কঠোর শৃঙ্খলারক্ষাকারী বলিয়া জাহীর করিবেড়ায়, এ বিষয়ে তাহারাই অধিক অপরাধী।

সৌভাগ্যক্রমে জেলে এবং জেলের বাহিরে আমাকে ঠাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে হইয়াছে, তাঁহারা প্রত্যেকেই আমার প্রতি সদয় ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছিলেন। যাহা হউক একটি ঘটনায় আমি এবং আমার পরিবারবর্গ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলাম। আমার মাতা, কমলা এবং আমার কন্যা ইন্দিরা, এলাহাবাদ জিলা জেলে আমার ভগ্নীপতি রণজিৎ পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের কোন অপরাধ না থাকা সত্ত্বেও, জেলের তাঁহাদিগকে অপমান করিয়া বাহির করিয়া দেয়। এই ঘটনায় আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম এবং এ ব্যাপারে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের প্রতিক্রিয়া দেখিয়া আরও মর্ম্মাহত হইলাম। জেল কর্মচারিগণ কর্তৃক মাতার পুনরায় অপমান সম্ভাবনা নিবারণকল্পে আমি সমস্ত দেখাশুনা বন্ধ করিবাব সঙ্কল্প করিলাম—দেরাহুন জেলে থাকাকালীন প্রায় সাতমাস আমি কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করি নাই।

৪৪

জেলে মানব প্রকৃতি

বেরিলী জিলা জেল হইতে আমরা দুইজন—আমি ও গোবিন্দবল্লভ পঙ্ক—দেরাহুন জেলে বদলী হইলাম। জনতার দৃষ্টি এড়াইবার জন্ত আমাদেরিগকে বেরিলী ষ্টেশনে গাড়ীতে না তুলিয়া পঞ্চাশ মাইল দূরে একটি ষ্টেশনে লইয়া যাওয়া হইল। রাত্রে গোপনে আমাদের মোটর গাড়ীতে তোলা হইল, কয়েকমাস আবদ্ধ থাকিবার পর রাত্রির স্বিদ্ধ বাতাসের মধ্য দিয়া মোটরে ভ্রমণ কত দুর্লভ আনন্দ।

বেরিলী জেল পরিত্যাগের প্রাক্কালে একটি ক্ষুদ্র ঘটনা আমার হৃদয় আলোড়িত করিয়াছিল, স্মৃতিতে তাহা এখনও অগ্নানুস্মরিত হইয়াছে। বেরিলীর পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট, একজন ইংরাজ ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছি, এমন সময় তিনি একটু সলজ্জভাবে এক

জওহরলাল নেহরু

তাড়া কাগজ আমার হাতে দিয়া বলিলেন, ইহাতে কতকগুলি পুরাতন জার্মান সচিত্র পত্রিকা আছে। তিনি শুনিয়াছিলেন যে, আমি জার্মান ভাষা শিখিতেছি, তাই আমার জন্য তিনি এই পত্রিকাগুলি আনিয়াছেন। তাঁহার সহিত পূর্বে আমার কখনও দেখা হয় নাই, পরেও আর তাঁহাকে দেখি নাই। আমি তাঁহার নাম পর্য্যন্ত জানি না। তথাপি দয়াত্র চিন্তা-প্রসূত এই স্বতঃস্ফূর্ত সৌজন্য আমার হৃদয় স্পর্শ করিল, এবং কৃতজ্ঞতায় আমার অন্তঃকরণ পূর্ণ হইল।

সেই দীর্ঘ মধ্যরাত্রে গাড়ীতে বসিয়া আমি, ইংরাজ ও ভারতবাসী, শাসক ও শাসিত, সরকারী ও বে-সরকারী, যাহারা আদেশ দেন এবং যাহাদের আদেশ পালন করিতে হয়, তাঁহাদের পরস্পরের সম্পর্ক চিন্তা করিতে লাগিলাম। এই উভয় জাতির মধ্যে কি বিস্তীর্ণ ব্যবধান, পরস্পরের প্রতি কত অবিশ্বাস, কত বিরাগ! কিন্তু অবিশ্বাস ও বিরাগ অপেক্ষাও পারস্পরিক অপরিচয়ের অজ্ঞতাই অধিক প্রবল, এবং সেই কারণে পরস্পর মিলিত হইলে উভয় পক্ষই একটু শঙ্কার সহিত সঙ্কচিত হইয়া পড়েন। একে অপরকে রক্ষপ্রকৃতি ও বিরসবদন ব্যক্তি বলিয়া ধারণা করেন। একথা কাহারও মনে আসে না যে, এই বাহ্য অবয়বের পশ্চাতে বিনয়, শালীনতা, দয়াও আছে। দেশের শাসক হিসাবে, তাঁহাদের হাতে অল্পগ্রহ করিবার অপরিমিত ক্ষমতাও রহিয়াছে; এই কারণে ইংরাজগণের চারপাশে চাকুরীপ্রার্থী ও সুবিধাষেষীদের কলগুঞ্জন মুখরিত হইতে থাকে, এবং এই শ্রেণীর বিরক্তিকর নমুনা দেখিয়া তাঁহারা ভারতকে বিচার করেন। ভারতবাসীর দৃষ্টিতে ইংরাজ হৃদয়হীন যন্ত্রের মত একজন শাসক, যিনি সর্বদা তাঁহাদের কায়েমী স্বার্থরক্ষার জন্য উগ্র ও উদগ্রীব হইয়া আছেন। একজন শাসক অথবা সৈন্যদলের সৈনিকের আচরণ হইতে স্বকীয় মানসিক আবেগের প্রেরণায় ব্যক্তিগতভাবে আচরণের পার্থক্য কতখানি! সৈনিক তাহার শৃঙ্খলার মধ্যে মানবোচিত গুণ বিসর্জন দিয়া যন্ত্রে পরিণত হয় এবং যাহারা তাহার কোন অনিষ্ট করে নাই, সেই সকল নিরীহ নিদোষ ব্যক্তিকেও গুলি করিয়া মারে। তাই আমি ভাবিলাম, যে পুলিশ কর্মচারী কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে ইতস্ততঃ করেন, তিনিই হয় ত পরদিন নিদোষ ব্যক্তিদের উপর লাঠি চালাইবার হুকুম দিবেন। তিনি নিজেকেও ব্যক্তিবিশেষ মানুষ মনে করিবেন না এবং যাহাদের উপর লাঠিচালনা বা গুলিচালনা করিবেন, সেই জনতাকেও মনুষ্যসমষ্টি বলিয়া মনে করিবেন না।

জেলে মানব প্রকৃতি

যখন কোন ব্যক্তি অপর পক্ষকে জনতা রূপে দেখেন, তখনই মানবীয় যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া যায়। জনতা যে নরনারী ও শিশুদের মিলিত মূর্তি, ইহা আমরা ভুলিয়া যাই। আমরা ভুলিয়া যাই যে, ইহাদেরও ভালবাসা আছে, ঘৃণা আছে, দুঃখানুভূতি আছে। একজন সাধারণ ইংরাজ যদি সরলভাবে কথা বলেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, তিনি কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্র ভারতীয়কেও জানেন, কিন্তু তাঁহারা নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র, মোটের উপর ভারতবাসীরা বিরক্তিকর ইতর সাধারণ মাত্র। সেইরূপ সাধারণ একজন ভারতবাসীও স্বীকার করিবেন যে, কতকগুলি ইংরাজ সত্য সত্যই শ্রদ্ধার পাত্র; কিন্তু ঐ কয়েকজনকে বাদ দিলে সাধারণ ইংরাজেরা প্রভুত্বগর্ভী, নৃশংস এবং অত্যন্ত মন্দপ্রকৃতির। আশ্চর্য্য এই, কেমন করিয়া মানুষ ভিন্ন-জাতির ব্যক্তিকে বিচার করে। তাঁহারা যাহাদের সম্পর্কে আসে সেই সকল ব্যক্তি-বিশেষকে বাদ দিয়া যাহাদের সম্বন্ধে সে অল্প জানে অথবা একেবারেই জানে না, তাঁহাদের লইয়াই জাতির গুণাগুণ সম্পর্কে ধারণা করিয়া ফেলে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি এ বিষয়ে অত্যন্ত সোভাগ্যবান। আমি সর্বদাই আমার স্বদেশবাসী এবং ইংরাজ উভয়ের নিকটই ভদ্র ব্যবহার পাষ্টয়াছি। যে সকল পুলিশ কর্মচারী আমাকে কয়েদীরূপে পাহারা দিয়া একস্থান হইতে অত্রস্থানে লইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা এবং জেলের কর্মচারীরা সর্বদাই আমার সহিত সদয় ব্যবহার করিয়াছেন। এই মানবোচিত ব্যবহারে, কারাজীবনের তিক্ততা, সংঘাত এবং দুঃখের দংশন বহুলাংশে হ্রাস হইয়াছে। আমার স্বদেশবাসীরা যে আমার সহিত সদয় ব্যবহার করিতেন, তাহাতে বিশ্বয়ের কিছুই নাই, কেন না আমি তাঁহাদের নিকট কতকাংশে স্থখ্যাতি বা জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছি। এমন কি, ইংরাজরাও আমাকে ইতর সাধারণ হইতে পৃথক ব্যক্তি বিবেচনা করেন, আমার মতে, ইহার কারণ আমি ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ করিয়াছি, বিশেষতঃ আমি ইংলণ্ডের স্কুলের ছাত্র ছিলাম। এই কারণে তাঁহারা আমার সহিত নৈকট্য অনুভব করেন এবং আমি অল্পবিস্তর যে তাঁহাদের ছাঁচে ঢালাই সভ্য, আমার রাজনৈতিক কাৰ্য্যপ্রণালী যতই মন্দ হউক না কেন, ইহা না ভাবিয়া তাঁহারা পারেন না। আমার অগ্রাগত সঙ্গীদের অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া সময় সময় আমি বিশেষ সদ্যবহারের জগু বিব্রত ও লজ্জিত হইয়াছি।

এই সকল সুব্যবহার ও সুবিবেচনা সত্ত্বেও জেল জেলই; তাঁহার

জওহরলাল নেহরু

নিরানন্দ আবহাওয়া এমনভাবে বৃকে চাপিয়া বসে যে, সময় সময় অসহ্য বোধ হয়। ইহার বাতাস, হিংসা, নীচতা, অবৈধ উৎকোচ, অসত্য, হীন তোষামোদ ও নিন্দিত শপথবাক্যে ভরা। যাহার আত্মমর্যাদাজ্ঞান তীব্র, সে সর্বদাই উত্তেজিত অবস্থায় থাকে। অতি সামান্য ঘটনাতেই যে কেহ বিচলিত হয়। পত্রে কোন দুঃসংবাদ অথবা সংবাদপত্রে কোন লেখা, কিছুকালের জন্য উৎকণ্ঠায় চিত্ত ব্যথিত করিয়া তোলে। বাহিরে জীবন ও কর্মধারার বৈচিত্র্য এবং স্বচ্ছন্দগতি, দেহ ও মনের সামঞ্জস্য ও ভারকেন্দ্র ঠিক রাখে। জেলে বহিঃপ্রকাশের পথ বন্ধ, মনের কামনা মনেই চাপিয়া রাখিতে হয়, তাহার ফলে মানুষের মন ঘটনা সম্পর্কে একদেশদর্শী হয় ও তাহা বিকৃত করিয়া দেখে। জেলে পীড়া হইলে তাহা বিশেষভাবে বিড়ম্বনাজনক।

তথাপি আমি জেলের নিয়মে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম এবং শারীরিক পরিশ্রম এবং অনেকাংশে কিছু কঠিন মানসিক শ্রম করিয়া শরীর ও মেজাজ ঠিক রাখিতাম। ব্যায়াম ও পরিশ্রমের বাহিরে যে প্রয়োজনই থাকুক না কেন জেলে তাহা অত্যাবশ্যক; নতুবা ভাঙ্গিয়া পড়িবার সম্ভাবনা পদে পদে। আমি প্রত্যেক কাজের সময় নিশ্চিষ্ট করিয়া লইয়াছিলাম এবং সেই নিয়মে চলিতে চেষ্টা করিতাম। যথাসম্ভব সাধারণ অভ্যাসগুলি রক্ষা করিতাম। দৃষ্টান্তস্বরূপ দৈনিক ক্ষৌরকার্যের কথা উল্লেখ করিতে পারি (আমাকে সেফ্টি রেজর দেওয়া হইয়াছিল)। এই সামান্য ব্যাপারটা উল্লেখ করিবার কারণ, অনেকেই ইহা একেবারেই পরিত্যাগ করেন এবং অন্ত্যন্ত ব্যাপারেও শিথিল হইয়া উঠেন। সমস্ত দিন কঠিন পরিশ্রমের পর সন্ধ্যায় আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িতাম, এবং অতি আরামে নিদ্রা হইত।

এইভাবে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস অতিক্রান্ত হইত। কখনও বা মাস শেষ হইতে চাহিত না, মনে হইত, সময়ের গতি নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। সময় সময় আমার চিত্ত বিরক্ত বিকৃত হইয়া উঠিত, সকলের উপর, সব কিছুর উপর রাগ হইত—জেলে আমার সঙ্গিগণ, জেলের কর্মচারিগণ, কোন কিছু কাজ করার বা না করার দরুণ বাহিরের লোকদের উপর, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপর (কিন্তু ইহা স্থায়ী ভাব), সর্বোপরি নিজের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিতাম। আমার স্নায়ুগুঞ্জ এমন হইয়া উঠিত যে, কারাজীবনের সর্ববিধ মেজাজই আমাকে পাইয়া বসিত। সৌভাগ্যক্রমে এই শ্রেণীর মানসিক অবস্থা হইতে অল্পেই নিষ্কৃতি পাইতাম।

জেলে মানব প্রকৃতি

বাহিরের আত্মীয়বর্গের সহিত সাক্ষাতের দিবস জেলে এক স্মরণীয় দিন। সেই দিনটি লোকে কামনা করে, তাহার জ্ঞান অপেক্ষা করে, প্রত্যহ দিবস গণনা করে। দেখা সাক্ষাতের উত্তেজনায় অবসানে ঐতিক্রিয়া-মুখে নিঃসঙ্গ শূন্যতা অনুভূত হয়। যদি কখনও দেখা সাক্ষাতের সার্থকতা লাভ করিতে না পারিতাম—কোন দুঃসংবাদ বা অহু কোন কারণে—তাহা হইলে পরে বড় আর্ন্ত হইয়া পড়িতাম। দেখা সাক্ষাতের সময় অবশ্যই জেলের কর্মচারীরা উপস্থিত থাকিতেন, কিন্তু বেরিলীতে দুই তিন বার একজন গোয়েন্দা বিভাগের লোক কাগজ পেন্সিল লইয়া উপস্থিত থাকিত এবং আমাদের কথাবার্তা বাগ্‌ভাবে লিখিয়া লইত। আমার নিকট ইহা অত্যন্ত বিরক্তিকর মনে হইত এবং এই সকল সাক্ষাতের কোন সার্থকতাই হইত না।

তাহার পর এলাহাবাদ জেলে দেখা সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে আমার মাতা ও পত্নী জেলে এবং গভর্ণমেন্টের নিকট যে ব্যবহার পাইলেন, তাহাতে এই দুর্লভ দেখা সাক্ষাৎও আমাকে বন্ধ করিতে হইল। প্রায় সাত মাস আমি কাহারও সহিত দেখা করি নাই। এই দিনগুলি কি নিরানন্দেই না কাটিয়াছে। যখন আমি পুনরায় দেখা সাক্ষাৎ করিবার জ্ঞান সম্মত হইলাম, এবং আমার আত্মীয়গণ আমাকে দেখিতে আসিলেন, তখন আমি আনন্দে আত্মহারা হইলাম। আমার ভগ্নীর ছেলে মেয়েরাও আসিয়াছিল। তাহার ছোট মেয়েটি পূর্বের অভ্যাস মত যখন আমার কাঁধে উঠিতে চাহিল, তখন ভাবাবেগ দমন করা আমার পক্ষে কঠিন হইল। দীর্ঘকাল সঙ্গ লাভের জ্ঞান লালায়িত থাকিয়া পারিবারিক জীবনের এই মধুর স্পর্শে আমি বিহ্বল হইয়া গেলাম।

দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ হইবার পর, পনের দিন পরে বাহির হইতে এবং অল্প জেল হইতে (আমার দুই ভগ্নীই তখন জেলে) যে পত্রগুলি আসিত, তাহার জ্ঞান আগ্রহভরে প্রতীক্ষা করিতাম। নির্দিষ্ট দিনে পত্র না আসিলে আমি অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িতাম। আবার পত্র পাইলেও খুলিতে ইতস্ততঃ করিতাম। মানুষ যেমন আনন্দদায়ক বস্তু লইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখে, আমিও চিঠি লইয়া নাড়াচাড়া করিতাম, মনে আশঙ্কাও হইত, হয় ত বা চিঠির মধ্যে এমন সংবাদ বা ইঙ্গিত আছে, যাতে আমি বিরক্ত হইব। জেলের শাস্তিপূর্ণ ও নিস্তরঙ্গ জীবনে চিঠি লেখা ও পাওয়া দুই-ই আকস্মিক উত্তেজনার কারণ হইয়া উঠে। ইহাতে এমন একটা ভাবাবেগ উপস্থিত হয়, যাহার ফলে দু'এক দিন মন উন্নয়ন হইয়া থাকে এবং দৈনন্দিন কাজে মন বসান কঠিন হয়।

জওহরলাল নেহরু

নৈনী ও বেরিলী জেলে আমার অনেক সাথী ছিল। দেৱাছন জেলে প্রথমে আমরা তিনজন—গোবিন্দবল্লভ পণ্ড, কাশীপুরের কুনোয়ার আনন্দ সিংহ এবং আমি,—কিন্তু দুই মাস পরে ছয় মাস কারাদণ্ড শেষ হওয়ায় পঞ্চজী মুক্তি পাইলেন। পরে আর দুইজন আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দিলেন। ১৯৩৩-এর জালুয়ারীর প্রথম ভাগে আমার সঙ্গীরা সকলেই চলিয়া গেলেন, আমি একা রহিলাম। আগষ্ট মাসের শেষে আমার মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত প্রায় আট মাস কাল আমি দেৱাছন জেলে প্রায় নির্জনে কাটাইয়াছি; কয়েক মিনিটের জন্ত কোন কারাকর্ষচারী ব্যতীত কথা বলিবার সুযোগ কদাচিৎ মিলিত। ঠিক আইনতঃ ইহা নির্জন কারাবাস নহে, অথচ প্রায় তাহাই, এবং আমার পক্ষে এই সময়টা অত্যন্ত নিরানন্দে কাটিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে আমি দেখা সাক্ষাৎ আরম্ভ করিয়াছিলাম বলিয়া একটু স্বস্তি পাইতাম। আমি মনে করি, বিশেষ অনুগ্রহস্বরূপ আমাকে প্রতাহ বাহির হইতে সত্ত্ব ফোটা ফুল পাইবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল এবং কয়েকখানি ফটোগ্রাফ ও কাছে রাখিতে দেওয়া হইত। ইহাতে আমি অনেক আনন্দলাভ করিতাম। সাধারণতঃ ফুল কি ফটোগ্রাফ রাখিতে দেওয়া হয় না। কয়েক বার বাহির হইতে প্রদত্ত ফুল আমাকে দেওয়া হয় নাই। সেলের জিনিসপত্র সুসজ্জিত করিয়া রাখিতে উৎসাহ দেওয়া হয় না। আমার মনে আছে, আমার পাশের সেলে আমার একজন সঙ্গী তাঁহার প্রসাধন দ্রব্যগুলি বেশ সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া জেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট আপত্তি করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বলা হইয়াছিল যে, তিনি যেন সেলটি চিত্তাকর্ষক বিলাসগৃহ না করিয়া তোলেন। বিলাস দ্রব্যগুলির তালিকা এই—একটি দাঁত মাজিবার ব্রাস, টুথ পেইন্ট, ফাউটেনপেনের কালি, এক বোতল মাথার তেল, চিরুণী, ব্রাস, সম্ভবতঃ আর দুই একটি ছোট খাট জিনিস।

জেলে মানুষ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর কত মূল্যবান তাহা অনুভব করে। জেলে লোকের নিজস্ব বস্তুর সংখ্যা একেই অতি কম, তাহার উপর ইচ্ছামত সেগুলি অদল বদল করা যায় না; কাজেই সকলে যত্ন সহকারে এত সামান্য জিনিসও সযত্নে কুড়াইয়া রাখে, যাহা বাহিরে লোকে ঠেঁড়া কাগজের বুড়িতে ফেলিয়া দেয়। মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা এত প্রবল যে, কিছু না থাকিলেও উহা বিনষ্ট হয় না।

সময় সময় জীবনের আরামগুলির জন্ত দৈহিক আশঙ্কা জাগ্রত হয়—শরীরের আরাম-আয়েস, মনোরম নিরালা, বন্ধু সমাগম, প্রাণবন্ত আলাপ

জেলে মানব প্রকৃতি

আলোচনা, শিশুদের সহিত ক্রীড়া...সংবাদপত্রের কোন ছবি বা মন্তব্য, প্রাচীনদিনের স্মৃতি জাগাইয়া তোলে, যৌবনের চিন্তাহীন দিনগুলি মনে পড়ে, গৃহে ফিরিবার জগ্ন মন ব্যাকুল হইয়া উঠে, সমস্ত দিন অতি অশান্তিতে অতিবাহিত হয়।

আমি প্রত্যহ কিছু স্মৃতি কাটিতাম। অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমের পর ইহাতে আরাম, অবকাশ ও তৃপ্তি পাইতাম। অবশ্য আমি প্রধানতঃ লেখা পড়া লইয়াই থাকিতাম। অবশ্য চাহিবামাত্র সব বই যে পাইতাম তাহা নহে, বাধা নিষেধ ছিল এবং বইগুলি পরীক্ষা করিয়া দেওয়া হইত। শাহার উপর পরীক্ষার ভার ছিল, তিনি সে কাজের খুব যোগ্য ছিলেন না। স্পেন্সলারের “পাশ্চাত্যের প্রভাব হ্রাস” নামক বইখানি আটক করা হইল, কেন না নামটা বিপজ্জনক ও সিদিসানীয় ধরণের। কিন্তু আমার অভিযোগ করিবার কিছুই নাই, কেন না মোটের উপর আমি অনেক প্রকার ভাল বই রাখিতে পারিতাম। এ ক্ষেত্রেও আমার প্রতি বিশেষ অনুরোধ প্রদর্শন করা হইত। কেন না আমার অনেক সঙ্গী (‘এ’ শ্রেণীর বন্দী) সমসাময়িক ব্যাপার লইয়া লিখিত পুস্তকাদি পাইতে অনেক দুর্ভোগ ভুগিতেন। আমি শুনিয়াছি, বারাণসী জেলে, রাজনৈতিক কথা আছে, এই অভ্যুত্থানে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রকাশিত “হোয়াইট পেপার” পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই। কেবল ধর্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক ও উপাখ্যান ব্রিটিশ শাসকগণ অতি সন্তোষের সহিত দিবার অল্পমতি দেন। ধর্মের প্রতি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের এত প্রগাঢ় অনুরাগ যে, তাঁহারা নিরপেক্ষ ভাবে সকল মার্কীর ধর্মকেই সমান উৎসাহ দিয়া থাকেন।

যখন ভারতে সর্ববিধ সাধারণ ব্যক্তিস্বাধীনতাও সঙ্কুচিত করা হইয়াছে, তখন কয়েদীদের অধিকারের আলোচনা খুব বেশী প্রাসঙ্গিক নহে। তবুও বিষয়টির গুরুত্ব আছে। যখন কোন আদালত কাহাকেও কারাদণ্ড দেন, তাহার অর্থ কি এই যে, তাহার দেহের সহিত মনকেও বন্দী করিতে হইবে? তাহার দেহ বন্দী হইলেও মন স্বাধীনতা পাইবে না কেন? ভারতে ষাঁহাদের হাতে কারাগার পরিচালনের ভার রহিয়াছে, তাঁহারা এই শ্রেণীর প্রশ্নে নিশ্চয়ই ভয় পাইবেন; কেন না তাঁহাদের নূতন আদর্শ ও ভাব গ্রহণ করা অথবা ধীর ভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ‘সেন্সর’ করা সব সময়েই মন্দ এবং ইহা একদেশদর্শিতা ও নির্বুদ্ধিতা। ভারতে এই কারণে আমরা অনেক আধুনিক পুস্তক, প্রগতিমূলক সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্র পাই না। নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত পুস্তকের তালিকা অত্যন্ত ভারী হইয়া উঠিয়াছে এবং উহার

জওহরলাল নেহরু

সহিত নিত্য নূতন নাম যোগ হইতেছে। তাহার উপর জেলে স্বতন্ত্র ও দ্বিতীয়বার 'সেন্সরের' ব্যবস্থা থাকার দরুণ, যে সকল পুস্তক অথবা সাময়িক পত্রিকা বৈধভাবেই বাহিরে কিনিয়া পড়া যায়, জেলে তাহা পাওয়ার উপায় নাই।

কতকগুলি কম্যুনিষ্ট সংবাদপত্র বন্ধ করিয়া দেওয়ায় কিছুদিন পূর্বে নিউইয়র্কের বিখ্যাত সিং সিং জেলে এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। আমেরিকার শাসক সম্প্রদায়ের মনে কম্যুনিষ্ট বিরুদ্ধতা অত্যন্ত প্রবল, তৎসঙ্গেও জেল কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত করিলেন, কয়েদীরা ইচ্ছা করিলে কম্যুনিষ্ট সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রাদি সহ যে কোন মুদ্রিত পুস্তিকাদি পাইতে পারিবে। জেলের ওয়ার্ডেন (কারাধ্যক্ষ) অত্যধিক উত্তেজনাপ্রদ বলিয়া ব্যঙ্গচিত্র নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন।

এ দেশের কারাগারে মনের স্বাধীনতার প্রশ্ন লইয়া আলোচনা করা অনেকাংশে নিফল, কেন না, কার্যতঃ অধিকাংশ কয়েদীকেই কোন সংবাদপত্র বা লিখিবার সরঞ্জামাদি দেওয়া হয় না। ইহা একেবারেই নিষিদ্ধ, এখানে 'সেন্সরের' প্রশ্নই উঠে না। কেবলমাত্র 'এ' শ্রেণীর (বাক্সলায় প্রথম ডিভিসন) কয়েদীদিগকে লিখিবার সরঞ্জামাদি দেওয়া হয়, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই দৈনিক সংবাদপত্র দেওয়া হয় না। গভর্ণমেণ্টের অমুমোদিত দৈনিক সংবাদপত্র দেওয়া চলিতে পারে। 'বি' বা 'সি' শ্রেণীর, রাজনৈতিক কি অরাজনৈতিক কোন কয়েদীই লিখিবার সরঞ্জাম পাইতে পারে, ইহা বিবেচনা করা হয় না। প্রথমোক্ত শ্রেণীর বন্দীরা বিশেষ সুবিধা হিসাবে উহা পাইতে পারে, তবে প্রায়ই তাহাদিগকে সে সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হয়, 'এ' শ্রেণীর কয়েদীদের সংখ্যা প্রতি হাজারে একজন হইবে কি না সন্দেহ, অতএব কয়েদীদের অবস্থা বিবেচনাকালে তাহারা ধর্তব্যের মধ্যেই নহে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্মরণীয় যে অত্যাগত সভ্যদেশের সাধারণ কয়েদীরা পুস্তক ও সংবাদপত্র সম্পর্কে যে সুবিধা পায়, এখানে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত 'এ' শ্রেণীর কয়েদীরাও তাহা পায় না।

হাজার করা অবশিষ্ট ৯৯ জন একসঙ্গে দুই তিনখানা বই পাইতে পারে, কিন্তু তাহার সর্ব এত কঠিন যে এই সুবিধা তাহারা প্রায়শঃই গ্রহণ করিতে পারে না। লেখা অথবা বই হইতে কোন কিছু টুকিয়া লওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক বিলাসিতা, কেহ যেন উহা না করে। মানসিক বিকাশ সম্পর্কে এই ইচ্ছাকৃত নিরুৎসাহ করিবার ব্যবস্থা অতি আশ্চর্য্য এবং সুস্পষ্ট। কয়েদীকে সংস্কার করিয়া তাহাকে সাধুজীবন যাপন করাইবার

জেলে মানব প্রকৃতি

উদ্দেশ্যের দিক হইতে দেখিলে, প্রথমেই তাহার মনের গতি পরিবর্তনের ব্যবস্থা আবশ্যক এবং তাহাকে লেখাপড়া শিখান ও কোন রকম শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু ভারতের জেল কর্তৃপক্ষ সম্ভবতঃ এই দিক দিয়া চিন্তা করেন না। যুক্ত-প্রদেশে ত একরূপ কোন ব্যবস্থা নাই বলিলেই হয়। সম্প্রতি জেলখানায়, বালক ও যুবকদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে বটে, কিন্তু অযোগ্য লোকের হাতে ইহার ভার দেওয়ার ফলে, মোটেই কার্য্যকরী হয় নাই। কখনও একরূপ কথাও বলা হয় যে, কয়েদীরা লেখাপড়া শিখিতে চাহে না। কিন্তু আমার নিজের অভিজ্ঞতা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত, আমি এমন অনেককে দেখিয়াছি, যাহারা আমার নিকট আসিয়া লেখাপড়া শিখিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিত। আমাদের সংস্পর্শে যে সকল কয়েদী আসিত, আমরা তাহাদের পড়াইতাম এবং তাহারা শিখিবার জন্য রীতিমত পরিশ্রম করিত। অনেক সময় হয় ত মধ্যরাত্রে আমার নিদ্রা ভাঙিয়া গিয়াছে, আমি আশ্চর্য্য হইয়া দেখিয়াছি, তাহারা দু'একজন তখনও তাহাদের ব্যারাকে ঝুড়াতি লণ্ঠনের সম্মুখে বসিয়া পরদিনের পাঠ অভ্যাস করিতেছে।

আমি নানাপ্রকার বই পড়িয়া জেলে সময় কাটাইতাম, সাধারণতঃ আমি “গুরুপাক” পুস্তকই পড়িতাম, হাক্ক উপন্যাস পড়িলে মন শিথিল হইয়া যায় বলিয়া আমি বেশী উপন্যাস পড়িতাম না। সময় সময় অতিরিক্ত পাঠজনিত ক্লান্তি আসিত, তখন কেবল লেখা লইয়া থাকিতাম। আমার কন্ঠার নিকট লিখিত ঐতিহাসিক পত্রগুলি আমি কারাগারে দুই বৎসর ধরিয়া লিখিয়াছি; এবং উহা আমার মানসিক স্বৈর্য্য রক্ষায় সহায়তা করিয়াছে। লিখিবার সময় আমি অতীত ইতিহাসের মধ্যে ডুবিয়া কারাগারের কথা বিস্মৃত হইতাম।

ভ্রমণ-কাহিনী পড়িতে আমার ভাল লাগিত; হিউয়েন সাং, মার্কো-পোলো, ইবন বাটুয়া এবং অন্যান্য পুরাতন ভ্রমণ-কাহিনী,—আধুনিক কালের সেভেন হেভিনের মধ্য এশিয়ার মরুভূমির মধ্য দিয়া ভ্রমণের বিবরণ, রোরিথের তিব্বত ভ্রমণের অত্যন্তব্য কাহিনী পাঠ করিয়াছি। ছবির বইও ভাল লাগিত, গিরি-শৃঙ্গ, চিত্রতুয়ারমণ্ডিত পর্বত, মরুভূমি—কারাগারে মরুভূমি ও সমুদ্রের অসীম বিস্তারের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। আমার নিকট মণ্টগ্লাস্, আল্পস্ ও হিমালয়ের কয়েকখানি উৎকৃষ্ট ছবির বই ছিল। যখন আমার সেল ও ব্যারাকের উত্তাপ ১১৫ ডিগ্রীরও উপরে, তখন ছবির বই-এর পাতা উন্টাইতে উন্টাইতে আমি তুষার-পর্বতের দিকে চাহিয়া থাকিতাম। ভূমণ্ডলের মানচিত্র দেখিতেও

বড় আনন্দ হইত। যে সমস্ত স্থান দেখিয়াছি, তাহার পূর্বস্মৃতি ও স্বপ্নগুলি মনে ভাসিয়া উঠে, আবার যে স্থানগুলি দেখিবার ইচ্ছা সঙ্গেও দেখিতে পারি নাই, তাহার কথাও মনে হয়। পুরাতন দিনের স্মৃতি ভাসিয়া উঠে—ক্ষুদ্র বিন্দুর মধ্যে মহানগরী, কৃষ্ণ রেখায় পর্কত, নীলবর্ণে রঞ্জিত সমুদ্র—এই সৌন্দর্য্যময়ী ধরিত্রীর কত আকর্ষণ, যেখানে সংঘাত ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়া মনুষ্যত্ব পরিবর্তিত হইতেছে, সেই কঠিন কর্মক্ষেত্রে দাঁড়াইবার আকাজ্জা যেন কণ্ঠ চাপিয়া ধরে। বিষন্ন চিত্তে তাড়াতাড়ি ভূচিক্রাবলী বন্ধ করিয়া অতি পরিচিত কারাগ্রাচীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করি; কারাগারের দৈনন্দিন নীরস কর্তব্যের কথা মনে পড়িয়া যায়।

৪৫

কারাগারে জীবজন্তু

দেরাহুন জেলের ক্ষুদ্র সেল বা কক্ষে আমি চৌদ্দ মাস পনের দিন অতিবাহিত করিয়াছি। আমি উহার এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হইয়াছিলাম। ইহার প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র অংশও আমার কত পরিচিত, চূর্ণকাম করা দেওয়াল, অসমান মেঝে ও ছাদের প্রত্যেকটি দাগ ও খাঁজ, ঘুণে-ধরা উইএ-খাওয়া কড়ি বর্গা—সব খুঁটিনাটি মনে আছে। বাহিরের উঠানে কয়েক গোছা ঘাস ও কয়েকখণ্ড পাথর আমার পুরাতন বন্ধু ছিল। আমার সেলে আমি একা থাকিতাম না, বোলতা ও ভীমরুলেরা কয়েকটি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল এবং টিকটিকিরা দিনের বেলায় বরগার অন্তরালে থাকিত এবং রাত্রে শিকারের আশায় বাহির হইয়া আসিত। যদি বাহ্য বস্তুর উপর চিন্তা ও ভাবাবেগ রেখাপাত করিতে পারে, তাহা হইলে সেই সেলের বায়ুমণ্ডলে তাহা এখনও থম থম করিতেছে এবং সেই স্থানের প্রত্যেক বস্তুর সহিত তাহা জড়াইয়া আছে।

অগ্নাগ্ন জেলে আমি দেরাহুন অপেক্ষা অনেক ভাল সেলে থাকিয়াছি; কিন্তু এখানে একটি বিশেষ সুবিধা পাইয়াছিলাম। জেলটি অত্যন্ত ছোট বলিয়া প্রাচীরের বাহিরে অথচ জেলের হাতার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র হাজতে আমাদের রাখা হইয়াছিল। স্থান এত অপরিসর যে হাঁটিয়া বেড়াইবার উপায় ছিল না। সেইজন্ত সকালে ও বিকালে জেলের

কারাগারে জীবজন্তু

দরজা পর্যন্ত আমাদের হাঁটিয়া বেড়াইতে দেওয়া হইত—ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় একশত গজ হইবে। জেলের হাতার মধ্যে থাকিলেও প্রাচীরের বাহিরে আসার দরুণ, আমরা পর্বত, শস্তক্ষেত্র এবং রাজপথের কিয়দংশ দেখিতে পাইতাম। এই সুবিধা কেবল আমাকেই দেওয়া হয় নাই, দেরাহুনে ‘এ’ ও ‘দি’ শ্রেণীর প্রত্যেক কয়েদীই এই সুবিধা পাইতেন। প্রাচীরের বাহিরে জেল হাতার মধ্যে আর একটা ছোট বাড়ী ছিল তাহাকে ইয়োরোপীয়ান হাজত বলা হইত। ইহার চারিদিকে কোন দেওয়াল ছিল না বলিয়া সেলে বসিয়াই মনোহর পর্বত ও বাহিরের লোকচলাচল দেখা যাইত; এই হাজতের ইয়োরোপীয়ান ও অগ্রান্ত কয়েদীদেরও জেলের দরজা পর্যন্ত সকালে বিকালে বেড়াইতে দেওয়া হইত।

যে বন্দী দীর্ঘকাল উচ্চপ্রাচীরের অন্তরালে বাস করিয়াছে, এই বাহিরে ভ্রমণ ও নৈসর্গিক দৃশ্য দেখার মানসিক সন্তোষ যে কতখানি সে-ই অনুভব করিতে পারে। বাহিরে বেড়ান আমার ভাল লাগিত। বর্ষাকালে যখন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইত, তখনও আমি এই অধিকার ত্যাগ করি নাই। ঝলে পা ডুবিয়া গেলেও আমি তাহার মধ্যেই হাঁটিতাম। অগ্রস্ত হইলেও এই বাহিরে ভ্রমণ আমার ভালই লাগিত। কিন্তু এখানে অদূরবর্তী হিমালয়ের সুউচ্চ গিরিমালার মনোহর শ্রী দেখিবার আনন্দ, কারাজীবনের অনেক ক্লান্তি দূর করিয়া দেয়। যখন দীর্ঘকাল দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ ছিল এবং কয়েক মাস আমি একাকী ছিলাম, তখন আমার চিরপ্রিয় হিমালয়ের দিকে চাহিয়া সময় কাটাইবার সৌভাগ্য অল্প নহে। সেল হইতে আমি পর্বত দেখিতে পাইতাম না, কিন্তু আমার মনে তাহা স্পষ্টরূপে জাগিয়া উঠিত; হিমালয়ের সহিত এই নৈকট্যবোধ আমাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিত।

“উল্কে আকাশে পাখীরা দল বাধিয়া উড়িয়া গেল; একখণ্ড নিঃসঙ্গ মেঘও ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া গেল। আমি অদূরবর্তী চিং-টিং পর্বতশৃঙ্গের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছি। আমি ও পর্বত, পরস্পরের প্রতি চাহিয়া আমাদের কখনও ক্লান্তি আসে না।”

আমার আশঙ্কা হয় কবি, লি তাই পোর সহিত সমস্বরে আমি বলিতে পারি না যে, এমন কি পর্বত দেখিয়াও আমার ক্লান্তি আসে না। তবে সে ক্ষণিকের; সাধারণতঃ পর্বতের সান্নিধ্যে আমি শান্তি পাইতাম, ইহা চিরস্থির, মহামৌন মহিমায় লক্ষ বর্ষের জ্ঞান-গম্ভীর দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া থাকিত, আমার চিত্তচাক্ষুণ্য ও চপলতাকে ব্যঙ্গ করিত, আমার উদ্বেজনাক্ষুণ্ণ মনে অপূর্ণ প্রশান্তি আনিয়া দিত।

জওহরলাল নেহরু

দেৱাতনে বসন্তকাল মনোহর, নিয়ের সমতল অপেক্ষা এখানে বসন্ত দীৰ্ঘস্থায়ী। শীতকালে সমস্ত বৃক্ষের পাতা ঝরিয়া যায়, তাহাদের কঙ্কালসার মূৰ্ত্তি বাহির হইয়া পড়ে। এমন কি, আমি আশ্চর্য হইয়া দেখিলাম, জেলের দরজায় দণ্ডায়মান চারটি প্রকাণ্ড অশ্বখ গাছও নিস্পাত হইয়া গিয়াছে। তারপর বসন্ত আসিয়া তাহাদের কঙ্কালসার নিরানন্দ দেহে নবজীবনের চেতনায় প্রত্যেক শিরা উপশিরা চঞ্চল করিয়া তুলিল। সহসা অশ্বখ এবং অগ্ন্যাগ্ন বৃক্ষে যেন এক সাড়া পড়িয়া গেল; যেন যবনিকার অন্তরালে এক গোপন আয়োজনের রহস্যের ইঙ্গিত আসিতেছে। তাহাদের অঙ্গে অঙ্গে কচি ক্ষুদ্র সবুজ পল্লবের ঈষৎ বিকাশ, আমি চমকিত হইয়া আবিষ্কার করি। ইহা দেখিয়া কত আনন্দ, কত সন্তোষ! দেখিতে দেখিতে লক্ষ লক্ষ নবপত্রে তাহাদের দেহ ভূষিত হইল, সূর্যালোকে উজ্জ্বল হইয়া তাহারা বাতাসের সহিত ক্রীড়ারত হইল। পল্লবের অঙ্কুর হইতে সহসা পত্ররূপে এই দ্রুত পরিবর্তন কি মনোহর!

আমি ইতিপূর্বে কখনও লক্ষ্য করি নাই যে, আশ্বের নবপল্লব ঈষল্লোহিত কপিশবর্ণ—কাস্মীরের পৰ্ব্বতে শরৎকালে যে বর্ণের বিভা ফুটিয়া উঠে তাহার সহিত কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ইহা সবুজ হইয়া যায়।

বর্ষার জন্ম প্রত্যাশা স্বাভাবিক, কেন না, বর্ষাগমের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রীষ্মতাপ শীতল হইয়া আসে। কিন্তু ভাল জিনিষেরও অতি প্রাচুর্য্য মানুষ সহিতে পারে না, দেৱাতনের উপর জলদেবতার ক্রুপা অত্যন্ত অধিক। বর্ষারস্তের পাঁচ ছয় সপ্তাহের মধ্যেই ৫০।৬০ ইঞ্চি বারিপাত হয়। ক্ষুদ্র সেলের মধ্যে বন্দী হইয়া বসিয়া থাকা, অথবা ছাদ দিয়া জলপড়া ও জানালা দিয়া ঝাপটার হাত হইতে জাগ্রাণ পাইবার জন্ম চেষ্টা করা খুব মধুর নহে।

শরৎকালও মনোহর, বৃষ্টির দিন ছাড়া শীতকালে যখন বজ্রের গর্জনে বৃষ্টি নামিয়া আসে, হাড়-কাপানো শীতল বাতাস বহিতে থাকে, তখন মনের মধ্যে স্রব্দের লোকালয়ে একটু উষ্ণ গৃহকোণে আরামের জন্ম আকাঙ্ক্ষা জাগে। সময় সময় শিলা বৃষ্টি হয়, মার্কেল অপেক্ষাও বড় বড় শিল টিনের ছাদের উপর পড়িয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে থাকে, মনে হয় গোলন্দাজেরা অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণ করিতেছে।

একটি দিনের কথা আমার বিশেষ ভাবে মনে আছে। ১৯৩২ সালের ২৪ শে ডিসেম্বর। সমস্ত দিন ধরিয়া অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ও ঝটিকার

কারাগারে জীবজন্তু

গর্জন এবং অসহ্য শীত ; শরীরের দিক হইতে জেলে ইহাই আমার সকলের চেয়ে দুঃখের দিন। কিন্তু সন্ধ্যা কালে সহসা আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। যখন দেখিলাম অদূরবর্তী পর্বতমালা শুভ্রতুষারমণ্ডিত হইয়া শোভা পাইতেছে তখন আমার সমস্ত দুঃখ নিমেষ দূর হইয়া গেল। পর দিন—বড়দিন, আকাশ উজ্জ্বল, চারিদিক মনোরম, অদূরে তুহিনাবৃত পর্বতমালার কি মনোহর শোভা !

সাধারণ কাজ কৰ্ম ছিল না বলিয়া আমরা প্রকৃতির পর্যবেক্ষক হইয়া উঠিলাম। বিবিধ জীবজন্তু, কীট-পতঙ্গ যাহা চোখে পড়িত তাহাই আমরা অন্তরসন্ধিস্বরূপ সহিত লক্ষ্য করিতাম। আমার অন্তরসন্ধিস্বরূপ যতই বাড়িতে লাগিল ততই লক্ষ্য করিলাম যে, আমার সেলে এবং ছোট্ট উঠানে কত বিবিধ শ্রেণীর কীট-পতঙ্গ বাস করিতেছে। আমি অনুভব করিলাম, বাহা পূর্বে আমার নিকট প্রাণহীন শূন্যময় বলিয়া বোধ হইত, তাহাই জীবনের প্রাচুর্য্যে ভরপুর। কেহ বৃকে হাটে, কেহ ধীরে ধীরে চলে, কেহ বা উড়িয়া বেড়ায়। ইহারা আমার কোন বাধা উৎপাদন না করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে, আমিও ইহাদের বিঘ্ন উৎপাদন করিবার কারণ খুঁজিয়া পাইতাম না। কিন্তু ছারপোকা ও মশা এবং কতকপরিমাণে মাছির সহিত আমাকে অবিরত যুদ্ধ করিতে হইত। বোলতা ও ভীমরুলগুলি আমি সহ্য করিতাম, আমার সেলের মধ্যে তাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে বাস করিত। কিন্তু একদিন আমি একটু কুপিত হইয়াছিলাম, একটা বোলতা সম্ভবতঃ অগ্রমনস্কভাবে আমাকে দংশন করিয়াছিল। আমি রাগিয়া গিয়া তাহাদিগকে ঝাড়ে বংশে উচ্ছেদ করিবার জগ্ন চেষ্টা করিলাম। তাহারাও তাহাদের অস্থায়ী চাকগুলি রক্ষা করিবার জগ্ন সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। হয়ত ঐ গুলির মধ্যে তাহাদের ডিম ছিল ; কাজেই আমি যুদ্ধে বিরত হইলাম এবং স্থির করিলাম যে তাহারা যদি আমার বিঘ্নোৎপাদন না করে তাহা হইলে আমিও তাহাদের শান্তিতে থাকিতে দিব। এই ঘটনার পর এক বৎসর কাল আমি বোলতা ও ভীমরুল বেষ্টিত হইয়া সেলে বাস করিয়াছি। তাহারা কখনও আমাকে আক্রমণ করে নাই এবং আমরা পরস্পরকে শ্রদ্ধা করিয়া চলিতাম।

চামটিকা আমি পছন্দ করিতাম না ; কিন্তু আমাকে তাহাদের সহ্য করিতে হইত। সন্ধ্যাকাশে তাহারা নিঃশব্দে উড়িত এবং প্রায়োন্ধকার আকাশে তাহাদের ছায়ার মত দেখা যাইত। কি ভীতি-

জওহরলাল নেহরু

উদ্দীপক প্রাণী, দেখিলে আমার গা ছম্ ছম্ করে। মনে হয় যেন উহার। আমার মুখ ছুঁইয়া উড়িয়া গেল, আঘাত করিবে ভয়ে আমি শিরিয়া উঠি। বহুদূর উল্কে বড় বড় বাতুড় উড়িয়া যাইত।

আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া পিপীলিকা ও উই পোকা লক্ষ্য করিতাম। সন্ধ্যাবেলা যখন টিকটিকিগুলি বাহির হইয়া লাফাইয়া শীকার ধরিত এবং হাশ্বোদ্দীপক ভঙ্গীতে লেজ নাড়িয়া পরস্পরকে তাড়া করিত, তাহাও চাহিয়া দেখিতাম। সাধারণতঃ তাহারা বোলতার কাছে ঘেঁষিত না কিন্তু আমি দুইবার টিকটিকিকে অতি সাবধানতার সহিত সম্মুখ দিক হইতে বোলতাকে ধরিতে দেখিয়াছি। আমি জানি না যে তাহারা ইচ্ছা করিয়া বা ঘটনাচক্রে হলের দিকটা এড়াইয়া বোলতা ধরে।

ইহা ছাড়া নিকটবর্তী রক্ষে বহু কাঠবিড়ালী বাস করিত। এগুলি বেশ সাহসী এবং আমাদের অতি নিকটে আসিত। লক্ষ্যে জেলে যখন আমি নিঃশব্দে বসিয়া পড়াশুনা করিতাম তখন একটা কাঠবিড়ালী আমার পা বাহিয়া জামুর উপর বসিয়া চারিদিকে তাকাইত এবং যখন সে চোখের দিকে চাহিত তখনই বৃষ্টিতে পারিত যে আমি বৃক্ষ কিংবা তাহার ধারণানুযায়ী কোন বস্তু নই। ভয়ে সে মুহূর্তের জন্য আড়ষ্ট হইয়া যাইত, কিন্তু পরক্ষণেই লাফাইয়া পলাইত। কাঠবিড়ালীর ছোট ছোট বাচ্চাগুলি কখনও গাছ হইতে পড়িয়া যাইত, তাহাদের মা দৌড়িয়া আসিয়া বলের মত পাকাইয়া নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইত, সময় সময় বাচ্চাগুলির মা খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। একবার আমার একজন সঙ্গী তিনটা কাঠবিড়ালীর হারান বাচ্চা কুড়াইয়া আনিয়া লালন পালন করিয়াছিলেন। তাহারা এত ছোট যে খাওয়ান একটা সমস্তা হইয়া উঠিল। দাহা ইউক আমরা কৌশল আবিষ্কার করিয়া সমস্তার সমাধান করিলাম। ফাউনটেন পেনে কালী ভরিবার কাচের নলের মুখে তুলি ভরিয়া আমরা দুধ খাওয়াইবার বোতল তৈরী করিলাম।

একমাত্র আলমোড়ার পার্শ্বত জেল ব্যতীত সকল জেলেই আমি অসংখ্য পায়রা দেখিয়াছি। হাজার হাজার পায়রা সন্ধ্যার আকাশ ছাইয়া ফেলিত, কখনও বা জেলকর্মচারীরা ঐগুলি গুলি করিয়া মারিয়া আহার করিত। সর্বত্র ময়নার প্রাচুর্য ছিল। দেরাহুন জেলে আমার সেলের দরজার উপরে একজোড়া ময়না বাসা বাঁধিয়াছিল; আমি তাহাদিগকে খাইতে দিতাম, ক্রমে তাহারা এত পোষ মানিয়াছিল যে সকালে বিকালে আমার খাইতে দিতে দেবী হইলেই

কারাগারে জীবজন্তু

তাহারা আমার নিকটে বসিয়া কিচির মিচির করিয়া আহারের দাবী জানাইত। তাহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া এবং অধীর চীৎকার শুনিয়া আমি বেশ আনন্দ বোধ করিতাম।

নৈনী জেলে হাজার হাজার টিয়া পাখী ছিল, এবং আমার ব্যারাকের প্রাচীরের ফাটলে অনেকগুলি বাস করিত। ইহাদের পূর্বে রাগ ও প্রেম কবিতার ভাবভঙ্গী অত্যন্ত কৌতুককর দৃশ্য। কখনও কখনও নারী-টিয়ার জুগ দুইটি পুরুষ-টিয়ার মধ্যে তুমুল দ্বন্দ্ব যুদ্ধ বাধিয়া যাইত, নারী-টিয়াটি শাস্তভাবে বসিয়া যুদ্ধের ফলাফল লক্ষ্য করিত এবং বিজয়ীর গলায় বরমাল্য দিবার জুগ প্রস্তুত থাকিত।

দেৱাঘনে বহু শ্রেণীর পাখী ছিল। তাহাদের সঙ্গীত ও কলকাকলীতে দিক মুখরিত হইত, এবং সর্বোপরি কোকিলের প্লুত স্বর সকলকে ছাপাইয়া উঠিত। বর্ষার অব্যবহিত পূর্বে পাপিয়া দেখা দিত এবং সমস্ত বর্ষাকাল থাকিত। অল্পদিনেই আমি ইহার নামের সার্থকতা * বুঝিতে পারিলাম। কি দিবা কি রাত্রি সূর্যালোকই থাকুক, আর অবিশ্রান্ত বর্ষাই হউক, এই পাখী অবিশ্রান্ত একঘেয়ে স্বরে ডাকিতে থাকিত। অধিকাংশ পাখী আমরা দেখিতে পাইতাম না কেবল তাহাদের ডাক শুনিতাম, কেন না আমাদের ক্ষুদ্র উঠানে কোন গাছ ছিল না। কিন্তু উল্কে আকাশে ঈগল ও চিলের সাবলীল গতিভঙ্গী নিরীক্ষণ করিতাম। কখনও তাহারা তীরবেগে নীচের দিকে নামিত আবার বায়ুতে ভর দিয়া উপরে উঠিয়া যাইত। কখনও কখনও বহু হংস বলাকা আমাদের মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যাইত।

বেরিলী জেলে বহুতর বানর ছিল। তাহাদের হাশ্বোদীপক ভাবভঙ্গী দেখিবার বিষয় ছিল। একটি গটনার কথা মনে আছে; একটা বানরের বাচ্চা কেমন করিয়া আমাদের ব্যারাকের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু উহা দেওয়াল বাহিয়া উপরে উঠিতে পারিতেছিল না, ওয়ার্ডার, সার্জন, কয়েদী ও ভারসিয়ার, ও কয়েদীরা মিলিয়া উহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং উহার গলায় একটি দড়ি বাধিল। অল্প দিকে উচু দেওয়ালের উপর বসিয়া উহার পিতা মাতা (সম্ভবতঃ) এই সব লক্ষ্য করিতে ছিল এবং রাগে ফুলিতেছিল। সহসা তাহাদের মধ্যে একটি বেশ বড় আকারের বানর লক্ষ্য দিয়া নীচে নামিল এবং বানর শিশু বেঠনকারী জনতাকে আক্রমণ করিল। ইহা অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ, কেন না ইহারা সংখ্যায়ও অধিক ছিল এবং ওয়ার্ডার ও কয়েদী ও ভারসিয়ারদের

* ইংরাজীতে Brain fever bird.

হাতে লাঠি ছিল এবং তাহারা দস্তুর মত লাঠি ঘুরাইতেছিল। কিন্তু পরিণামে দুঃসাহসই জয়ী হইল। মালুঘেরা ভয় পাইয়া লাঠি ফেলিয়া পলাইয়া গেল। বানরের বাচ্চাটি মুক্তি পাইল।

আমরা সময় সময় অবাক্তনীয় জীবজন্তু দেখিতাম। আমাদের সেলে সর্বদাই, বিশেষভাবে ঝড় বৃষ্টির পর অনেক বৃশ্চিক দেখা যাইত। কখনও বা আমার বিছানায়, কখনও বা বই তুলিতে গিয়া দেখি তাহার উপর বৃশ্চিক বসিয়া আছে। এইভাবে নানা অপ্রত্যাশিত স্থানে আমি প্রায়ই বৃশ্চিকের দেখা পাইতাম, কিন্তু আশ্চর্য্য এই কখনও একটিও আমাকে দংশন করে নাই। একবার একটা কৃষ্ণ বর্ণ বিষাক্ত-দর্শন বৃশ্চিককে কিছু দিন বোতলের মধ্যে রাখিয়াছিলাম এবং ইহাকে মাছি ইত্যাদি খাইতে দিতাম। একদিন উহাকে সূতা দিয়া বাধিয়া দেওয়ালের উপর রাখিয়াছি, সহসা দেখিলাম যে সূতা কাটিয়া সে পলাইয়াছে। তাহাকে মুক্ত দেখিবার আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না, কাজেই আমি সমস্ত সেল তন্ন তন্ন করিয়া অহুসন্ধান করিলাম কিন্তু আর তাহার সাক্ষাৎ পাইলাম না। আমার সেলে অথবা তাহার নিকটে তিন চারটি সাপও দেখিয়াছি। একবারের ঘটনা, সংবাদপত্রে বড় বড় শিরোনামায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কার্য্যতঃ এই বৈচিত্র্য আমার ভালই লাগিয়াছিল। কারাজীবন অত্যন্ত নীরস, ইহার একটানা গতির মধ্যে যাহা কিছু নূতনত্ব আসে তাহাই ভাল লাগে। কিন্তু তাই বলিয়া আমি সাপ ভালবাসি অথবা তাহাদের আগমনে পুলকিত হই, তাহা নহে বরং সাধারণ মালুঘের মত আমিও সাপ দেখিলে ভয়ে কটকিত হইয়া উঠি। আমি যদি সাপ দেখি তাহা হইলে দংশনের ভয়ে আমি নিশ্চয়ই আত্মরক্ষা করিব। কিন্তু তাহা ঘণা হইতে নহে অথবা ভয়ে অভিভূত হইয়াও নহে। কেবলই দেখিলে আমি অধিকতর আতঙ্কে শিহরিয়া উঠি! ইহা ঠিক ভয় নয়, একটা সহজাত ঘণা। কলিকাতার আলীপুর জেলে একবার আমি মধ্য রাত্রে জাগিয়া অহুভব করিলাম, কি যেন আমার পায়ের উপর হাঁটিতেছে। আমার নিকট একটা টর্চ ছিল, জ্বালাইয়া দেখি বিছানার উপর একটা কেবলুই। স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া অতি দ্রুত আমি বিছানা হইতে লাফাইয়া পড়িলাম, অল্পের জন্য সেলের দেওয়ালে আঘাত পাই নাই। পাল্লোভের ইচ্ছার সম্পর্কহীন প্রতিক্রিয়ায় অর্থ আমি পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিলাম।

দেরাহুনে আমি একটি নূতন প্রাণী দেখিলাম অর্থাৎ আমার নিকট ইহা নূতন প্রাণী। আমি জেলের দরজায় দাঁড়াইয়া জেলারের সহিত

কারাগারে জীবজন্তু

কথা বলিতেছি, এমন সময় দেখিলাম বাহিরে একটি লোক ঐ অদ্ভুত প্রাণীটাকে বহন করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। জেলার তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি দেখিলাম ইহা টিকটিকি ও কুমীরের মাঝামাঝি প্রায় দুই ফুট লম্বা হইবে, পায়ে নখর আছে এবং সমস্ত শরীর পুরু শঙ্কবৃত্ত। এই কুৎসিৎদর্শন প্রাণীটি অত্যন্ত অস্থির এবং ক্রমাগত নিজেকে এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে পাকাইয়া এক প্রকার গ্রন্থির মত করিতেছিল এবং ইহার মালীক স্বচ্ছন্দে ঐ গ্রন্থির মধ্য দিয়া লাঠা চালাইয়া দিয়া ঘাড়ে করিয়া চলিতেছিল। তাহার নিকট শুনিলাম যে ইহার নাম “বো”। জেলার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ইহা দিয়া সে কি করিবে। উত্তরে লোকটা এক গাল হাসিয়া বলিল যে সে উহা “ভাজ্জি” অথাৎ ঝোল রান্না করিয়া খাইবে। সে জঙ্গলে বাস করিয়া থাকে। পরে আমি এফ, ডাবলিউ, চ্যাম্পিয়নের “দি জাঙ্গল্ ইন্ সান্ লাইট এণ্ড শ্রাডো” পুস্তকে দেখিলাম এই জানোয়ারের নাম ‘প্যাঙ্গলীন’*।

কয়েদীদের বিশেষতঃ দীর্ঘদণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদীদের হৃদয় সর্বদাই উপবাসী থাকে। সময় সময় তাহারা কোন প্রাণী পুষিয়া হৃদয়াবেগের চরিতার্থতা সাধন করে। সাধারণ কয়েদীরা অবশ্য ইহা পারে না। কিন্তু কয়েদী মেটদের একটু স্বাধীনতা আছে এবং জেলের কর্মচারীরা সাধারণতঃ আপত্তি করেন না। সচরাচর কাঠ বিড়াল এবং আশ্চর্য্য এই বেজীও তাহারা পুষিয়া থাকে। জেলে কুকুর প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না, কিন্তু বিড়ালের অভাব নাই। একবার একটা বিড়ালের বাচ্চার সহিত আমার ভাব হইয়াছিল। ইহা এক জন জেল কর্মচারীর এবং তিনি বদলী হইবার সময় উহাকে লইয়া গেলেন। কয়েক দিন আমি ইহার অভাব বোধ করিয়াছিলাম। যদিও কুকুর রাখিতে দেওয়া হয় না তথাপি অপ্রত্যাশিতভাবে দেওয়া হইলে জেলে আমাকে কয়েকটি কুকুরের ভার লইতে হইয়াছিল। একজন জেল কর্মচারীর একটা মাদি কুকুর ছিল, তিনি বদলী হইবার সময় ইহাকে ফেলিয়া গেলেন। বেচারী গৃহহারা হইয়া একটা জলনালীর নীচে থাকিত, ওয়ার্ডারদের উচ্ছিষ্ট খুঁটিয়া খাইত এবং প্রায়ই খাইতে পাইত না। আমি জেলের বাহিরে হাজতে ছিলাম

* ইহার সংস্কৃত নাম বজ্রকীট। হিমালয়ের তরাই অঞ্চলের অরণ্যে ইহা পাওয়া যায়। উত্তর বাঙ্গলার তরাইয়ের লোকেরা ইহাকে ‘বনরই’ বলে। ইহার মাংস স্বাদু। ইহার পুরু শক হইতে নিশ্চিত আংটা ধারণ করিলে অর্ধ রোগ আরোগ্য হয় বলিয়া জনশ্রুতি আছে।—অমুবাদক

জওহরলাল নেহরু

বলিয়া সে মাঝে মাঝে খাত্তের আশায় আমার নিকট আসিত। আমি নিয়মিতভাবে তাহাকে খাবার দিতে লাগিলাম, এবং অল্পদিন পরেই সেই জলনানীর নীচে সে এক পাল বাচ্চা প্রসব করিল। কয়েকটা বাচ্চা লাইয়া গেল, তিনটা রহিল, আমি তাহাদের খাওয়াইতাম। একটা বাচ্চার একবার কঠিন পীড়া হইল। ইহাকে লইয়া আমি অত্যন্ত বিব্রত হইয়াছিলাম, আমি উহার সেবা করিতাম এবং কয়েক দিন রাত্রে দশ-বার বার উঠিয়া আমার তাহাকে দেখিতে হইত। বেচারী ঠাচিয়া গেল। আমার সেবা সার্থক হইল দেখিয়া আমিও খুসী হইলাম।

বাহির অপেক্ষা কারাগারের মধ্যেই আমি অধিকতর পশু প্রাণীর সংস্পর্শে আসিয়াছি। আমি সর্বদাই কুকুর ভালবাসি, আমার কয়েকটি কুকুরও ছিল, কিন্তু কাজের চাপে নিজে তত্ত্বাবধান করিতে পারিতাম না। জেলে ইহাদের সঙ্গ পাইয়া আমি খুসী হইয়াছিলাম। ভারতবাসীরা সাধারণতঃ বাড়ীতে পশু প্রাণী পোষা পছন্দ করে না। আশ্চর্য্য এই, পশু পাখীর প্রতি অহিংসার উপদেশ থাকা সত্ত্বেও তাহারা উহাদের প্রতি সাধারণতঃ উদাসীন এবং নিষ্ঠুর। এমন কি যে গাভী হিন্দুদের সর্বাধিক প্রিয় ও অনেকে পূজা পর্য্যন্ত করিয়া থাকে,—যাহা লইয়া দাঙ্গা বাধে, তাহার প্রতিও সদয় ব্যবহার করা হয় না। পূজা ও দয়া প্রায়ই একত্রে দেখা যায় না।

বিভিন্ন দেশ তাহাদের জাতীয় চরিত্র অথবা আকাঙ্ক্ষার প্রতীকরূপে বিভিন্ন পশু পক্ষী গ্রহণ করিয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানীর ঙ্গল, ইংলণ্ডের সিংহ ও বুল-ডগ, ফ্রান্সের যুদ্ধমান কুকুট, প্রাচীন রুষিয়ার ভল্লুক। এই সকল ইষ্টদেবতাতুল্য প্রাণী জাতীয় চরিত্র গঠনে কতটুকু সহায়তা করিয়াছে? ইহারা প্রায় সকলেই আক্রমণশীল, হিংস্র ও শিকারী প্রাণী। এই সকল আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া যাহারা সচেতন ভাবে চরিত্র গঠন করে, তাহারা যে হিংস্র স্বভাব হইবে এবং গর্জন করিয়া অপরের স্বন্ধে পড়িবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। গাভী যাহাদের ইষ্টদেবতা সেই হিন্দুরা যে নিরীহ ও অহিংস হইবে, তাহাতেই বা আশ্চর্য্য কি?

সংঘর্ষ

বাহিরে সংঘর্ষ চলিতে লাগিল; সাহসী নরনারীরা শক্তিশালী ও সুসজ্জ গভর্ণমেন্টের আদেশ শাস্তিপূর্ণ উপায়ে অগ্রাহ্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা জানিতেন যে বর্তমানে অথবা অদূর ভবিষ্যতে উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোন সম্ভাবনাই নাই। বিরামহীন দমননীতি ক্রমশঃ অধিকতর কঠোর হইয়া ভারতে ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপ নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিতে লাগিল। ইহার মধ্যে কোন চাতুর্যের আবরণ রহিল না, ইহাতে আমরা কতকটা সান্ত্বনা পাইলাম। বেয়োনেট জয়ী হইল, কিন্তু একজন বিখ্যাত বোদ্ধা বলিয়াছিলেন, “তুমি বেয়োনেট দিয়া সব করিতে পার, কিন্তু উহার উপর বসিতে পার না।” নিজের আত্মাকে বিক্রয় করিয়া মানসিক কুলটাবৃত্তি অপেক্ষা এই ভাবে শাসিত হওয়া অনেক ভাল। আমরা জেলখানায় দৈহিকভাবে নিরুপায় হইয়াও অনুভব করিতাম, বাহিরের অনেকের অপেক্ষা অধিক সেবা করিতেছি। আমরা দুর্বল বলিয়াই কি আত্মরক্ষার জন্ত ভারতের ভবিষ্যৎকে বিসর্জন দিব? মানুষের বীৰ্য্য, মানুষের শক্তি সীমাবদ্ধ। অনেকে দৈহিক ভাবে অকর্মণ্য হইয়াছেন। অনেকের মৃত্যু হইয়াছে, অনেকে দূরে সরিয়া গিয়াছে, কেহ কেহ বা উদ্দেশ্যের প্রতি কৃতব্রতা করিয়াছে। কিন্তু প্রতিরোধ সত্ত্বেও উদ্দেশ্য অবাহত রহিল,—আদর্শ যদি ম্লান না হয়, আত্মা যদি ভয়হীন থাকে, তাহা হইলে ব্যর্থতা আসিতেই পারে না। মূলনীতি ত্যাগ, নিজেদের অধিকার অস্বীকার এবং অগ্নায়ের নিকট মানিকর বশতা স্বীকারই প্রকৃত ব্যর্থতা। শত্রুর আঘাত-জনিত ক্ষত অপেক্ষা আত্মকৃত ক্ষত আরোগ্য হইতেই অধিক সময় লাগে।

আমাদের দুর্বলতা, জগতের অগ্নায় গতি দেখিয়া মাঝে মাঝে অবসাদ আসে, তথাপি আমরা যাহা সাধন করিয়াছি তাহার জন্ত গর্ববোধও করিয়া থাকি। আমাদের জাতির আচরণ নিশ্চয়ই গৌরবময়; এবং এই সাহসী সৈন্যদলের অগতমরূপে নিজেকে চিন্তা করিয়া বড় আনন্দ।

নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় একবার দিল্লীতে এবং একবার কলিকাতায় কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনের জন্ত চেষ্টা করা হইয়াছিল। কোন বে-আইনী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সাধারণ ভাবে শাস্তির সহিত মিলিত হওয়া

জওহরলাল নেহরু

সম্ভবপর নহে ; চেষ্টা করিতে গেলে পুলিশের সহিত সংঘর্ষ অনিবার্য। কার্যতঃ এই সকল সভা পুলিশ লাঠী চালনা করিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল, এবং বহুলোককে গ্রেফতার করা হইয়াছিল। এই সকল বে-আইনী সম্মেলনের বিশেষ বিশেষত্ব এই যে ভারতের নানাপ্রান্ত হইতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি ইহাতে প্রতিনিধিরূপে যোগ দিয়াছিল। যুক্ত-প্রদেশের লোকেরাই অধিক সংখ্যায় এই দুই সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন, এই সংবাদে আমি হুটু হইয়াছিলাম। ১৯৩০-এর মার্চমাসের শেষভাগে আমার মাতা কলিকাতা কংগ্রেসে যোগ দিবার জন্ত জিদ্ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পণ্ডিত মালব্যজী ও অগ্ন্যাগ্নের সহিত কলিকাতার পথে গ্রেফতার হইয়া আসানসোল জেলে কয়েকদিন ছিলেন। রুগ্না ও দুর্বল হইলেও তিনি যে উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে আমি আশ্চর্য হইলাম। জেলের ভয় তাঁহার অল্পই ছিল, তাহা অপেক্ষাও অধিক অগ্নিপরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার পুত্র, দুই কন্যা ও অগ্ন্যাগ্ন প্রিয়জন সকলেই কারাগারে ; শূন্যভবন নৈশ দুঃস্বপ্নের মত তাঁহার শ্বাসরোধ করিত।

আন্দোলন ক্রমে মন্দীভূত হইয়া, অতি মৃদুভাবে চলিতে লাগিল ; কদাচিৎ উত্তেজনার কিছু ঘটিত। কাজেই আমার চিন্তা ক্রমে অগ্ন্যাগ্ন দেশের প্রতি ধাবিত হইল। কারাগারে যতটা সম্ভব, বৃহৎ অর্থসঙ্কটের মধ্যে পতিত জগতের ঘটনাবলীর গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। এই বিষয়ে যথাসম্ভব পুস্তকাদি পড়িতে লাগিলাম, যতই পাঠ করি, ততই আমার আকাজ্জা, বদ্ধিত হইতে লাগিল। জগতের রক্তমঞ্চে যে বৃহৎ নাট্যের অভিনয় হইতেছে, সর্বত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তিপুঞ্জের যে সংঘাত ও সংঘর্ষ চলিতেছে, ভারতের সমস্যা ও সংঘর্ষ তাহারই একটা অংশমাত্র। এই সংঘর্ষের মধ্যে আমার সহানুভূতি ক্রমবর্দ্ধমান গতিতে কমুনিষ্টদের দিকেই প্রবাহিত হইল।

বহুকাল হইল আমি সমাজতন্ত্রবাদ ও কমুনিজম-এর দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম, রুশিয়ার প্রতিও আমার অহুরাগ ছিল। সোভিয়েট রুশিয়ার অনেক কিছুই আমার ভাল লাগে না—বিপরীত মতবাদ নিষ্ঠুর ভাবে দমন, সর্বসাধারণকে সৈন্তদলে যোগ দিতে বাধ্য করা, অনাবশ্যক বলপ্রয়োগে (আমার বিশ্বাস) বিভিন্ন কার্যপ্রণালী অহুসরণ করিতে বাধ্য করা প্রভৃতি। ধনতান্ত্রিক জগতেও পীড়নমূলক দমন ও হিংসানীতির অসম্ভাব নাই, এবং আমি অধিকতর স্পষ্টরূপে বুঝিতে লাগিলাম যে অর্জন ও সঞ্চয়মূলক সমাজ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তি

ও আশ্রয়ের মূলে রহিয়াছে, হিংসানীতি। হিংসানীতি ব্যতীত ইহা বেশী দিন চলিতে পারিত না। সর্বত্রই অধিকাংশ ব্যক্তি ক্ষুধার ভয়ে অল্পসংখ্যক ব্যক্তির ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইতেছে,— তাহার মহিমা ও সুবিধা বিবিধ প্রকারে বৃদ্ধি করিতেছে, সেখানে খানিকটা রাজনৈতিক সুবিধার মূল্য কতটুকু?

উভয় স্থলেই হিংসানীতি আছে; কিন্তু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সহিত হিংসানীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত; কিন্তু রুশিয়ার হিংসানীতি যতই মন্দ হউক, তাহার লক্ষ্য ও ভিত্তি শাস্তি ও সহযোগিতা; জনসাধারণের প্রকৃত স্বাধীনতা। ক্রটি ও ভুল সত্ত্বেও সোভিয়েট রুশিয়া পর্বতপ্রমাণ বাধা অতিক্রম করিয়াছে এবং নূতন সমাজ বিপ্লবের দিকে অধিকতর অগ্রসর হইয়াছে। যখন অবশিষ্ট জগত অর্থনৈতিক মন্দার বিব্রত হইয়া নানাদিক দিয়া পিছাইয়া যাইতেছে, তখন সোভিয়েট রাষ্ট্রে আমাদের চক্ষুর সম্মুখেই নূতন জগত গড়িয়া উঠিতেছে। মহান লেনিনের অহুগামী রুশিয়ার দৃষ্টি ভবিষ্যতে নিবদ্ধ, তাহার চিন্তা, কি হইতে হইবে; পক্ষান্তরে অগ্ৰাণ্য দেশ অতীতের জীর্ণ মৃতভারে অভিভূত এবং অতীতের অকর্মণ্য নিদর্শনগুলি রক্ষার জগৎ বৃথা শক্তিক্ষয় করিতেছে। সোভিয়েট রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে পশ্চাৎপদ মধ্য এশিয়ার বিশ্বয়কর উন্নতির বিবরণ পাঠে আমি মুগ্ধ হইলাম। দুই দিক বিচার করিয়া আমি সর্বতোভাবে রুশিয়ারই পক্ষপাতী;— এই অন্ধকার ও বিষম জগতে রুশিয়াই উৎফুল্ল আশার আলোকবর্তিকা তুলিয়া ধরিয়াছে।

কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র স্থাপনে সোভিয়েট রুশিয়ার পরীক্ষামূলক কার্যগুলির সাফল্য বা ব্যর্থতার গুরুত্ব অনেক অধিক হইলেও, কম্যুনিষ্ট মতবাদের অভ্রান্ততার উহাতে কোন ইতর বিশেষ হয় না। বলশেভিকেরা ভুল করিতে পারে, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক কারণে তাহারা ব্যর্থ হইতে পারে, কিন্তু তথাপি কম্যুনিষ্ট মতবাদ অভ্রান্তই থাকিতে পারে। এই মতবাদই নির্দেশ করিতেছে যে, রুশিয়ায় যাহা ঘটিয়াছে, অন্ধভাবে তাহার অনুকরণ করা অযৌক্তিক; কোন দেশের ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির স্তর এবং তাহার সমসাময়িক বিশেষ অবস্থার উপরই উহার প্রয়োগ কৌশল নির্ভর করে। ইহা ছাড়া বলশেভিকদের সাফল্য এবং অপরিহার্য ভুল হইতে ভারতবর্ষ ও অগ্ৰাণ্য দেশ যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিতে পারে। সম্ভবতঃ চারিদিকে শত্রু পরিবেষ্টিত বলশেভিকেরা বাহ্য আক্রমণের আশঙ্কায় অতি দ্রুত অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিয়াছিল। ধীরে কাজ হইলে হয়ত পল্লী অঞ্চলের অনেক দুঃখ দুর্দশা নিবারণ করা যাইত। কিন্তু তাহা

জওহরলাল নেহরু

হইলেও প্রশ্ন উঠিবে যে পরিবর্তনের গতি মন্থর করিলে, আমূল পরিবর্তনের প্রকৃত ফল পাওয়া যাইত কি না সন্দেহ। কোন গুরুতর সমস্যা সমাধানের জন্ত সমাজবিজ্ঞাসকে ঢালিয়া সাজিতে হইলে সংস্কারমূলক উপায় দ্বারা তাহা অসম্ভব। পরে উন্নতির গতি যতই দীর্ঘ হউক না কেন, প্রথম পদক্ষেপের সূচনাতে প্রচলিত ব্যবস্থা ভাঙিতেই হইবে, কেন না, উহার প্রয়োজন অবসান হওয়া সত্ত্বেও, উহা ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে ভার স্বরূপ হইয়া বিঘ্নমান রহিয়াছে।

ভারতে ভূমি ও কলকারখানা সংক্রান্ত ও দেশের অগ্রাগ্র প্রধান সমস্যাগুলি একমাত্র বৈপ্লবিক কার্যপদ্ধতি দ্বারাই সমাধান করা যাইতে পারে। মিঃ লয়েড জর্জ তাঁহার “মহাযুদ্ধের স্মৃতি”তে যথার্থ বলিয়াছেন যে, “দুই লক্ষ গহ্বর উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টার মত মৃদুতা আর নাই।”

রুশিয়ার কথা ছাড়িয়া দিলেও মার্কসীয় মতবাদ ও দর্শন আমার মনের অনেক অঙ্ককার কোণ উজ্জল করিয়া তুলিয়াছে। আমার দৃষ্টিতে ইতিহাসের এক নূতন রূপ উদ্ঘাটিত হইল। মার্কসীয় বিশ্লেষণ প্রশালী ইহার উপর এক নূতন আলোক সম্পাত করিল; অজ্ঞাতসারে হইলেও ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি এক শৃঙ্খলা ও উদ্দেশ্যের মধ্য দিয়াই প্রকটিত হইতেছে। অতীত ও বর্তমানের দুঃখ ও অপচয় যতই ভয়াবহ হউক না কেন, বহু বিপত্তির বাধা সত্ত্বেও ভবিষ্যৎ আশায় সমুজ্জ্বল। অর্থোক্তিক মতবাদ হইতে মুক্ত এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর জগুই আমি মার্কসীয় মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হইলাম। অগ্রাগ্র স্থানে ও রুশিয়ার সরকারী কম্যুনিজম-এর মধ্যে অনেক যুক্তিনিরপেক্ষ মতবাদ আছে সত্য এবং প্রায়ই অধিবাসীদিগের প্রতি পীড়নমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ইহা গভীর আক্ষেপের বিষয় হইলেও, ইহা বুঝা কঠিন নহে। সোভিয়েট দেশগুলিতে যখন অতি দ্রুত গুরুতর পরিবর্তন চলিতেছে, তখন কোন বিরুদ্ধতাকে প্রবল হইতে দিলে বার্থতা অতি শোচনীয় হইতে পারিত।

জগদ্ব্যাপী অর্থসঙ্কট ও মন্দা হইতে মার্কসীয় বিশ্লেষণের যৌক্তিকতাই প্রমাণিত হয়। যখন অগ্রাগ্র পদ্ধতি ও মতবাদ অঙ্ককারে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছে, তখন কেবলমাত্র মার্কসীয় মতবাদই ইহা অল্পবিস্তর সম্ভোষণরূপে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া প্রকৃত সমাধানের পথ নির্দেশ করিতেছে।

এই বিশ্বাস আমার মধ্যে যতই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, আমি ততই নূতন উত্তেজনায় সজীবিত হইয়া উঠিলাম; নিরুপদ্রব প্রতিরোধের অসাফল্যজনিত অবসাদ বহুলাংশে উপশম হইল। জগত কি ঈশ্বিত পরিণতির দিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছে না? সম্মুখে যুদ্ধ ও

সংঘর্ষ

খণ্ড-প্রলয়ের আশঙ্কা, তথাপি আমরা অগ্রসর হইতেছি। কেহ নিশ্চয় হইয়া বসিয়া নাই। আমাদের জাতীয় সংঘর্ষ এক সুদীর্ঘ যাত্রাপথের ক্ষণিক বিশ্রাম স্থল; দমন নীতি ও দুঃখভোগের পরিণাম ভালই, ইহা আমাদের জনসাধারণকে ভবিষ্যৎ সংঘর্ষের জগৎ প্রস্তুত করিবে; যে সকল নূতনভাব জগতকে আলোড়িত করিতেছে, তাহারাও তাহা ভাবিতে বাধ্য হইবে। আমাদের মধ্যে দুর্বল ব্যক্তির সন্নিবিষ্ট গেলো আমরা অধিকতর শৃঙ্খলাবদ্ধ, অধিকতর শক্তিশালী হইব, সময় আমাদের অমূল্য।

রুশিয়া, জার্মানী, ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান, চীন, ফ্রান্স, স্পেন, ইতালী ও মধ্য ইউরোপের ঘটনাক্রমে আমি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম এবং সমসাময়িক ঘটনাবলীর জটিল জাল বৃত্তিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। প্রত্যেক দেশ স্বতন্ত্র ভাবে এবং মিলিত ভাবে ঝড়ের মধ্য দিয়াও তরী চালাইবার জগৎ বিরূপ উদ্ভব করিতেছে, আমি কৌতূহলের সহিত লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুর্গতি সমাধানকল্পে ও নিরস্ত্রীকরণ সমস্ত সমাধানের জগৎ আহৃত বিবিধ আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ব্যর্থতা আমাকে আমাদের দেশের ক্ষুদ্র অথচ বিরক্তিকর সাম্প্রদায়িক সমস্যার কথা স্মরণ করাইয়া দিল। জগতে সদিচ্ছার অভাব না থাকা সত্ত্বেও সমস্যার সমাধান হইল না:—যদিও অধিকাংশ লোকেরই বিশ্বাস যে, ব্যর্থতার পরিণাম জগৎব্যাপী বিপর্যয়, তথাপি ইউরোপ ও আমেরিকার খ্যাতিনামা রাজনীতিকগণ একত্র মিলিত হইতে পারিতেছেন না। যে ভাবেই হউক, তাঁহারা ভুল পথে মীমাংসার চেষ্টা করিতেছেন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সত্যপথ গ্রহণ করিবার সাহস নাই।

জগতের ক্রেশ ও সংঘাত চিন্তা করিতে করিতে আমি ব্যক্তিগত ও জাতীয় অশান্তি ও ক্রেশের কথা অনেকাংশে বিস্মৃত হইলাম। জগতের ইতিহাসের এই বৃহৎ বৈপ্লবিক অবস্থার মধ্যে আমি জীবিত আছি, এই চিন্তায় মাঝে মাঝে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতাম। যে মহান পরিবর্তন আসিতেছে, সম্ভবতঃ আমিও জগতে আমার এই গৃহকোণে তাহার মধ্যে কোন যৎসামান্য ভূমিকার অভিনয় করিতে পারি। কখনও বা সমগ্র জগতের সংঘাত ও হিংসানীতির আবহাওয়ায় আমি অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িতাম। বুদ্ধিমান নরনারীরা, মানুষের অধঃপতন ও দাসত্ব দেখিতে এত অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন যে, তাঁহাদের অন্তর্ভূতিহীন হৃদয়ে দারিদ্র্য, দুর্দশা ও অমানুষিকতা দেখিয়া ক্রোধের উদ্বেক হয় না। নীতির কণ্ঠরোধ করিয়া অশিষ্ট ইতরতা ও শূন্যগর্ত আক্ষালন মুখর হইয়া উঠিয়াছে

অথচ ছায়াবান ব্যক্তির নীরব। হিটলারের জয় এবং তাহার পর “খাকী ভীতি”র রাজত্ব দেখিয়া আমি মর্মান্বিত হইলেও, উহা সাময়িক মনে করিয়া নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম। মনে হয়, মানুষের সমস্ত চেষ্টা যেন ব্যর্থ। অন্ধ আবেগে যন্ত্র চালিত হইতেছে, ইহার ক্ষুদ্র এক চক্রদন্ত কি করিতে পারে ?

তথাপি জীবনের কম্যুনিষ্ট-দার্শনিক ব্যাখ্যার মধ্যে সান্ত্বনা ও আশা পাইলাম। ভারতে ইহা কি ভাবে প্রয়োগ করা যায় ? আমরা এখনও রাজনৈতিক স্বাধীনতার সমস্তা সমাধান করিতে পারি নাই, এখনও জাতীয়তার ভাবেই আমাদের হৃদয় পূর্ণ হইয়া আছে। আমরা কি এখনই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্ত চেষ্টিত হইব, না, ব্যবধান যতই সঙ্কীর্ণ হউক একের পর আর গ্রহণ করিব ? জগতের তথা ভারতের ঘটনাপ্রবাহ সামাজিক সমস্তাগুলিকেই মুখ্য করিয়া তুলিতেছে এবং মনে হয়, রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে আর ইহার সহিত স্বতন্ত্র করা সম্ভব হইবে না।

ভারতে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের নীতির ফলে সামাজিক উন্নতিবিরোধী শ্রেণীগুলি রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা অপরিহার্য এবং ভারতে বিভিন্ন শ্রেণী বা দলের সীমারেখা স্পষ্ট হইয়া উঠুক, আমি ইহা প্রত্যাশা করি। কিন্তু এই ঘটনা সকলে অনুভব করেন কি ? দেখা যায়, অনেকেই করেন না। বড় বড় সহরে মুষ্টিমেয় গোঁড়া কম্যুনিষ্ট আছেন, তাঁহারা জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধবাদী ও তীব্র সমালোচক। বিশেষভাবে বোম্বাইয়ে এবং কতক পরিমাণে কলিকাতায় সজ্জবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনও এক প্রকার শিথিল সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়, কিন্তু ইহাও ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে, এমন কি, বুদ্ধিমান সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেও অস্পষ্ট সমাজতান্ত্রিক এবং কম্যুনিজম বিশ্বাস লাভ করিতেছে। কংগ্রেসের তরুণ নরনারীরা যাহারা পূর্বে ব্রাইসের গণতন্ত্র, কিথ এবং মাংসিনী পাঠ করিতেন, এখন তাঁহারা হাতের কাছে পাইলে সমাজতন্ত্রবাদ, কম্যুনিজম ও রুশিয়া সংক্রান্ত গ্রন্থাদি পাঠ করেন। জনসাধারণের দৃষ্টি এই সকল নূতন ভাবের প্রতি আকৃষ্ট করিতে মীরট যড়যন্ত্রের মামলা অনেক সহায়তা করিয়াছে এবং জগতের বর্তমান সঙ্কটের ফলে উহার প্রতি মনোযোগ অধিকতর একাগ্র হইয়াছে। অনুসন্ধানের আগ্রহ, প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা এবং বর্তমান প্রচলিত প্রতিষ্ঠানগুলির উপর সন্দেহ, সর্বত্রই দেখা যায়। মনের হাওয়ার গতি কোন দিকে, তাহা

সংঘর্ষ

যুগ। যাইতেছে, তবে ইহা এখনও যুহুন্দ মল্ল পবন—অনিশ্চিত, আত্মসম্বিশ্রী। কেহ কেহ কামিস্ত ভাব লইয়াও নাড়াচাড়া করেন। স্পষ্ট ও নিশ্চিত মতবাদের এখনও অভাব। জাতীয়তাবাদীই চিন্তাজগতে সর্বাপেক্ষা প্রবল।

যে পর্য্যন্ত না কতকটা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাওয়া যায়, ততদিন জাতীয়তাবাদই মুখ্য প্রেরণার বিষয় থাকিবে, ইহাতে আমার সন্দেহ নাই। এই কারণে অতীত এবং বর্তমানে কংগ্রেসই (কোন কোন শ্রমিক সঙ্ঘ ছাড়া) ভারতে সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল ও তুলনায় বহুগুণে অধিক শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। গত তের বৎসরে গান্ধিজীর নেতৃত্বে ইহা জনসাধারণের মধ্যে অপূর্ণ জাগরণ আনিয়াছে এবং ইহার মধ্যে বুর্জোয়া মতবাদ সঙ্ঘেও, ইহা বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়তা করিয়াছে। ইহার প্রয়োজন এখনও শেষ হয় নাই, এবং যতদিন না জাতীয়তাবাদের স্থান সমাজতান্ত্রিক প্রেরণা গ্রহণ করে, ততদিন ইহা থাকিবে। অতএব, মতবাদ ও কার্যপদ্ধতির দিক দিয়া ভবিষ্যৎ উন্নতি ও অগ্রসর বহুল পরিমাণে কংগ্রেসের সহিতই সংশ্লিষ্ট থাকিবে, তবে অস্বাভাবিক উপায়ও যে ব্যবহৃত হইবে না তাহা নহে।

এই সকল কারণে কংগ্রেস পরিত্যাগ করা আমার মতে জাতীয় অভিব্যক্তির প্রধান ধারা হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা, যে শক্তিশালী অস্ত্র আমরা হাতে পাইয়াছি, তাহার তীক্ষ্ণতা হ্রাস করা এবং সম্ভবতঃ নিষ্ফল বীজত্ব প্রকাশ করিয়া শক্তির অপব্যয় করা। তথাপি কংগ্রেস বর্তমানে যে ভাবে গঠিত, তাহাতে তাহার পক্ষে কি কোন আমূল পরিবর্তনমূলক সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবপর? যদি ঐরূপ কোন প্রস্তাব ইহাতে উপস্থিত করা হয়, তাহা হইলে ইহা দুই বা ততোধিক ভাগে বিভক্ত হইয়া যাইবে, অন্ততঃ বহুসংখ্যক ব্যক্তি ইহার বাহিরে চলিয়া যাইবেন। তবে যদি সুস্পষ্ট মতবাদের ভিত্তিতে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘিষ্ঠ শক্তিশালী ও সম্ভাব্য দল কোন আমূল পরিবর্তনমূলক সমাজতান্ত্রিক কার্যপ্রণালী গ্রহণ করেন, তবে তাহা অবাঞ্ছনীয় নিশ্চয়ই নহে।

কিন্তু বর্তমানে কংগ্রেস অর্থই গান্ধিজী। তিনি কি করিবেন? সময় সময় মতবাদের দিক দিয়া তিনি আশ্চর্যরূপে পশ্চাৎপদ; অথচ কার্যক্ষেত্রে আধুনিক ভারতে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বৈপ্লবিক। তাঁহার ব্যক্তিগত অনগ্রসাধারণ, প্রচলিত মাপকাঠি দিয়া তাঁহাকে বিচার করা যায় না, গ্রামশাস্ত্রের সাধারণ সূত্রও তাঁহার উপর প্রয়োগ করা যায় না। কিন্তু তিনি অন্তরে বৈপ্লবিক, এবং ভারতের রাজনৈতিক

স্বাধীনতালাভের জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ,—রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ না হওয়া পর্যন্ত তিনি নিরলসভাবে কর্ম করিবেন। এই চেষ্টায় গণশক্তি অধিকতর উদ্বোধিত হইবে এবং তিনি নিজেও ধীরে ধীরে সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইবেন বলিয়া আমি কিছু ভরসা রাখি।

ভারতীয় ও বৈদেশিক কম্যুনিষ্টরা বহুবৎসর ধরিয়া গান্ধিজী ও কংগ্রেসকে তীব্রভাবে আক্রমণ এবং কংগ্রেসের নেতাদের উদ্দেশ্যের উপর সর্ববিধ হীন অভিসন্ধি আরোপ করিয়া আসিতেছেন। কংগ্রেসের মতবাদ সম্পর্কে তাঁহাদের আত্মমানিক সমালোচনার কোন কোন অংশে যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় এবং পরবর্ত্তী ঘটনায় অনেকগুলির যৌক্তিকতাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। ভারতীয় রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে প্রথম দিকে কম্যুনিষ্টগণ যে বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন, তাহা আশ্চর্য্যরূপে সত্যে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু যখন সমালোচনামুখে তাঁহারা তাঁহাদের সাধারণ নীতি হইতে বিস্তীর্ণ বর্ণনার ভূমিতে অবতীর্ণ হন, বিশেষভাবে কংগ্রেসের নির্দিষ্ট কার্য্য বিশ্লেষণ করিতে প্রবৃত্ত হন, তখনই তাঁহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়েন। ভারতে কম্যুনিষ্টদের সংখ্যালঘুতার ও প্রভাব প্রতিপত্তি না হইবার অন্যতম কারণ এই যে, বৈজ্ঞানিকভাবে কম্যুনিজম সম্পর্কে প্রচার ও অপরকে স্বমতে আনিবার চেষ্টা না করিয়া তাঁহারা প্রধানতঃ অপরকে গালি দিতেই অধিকতর উৎসাহ প্রদর্শন করেন। ইহাই প্রতিক্রিয়া মুখে তাঁহাদের ঘোরতর অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। ইহাদের অগাধাংশই শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করিয়া থাকেন এবং শ্রমিকদের চিত্তজয় করিবার পক্ষে কয়েকটি বাধাবুলিই যথেষ্ট। কিন্তু কতকগুলি বুলি বা জয়ধ্বনি দিয়া শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের ভুলান যায় না। তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, বর্ত্তমানে মধ্যাশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত ব্যক্তিরাই ভারতের সর্বপ্রধান বৈপ্লবিক শক্তি। গোঁড়া কম্যুনিষ্টদের অপেক্ষা না করিয়াই বহু বুদ্ধিমান ব্যক্তি কম্যুনিজম-এর দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং তথাপি তাঁহাদের মধ্যে ব্যবধান রহিয়াছে।

কম্যুনিষ্টদের মতে কংগ্রেসের নেতাদের উদ্দেশ্য হইল, জনসাধারণ কর্তৃক গভর্ণমেণ্টের উপর চাপ দিয়া ভারতীয় মূলধনী ও জমিদারদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কল-কারখানা ও বাণিজ্যের সুবিধা আদায় করা। কংগ্রেসের কাজ হইল, “কৃষক, কারখানার শ্রমিক ও নিম্ন মধ্যাশ্রেণীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অসন্তোষকে বোম্বাই, আহম্মদাবাদ ও কলিকাতার ধনীদেব রথে জুড়িয়া দেওয়া।” কথিত হয় যে, ভারতীয় ধনীরা

সংস্বৰ্ণ

পশ্চাতে থাকিয়া কংগ্ৰেসের কাৰ্য্যকৰী সমিতিৰূপে গণ-আন্দোলন পরিচালনা কৰিবাব আদেশ দেন। অধিকন্তু কংগ্ৰেসের নেতারা ব্ৰিটিশগণ চলিয়া যান ইহা চাহেন না, তাঁহাদের সাহায্যে ক্ষুণ্ণ জনসাধাৰণকে আয়ত্তের মধ্যে রাখিয়া শোষণ কৰিতে চাহেন; ভারতের মধ্যশ্ৰেণী এই কাজে নিজেরদের সম্যক পৰদৰ্শী বলিয়া মনে করেন না।

শক্তিমান কমুনিষ্টগণ এই প্ৰকাৰ আজগুৰী বিশ্লেষণে বিশ্বাস করেন, ইহা অতি আশ্চৰ্য্য কথা এবং এই প্ৰকাৰ বিশ্বাসের জগুই তাঁহারা ভারতবৰ্ষে ব্যৰ্থকাম হইয়াছেন, তাহাতে বিশ্বিত হইবার কিছু নাই। তাঁহাদের আসল ভুল হইল, তাঁহারা ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে ইউৰোপীয় শ্ৰমিক আন্দোলনের মাপকাঠিতে বিচাৰ করেন; সেখানে শ্ৰমিক আন্দোলনের প্ৰতি শ্ৰমিক নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতার দৃষ্টান্তে তাঁহারা অভ্যস্ত বলিয়া সেই উপমানগত সাদৃশ্য ভারতেও প্ৰয়োগ করেন। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন শ্ৰমিক আন্দোলনও নহে, কৃষক শ্ৰমিক বৃত্তিজীবীদের (প্ৰোলেট্যৰিয়ান) আন্দোলনও নহে। ইহা যে বুৰ্জোয়া আন্দোলন, নামেই তাহার প্ৰমাণ এবং ইহার উদ্দেশ্য একাল পৰ্য্যন্তও রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক স্বত্ববিহীন ব্যৱস্থার পৰিবৰ্ত্তন নহে। এই উদ্দেশ্য প্ৰয়োজনানুৰূপ ব্যাপক নহে বলিয়া সমালোচনা করা যাইতে পারে এবং জাতীয়তাবাদকেও বৰ্ত্তমান কালের অল্পযোগী বলা যাইতে পারে। কিন্তু আন্দোলনের মূল ভিত্তিকে মানিয়া লইলে, নেতারা ভূমিসংক্ৰান্ত ব্যবস্থা স্থখবা গণতান্ত্ৰিক ব্যবস্থা উদ্ভাৱিত কৰে না বলিয়া তাঁহারা জনসাধাৰণের প্ৰতি বিশ্বাসঘাতকতা কৰিয়াছেন, একথা বলা অযৌক্তিক। তাঁহারা একুপ কথা কখনও ঘোষণা করেন নাই। কংগ্ৰেসের মধ্যে এমন অনেকে আছেন,—তাঁহাদের সংখ্যা ক্ৰমেই বাঢ়িতেছে,—তাঁহারা ভূমিসংক্ৰান্ত ও ধনতান্ত্ৰিক ব্যবস্থা পৰিবৰ্ত্তন কৰিতে চাহেন, কিন্তু তাঁহাদের কংগ্ৰেসের নামে কিছু বলিবার অধিকাৰ নাই।

ইহা সত্য যে, ভারতের ধনী সম্প্ৰদায় (বড় জমিদার বা তালুকদারগণ নহেন) জাতীয় আন্দোলনের ফলে প্ৰচুৰ লাভবান হইয়াছেন; ব্ৰিটিশ ও বিদেশী বৰ্জন ও স্বদেশী প্ৰচাৰের ফলে তাঁহাদের সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু ইহা অপরিহাৰ্য্য। জাতীয় আন্দোলন মাৰ্ত্তেই দেশীয় শিল্পের উৎসাহ দান এবং বিদেশী বৰ্জন প্ৰচাৰ কৰিয়া থাকে। কাৰ্য্যক্ষেত্ৰে দেখা যায়, যখন নিৰুপদ্রৱ প্ৰতিৰোধ আন্দোলন চলিতেছে এবং আমরা ব্ৰিটিশ পণ্য বৰ্জন আন্দোলন চালাইতেছি, তখন বোম্বাইয়ের

জওহরলাল নেহরু

কাপড়ের কলের মালিকেরা ল্যাঙ্কাশায়ারের সহিত চুক্তি করিবার স্পর্ধা দেখাইয়াছিল। কংগ্রেসের দৃষ্টিতে ইহা জাতীয় উদ্দেশ্যের প্রতি অতি জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা এবং উহাকে ঐরূপেই অভিহিত করা হইয়াছিল। যখন আমরা অধিকাংশই কারারুদ্ধ, তখন বোম্বাইয়ের কলওয়ালাদের প্রতিনিধি ব্যবস্থা পরিষদে বারম্বার কংগ্রেস ও চরমপন্থীদের নিন্দা করিয়াছেন।

গত কয়েক বৎসরে ভারতবর্ষে ধনী সম্প্রদায় যাহা করিয়াছেন, তাহা কলঙ্ককর সন্দেহ নাই। এমন কি, জাতীয়তাবাদ ও কংগ্রেসের দৃষ্টিতেও তাহা গর্হিত। ওট্টাওয়া চুক্তিতে সাময়িকভাবে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি লাভবান হইয়াছেন বটে, কিন্তু মোটের উপর ইহাতে ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষতিই হইয়াছে এবং ইহাকে ব্রিটিশ মূলধন ও বাণিজ্যের পশ্চাতে স্থান দেওয়া হইয়াছে। ইহা ভারতীয় জনসাধারণের পক্ষে অনিষ্টকর এবং যখন সংঘর্ষ চলিতেছিল, যখন বহু সহস্র ব্যক্তি কারাগারে, তখন এই চুক্তির কথাবার্তা চলিয়াছিল। ফলে প্রত্যেকটি ঔপনিবেশিক বাষ্ট্র ইংলণ্ডের নিকট হইতে মোটা রকম সর্ব আদায় করিয়া লইয়াছে এবং ভারতবর্ষ কেবল দাতার আসন পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। গত কয়েক বৎসর, আর্থিক ভাগ্যাহ্বেষীরা ভারতবর্ষের সর্বনাশ করিয়া সোনা ও রূপার অবৈধ ব্যবসায় চালাইয়াছে।

বড় জমিদার ও তালুকদারেরা গোলটেবিল বৈঠকে সম্পূর্ণরূপে কংগ্রেসের বিরুদ্ধতা করিয়াছে এবং নিকপত্র প্রতিক্রিয়া আন্দোলনকালে তাহারা প্রকাশ্যভাবে নিজেদের গভর্ণমেন্টের পক্ষীয় ঘোষণা করিয়া আমাদের আক্রমণ করিয়াছে। ইহাদেরই সহায়তায় বিভিন্ন প্রদেশে গভর্ণমেন্ট নানাবিধ অডিগ্যান্স আইনসভাগুলিতে পাশ করাইয়া লইয়াছেন। যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় অধিকাংশ জমিদার সদস্যই নিকপত্র প্রতিক্রিয়া আন্দোলনের বন্দীদের মুক্তি-প্রত্যাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন।

জনসাধারণের চাপে পড়িয়া ১৯২১ ও ১৯৩০-এ গান্ধিজী দৃশ্যতঃ আক্রমণমূলক আন্দোলন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এইরূপ কথা সর্বৈব ভুল। অবশ্য জনসাধারণের মধ্যে চাঞ্চল্য ছিল, কিন্তু গান্ধিজী তাহাতে গতিবেগ সঞ্চার করিয়াছিলেন। ১৯২১-এ তিনি প্রায় একক চেটায় কংগ্রেসকে অসহযোগ গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। তিনি যদি কোন প্রকারে বাধা দিতেন, তাহা হইলে ১৯৩১-এ প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক কোন আক্রমণশীল আন্দোলন অসম্ভব হইত।

ইহা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা যে, এমন নিক্রোধ ও অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগত

সংঘর্ষ

সমালোচনা করা হয়, যাহাতে মূল বিষয় হইতে দৃষ্টি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। গান্ধিজীর সদিচ্ছাকে আক্রমণ করা আত্মঘাতী চেষ্টা মাত্র, কেন না, লক্ষ কোটি ভারতবাসীর দৃষ্টিতে তিনি সত্যের জীবন্ত বিগ্রহ। তাঁহাকে যাহারা জানেন, তাঁহারাই বলিবেন, কি ঐকান্তিক আগ্রহে তিনি সত্যত গ্রাম্য কাজ করিবার জন্ত চেষ্টা করিয়া থাকেন।

কম্যুনিষ্টগণ বড় বড় সহরে কারখানার শ্রমিকদের সহিত মেলামেশা করিয়া থাকেন। পল্লী-অঞ্চলের সহিত তাঁহাদের সংস্পর্শ বা অভিজ্ঞতা নাই বলিলেই হয়। কারখানার শ্রমিকদের গুরুত্ব কম নহে এবং ভবিষ্যতে তাহা আরও বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু তাহাদের স্থান কৃষকদের পশ্চাতে, কেন না ভারতের প্রধান সমস্যাই কৃষক সমস্যা। পক্ষান্তরে, কংগ্রেস কর্মীরা পল্লী-অঞ্চলেই ছড়াইয়া আছেন এবং স্বাভাবিক ভাবেই কংগ্রেস এক বৃহৎ কৃষক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। কৃষকেরা আশু অভিপ্রায় সিদ্ধ হইলে কদাচিৎ বৈপ্লবিক মনোভাব দেখাইয়া থাকে এবং ভবিষ্যতে ভারতেও নগর বনাম পল্লী, কারখানার শ্রমিক বনাম কৃষক সমস্যা দেখা দিবে।

বহুসংখ্যক কংগ্রেস নেতা ও কর্মীর সহিত আমার ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিবার সুযোগ হইয়াছে; এবং ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর নরনারীর সম্বন্ধভের জন্ত আমার চিতে কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। তথাপি ইহাদের সহিত আমি অনেক মূল বিষয়ে ভিন্ন মত অবলম্বন করিয়াছি। যাহা আমার নিকট স্বতঃসিদ্ধ; তাহা ইহারা বুঝিতে বা অনুভব করিতে পারিতেছে না দেখিয়া আমি বিষম হইয়াছি। ইহা বুদ্ধির অভাব নহে, আমরা স্বতন্ত্র মতবাদের ক্ষেত্রে বিচরণ করি বলিয়া। এই সীমারেখা সহসা অতিক্রম করা কত কঠিন! প্রত্যেকের স্বগঠিত জীবনের দার্শনিক ভিত্তি স্বতন্ত্র; এবং তাহার মধ্যে আমরা অজ্ঞাতনারেই বদ্ধিত হই। অপরপক্ষকে দোষ দেওয়া নিষ্ফল। সমাজতন্ত্রবাদ, জীবন ও তাহার সমস্যা সম্পর্কে এক নিশ্চিত মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর অপেক্ষা রাখে। ইহা গ্রাম্যশাস্ত্রের বাঁধা রাস্তায় চলে না। লৌকিক গুণ, শিক্ষা দাক্ষা, অতীতের অদৃষ্ট প্রভাব ও বর্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর এই দৃষ্টিভঙ্গী বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। জীবনের অতি তিক্ত অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা আমাদিগকে নূতন পথে ঠেলিয়া দেয় এবং পরিণামে আরও কঠোরতর অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া আমাদিগকে স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করিতে শিখায়। হয় ত বা আমরা এই পরিণতির পথে কিছু সাহায্য করিতে পারি। এবং হয় ত বা—“নিয়তিকে এড়াইবার জন্ত মানুষ যে পথ গ্রহণ করে, সেই পথেই নিয়তি তাহার সম্মুখে উপস্থিত হয়”।

ধন্য কি ?

১৯৩২-এর সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগে আমাদের শান্তিপূর্ণ বৈচিত্র্যহীন কারাজীবনের দৈনন্দিন কার্যপ্রণালী সহসা এক বজ্রাঘাতে বিপর্যস্ত হইয়া গেল। মিঃ রামজি ম্যাকডোনাল্ড প্রদত্ত সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার, অল্পমত শ্রেণীগুলির জ্ঞাত পৃথক নির্বাচন পদ্ধতির প্রতিবাদস্বরূপ গান্ধিজী “মৃত্যুপণে অনশন” করিবার জ্ঞাত সঙ্কল্প করিয়াছেন। লোককে মধ্যাহ্ন করিবার তাঁহার কি আশ্চর্য ক্ষমতা! সহসা নানাবিধ চিন্তায় আমার মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল, মনের মধ্যে নানা সম্ভাবনা ও অনিশ্চিত আশঙ্কা ভাসিয়া উঠিল, এবং আমি সম্পূর্ণরূপে স্থৈর্য হারাইলাম। দুইদিন আমি অন্ধকারের মধ্যে কোন আলোক দেখিতে পাইলাম না। গান্ধিজীর কার্যের পরিণাম চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় দমিয়া গেল। ব্যক্তিগত আকর্ষণও অত্যন্ত প্রবল এবং হয় ত তাঁহার সহিত আর দেখা হইবে না ভাবিয়া আমি অত্যন্ত যাতনা অনুভব করিতে লাগিলাম। এক বৎসর পূর্বে ইংলণ্ড যাত্রার প্রাক্কালে তাঁহার সহিত আমার শেষ দেখা হইয়াছিল। তাহাই কি সর্বশেষ দেখায় পরিণত হইবে ?

নির্বাচনের মত একটা সামান্য বিষয় লইয়া তিনি চরম আত্মোৎসর্গ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহাতে তাঁহার উপর আমার বিরক্তিও হইল। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিণাম কি হইবে? অন্ততঃ সাময়িক ভাবেও বৃহত্তর সমস্যাগুলি কি চাপা পড়িয়া যাইবে না? যদি তাঁহার আশু উদ্দেশ্য সফল হয়, যদি অল্পমত শ্রেণীদের যুক্ত নির্বাচনের অধিকার স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতিক্রিয়ার ফলে কি অনেকেই, কিছু সাফল্য লাভ করিয়াছি, অতএব এখন আর কিছু করিবার প্রয়োজন নাই, এই ধারণার বশবর্তী হইয়া পড়িবে না? তাঁহার এই কার্যের ফলে কি সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা এবং গভর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রসূত শাসনতন্ত্রের পরিকল্পনাগুলি স্বীকার ও গ্রহণ করা হইবে না? ইহার সহিত অসহযোগ ও নিরুপদ্রব প্রতিরোধের কি সঙ্গতি আছে? এত তাগ স্বীকার করিয়া এত সাহসিক প্রচেষ্টার পর আমাদের আন্দোলন কি বিশীর্ণ হইয়া অবশেষে তুচ্ছ ব্যাপারে পর্যাবসিত হইবে?

ধর্ম কি ?

তাঁহার রাজনৈতিক ব্যাপারে ধর্ম ও ভাবপ্রবণতার অবতারণা এবং এই সম্পর্কে প্রায়ই ঈশ্বরের আদেশ উল্লেখ আমার তাঁহার উপর অত্যন্ত রাগ হইল। এমন কি তিনি এমন কথাও বলিলেন যে, ঈশ্বর তাঁহার উপবাসের দিন পর্য্যন্ত নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কি ভয়ঙ্কর দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করিতেছেন !

যদি বাপুর মৃত্যু হয় ? তখন ভারতবর্ষ কিরূপ হইবে ? ভারতের রাজনীতি কি আকার ধারণ করিবে ? এই চিন্তায় আমার হৃদয় নৈরাশ্রে ভরিয়া উঠিল। ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় ও নীরস মনে হইতে লাগিল।

যিনি এই বিপর্য্যয়ের কারণ তাঁহার প্রতি প্রেম ও অসহায় ক্রোধে, চিন্তার পর চিন্তায় আমি আচ্ছন্ন হইয়া উঠিলাম, আমার মস্তিষ্ক বিশৃঙ্খল হইয়া গেল ! কি করিব ভাবিয়া পাইলাম না, আমার মেজাজ লিগড়াইয়া গেল, সকলের উপর রূঢ় হইয়া উঠিলাম, সর্বোপরি নিজের উপরই বেশী রাগ হইতে লাগিল।

তাহার পর এক আশ্চর্য্য ভাবান্তর ঘটিল। ভাবোন্মাদনার অবসানে আমি শান্ত হইয়া দেখিলাম, ভবিষ্যৎ তত অন্ধকারময় নহে। সঙ্কটের মুহূর্ত্তে সম্যকভাবে কার্য্য করিবার বাপুজীর এক আশ্চর্য্য কুশলতা আছে। আমার মতে যদিও তাহার যৌক্তিকতা নির্দ্বারক অসম্ভব, তথাপি এমনও হইতে পারে যে, তাঁহার কার্য্য এমন মহৎ ফল প্রসব করিবে যে, যাহা ঐ নির্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে না, আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ব্যাপক ক্ষেত্রেও তাহা প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবে। যদি বাপুর মৃত্যুও হয়, তাহা হইলেও আমাদের জাতীয় আন্দোলন চলিবে। অতএব, যাহাই ঘটুক না কেন, প্রত্যেকেরই তাহার জগ্ন প্রস্তুত থাকা উচিত। এমন কি, গান্ধিজীর যদি মৃত্যুও হয়, তাহা হইলেও পরাজুথ হইব না, এই ভাবে মনকে প্রস্তুত করিলাম। আমি শান্তভাবে আত্মসম্বরণ করিয়া জগতের সম্মুখীন হইবার জগ্ন প্রস্তুত হইলাম।

তারপর দেশব্যাপী বিরাট আলোড়নের সংবাদ আসিল, সমস্ত হিন্দু সমাজ যেন ষাটুমুখে জাগিয়া উঠিল, মনে হইতে লাগিল যেন অস্পৃশ্যতার অন্তিমকাল উপস্থিত। আমি ভাবিতে লাগিলাম, এরোডা জেলে উপবিষ্ট এই ক্ষীণ মানুষটি কি আশ্চর্য্য যাহুকর, কি নিপুণ ভাবে সূত্র আকর্ষণ করিয়া তিনি জনগণচিত্ত অভিভূত করিতেছেন।

তাঁহার নিকট হইতে আমি একখানি চিঠি পাইলাম। আমার কারাদণ্ডের পর তাঁহার নিকট হইতে এই প্রথম সংবাদ আসিল, দীর্ঘকাল পরে তাঁহার এই চিঠি পাইয়া সুখী হইলাম। তারে তিনি লিখিয়াছেন,—

“এই কর্মীদের বাড়িয়ার মধ্যেও তুমি আমার বন্ধুদের মধ্যে রয়েছ। তোমার মতামত জানিবার অর্থ আমি অত্যন্ত উৎকর্ষিত হইয়াছি। তোমার মত আমার নিকট কত মূল্যবান, তাহা তুমি জান। ইন্দু ও স্বরূপের ছেলেমেয়ের সহিত দেখা হইয়াছে। ইন্দুকে বেশ খুশী মনে হইল, তাহার শরীরও একটু মোটা হইয়াছে। আমি ভালই আছি। তারে উত্তর দাও। ভালবাসা জানিও।”

ইহা অনগ্রসাধারণ, কিন্তু ইহাই তাঁহার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। অননশনক্লেশে এবং অগ্রাগ্র অনেক কাজের মধ্যেও তিনি আমার কথা ও ভাগিনেয় ভাগিনেয়ীদের সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, এমন কি ইন্দিরা যে একটু মোটা হইয়াছে, তাহাও উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। (আমার ভগ্নীও তখন জেলে, এই সব ছেলেমেয়েরা পুণার স্থলে পড়িত। জীবনের অতি ছোটখাট ব্যাপারও তিনি ভোলেন না এবং তাহা কত হৃদয়গ্রাহী !

নির্বীচন-প্রথা লইয়া আপোষ হইয়া গিয়াছে, সে সংবাদও আসিল। জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আমাকে গান্ধিজীর তারের উত্তর দিতে সম্মতি দিয়া যথেষ্ট সৌজ্ঞ্য প্রদর্শন করিলেন। আমি তাঁহার নিকট নিম্নলিখিত তার করিলাম।

“আপনার তার এবং আপোষ হইয়া গিয়াছে এই সংবাদে আমি আনন্দিত ও আশ্বস্ত হইলাম। আপনার উপবাসের সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া আমি মর্মান্বিত ও বিব্রান্ত হইয়াছিলাম। যাহা ইউক, অবশেষে আশার উপর নির্ভর করিয়া আমার মন শান্ত হইয়াছিল। নির্ধ্যাতিত পদদলিত শ্রেণীর জন্ত কোন স্বার্থত্যাগই বড় নহে। স্বাধীনতাকে সর্বমুখ্যতমের স্বাধীনতা দিয়াই বিচার করিতে হইবে, কিন্তু অগ্রাগ্র সমস্তায় আমাদের লক্ষ্য অস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে এই আশঙ্কা করিতেছি। ধর্মের দিক দিয়া বিচার করিতে আমি অক্ষম। আশঙ্কা হয়, আপনার প্রদর্শিত উপায়ের সুবিধা অপরে গ্রহণ করিবে; কিন্তু যাহুকরকে আমি কি উপদেশ দিব। প্রণাম জানিবেন।”

পুণায় সম্মিলিত বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা একথানা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী অতি অস্বাভাবিক দ্রুততার সহিত তাহা স্বীকার করিয়া লইলেন। এবং তদনুসারে তাঁহার বাটোয়ারার পরিবর্তন করিলেন। উপবাস ভঙ্গ হইল। এই শ্রেণীর চুক্তি ও আপোষ আমি অত্যন্ত অপছন্দ করি; কিন্তু উহার বিষয়বস্তু বাদ দিয়াও পুণা-চুক্তি আমি গ্রহণ করিলাম।

উত্তেজনার অবসানে আমরা পুনরায় জেলের দৈনন্দিন কর্মধারার অহুসরণে প্রবৃত্ত হইলাম। হরিজন আন্দোলন ও জেল হইতে গান্ধিজীর কার্যপদ্ধতির সংবাদ আমাদের নিকট আসিল, আমি এই ব্যাপারে স্থখী হইলাম না। মনভাগ্য নির্ধ্যাতিত শ্রেণীর উন্নতি সাধন ও অস্পৃশ্যতা বর্জন আন্দোলনে অপূর্ণ শক্তি সঞ্চারিত হইল সন্দেহ নাই—ইহা চুক্তির ফল নহে, দেশব্যাপী

উৎসাহের ফল। ইহাকে সাদরে গ্রহণ করাই কর্তব্য। কিন্তু ইহাও নিঃসন্দেহ যে, নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের অনিষ্ট হইল। দেশের দৃষ্টি বিষয়ান্তরে চলিয়া গেল এবং অনেক কংগ্রেসকর্মী হরিজন আন্দোলনে যোগ দিলেন। সম্ভবতঃ, এই সকল ব্যক্তি নিরাপদ ক্ষেত্রে কাজ করিবার অছিল। খুঁজিতে-ছিলেন, যাহাতে কারাগমন অথবা ততোধিক মন্দ যষ্টিগ্রহার ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের ভয় নাই। ইহা স্বাভাবিক, সহস্র সহস্র কর্মী প্রত্যেকেই সর্বদা তীব্র দুঃখভোগ ও ভিটা মাটি উচ্ছন্ন হইবার জগ্ন প্রস্তুত থাকিবে, ইহা প্রত্যাশা করা অশ্রুয়। তথাপি আমাদের বিরাট আন্দোলনের এই ক্রমাবনতি লক্ষ্য করা বড় বেদনাজনক। যাহা হউক, নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন চলিতে লাগিল এবং মাঝে মাঝে ১৯৩৩-এর মার্চ-এপ্রিলে কলিকাতা কংগ্রেসের মত দৃশ্যমান ব্যাপারও ঘটিত। গান্ধিজী তখন এরোডা জেলে—তঁাহাকে হরিজন আন্দোলন সম্পর্কে নির্দেশ দিবার এবং লোকজনের সহিত দেখা করিবার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল। যাহা হউক, ইহার ফলে তঁাহার কারাগারে অবস্থিতিজনিত দেশের চিত্তবেদনা অনেকাংশে উপশমিত হইল। এই সকল দেখিয়া আমি বিষাদগ্রস্ত হইলাম।

কয়েক মাস পরে, ১৯৩৩-এর মে মাস, গান্ধিজী তঁাহার একুশ দিন উপবাস আরম্ভ করিলেন। প্রথম সংবাদ পাইয়াই আমি পুনরায় মর্মান্বিত হইলাম, কিন্তু আমি নিজেকে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলাম এবং অপরিহার্য ঘটনার মত ইহাকে গ্রহণ করিলাম। আমার নিকট এই শ্রেণীর উপবাস দুর্বোধ ব্যাপার, এবং সঙ্কল্প গ্রহণের পূর্বে আমার মত জানিতে চাহিলে আমি নিশ্চয়ই দৃঢ়তার সহিত ইহার বিরুদ্ধে মত দিতাম। গান্ধিজীর বাক্যের কি মূল্য তাহা আমি জানি, তঁাহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করাইবার চেষ্টা আমার নিকট অত্যন্ত অশ্রুয় বলিয়া মনে হইল। এই শ্রেণীর ব্যক্তিগত ব্যাপারের গুরুত্ব তঁাহার নিকট অনেক বেশী। অতএব দুঃখবোধ করিলেও আমি ইহা সহ্য করিলাম।

উপবাস আরম্ভ করিবার কয়েকদিন পূর্বে তিনি আমার নিকট তঁাহার বিশিষ্ট ভঙ্গীতে একখানি পত্র লিখিলেন, পত্র পাইয়া আমি অভিভূত হইলাম। তিনি আমার নিকট উত্তর চাহিয়াছিলেন বলিয়া আমি নিম্নলিখিত তার করিলাম।

আপনার পত্র পাইলাম। যে বিষয় আমি বুঝি না, সে সম্বন্ধে কি বলিব? আমি যেন কোন অজ্ঞাতদেশে হারাইয়া গিয়াছি, সেখানে আপনিই একমাত্র পরিচিত স্থান, আর আমি অন্ধকারে হাতড়াইয়া অগ্রসর হইতেছি, কিন্তু পদখলম হইতেছে। যাহাই ঘটুক, আমার অনুরাগ ও চিন্তা আপনারই অভিমুখী হইয়া রহিল।

একদিকে তাঁহার কার্যে আমার সম্পূর্ণ অনবদ্যতা, অন্যদিকে তাঁহাকে আঘাত না করিবার অভিপ্রায়—আমার চিন্তে দ্বন্দ্ব বাধিল। যাহা হউক আমার মনে হইল, আমি তাঁহাকে উৎসাহ দেই নাই; এখন তিনি যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে, অতএব আমার সাধ্যমত তাঁহার সম্ভাব্য বিধান করাই কর্তব্য। সামান্য ব্যাপারেও মানসিক অবস্থার কত পরিবর্তন হয়, তাঁহাকে বাচিবার জ্ঞান প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। আমি আরও ভাবিলাম, যাহাই ঘটুক না কেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলেও আমরা দৃঢ়হৃদয়ে তাহা সহ্য করিব। অতএব, আমি তাঁহার নিকট আর একখানি তার করিলাম ;—

আপনি এক্ষণে মহা পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমি পুনরায় আপনার নিকট প্রেম ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি; আমি এখন স্পষ্টভাবে বুঝিতেছি, যাহাই ঘটুক, তাহাতে কল্যাণই হইবে এবং আপনার জয় অবধারিত।

তিনি উপবাস কাটাইয়া উঠিলেন। উপবাসের প্রথম দিনই তাঁহাকে কারাগার হইতে মুক্তি দেওয়া হইল এবং তাঁহার উপদেশে ছয় সপ্তাহের জ্ঞান নিরুপদ্রব প্রতিরোধনীতি বন্ধ রহিল।

পুনরায় অনশনকালে দেশব্যাপী ভাবাবেগ উথলিয়া উঠিল; আমি আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, রাষ্ট্রক্ষেত্রে ইহা সম্যক উপায় কিনা। ইহা নিছক ধর্ম্মোন্মাদনা এবং ইহার মধ্যে স্পষ্টভাবে চিন্তা প্রত্যাশা করা যায় না। সমস্ত ভারত অথবা অধিকাংশ ব্যক্তি ভক্তিভরে মহাত্মার দিকে অপলকে চাহিয়া রহিল এবং প্রত্যাশা করিতে লাগিল, তিনি অলৌকিক কার্য্যদ্বারা অস্পৃশ্যতা দূর করিবেন, স্বরাজ লাভ করিবেন ইত্যাদি। গান্ধিজী অপরকে চিন্তা করিতে উৎসাহ দেন না, তিনি কেবল পবিত্রতা ও ত্যাগস্বীকার চাহেন। তাঁহার প্রতি আমার আবেগময় আসক্তি সত্ত্বেও আমি অনুভব করিলাম যে, আমি মানসিক দিক দিয়া তাঁহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছি। বহুবার তিনি অভ্রান্ত সহজাত বুদ্ধি লইয়া তাঁহার রাজনৈতিক কার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন। তাঁহার কর্ম্মে জলন্ত উৎসাহ আছে; কিন্তু বিশ্বাসের পথ কি জাতিকে শিক্ষা দেওয়ার সত্যপথ? সাময়িক ভাবে ইহাতে সফল হইলেও পরে কি হইবে?

হিংসা ও সংঘর্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থাকে তিনি কি করিয়া স্বীকার করেন, আমি বুঝিতে পারি না। আমার মধ্যেও দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, দুই পৃথক আত্মগতের দো-টানায় আমি ছিন্নভিন্ন হইতেছি। যখন জেলের এই বাধ্যতামূলক বাধা অপসারিত হইবে, তখন আমাকে

ধর্ম কি ?

বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে, ইহা নিশ্চয় করিয়া বুঝিলাম। আমি নিজেকে নিঃসঙ্গ ও গৃহহারা মনে করিতে লাগিলাম; এবং এই ভারতবর্ষ, যাহাকে আমি প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি, যাহার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছি, তাহা আমার নিকট আশ্চর্য ও বিহ্বলকর বলিয়া মনে হইতে লাগিল। আমার স্বদেশবাসীর চিন্তা ও হৃদয়বেগের মধ্যে আমি প্রবেশ করিতে পারি না, তাহা কি আমার দোষ ? এমন কি আমার ঘনিষ্ঠ সঙ্গীদের সহিতও এক অদৃশ্য ব্যবধান অহুভব করি; দুঃখের কথা, আমি তাহা অতিক্রম করিতে না পারিয়া নিজের মধ্যেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়ি। প্রাচীন জগত, তাহার পুরাতন মতবাদ, আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়া তাহাদিগকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। নবীন জগত এখনও বহুদূরে।

“দুইটি জগতের মধ্যে তাহার লক্ষ্যহীন ভ্রমণ; একটি মৃত, অপরটির জন্মলাভ করিবার শক্তি নাই; তাহার মাথা গুঁজিবার ঠাই কোথায় !”

কথিত হয়, ভারতবর্ষ সর্বোপরি ধর্মের দেশ। হিন্দু, মুসলমান, শিখ প্রত্যেকেই স্ব স্ব ধর্মবিশ্বাসের গর্ব করিয়া থাকে এবং পরা্পরের মাথা ফাটাইয়া তাহা প্রমাণ করে। ধর্ম বলিতে যাহা দেখা যায়, ভস্তুতঃ প্রণালীবদ্ধ যে ধর্ম আমরা ভারতে ও অন্যান্য দেশে দেখি, তাহা আমার নিকট বিভীষিকাপ্রদ। আমি প্রায়ই তাহার নিন্দা করি এবং উহা সমূলে উৎখাত করিবার ইচ্ছা হয়। সর্বত্রই ইহা অন্ধবিশ্বাস ও প্রতিক্রিয়াশীলতা, যুক্তিহীন মতবাদ ও গোড়ামি, কুসংস্কার ও শোষণ এবং কায়েমী স্বার্থরক্ষার প্রশ্রয় দিয়া থাকে। তথাপি আমি জানি, ইহার মধ্যে এমন অতিবিক্ত কিছু আছে, যাহা মানবচিত্তের গভীর আবেগকে পরিতৃপ্ত করে। নতুবা ইহা সেই বিপুল শক্তি কোথায় পাইল যাহা লক্ষ লক্ষ আর্ন্ত নরনারীকে শান্তি ও সাহসনা দিয়াছে ? এই শান্তি কি আজ অন্ধবিশ্বাসের আবরণ, ইহা কি সংশয়সঙ্কুল প্রশ্নের অভাব অথবা ঝটিকাস্কন্ধ সমুদ্র হইতে নিরাপদ বন্দরে উত্তীর্ণ হইবার প্রশান্তি অথবা আরও কিছু বেশী ? কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা নিশ্চয়ই কিছু বেশী :

কিন্তু প্রণালীবদ্ধ ধর্ম অতীতে যাহাই থাকুক না কেন বর্তমানে ইহা প্রাণহীন বাহ্য অহুষ্ঠানের সমষ্টি মাত্র। মি: জি, কে, চেষ্টারটন ইহাকে (তাঁহার নিজস্ব মার্কামারা ধর্ম নহে, অপরের!) প্রাচীনযুগের প্রস্তুতীভূত জীবদের সহিত তুলনা করিয়াছেন—যাহার নিজস্ব অভ্যন্তরীণ প্রত্যঙ্গাদি সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়াছে। সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার উপাদানে পূর্ণ হইয়া ইহা বাহ্য আকার বজায় রাখিয়াছে মাত্র। যদিও কোথায়ও

জওহরলাল নেহরু

কোন মূল্যবান কিছু থাকিয়া থাকে, তাহাও নানা অনিষ্টকর বস্তু সহিত মিশ্রিত।

এই ব্যাপার কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য উভয় দেশের ধর্ম্মেই ঘটিয়াছে। ইংলিশ চার্চ সম্ভবতঃ এই শ্রেণীর ধর্ম্মের প্রকৃষ্ট উদাহরণ; ধর্ম্ম বলিতে যাহা বুঝায় উহাতে তাহার কিছুই নাই। এই কথা অন্যান্য প্রণালীবদ্ধ প্রটেস্ট্যান্ট মত সম্বন্ধে খাটে, কিন্তু চার্চ অফ ইংলণ্ড আরও অগ্রসর হইয়াছে; কেন না দীর্ঘকাল যাবৎ ইহা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।*

এই সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক উন্নত-চরিত্র ব্যক্তি আছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু এই চার্চ যে ভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রের উপর নৈতিক ও খৃষ্টানী আবরণ দিয়াছে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এশিয়া ও আফ্রিকায়

* ভারতে চার্চ অফ ইংলণ্ডের সহিত গভর্ণমেন্টের পার্থক্য বুঝিবার উপায় নাই। সরকারী বেতনভোগী (ভারতের রাজস্ব হইতে) পাদ্রী পুরোহিতেরা উচ্চ কর্মচারীদের মতই সাম্রাজ্যের শক্তির প্রতীক। মোটের উপর, ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে চার্চ রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়ামূলক শক্তি এবং সাধারণতঃ সমস্ত প্রকার উন্নতি ও সংস্কারের বিরোধী। মোটামুটি ভাবে পাদ্রীরা ভারতের অতীত ইতিহাস, সংস্কৃতি সম্পর্কে গভীর ভাবেই অজ্ঞ এবং উহা কি ছিল, বর্তমানে কি তাহা জানিবার জ্ঞান তাহারা বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করেন না। তাহারা হিদেরদের পাপ ও দোষ দেখাইতেই বাস্তব। অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম আছে। চার্লি এনড্রুজ ভারতের একজন অকৃত্রিম বন্ধু, তাহার অপার প্রেম ও সেবার আগ্রহ সর্বদাই আনন্দদায়ক। পুণার খৃষ্টসেবা সঙ্ঘেও কতিপয় উন্নত হৃদয় ইংরাজ রহিয়াছেন, তাহাদের ধর্ম্ম সেবা, মুক্তকীয়ানা নহে এবং তাহারা নিঃস্বার্থভাবে উচ্চপ্রবৃত্তি লইয়া ভারতবাসীর সেবা করিতেছেন। আরও অনেক ইংরাজ মিশনারীর মৃতি ভারতের মৃতিভাণ্ডারে অক্ষর হইয়া রহিয়াছে।

ক্যাণ্টারবেরীর আর্ক-বিশপ, ১৯৩৪-এর ১২ই ডিসেম্বর, লর্ড সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ১৯১৯-এর মট-কোর্ড শাসনসংস্কারের ভূমিকা উল্লেখ করিয়া বলেন—অনেক সময় তাহার মনে হইয়াছে যে, ঐ মহান যোষণা অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া ক্ষিপ্ৰভাবে করা হইয়াছিল এবং যুদ্ধের পর উদারতা প্রকাশ করিবার অধৈর্য্যের ফলে উহা ঘটিলেও, যে লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, তাহা প্রত্যাহার করা যায় না। ইংলিশ চার্চের প্রধান কর্তা ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে এরূপ অতিমাত্রার রক্ষণশীল মনোবৃত্তিসম্পন্ন, ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। যাহা ভারতীয় জনমতের নিকট অসম্পূর্ণ মনে হইয়াছিল এবং বাহার ফলে অনন্যবোণ আন্দোলন ইত্যাদি সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা আর্ক-বিশপের নিকট “অধৈর্য্যাপ্রসূত এবং উদার” বলিয়া মনে হইল। ইংরাজ শাসকগণের নিকট ইহা অত্যন্ত ঐতিহাসিক, এবং হঠকাক্সিতার সহিত প্রকাশিত হইলেও নিজেদের উদারতার জ্ঞান তাহারা নিশ্চয়ই এক আধ্যাত্মিক আনন্দ অনুভব করিবেন।

ধর্ম কি ?

ব্রিটিশ লুণ্ঠন নীতিকে ইহা উচ্চতম নৈতিক আদর্শের দিক হইতে সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং ব্রিটিশ সর্বদাই গ্রায় কাজ করিতেছে, এই ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছে। চার্লস এই শ্রেণীর চোস্ত গ্রায়পরায়ণ মনোভাবের জন্ম দিয়াছে, না, উহাই চার্লসকে সম্ভব করিয়াছে, তাহা আমি জানি না। ইউরোপের অগ্রাগ্র স্বল্প ভাগ্যবান জাতি এবং আমেরিকা গ্রায়ই ইংলণ্ডকে ভগ্নামির অপবাদ দিয়া থাকে; “বিশ্বাশঘাতক এলবিয়ন” একটি অতি পুরাতন বিদ্রূপ, কিন্তু সম্ভবতঃ ব্রিটিশের সাফল্যে ঈর্ষা হইতেই এই শ্রেণীর অপবাদেই উদ্ভব; অগ্র কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই ইংলণ্ডের প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে পারে না, কেন না তাহাদের নিজের কার্যাবলীও অনুরূপ প্রানিজনক। এমন সচেতনভাবে ভগ্নামি করিয়া কোন জাতিই অশাধ সঞ্চিত শক্তি লাভ করিতে পারে নাই, যাহা ব্রিটিশ পুনঃ পুনঃ প্রদর্শন করিয়াছে। যে শ্রেণীর “ধর্ম” তাহারা অবলম্বন করিয়াছে, তাহা তাহাদের যেখানে নিজেদের স্বার্থের সঙ্গে সংশ্রব সেখানে নৈতিক অনুভূতিপ্রবণতা হ্রাসের সহায়ক হইয়াছে। ব্রিটিশ যাহা করিয়াছে, অগ্রাগ্র দেশের লোক বা জাতি তদপেক্ষা অধিকতর মন্দ ব্যবহার করিয়াছে; কিন্তু তাহারা ব্রিটিশের গ্রায় নিজেদের লাভের চেষ্টাকে পুণ্যকর্ম বলিয়া অনুভব করিতে সক্ষম হয় নাই। আমরা সকলেই অতি সহজে পরের চোখের ধূলিকণা দেখাইয়া দিতে পারি; কিন্তু নিজেদের চোখের পর্দাতও দেখিতে পাই না; কিন্তু ইহাতেও ব্রিটিশের জুড়ি নাই। *

প্রটেষ্ট্যান্ট মতবাদ নিজেকে নূতন অবস্থার উপযোগী করিবার জন্য প্রাচীন ও নবীন উভয়ের ভালগুলি গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। ঐহিক ব্যাপারে ইহা আশ্চর্য সাফল্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু ধর্মের দিক দিয়া ইহা ব্যর্থ হইয়াছে; প্রণালীবদ্ধ ধর্মমত হিসাবে ইহা দো-টানায়

* চার্লস অব ইংল্যান্ড কি ভাবে ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে, তাহার একটি দৃষ্টান্ত সম্প্রতি আমার নজরে আসিয়াছে। ১৯৩৪-এর ৭ই নভেম্বর কানপুরে আহৃত যুক্তপ্রাদেশিক খৃষ্টান সম্মেলনের অধ্যক্ষনা সমিতির সভাপতি মিঃ ই. ডি. ডেভিড বলিয়াছেন—“খৃষ্টান হিসাবে আমরা রাজার প্রতি অনুগত থাকিতে ধর্মশাসনের দ্বারা বাধ্য, কেন না তিনি আমাদের ধর্মবিশ্বাসের রক্ষক।” ইহার একমাত্র অর্থ এই যে, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করিতে হইবে। অধিকন্তু মিঃ ডেভিড সিভিল সার্ভিস, পুলিশ, প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র সম্পর্কে ইংলণ্ডের অতিমাত্রায় রক্ষণশীলদের মতের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাদের মতে উহা না থাকিলে ভারতে খৃষ্টান মিশনগুলির বিপদ ঘটিতে পারে।

পড়িয়া ক্রমশঃ ধর্মের পরিবর্তে ভাবপ্রবণতা এবং বৃহৎ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। রোমান ক্যাথলিক ধর্ম এই দুর্ভাগ্য হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছে এবং প্রাচীন ভূমির উপরেই দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া আছে; এবং যতদিন এই ভিত্তি থাকিবে, ততদিন ইহার বিনাশ নাই। বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশে ইহাই একমাত্র (সীমাবদ্ধ অর্থে) জীবন্ত ধর্ম। একজন রোমান ক্যাথলিক বন্ধু আমার নিকট জেলে, ক্যাথলিক মত ও পোপের ধর্ম সম্বন্ধীয় পত্রাবলী সম্বন্ধে কতকগুলি বই পাঠাইয়াছিলেন, আমি সে গুলি আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়াছি। পড়িতে পড়িতে আমি বুঝিতে পারিলাম, কেন বহুলোক ইহার অনুরক্ত। ইসলাম ও জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত হিন্দুধর্মের মতই ইহা সংশয় ও মানসিক দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত করিয়া মানুষকে ভবিষ্যৎ জীবনের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দেয়; ইহাজীবনে যাহা জুটিল না, পরজন্মে তাহা পাওয়া যাইবে।

আমার আশঙ্কা হয়, এই প্রকার নিরাপদ বন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব; আমি চাই উন্মুক্ত সমুদ্র, তরঙ্গসঙ্কুল, বাটকাবিস্কুল। মৃত্যুর পর কি ঘটে, সেই পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে আমার বিশেষ আগ্রহ নাই। এই জীবনের সমস্যাগুলিই আমার মনকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট। চীনের প্রাচীন পরম্পরাগত ধারা যাহা মূলতঃ নৈতিক অথচ ধর্মের সহিত সম্পর্কহীন কিম্বা আধ্যাত্মিক সংশয়বাদ, উহার প্রতি আমার আকর্ষণ আছে কিন্তু আমি উহা জীবনে প্রয়োগ করিতে প্রস্তুত নহি। “টাও”—অর্থাৎ পথ মানিতে হইবে—জীবনের পথ আমার ভাল লাগে, ইহাকে জানিতে হইবে, বুঝিতে হইবে, ইহাকে ত্যাগ করিয়া নহে গ্রহণ করিয়াই ইহাকে প্রতিষ্ঠা ও উন্নত করিতে হইবে। কিন্তু সাধারণতঃ ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গী ইহজগতের সহিত সম্পর্কহীন। আমার মতে ইহা সুস্পষ্ট চিন্তার শত্রু বলিয়াই মনে হয়; নির্ঝিঁচারে কতকগুলি অপরিবর্তনীয় ও স্থনির্দিষ্ট মত ও ধারণা স্বীকার করিয়া লওয়া এবং তদনুসারে ভাবাবেগ, মনের ও ইন্দ্রিয়ের প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করার উপরেই ইহা প্রতিষ্ঠিত। আমি যাহাকে আধ্যাত্মিক বা আত্মিক ব্যাপার বলিয়া মনে করি, ইহা তাহা হইতে বহু দূর এবং ইহা ইচ্ছা করিয়াই বাস্তবকে অস্বীকার করিতে এবং এড়াইতে চাহে; ভয়, বাস্তব হয় ত ইহার পূর্বনির্দিষ্ট ধারণার বিরোধী হইবে। ইহা সঙ্কীর্ণ, পরমত অসহিষ্ণু, ইহা আত্মনিষ্ঠ ও আত্মসত্ত্বী এবং স্বার্থাশ্রয়ী ও স্ববিধাবাদীরা সহজেই ইহাকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগাইতে পারে।

ধর্ম কি ?

ধার্মিক ব্যক্তিদের মধ্যে উচ্চতম আধ্যাত্মিক বা নৈতিক জীবন ছিল না, এবং নাই, আমি এমন কথা বলিতেছি না। কিন্তু ইহার অর্থ এই যে, পরলোকের মাপকাঠিতে বিচার না করিয়া যদি ইহজগতের মাপকাঠিতে নীতি ও আধ্যাত্মিকতার পরিমাপ করা যায়, তাহা হইলে ধর্মপ্রবণতা জাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির কোন সহায়তা করে না, বরং বাধা দিয়া থাকে। ধর্ম সাধারণতঃ ঈশ্বর বা পরমাত্মার সহিত মিলিত হইবার জন্ত অহুসন্ধান এবং ধার্মিক ব্যক্তি সমাজের কল্যাণ অপেক্ষা নিজের মুক্তি লইয়াই ব্যস্ত। নৈতিক আদর্শের সহিত সামাজিক প্রয়োজনের কোন সম্পর্ক নাই। উহা উচ্চাঙ্গের দার্শনিক পাপবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই জন্তই প্রণালীবদ্ধ আন্তর্জাতিক ধর্ম স্বভাবতঃই কার্যময়ী স্বার্থরূপে পরিণত হয় এবং অনিবার্যরূপে সমস্ত প্রকার পরিবর্তন ও উন্নতির বিরুদ্ধ শক্তিরূপে কার্য্য করিয়া থাকে।

থুগটান চার্লস প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে ক্রীতদাসদের সামাজিক উন্নতির জন্ত কোন চেষ্টাই করেন নাই, ইহা সর্বজনবিদিত। অর্থনৈতিক অবস্থার জন্তই মধ্যযুগে ইউরোপে ক্রীতদাসেরা সমস্ত জমিদারদের কৃষি মজুরে পরিণত হইয়াছিল। দুইশত বৎসর পূর্বেও (১৭২৭ সালে) চার্লসের মনোভাব কিরূপ ছিল, তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দক্ষিণ আমেরিকার ঔপনিবেশিক ক্রীতদাসদের মালিকদের নিকট লণ্ডনের বিশপ কর্তৃক লিখিত একখানি পত্রে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। *

বিশপ লিখিয়াছিলেন, “খৃষ্টধর্ম অথবা খৃষ্টশিষ্টাঙ্গ রচিত সর্বগ্রাসী স্বসমাচার, লৌকিক সম্পত্তি এবং লৌকিক সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত কর্তব্যের কোন পরিবর্তন করিতে চাহে না; এ সকল বিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তিই স্ব স্ব রাষ্ট্রব্যবস্থার নিয়মাধীন। খৃষ্টধর্ম যে স্বাধীনতার কথা বলে, সে স্বাধীনতা পাপ ও শয়তানের কবল হইতে মুক্তি, কাম ক্রোধাদি ইন্দ্রিয় গ্রাম ও অপরিমিত কামনা হইতে মুক্তি, কিন্তু তাহাদের বাহ্য অবস্থা যাহাই হউক—দাসই হউক আর স্বাধীনই হউক, বাপ্তাইজ হইয়া খৃষ্টান হইলেও তাহার কোন পরিবর্তনই হইবে না”।

কোন প্রণালীবদ্ধ ধর্মই আজকাল এতটা খোলাখুলি ভাবে অভিমত প্রকাশ করিবে না, কিন্তু মূলতঃ সম্পত্তি ও প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে ইহার ধারণা পূর্বের মতই আছে।

* এই পত্রখানি রেগহোল্ড নেবুরের “মরাল ম্যান এণ্ড ইম্মরাল সোসাইটি” নামক স্বপ্নাণ্ড ও ভাবোদ্ধাপক পুস্তক (৭৮৫ পৃঃ) হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শব্দ দ্বারা মনোভাব গোপন করিবার উপায় অত্যন্ত অসম্পূর্ণ এবং একই কথা বিভিন্ন ব্যক্তি নানাভাবে গ্রহণ করে, কিন্তু “রিলিজ্যান্স” এই শব্দটিকে বিভিন্ন ব্যক্তি যত বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সম্ভবতঃ আর কোন শব্দের এরূপ বিবিধ ব্যাখ্যা সম্ভব হয় নাই (রিলিজ্যান্স শব্দের অগ্ৰাণ্ণ ভাষার প্রতিশব্দ ইহার সহিত বুলিতে হইবে)। ধর্ম এই শব্দটি শুনিলে অথবা পাঠ করিলে মনে যে সকল ভাবমূর্ত্তির উদয় হয়, হয় ত কোন দুই ব্যক্তির ধারণা সেই সম্বন্ধে এক হইবে না। এই সকল ধারণা ও মূর্ত্তির মধ্যে আচার, অনুষ্ঠান, ধর্মপুস্তক, জনসমাবেশ, কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ মতবাদ, নৈতিক ধারণা, ভক্তি, ভালবাসা, ভয়, ঘৃণা, দয়া, দাক্ষিণ্য, ত্যাগ স্বীকার, কঠোর তপস্যা, উপবাস, ভোজ, প্রার্থনা, প্রাচীন ইতিহাস, বিবাহ, মৃত্যু, পরলোক, দাস্তা, মাথা ফাটাফাটি এইরূপ কত কি আছে। এই সকল বহুতর বিমিশ্র ভাবমূর্ত্তি ও ব্যাখ্যা ছাড়িয়া দিলেও ধর্মের মধ্যে এমন এক তীব্র ভাবাবেগের প্রতিক্রিয়া রহিয়াছে, যাহার ফলে নিরপেক্ষভাবে কোন বিষয় বিচার করা অসম্ভব। ধর্ম শব্দ তাহার মূল অর্থ হারাইয়া ফেলিয়াছে। (যদি কিছু থাকিয়া থাকে) এখন ইহাতে কেবল চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হয় এবং প্রায়শঃই পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাখ্যা লইয়া তর্ক ও আলোচনা হইয়া থাকে। যদি এই শব্দটি একেবারে বর্জন করিয়া সীমাবদ্ধ অর্থে ব্যবহার করা যায় এমন কোন শব্দ ব্যবহার করা যাইত, তাহা হইলে অনেক ভাল হইত, যথা; আস্তিক্যবাদ, দর্শন, নীতি, লোকব্যবহার, আধ্যাত্মিকতা, তত্ত্ববিজ্ঞান, কর্তব্য, পর্কোংসব ইত্যাদি। এই সকল শব্দের মধ্যেও অস্পষ্টতা আছে বটে, তাহা হইলেও ইহাদের অর্থ সীমাবদ্ধ, “ধর্মের” মত ব্যাপক নহে। এই সকল শব্দের প্রধান সুবিধা এই যে, এইগুলি ধর্মশব্দের স্থায় ভাবাবেগ ও অনুমানের দ্বারা ততটা আচ্ছন্ন হয় না।

/ তাহা হইলে ধর্ম কি (অসুবিধা সত্ত্বেও এই শব্দটিই ব্যবহার করিতে হইতেছে)? সম্ভবতঃ ইহা ব্যক্তির অন্তঃপ্রকৃতির পরিপুষ্টি এবং তাহার আত্মচেতনাকে বিকশিত করিয়া কল্যাণের পথে পরিচালিত করা। এই কল্যাণের পথ কি তাহাও তর্কের বিষয়। কিন্তু আমি যতদূর বুঝিয়াছি, ধর্ম এই অন্তঃপ্রকৃতির বিকাশের উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকে, বাহিরের পরিবর্তন উহারই বাহ্যবিকাশ মাত্র। অন্তঃপ্রকৃতির এই বিকাশ বাহ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরও প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাও স্বতঃসিদ্ধ যে, বাহ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থাও অন্তঃপ্রকৃতির বিকাশকেও অনুরূপ প্রভাবান্বিত করে। উভয়েই পরস্পরের উপর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করে। আধুনিক পাশ্চাত্য

ধর্ম কি ?

বহুবিজ্ঞানের কলে বাহ্য উন্নতি, আত্মোন্নতিকে বহুদূর ছাড়াইয়া অগ্রসর হইয়াছে, ইহা একটি পুরাতন কথা। কিন্তু ইহাতে প্রমাণ হয় না যে (প্রাচ্যে অনেকে এইরূপ ভাবিয়া থাকেন), যেহেতু আমাদের বাহ্য উন্নতি অতি ধীরে ধীরে হইতেছে, সেইজন্ত আমাদের আত্মোন্নতি অনেক বেশী। এই শ্রেণীর ভ্রান্ত বিশ্বাস দ্বারা আমরা সামান্য লাভের চেষ্টা করি এবং নিজেদের হীনতাবোধ ঢাকিতে চাই। প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া ব্যক্তিবিশেষ হয়ত আত্মোন্নতি সাধন করিতে পারেন। কিন্তু বহুলোক বা জাতির পক্ষে কতকাংশে বাহ্য অবস্থার উন্নতি না হইলে মানসিক সমুন্নতি সম্ভবপর নহে। যে ব্যক্তি আর্থিক, পারিপার্শ্বিক অবস্থার দাস, জীবন সংগ্রামের মধ্যে যাহার শক্তি সীমাবদ্ধ ও অবরুদ্ধ, তাহার পক্ষে উচ্চাঙ্গের আত্মোন্নতি সাধন প্রায় অসম্ভব। পদদলিত ও শোষিত শ্রেণী কখনও মানসিক উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে না। যে জাতি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরাধীন, যাহাদের গতি সীমাবদ্ধ, সঙ্কুচিত, যাহারা শোষিত তাহার। কখনও আত্মোন্নতি সাধন করিতে পারে না। অতএব আত্মোন্নতি করিতে হইলেও স্বাধীনতা ও অতুল পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রয়োজন। বাহ্য স্বাধীনতা লাভ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টার জন্ত এমন উপায় অবলম্বন করা উচিত। যাহা উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের অপহৃব ঘটাইবে না। আমার মনে হয়, গান্ধিজী যখন বলেন উদ্দেশ্য অপেক্ষা উপায়ের গুরুত্ব অনেক বেশী, তখন তাঁহার মনে হয়ত ঐ শ্রেণীর ধারণা থাকে। কিন্তু উপায় এমন হওয়া উচিত, যাহা আমাদেরকে শেষ পর্যন্ত লইয়া যাইবে, অত্যাধিক শক্তিক্ষয় হইবে, এবং এমন কি ভিতরে বাহিরে অধিকতর অধঃপতন হইতে পারে।

গান্ধিজী কোন এক স্থানে লিখিয়াছেন, “ধর্ম ছাড়া কেহই ঝঁচিতে পারে না, এমন অনেকে আছেন যাহারা অহঙ্কারের সহিত ঘোষণা করেন, ধর্মের সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। যদি কেহ বলে যে, নিঃশ্বাস লয় অথচ তাহার নাক নাই, ইহা সেই শ্রেণীর কথা।” অতঃপা তিনি বলিয়াছেন, “আমার সত্যাহুত্বগাই আমাকে রাষ্ট্রক্ষেত্রে টানিয়া আনিয়াছে; যাহারা বলেন যে, ধর্মের সহিত রাজনীতির কোন সম্পর্ক নাই, তাঁহাদিগকে আমি কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া বিনয়ের সহিত বলিব, তাঁহারা ধর্ম কি বুঝেন না।” সম্ভবতঃ এই কথা বলিলে অধিকতর সত্য হইত যদি তিনি বলিতেন, যে সকল ব্যক্তি জীবন ও রাজনীতি হইতে ধর্মকে পৃথক করিয়া রাখিতে চাহে, তাহার। “ধর্ম” বলিতে যাহা বুঝেন, তাহা তাঁহার ধারণা হইতে স্বতন্ত্র। ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, তিনি উহা যে-অর্থে ব্যবহার করেন—সম্ভবতঃ অত্যাধিক

জওহরলাল নেহরু

ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর নৈতিক অর্থে—তাহা ধর্মের সমালোচকগণ হইতে পৃথক। এই ভাবে একই শব্দ সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করিলে পরস্পরের মধ্যে বুঝাপড়া অধিকতর কঠিন হইয়া উঠে।

অধ্যাপক জন ডেওয়ে ধর্মের যে অতি আধুনিক সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন, ধার্মিকেরা তাঁহার সহিত নিশ্চয়ই একমত হইবেন না। তাঁহার মতে ধর্ম, “যাহা দৃশ্যমান জগতের বিক্ষিপ্ত ও গতিশীল ঘটনাপ্রবাহকে এক নির্দিষ্ট স্থিরভূমি হইতে সম্যকরূপে পরিপ্রেক্ষণের সহায়তা করে।” অথবা অগ্রত্ব তিনি বলিতেছেন,—“অথবা কোন আদর্শ সিদ্ধির জগৎ সমস্ত প্রকার বাধার বিরুদ্ধে কর্ম করা, ভীতিপ্রদর্শন অথবা ব্যক্তিগত ক্ষতি সম্বন্ধে উহার সর্বজনীন ও অবিনশ্বর কল্যাণের উপর আস্থা রাখাই ধর্মের লক্ষণ।” ইহাই যদি ধর্ম হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কেহ বিন্দুমাত্র আপত্তি করিবেন না।

রোম্যা রোল্যা ধর্মের অর্থ যে ভাবে প্রসারিত করিয়াছেন তাহাতে সম্ভবতঃ আন্তর্জাতিক ধর্মের গোঁড়ারা ভয় পাইবেন। তিনি “শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী”তে বলিতেছেন,—

“.....এমন অনেকে আছেন, যাহারা বিশ্বাস করেন যে, তাঁহারা সমস্ত প্রকার ধর্মবিশ্বাস হইতে মুক্ত। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা অতিমাত্রায় যুক্তিপন্থী আত্মচেতনার এক প্রকার অবস্থার মধ্যে ডুবিয়া থাকেন। ইহাকে তাঁহারা সমাজতত্ত্ববাদ, সাম্যবাদ, মানবতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, এমন কি যুক্তিবাদও বলেন। বিষয় বস্তু দেখিয়া নহে। চিন্তার প্রকৃতি দেখিয়াই আমরা উহার উৎপত্তিস্থল নির্ণয় করি এবং উহা ধর্মভাব হইতে উদ্ভূত কিনা বিচার করি। যদি দেখা যায় যে, ইহা সর্বস্বপণ করিয়া নির্ভীকভাবে সত্য অনুসন্ধান করিতেছে, একাগ্রচিত্তে অকৃত্রিম বিশ্বাস লইয়া যে কোন আত্মত্যাগে প্রস্তুত, আমি তাহাকেই ধর্ম বলিব। কেন না, মাতৃঘের উত্তমের উপর পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট এক দৃঢ় বিশ্বাস ইহাতে বিद्यমান, যাহা প্রচলিত সমাজ জীবন এমন কি মানবের সমষ্টি জীবন হইতেও উন্নততর, এমন কি, সংশয়বাদও যখন আপনাতে আপনি ঘটল শক্তিশালী চরিত্র হইতে উদ্ভূত হয়, এবং তখন তাহা দুর্বলতা নহে, শক্তিরই পরিচায়ক, তখন সে ধর্মপ্রাণ আত্মার মহান সৈন্তদলের সহিত সমান তালে পা ফেলিয়াই চলে।”

রোম্যা রোল্যা যে সকল নিয়ম ও পণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, আমি সেগুলি পূরণ করিতে পারিব এমন ভরসা রাখি না, তবে ঐ সর্বোপরি আমিও সেই মহান সৈন্তদলের একজন অঙ্গ হইতে প্রস্তুত।

ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের দ্বৈতনীতি

প্রথমে এরোডা জেল হইতে, পরে বাহির হইতে, গান্ধিজীর নির্দেশে হরিজন আন্দোলন চলিতে লাগিল। মন্দির প্রবেশের বাধা অপসারিত করিবার জগ্ৰ তীব্র আন্দোলন চলিতে লাগিল, ঐ মর্মে ব্যবস্থা পরিষদে এক আইনের পাণ্ডুলিপিও উপস্থাপিত হইল। এই সময় এক আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখা গেল, কংগ্রেসের একজন প্রধান নেতা দিল্লীতে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন এবং মন্দির প্রবেশ বিলের অন্তর্কূলে ভোট দিবার জগ্ৰ অনুরোধ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। গান্ধিজী নিজেও তাঁহার মারফতে সদস্যদিগের নিকট এক অনুরোধপত্র প্রেরণ করিলেন। এদিকে কিন্তু নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন চলিতেছে, আমাদের লোকেরা জেলে যাইতেছে এবং কংগ্রেস ব্যবস্থা পরিষদ বয়কট করিয়াছে, কংগ্রেসপক্ষীয় সদস্যগণ উহা ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছেন। বাদবাকী যে কয়জন অপদাথ রহিয়া গেলেন এবং যাহারা আসিয়া শূণ্যস্থান পূরণ করিলেন, তাঁহারা কংগ্রেসের বিরোধিতা এবং গভর্ণমেন্টকে সমর্থন করিয়া সেই সপ্তকের দিনে বেশ খ্যাতিমান হইয়া উঠিলেন। অধিকাংশ সদস্য অভিন্যাসীয় ধারাসম্মিত দমননীতিমূলক আইন প্রণয়ন ও পাশ করাইতে গভর্ণমেন্টকে সাহায্য করিলেন। তাঁহারা ওটাওয়া চুক্তি নিঃশব্দে গিলিয়া ফেলিলেন; দিল্লী, সিমলা ও লণ্ডনে বড় বড় লোকের সহিত খানাপিনা ও আনন্দ-অনুষ্ঠানে যোগ দিয়া ভারতে ব্রিটিশ শাসনের গুণগান করিতে লাগিলেন; এবং ভারতে “দ্বৈতনীতির” সাফল্যের জগ্ৰ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

এই অবস্থার মধ্যে গান্ধিজীর আবেদন এবং কয়েক সপ্তাহ পূর্বেও যিনি কংগ্রেসের অস্থায়ী স্বরাভিষিক্ত সভাপতি ছিলেন সেই রাজাগোপালাচারীর কর্মতৎপরতায় আমি অতিমাত্রায় বিস্মিত হইলাম। ইহাতে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ নীতির নিশ্চয়ই ক্ষতি হইল,—কিন্তু আমি ইহার নৈতিক দিক চিন্তা করিয়া অধিকতর মর্ম্মাহত হইলাম। গান্ধিজী এবং যে কোন কংগ্রেস নেতার এই শ্রেণীর আচরণ আমার নিকট অ-নীতিক এবং যাহারা কারাগারে আছে অথবা সংগ্রাম চালাইতেছে, তাহাদের প্রতি বিশ্বাসভঙ্গের

মত মনে হইল। কিন্তু আমি জানি যে, গান্ধিজীৱি বিচার করিবার প্রণালী স্বতন্ত্র।

মন্দির-প্রবেশ বিলের প্রতি গভর্ণমেণ্টের মনোভাব তৎকালীন ও পরবর্তী ঘটনায় অতি আশ্চর্যরূপে উন্মোচিত হইল। তাঁহারা বিলের সমর্থকদের পথে যথাসম্ভব বাধা সৃষ্টি করিতে লাগিলেন, স্থগিত রাখিতে লাগিলেন। বাধাদানকারীদের উৎসাহ দিতে লাগিলেন, অবশেষে তাঁহারাও প্রকাশ্য ভাবে বিরোধিতা করিয়া বিলটির মৃত্যু ঘটাইলেন। ভারতে সমাজ-সংস্কারমূলক প্রচেষ্টার প্রতি তাঁহাদের মনোভাব অল্পবিস্তর এইরূপই; ধর্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষতার অছিল। লইয়া গভর্ণমেণ্ট সামাজিক উন্নতিতে বাধা দেন। তবে ইহা বলা বাহুল্য যে, ইহাতে আমাদের সামাজিক দোষগুলির সমালোচনা করিতে বা অপরকে একরূপ সমালোচনায় উৎসাহ দিতে তাঁহাদের বাধে না। এক অপ্রত্যাশিত সুযোগে বাল্য-বিবাহ নিরোধ বা শারদা বিল আইনে পরিণত হইয়াছিল; কিন্তু এই মন্দভাগ্য আইনের পরবর্তী ইতিহাস দেখাইয়া দিল যে, উহা প্রয়োগ করিতে গভর্ণমেণ্ট কত অনিচ্ছুক। যে গভর্ণমেণ্ট রাতারাতি অডিট্যান্স সৃষ্টি করিতে পারেন, অভিনব অপরাধ সৃষ্টি করিতে পারেন; উদ্যোগ পিণ্ডি বৃদ্ধির ঘাড়ে চাপাইয়া শাস্তি দিতে পারেন, তাঁহাদের নিজেদের সৃষ্ট অপরাধের জ্ঞাত হাজার হাজার ব্যক্তিকে জেলে পাঠাইতে পারেন, সেই গভর্ণমেণ্টই শারদা আইনের মত বিধিবদ্ধ আইন প্রয়োগ করিতে ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িলেন। এই আইনের প্রথম ফল হইল এই যে, যাহা নিবারণ করা ইহার উদ্দেশ্য,—লোকে তাহাই করিতে লাগিল; অর্থাৎ বাল্য-বিবাহের দৃশ্য পড়িয়া গেল; আইন পাশ হওয়ার ছয় মাস পর ইহা বলবৎ হইবে, এই নিকোঁধ সিদ্ধান্তই উহার জ্ঞাত দায়ী। তাহার পর দেখা গেল, এই আইন একটা পরিহাস মাত্র, অতি সহজেই ইহাকে অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে, গভর্ণমেণ্ট কিছুই করেন না। সরকারী ভাবে প্রচারকার্যের কোন ব্যবস্থাও করা হয় নাই,—পল্লী-অঞ্চলের লোকেরা এই আইন যে কি, তাহা জানে না। তাহারা হিন্দু ও মুসলমান প্রচারকদের নিকট এক বিকৃত বিবরণ শুনিয়াছে মাত্র এবং ঐ প্রচারকেরাও আইনের ধারাগুলি জানে না।

ভারতের সামাজিক অগ্রাগ্রগুলির প্রতি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতার কারণ যে ঐগুলির প্রতি পক্ষপাতিত্ব নহে, ইহা অবশ্য স্বতঃসিদ্ধ। তবে ইহা সত্য যে, ঐগুলি দূর করিবার জ্ঞাত তাঁহাদের কোন আগ্রহ নাই, কেন না ঐ সকল অগ্রাগ্রের ফলে ভারতে তাঁহাদের শাসনকার্য্য অথবা তাহার ধনসম্পদের সদ্ব্যবহার করিবার কোন বিঘ্ন হয় না। সমাজ-

ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বৈতনিকীতি

সংস্কারের প্রস্তাবের ফলে নানা শ্রেণীর লোকের বিরক্তির সম্ভাবনাও রহিয়াছে; রাজনীতিক্ষেত্রে ক্রোধ ও বিরক্তির অসম্ভাব নাই, তাহার উপর আরও বিরক্তি ও দুশ্চিন্তার কারণ ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বৃদ্ধি করিতে চাহেন না। কিন্তু সমাজ সংস্কারকের দৃষ্টিতে কালক্রমে এই অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে, ব্রিটিশগণ ক্রমে ক্রমে ঐ সকল অগ্নায়ের মৌন রক্ষক হইয়া উঠিতেছেন। ইহা তাঁহাদের ভারতে প্রগতিবিরোধী ব্যক্তিদের সহিত অতি ঘনিষ্ঠতার ফল। তাঁহাদের শাসনের প্রতি বিরুদ্ধতার ফলে তাঁহারা অতি আশ্চর্য্য মিত্রদের সহিত মিলিত হইয়াছেন, এবং বর্তমানে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রধান সমর্থক হইলেন, অতিমাত্রায় সাম্প্রদায়িকতাবাদী, ধর্ম্মাঙ্ক প্রগতিবিরোধী এবং সংস্কারবিরোধী ব্যক্তিগণ। মুসলমান সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ, সকল দিক দিয়াই অতি কুংসিতভাবে প্রগতিবিরোধী। হিন্দু মহাসভা ইহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী; কিন্তু পশ্চাৎদিকে গমনের দৌড়ের পাল্লায় সনাতনীর। তাঁহাদিগকে হারাইয়া দিয়াছেন, সনাতনীবা চরমতম ধর্ম্মাঙ্ক সংস্কার-বিরোধিতা উৎসাহের সহিত ঘোষণা করিয়া তাহার সহিত ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্য একত্র মিলাইয়া লইয়াছেন।

যদি গভর্নমেন্ট নীরব থাকিয়া শারদা-আইনকে জনপ্রিয় করিতে বা প্রয়োগ করিতে চেষ্টা না করেন; তাহা হইলে কংগ্রেস ও অগ্নাত্ত বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি উহার অল্পকূলে প্রচারকার্য্য করে না কেন? এই প্রশ্ন ইংরাজ ও অগ্নাত্ত বিদেশী সমালোচকেরা তুলিয়া থাকেন। কংগ্রেসের পক্ষে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, ইহা গত পনের বৎসর ধরিয়া বিশেষভাবে ১৯৩০ সাল হইতে ব্রিটিশ শাসকগণের সহিত জাতীয় স্বাধীনতার জগ্ন অতি তীব্র জীবন মরণ সংঘর্ষে নিযুক্ত রহিয়াছে; অগ্নাত্ত প্রতিষ্ঠানের কোন শক্তিও নাই, জনসাধারণের সহিত যোগও নাই। আদর্শবাদী ও চরিত্রবান নরনারী, ঐহাদের জনসাধারণের উপর প্রভাব আছে, তাঁহারা কংগ্রেসে যোগ দিয়াছেন এবং তাঁহাদের অধিকাংশ সময়ই ব্রিটিশ জেলে থাকিতে হয়।

অগ্নাত্ত প্রতিষ্ঠান, জনসাধারণের সংস্পর্শের ভয়ে ভীত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লইয়া প্রস্তাব পাশ করা ছাড়া আর বেশী অগ্রসর হন না। তাঁহারা অতিশয় ভ্রূব্যক্তির মত, অথবা নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের মাননীয়া মহিলাদের মত কাজ করেন, আক্রমণশীল প্রচারকার্য্য তাঁহাদের ধাতে সহ্য না। ইহা ছাড়া অডিগ্গাল ও অল্পরূপ আইন দ্বারা সাধারণ কার্য্যপ্রণালী তীব্রভাবে দমনের ব্যবস্থার মধ্যেও তাঁহারা পঙ্কু হইয়া পড়িয়াছিলেন।

জওহরলাল নেহরু

সামরিক আইন বৈপ্লবিক কার্যপদ্ধতি ধ্বংস করিতে পারে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উহা সভ্যতা ও তদানুযায়িক কার্যপ্রণালীও পঙ্গু করিয়া ফেলে।

কিন্তু কংগ্রেস ও অগ্রগত প্রতিষ্ঠানগুলি যে সমাজসংস্কারমূলক কার্য করিতে পারেন না, তাহার কারণ আরও গভীর। আমরা জাতীয়তাবাদরূপ ব্যাধিগ্রস্ত, এবং উহার প্রতিই আমাদের সমস্ত লক্ষ্য নিবিষ্ট থাকে। যতদিন পর্যন্ত না আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিতেছি, ততদিন এইরূপই চলিবে। যেমন বার্নাড শ, বলিয়াছেন—“বিজিত জাতি, দূষিত ক্ষত রোগগ্রস্ত ব্যক্তির মত, সে অণু কিছু ভাবিতে পারে না। কোন জাতির পক্ষে জাতীয় আন্দোলনের মত অধিকতর অভিশাপ কিছু নাই। স্বাভাবিক কাজকর্ম বলপূর্ব্বক দাবাইয়া রাখিলে যাহা হয়, উহা সেই তীব্র যন্ত্রণার পরিস্ফুট লক্ষণ। বিজিত জাতিরা জগতের যাত্রাপথে স্ব স্ব স্থান গ্রহণ করিতে পারে না, কেন না, জাতীয় স্বাধীনতা উদ্ধার করিয়া জাতীয় আন্দোলনের হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টা করিবার কোন অধিকার তাহাদের নাই।”

অতীত অভিজ্ঞতা হইতে আমরা ইহাই দেখিয়াছি যে, নির্বাচিত মন্ত্রীদেব হাতে কতকগুলি হস্তান্তরিত বিভাগ থাকা সত্ত্বেও আমাদের পক্ষে সমাজসংস্কারমূলক কার্য অতি অল্পই সম্ভব। গভর্নমেন্টের বিপুল অচলায়তন অবস্থা সর্বদাই রক্ষণশীলদের সহায়ক, এবং অতীতে কয়েক পুরুষ ধরিয়া ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত কর্মসম্পূহা একেবারে ধ্বংস করিয়াছেন, এবং পীড়নমূলক অথবা পিতৃ-বাৎসল্যের নীতি লইয়া শাসন করিয়াছেন, ইহা তাঁহারা বলেন। ব্যাপকভাবে বে-সরকারী কোন সজ্জবদ্ধ উদ্যম তাঁহারা পছন্দ করেন না এবং উহার গুপ্ত উদ্দেশ্য আছে এরূপ সন্দেহ করেন। কর্মীদের যথেষ্ট সাবধানতা সত্ত্বেও হরিজন আন্দোলনেও শাসকদের সহিত সংঘর্ষ হইয়াছে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, কংগ্রেস যদি অধিকতর সাবান ব্যবহার করিবার জন্ত কোন দেশব্যাপী আন্দোলনে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলেও অনেকস্থলে গভর্নমেন্টের সহিত সংঘর্ষ হইবে।

আমার মতে রাষ্ট্র দায়িত্ব গ্রহণ করিলে জনসাধারণকে সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত করান বেশী কঠিন নহে। কিন্তু বিদেশী শাসকগণ সর্বদাই সন্দেহাতুর, জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিতে তাঁহারা বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারেন না; যদি বিদেশী শাসকগণকে সরাইয়া অর্থনৈতিক উন্নতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, তাহা হইলে উৎসাহী ও শক্তিশালী শাসনপদ্ধতি দ্বারা সহজেই স্থায়ী ও দূরপ্রসারী সমাজসংস্কারের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যাইতে পারে।

ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের দ্বৈতনীতি

যাহা হউক, জেলে আমরা সমাজসংস্কার, শারদা আইন অথবা হরিজন আন্দোলন লইয়া মাথা ঘামাইতাম না। তবে হরিজন আন্দোলনের উপর আমি একটু বিরক্ত হইয়াছিলাম, কেন না, ইহা নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের অন্তরায় স্বরূপ হইয়াছিল। ১৯৩৩-এর মে মাসের প্রথম ভাগে ছয় সপ্তাহের জন্ত নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন স্থগিত হইল এবং আমরা পরবর্তী ঘটনার জন্ত উদগীব হইয়া রহিলাম। এই স্থগিত রাখায় আন্দোলনের উপর সর্বশেষ খাঁড়ার ঘা পড়িল, কেন না জাতীয় সংঘর্ষ লইয়া এমন ধরা ও ছাড়ার খেলা চলে না। কেহ ইচ্ছামত ইহাকে বন্ধ বা পরিচালনা করিতে পারে না। এমন কি স্থগিত রাখার পূর্বেই এই আন্দোলনের পরিচালনা বিশেষভাবে দুর্বল ও অকর্মণ্য হইয়া উঠিয়াছিল। অতি তুচ্ছ পরামর্শ সভা হইত এবং এমন সমস্ত গুজব রটিত, যাহা আন্দোলনের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। কংগ্রেসের কয়েকজন স্থলাভিষিক্ত সভাপতি শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক আন্দোলনের সেনাপতি পদে তাঁহাদের নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করা হইয়াছিল। তাঁহারা যে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এরূপ ইন্ধিতের অভাব ছিল না। এবং অস্থবিধাজনক অবস্থা হইতে মুক্তি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও ছিল। উপরের দিকে এই অনিশ্চিত সংশয় ও অব্যবস্থিত চিন্ততার বিরুদ্ধে অসন্তোষ জাগ্রত হইল, কিন্তু কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলি বে-আইনী বলিয়া তাহা যথায়ভাবে প্রকাশিত হইতে পারিল না।

ইহার পরেই গান্ধিজীর একুশ দিন উপবাস, কারামুক্তি এবং ছয় সপ্তাহের জন্ত নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন স্থগিত হইল। উপবাস শেষ হইল, তিনি ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যলাভ করিলেন। জুন মাসের মধ্যভাগে আন্দোলন স্থগিত রাখার মেয়াদ আরও ছয় সপ্তাহ বাড়াইয়া দেওয়া হইল। ইতিমধ্যে গভর্ণমেন্ট কোন দিক দিয়াই দমন নীতি শিথিল করেন নাই। আন্দামানে রাজনৈতিক বন্দীরা (বাঙ্গলায় হিংসামূলক অপরাধের জন্ত দণ্ডিত ব্যক্তিরা তথায় প্রেরিত হইয়াছিল) দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে অনশন আরম্ভ করিল, তাহাদের মধ্যে একজন কি দুইজনের মৃত্যু হইল—অনশনে প্রাণত্যাগ করিল। অনেকে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে লাগিল। ভারতে আন্দামানের ব্যাপার লইয়া জনসভায় যাহারা বক্তৃতা করিল, তাহারা ধরা পড়িয়া কারাদণ্ড লাভ করিল। আমরা যে কেবল সহ করিব তাহা নহে, প্রতিবাদও করিতে পারিব না; এমন কি প্রতিকারের অঙ্গ পথ না পাইয়া অনশনের ভয়াবহ দুঃখ বরণ করিয়া বন্দীরা যদি মৃত্যুমুখে

পতিত হয়, তবুও নহে। কয়েকমাস পরে ১৯৩৩-এর সেপ্টেম্বর মাসে (তখন আমি জেলের বাহিরে) একখানি আবেদনপত্র প্রচারিত হইল। ইহাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি, এফ, এনডুজ এবং কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন এমন অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষর ছিল। ইহাতে আন্দামানের বন্দীদের প্রতি অধিকতর মানবোচিত ব্যবহার এবং তাহাদিগকে ভারতীয় জেলে বদলী করিবার আবেদন ছিল। ভারত গভর্নমেন্টের স্বরাষ্ট্র সচিব এই বিবৃতির প্রতি তাহার গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং বন্দীদের প্রতি সহানুভূতির জ্ঞা স্বাক্ষরকারীদের তীব্র সমালোচনা করিলেন। পরে, আমার যতদূর স্মরণ হয়, এই শ্রেণীর সহানুভূতি প্রকাশ বাঙ্গলাদেশে দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

নিরুপদ্রব প্রতিরোধ স্থগিত রাখিবার দ্বিতীয় ছয় সপ্তাহ শেষ হইবার পূর্বেই দেরাহুন জেলে আমরা সংবাদ পাইলাম, গান্ধিজী পুনরায় একটি ঘরোয়া বৈঠক আহ্বান করিয়াছেন। দুই তিন শত ব্যক্তি সেখানে একত্রিত হইলেন এবং গান্ধিজীর নির্দেশে, সর্বজনীন ভাবে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ স্থগিত করিয়া ব্যক্তিগত আইন অমান্তের অনুমতি দেওয়া হইল এবং সর্বপ্রকার গুপ্ত উপায় নিষিদ্ধ হইল। এই সিদ্ধান্ত এমন কিছু নবীন আশার উদ্দীপক নহে; কিন্তু আমি এই ব্যাপারে বিশেষ কোন আপত্তি করিলাম না। সর্বজনীন নিরুপদ্রব প্রতিরোধ স্থগিত করার অর্থ, বাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করিয়া লওয়া, কেন না প্রকৃত প্রস্তাবে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ তখন জনসাধারণের আন্দোলন ছিল না। গুপ্তভাবে কাজ করাটা কেবল আমরা যে কাজ করিতেছি তাহার ছলনা মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল এবং ইহাতে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের চরিত্রের দোষীল্য প্রকাশিত হইত।

পুণার আলোচনায় আমাদের বর্তমান অবস্থা ও আমাদের লক্ষ্যের বিষয় আলোচনার অভাব দেখিয়া আমি বিস্মিত ও দুঃখিত হইলাম। প্রায় দুই বৎসর তীব্র সংঘর্ষ ও দমননীতির পর কংগ্রেসপন্থীরা একত্র মিলিত হইয়াছিলেন, এই কালের মধ্যে ভারতে এবং বৃহত্তর জগতে কত-কিছু ঘটিয়াছে; শাসনতন্ত্র সংস্কারে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রস্তাব সমন্বিত “হোয়াইট পেপার”ও প্রকাশিত হইয়াছে। এইকালে আমাদের লক্ষ্যকে বলপূর্বক নিষ্পত্ত করিয়া রাখা হইয়াছিল; অত্যাচারকে মূল বিষয়গুলিকে অস্পষ্ট করিবার জ্ঞা অবিরত বিকৃত প্রচারকার্য চলিতেছিল। গভর্নমেন্টের সমর্থকগণ ত বটেই, লিবারেল ও অগ্নাগ্র অনেকে প্রায়ই বলিতে লাগিলেন যে, কংগ্রেস স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিয়াছে। আমার মতে অন্ততঃ আমাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের উপর অধিকতর জোর দিয়া

তাহা পুনরায় স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করা উচিত ছিল, এবং সম্ভব হইলে উহার সহিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যগুলিও প্রকাশ করা উচিত ছিল। কিন্তু তাহার পরিবর্তে আলোচনা—ব্যক্তিগত না সর্বজনীন নিরুপদ্রব প্রতিরোধ, গুপ্তভাবে না ব্যক্তভাবে—ইহাতেই সীমাবদ্ধ রহিল। গভর্ণমেণ্টের সহিত “শান্তি” স্থাপনের অদ্ভুত প্রস্তাবও সেখানে উঠিয়াছিল। আমার যতদূর স্মরণ হয়, গান্ধীজী বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়া তার করিলেন, বড় লাট উত্তর দিলেন,—“না” এবং গান্ধীজী তাহার পরেও দ্বিতীয় তারে “সম্মানজনক শান্তি” সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করিলেন। যখন গভর্ণমেণ্ট বিজয়-গর্বে সর্বতোভাবে জাতিকে দাবাইবার জ্ঞা চেষ্টা করিতেছেন, যখন মানুষ আন্দামানে অনশনে দেহত্যাগ করিতেছে, তখন চিন্তাহারী শান্তির জ্ঞা লালায়িত হইলেও তাহা কোথায় মিলিবে? কিন্তু আমি জানিতাম যে, সর্বদাই শান্তির জ্ঞা প্রস্তুত থাকা গান্ধীজীর স্বভাব।

দমন-নীতি পূর্বেই চলিতে লাগিল, জনসাধারণের স্বাধীন কার্য বন্ধ করিবার জ্ঞা রচিত বিশেষ আইনগুলি কার্য্যকরী রহিল। এমন কি, ১৯৩৩-এর ফেব্রুয়ারী মাসে আমার পিতার মৃত্যুবার্ষিকী স্মৃতিসভাও পুলিশ বন্ধ করিয়া দিল; যদিও এই সভা অ-কংগ্রেসীয় ব্যক্তিরাই ডাকিয়াছিলেন, এবং স্মার তেত্র বাহাদুর সফর মত একজন বিশিষ্ট মডারেট ইহার সভাপতি বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিলেন। এবং ভবিষ্যতের অনুগ্রহ কিরূপ হইবে, তাহা কল্পনা করিবার জ্ঞা আমাদেরকে ‘হায়াইট পেপার’ উপহার দেওয়া হইল।

ইহা এক অপূর্ব দলিল, পড়িতে গেলেই শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসে। ভারতকে এক গরিমাময় ভারতীয় রাষ্ট্রে পরিণত করা হইবে, সেই যুক্তরাষ্ট্রে দেশীয় রাজ্যের সামন্ত প্রতিনিধিগণ আসিয়া মুকব্বীযানা করিবেন। কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলির উপর বাহির হইতে কোন হস্তক্ষেপ সহ করা হইবে না; সেখানে খাঁটি স্বৈচ্ছাতন্ত্র প্রবর্তিত থাকিবে। সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত শৃঙ্খল—ঋণ-শৃঙ্খল আমাদের চিরদিন লগুন নগরীর সহিত বাঁধিয়া রাখিবে এবং ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারকতে আমাদের মুদ্রানীতি ও বিনিময় বাট্টার হার নিয়ন্ত্রণ করিবে। সমস্ত প্রকার কায়েমী স্বার্থ রক্ষার দুর্ভেদ্য ব্যবস্থার সহিত নূতন নূতন কায়েমী স্বার্থও সৃষ্টি হইতে থাকিবে। আমাদের রাজত্ব হস্তপদবদ্ধ অবস্থায় কায়েমী স্বার্থের নিকট বন্ধক দেওয়া থাকিবে। মহান এবং আমাদের অতি আদরের ইম্পিরিয়াল সার্বিস অব্যাহত ও আয়ত্তের বাহিরে থাকিয়া আমাদেরকে আর এক দফা স্বায়ত্তশাসনের জ্ঞা শিক্ষা

জওহরলাল নেহরু

দিতে থাকিবে। প্রাদেশিক স্বাভাব্য দেওয়া হইবে বটে, কিন্তু দয়ালু ও সর্বশক্তিমান গভর্নর ডিস্ট্রিক্টরূপে আমাদেরকে শাস্ত রাখিবেন। সর্বোপরি থাকিবেন, সর্বশ্রেষ্ঠ মহাডিস্ট্রিক্টর বড়লাট, ইচ্ছামত যাহা কিছু করিবার সমস্ত ক্ষমতা তাঁহার থাকিবে এবং ইচ্ছা হইলেই তিনি যাহা কিছু বারণ করিতে পারিবেন। ঔপনিবেশিক গভর্নমেন্ট তৈয়ারীর জগ্ন ব্রিটিশ শাসক সম্প্রদায়ের স্বজনী-প্রতিভার এমন অদ্ভুত বিকাশ কখনও এত প্রত্যক্ষ হয় নাই এবং হিটলার ও মুসোলিনী প্রশংসমান দৃষ্টিতে ভারতের বড়লাটের দিকে চাহিয়া নিশ্চয়ই ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিবেন।

ভারতের হস্তপদ কষিয়া ষাধিবার মত শাসনতন্ত্র রচনা করিবার পর “বিশেষ দায়িত্ব” ও রক্ষাকবচের কতকগুলি অতিরিক্ত বেড়ী লাগাইয়া দেওয়া হইল, যাহাতে এই দুর্ভাগা বন্দী দেশ এক পা’ও নড়িতে না পারে। যেমন মিঃ নেভিল চেম্বারলেন বলিয়াছেন,—“মানুষের বুদ্ধিতে যত প্রকার উদ্ভাবন করা যাইতে পারে, সেই সকল রক্ষাকবচ দিয়া প্রস্তাবগুলি সুরক্ষিত করিতে তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।”

তারপর আমাদেরকে আরও শুনান হইল যে, এই অল্পগ্রহের মূল্যস্বরূপ মোটা টাকা দিতে হইবে—প্রথমে একযোগে কয়েক কোটি টুকা; পরে বাৎসরিক বরাদ্দ। উপযুক্ত মূল্য না দিলে আমরা স্বরাজের আশীর্বাদ কেমন করিয়া লাভ করিব? আমরা অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া মনে করি যে, ভারত দারিদ্র্যপীড়িত, বোঝা অত্যন্ত দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে, ভার লাঘবের জগ্ন আমরা স্বাধীনতা প্রত্যাশা করি। এই কারণেই জনসাধারণ স্বাধীনতার জগ্ন আগ্রহশীল হয়। কিন্তু এখন বুঝা গেল যে, ঐ বোঝা আরও ভারী হইয়া উঠিবে।

ভারতীয় সমস্ত্রার এই হাস্তকর সমাধান যথোচিত ব্রিটিশ সৌজগ্ন সহকারে প্রদত্ত হইল; এবং আমরা শুনিলাম যে, আমাদের শাসকগণ কত উদার। ইতিপূর্বে আর কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পরাধীন জাতিকে এতখানি ক্ষমতা ও স্বযোগ প্রদান করে নাই। যাহারা এতখানি উদারতায় ভীত হইয়া প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন, তাহাদের সহিত দাতাদের ইংলণ্ডে তুমুল তর্ক চলিতে লাগিল। তিনটি গোলটেবিল বৈঠক, অসংখ্য কমিটি ও পরামর্শসভা, তিন বৎসর বহু ব্যক্তির ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে যাতায়াতের পর এই ফললাভ হইল।

কিন্তু ইংলণ্ড গমন পর্ব শেষ হইল না। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নিযুক্ত ‘জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটি’, ‘হোয়াইট পেপার’ লইয়া বিচার করিতে বসিলেন, কতিপয় ভারতীয় সাক্ষী বা এসেসররূপে বিলাতে গেলেন। লণ্ডনে আরও

ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের দ্বৈতনীতি

কতকগুলি কমিটি বসিল, বিনা খরচায় যাতায়াত ও লগুনে বাস করিবার লোভে, যে কোন কমিটির সদস্যপদের জন্ত তলে তলে অমর্যাদাকর তহবিল ও কাড়াকাড়ি চলিল। হোয়াইট পেপারের পাষণ-কঠিন ধারাগুলি দেখিয়াও বীরগণ ভীত হইলেন না, সমুদ্রবাত্রা এ বিমানপোতে যাত্রার বিঘ্নবিপদ তুচ্ছ করিলেন, লগুনে বাস করিবার অধিকতর বিপদ গ্রাহ্য করিলেন না; বাগ্মিতা ও তহবিল করিবার সমস্ত নৈপুণ্য লইয়া তাহারা হোয়াইট পেপারের ধারাগুলি পরিবর্তন করিবার চেষ্টায় লাগিয়া গেলেন। তাহারা জানিতেন এবং বলিতেন যে, ফললাভের কোন আশাই নাই; তাই বলিয়া তাহারা পিছাইয়া যাইবার লোক নহেন, তাহাদের বাহা বলিবার আছে, তাহা তাহারা বলিবেনই, শুনিবার লোক কেহ না থাকিলেও তাহারা বলিবেন। ইহাদের মধ্যে একজন রেসপনসিভিটি দলের নেতা সকলে চলিয়া আসার পরও লগুনে রহিয়া গেলেন,—ইংলণ্ডের কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সহিত সাক্ষাতের পর সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন; বহু ‘ভিনার’ খাইলেন; এবং সেই স্মরণে তাহার ইঙ্গিত রাজনৈতিক পরিবর্তন তাহাদের বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি তাহার স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া উন্মুখ জনসাধারণকে শুনাইলেন যে, মারাঠীর ধৈর্য ও অধ্যবসায় লইয়া তিনি কর্তব্যপালনে বিমুগ্ধ হন নাই এবং লগুনে থাকিয়া শেষ পর্যন্ত তাহার কথা শুনাইয়াছেন।

আমার পিতা প্রায়ই অলুযোগ করিতেন যে, তাহার রেসপনসিভিটি বন্ধুগণের রসবোধ নাই। পরিহাস করিতে গিয়া তাহাকে অনেক সময় বিপদে পড়িতে হইত; তাহারা উহার রসগ্রহণ করিতে পারিতেন না, অগত্যা তিনি বুঝাইয়া তাহাদের শাস্ত করিতেন—অত্যন্ত ঝকঝকী ব্যাপার! রণপ্রিয় মারাঠাদের কেবল অতীত বীরত্ব নহে, আমাদের জাতীয় সংগ্রামে বর্তমানের বীরত্বের কথাও আমি ভাবি, এবং সেই মহান ও অপরাঞ্জেয় তিলকের কথাও মনে হয়। যিনি ভাঙ্গিলেও নত হইতে জানিতেন না।

লিবারেলগণও হোয়াইট পেপার একেবারেই না-পছন্দ করিলেন। ভারতে দিনের পর দিন যে দমন নীতি চলিতেছিল, তাহাও তাহারা ভালবোধ করিতেন না, কদাচিৎ তাহারা উহার প্রতিবাদও করিতেন, কিন্তু সেই সঙ্গে কংগ্রেস ও তাহার কার্যপদ্ধতির নিন্দা করিতেও ভুলিতেন না। তাহারা সময় সময় কোন কোন কংগ্রেস-নেতাকে কারামুক্তি দিবার জন্ত গভর্নমেন্টকে পরামর্শ দিতেন—তাহাদের পরিচিত ব্যক্তিদের দিক দিয়াই তাহারা ভাবিতে অভ্যস্ত। লিবারেল ও রেসপনসিভিটিরা এই

যুক্তি দেখাইতেন যে, অমুক অমুককে ছাড়িয়া দিলে বর্তমানে সাধারণের শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা নাই। যদি সে ব্যক্তি দুর্ব্যবহার করে, তাহা হইলে গভর্নমেন্টের পক্ষে তাহাকে পুনরায় গ্রেফতার করার পথ খোলাই থাকিবে এবং তখন গভর্নমেন্টের কার্যের যৌক্তিকতা অধিকতর প্রমাণিত হইবে। এই সকল যুক্তি দেখাইয়া ইংলণ্ডেও কেহ কেহ অত্যন্ত সদয়ভাবে কার্য্যকরী সমিতির কয়েকজন সদস্য বা কোন ব্যক্তিবিশেষের মুক্তির জন্ত আবেদন করিতে লাগিলেন। যখন আমরা জেলে, তখন যে সকল ভদ্রমহোদয় আমাদের কথা ভাবিতেছেন, আমরা তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া পারি না; তবে সময় সময় মনে হইত যে, এই সকল সহৃদয় বন্ধুরা যদি আমাদের নিষ্কৃতি দিতেন, তাহা হইলেই ভাল হইত। তাঁহাদের সাধু উদ্দেশ্যে আমরা অণুমাত্র সন্দেহ করি না; কিন্তু তাঁহারা যে সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন ইহা স্বতঃসিদ্ধ এবং তাঁহাদের ও আমাদের মধ্যে ব্যবধান অনেক বেশী।

লিবারেলরাও ভারতের এই সকল ঘটনা বিশেষ প্রীতিপ্রদ মনে করিতেন না; তাঁহারা অস্বস্তি বোধ করিতেন, কিন্তু তথাপি তাঁহারা কি করিতে পারেন? গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে কোন কার্য্যকরী পদ্য গ্রহণ করা তাঁহাদের ধারণারও অতীত। কেবলমাত্র নিজেদের স্বাভাবিক করিবার জন্ত তাঁহারা জনসাধারণ অথবা দেশকর্ম্মীদের নিকট হইতে বহুদূর সরিয়া গিয়াছিলেন; এবং ভাসিতে ভাসিতে এমন জায়গায় গিয়া তাঁহারা পৌঁছিলেন, যেখানে তাঁহাদের মতবাদ, গভর্নমেন্টের মতবাদ হইতে পৃথক করিয়া দেখা কঠিন। তাঁহারা সংখ্যায় অল্প এবং জনসাধারণের উপর প্রভাব প্রতিপত্তিহীন, কাজেই তাঁহারা গণ-আন্দোলনের কোন ইतरবিশেষ ঘটাইতে অক্ষম। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন খ্যাতনামা ও সুপরিচিত ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধার পাত্র। এই সকল নেতা এবং সমগ্র লিবারেল ও রেসপনসিভিষ্টরা সর্ব্বটের সময় সরকারী নীতি সমর্থন করিয়া, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রভূত সেবা করিয়াছিলেন। কার্য্যকরী সমালোচনার অভাব এবং লিবারেলগণ কর্তৃক সমর্থন ও অহুমোদনের ফলে গভর্নমেন্টের বে-আইনী চওনীতির পক্ষে মহা সুযোগ ঘটিয়াছিল। এইরূপে যে সময় গভর্নমেন্ট নিজেরাই-দমন নীতির যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতে গলদঘর্ষ হইতেছিলেন, তখন লিবারেল ও রেসপনসিভিষ্টরা তাঁর ও অভূতপূর্ব্ব দমন নীতিকে নৈতিক সমর্থন প্রদান করিয়াছিলেন।

লিবারেল নেতারা বলিতে লাগিলেন, হোয়াইট পেপার মন্দ—অতিশয় মন্দ। কিন্তু ইহা লইয়া কি করা হইবে? ১৯৩৩-এর এপ্রিল মাসে

ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বৈতননীতি

কলিকাতায় মডারেট বৈক বসিল। লিবারেল নেতাদের সর্বপ্রধান মুখপাত্র মি: শ্রীনিবাস শাস্ত্রী বলিলেন যে, শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন যত অসম্ভাবজনকই হউক না কেন, তাঁহাদের উহা লইয়া কার্য্য করাই উচিত। তিনি বলিলেন, “এখন দাঁড়াইয়া থাকিয়া ঘটনাপ্রবাহ দেখার সময় নহে।” তাঁহার মতে কেবল একটি কাজ করা যাইতে পারে, তাহা হইল যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহা লইয়া কাজ করা। তাহা না হইলে অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়। তিনি আরও বলিলেন,— “যদি আমাদের বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, আত্মসংযম, বুঝাইয়া কার্য্যোদ্ধারের ক্ষমতায় প্রতীতি, শাস্ত প্রভাব এবং প্রকৃত যোগ্যতা—এই সকল গুণ থাকে, তাহা হইলে পূর্ণোত্তমে সেগুলি দেখাইবার সময় আসিয়াছে।” কলিকাতার ষ্টেটসম্যান পত্রিকা এই আবেগময় আবেদনে মন্তব্য করিলেন, “আলোকময় বাণী” (সাইনিং ওয়ার্ডস)।

মি: শাস্ত্রী সর্বদাই আবেগময় বক্তৃতা করেন। তাঁহার বাগ্মীমূলভ মনোহর শব্দচয়ন এবং বাক্যরময় প্রয়োগ-নৈপুণ্যে অতুরাগ আছে। কিন্তু তিনি উৎসাহের আধিক্যে আত্মহারা হন এবং তাঁহার স্বল্প শব্দের যাদুমন্ত্র অপরের নিকট, সম্ভবত: তাঁহার নিজের নিকটও অর্থহীন হইয়া উঠে। যখন নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন চলিতেছিল, সেই সময় কলিকাতায় ১৯৩৩-এর এপ্রিল মাসে তাঁহার এই আবেদন বিশেষভাবে বিচার্য্য। মূলনীতি অথবা উদ্দেশ্য ছাড়াও দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথমত: যাহাই ঘটুক না কেন, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট আমাদের কাছে যতই অপমানিত, নিপীড়িত, পরাস্তৃত এবং শোষণ করুক না কেন, আমাদের কাছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমাদের এক নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করা উচিত নহে, তবে সে সীমারেখা কখনও অঙ্কিত হইবে না। দলিত কীটও মাথা ফিরাই, কিন্তু মি: শাস্ত্রীর উপদেশে ভারতবাসীর তাহাও করা উচিত নহে। তাঁহার মতে অন্য পথ নাই। ইহার অর্থ এই যে, তাঁহার নিজের দিক দিয়া ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সিদ্ধান্তগুলি আত্মগত্যা স্বীকারের সহিত গ্রহণ করা ধর্ম্ম (যদি এই অস্পষ্ট শব্দটি ব্যবহার করা সম্ভব হয়)। আমরা চাই আর নাই চাই, সকলে মিলিয়া অদৃষ্ট, নিয়তি অথবা কিসমৎকে গ্রহণ করিতে বাধ্য।

ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, তিনি কোন নিশ্চিত পরিস্থিতি সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেন নাই। যদিও ফল যে মন্দ হইবে, সে সম্বন্ধে সকলের মোটামুটি ধারণা থাকিলেও ‘শাসনতন্ত্রগত পরিবর্তন’ তখনও গঠন করা হইতেছে। তিনি যদি বলিতেন যে, হোয়াইট পেপারের

প্রস্তাবগুলি মন্দ হইলেও সকল দিক বিবেচনা করিয়া আমি বলিতেছি যে, ঐগুলি আইনে পরিণত হইলে উহা লইয়া কাজ করা উচিত, তাহা হইলে তাঁহার উপদেশ ভাল হউক, মন্দ হউক, তাহার সহিত বাস্তব ঘটনার সংশ্রব থাকিত। কিন্তু মি: শাস্ত্রী আরও অগ্রসর হইয়া বলিলেন যে, শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন, যত অসম্ভবজনকই হউক না কেন, তাঁহার উপদেশ ঐরূপই থাকিবে। জাতির অতি মর্যাদাসিক বিষয় লইয়াও তিনি সাদা কাগজে স্বাক্ষর করিয়া ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের হাতে দিতে সর্বদাই প্রস্তুত। কোন ব্যক্তি বা দল কিরূপে অদৃষ্টপূর্ব ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এমন স্বীকৃতিমূলক মনোভাব দেখাইতে পারেন, আমার পক্ষে তাহা বুঝা কঠিন; হয় ত ইহাদের কোন প্রকার নীতি বা নৈতিক ও রাজনৈতিক মাপকাঠি নাই; ইহাদের মূলমন্ত্র ও কর্মনীতি হইল শাসকদের হুকুম বা আদেশ অবিচারিত আহুগত্যের সহিত গ্রহণ করা।

দ্বিতীয় বিষয় হইল কর্মকৌশলের কথা। নূতন শাসন সংস্কার আইনে পরিণত হইবার দীর্ঘ যাত্রাপথে হোয়াইট পেপার অগ্রতম বিশ্রামস্থল। গভর্নমেন্টের দিক হইতে ইহা এক প্রয়োজনীয় বিরামকেন্দ্র—পরবর্তী যাত্রাপথে আরও এরূপ অনেক অবসর আছে, যেখানে ইহা ভাল কি মন্দ দুইদিকেই পরিবর্তিত হইতে পারে। বিভিন্ন স্বার্থের দিক হইতে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তথা পার্লামেন্টের উপর চাপ দেওয়ার উপরই এই পরিবর্তন নির্ভর করে। এই টানাটানিতে ভারতীয় লিবারেলদিগকে হাত করিবার জগৎ গভর্নমেন্ট প্রস্তাবগুলিকে অধিকন্তর উদার অস্তিত্ব: অধিকার সঙ্কোচের কঠোরতা হ্রাস করিতে চেষ্টা করিতে পারিতেন, ইহা অহুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু গ্রহণ কি বর্জন, নূতন শাসনতন্ত্র লইয়া কাজ করা কি না করা, এ প্রশ্ন উঠিবার বহু পূর্বেই, মি: শাস্ত্রীর সুস্পষ্ট ঘোষণা হইতে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভাল করিয়াই বুঝিলেন যে, তাঁহারা ভারতীয় লিবারেলদিগকে সম্পূর্ণরূপেই অবজ্ঞা করিতে পারেন। ইহাদিগকে হাত করার কোন কথাই উঠে না। ইহাদিগকে তেলিয়া ফেলিয়া দিলেও ইহারা গভর্নমেন্টকে ছাড়িবে না। আমি যতটা পারি, কলিকাতায় মি: শাস্ত্রীর বক্তৃতা লিবারেলদের দৃষ্টি দিয়া বিচার করিয়া আমার মনে হইল, কর্মকৌশল হিসাবেও ইহা অতি মন্দ এবং লিবারেলদের উদ্দেশ্যও ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

মি: শাস্ত্রীর পুরাতন বক্তৃতার উপর এত কথা লিখিবার কারণ ইহা নহে যে, ঐ বক্তৃতা বা কলিকাতার মডারেট বৈঠকের বিশেষ কোন গুরুত্ব আছে; লিবারেল নেতাদের মনস্তত্ত্ব ও মানসিক অবস্থা বুঝিবার

ব্রিটিশ মন্তব্যমেন্টের দৈর্ঘ্যনীতি

আগ্রহ হইতেই ইহা আমি আলোচনা করিলাম। ইহার যোগ্য ও প্রভাষ্য ব্যক্তি, তথাপি অশেষ সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমি বুদ্ধিতে পারি না যে, ইহার কেন এরূপ কাজ করেন। জেল মিঃ শাস্ত্রীর আর একটি বক্তৃতা পড়িয়া আমি অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়াছিলাম। ১৯৩৩-এর জুন মাসে পুণায় তিনি সার্ভেন্ট অব্ ইণ্ডিয়া সোসাইটিতে (তিনিই উহার সভাপতি) একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সংবাদে প্রকাশ, ভারতে ব্রিটিশ প্রভাব সহসা অন্তহিত হইলে কি বিপদ হইবে তাহা দেখাইতে গিয়া তিনি বলিলেন, রাজনৈতিক আন্দোলনে ঘণা, উৎপীড়ন, এক দল কর্তৃক অগ্র দলের নির্যাতন বৃদ্ধি পাইবে। অগ্রদিকে পরমতসাহসুতাই ব্রিটিশ রাজনৈতিক জীবনের চিরন্তন নীতি; অতএব, ভবিষ্যতে ভারত ব্রিটেনের সহিত সহযোগিতা করিলে ভারতেও পরমতসাহসুতা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। জেলে থাকায় আমাকে কলিকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত মিঃ শাস্ত্রীর বক্তৃতার সারাংশের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। স্টেটসম্যান মন্তব্য করিয়াছেন,—“ইহা অত্যন্ত মধুর মতবাদ, আমরা দেখিলাম, ডাক্তার মুঞ্জো এই মন্তব্য বক্তৃতা করিয়াছেন।” সংবাদে আবও প্রকাশ যে, মিঃ শাস্ত্রী রুশিয়া, ইতালী ও জার্মানীতে স্বাধীনতা অগ্ৰহণ এবং ঐ সকল দেশে অনুষ্ঠিত অমানুষিক অত্যাচার ও বর্বরতার কথাও উল্লেখ করিয়াছেন।

ইহা পড়িবামাত্র আমার প্রথমেই মনে পড়িল, ভারত ও ব্রিটেন সম্পর্কে মিঃ শাস্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত ব্রিটিশ রক্ষণশীল দলের কি আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য! খুঁটিনাটি ব্যাপারে পার্থক্য থাকিলেও, মূল মতবাদ এক। নিজের মর্ম্মগত বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ না করিয়াও মিঃ উইনষ্টন চার্চিল ঠিক এই ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারিতেন। এহেন মিঃ শাস্ত্রী লিবারেল দলের মধ্যেও বামপন্থী এবং তাহাদের একজন স্বেযোগ্য নেতা!

আমার আশঙ্কা হয়, মিঃ শাস্ত্রীর ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা, জগতের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে, বিশেষভাবে ভারত ও ব্রিটেন সম্পর্কে তাঁহার মতবাদ আমি মানিয়া লইতে অক্ষম। সম্ভবতঃ ইংরাজ নহেন এমন কোন বিদেশীও উহা গ্রহণ করিবেন না, এবং প্রগতিশীল মতবাদী অনেক ইংরাজও উহার সহিত ভিন্নমত অবলম্বন করিবেন। ব্রিটিশ শাসক সম্প্রদায়ের রন্ধন চশমা দিয়া জগত ও স্বদেশকে দেখিবার অতি আশ্চর্য্য ক্ষমতা তিনি অর্জন করিয়াছেন। তবুও ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, গত আঠার মাস ধরিয়া ভারতে দিনের পর দিন যাহা ঘটিতেছিল এবং তাঁহার বক্তৃতার সময়েও যাহা ঘটিতেছিল, তিনি বক্তৃতায় তাহা বিন্দুমাত্রও

উল্লেখ করেন নাই। তিনি ক্রিয়া, আর্থনী, ইত্যাদির কথা বলিয়াছেন, তাঁহার স্বদেশের জীবন-নীতি ও সর্ববিধ স্বাধীনতার বিশ্লেষণ নাই। কিছুই বলেন নাই। সীমান্তপ্রদেশ ও বাঙ্গলার ভয়াবহ ঘটনাগুলির বিষয় তিনি নাও জানিতে পারেন—রাজেন্দ্রবাবু সম্প্রতি তাঁহার কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে যাহা “বাঙ্গলার উপর বলাৎকার” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—কেন না সংবাদনিয়ন্ত্রণ ও গোপনের সতর্ক ব্যবস্থায় অনেক ঘটনাই প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু ভারতের মর্মবেদনা, প্রবল প্রতিপক্ষের সহিত তাঁহার জাতি স্বাধীনতার জন্য যে জীবন-মরণ সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা বিশ্বত হইলেন কি করিয়া? বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উপর পুলিশ-রাজ প্রতিষ্ঠা—প্রায় সামরিক আইনের কাছাকাছি অবস্থা, অনশন ধর্মঘট, কারাগারের দুঃখভোগ ইহা কি তিনি জানিতেন না? যে সহিষ্ণুতা ও স্বাধীনতার জন্য তিনি ব্রিটেনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, সেই ব্রিটেনই যে ভারতে উহার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিতেছে, তাহা কি তিনি বুঝিতে পারেন না?

তিনি কংগ্রেসের সহিত একমত হউন আর নাই হউন, কিছু আসিয়া যায় না। কংগ্রেসের নীতির সমালোচনা ও নিন্দা করিবার অধিকার তাঁহার নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু একজন ভারতীয়, একজন স্বাধীনতাপ্রেমিক, একজন আত্মমর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে তাঁহার স্বদেশের নরনারীদের আশ্রয় সাহস ও আত্মতাগ, তাঁহার মনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে? আমাদের শাসকগণ যখন ভারতের হৃদয়ে কুঠারাঘাত করিতেছিলেন, তখন তিনি কি কোন বেদনা, কোন মর্মঘাতনা বোধ করেন নাই! অহঙ্কৃত সাম্রাজ্যের বাহুবলের নিকট যাহারা নত হইল না, যাহারা দৈহিক পীড়ন অগ্নানবদনে সহ্য করিল, যাহাদের গৃহ বিনষ্ট হইল, যাহাদের প্রিয়জন দুঃখভোগ করিল তথাপি আত্মাবমাননা করিল না, সেই সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহার নিকট কি কিছুই নহে? আমরা কারাগারে ও কারার বাহিরে মুখে সাহস দেখাইয়া হাসিয়াছি, কিন্তু আমাদের সে হাস্য প্রায়ই অশ্রুতে অভিষিক্ত এবং ক্রন্দনের রূপান্তর।

সাহসী ও উদারহৃদয় ইংরাজ মিঃ ভেরিয়ার এলউইন, তাঁহার অভিজ্ঞতার কথা আমাদের কাছে শুনাইয়াছেন। ১৯৩০ সালে তিনি লিখিয়াছেন, “সমগ্র জাতি মানসিক দাসত্বের বন্ধন দূরে নিক্ষেপ করিয়া নির্ভীক আত্মমর্যাদা প্রদর্শন করিতেছে, এ দৃশ্য দর্শন এক অপূর্ণ অভিজ্ঞতা!” আরও বলিয়াছেন, “সত্যগ্রহ সংঘর্ষে কংগ্রেসের প্রায় সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক যে আশ্রয় শৃঙ্খলা দেখাইয়াছে, একজন প্রাদেশিক গভর্নর পর্যন্ত উদারভাবে তাহা স্বীকার করিয়াছেন………।”

যদি শাস্ত্রী মহাশয় জীবিত এবং যোগ্যব্যক্তি, দেশবাসী তাঁহাকে প্রভা
করে; সংঘর্ষের সময় তাঁহার দেশবাসীর জন্ত তিনি অল্পরূপ সমবেদনা
অনুভব করিলেন না, ইহা বিশ্বাস করা অসম্ভব। গভর্ণমেন্ট কর্তৃক সর্ববিধ
সম্মিলিত কার্যক্রম ও ব্যক্তিস্বাধীনতা বিলোপের বিরুদ্ধে তাঁহার কণ্ঠ
হইতে প্রতিবাদ উদ্ভূত হইবে, ইহা সকলেই প্রত্যাশা করিতে পারে।
অনেকে ইহাও আশা করিয়াছিল যে, তিনি এবং তাঁহার সহকর্মীরা পীড়িত
অঞ্চলে—সীমান্ত ও বাকলায় গিয়া স্বচক্ষে সব দর্শন করিবেন, কংগ্রেস-র
নিরুপদ্রব প্রতিরোধের সাহায্য করিবার জন্ত নহে, ঘটনা প্রকাশ করিয়া
পুলিশ ও সরকারী কর্মচারীদের অতিরিক্ত পীড়ন সংঘত করিবার জন্ত।
অগ্রান্ত্র দেশের স্বাধীনতাপ্রেমিক ও ব্যক্তিস্বাধীনতার উপাসকগণ ইহা
করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি ইহা করিলেন না। যখন শাসকবৃন্দ ভারতের
নরনারীকে সরাসরি দলন করিতেছেন, এমন কি, সাধারণ স্বাধীনতাও বিলুপ্ত
হইয়াছে, তখন তিনি তাঁহাদিগকে সংঘত করিবার চেষ্টা করিলেন না; কি
ঘটিতেছে তাহাও দেখিতে চাহিলেন না। এমন এক সময়ে তিনি সহিষ্ণুতা
ও স্বাধীনতার জন্ত ব্রিটিশজাতিকে প্রশংসাপত্র প্রদান করিতে অগ্রসর
হইলেন, যখন ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে ঐ দুইটি সদগুণের একান্ত অভাব।
তিনি তাঁহার নৈতিক সমর্থন দ্বারা দমন-নীতির কঠোর কর্তব্য পালনে
তাঁহাদিগকে উৎসাহী ও চাক্ষা করিয়া তুলিলেন।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহার উদ্দেশ্য এরূপ ছিল না এবং তাঁহার কাজের
কি ফল হইবে, তাহাও তিনি ভাবেন নাই। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতার যে
ঐরূপ ফল হইয়াছিল, ইহা নিঃসন্দেহ। অতএব, কেন তিনি এই ভাবে চিন্তা
ও কার্য করেন?

আমি এই প্রশ্নের কোন সন্তুস্তর পাই নাই; বরং দেখিতেছি, লিবারেলগণ
তাঁহাদের স্বদেশবাসী হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছেন এবং আধুনিক চিন্তা
দ্বারা সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন। তাঁহারা যে সকল বস্তাপচা
পুরাতন পুঁথি পড়েন, তাহা তাঁহাদের দৃষ্টি হইতে, ভারতের জনসাধারণ হইতে
আবৃত করিয়া রাখে এবং তাহারা এক প্রকার আপনাতে আপনি মুগ্ধ
অবস্থায় থাকেন। আমরা জেলে গিয়াছি, আমাদের দেহ সেলে তালাচাবি
বদ্ধ; কিন্তু আমাদের মন মুক্ত, আমাদের চিত্ত প্রফুল্ল; কিন্তু তাঁহারা নিজেদের
মনোমত করিয়া এক মানসিক কারাগার রচনা করিয়াছেন, যেখানে তাঁহারা
চক্রাকারে অবিশ্রান্ত ঘুরিতে থাকেন, বাহির হইবার পথ পান না। তাঁহারা
বস্তুর অপরিবর্তনীয় সত্তার উপাসক, কিন্তু এই পরিবর্তনশীল জগতে যখন
বস্তুর পরিবর্তন হয়, তখন তাঁহারা দিশাহারা হইয়া উঠেন। কোন আদর্শ বা

পরিবর্তনকে বৃষ্টিবার মত কোন উপায় হাতড়াইয়া পান না। আমাদের সম্মুখে দুইটি প্রশ্ন, হয় সম্মুখে অগ্রসর হইতে হইবে, নয় থাকি থাইয়া পড়িয়া যাইতে হইবে; এই তীব্র গতিশীল জগতে আমরা স্থির হইয়া থাকিতে পারি না। পরিবর্তন ও গতির ভয়ে ভীত লিবারেল তাঁহাদের চারিদিকে ঝড় দেখিয়া শঙ্কিত হইলেন; অক্ষম, দুর্বল পদে তাঁহারা অগ্রসর হইতে পারিলেন না। অতএব ঝড়ের ঝাপ্টায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিলেন। যে কোন তৃণ-খণ্ড সম্মুখে পাইলেই ব্যাকুল মুষ্টিতে ধরিতে লাগিলেন। ভারতের রাষ্ট্রীয় রক্তক্ষেত্রে তাঁহারা হামলেট, চিন্তায় জর্জ্বর, বিবর্ণ-বিশীর্ণমুখ, সর্বদাই সঙ্কীর্ণ, সংশয়াতুর এবং অব্যবস্থিতচিত্ত।

লিবারেলদের সাপ্তাহিক পত্রিকা “দি সারভেন্ট অব ইণ্ডিয়া” নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের শেষের দিকে কংগ্রেসপন্থীদেরকে এই বলিয়া অপবাদ দিয়াছিলেন যে, তাহারা জেলে যাইতে চাহে এবং যখন তাহারা জেলে যায় তখন আবার বাহিরে আসিবার জন্য ব্যাকুল হয়। কিছু বিরক্তির সহিত ইহাতে মন্তব্য করা হইয়াছিল যে, ইহাই কংগ্রেসের নীতি হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পরিবর্তে লিবারেলদের মতে ইংলণ্ডে ডেপুটেশন লইয়া গিয়া ব্রিটিশ মন্ত্রীদের নিকট ধর্ণা দেওয়া উচিত, অথবা গভর্নমেন্টের পরিবর্তনের জন্য ইংলণ্ডে গিয়া আবেদন নিবেদন করা উচিত।

অবশ্য কতক পরিমাণে এই কথা সত্য যে, তখন প্রধানতঃ কংগ্রেসের এই কৰ্ম নীতি ছিল যে, অর্ডিন্যান্সীয় আইন এবং অশাস্ত্রীয় দমননীতিমূলক ব্যবস্থাপনাদের অমাত্য করা। তাহার ফলে কারাদণ্ড হইত। ইহাও অবশ্য সত্য যে, কংগ্রেস ও জাতি দীর্ঘ সংঘর্ষে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং গভর্নমেন্টের উপর কোনও ফলপ্রসূ চাপ দিতে পারিতেছিল না। কিন্তু তথাপি তাহার এক বাস্তব ও নৈতিক মূল্যও ছিল।

যে উল্লঙ্ঘন-নীতি ভারতবর্ষে সচল করিয়াছে, তাহা শাসকবর্গের পক্ষেও এক ব্যয়বহুল ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল। এমন কি তাঁহাদিগকেও অত্যন্ত যন্ত্রণাপ্রদ মানসিক অবস্থার মধ্যে কাল কাটাইতে হইয়াছে এবং তাঁহারা ভাল করিয়াই জানিতেন, পরিণামে ইহা তাঁহাদের ভিত্তিকেও দুর্বল করিবে। ইহাতে নির্ধ্যাতিত জনসাধারণ এবং জগতের সম্মুখে তাঁহাদের শাসনের আসল স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়ে। তাঁহারা সর্বদাই লৌহমুষ্টি মথমলের কোমল আবরণে ঢুকাইয়া রাখিতে ভালবাসেন। চরম ভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ফলাফলের প্রতি ভ্রক্ষেপহীন হইয়া যখন জনসাধারণ গভর্নমেন্টের ইচ্ছার নিকট নত হয় না, তখন তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা গভর্নমেন্টের পক্ষে বিরক্তিকর এবং অনিষ্টকরও বটে। কাজেই দমন-নীতিমূলক ব্যবস্থার

ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের দৈতনীতি

বিরুদ্ধে সাময়িক ও স্থানীয় প্রকাশ্য বিরোধিতারও মূল্য আছে। ইহাতে জনসাধারণের মধ্যে দৃঢ়তা জাগে এবং গভর্নমেন্টের নৈতিক শক্তি দুর্বল করিয়া ফেলে।

ইহার নৈতিক দিকের গুরুত্ব অনেক বেশী। এক অস্বর্ণীয় পথ্যায়ে থুরো বলিয়াছেন, “যখন নরনারীরা অত্যাচারে কারারুদ্ধ হয়, তখন ত্রায়পরায়ণ প্রত্যেক নরনারীর স্থানও ঐ কারাগারে”। এই উপদেশ লিবারেল এবং অগ্রাণ্ড অনেকের নিকট শ্রুতিস্মৃতির হইবে না। কিন্তু আমরা অনেকে অনুভব করিতেছিলাম যে বর্তমান অবস্থার মধ্যে নৈতিক জীবন অসম্ভব। নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমাদের অনেক সহকর্মী সর্বদাই জেলে থাকিতেন এবং রাষ্ট্রের দমন-নীতির অস্ত্র অবিরত আমাদের বিরুদ্ধে পৌড়ন করিতেছিল এবং উহা জনসাধারণের শোষণেরও সহায়ক হইয়া উঠিয়াছিল। আমাদের নিজের দেশে আমরা সন্ধিদ্ধ ব্যক্তির মত বিচরণ করি, গুলচর ছাড়ার মত পশ্চাতে অনুসরণ করে, আমাদের প্রত্যেকটি কথা যত্ন সহকারে টুকিয়া লওয়া হয়, পাছে আমরা সর্বত্র বিদ্যমান সিদ্ধান্তীয় আইন ভঙ্গ করিয়া ফেলি। আমাদের চিঠিপত্র খুলিয়া দেখা হয়, নিষেধাজ্ঞা ও গ্রেফতারের সম্ভাবনা সর্বদাই বিদ্যমান থাকে। আমাদের নির্বাচন করিয়া লইতে হইবে,—রাষ্ট্রের শক্তির নিকট হীন আনুগত্য স্বীকার, আত্মিক অধঃপতন, আমাদের মধ্যে যে শক্তি আছে তাহা অস্বীকার, বাহাকে আমরা হীন বলিয়া জানি সেই উদ্দেশ্যে নৈতিক গণিকা বৃত্তি—অথবা ফলাফল সম্পর্কে ভ্রক্ষেপ না করিয়া ইহার প্রতিরোধ। কেহই ইচ্ছা করিয়া জেলে যায় না অথবা বিপদকে নিমন্ত্রণ করে না। কিন্তু সময় সময় অনেক কিছু পরিবর্তেই কারাগার বাঞ্ছনীয়। যেমন বার্ণাড শ’ বলিয়াছেন,—“যাহা তুমি হীন বলিয়া জান, সেই উদ্দেশ্যেই অপরের দ্বারা প্রবৃত্ত হইবার মত বিয়োগান্তক ঘটনা জীবনে আর কিছু নাই। অগ্রাণ্ড শোচনীয় ব্যাপার হয় দুর্ভাগ্য কিম্বা মৃত্যু; কিন্তু একমাত্র ইহাই দুঃখ, দাসত্ব এবং মর্ত্যের নরক।”

দীর্ঘ কারাদণ্ডের অবসান

আমার কারামুক্তির দিন ঘনাইয়া আসিল। “সদ্যবহারের জন্ত” সাধারণ নিয়মে আমার কিছু দণ্ড মকুব হইয়াছিল অর্থাৎ দুই বৎসরের মধ্যে সাড়ে তিন মাস কম হইয়াছিল। আমার মনের শান্তি অথবা জেলের মধ্যে স্বভাবতঃই মনের মধ্যে যে নিশ্চৈজ অবসন্নভাব দেখা যায়, তাহা কারামুক্তির সম্ভাবনার বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। আমি উত্তেজনা বোধ করিতে লাগিলাম। বাহিরে গিয়া আমি কি করিব? অতি কঠিন প্রশ্ন। উত্তর দিতে গিয়া আমি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম, এই প্রশ্ন মুক্তির আনন্দ হরণ করিল। কিন্তু ইহাও সাময়িক চিন্তাবিকার। আমার বলপূর্ব্বক দাবাইয়া রাখা শক্তি মাথা তুলিতে লাগিল। আমি বাহিরে যাইবার জন্ত ব্যাকুল হইলাম।

১৯৩৩-এর জুলাই মাসের শেষ ভাগে এক মর্যাস্তিক সংবাদে হুশিস্তা-গ্রস্ত হইলাম—জে, এম, সেনগুপ্তের অকস্মাৎ মৃত্যু হইয়াছে। কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতিতে আমরা বহুবর্ষ যাবৎ সহকর্মী ছিলাম ত বটেই, আমার কেম্ব্রিজের ছাত্রজীবনের প্রথম দিকে তাঁহার সংশ্রবে আসিয়াছিলাম। কেম্ব্রিজে আমাদের প্রথম দেখা—আমি নবাগত এবং তিনি সদ্য ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন।

অন্তরীণে আবদ্ধ অবস্থায় সেনগুপ্তের মৃত্যু হইয়াছে। ১৯৩২-এর প্রথম ভাগে ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর বোম্বাইয়ে জাহাজের উপরই তাঁহাকে গ্রেফতার করিয়া রাজবন্দী করা হয়। তাহার পর হইতেই তিনি বন্দী অথবা অন্তরীণে আবদ্ধ ছিলেন এবং তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। গভর্ণমেন্ট তাঁহাকে অনেক রকম সুবিধা দিয়াছিলেন; কিন্তু তৎসঙ্গেও ব্যাধির কোন পরিবর্তন হইল না। কলিকাতায় তাঁহার শোকযাত্রায় বিপুল জনসংখ্য যে ভাবে পরলোকগত নেতার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিল, তাহাতে মনে হইল, বাংলার হৃদয়ে বহুদিন অবরুদ্ধ বেদনা অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্তও যেন প্রকাশের পথ পাইয়াছে।

সেনগুপ্তও চলিয়া গেলেন। আর একজন রাজবন্দী স্বভাব বহু কয়েক বৎসরের কারাদণ্ড ও অন্তরীণে ভয়স্বাস্থ্য—অবশেষে গভর্ণমেন্ট

দীর্ঘ কারাদণ্ডের অবসান

তঁাহাকে চিকিৎসার জন্য ইউরোপ যাইবার অনুমতি দিলেন। প্রবীণ বিঠলভাই প্যাটেল ইউরোপে অস্থস্থ। আরও কতজন স্বাস্থ্য হারাইয়াছে, যুত্মমুখে পতিত হইয়াছে—কারাজীবনের শারীরিক দুঃখ ও বাহিরের কৰ্ম্মপ্রেরণা দেহ সহ্য করিতে পারে নাই! কতজনের, (যদিও বাহির হইতে দেখিলে একরূপই মনে হয়) অস্বাভাবিক জীবন যাপনের ফলে মানসিক অবস্থা বিপর্যাস্ত হইয়া গিয়াছে!

সমগ্র দেশ কি ভয়াবহ দুঃখ নীরবে বহন করিতেছে, সেনগুপ্তের যুত্মতে তাহা স্পষ্টভাবে মনে পড়িল, আমি ক্লান্ত ও অবসাদ বোধ করিতে লাগিলাম। ইহার পরিণাম কি? কোথায় ইহার শেষ?

সৌভাগ্যক্রমে আমার স্বাস্থ্য ভালই ছিল; কংগ্রেসের কার্যে অনিয়মিত জীবন যাপন সবেও মোটের উপর আমি ভালই ছিলাম। ইহার কারণ, পিতার নিকট হইতে আমি স্বগঠিত দেহ লাভ করিয়াছিলাম এবং দেহের যত্ন করিতাম। রোগ, দুর্বল দেহ এবং অতিরিক্ত মেদ, এ তিনটিই আমার নিকট অশোভন মনে হইত; নিয়মিত ব্যায়াম, মুক্ত-বায়ু এবং সাদাসিধে খাদ্য এই তিন উপায়ে আমি উহা হইতে মুক্ত ছিলাম। আমার নিজের অভিজ্ঞতা এই যে, মধ্যশ্রেণীর ব্যক্তির প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং গুরুপাক খাদ্যের দোষে প্রায়ই পীড়া ভোগ করেন (ঐহাদের অপচয় করিবার মত অর্থ আছে, তঁাহাদের সম্বন্ধেই ইহা প্রযোজ্য)। স্নেহদুর্বলা জননীরা অতিরিক্ত মিষ্ট ও মুখরোচক খাদ্য দিয়া অতিভোজনে বাল্যকাল হইতেই সন্তান সন্ততির দেহে বদহজমের বনিয়াদ গড়িয়া তোলেন। আমাদের দেশে শিশুদিগকে অতিরিক্ত কাপড়চোপড় দিয়া মুড়িয়া রাখা হয়। ভারতে ইংরাজগণও অতি ভোজন করিয়া থাকেন, তবে তঁাহাদের খাদ্যে যি মশলা কম থাকে। সম্ভবতঃ একপুরুষ পূর্বের ইংরাজগণের অপেক্ষা তঁাহারা একটু উন্নত হইয়াছেন, কেন না পূর্বোক্ত শ্রেণী প্রচুর পরিমাণে উষ্ণ ও তীব্র পানাহার করিতেন।

খাদ্য সম্পর্কে আমার কোন বিশেষ বাতিক নাই—কেবল অতি ভোজন ও গুরুপাক খাদ্য বর্জন করিয়া থাকি। অগ্ৰাণ্ড কাশ্মিরী ব্রাহ্মণদের মত আমাদের পরিবারেও মাংসাহার প্রচলিত, বাল্যকাল হইতেই আমি মাংসাহারে অভ্যস্ত, তবে উহা আমার বেশী প্রিয় ছিল না। ১৯২০-এ অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা হইতেই আমি মাংসাহার ত্যাগ করিয়া নিরামিষাশী হইয়াছিলাম। তারপর ইউরোপ গমনের পূর্ব পর্য্যন্ত ছয় বৎসর কাল আমি নিরামিষভোজী ছিলাম। ইউরোপে গিয়া অবশু মাংসাহার করিয়াছি। ভারতে ফিরিয়া আমি পুনরায় নিরামিষ ভোজন

আরম্ভ করি; এবং এখন পর্যন্ত প্রায় তাহাই আছি। মাংস আমার শরীরে সহ্য হয়, তবে আমি উহার প্রতি অকুটি প্রদর্শন করিয়া থাকি,— কেন না, উহা আমার নিকট অত্যন্ত স্থূলরুচি বলিয়া মনে হয়।

১৯৩২-এ জেলে একবার আমার স্বাস্থ্য খারাপ হইয়াছিল; কয়েকমাস প্রত্যহ একটু জ্বর হইত; ইহাতে আমার স্বাস্থ্যের গর্ভ ক্ষুণ্ণ হইত বলিয়া আমি বিরক্ত হইতাম। আমি এতকাল জীবন ও শক্তির যে প্রাচুর্য অল্পভব করিতাম, এই প্রথম তাহাতে সন্দেহের ছায়াপাত হইল,—ক্রমশঃ ক্ষম ও জ্বরের বিভীষিকা সম্মুখে দেখিয়া আমি ভীত হইলাম। আমি যে মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়াছিলাম তাহা নহে, কিন্তু ধীরে ধীরে শারীরিক ও মানসিক বলক্ষয় স্বতন্ত্র বস্তু। যাহা হউক, আমার ভয় একটু অতিরঞ্জিত, এই অসুস্থতা জয় করিয়া আমি শরীর আয়ত্তের মধ্যে আনিলাম। শীতকালে দীর্ঘকাল সূর্যালোকে থাকিয়া আমি স্নান বোধ করিতে লাগিলাম। যখন আমার জেলের সঙ্গীরা কোট ও শাল গায়ে দিয়া শীতে কাপিতেন, আমি দিব্য আনন্দে উলঙ্গ দেহে রোদ্দ্র পোহাইতাম। ইহা কেবল শীতকালে উত্তর ভারতেই সম্ভব, অগ্রত্ব সূর্যালোক অত্যন্ত প্রখর।

ব্যায়ামের মধ্যে—“শির শাসন” অর্থাৎ হাতের তালু ও মাথা মাটিতে রাখিয়া উপরের দিকে পদদ্বয় উত্তোলন করা, তাহার পর মাথার পশ্চাৎ দিকে দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী রাখিয়া কনুইয়ের উপর ভর দিয়া শরীর সোজা উপরে রাখায় আমি বড় আনন্দ পাই। আমার মনে হয়, শরীরের দিক দিয়া ইহা খুব ভাল,—আমার ইহা আরও ভাল লাগে, কেন না ইহাতে আমার মনও প্রশস্ত হয়। কিঞ্চিৎ হাস্যকর এই ভঙ্গীতে আমার মেজাজ ভাল হয় এবং জীবনের খামখেয়ালীগুলি সহ্য করিবার শক্তি পাই।

আমার সাধারণ ভাল স্বাস্থ্য এবং সুস্থদেহজনিত আনন্দে আমি কারাজীবনে অপরিহার্য সামগ্রিক অবসাদ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছি। ইহাতে কি কারাগারে কি বাহিরে সতত পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্যেও নিজেকে উপযোগী করিয়া লইয়াছি। আমি জীবনে বহু আঘাত পাইয়াছি, আঘাতের মুহূর্তে মনে হইয়াছে যে, আমি বুঝি লুটাইয়া পড়িব। কিন্তু বিশ্বয়ে লক্ষ্য করিয়াছি, প্রত্যাশাতীত অল্পকালের মধ্যেই আমি নিজেকে সংহত করিয়াছি। আমার চরিত্রের প্রশান্তি ও সংযমের লক্ষণ আমার মতে এই যে, আমার কখনও বেশী মাথা ধরে নাই বা অনিদ্রায় কষ্ট পাই নাই। আধুনিক সভ্যতার সাধারণ ব্যাধিগুলিও আমার নাই, এমন কি অতিরিক্ত লেখাপড়া করা, বিশেষভাবে জেলে স্বল্পালোকে লেখাপড়া করা সত্ত্বেও আমার দৃষ্টিশক্তি মন্দ নহে। একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ গত বৎসর

দীর্ঘ কারাদণ্ডের অবসান

আমার উৎকৃষ্ট দৃষ্টি-শক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আট বৎসর পূর্বে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, দুই এক বৎসরের মধ্যেই আমাকে চশমা লইতে হইবে। তিনি অত্যন্ত ভুল করিয়াছিলেন, কেন না আমি এখনও চশমা ছাড়াই কাজ চালাইতেছি। এই সকল ঘটনা যদিও আমার প্রশান্তি ও সংযমের খ্যাতির পরিচায়ক, তথাপি বলিয়া রাখি, যে সকল লোক সর্বদাই ধীরমস্তিষ্ক এবং সংযত, তাঁহাদিগকে আমি ভয়ের চক্ষে দেখিয়া থাকি।

আমি যখন কারামুক্তির জন্ত অপেক্ষা করিতেছিলাম, তখন বাহিরে ব্যক্তিগত নিরুপদ্রব প্রতিরোধের নূতন আন্দোলন চলিতেছে। গান্ধিজী এই আন্দোলনের পুরোভাগে আসিতে প্রস্তুত হইলেন এবং কর্তৃপক্ষের নিকট জ্ঞাপন করিলেন যে, তিনি এলা আগষ্ট হইতে গুজরাটের কৃষকদের মধ্যে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ প্রচাৰ করিতে যাইবেন। তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ গ্রেফতার করা হইল, এক বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া তিনি এরোডা জেলে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার কারাগমনে আমি আনন্দিত হইলাম। কিন্তু শীঘ্রই নূতন সমস্যা দেখা দিল। গান্ধিজী কারাগার হইতে পূর্বের মত হরিজন আন্দোলন চালাইবার সুবিধা দাবী করিলেন,—গভর্ণমেণ্ট তাহা দিলেন না। সহসা আমরা গুলিলাম, গান্ধিজী এই ব্যাপার লইয়া অনশন আরম্ভ করিয়াছেন। সামান্য ব্যাপার লইয়া এইরূপ বিদ্রোহকুল কাণ্ডে প্রবৃত্ত হওয়া অভূতপূর্ব বলিয়া মনে হইল। গভর্ণমেণ্টের সহিত তর্কযুক্তিতে তিনি অশ্রান্ত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করা আমার পক্ষে কঠিন হইল। আমাদের করিবার কিছুই নাই, বিফল হইয়া ঘটনার গতি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম।

এক সপ্তাহ উপবাসের পরেই তাঁহার অবস্থা অতিশয় মন্দ হইল। তাঁহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইল; কিন্তু তখনও তিনি বন্দী; গভর্ণমেণ্ট হরিজন আন্দোলন পরিচালনার সুবিধা দিতে সম্মত হইলেন না। তিনি ঝাঁচিবার ইচ্ছা ছাড়িয়া দিলেন (পূর্ববার অনশনকালে ইহা ছিল) এবং ক্রমশঃ নিজেকে মৃত্যুপথে আগাইয়া দিতে লাগিলেন। শেষ সময় উপস্থিত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তিনি সকলের নিকট হইতে বিদায় লইলেন এবং তাঁহার ব্যক্তিগত ব্যবহারের যে কয়েকটি বস্তু ছিল, তাহাও নাস ও অগ্নাত্তের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি গভর্ণমেণ্টের রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে প্রাণত্যাগ করুন, এ অভিপ্রায় তাঁহাদের ছিল না। সেই দিন অপরাহ্নেই তাঁহাকে সহসা মৃত্তি দেওয়া হইল। অমর জন্ত তিনি সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন। সম্ভবতঃ,

জওহরলাল নেহরু

আর একদিন গেলেই বহু বিলম্ব হইয়া যাইত। সম্ভবতঃ ইহা সি, এক, এনডুজের চেষ্টার ফল, গান্ধিজীর নিবেদন সত্ত্বেও তিনি তাড়াতাড়ি ভারতে ফিরিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে আমি দেৱাদুন জেল হইতে, অগ্নাত জেলে দেড়বৎসর কাটাইয়া পুনরায় ১৩ই আগষ্ট নৈনী জেলে ফিরিয়া আসিলাম। তখনই মাতার পীড়া এবং তাঁহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে, এই সংবাদ আসিল। মাতার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন বলিয়া ১২৩৩-এর ৩০শে আগষ্ট আমি কারাগার হইতে মুক্তি পাইলাম। সাধারণভাবে আমি পূর্ণ দণ্ড ভোগান্তে ১২ই সেপ্টেম্বর মুক্তি পাইতাম। প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট আমাকে আরও তের দিন কারাদণ্ড মাপ করিলেন।

৫০

গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাৎ

কারামুক্তির অব্যবহিত পরেই আমি লক্ষ্ণৌয়ে মাতার রোগশয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহার সহিত কয়েক দিন থাকিলাম। দীর্ঘকাল পরে কারাগারের বাহিরে আসিয়া আমি অশ্রুভব করিলাম, আমার চারিদিকের পরিবেষ্টনের সহিত আমার যোগসূত্র ছিল হইয়া গিয়াছে। সকলের মনের ভাব যেমন হয়, তেমনি ভাবে আমিও আশ্চর্য্য হইয়া অশ্রুভব করিলাম, যখন আমি কারাগারে নিশ্চল হইয়া ছিলাম, তখনও জগত চলিয়াছে, কত কি পরিবর্তন হইয়াছে। ছেলেমেয়েরা বড় হইয়াছে—জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, প্রেম, কলহ, খেলাধুলা, কাজকর্ম, সুখ-দুঃখের নিত্য আবর্তন। জীবনের নূতন আকর্ষণ, আলাপের নূতন বিষয়—যাহা দেখি শুনি, সবই একটু অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের। আমাকে পশ্চাতে ফেলিয়া জীবন যেন অগ্রসর হইয়াছে। ইহা খুব সুখের অশ্রুভূতি নয়। অল্পকালের মধ্যেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া লইলাম, কিন্তু কোন আগ্রহ বোধ করিলাম না। আমি বুঝিলাম, অল্প কয়েকদিনের দ্রুত জেল হইতে ছাড়া পাইয়াছি মাত্র, শীঘ্রই হয় ত আবার ফিরিয়া যাইতে হইবে। যাহা শীঘ্রই ত্যাগ করিতে হইবে, তাহার সহিত সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টায় ফল কি ?

গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাৎ

রাজনীতির দিক দিয়া ভারত অপেক্ষাকৃত শান্ত, আন্দোলন ও তৎসংক্রান্ত কাজকর্ম গভর্ণমেন্ট সংযত ও দমন করিয়া ফেলিয়াছেন; কদাচিৎ কেহ গ্রেফতার হয়। কিন্তু ভারতের এই নিস্তব্ধতার মধ্যে বহু ইঙ্গিত ছিল। দীর্ঘকাল তীব্র দমন-নীতির ফলে ক্রান্তিজনিত এই নিস্তব্ধতা অশুভ সম্ভাবনায় পূর্ণ; এ নিস্তব্ধতা যেন মুখর; যাহারা দমন করেন, ইহা তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। বাহ্যতঃ সমস্ত অবাধ্যতা দমিত হইয়াছে, গোয়েন্দা ও গুপ্তচরের বিপুল বাহিনী দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। সর্বত্র ছত্রভঙ্গ অবস্থা, জনসাধারণ সন্ত্রস্ত। সর্ববিধ রাজনৈতিক কার্য—বিশেষভাবে পল্লী-অঞ্চলে—দমন করা হইয়াছে এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট মিউনিসিপালিটি ও লোকাল বোর্ডের চাকুরী হইতে কংগ্রেসপন্থীদের তাড়াইবার জন্ত ব্যস্ত। মিউনিসিপালিটি প্রভৃতির উপর অত্যধিক চাপ দেওয়া হইতে লাগিল, যদি দুই কংগ্রেসপন্থীদিগকে পদচ্যুত না করা হয়, তাহা হইলে সরকারী সাহায্য বন্ধ করা হইবে বলিয়া ভয় দেখান হইল। এই প্রকার জ্বরদস্তীর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখা গেল, কলিকাতা কর্পোরেশনে। অবশেষে, বাঙ্গলা গভর্ণমেন্ট আইন করিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনে রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিদের নিয়োগ বন্ধ করিয়া দিলেন।

জায়াগীতে নাংসী দলের অত্যাচারের বিবরণ ভারতীয় ব্রিটিশ কর্মচারিগণ এবং ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলির উপর এক আশ্চর্য্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিল। তাঁহারা ভারতে যাহা করিয়াছেন, যেন উহার মধ্যে তাহার বৈধ যৌক্তিকতা খুঁজিয়া পাইলেন, অহঙ্কারের সহিত তাঁহারা আমাদের শুনাইতে লাগিলেন যে, যদি নাংসীদের হাতে পড়িতে, তাহা হইলে অবস্থা কি হইত একবার ভাবিয়া দেখ। নাংসীরা নূতন নীতি, নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছে; তাহাদের সহিত পাল্লা দেওয়া নিশ্চয়ই সহজ নহে। সম্ভবতঃ তাহাদের হাতে পড়িলে আমাদের দুর্ভোগ আরও বেশী হইত। তবে গত পাঁচ বৎসরে ভারতের নানা অংশে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার আত্মপূর্ব্বিক বিবরণ আমি জানি না বলিয়া আমার পক্ষে তুলনামূলক বিচার করা কঠিন। দক্ষিণ হস্তে যাহা দান করিবে, বাম হস্ত তাহা জানিবে না, ভারতে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট এই নীতিতে বিশ্বাসী; কাজেই নিরপেক্ষ তদন্তের প্রস্তাবে তাঁহারা কর্ণপাত করিলেন না, অথবা এই শ্রেণীর তদন্তে শাসকবর্গের নির্দোষিতা প্রমাণের ঝোঁকই বেশী দেখা যায়। আমার মতে সাধারণ ইংরাজগণ বর্ষের অত্যাচারকে ঘৃণা করেন, ইহা সত্য। নাংসীদের মত ইংরাজেরাও প্রকাশ্যে গর্ব্বভরে

“কৃতালিতাৎ” (অথবা ইংরাজী প্রতিশব্দ) বলিয়া সর্বত্র জয়ধ্বনি দিয়া ফিরিতেছেন, ইহা আমি কল্পনাও করিতে পারি না। যখন ইংরাজেরা ঐরূপ করেন, তখন তাঁহারা একটু লজ্জাবোধও করিয়া থাকেন। আমরা ইংরাজই হই, জার্মান বা ভারতীয়ই হই, আমাদের সুসভ্য ব্যবহারের উপর আবরণ অত্যন্ত পাতলা, রিপূর উদ্রেক হইবার সঙ্গে সঙ্গে আবরণ মুছিয়া গিয়া যে দৃশ্য প্রকাশিত হয়, তাহা দেখিতে মনোহর নয়। বিগত মহাযুদ্ধ মাহুষকে ভয়াবহ বর্ষরতার মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছিল এবং যুদ্ধ-বিরতি সন্ধির পরও আমরা দেখিয়াছি, জার্মানীকে না থাইতে দিয়া পিষিয়া মারিবার জন্ত অবরোধ করিবার চেষ্টা; যাহা একজন ইংরাজ লেখকের মতে, “কোন জাতি এত বড় হৃদয়হীন অমাহুষিক বর্ষরতা ও পাশবিক নৃশংসতা দেখায় নাই”। ভারতবর্ষ ১৮৫৭-৫৮র কথা ভুলিয়া যায় নাই। যখনই আমাদের স্বার্থে হাত পড়িবার উপক্রম হয়, তখনই আমরা সুশিক্ষা ও সভ্য ব্যবহার ভুলিয়া যাই। তখন অসত্যের নাম হয় “প্রচারকাণ্ড”, বর্ষরতার নাম হয় “বৈজ্ঞানিক দমননীতি” এবং “আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা”।

ইহা কোন বিশেষ জাতি বা ব্যক্তির দোষ নহে। সমান অবস্থায় পড়িলে সকলেই অল্পবিস্তর ঐরূপ আচরণ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের মত প্রত্যেক বৈদেশিক শাসনাধীন দেশেই শাসকবর্গের প্রতি একটা বিরুদ্ধতা সর্বদাই থাকে, সময় সময় উহা প্রত্যক্ষ ও বিপজ্জনক হইয়া উঠে। এই বিরুদ্ধতা হইতেই শাসক সম্প্রদায়ের চরিত্রে সামরিক সদৃশ্য ও পাপাচার উভয়ই জাগিয়া উঠে। গত কয়েক বৎসরে আমাদের বিরুদ্ধতা প্রবল ও কাণ্ডাকরী হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া আমরা ভারতেও ঐ শ্রেণীর সামরিক সদৃশ্য ও পাপাচার দেখিয়াছি। কিন্তু ভারতে আমরা কতক পরিমাণে এই সামরিক মনোবৃত্তি (অথবা তাহার অভাব) সহ্য করিয়াছি। সাম্রাজ্যের ইহাই পরিণাম, উহা উভয় পক্ষকেই অধঃপতিত করে। ভারতবাসীদের অধঃপতন ত সর্বত্রই প্রত্যক্ষ; অপর পক্ষের অধঃপতন অত্যন্ত ক্ষুদ্র, কিন্তু সঙ্কটের সময় তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ইহা ছাড়া, এক তৃতীয় দল আছে, যাহাদের মধ্যে উভয়বিধ অধঃপতনই দেখা যায়।

জেলে বসিয়া সরকারী উচ্চকর্মচারীদের বক্তৃতা, ব্যবস্থা পরিষদ ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার প্রেমের তাঁহাদের উত্তর এবং গভর্ণমেণ্টের বিতৃষ্ণাগুলি পাঠ করিবার প্রচুর অবসর পাইতাম। আমি লক্ষ্য করিয়াছি, গত তিন বৎসরে তাঁহাদের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে এবং তাহা ক্রমশঃই

গাজীজীর সহিত সাক্ষাৎ

প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে। তাঁহাদের মধ্যে ভয় দেখাইবার ভাব প্রবল হইয়াছে এবং সার্জেন্ট মেজর যে ভঙ্গীতে সৈন্যদের সম্বোধন করেন, তাঁহারাও ক্রমশঃ তাহা আয়ত্ত করিতেছেন। ১২৩৩-এর নভেম্বর কি ডিসেম্বরে বাঙ্গলায় মেদিনীপুরে ডিভিসনের (আমার মনে হয়) কমিশনারের বক্তৃতা ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এই বক্তৃতার প্রত্যেকটি কথা যেন “পরাজিতের প্রতি কিছুমাত্র করুণা প্রদর্শন না করিয়া জয়ের পূর্ণ ফল আদায় করিবার দৃঢ়সঙ্কল্প প্রকাশের” মনোবৃত্তির সূত্রে গ্রথিত। বে-সরকারী ইংরাজগণ, বিশেষতঃ বাঙ্গলায়, সরকারী নমুনা অপেক্ষাও অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বক্তৃতা ও আচরণে ফাসিত মনোভাব প্রকাশিত হইত।

সম্প্রতি সিন্ধুদেশে একজন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীকে প্রকাশস্থলে ফাঁসিতে লটকান বর্ষরতার আর একটি দৃষ্টান্ত। সিন্ধুদেশে অপরাধীর সংখ্যা বাড়িতেছে; কাজেই অপরকে সাবধান করিবার জন্ত কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্যে প্রাণদণ্ড দিবার ব্যবস্থা করিলেন। এই পৈশাচিক দৃশ্য দেখিবার জন্ত জনসাধারণকে সকল প্রকার স্ববিধা দেওয়া হইয়াছিল এবং শুনা যায়, বহু সহস্র ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিল।

কারামুক্তির পর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে উৎসাহিত হইবার কিছু ছিল না। আমার বহু সহকর্মী তখনও জেলে, নূতন নূতন গ্রেফতারও চলিয়াছিল। সমস্ত অভিজ্ঞান্বীত আইনের কাজ পূর্ণোত্তমে চলিতেছিল; সেন্সরের প্রত্যাপে সংবাদপত্র রুদ্ধকণ্ঠ; আমাদের চিঠি পত্র বিপর্যস্ত। আমার সহকর্মী রফি আহম্মদ কিদোয়াই তাঁহার চিঠিপত্র সম্বন্ধে সেন্সরের খামখেয়ালীতে মহা বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। চিঠিপত্র আটকান হইত, কখনও আসিতে বিলম্ব হইত, কখনও বা হারাইত; এরূপ অবস্থায় তিনি দেখা সাক্ষাৎ নিমন্ত্রণ কাজ কর্মের নির্দিষ্ট সময় রক্ষা করিতে পারিতেন না। সেন্সর যাহাতে একটু তৎপরতার সহিত কার্য্য করে, এ জন্ত তিনি পত্র লিখিবার সঙ্কল্প করিলেন, কিন্তু কাহাকে লিখিবেন? সেন্সর কোন রাজনৈতিক কর্মচারী নহে। হয় ত একজন গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারী গোপনে এই কাজ করে, যাহার অস্তিত্ব ও কার্য্যপ্রণালী প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করা হয় না। রফি আহম্মদ এই সমস্তা সমাধান করিলেন; তিনি সেন্সরের নিকট একখানি পত্র লিখিয়া খামের উপর নিজের ঠিকানা লিখিয়া দিলেন। চিঠিখানা যে ঠিক লোকের হাতে পড়িয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; তাহার পর হইতে রফি আহম্মদ অনেকটা নিয়মিতরূপে চিঠিপত্র পাইতেন।

আমার জেলে কিরিয়্যা যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। আমার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত রাজনৈতিক কার্য হইতে অবসর গ্রহণ না করিলে, উহার হাত হইতে নিষ্কৃতির উপায়ও আমি দেখিলাম না। আমার সেরূপ অভিপ্রায় ছিল না, কাজেই আমি অনুভব করিলাম যে, গভর্ণমেন্টের সহিত সংঘর্ষ অনিবার্য। যে কোন মুহূর্ত্তে হয় ত আমার উপর কিছু করিতে অথবা না করিতে আদেশ জারী করা হইবে; কোন নির্দিষ্ট নিয়মে বলপূর্ব্বক কার্য করিতে বাধ্য করার বিরুদ্ধে আমার সমস্ত প্রকৃতি বিদ্রোহ করিবে। ভারতীয় জনসাধারণকে ভয় দেখাইয়া অবনমিত করিবার চেষ্টা চলিতেছিল। আমি নিরুপায়, ব্যাপক ক্ষেত্রে আমার করিবার কিছুই নাই; কিন্তু অস্তুতঃপক্ষে ব্যক্তিগতভাবে ভয়ে নত হইয়া আত্মগত্যা স্বীকার করিতে অস্বীকার করিতে পারি।

জেলে যাইবার পূর্বে কতকগুলি কাজ শেষ করিবার সঙ্কল্প করিলাম। প্রথমতঃ পীড়িতা মাতাকে লইয়া বিব্রত হইলাম। ধীরে ধীরে তিনি আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন,—এত ধীরে যে, এক বৎসর তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। গান্ধিজীকে দেখিবার জন্ত আমি ব্যগ্র হইলাম; সর্ব্বশেষ উপবাসের পর তিনি পুনরায় ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করিতে-ছিলেন। দুই বৎসরের অধিককাল তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। ভারতের অগ্ন্যাগ্ন প্রদেশের আমার সহকর্মীদের সাক্ষাৎ লাভের জন্তও আমি আগ্রহান্বিত হইলাম। ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছাড়াও, জগতের অবস্থা এবং আমার মনের মধ্যে যে সকল ভাব জাগিয়াছে, তাহা যথাসম্ভব আলোচনা করিতে ইচ্ছা হইল। আমি তখন ভাবিতাম, জগৎ অতি দ্রুত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এক খণ্ড-প্রলয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে; উহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের জাতীয় কর্মপদ্ধতি নির্ণয় করা উচিত।

আমার পারিবারিক ব্যাপারের দিকেও নজর দেওয়ার আবশ্যক হইল। এতকাল আমি উহার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলাম, এমন কি, পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার কাগজপত্রগুলি দেখিবার পর্য্যন্ত অবসর পাই নাই। আমরা আমাদের ব্যয় অনেক কমাইয়া ফেলিয়াছিলাম, তথাপি যাহা ছিল, তাহাও আমাদের সাধ্যাতীত। কিন্তু আমাদের বর্তমান বাটীতে বাস করিয়া উহা আর বেশী কমান কঠিন। আমাদের আর মোটর গাড়ী ছিল না, কেন না উহার ব্যয় বহন করার সাধ্য আমাদের নাই, দ্বিতীয়তঃ যে কোন মুহূর্ত্তে গভর্ণমেন্ট উহা বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন। এই অর্থসঙ্কটের মধ্যেও আমি রাশি রাশি ভিক্ষার জন্ত পত্র পাইতাম। (সেলার এগুলি

গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাৎ

আটকাইত না)। দেশে, বিশেষতঃ দক্ষিণভারতে একটা প্রচলিত এবং অত্যন্ত শ্রান্ত্যধারণা আছে যে, আমি একজন মহাধনী ব্যক্তি।

আমি জেল হইতে বাহির হইবার পরেই আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী কৃষ্ণার বিবাহ সম্বন্ধ ঠিক হইল এবং আমার অনিচ্ছাকৃত কারাগমনের পূর্বেই তাহার বিবাহ সম্পন্ন করিবার জন্ত উৎকণ্ঠিত হইলাম। কৃষ্ণাও এক বৎসর কারাদণ্ড ভোগান্তে কয়েক মাস পূর্বে মুক্তি পাইয়াছিল।

মায়ের শরীর একটু ভাল হইলে আমি গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাতের জন্ত পুণা রওনা হইলাম। তাঁহার সহিত সাক্ষাতে আমি সুখী হইলাম; তখন তিনি দুর্বল হইলেও ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করিতেছেন। আমাদের অনেক কথাবার্তা হইল। রাজনীতি, অর্থনীতি এবং জীবন সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য প্রচুর, ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তিনি উদারতার সহিত আমার বক্তব্য বিষয় ব্যাসস্তব অনুমোদন করিবার চেষ্টা করিলেন, ইহাতে আমি কৃতজ্ঞ হইলাম। পরে প্রকাশিত আমাদের পত্রাবলীতে, যে সকল সমস্ত তখন আমার মনে জাগিয়াছিল, তাহা আলোচনা করিয়াছিলাম; ভাষা একটু অস্পষ্ট হইলেও আমাদের মতভেদ পরিষ্কাররূপেই বুঝা গিয়াছিল। আমি দেখিয়া সুখী হইলাম, গান্ধিজীও ঘোষণা করিলেন যে, কায়েমী স্বার্থ লোপ করিতে হইবে, তবে তিনি বাধ্য করা অপেক্ষা বুঝাইয়া স্বমতে আনার উপর জোর দিলেন। স্বমতে আনয়ন করিবার তাঁহার প্রণালীগুলি আমার মতে সৌজ্ঞেয় ও সুবিবেচনার সহিত বাধ্য করা অপেক্ষা অধিক দূরবর্তী নহে; অতএব পার্থক্যটা আমার নিকট খুব বেশী বোধ হইল না। পূর্বের মত তখনও তাঁহার সম্বন্ধে আমার এই ধারণা ছিল যে, মতবাদ লইয়া আলোচনা করিতে তিনি বিমুখ হইলেও ঘটনার গতি ও যৌক্তিকতা তাঁহাকে একপদ একপদ করিয়া সামাজিক আমূল পরিবর্তনের অপরিহার্য প্রয়োজনের অভিমুখে লইয়া যাইবে। তিনি এক অনন্তসাধারণ বিন্ময়, মিঃ ভেরিয়ার এলউইনের ভাষায় মধ্যযুগীয় ক্যাথলিক সন্ন্যাসীদের মত এই মনুষ্যটি, ভারতীয় কৃষক সম্প্রদায়ের সহিত প্রাণগত সম্বন্ধে আবদ্ধ একজন কুশলকর্মা জননায়ক। সঙ্কটের মুহূর্ত্তে তিনি যে কোন দিকে ঝুঁকিবেন, তাহা অনুমান করা কঠিন, কিন্তু তিনি যে দিকেই যান, একটা স্বতন্ত্র কিছু ঘটবেই। আমাদের মতে তিনি ভুলপথে গেলেও, সে পথ হইবে সরল। তাঁহার সহিত মিলিত ভাবে কাজ করা সব সময়েই ভাল; কিন্তু প্রয়োজন হইলে পৃথক পথে চলিবার জন্তও প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

জওহরলাল নেহেরু

তখন ডাবিলাম, আপাততঃ এ প্রশ্ন উঠে না। আমরা তখনও জাতীয় সংঘর্ষের মধ্যে আছি এবং ব্যক্তিগত ব্যাপারে সীমাবদ্ধ হইলেও নিরুপদ্রব প্রতিরোধ তখনও কংগ্রেসের মতবাদে পর্যাবসিত কার্যপদ্ধতি। এই অবস্থার মধ্যেই আমাদের জনসাধারণ, বিশেষভাবে রাজনীতি ঘেঁসা কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রচার করিতে হইবে এবং যখন পুনরায় কার্যপদ্ধতি ঘোষণা করিবার সময় আসিবে, তখন আমরা আরও অনেকখানি অগ্রসর হইতে পারিব। ইতিমধ্যে কংগ্রেস বে-আইনী প্রতিষ্ঠান হইয়াই আছে এবং ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট উহাকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমাদেরকে এই আক্রমণের সম্মুখীন হইতে হইবে।

গান্ধিজী নিজেকে লইয়াই বিষয় সমস্যায় পড়িলেন। তিনি নিজেকে লইয়া কি করিবেন? তিনি এক জটিল জালে জড়াইয়া পড়িয়াছেন। যদি তিনি পুনরায় জেলে যান, তাহা হইলে আবার হরিজন কার্যের সুবিধার কথা উঠিবে, গভর্নমেন্ট রাজী হইবেন না, ফলে পুনরায় অনশন। আবার কি তাহার পুনরায়ুত্তি হইবে? এই ইন্দুর-বিড়াল খেলার মধ্যে যাইতে তিনি অস্বীকার করিলেন; এবং বলিলেন, এই সুবিধার জগ্ন যদি তাঁহাকে পুনরায় উপবাস করিতে হয়, তাহা হইলে তিনি মুক্তি পাইলেও অনশন ত্যাগ করিবেন না। তাহার অর্থ অনশনে মৃত্যু।

তাঁহার সম্মুখে সম্ভবপর দ্বিতীয় পথ, কারাদণ্ডের এক বৎসরকাল (তখনও সাড়ে দশমাস বাকী) পুনরায় কারাবরণ না করা এবং হরিজন আন্দোলন লইয়া থাকা। এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি কংগ্রেস কর্মীদের সহিত মিলিত হইবেন এবং প্রয়োজনমত উপদেশাদি দিবেন।

তিনি আমাদের তৃতীয় উপায়ের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, কিছুদিনের মত তিনি কংগ্রেস হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন এবং উহা—তাঁহার ভাষায় “যুবক সম্প্রদায়ের” হাতে অর্পণ করিবেন।

প্রথম উপায়ের শেষ ফল যখন অনশন মৃত্যু, তখন তাঁহাকে সে পরামর্শ দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কংগ্রেস যতক্ষণ বে-আইনী প্রতিষ্ঠান থাকিবে, ততক্ষণ তৃতীয় উপায়ও অবাস্তব মনে হইল। ইহার ফলে অবিলম্বে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ বর্জন এবং সর্ববিধ প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক কার্য ত্যাগ করিয়া আইনসম্মত নিয়মতান্ত্রিকতার পথে প্রত্যাবর্তন, অথবা বে-আইনীঘোষিত সাহায্যবঞ্চিত কংগ্রেস অবশেষে গান্ধিজী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে গভর্নমেন্ট কর্তৃক আরও নিষিদ্ধ হইবে। যে বে-আইনী প্রতিষ্ঠানের কার্যপদ্ধতি নির্ণয়ের জগ্ন একত্র মিলিত হইয়া আলোচনা সম্ভবপর নহে, কোন দলই তাহার ভার গ্রহণ করিতে চাহিবে

গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাৎ

না। এই ভাবে ছাড়িতে ছাড়িতে আমরা তাঁহার নির্দেশিত দ্বিতীয় পথের কথা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদের প্রায় সকলেরই ইহা ভাল বোধ হইল না, কেন না ইহাতে নিরুপদ্রব প্রতিবোধের ঘেটুকু অবশিষ্ট আছে, তাহাও ভাবিয়া পড়িবে। স্বয়ং নেতাই যদি সংগ্রাম হইতে সরিয়া দাঁড়ান, তাহা হইলে উৎসাহী কংগ্রেসকর্মীরা আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িবে, এক্ষণে প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু এই জটিল অবস্থা হইতে বাহির হইবার অন্য পথও ছিল না, অতএব গান্ধিজী তাঁহার ঐ অভিপ্রায় ঘোষণা করিলেন।

যদিও আমাদের যুক্তি ও কারণ স্বতন্ত্র, তথাপি আমি ও গান্ধিজী একমত হইয়া স্থির করিলাম, নিরুপদ্রব প্রতিরোধ নীতি বর্জন করিবার সময় এখনও আসে নাই এবং মুহূর্ত্তাবেও আমাদেরকে ইহা চালাইতে হইবে। অগত্যা বিষয়ে আমি সমাজতান্ত্রিক মতবাদ ও জগতের বর্তমান অবস্থার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলাম।

ফিরিবার পথে আমি কয়েকদিনের জন্ত বোম্বাইয়ে ছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে এখানে উদয়শঙ্কর ছিলেন, আমি তাঁহার নৃত্য দেখিবার সুযোগ পাইলাম। এই অপ্রত্যাশিত আনন্দ আমি উপভোগ করিলাম। নাটক, সিনেমা, সঙ্গীত, টকি, রেডিও প্রভৃতি বহু বৎসর ধরিয়া আমার আশ্রয়ের বাহিরে, এমন কি, সাময়িক মুক্তির সময়ও আমি এত কাজে ব্যস্ত থাকিতাম যে, সময় হইত না। আমি একবার মাত্র ‘টকি’ দেখিয়াছি; খ্যাতনামা সিনেমা অভিনেতা অভিনেত্রীদের নামগুলি আমার নিকট কেবল নামেই পর্য্যবসিত। নাটকের কথা আমার বিশেষভাবে মনে পড়িত, বিদেশে নৃতন নাট্যকাভিনয়ের বিবরণ আমি ঈর্ষার সহিত সংবাদপত্রে পাঠ করিতাম। কারার বাহিরে থাকিলেও উত্তর ভারতে উত্তম অভিনয় দেখিবার কোন সুযোগ ছিল না; আমার বিশ্বাস, বাঙ্গলা, গুজরাট ও মারাঠী নাটকের অনেক উন্নতি হইয়াছে; কিন্তু হিন্দুস্থানী রঙ্গমঞ্চের সেরূপ উন্নতি হয় নাই। উহা (পরে উন্নতি হইয়াছে কিনা জানি না) অত্যন্ত স্থূল ও কলাইনপুণ্যহীন। আমি শুনিয়াছি, ভারতীয় মুখর বা নিক্কাক ছায়াচিত্রগুলি স্থূলরুচির পরিচায়ক। ঐ গুলি সাধারণতঃ অপেরা কিম্বা ভারতের পুরাণ ও প্রাচীন ইতিহাসের ভিত্তিতে রচিত নাটক।

আমার মনে হয়, তাহারা সহরবাসীদের রুচির খাণ্ড জোগাইয়া থাকেন। এই সকল স্থূল ও পীড়াদায়ক চিত্রের সহিত আমাদের লোক-সঙ্গীত ও নৃত্য এমন কি গ্রাম্য যাত্রাভিনয়াদির পার্থক্যও কত বেশী! বাঙ্গলা, গুজরাট ও দক্ষিণ ভারতে সময় সময় দেখা যায় এবং দেখিয়া

কণ্ঠহরলাল নেহরু

আনন্দে বিম্বিত হইতে হয় যে, আমাদের পল্লীবাসীরা নিজদের অজান্তে-সারেই কি গভীর ভাবে কলানিপুণ ও রসজ্ঞ। কিন্তু যথা জ্ঞেয়ীরা একরূপ নহেন, তাঁহারা জ্ঞানিদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পরস্পরাগত সৌন্দর্য্য রসজ্ঞান হারাইয়াছেন। তাঁহাদের ঘরে ঘরে জাখাগী ও অস্ত্রিয়ার সস্তা ছাপা কুংসিত ছবি, বড় জোর তাঁহাদের মোড় রবিবর্ণা পর্য্যন্ত। তাঁহাদের প্রিয় বাদ্যযন্ত্র হারমোনিয়ম (আমি এই আশায় বাঁচিয়া থাকিব যে, স্বরাজ গভর্ণমেন্টের অগ্রতম প্রাথমিক কাজ হইবে, ভয়াবহ যন্ত্রটি বন্ধ করা)। লক্কো এবং অন্ত্র বড় বড় তালুকদারদের বাড়ীতে অসামঞ্জস্য এবং কলানৈপুণ্যের ব্যভিচারের যে পরাকাষ্ঠা দেখা যায়, অন্ত্র তাহা আছে কিনা সন্দেহ। তাঁহাদের খরচ করিবার মত পয়সাও আছে, লোককে দেখাইবার স্পৃহাও আছে, তাঁহারা তাহা করিয়াও থাকেন; এবং যে সকল লোক তাঁহাদের সহিত দেখা করিতে যান, তাঁহারা উহাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে গিয়া পীড়িত হন।

প্রসিদ্ধ ঠাকুর পরিবারের প্রভাবে অধুনা ভারতের সর্বত্র কারু-শিল্প-কৃতি জাগিতেছে। কিন্তু যে দেশের লোকের প্রতিপদে ঋণা-বিপত্তি, নিষেধাজ্ঞা ও দমন, যেখানে এক সর্বব্যাপী ভয়ের রাজত্ব, সেখানে কি কোন কলাবিদ্যার উন্নতি হইতে পারে?

বোম্বাইয়ে অনেক সহকর্মীর সহিত সাক্ষাৎ হইল; অনেকেই সদ্য কারামুক্ত। বোম্বাইয়ে সমাজতন্ত্রীদল বেশ শক্তিশালী দেখিলাম, আধুনিক কতকগুলি ঘটনায় কংগ্রেসের কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিদের উপর অনেকেই ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। রাজনৈতিক ব্যাপারে গান্ধিজীর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর তীব্র সমালোচনা চলিতেছে। এই সকল সমালোচনার সহিত আমি প্রায় একমত; কিন্তু আমি স্পষ্টই বুঝিলাম যে, আমরা যে অবস্থায় পড়িয়াছি, তাহার উপর আমাদের কোন হাত নাই; ইহার মধ্যেই কাজ চালাইতে হইবে। নিরুপদ্রব প্রতিরোধ বর্জন করিলেই যে আমরা রেহাই পাইব, এমন সম্ভাবনা নাই; গভর্ণমেন্ট আক্রমণ চালাইতে থাকিবেন এবং কোন কাজ করিতে গেলেই জেলে যাওয়া অনিবার্য্য। আমাদের জাতীয় আন্দোলন এখন এমন অবস্থায় আসিয়াছে যে, হয় গভর্ণমেন্ট ইহা দলিত করিয়া ফেলিবেন, নয় ইহা ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টকে ইহার ইচ্ছামত কার্য্য করিতে বাধ্য করিবে। ইহার অর্থ এই যে, ইহা বর্তমানে এমন এক অবস্থায় আসিয়াছে, যেখানে বে-আইনী ঘোষিত হইবার সম্ভাবনা সর্বদাই বিদ্যমান এবং নিরুপদ্রব প্রতিরোধ বর্জন করিলেও এই আন্দোলন পিছাইয়া যাইতে পারে না। নিরুপদ্রব

প্রতিরোধ চালাইয়া যাওয়ার মূল্য কার্যতঃ অতি অল্প হইলেও নৈতিক আত্মরক্ষার দিক দিয়া ইহার একটা মূল্য আছে। সংঘর্ষ চলিবার সময় নূতন ভাব প্রচার সহজ; সাময়িক ভাবে সংঘর্ষে ক্রান্ত দিলেই সকলে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িবে। সংঘর্ষের পরিবর্তে এক মাত্র পথ,—আপোষের মনোভাব লইয়া ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সম্মুখীন হওয়া এবং আইন সভায় নিয়মতান্ত্রিক কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া।

ইহা অত্যন্ত সঙ্কটের অবস্থা, সহসা মন স্থির করিয়া সহজ নহে। আমি সহকর্মীদের মানসিক দ্বন্দ্ব সংঘাত হৃদয়ঙ্গম করিলাম, কেন না আমার নিজের মনেও আলোড়ন চলিতেছিল। কিন্তু আমি এখানেও দেখিলাম, ভারতের অন্ত্রও দেখিয়াছি, কেহ কেহ উচ্চাঙ্গের সমাজতান্ত্রিক যতবাদের দ্বারা কর্মহীন আশ্রমকে প্রশ্রয় দিতে চাহেন। যাহারা সংঘর্ষের মধ্যে ধূলি ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া বিম্ববহুল দায়িত্ব স্বন্ধে লইয়াছেন, তাঁহাদিগকে, যাহারা প্রায় কিছুই করেন নাই, তাঁহারা যখন দূর হইতে প্রগতিবিরোধী বলিয়া সমালোচনা করেন, তখন তাহা বিরক্তিকর সন্দেহ নাই; এই সকল বৈঠকখানা-বিলানী সমাজতান্ত্রিকের অজ্ঞোশ, “প্রধান প্রগতিবিরোধী” গান্ধিজীর উপরই সর্বাধিক। ছায়াশাস্ত্রের দিক দিয়া ইহাদের যুক্তিতর্ক নিপুণ ও নিখুঁত সন্দেহ নাই। তথাপি ইহা বাস্তব ঘটনা যে, এই “প্রগতিবিরোধী” মনুষ্যটি ভারতবর্ষকে জানেন, বুঝেন এবং ইনিই কৃষক ভারতের প্রতীক। ইনি ভারতবর্ষকে যেরূপ প্রচণ্ড আলোড়নে আলোড়িত করিয়াছেন, কোন তথাকথিত বিপ্লবী দ্বারা তাহা সম্ভব হয় নাই। এমন কি, তাঁহার অতি আধুনিক হরিজন আন্দোলনও ধীর অথচ অনিবার্য গতিতে হিন্দুয়ানীর গোঁড়ামির ভিত্তি কাঁপাইয়া তুলিয়াছে। যদিও তিনি গোঁড়াদের প্রতি ভয় ও সৌজত্বপূর্ণ ব্যবহার করেন, তথাপি তাঁহাকে পরমশত্রুজ্ঞানে তাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধে সজ্জাবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন। তিনি তাঁহার নিজস্ব ভঙ্গীতে এমন ভাবে শক্তি সঞ্চার করেন, যাহা জলতরঙ্গের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া লক্ষ লক্ষ নরনারীকে অভিভূত করিয়া ফেলে। প্রগতিবিরোধীই হউন আর বিপ্লবীই হউন, তিনি ভারতকে রূপান্তরিত করিয়াছেন, ভয়চকিত অধঃপতিত জনসাধারণের মধ্যে গর্ব ও চরিত্রবল সঞ্চার করিয়াছেন, তাহাদের শক্তি ও চেতনাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছেন এবং ভারতের সমস্তকে আন্তর্জাতিক সমস্তায় পরিণত করিয়াছেন। উদ্বেগ ও তৎসংশ্লিষ্ট দার্শনিক তত্ত্বের কথা ছাড়াও তিনি ভারতবর্ষ ও জগতকে অতি শক্তিশালী ও অল্পময় অহিংস অসহযোগ এবং নিরুপদ্রব প্রতিরোধের উপায় প্রদান



জওহরলাল নেহরু

করিয়েছেন; এবং ইহা যে ভারতের বিশেষ অবস্থায় গ্রহণের সবিশেষ অনুকূল, তাহাতে লেশমাত্র সংশয় নাই।

আমার মতে সততই সাধু সমালোচনায় উৎসাহ দেওয়া কর্তব্য এবং আমাদের সমস্যাগুলি যথাসম্ভব প্রকাশে আলোচনা করা উচিত। গান্ধিজীর উপর নির্ভর করা এবং সিদ্ধান্তের জন্য তাঁহার মুখাপেক্ষী হওয়ার ভাব সর্বদাই দেখা যায়। ইহা অত্যন্ত ভুল। অন্ধ আনুগত্য দ্বারা নহে, যুক্তিযুক্ত ভাবে উদ্বেগ ও উপায় স্থির করিয়া এবং সেই ভিত্তিতে সহযোগিতা ও শৃঙ্খলাবদ্ধ কার্যদ্বারাই জাতি অগ্রসর হইতে পারে। যিনি যত বড়ই হউন না কেহই সমালোচনার অতীত নহেন। কিন্তু যখন সমালোচনা কর্মবিমুখতার ছলনা মাত্র, তখন তাহা অশ্রদ্ধা। সমাজতন্ত্রীরা এই শ্রেণীর কাজ করিলে জনসাধারণের দিক্কারই লাভ করিবেন, কেন না লোকে কাজ দেখিয়া বিচার করে। লেনিন বলিয়াছেন, “ভবিষ্যতের কোমল স্বপ্নে বিভোর হইয়া যে উপস্থিত কঠিন কর্তব্য অস্বীকার করে, সে-ই স্ববিধাবাদী। তন্ম্বের দিক্ দিয়া ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, বাস্তব জীবনে বিকাশ ও পরিপুষ্টির মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিয়া, স্বপ্নালস কল্পনার মোহাই দিয়া নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা।”

সমাজতন্ত্রী ও কমুনিষ্টগণ প্রধানতঃ কলকারখানার শ্রমিক সম্পর্কিত সাহিত্য হইতে পুষ্টি আহরণ করেন। কোন বিশেষ অঞ্চলে বোম্বাই বা কলিকাতার সহরতলীতে বহুসংখ্যক কারখানার শ্রমিক আছে বটে, কিন্তু অবশিষ্ট ভারত কৃষক পরিপূর্ণ। কাজেই কারখানার শ্রমিকদের কথাই মুখ্য করিয়া ভারতবর্ষের সমস্ত সমাধান অথবা তাহা লইয়া কোন কাজ করা যাইতে পারে না। জাতীয়তাবাদ ও পল্লীর আর্থিক ব্যবস্থা—এই দুইটি মুখ্য কথা; ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রবাদে কদাচিৎ ইহার আলোচনা দেখা যায়। মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী কৃষিয়ার সহিত ভারতের অনেকটা সাদৃশ্য থাকিলেও, সেখানে যে অভূতপূর্ব ও অচিস্তনীয় ব্যাপার ঘটিয়াছে, অন্তত তাহার পুনরভিনয় প্রত্যাশা করা মূঢ়তা মাত্র। আমি বিশ্বাস করি, কমুনিজম-এর দার্শনিকতা আমাদেরকে প্রত্যেক দেশের বর্তমান অবস্থা বুঝিতে সাহায্য করে এবং অধিকন্তু ভবিষ্যৎ উন্নতির পথও নির্দেশ করে। কিন্তু ঘটনা ও অবস্থা পর্যবেক্ষণ না করিয়া উহাকে অন্ধভাবে প্রয়োগ করা উহার প্রতি অবিচার ও জবরদস্তী মাত্র।

জীবন একটা জটিল ব্যাপার; জীবনের মধ্যে স্ববিরোধিতা ও

গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাৎ

সংঘাত দেখিয়া সময় সময় হতাশ হইতে হয়। মানুষের মধ্যে যে মতভেদ হইবে, তাহাতে বিচিত্র কিছুই নাই; এমন কি, সহকর্মীরা পর্যন্ত একই উপায়ে সমস্যা সমাধান করিতে গিয়া বিপরীত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের দুর্বলতা ঢাকিবার জন্য বড় বড় বুলি আওড়ায় এবং মহান বীতির কথা বলে, তাহাকে সন্দেহ করিতে হয়। যে ব্যক্তি কারাগার হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য গভর্ণমেন্টের নিকট প্রতিশ্রুতি অথবা মুচলেকা দেয় এবং অন্ত্যস্ত সন্দেহের আচরণ করে, আবার অপরকে সমালোচনা করিবার দুঃসাহস দেখায়, সে যে পথ বা মত সমর্থন করে, তাহারই ক্ষতি হয়।

বোম্বাই সকল জাতির জনপূর্ণ বৃহৎ সহর, এখানে নানাশ্রেণীর লোকের বিচিত্র অতি-গতি দেখা যায়। যাহা ইউক, একজন প্রধান নাগরিক তাঁহার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মসম্পর্কিত মতবাদের উদারতার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। শ্রমিক নেতা হিসাবে তিনি সমাজতান্ত্রিক; রাজনীতিক্ষেত্রে সাধারণতঃ নিজকে গণতন্ত্রী বলিয়া পরিচয় দেন। তিনি হিন্দুস্তানের অতিমাত্রায় প্রিয় এবং ধর্ম ও সমাজের প্রাচীন আচার অনুষ্ঠান রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আইনের হস্তক্ষেপের তিনি বিরোধী। নির্বাচনের সময় তিনি প্রাচীন রহস্যবেত্তা আধ্যাত্মিকতার পূজারী সনাতনীদেব মনোনীত প্রার্থী। এত বহুমুখী ও বিভিন্ন কার্যের মধ্যে লিপ্ত থাকিয়াও তাঁহার শক্তির শেষ নাই, অবশিষ্ট শক্তি তিনি কংগ্রেসের সমালোচনা এবং গান্ধিজীকে “প্রগতিবিরোধী” বলিয়া নিন্দা করিতে নিয়োগ করেন। আরও কয়েকজনের সহিত মিলিত হইয়া ইনি কংগ্রেস গণতন্ত্রীদল গঠন করিয়াছেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে গণতন্ত্রের সহিত ইহার কোন যোগাযোগ নাই এবং সেই মহান প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ করা ছাড়া কংগ্রেসের সহিত ইহার আর কোন সম্পর্ক নাই। নূতন রাজ্য জয় করিবার অেষ্মেণে বহির্গত হইয়া ইনি শ্রমিক প্রতিনিধিরূপে জেনেভায় শ্রমিক সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন; ইহার কাজ কর্ম দেখিয়া মনে হয়, ইনি যেন ইংরাজ নমুনায়, “ন্যাশনাল” গভর্ণমেণ্টের প্রধানমন্ত্রিপদের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিতেছেন।

এত বহু বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গী এবং কার্যশক্তি লাভ করিবার দুর্বল ভৌগা অতি অল্প লোকেরই থাকে। তথাপি কংগ্রেসের সমালোচকদের অনেকেই ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে ভ্রমণ করিয়াছেন, অনেক কিছুই হাতড়াইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কয়েকজন আবার নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলেন; ইহারা সমাজতন্ত্রবাদকেই কলঙ্কিত করেন।

লিবারেল দৃষ্টিভঙ্গী

গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাতের জগ্ন পুণ্য অবস্থানকালে একদিন সন্ধ্যায় তাঁহার সহিত ‘সার্ভেণ্টস অব্ ইণ্ডিয়া সোসাইটী’র বাড়ীতে গিয়াছিলাম। সমিতির কতিপয় সদস্য রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং তিনি উত্তর দিতে লাগিলেন; এইরূপে এক ঘণ্টারও কিছু অতিরিক্ত কাল অতিবাহিত হইল। সমিতির সভাপতি মিঃ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী তথায় উপস্থিত ছিলেন না এবং অগ্ন্যগ্ন সদস্যগণ অপেক্ষা বহুগুণে যোগ্য পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরুও ছিলেন না; তবে কয়েকজন প্রবীণ সদস্য উপস্থিত ছিলেন। আমরা অল্প কয়েকজন এইকালে উপস্থিত ছিলাম, অতিশয় তুচ্ছ ঘটনা লইয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন শুনিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। গান্ধিজীর সেই বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা এবং বড়লাটের অসম্মতি—অধিকাংশ প্রশ্নই ঐ পুরাতন বিষয় লইয়া হইতে লাগিল। এই বহুসমস্যাপীড়িত জগৎ এবং যখন তাহাদের স্বদেশ স্বাধীনতার জগ্ন কঠোর সম্বন্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, যখন শত শত প্রতিষ্ঠান বে-আইনী ঘোষিত হইয়াছে, তখন তাঁহারা উহা ছাড়া আর কি আলোচনার কোন গুরুতর বিষয় খুঁজিয়া পাইলেন না? কৃষকদের দুর্দশা, ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দাজনিত ব্যাপক বেকার-সমস্যা রহিয়াছে। বাঙ্গলা, সীমান্ত এবং ভারতের অগ্ন্যগ্ন অংশে ভয়াবহ ঘটনা ঘটতেছে। স্বাধীন চিন্তা, বক্তৃতা, লেখা ও সভা-সমিতির স্বাধীনতা হরণ করা হইয়াছে—এমনই আরও কত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা রহিয়াছে; কিন্তু তাহাদের প্রশ্নগুলি তুচ্ছ ঘটনার মধ্যই সীমাবদ্ধ রহিল। গান্ধিজী অগ্রসর হইলে বড়লাট কিম্বা ভারত গবর্ণমেন্ট কি করিবেন, সেই সম্ভাবনা লইয়াই তাঁহারা ব্যস্ত।

আমার মনে হইতে লাগিল, যেন আমি একটা মঠে প্রবেশ করিয়াছি। এখানকার অধিবাসীরা সমস্ত বহির্জগতের সহিত যেন সকল যোগসূত্র ছিন্ন করিয়াছেন। তথাপি আমাদের এই বন্ধুরা রাজনৈতিক কর্মী এবং যোগ্য ব্যক্তি। ইহারা ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন এবং দীর্ঘকাল জনসেবায় ব্রতী আছেন। অগ্ন্যগ্ন কয়েকজনের সহিত মিলিত হইয়া ইহারা ই লিবারেল দলের প্রকৃত মেরুদণ্ড। এই দলের অগ্ন্যগ্ন ব্যক্তির কোন

লিবারেল দৃষ্টিভঙ্গী

নির্দিষ্ট মতামতের ধার ধারেন না। মাঝে মাঝে রাজনৈতিক ব্যাপারের মধ্যে যোগ দিয়া ক্ষণিক উত্তেজনা অল্পভব করেন মাত্র। এই শ্রেণীর মডারেটদের অনেকের, বিশেষতঃ বোম্বাই ও মাদ্রাসে, সরকারী কর্মচারীদের সহিত পার্থক্য বুঝাই কঠিন :

কোন দেশের রাজনৈতিক উন্নতি কতখানি হইয়াছে, সেই দেশের নিকট উহাই প্রধান প্রশ্ন। সেই দেশের ব্যর্থতার যদি কোন কারণ থাকে, তাহা হইলে তাহা এই যে, সে নিজের নিকট প্রকৃত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে নাই। আমরা সম্প্রদায় হিসাবে আসন বণ্টন লইয়া সময় ও শক্তি নষ্ট করিতেছি। সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা লইয়া স্বতন্ত্র দল গড়িতেছি এবং নিষ্ফল তর্কযুদ্ধ চালাইতেছি; অথচ মূখ্য সমস্যাগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছি না। আমরা যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ, ইহা তাহারই প্রমাণ। ঠিক এই ভাবেই ‘সার্ভেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া সোসাইটী’র সদস্যগণ সেদিন গান্ধিজীকে যে সকল প্রশ্ন করিলেন, তাহার মধ্যে ঐ সমিতি এবং লিবারেল দলের অদ্বুত মানসিক অবস্থা ফুটিয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল, তাঁহাদের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক নীতি নাই, কোন উদার দৃষ্টিভঙ্গী নাই, তাঁহাদের রাজনীতি যেন বৈঠকখানা অথবা দরবারী ধরণের—উচ্চ রাজকর্মচারীরা কি করিবেন অথবা কি করিবেন না।

“লিবারেল পার্টি” এই নাম শুনিয়া অনেকের ভ্রান্ত ধারণা হইতে পারে। অল্পত্র এবং বিশেষভাবে ইংলণ্ডে এই নামের একটা সার্থকতা আছে। সেখানে উহাতে এক নিশ্চিত অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য—স্বাধীন বাণিজ্য এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে গভর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ না করা প্রভৃতি এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও কতকগুলি সামাজিক স্বাধীনতা সম্পর্কিত মতবাদ বুঝায়। ইংলণ্ডের উদারনৈতিক দলের পরম্পরাগত নীতি অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বাণিজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা এবং রাজার একচেটিয়া অধিকার ও ইচ্ছামত ট্যাক্স ধাৰ্য্য করিবার ব্যবস্থার বিলোপ করিবার চেষ্টা হইতেই রাজনৈতিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছিল। ভারতীয় লিবারেলদের সেরূপ কোন ভিত্তি নাই। তাঁহারা স্বাধীন বাণিজ্যে বিশ্বাস করেন না; প্রায় সকলেই সংরক্ষণবাদী এবং আধুনিক ঘটনাগুলিতে প্রমাণ হইয়াছে যে, তাঁহারা পৌর স্বাধীনতাগুলিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেন না। প্রায় সামন্ত-তান্ত্রিক ও স্বৈচ্ছাচারী দেশীয় রাজ্যগুলি, যেখানে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের কোন অস্তিত্ব নাই, ঐগুলির সহিত ইহাদের ঘনিষ্ঠতা এবং সর্বদা সমর্থন দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাঁহারা ইউরোপীয় শ্রেণীর লিবারেল নহেন—অর্থাৎ ভারতীয় লিবারেলগণ কোন দিক দিয়াই উদার

নহেন। বস্তুতঃ তাঁহারা যে কি তাহা বলা কঠিন। কেন না, তাঁহাদের কোন দৃঢ় মতবাদ বা বিশ্বাস নাই এবং সংখ্যায় অত্যন্ত হইলেও পরস্পরের সহিত মতভেদ ঘটয়া থাকে। কেবল গা বাঁচাইবার বেলায় তাঁহাদের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা সর্বত্রই অগ্রায় দেখেন এবং তাহা এড়াইতে চান এবং আশা করেন যে, এইভাবে তাঁহারা সত্য আবিষ্কার করিবেন। সত্য অবশ্য তাঁহাদের নিকট মধ্য-পন্থা। তাঁহাদের মতে চরম কিছু মনে হইলেই তাঁহারা সমালোচনা করেন এবং সমালোচনামুখে নিজেদের ধান্মিক, ধীরপ্রকৃতি এবং ভাল মানুষ মনে করিয়া পুলকিত হন। এই উপায়ে তাঁহারা তাঁহাদিগকে জটিল চিন্তা হইতে মুক্ত রাখেন, কোন গঠনমূলক প্রস্তাব গড়িয়া তুলিবার ক্লেশ স্বীকার করেন না। অনেকের অস্পষ্ট ধারণা আছে যে, ধনতন্ত্র ইউরোপে পূর্ণভাবে কৃতকার্য হয় নাই এবং অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল অবস্থার মধ্যে পড়িয়াছে। অন্যদিকে সমাজতন্ত্রবাদ একেবারেই মন্দ, কেন না ইহা কায়েমী স্বার্থকে আক্রমণ করে। সম্ভবতঃ, ভবিষ্যতে এক অলৌকিক সমাধান খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে, একটা মাঝামাঝি ব্যবস্থা হইবে এবং ততদিন কায়েমী স্বার্থগুলি রক্ষা করা উচিত। যদি তর্ক উঠে যে, পৃথিবী গোল কি চ্যাপ্টা, তাহা হইলে তাঁহারা সম্ভবতঃ এই দুই চরম মতেরই নিন্দা করিবেন এবং বলিবেন, ইহাকে চতুষ্কোণ অথবা ডিম্বাকৃতি বলিয়াও ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

অতি তুচ্ছ এবং সামান্য ব্যাপার লইয়াও তাঁহারা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠেন এবং এমন চেষ্টামেচি গোলমাল স্রব্দ করিয়া দেন যে, দেখিতে বিশ্বয় লাগে। জ্ঞাতসারেই হউক এবং অজ্ঞাতসারেই হউক, তাঁহারা মূল সমস্যাগুলির ধার দিয়াও যান না। কেন না, তাহা হইলে খাটী প্রতীকারোপায় নির্দেশ করিতে হইবে এবং তাহাতে চিন্তা ও কার্যের সাহসিকতা আবশ্যক। ইহার ফলে জয়পরাজয় লইয়া লিবারেলরা মোটেই উদ্বিগ্ন হন না। তাঁহাদের কোন নীতি নাই; এই দলের প্রধান বিশেষত্ব হইল এই,—যদি ইহাকে বিশেষত্ব বলা যায়,—যে ভাল মন্দ সকল বিষয়েই মধ্যপথে থাকা। জীবনের এই দৃষ্টিভঙ্গী দেখিয়া মনে হয় যে, ইহাদের পুরাতন নাম মডারেটই অধিকতর শোভন ও সঙ্গত।

“মিতাচারের উপরেই আমার গৌরব প্রতিষ্ঠিত। রক্ষণশীলেরা আমাকে বলে উদারনৈতিক আর উদারনীতিকেরা বলে আমি রক্ষণশীল।”

—আলেকজান্ডার পোপ।

কিন্তু সদৃশ্য হিসাবে মিতাচার যতই প্রশংসার হউক না কেন, ইহা প্রথর ও প্রদীপ্ত নহে। ইহাতে অনুভূতিপ্রবণতা মন্দীভূত হইয়া যায়,

লিবারেল দৃষ্টিভঙ্গী

সেই কারণেই ভারতীয় লিবারেলগণ “নিরানন্দ সৈন্যদল”, ইহাদের হাবভাব গুরুগম্ভীর ও চিন্তাশীল, ইহাদের কথাবার্তা বলিবার এবং লিখিবার ভঙ্গী নীরস এবং পরিহাসপটুতা ‘আদৌ’ নাই। ইহার ব্যক্তিগতও অবশ্য আছে। যেমন স্মার তেজ বাহাদুর স্প্রু, ইনি ব্যক্তিগত জীবনে মোটেই নিস্তেজ ও রসবোধহীন নহেন এবং নিজের বিদ্বেষে পরিহাসও উপভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু মোটের উপর লিবারেলগণ চরম বুদ্ধিগাতাত্ত্বিক এবং ইহাদের মধ্যে একটা সাধারণ ঐক্য আছে। লিবারেল দলের মুগ্ধপ্রবৃত্তি এলাহাবাদের “লীডার” গত বৎসর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই মনোবৃত্তির এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন। লেখা হইয়াছিল, মহাপুরুষ ও অসাধারণ ব্যক্তির জগতকে বড় বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত করেন, অতএব সাধারণ মাঝারী গোছের মানুষ অনেক ভাল। অতি সরল ও নিখুঁতভাবে “লীডার” মধ্যপন্থার জয়ধ্বজা কলিয়া ধরিয়াছিলেন।

মিতাচার, রক্ষণশীলতা, আকস্মিক পরিবর্তন ও বিঘ্ন এড়াইবার চেষ্টা বৃদ্ধবয়সের সাধারণ লক্ষণ। কিন্তু যৌবনের ইহাতে অনুরাগ নাই। আমাদের এই প্রাচীন ভূমিতে অনেকেই জন্ম হইতেই অবসন্ন, নিরাশ, তাঁহাদের মুখে দীপ্তিহীন পঙ্কতার ছাপ। কিন্তু এই প্রাচীন ভূমিতেও পরিবর্তনের শক্তি সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে এবং মডারেট-মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির বিহ্বল হইতেছেন। প্রাচীন জগত অস্বস্তিক হইতেছে; লিবারেলগণ যথাসাধ্য তাঁহাদের মধুর যৌক্তিকতা দিয়াও তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছেন না। ইহারা ঘূর্ণিবাত্যা, বহু ও ভূমিকম্পের সহিত যেন তর্ক করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহাদের অভ্যস্ত পুরাতন কৌশল ব্যর্থ অথচ তাঁহারা নূতনভাবে চিন্তা ও কার্য্য করিতে সাহস পান না। ইউরোপীয় পরম্পরাগত কৌলিক গুণ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ডাঃ এ এন হোয়াইটহেড বলিতেছেন, “পূর্বপুরুষগণ যে সকল বিধি ব্যবস্থার দ্বারা শাসিত হইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়াছেন, বংশানুক্রমিক তাহাই চলিবে এবং উহা দ্বারাই সম্ভান-সন্ততিগণের জীবনও বহল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইবে, এই নীতিবিগহিত ধারণার উপরই সমস্ত পারম্পর্য্য অবস্থিত। আমরা মানবেতিহাসের এমন এক প্রথম অধ্যায়ে আসিয়াছি, যেখানে ঐরূপ ধারণা ভ্রান্ত।” ডাঃ হোয়াইটহেড এই বিশ্লেষণে যথেষ্ট সংযম দেখাইয়াছেন, কেন না হয় ত এই ধারণা সর্বকালেই মিথ্যা ছিল। যদি ইউরোপের পারম্পর্য্য রক্ষণশীল হয়, তাহা হইলে আমাদের দেশে উহার প্রভাব কত অধিক! কিন্তু যখন পরিবর্তনের সময় আসে তখন ইতিহাসের গঠনিতাগণ ঐ সকল পারম্পর্য্যকে অল্পই গ্রাহ্য করেন।

আমাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হইলে আমরা অসহায়ভাবে তাহা নিরীক্ষণ করি এবং অপরের উপর দোষ দেই। যেমন মিঃ জেরাল্ড হিয়ার্ড বলিয়াছেন, “যে পরিকল্পনার ব্যর্থতা হইতে কাহারও মনে এরূপ ধারণা হয় যে, তাহার নিজের চিন্তার ভুলে নহে, অপরে ইচ্ছা করিয়া উহা পণ্ড করিয়াছে, তবে তাহার মত ভ্রান্তির বিড়ম্বনা আর নাই।”

আমরা সকলেই এই ভয়াবহ ভ্রান্তি দ্বারা পীড়িত। সময় সময় আমার মনে হয়, গান্ধিজীও ইহা হইতে মুক্ত নহেন। কিন্তু আমরা অন্ততঃ কার্য্য করি এবং জীবনের সহিত যোগ রাখিবার চেষ্টা করি; পরীক্ষা ও ভুলের দ্বারা সময় সময় ভ্রান্ত ধারণা অপসারিত হয় এবং আহত ব্যাহত হইয়াও আমরা অগ্রসর হই। কিন্তু লিবারেলদের দুঃখ অনেক বেশী। বৃষ্টি বা ভুল করিয়া ফেলিব, এই ভয়ে তাঁহারা কাজই করিতে চাহেন না, তাঁহারা জনসাধারণের প্রাণপ্রদ সংশ্রবে আসেন না এবং আত্মসম্বোধিত মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিজেদের মনের মধ্যে বাস করেন। দেড় বৎসর পূর্বে মিঃ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী তাঁহার লিবারেল সঙ্গীদিগকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, “দূরে দাঁড়াইয়া ঘটনার স্রোত লক্ষ্য করিও না।” এই সাবধানবাণীর মধ্যে যে উচ্চতর সত্য নিহিত আছে, সম্ভবতঃ তিনি তাহা ধারণা করিতে পারেন নাই। গভর্নমেন্টের কাঁধের সহিত সতত চিন্তা করিতে অভ্যস্ত শাস্ত্রী মহাশয়, বিভিন্ন সরকারী কমিটি তা দিয়া যে শাসনতন্ত্র ফুটাইতেছিল, তাহার প্রতিই অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু লিবারেলদের দুর্ভাগ্য এই যে, যখন তাঁহাদের স্বদেশবাসীরা অগ্রসর হইতেছিল, তখন তাঁহারা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ঘটনার স্রোত লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাঁহাদের আপন জনসাধারণের ভয়েই তাঁহারা ভীত; আমাদের শাসকগণের সহিত কলহ করা অপেক্ষা জনসাধারণের সংশ্রব বর্জন করাই তাঁহারা শ্রেয় মনে করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে নিজেদের দেশে অপরিচিত অতিথি হইবেন এবং জীবন তাঁহাদিগকে ছাড়াইয়া অগ্রসর হইবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি? যখন জীবন ও স্বাধীনতার জ্ঞাত তাঁহাদের স্বদেশবাসীরা তীব্র সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তখন তাঁহারা কোন পক্ষে ছিলেন, সে সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। নিরাপদ অন্তরাল হইতে তাঁহারা আমাদের অনেক সদুপদেশ দিয়াছেন, বড় বড় নীতিকথা গুনাইয়াছেন এবং আঠার মত তৈলমদনে লাগিয়াছিলেন। গোলটেবিল বৈঠকে ও বিভিন্ন কমিটিতে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সহিত তাঁহাদের সহযোগিতাকে গভর্নমেন্ট কিছু মর্যাদা দিয়াছিলেন। অস্বীকার করিলে অস্বীকার অত্যাচার হইত। ইহা উল্লেখযোগ্য

লিবারেল দৃষ্টিভঙ্গী

যে, এই সকল সম্মেলনের একটিতে ব্রিটিশ শ্রমিকদল পর্যন্ত যোগদান করে নাই; কিন্তু কতিপয় বিশিষ্ট ভদ্রলোকের নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহারা যোগ না দিয়া পারেন নাই।

বিভিন্ন বিষয়ে আমরা সকলেই অল্পবিস্তর নানান্তরের নরমপন্থী ও চরমপন্থী। কোন বিষয়ে যদি আমাদের আসক্তি থাকে, তবে তাহার প্রতি আমাদের মনোভাব অতিমাত্রায় সচেতন থাকিবে এবং তাহাই চরমপন্থীর মনোভাব। অগ্রক্ষেপে আমরা সৌজ্ঞাত্মপূর্ণ সহিষ্ণুতা, দার্শনিক সংযম দেখাইতে পারি; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহা আমাদের ঔদাসীন্যের আবরণ মাত্র। আমি দেখিয়াছি, মডারেটদের মধ্যেও নিরীহ ব্যক্তি কোন বিশেষ শ্রেণীর কায়মীস্বার্থ লোপের প্রস্তাব শুনিয়া উগ্র চরমপন্থীসুলভ মনোভাব দেখাইয়াছেন। আমাদের লিবারেল বন্ধুরা কিয়দংশে ধনী ও স্বচ্ছলশ্রেণীর প্রতিনিধি। তাঁহারা স্বরাজের জগৎ অপেক্ষা করিতে পারেন; উহা লইয়া তাঁহাদের উত্তেজিত হইয়া উঠিবার প্রয়োজনাভাব। কিন্তু কোন গুরুতর সামাজিক পরিবর্তনের প্রস্তাব শুনিলেই তাঁহারা অধৈর্য্য হইয়া উঠেন, তাঁহাদের সংযম ভাসিয়া যায় অথবা মধুর যৌক্তিকতা আর থাকে না। বস্তুতঃ তাঁহাদের সংযম কেবল ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রতি তাঁহাদের মনোভাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাঁহারা মনে মনে এই আশা পোষণ করেন যে, তাঁহারা যদি গভর্নমেন্টকে শ্রদ্ধা করিয়া আপোষের ভাব দেখান, তাহা হইলে পুরস্কারস্বরূপ তাঁহারা ইহাদের কথা শুনিবেন। এই অবস্থায় ব্রিটিশ মতামতই পূর্ণভাবে মানিয়া লওয়া ছাড়া তাঁহাদের গতান্তর নাই। এরস্কাইন মের “পার্লামেন্টারী প্রাকটিস” ইহাদের নিত্যপাঠ্য, এই শ্রেণীর পুস্তক, সরকারী নানাবিধ রিপোর্ট তাঁহারা ভক্তির সহিত পাঠ করেন; নূতন কোন সরকারী রিপোর্ট প্রকাশ হইলেই তাঁহারা উৎসাহের সহিত গবেষণা আরম্ভ করেন। লিবারেল নেতারা ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া “হোয়াইট হলে”র (ইংলণ্ডের মন্ত্রীদের দপ্তরখানা) বড় কর্তাদের সম্মুখে রহস্যময় বিবৃতি দেন; লিবারেল, রেসপনসিভিটি ও এই প্রকার অগ্ন্যাত্ম শ্রেণীর ব্যক্তিদের নিকট হোয়াইট হল হইল ইঙ্গলোক। একটা পুরাতন প্রবাদ আছে যে, ভাল আমেরিকানরা মৃত্যুর পর প্যারীতে যায়; হয় ত ভাল লিবারেলরা মৃত্যুর পর ভূত হইয়া হোয়াইট হলের আনাচে কানাচে বিচরণ করেন।

আমি লিবারেলদের কথা লিখিতেছি বটে; কিন্তু এই সকল কথা অনেক কংগ্রেসপন্থীদের সম্মুখেও খাটে। ইহা রেসপনসিভিটিদের প্রতিই বিশেষভাবে প্রযোজ্য, কেন না আত্মসংযমের দিক দিয়া ইহারা লিবারেলদেরও হারা হইয়া দিয়াছেন। সাধারণ একজন লিবারেলের সহিত সাধারণ একজন কংগ্রেসপন্থীর

অনেক কিছুই পার্থক্য আছে ; কিন্তু এই পার্থক্যের সীমা সম্প্রতি ও নির্দিষ্ট নহে। মতবাদের দিক দিয়া অগ্রগতিসম্পন্ন লিবারেল এবং মডারেট কংগ্রেসপন্থীর মধ্যে পার্থক্য অল্পই। তবে গান্ধিজীর ব্যবহার ফলে প্রত্যেক কংগ্রেসপন্থীই দেশ ও জনসাধারণের সহিত কিছু সংস্পর্শ রাখিয়া থাকে, তাহাকে কিছু কাজও করিতে হয়, এই কারণে তাহার মতবাদ সম্প্রতি ও বাপসা হইয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু লিবারেলদের সম্বন্ধে একথা বলা চলে না, তাহারা কি প্রাচীন, কি আধুনিক উভয়ের সহিতই যোগসূত্র হারাইয়াছেন। দল হিসাবে ইহারা ক্ষয়িষ্ণু এবং ক্রমে বিলীয়মান হইতেছেন।

আমার মনে হয়, আমরা অনেকেই প্রাচীন পৌরাণিক ভাব হারাইয়াছি অথচ কোন নূতন অন্তর্দৃষ্টি পাই নাই। আমরা আর দেখিব না যে, উর্বরী সমুদ্র মগ্ননে আবিস্কৃতি হইতেছেন অথবা মহাদেবের পিনাক টঙ্কারও শুনিব না। এ সৌভাগ্য অতি অল্প লোকেরই হয়, যাহারা—“বালুকা কণার মধ্যে ব্রহ্মাও দর্শন করেন ; বিকশিত বনফুলে স্বর্গ দেখেন, অনন্তকে করামলকবৎ প্রত্যক্ষ করেন, মুহূর্ত্তে অনন্তকাল অনুভব করেন।”

দুঃখের কথা, আমরা অনেকেই প্রকৃতির রহস্যময় জীবনলীলা অনুভব করিতে পারি না ; আমাদের কাণে কাণে সে গোপন কথা বলে না, তাহার স্পর্শে আমরা পুলকে উজ্জল হইয়া উঠি না। তেহি নো দিবস গতাঃ। পুরাকালের মত আমরা প্রকৃতির মধ্যে মহানের আবিস্কৃতি না দেখিলেও আমরা তাহাকে মনুষ্যত্বের গৌরব ও বেদনার মধ্যে দেখিতে পাই—কি বিপুল ইহার স্বপ্ন, ইহার অন্তরে কি প্রমত্ত ঋতিকার আলোড়ন, ইহার সংঘর্ষ ও দুঃখাভিষাত এবং সর্বোপরি দেগি, ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাবনা ও স্বপ্নের সার্থকতায় ইহার কি অগাধ বিশ্বাস। ইহার অনুসন্ধানই আমরা আশাভঙ্গ-জনিত বেদনার উপশম বোধ করি এবং সময় সময় আমরা জীবনের ক্ষুদ্রতা হইতে উদ্ধে উঠিয়া যাই। কিন্তু অনেকেই এই অনুসন্ধানের পথে অগ্রসর হন না ; প্রাচীন ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বর্ত্তমানেও তাহারা অনুসরণ করিবার মত পথ পান না। ইহাদের কোন মহৎ স্বপ্ন নাই, কোন কর্ম নাই। বিপুল ফরাসী বিদ্রোহ বা রুশ-বিপ্লবে মনুষ্যজাতির প্রচণ্ড আলোড়নের মর্ম্মকথা ইহারা উপলব্ধি করিতে পারে না। বহুদিন নির্জীত মানুষের ক্ষুদ্র দুরাশা নিষ্ঠুর আবেগে বিক্ষুব্ধিত হইয়া উঠিলে ইহারা ভয় পায়। ইহাদের দৃষ্টিতে ‘বাস্তব’ এখনও ধ্বংস হয় নাই।

সময় সময় অনেকে ত্রায়সঙ্গত কোভের সহিত বলিয়া উঠেন, “দেশাত্মবোধ কংগ্রেসেরই একচেটিয়া নহে।” এই একই বুলি পুনঃ পুনঃ বলিতে বলিতে ইহার মৌলিকতা নষ্ট হইয়া অত্যন্ত রিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছে। আমি

লিবারেল দৃষ্টিভঙ্গী

আশা করি, কোন কংগ্রেসপন্থীই মনে এরূপ ভাবাবেগ পোষণ করেন না। আমি ত নিশ্চয়ই ইহা কংগ্রেসের একচেটিয়া অধিকার বলিয়া মনে করি না এবং যে কেহ চাহিলেই আমি ইহা তাহাকে সানন্দে উপহার দিতে পারি। অনেক সময়ই ইহা স্ববিধাবাদী ও ভাগ্যাস্থেবীদের আশ্রয়স্থল; সকল শ্রেণী, সকল স্বার্থ ও সকল রুচিকে তৃপ্ত করিবার জন্ত অবশ্য নানা নমুনার স্বদেশপ্রেম আছে। জুডাস যদি আজ জীবিত থাকিত, তাহা হইলে সেও স্বদেশপ্রেমের নামেই কাজ করিত। এখন আর স্বদেশপ্রেমই যথেষ্ট নহে—আমরা আরও উচ্চতর, মহত্তর ও ব্যাপক আরও কিছু চাই।

মিতাচারের জন্তই মিতাচার পর্যাপ্ত নহে। সংঘম ভাল এবং উহা আমাদের মানসিক উৎকর্ষের পরিচায়ক; কিন্তু সংঘমেরও অনেক অন্তরায় আছে, যেগুলিকে সংযত করিতে হয়। মানবের নিয়তি—তাহাকে জড়প্রকৃতি আয়ত্তে মধ্যে আনিতে হইবে। বজ্র ও বিদ্যুৎ হইবে তাহার বাহন; জলন্ত হতাশন, খরস্রোতে কল্লোলিত সলিল হইবে তাহার দাস। কিন্তু যে অন্ধ আবেগ ও আকাজক্ষা তাহাকে দন্ধ করিতেছে, তাহাকে সংঘমের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখা অধিকতর কঠিন। যত দিন পর্যাপ্ত না সে ইহা জয় করিতেছে, ততদিন মনুষ্যত্বের সম্পদের উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে না। কিন্তু আমরা কি পদ পদদ্বয় ও অসাড় হস্তকে সংযত করিব?

দক্ষিণ আফ্রিকার ঔপন্যাসিকদের লক্ষ্য করিয়া লিখিত রয় ক্যাম্বেলের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিবার লোভ আমি সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। ভারতীয় কয়েকটি রাজনৈতিক দল সম্পর্কেও উহা প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয় :—

“তোমরা যেরূপ দৃঢ় সংঘমের সহিত লেখ, তাহারা তাহার প্রশংসা করিয়া থাকে। আমিও তাহার সহিত একমত। তোমাদের হাতে বলা আছে, সংযত করিবার লোহ নাগাম আছে, কিন্তু হায় তোমাদের বেচারা ঘোড়া কোথায়?”

আমাদের লিবারেল বন্ধুরা বলেন যে তাঁহারা,—এক দিকে কংগ্রেস অগ্র দিকে গভর্ণমেন্ট, এই দুই চরম বস্তুকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া সঙ্গীর্ণ অথচ প্রকৃষ্টতর পথে চলেন। উভয়ের দোষ ত্রুটির তাঁহারা স্বয়ং নির্বাকচিত সমালোচক এবং দুই পক্ষের দোষ হইতে তাঁহারা মুক্ত বলিয়া নিজেদের ভাগ্যবান বিবেচনা করেন। তাঁহারা জ্বায়ে তুলাদণ্ডধারী বিচারকের মত চক্ষু বুজিয়া বা বাঁধিয়া রাখেন বলিয়া মনে হয়। কল্পনায় আমি স্বদূর অতীত যুগের সেই বাণী কাণ পাতিয়া শুনি,—
“শাস্ত্রব্যাত্যাতা ধর্মধ্বজী ইহদিগণ...হে অন্ধ পথপ্রদর্শক, তোমরা মশা দেখিলে আংকাইয়া উঠ; কিন্তু উট গিলিতে পটু।”

স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন

গত সতর বৎসর ধাহারা কংগ্রেসের নীতি নিয়মণ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই মধ্যশ্রেণীর লোক। কি লিবারেল কি কংগ্রেসপন্থী উভয়েই একই শ্রেণীভুক্ত এবং একই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বদ্ধিত। ইহাদের সামাজিক জীবন, কুটুম্বিতা, বন্ধুত্ব একই প্রকার এবং তাঁহাদের উভয় জাতীয় বুজ্জিয়া আদর্শের মধ্যে প্রভেদ অল্পই। চরিত্রগত ও মানসিক অবস্থার বিভিন্নতা হইতেই তাঁহারা পৃথক হইতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহারা দুই বিপরীত দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন—একদল গভর্ণমেন্ট, ধনী সম্প্রদায় ও উচ্চ মধ্যশ্রেণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন অগ্ৰদল নিম্ন মধ্যশ্রেণীর দিকে অগ্রসর হইলেন। একই মতবাদ, উদ্দেশ্যেরও তারতম্য নাই। কিন্তু দ্বিতীয় দলের পশ্চাতে আজ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে অগণিত লোক হাট বাজার হইতে, সাধারণ বৃত্তিজীবীদের মধ্য হইতে এবং শিক্ষিত বেকারগণ। স্রর ঘুরিয়াছে, ভাষা এখন আর শ্রদ্ধালু ও ভদ্র নহে; ইহা কর্কশ ও আক্রমণশীল। কার্যতঃ কিছু করিতে না পারিয়া, উগ্র ভাষার মধ্যে কিঞ্চিৎ সাঙ্ঘনা লাভের চেষ্টা। এই নূতন অবস্থা দেখিয়া মডারেটগণ ভয় পাইয়া সরিয়া গেলেন এবং নিরাপদ কোণে আশ্রয় লইলেন। তবুও উচ্চ মধ্যশ্রেণীর একটা বড় অংশ কংগ্রেসে রহিল, তবে সংখ্যায় নিম্ন মধ্যশ্রেণীর বুজ্জিয়ারাই অধিক। কেবল জাতীয় সংঘর্ষের সাফল্যের জগুই তাহারা আসে নাই; সংঘর্ষের মধ্যে আত্মতৃপ্তি লাভ করিবার আশাতেই তাহারা আসিয়াছে। তাহারা অবলুপ্ত অহঙ্কার ও আত্মসম্মানবোধ পুনরুদ্ধার করিতে চায়,—প্রণষ্ট মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে উদগ্রীব। ইহা অতি সাধারণ জাতীয়তাবাদের প্রেরণা এবং উভয়ক্ষেই ইহা সমান; তথাপি কচি ও প্রবৃত্তির বৈচিত্র্যের জগু ইহাই মডারেট ও চরমপন্থীদেরকে পৃথক করিয়াছে। ক্রমে নিম্ন-মধ্যশ্রেণী কংগ্রেসের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং কৃষক সম্প্রদায়ের প্রভাবও অল্পভূত হইতেছে।

কংগ্রেস ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া যতই পল্লীর জনসাধারণের প্রতিনিধি হইয়াছে, ততই লিবারেলদের সহিত তাহার ভেদ বাড়িয়াছে এবং

স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন

এখন কংগ্রেসের বক্তব্য বিষয় বুঝিয়া উঠাই লিবারেলদের পক্ষে কঠিন হইয়াছে। অতি উচ্চশ্রেণীর ড্রয়িং রুমে বসিয়া, দরিরদের গৃহ অথবা মৃৎ কুটীর বুঝা কঠিন। তথাপি উভয় মতবাদই জাতীয় ও বুদ্ধিজাত্য ধরণের—ইহার পার্থক্য কেবল স্তর ভেদ, মূল বস্তুগত নহে। কংগ্রেসে এখনও এমন অনেক ব্যক্তি টিকিয়া আছেন, যাহারা গভার্নেট দলে মিশিলেও বিশেষ অসুবিধা বোধ করিবেন না।

কয়েক পুরুষ ধরিয়া ব্রিটিশগণ ভারতবর্ষকে নিজেদের বৃহৎ মফঃস্বলের বাড়ী (প্রাচীন ইংরেজগণের ধরণে) বলিয়া ভাবিতে অভ্যস্ত। এ-বাড়ীতে তাঁহারাই ভদ্রলোক এবং ভাল অংশে বাস করিবেন, ভারতীয়েরা চাকরদের ঘরে, আস্তাবলে, রান্নাঘরে থাকিবে। প্রত্যেক মফঃস্বলের বাড়ীতে নিম্নপদগুলি নির্দিষ্ট হইয়া আছে—সর্দার চাকর, বাজার সরকার ও তদ্বিরকারক, পাচক খানসামা, চাকরাণী, কোচওয়ান প্রভৃতি এবং প্রত্যেকের স্ব স্ব নির্দিষ্ট নিয়মে চলা ফেরা করে। কিন্তু বাড়ীর উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সামাজিক বা রাজনৈতিক কোন সম্বন্ধ নাই, ব্যবধান অনতিক্রমণীয়, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট যে এই ব্যবস্থা আমাদের উপর চাপাইয়া দিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই; বিশ্বাসের এই যে, আমরা প্রায় সকলেই এই ব্যবস্থাকে আমাদের জীবন যাত্রার স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য নিয়তি বলিয়া মানিয়া লই। বড় লোকের বাড়ীর ভাল চাকরের মনোবৃত্তিতে আমরা অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি। সময় সময় আমরা অতি দুল্লভ সম্মান পাই, বৈঠকখানায় আমাদেরিগকে এক-আধ পেয়লা চা খাইতে দেওয়া হয়। আমাদের জীবনের সর্বোচ্চ দুরাকাজ্জা হইল ইংরাজের নিকট সম্মানলাভ ও ব্যক্তিগতভাবে উচ্চশ্রেণীতে ‘প্রমোশন’ পাওয়া। অস্ত্রবলে জয় বা কূট রাজনৈতিক কৌশলে জয় অপেক্ষা এই মানসিক দাসত্বই ভারতে ইংরাজের সর্বশ্রেষ্ঠ জয়। প্রাচীন কালের জ্ঞানী ব্যক্তির যেমন বলিয়াছেন যে, ক্রীতদাস নিজেকে ক্রীতদাস বলিয়া ভাবিতে আরম্ভ করে।

কিন্তু সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে; মফঃস্বলের বড়বাবুর বাড়ী শ্রেণীর সভ্যতা কি ইংলণ্ড কি ভারতবর্ষ, কোথাও কেহ স্বেচ্ছায় মানিয়া লইতে চাহে না। কিন্তু আমাদের মধ্যে এখনও এমন লোক আছে, যাহারা চাকরদের ঘরে থাকিতে ভালবাসে এবং তকমা, চাপরাশ, উর্দীর বড়াই করে। আবার লিবারেলদের মত অনেকে এই ব্যবস্থা ও ইহার নির্মাণ প্রণালীর প্রশংসা করেন, এবং আশা করেন, একজন একজন করিয়া মালিকদের তাড়াইয়া তাঁহারাই মালিক হইয়া বসিবেন। তাঁহারাই ইহাকে

বলেন, ভারতীয়করণ। তাঁহাদের মতে সমস্তা হইল বর্তমান শাসন ব্যবস্থার বর্ণ পরিবর্তন, অথবা বড়জোর নূতন শাসনব্যবস্থা। কিন্তু তাঁহারা নূতন রাষ্ট্র ভাবিতে পারেন না।

তাঁহারা স্বরাজ্য বলিতে বুঝেন, সবই ঠিক থাকিবে, কেবল কালা আদমীর আধিক্য ঘটবে। তাঁহারা কেবল এক প্রকার ভবিষ্যৎ কল্পনা করিতে পারেন, সেখানে তাঁহারা অথবা তাঁহাদের মত ব্যক্তির বর্তমান ইংরাজ উচ্চকর্মচারীদের পদ গ্রহণ করিয়া প্রধান হইয়া উঠিবেন—একই শ্রেণীর চাকুরী, সরকারী বিভাগ, আইনসভা, ব্যবসা-বাণিজ্য—একই ভাবে সিভিলিয়নরা কাজ করিবেন, রাজা মহারাজারা তাঁহাদের প্রাসাদে থাকিবেন, মাঝে মাঝে উৎসবভূমায় সম্মিলিত ও মণিমাণিক্যখচিত হইয়া প্রজাদের দর্শন দিবেন, জমিদারেরা প্রজাকে হযরাত করিবেন এবং বিশেষ অধিকার রক্ষার জন্ত দাবী করিবেন, টাকার থলিয়া লইয়া মহাজন, জমিদার ও প্রজা উভয়কেই হযরাত করিবেন, উকীলেরা মোটা মোটা 'ফি' পাইবেন এবং ভগবান স্বর্গে থাকিবেন।

তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী বর্তমান প্রচলিত ব্যবস্থা রক্ষা করিয়া চলার উপর স্থাপিত; রামের বদলে শ্রামের নিয়োগ—এই শ্রেণীর ব্যক্তিগত পরিবর্তন ছাড়া তাঁহারা বড় বিশেষ কিছু চাহেন না। ব্রিটিশের সমিচ্ছার সাহায্যে অতি দীর্ঘে তাঁহারা এই পরিবর্তন সাধন করিতে চাহেন। ব্রিটিশসাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ও প্রতিষ্ঠার উপরই তাঁহাদের সমস্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদের ভিত্তি স্থাপিত। এই সাম্রাজ্য চিরদিন থাকিবে, অন্ততঃ দীর্ঘকাল থাকিবে, তাঁহারা ইহা ধরিয়া লইয়া ইহার সহিত নিজেদের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। ইহার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদ গ্রহণ করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হন নাই; ব্রিটিশ প্রভুত্ব রক্ষার জন্ত রচিত লোকব্যবহারের নৈতিক মানদণ্ডও ইহার গ্রহণ করিয়াছেন।

কংগ্রেসের মনোভাব ইহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক; কংগ্রেস নূতন রাষ্ট্র চাহে, কেবল মাত্র স্বতন্ত্র প্রকার শাসন প্রণালী চাহে না। সেই নূতন রাষ্ট্র কিরূপ হইবে সে সম্বন্ধে সাধারণ কংগ্রেসপন্থীদের হয় ত স্পষ্ট ধারণা নাই এবং মতভেদও হয় ত আছে। কিন্তু কংগ্রেসের সকলেই (মুষ্টিমেয় মডারট ছাড়া) এ বিষয়ে একমত যে, বর্তমান অবস্থা ও ব্যবস্থা আর চলিতে দেওয়া উচিত নহে, ঢালিঙ্গু সাজার প্রয়োজন হইয়াছে। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার পার্থক্য ইহার মধ্যেই নিহিত। প্রথমটিতে সেই পুরাতন ঠাটই বজায় থাকিবে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে, এবং ব্রিটিশ অর্থনীতির বহু দৃশ্য ও অদৃশ্য বন্ধনে উহা আবদ্ধ

স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন

থাকিবে; শেযোক্ত ব্যবস্থায় আমরা পাইব মুক্তি, অন্ততঃ উহা আমাদেরকে আমাদের অবস্থার অস্বাভাবিক নতন ব্যবস্থা গঠনের স্বাধীনতা দিবে।

ইহা ইংলণ্ড বা ইংরাজ জাতির সহিত চিরন্তন শত্রুতার প্রসঙ্গ নহে; যে কোন ক্ষতি স্বীকার করিয়া তাহাদের সহিত সকল সম্পর্ক বর্জন করিবার কথাও নহে। এপর্যন্ত যাহা ঘটিয়াছে তাহার ফলে ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে মনোমালিগ্ন ঘটাই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “ক্ষমতার মত্ততা চাবীকে অগ্রাহ্য করিয়া শাবল ব্যবহার করিতেছে।” আমাদের হৃদয়ের দ্বার খুলিবার চাবী বহু পূর্বেই বিনষ্ট হইয়াছে; এবং যেরূপ দরাজ হাতে আমাদের উপর শাবল মারা হইতেছে, তাহাতে আমরা মোটেই ব্রিটেনের পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছি না। কিন্তু যদি আমরা মনুষ্যত্ব ও ভারতবর্ষের সেবার দাবী করি, তাহা হইলে কোন সাময়িক ভাবাবেগে বিচলিত হওয়া উচিত নহে। এবং যদিই বা আমাদের ঐরূপ অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলেও গত পনের বৎসর আমরা গান্ধিজীর নিকট যে কঠোর শিক্ষা পাইয়াছি, তাহাই আমাদেরকে সংযত রাখিবে। আমি ব্রিটিশ কারাগারে বসিয়াই ইহা লিখিতেছি, কয়েক মাস যাবৎ আমার মন উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হইয়া আছে, এবং সম্ভবতঃ আমি এই নিঃসঙ্গ কারাবাসে যাহা সহ্য করিতেছি, আমার কারাজীবনে ইতিপূর্বে তাহা ঘটে নাই। নানা ঘটনায় আমার মন ক্রোধে ও ক্ষোভে পূর্ণ হইয়া উঠে; তথাপি এইখানে বসিয়া যখন আমি মনের গভীর অতলে দৃষ্টিপাত করি, সেখানে ইংরাজ জাতি বা ইংলণ্ডের প্রতি কোন ক্রোধ দেখি না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আমি অপছন্দ করি, ভারতের উপর বলপূর্ব্বক উহা চাপাইয়া দেওয়ায় আমি ক্রুদ্ধ; আমি ধনতত্ত্ববাদ অপছন্দ করি; ব্রিটেনের শাসক সম্প্রদায়গুলি যে ভাবে ভারত শোষণ করিতেছে, তাহা আমার দৃষ্টিতে অতীত ঘূর্ণাই। কিন্তু ইহার জন্ত আমি সমগ্র ইংলণ্ড বা সমস্ত ইংরাজ জাতিকে দায়ী করি না। করিলেও যে অবস্থার কিছু ইতর বিশেষ হইত এমন নহে, তবে সমগ্র জাতিকে নিন্দা করা নির্বুদ্ধিতা ও ঐশ্বর্য্যহীনতার পরিচায়ক হইত। তাহারাও আমাদের মতই অবস্থার দাস।

ব্যক্তিগত ভাবে আমার মানসিক গঠনের জন্ত আমি ইংলণ্ডের নিকট অশেষ প্রকারে ঋণী। তাহাকে আমি সম্পূর্ণ বিদেশী ও বিরুদ্ধ-প্রকৃতি বলিয়া ভাবিতেই পারি না। আমি যাহাই করি না কেন, আমার মানসিক অভ্যাসকে অতিক্রম করিতে পারি না; আমি ইংলণ্ডের স্থূল কলেজে যাহা কিছু অর্জন করিয়াছি, সেই দৃষ্টি এবং মাপকাঠিতেই

জওহরলাল নেহরু

অগ্রাণু দেশ ও সাধারণ ভাবে জীবনের সকল কাজ বিচার করিয়া থাকি। আমার সমস্ত আসক্তিই (রাজনীতি ক্ষেত্র ছাড়া) ইংলণ্ড ও ইংলণ্ডবাসীদের দিকে। আমি যাহা হইয়াছি, যেজন্য আমাকে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সকল অবস্থার বিরোধী বলিয়া বলা হয়, তাহা আমি প্রায় নিজের বিরুদ্ধেই হইয়াছি।

এই যে শাসন, এই যে প্রভুত্ব যাহার সহিত আমরা কিছুতেই স্বেচ্ছায় আপোষ করিতে পারি না, তাহার জন্য ইংরাজ জাতি দায়ী নহে। আমরা সর্বপ্রথমে ইংরাজ ও অগ্রাণু বিদেশীদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করিব। ভারতে বাহিরের তাজা বাতাস আশুক, নবীন ও সতেজ ভাবধারা আশুক, আমরা সহযোগিতা চাহি; আমরা বয়সদোষে অত্যন্ত জরাজীর্ণ হইয়া উঠিয়াছি। কিন্তু ইংরাজ যদি ব্যাঘ্রের মূর্তি ধরিয়া আসে, তাহা হইলে সে বন্ধুত্ব বা সহযোগিতা প্রত্যাশা করিতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদী ব্যাঘ্রের সহিত কেবল মাত্র তীব্র বিরোধিতাই চলিতে পারে এবং বর্তমানে আমাদের দেশ সেই হিংস্র পশুর সম্মুখীন হইয়াছে। বনের বাঘকে পোষ মানাইয়া তাহার আদিম হিংস্র প্রকৃতি দূর করাও সম্ভব, কিন্তু যখন ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যনীতি একত্র হইয়া কোন দুর্ভাগ্য দেশের উপর ঝাপাইয়া পড়ে, তখন পোষ মানান সম্ভব হয় না।

যদি কেহ বলে, সে এবং তাহার দেশ কিছুতেই আপোষ করিবে না, তবে এক দিক দিয়া তাহা অতি নির্বোধ মন্তব্য; কেন না, জীবন আমাদেরকে প্রতি পদে আপোষের জন্য প্রেরণা দিতেছে। অগ্র দেশ বা জাতির সম্পর্কে ঐ কথা বলাও সম্পূর্ণ নির্বুদ্ধিতা। কিন্তু যখন কোন ব্যবস্থা বা বিশেষ শ্রেণীর পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্মুখে ঐ কথা বলা হয়, তখন উহাতে কিছু পরিমাণে সত্য থাকে; কেন না, তখন উহা সকলের সাধ্যাতীত হইয়া দাঁড়ায়। ভারতের স্বাধীনতা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ—এ দুইটি পরস্পর স্ববিরোধী বস্তু; কি সামরিক আইন, কি জগতের সমস্ত মধু আনিয়া ঢালিয়া দিলেও এ দুই-এর মিলন-মিশ্রণ কিছুতেই সম্ভবপর নহে। কেবল যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অপসারিত হয়, তাহা হইলেই প্রকৃত ব্রিটিশ-ভারতীয় সহযোগিতার অমূলক অবস্থা সৃষ্টি হইবে।

আমরা শুনিয়াছি, আধুনিক জগতে ইণ্ডিপেন্ডেন্স বা অনধীনতা অতি সর্বাঙ্গ আদর্শ; কেন না, অধুনা সকলেই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। অতএব, আমরা উহা দাবী করিয়া সেকেলে হইয়া পড়িতেছি। লিবারেল, শান্তিবাদী, এমন কি ব্রিটেনের তথাকথিত সমাজতন্ত্রীরা পর্যন্ত এই অজুহাত

স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন

তুলিয়া আমাদের সঙ্গীর্ণ জাতীয়তাবাদের জন্ম ভৎসনা করেন এবং প্রসঙ্গতঃ আমাদের বলেন যে, “ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশনস্” এর মধ্যেই আমাদের জাতীয় জীবনের পূর্ণ বিকাশ সম্ভবপর। ইহা আশ্চর্য্য যে, ইংলণ্ডে লিবারেল, শাস্তিবাদী, সমাজতন্ত্রী প্রভৃতি সকলের পথই সাম্রাজ্য রক্ষার মধ্যে পরিণতি লাভ করিয়াছে। ট্রটস্কী বলিয়াছেন, “শাসক জাতির প্রচলিত ব্যবস্থা রক্ষা করিবার আকাঙ্ক্ষা ‘জাতীয়তা’ অপেক্ষাও উচ্চতর ভাবের আবরণে প্রকাশ পায়, যেমন বিজয়ী জাতি লুণ্ঠনলব্ধ সম্পদ হস্তগত করিয়া সহজেই শাস্তিবাদী সাজিয়া বসে। এইরূপে গান্ধীর সম্মুখে ম্যাকডোনাল্ড নিজেকে আন্তর্জাতিকতাবাদী মনে করিতেছেন।”

[রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিলে ভারত কি হইবে, কি করিবে, তাহা আমি জানি না। তবে আমি ইহা জানি যে, আজ যাহারা জাতীয় স্বাধীনতার জন্ম প্রচেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা ব্যাপক আন্তর্জাতিকতাতেও বিশ্বাসী। সমাজতান্ত্রিকের নিকট জাতীয়তাবাদের কোন অর্থ নাই; কিন্তু সমাজতান্ত্রিক নহেন এমন অনেক কংগ্রেসপন্থীও আন্তর্জাতিকতার অমুরাগী। আমরা জগৎ হইতে স্বতন্ত্র হইবার জন্ম স্বাধীনতা চাহিতেছি না। পক্ষান্তরে, প্রকৃত আন্তর্জাতিক সুব্যবস্থার জন্ম অগ্রাগ্র দেশের সহিত সমানভাবে আমরাও স্বাধীনতার কিয়দংশ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু কোন সাম্রাজ্যনৈতিক পদ্ধতি, তাহাকে যে কোন বড় নামেই অভিহিত করা হউক না কেন, ঐ প্রকার ব্যবস্থার বিরোধী এবং উহা দ্বারা কোন দিন আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অথবা জগতে শান্তি স্থাপনের সম্ভাবনা নাই।

আধুনিক ঘটনার গতি হইতে জগতের সর্বত্রই দেখা যাইতেছে যে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ক্রমশঃ অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা আত্মনির্ভরশীল হইবার চেষ্টা করিতেছে। আন্তর্জাতিকতার প্রসার ও পরিপুষ্টির পরিবর্তে আমরা উহার বিপরীত গতিই দেখিতে পাইতেছি। ইহার কারণ আবিষ্কার করা খুব কঠিন নহে, বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় উহা যৌর্বল্যেরই পরিচায়ক। এই নীতির ফলে সাম্রাজ্যের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সহযোগিতা বৃদ্ধি পাইলেও ইহাতে অবশিষ্ট জগৎ হইতে স্বতন্ত্র হইবার চেষ্টারও অভাব নাই। ভারতেও আমরা ওট্টাওয়া ও অগ্রাগ্র চুক্তি দেখিয়াছি, যাহার ফলে বিভিন্ন দেশের সহিত সম্পর্ক ও আদান-প্রদান ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। আমরা পূর্বাপেক্ষা ব্রিটিশ বাণিজ্যনীতির অধিকতর মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতেছি। ইহার আশু অনিষ্টকারিতা ত

রহিয়াছেই, ভবিষ্যৎ ফলও ভয়াবহ। এইভাবে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন স্বাতন্ত্র্যেরই পথ, আন্তর্জাতিকতার পথ নহে।

কিন্তু আমাদের লিবারেল বন্ধুদের ব্রিটিশ নীল চশমার মধ্য দিয়ে জগৎকে, বিশেষভাবে তাঁহাদের স্বদেশকে দেখিবার এক আশ্চর্য্য দক্ষতা আছে। কংগ্রেস কি বলে, কেন বলে তাহা ত তাঁহারা বুঝিবার চেষ্টাও করেন না, তাঁহারা পুরাতন ব্রিটিশ-যুক্তি পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া বলেন, স্বাধীনতা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের তুলনায় সঙ্গীর্ণতর। আন্তর্জাতিকতা বলিতে তাঁহাদের দোড় লগুনের ব্রিটিশ সরকারী দপ্তরখানা পর্য্যন্ত। অগ্ণাত দেশ সম্বন্ধে তাঁহারা গভীরভাবেই অজ্ঞ, ইহার কারণ ভাষার বিভিন্নতা, আরও কারণ যে, তাঁহারা উদাসীন থাকিয়াই স্থখী। তাঁহারা নিশ্চয়ই ভারতে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক অথবা আক্রমণশীল রাজনীতি পছন্দ করেন না। তবে বিশ্বয়ের এই যে, এই দলের কয়েকজন নেতা অগ্ণদেশে অহুরূপ পদ্ধতি অবলম্বিত হইলে আপত্তি করেন না। দূর হইতে তাঁহারা উহার তারিফ করেন এবং পাশ্চাত্য দেশের কতিপয় আধুনিক ‘ডিস্টেক্টরকে’ তাঁহারা মনে মনে পূজা করেন।

নাম দেখিয়া অনেক ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে; কিন্তু ভারতে আমাদের সম্মুখে প্রধান প্রশ্ন, এক নূতন রাষ্ট্র আমাদের লক্ষ্য, না কেবলমাত্র এক নূতন শাসনপদ্ধতি আমরা কামনা করিতেছি? লিবারেলদের উত্তর অতি স্পষ্ট, তাঁহারা শেখোক ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই চাহেন না; এমন কি, ক্রম-অগ্রসরমূলক দূরবর্তী আদর্শরূপেও নহে। ‘ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন’ শব্দটি তাঁহারা বারম্বার উচ্চারণ করেন, কিন্তু উহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য “কেন্দ্রীয় দায়িত্ব” এই রহস্যময় দাবীর আকারে প্রকাশ পায়। ক্ষমতা, স্বাধীনতা, নিরপেক্ষ আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি শব্দ তাঁহাদের নিকট ভয়াবহ। আইনজীবীর ভাষা ও ভঙ্গীর প্রতিই তাঁহাদের অত্যধিক অহুরাগ—তাহাতে জনসাধারণ কোন প্রেরণা না পাইলেও ক্ষতি নাই। বিশ্বাস ও স্বাধীনতার জন্ত ব্যক্তি বা দল বিশ্বের সম্মুখীন হইয়াছে, জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন করিয়াছে, ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কিন্তু মডারেটগণ “কেন্দ্রীয় দায়িত্ব” অথবা অহুরূপ কোন আইন-সঙ্গত বাক্যের জন্ত ইচ্ছা করিয়া একদিনের অন্ন বা এক রাজির স্থনিত্রা নষ্ট করিতে প্রস্তুত আছেন কি না সন্দেহ।

অতএব, তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ত তাঁহারা কোন ‘প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক’ অথবা আক্রমণমূলক কার্য্য করিবেন না। কিন্তু যাহা তাঁহারা করিবেন, তাহা মিঃ শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর ভাষায়,—“বুদ্ধি, বিবেচনা,

বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন

অভিজ্ঞতা, সংঘম, খোসামোদ করিবার শক্তি, স্খিপ্রপ্রভাব এবং প্রকৃত যোগ্যতা” প্রদর্শন। তাঁহাদের ভরসা যে, আমরা সদ্যবহার ও ভাল কাজ দেখাইয়া পরিণামে আমাদের শাসকগণকে ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতে রাজী করাইতে পারিব। এ কথার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আমাদের আক্রমণমূলক কাজকর্মে তাঁহারা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আছেন অথবা আমাদের যোগ্যতায় তাঁহারা সন্দেহ করেন; কিম্বা উভয় কারণেই তাঁহাদের মনোভাব আমাদের বিরুদ্ধে। সাম্রাজ্যবাদ ও বর্তমান অবস্থার এই বিশ্লেষণ বালকোচিত সন্দেহ নাই। শাসকশ্রেণীর সহিত সহযোগিতা করিয়া ধাপে ধাপে ক্ষমতা লাভ করা সম্পর্কে অধ্যাপক আর, এইচ, টাউনী অতি সঙ্গত ও হৃদয়গ্রাহী যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। তিনি ব্রিটিশ শ্রমিকদলকে লক্ষ্য করিয়া লিখিলেও ভারতের পক্ষেই ইহা সমধিক প্রযোজ্য; কেন না, ইংলণ্ডে অন্ততঃপক্ষে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সমূহ রহিয়াছে; এবং মতবাদের দিক দিয়া অধিকাংশের মতের মর্যাদা আছে, ইহাও স্বীকৃত হয়। অধ্যাপক টাউনী লিখিতেছেন,—

“পেন্সজের খোসা একটি একটি করিয়া ছাড়াইয়া খাওয়া যায়; কিন্তু জীবন্ত বাঘের এক একটি খাবা ধরিয়া ছাল ছাড়ান যায় না; কেন না, জীবন্ত জীবদেহ ছিন্নভিন্ন করা তাহার পেশা এবং তুমি ছাল ছাড়াইবার পূর্বে সে-ই তোমাকে ক্ষতবিক্ষত করিবে……

“যদি কোন দেশের বিশেষ স্ববিধাভোগী সম্প্রদায় সরল ও বোকা থাকে, তবে সে দেশ ইংলণ্ড নহে। কৌশল ও অমায়িকতার সহিত শ্রমিকদলের স্বার্থের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া ঐগুলি যে তাঁহাদের স্বার্থেরও অনুরূপ, ইহা বুঝাইয়া ঠকাইবার আশা নিফল; যেমন যাহার হাতে সম্পত্তির পাকা দলিল আছে, সেই ব্যাছু এটর্নীকে ধাক্কা দিয়া সম্পত্তি হস্তগত করা অসম্ভব। ব্রিটিশ ধনীসমাজ বিনয়ী, চতুর, শক্তিশালী, আত্মবিশ্বাসী এবং চাপে পড়িলে তাঁহারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হন। তাঁহারা ভাল করিয়াই জানেন যে, তাঁহাদের রুটির কোনদিকে মাখন এবং এই মাখন সরবরাহে টান না পড়ে, সেদিকে তাঁহাদের খর দৃষ্টি। যদি তাঁহাদের অবস্থা বিপন্ন হইবার উপক্রম হয়, তাহা হইলে তাঁহারা প্রত্যেকটি পয়সা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আক্রমণে নিয়োজিত করিবেন—লর্ড-সভা, রাজমুকুট, সংবাদপত্র, সৈন্যদলে অসন্তোষ, অর্থনৈতিক সঙ্কট, আন্তর্জাতিক জটিলতা, এমন কি ১৯৩১ সালে সংবাদপত্রে পাউণ্ডের উপর আক্রমণকালে যাহা দেখা গিয়াছে, সেই ভাবে ক্ষমাসী বিদ্রোহের সময় পলায়িত রাজতন্ত্রীদেব্র গায় তাঁহারাও পকেট বাঁচাইবার জন্ত স্বদেশের ক্ষতি করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিবেন না।”

জওহরলাল নেহরু

ব্রিটিশ শ্রমিকদল শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। ইহার পশ্চাতে লক্ষ লক্ষ চাঁদাদানকারী সদস্য সমন্বিত ট্রেড্-ইউনিয়ন বা শ্রমিক সঙ্ঘগুলি রহিয়াছে ; ইহাদের সমবায় সমিতিগুলিও বহুল পরিমাণে উন্নত, উচ্চতর বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যেও ইহাদের অনেক সদস্য ও সহায়ভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি রহিয়াছেন। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টারী প্রতিষ্ঠানগুলি ব্রিটেনে আছে এবং ব্যক্তিস্বাধীনতারও প্রাচীন পরম্পরাগত ধারণা বিদ্যমান। কিন্তু এ সকল সম্বন্ধে মিঃ টাউনীর মতে শ্রমিক দল মধুর হাসিয়া অমুনয় করিয়া প্রকৃত ক্ষমতা অর্জন করিতে পারিবেন না। আধুনিক কতকগুলি ঘটনায় এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। মিঃ টাউনীর মতে, যদি ব্রিটিশ শ্রমিকদল কমন্স সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠও হন, তাহা হইলেও, বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীগুলির বিরুদ্ধতা অতিক্রম করিয়া কোন আমূল পরিবর্তনমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে পারিবেন না; কেন না, তাহারাই রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজস্ব সম্পর্কিত এবং সামরিক দুর্গগুলি অধিকার করিয়া আছে। ভারতের অবস্থা যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ইহা উল্লেখ করাই বাহুলা। এখানে কোন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নাই, তাহার পারম্পর্য্যও নাই। তাহার পরিবর্তে আমাদের আছে, সুপ্রতিষ্ঠিত অর্ডিন্যান্স, ডিক্টেটরী শাসন, ব্যক্তিগত বক্তৃতা, লেখা, সভাসমিতি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সঙ্কোচ ও দমন। লিবারেলদের পশ্চাতে কোন শক্তিশালী সঙ্ঘ নাই। হাসিমুখ ছাড়া তাঁহাদের অস্ত্র কোন সম্বল নাই।

লিবারেলগণ “নিয়মতন্ত্র বিরোধী” এবং “বে-আইনী” কার্য্যপদ্ধতির ভীত নিন্দা করিয়া থাকেন। যে সকল দেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি আছে, সেখানে “নিয়মতান্ত্রিক” শব্দটি এক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা আইন প্রণয়ন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ হয়, ইহা ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করে, ইহা শাসকগণকে সংযত রাখে, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন সাধনের অমুকূল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ইহাতে থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষে এরূপ কোন নিয়মতন্ত্র নাই; এবং ঐ শব্দ দ্বারা এখানে পূর্ব্বকথিত কোন ব্যবস্থা বুঝায় না। * ঐ শব্দটি এদেশে ব্যবহার করার ফলে যে ধারণার সৃষ্টি হয়,

* বিখ্যাত লিবারেল নেতা এবং ‘লাডার’ পত্রের সম্পাদক মিঃ সি. ওয়াই, চিল্ডার্নাণ্ড বৃক্সপ্রদেশের আইনসভায় পার্লামেন্টারী জয়েন্ট কমিটির রিপোর্ট সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, ভারতে কোন প্রকার নিয়মতান্ত্রিক গভর্নমেন্ট নাই, “বর্তমানের নিয়মতন্ত্রহীন গভর্নমেন্টও বরং ভাল, ভবিষ্যতের গভর্নমেন্ট অধিকতর নিয়মতন্ত্রহীন এবং অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতিবিরোধী হইবে।”

স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন

অধ্যাকার ভারতের কোথাও তাহার স্থান নাই। ‘নিয়মতান্ত্রিক’ এই শব্দটি এদেশে প্রায়ই শাসক সম্প্রদায়ের অল্পবিস্তর স্বেচ্ছাচারমূলক কার্যের সমর্থনের জন্য ব্যবহৃত হয়। অথবা ইহা ছাড়া “আইন সঙ্গত”—এই অর্থেও ঐ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আমাদের পক্ষে “আইন সঙ্গত” ও “বে-আইনী” এই দুইটি শব্দ ব্যবহার করা অনেক ভাল; যদিও উহার অর্থও অনির্দিষ্ট ও অস্পষ্ট; কেন না, দিনে দিনে উহারও অনেক পরিবর্তন হয়।

নূতন অভিজ্ঞান্স ও নূতন আইন নূতন নূতন অপরাধ সৃষ্টি করে। কোন সভায় উপস্থিত হওয়া অপরাধ হইতে পারে; এমনি ভাবে বাইসাইকেল চড়া, কোন বিশেষপ্রকার পোষাক পরা, সূর্যাস্তের সময় গৃহে না থাকা, প্রত্যহ পুলিশে হাজিরা না দেওয়া—এই শ্রেণীর বহুতর কাজ আজ ভারতের কোন কোন অঞ্চলে অপরাধ বলিয়া গণ্য। কোন বিশেষ কাজ দেশের এক অঞ্চলে হয়ত অপরাধ, অত্র নহে। এবং এই শ্রেণীর আইন যখন জনমতের নিবট দায়িত্বহীন শাসকগণ যে কোন মুহূর্তে খসীমত রচনা করিতে পারেন, তখন “আইন সঙ্গত” এই শব্দটির অর্থ শাসকমণ্ডলীর ইচ্ছা ছাড়া আর কিছু নহে। ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, এই ইচ্ছা মানিতে হইবে, অমান্য করিলে যে ফল হইবে তাহা প্রীতিপ্রদ নহে। যদি কেহ বলে যে, সে সর্বদাই ইহা মান্য করিবে, তাহার অর্থ ডিস্টেটরী অথবা দায়িত্বহীন প্রভুত্বের নিকট হইন বশুত। স্বীকার, নিজের বিবেক বর্জন এবং তাহার কার্যপ্রণালী দ্বারা স্বাধীনতা অর্জন চিরদিন অসম্ভবই থাকিবে।

নিয়মতান্ত্রিক যে ব্যবস্থা বর্তমানে হাতে আছে, তাহা দিয়াই সাধারণ উপায়ে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সম্ভবপর কি না, ইহা লইয়া আজকাল প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দেশেই আলোচনা চলিতেছে। অনেকের মতে ইহা সম্ভবপর নহে; কিছু অসাধারণ বা বৈপ্রবিক উপায় গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতে আমাদের উদ্দেশ্যের দিক দিয়া এই যুক্তিতর্কের নির্ধারণ একান্তই মূল্যহীন; কেন না আমাদের প্রার্থিত পরিবর্তন সাধনের উপযোগী কোন নিয়মতন্ত্রই আমাদের নাই। যদি হোয়াইট পেপার বা অন্তরূপ কোন শাসন ব্যবস্থা আইনে পরিণত হয়, তাহা হইলে নানাদিকে নিয়মতান্ত্রিক উন্নতির পথ একেবারেই রুদ্ধ হইয়া যাইবে। বিদ্রোহ বা বে-আইনী কার্য ছাড়া অত্র কোন পথই থাকিবে না। তাহা হইলে লোকে কি করিবে? সমস্ত পরিবর্তনের আশা ছাড়িয়া দিয়া নিয়তির নিকট আত্মসমর্পণ করিবে।

বর্তমানে ভারতের অবস্থা অধিকতর অস্বাভাবিক। সর্বপ্রকার জনসাধারণের সম্মিলিত কার্য শাসকমণ্ডলী বন্ধ করিতে পারেন, করিয়াও

থাকেন। যে কোন কাজ তাঁহাদের মতে বিপজ্জনক হইলেই তাহা বন্ধ করা হয়। এইভাবে সমস্ত প্রকার কার্য্যাকরী প্রচেষ্টার পথই রুদ্ধ করা যাইতে পারে এবং গত তিন বৎসর তাহা করা হইয়াছে। ইহার নিকট বশুত স্বীকার করার অর্থ সর্বপ্রকার সম্মিলিত কার্য্য একেবারে পরিত্যাগ করা। কিন্তু এরূপ অবস্থা স্বীকার করিয়া লওয়া অসম্ভব।

কেহ বলিতে পারে না যে, সে তিলমাত্র ব্যতিক্রম না করিয়া সর্বদাই আইনসম্মত কার্য্য করিবে। এমন কি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও অনেকে বিবেকের নির্দেশে ভিন্নরূপ আচরণ করিতে বাধ্য হন। স্বৈচ্ছাচারমূলক অথবা ধামধেয়ালীর সহিত যে সকল দেশ শাসিত হয়, সেখানে সচরাচরই এই শ্রেণীর ঘটনা ঘটিতে বাধ্য; কেন না, এরূপ রাষ্ট্রের আইনের কোন নৈতিক যৌক্তিকতা নাই।

লিবারেলগণ বলেন, “প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ডিক্টেটরীর অল্পকূল, গণতন্ত্রের নহে; যাহারা গণতন্ত্রের জয় কামনা করে তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ছাড়িতে হইবে।” ইহা চিন্তার আবিলতা ও শিথিল লেখনীর পরিচায়ক। সময় সময় প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক কার্য্য, যেমন—শ্রমিক ধর্ম্মঘট—সম্পূর্ণ বৈধ। কিন্তু সম্ভবতঃ এখানে রাজনৈতিক কার্য্যের কথা বলা হইয়াছে। আজ জার্মানীতে হিটলারের অধীনে কোন প্রকার কার্য্য করা সম্ভব? হয় হীনভাবে বশুত স্বীকার, নয় বে-আইনী বা বৈপ্লবিক কার্য্য। সেখানে কি ভাবে গণতন্ত্রের সেবা করা যাইতে পারে।

ভারতীয় লিবারেলরা প্রায়ই গণতন্ত্রের উল্লেখ করেন; কিন্তু তাহাদের মধ্যে প্রায় কাহারও উহার নিকট যাইবার অভিপ্রায় নাই। অগতঃ প্রধান লিবারেল নেতা স্যর পি এস শিবস্বামী আয়ার ১৯৩৪ সালের মে মাসে বলিয়াছেন, “গণ-পরিষদ আহ্বানের পক্ষে ওকালতী করিতে গিয়া কংগ্রেস জনতার বুদ্ধি-বিবেচনার উপর অতিমাত্রায় বিশ্বাস দেখাইয়াছেন এবং ইহার দ্বারা বিভিন্ন গোলটেবিল বৈঠকে যে সকল ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের যোগ্যতা ও আন্তরিকতার উপর স্তুতিচার করা হয় নাই। গণ-পরিষদ যে ইহার চেয়ে উৎকৃষ্টতর কিছু করিতে পারিবে, তাহাতে আমার বিস্তর সন্দেহ আছে।” কাজেই দেখা যাইতেছে, স্যার শিবস্বামী গণতন্ত্র বলিতে যাহা বুঝেন, তাহা ‘জনতা’ হইতে পৃথক এবং উহা ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট কর্তৃক মনোনীত ‘বিশুদ্ধ এবং যোগ্য’ ব্যক্তিদের সহিত বেশ খাপ খায়। তিনি হোয়াইট পেপারকে দুই হাতে বরণ করিয়াছেন—যদিও উহাতে তিনি ‘সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট’ হইতে পারেন নাই—তথাপি ‘তিনি মনে করেন যে, সরাসরি ভাবে ইহার প্রতিবাদ করা দেশের পক্ষে সুবিবেচনার কার্য্য হইবে না।’

প্রাচীন ও নবীন ভারত

ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট এবং স্ত্র পি এস শিবস্বামী আয়ারের মধ্যে অতি প্রগাঢ় সহযোগিতা না হইবার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

কংগ্রেস নিরুপদ্রব প্রতিরোধ প্রত্যাহার করায় শিবস্বামী স্বভাবতঃই আনন্দিত হইয়াছিলেন। এই ‘নির্বেদ ও অযৌক্তিক’ আন্দোলন হইতে দূরে সরিয়া থাকিয়া তাঁহারা যে স্তম্ভিবেচনা দেখাইয়াছেন, সে জন্য তাঁহারা বাহাদুরী লইবেন, ইহাতে বিশ্বাসের কিছুই নাই। তাঁহারা আমাদেরকে বলিতে লাগিলেন, ‘আমরা কি ইহা পূর্বেই বলি নাই?’ ইহা এক অদ্ভুত যুক্তি! যেহেতু আমরা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছি এবং প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছি, অবশেষে ধরাশায়ী হইয়াছি, অতএব তাহা হইতে এই নৈতিক সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হইল যে, উঠিয়া দাঁড়ান অত্যন্ত মন্দ। বৃকে হাঁটাই সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বাধিক নিরাপদ। ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় থাকিলে ধাক্কা দিয়া ধরাশায়ী করা একান্তই অসম্ভব ব্যাপার।

৫৩

প্রাচীন ও নবীন ভারত

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ যে পর-শাসনের প্রতি রুষ্ট হইবে, ইহা অনিবার্য ও স্বাভাবিক। কিন্তু তথাপি উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ সাম্রাজ্য সম্পর্কে ব্রিটিশ মতবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা অত্যন্ত কৌতূহলের বিষয়। এই মতবাদের উপর তাঁহারা নিজেদের যুক্তিজাল রচনা করিতেন এবং কেবলমাত্র কতকগুলি বাহ্য লক্ষণের সমালোচনা করিবার সাহস দেখাইতেন। স্কুল এবং কলেজে ইতিহাস, অর্থনীতি ও অগ্রগত বিষয়ে যাহা শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা সমস্তই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যনীতির মতবাদের দিক হইতে রচিত এবং উহাতে আমাদের অতীত ও বর্তমান বহুতর দোষ, ত্রুটি উজ্জল বর্ণে চিত্রিত করা হইয়াছে এবং ব্রিটিশের গুণাবলী ও উচ্চ আদর্শের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বিকৃত বিবরণ আমরা কতকাংশে গ্রহণ করিয়াছি এবং এমন কি, যখন আমরা ইহাকে প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তখনও অলক্ষ্যভাবে আমরা ইহা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছি। প্রথমভাগে বুদ্ধির দিক হইতে ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতির উপায় ছিল না; কেন না, অগ্র প্রকার ঘটনা ও যুক্তিজাল আমরা

জানিতাম না। কাজেই আমরা এক প্রকার ধর্মগত জাতীয়তাবাদের মধ্যে সাঙ্ঘনা খুঁজিয়াছি এবং ভাবিয়াছি, অস্তুতঃ ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে আমরা জগতে কোন জাতি অপেক্ষা কম নহি। আমাদের দুর্ভাগ্য ও অধঃপতনের মধ্যেও আমরা নিজেদের এই বলিয়া সাঙ্ঘনা দিয়াছি যে, যদিও পাশ্চাত্যের বাহু চাকচিক্য, ঐশ্বর্য্য আমাদের নাই, তথাপি আমাদের যে চিন্তাসম্পদ আছে, তাহা বহু গুণে মূল্যবান ও দুর্লভ। বিবেকানন্দ, আমাদের প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রে অমুরাগী পণ্ডিতগণ এবং আরও কেহ কেহ আমাদের মধ্যে আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান অনেকাংশে জাগ্রত করিয়াছেন এবং অতীতকাল সম্পর্কে আমাদের প্রস্তুত গৌরববোধকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন।

ক্রমশঃ আমরা সন্দেহ করিতে লাগিলাম, আমাদের অতীত ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ব্রিটিশ বিবরণগুলি সমালোচকের দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু তখনও আমাদের চিন্তা ও কার্য্যপ্রণালী ব্রিটিশ মতবাদের অভিজ্ঞতার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। যদি কোন জিনিষ মন্দ হয়, তাহাকে বলা হইত ‘অব্রিটিশ’; যদি ভারতে কোন ইংরাজ দুর্ব্যবহার করিত, তাহা হইলে সে দোষ তাহার ব্যক্তিগত, কোন ব্যবস্থা তাহার জন্ত দায়ী নহে। কিন্তু গ্রন্থকারদিগের মডারেটীয় দৃষ্টিভঙ্গী সত্ত্বেও ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনামূলক যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করিয়াছে এবং আমাদের জাতীয়তাবাদের জন্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি রচনা করিয়াছে। এই ভাবে দাদাভাই নোরজীর ‘Poverty and Un-British Rule in India’, রমেশ দত্ত, উইলিয়ম ডিগবি এবং অগ্নান্ন ব্যক্তির রচিত গ্রন্থ আমাদের জাতীয় চিন্তাধারা পরিপুষ্টির পথে বৈপ্লবিক প্রেরণা যোগাইয়াছে। অধিকতর অহুসন্ধান ও গবেষণার ফলে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের বহু স্বদূর অতীতকালের কীৰ্ত্তি-সমুজ্জল স্মৃতিভাষ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং আমরা অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত তাহা পাঠ করিয়াছি। আমরা আরও দেখিলাম যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের যে বিবরণ তাঁহাদের ইতিহাস পুস্তকে লিখিয়া তাঁহারা আমাদের বিবাস করাইয়াছেন, তাহা প্রকৃত ঘটনা হইতে কত পৃথক।

ব্রিটিশ রচিত ইতিহাস, অর্থনীতি ও ভারতের শাসনব্যবস্থার সিদ্ধান্তগুলির বিরুদ্ধে আমাদের বিরোধিতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; কিন্তু তথাপি আমরা তাঁহাদের মতবাদের গভীর মধ্যে থাকিয়াই কাজ করিতে লাগিলাম। শতাব্দীর শেষভাগে সমগ্রভাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অবস্থা ইহাই ছিল। এখনও লিবারেল দল ও অগ্নান্ন ক্ষুদ্র শ্রেণীগুলি, এমন কি কতিপয় মডারেট কংগ্রেসপন্থীও প্রায় সেই অবস্থাতেই আছেন, যদিও মাঝে মাঝে ভাবাবেগে

প্রাচীন ও নবীন ভারত

তঁাহারা অগ্রসর হন, তথাপি জ্ঞান ও বুদ্ধির দিক দিয়া তঁাহারা উনবিংশ শতাব্দীতেই বাস করেন। এই কারণেই লিবারেলগণ ভারতীয় স্বাধীনতার কথা ধারণায়ও আনিতে পারেন না। কেন না, এই দুই পৃথক মনোভাবের মধ্যে মূলগত পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে। তঁাহারা কল্পনা করেন, ধাপে ধাপে তঁাহারা বড় বড় সরকারী উচ্চপদ পাইবেন এবং মোটা মোটা গুরুত্বপূর্ণ ফাইল লইয়া নাড়াচাড়া করিবেন। গবর্ণমেন্টের শাসনযন্ত্র পূর্বের মতই মন্থনভাবে চলিতে থাকিবে, কেবল তঁাহারা থাকিবেন ধুরন্ধর এবং বহুদূরে পশ্চাতে ব্রিটিশ সৈন্যদল থাকিবে; কিন্তু তাহারা বড় বেশী হস্তক্ষেপ করিবে না, কেবল প্রয়োজনের সময় আসিয়া তঁাহাদিগকে রক্ষা করিবে। সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন লাভের ইহাই তঁাহাদের ধারণা। এই বালকোচিত আশা কোন দিনই পূরণ হইবার সম্ভাবনা নাই। কেন না, ব্রিটিশের আশ্রয় প্রার্থনার মূল্যই হইল ভারতের স্বাধীনতা। এমন কি, যদি ইহা এক মহান দেশের আত্মমর্যাদার অপক্লবজনক বাও হয়, তথাপি আমরা দুই কূল বজায় রাখিতে পারিব না। স্মার ফ্রেডরিক হোয়াইট (ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পক্ষপাতী নহেন) সত্ত প্রকাশিত একখানি পুস্তকে লিখিয়াছেন, ‘তাহারা (ভারতীয়গণ) এখনও বিশ্বাস করে যে, ইংলণ্ড বিপদের সময় তাহাদিগকে রক্ষা করিবে এবং যতদিন পর্যন্ত তাহারা এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিবে, ততদিন তাহারা তাহাদের নিজস্ব স্বায়ত্তশাসনের আদর্শের ভিত্তির প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে না।’ তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি থাকাকালীন যে শ্রেণীর লোকের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, সেই সকল লিবারেল, প্রগতিবিরোধী এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদী শ্রেণীর ভারতীয়ের মনোভাবই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কংগ্রেসের এরূপ বিশ্বাস নাই এবং অত্যন্ত অগ্রগামী দলও এরূপ বিশ্বাস করেন না। যাহা হউক, তঁাহারা স্মার ফ্রেডরিকের সহিত এ বিষয়ে একমত হইবেন। ঐ ভ্রান্ত ধারণা থাকা পর্যন্ত স্বাধীনতা আসিতে পারে না এবং যদি ভারতের ভাগ্যে কোনও বিপদ থাকে, তবে তাহাকে একাকী সে বিপদের সম্মুখীন হইতে দেওয়া উচিত। ভারতে ব্রিটিশ সামরিক নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণরূপে উঠাইয়া লওয়ার পর ভারতের স্বাধীনতার আরম্ভ হইবে।

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় যে ব্রিটিশ মতবাদের মধ্যে আত্মহারা হইয়াছিলেন, তাহাতে বিশ্বাসের কিছু নাই। কিন্তু ইহাই বিশ্বাসের যে, এই বিংশ শতাব্দীর পরিবর্তন ও যুগান্তকারী ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেও বহুলোক এই ভ্রান্ত ধারণা লইয়াই বাসিয়া আছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীগুলি জগতের সেবা অভিজাত ছিলেন, ঐশ্বর্য্য, সাফল্য, শক্তির কৌলিক গৌরব তঁাহাদের ছিল। এই বংশপরম্পরাগত

কীৰ্ত্তি এবং তাহাৰ শিক্ষা হইতে তাঁহারা যেমন বহু গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন, তেমনি অভিজাতমূলভ অনেক দোষও তাঁহাদের মধ্যে ছিল। গত পোণে দুই শতাব্দী ধরিয়া আমরা এই আভিজাত্যের গুণগরিমা বিকাশের রসদ জোগাইয়াছি এবং তাহাতে আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। অতীতে অগ্ৰাণ্য সম্প্রদায় বা জাতি যাহা করিয়াছেন, ঠিক সেইরূপেই ইংৰাজরাও ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন যে, তাঁহারা ঈশ্বৰ কৰ্ত্তৃক নিৰ্দ্ধিষ্ট এবং তাঁহাদের সাম্রাজ্য মৰ্ত্ত্যের স্বৰ্গৰাজ্য। যদি তাঁহাদের এই বিশেষ মৰ্যাদা স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে প্রশ্ন না উঠে, তাহা হইলে তাঁহারা সৰ্ব্বদাই দয়ালু ও অতি অমায়িক। অবশ্য, নিজেদের অনিষ্ট না হইলে অহুগ্রহ করিতে আপত্তি নাই। কিন্তু তাঁহাদের বিরুদ্ধতা করার অৰ্থই হইতেছে, ঐশ্বৰিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধতা করা। সে ক্ষেত্রে তাহা দমন করিতেই হইবে।

ব্রিটিশ মনস্তত্ত্বের এই দিকটা মিঃ আৰ্দ্ৰে সিগফ্রিদ অতি সুন্দররূপে তাঁহাৰ “লা ক্রিজ ব্রিতানিক য়ো ভ্যাতিয়েম সিয়েকল” নামক পুস্তকে বৰ্ণনা করিয়াছেন।

“শক্তি ও ঐশ্বৰ্য্যের সমবায়ে বংশানুক্ৰমিক অভ্যাসবশতঃ তাহাৰ জীবন-যাত্রাৰ ভঙ্গীৰ মধ্যে এমন এক আভিজাত্যের ভাব আসিয়া পড়িয়াছে যে, সে মনে করে যে, তাহাৰ জন্মপ্ৰাপ্ত অধিকাৰ বিধাতৃনিৰ্দ্ধিষ্ট। যখনই বৃটিশের শ্রেষ্ঠত্বাভিমানে কেহ সন্দেহ প্ৰকাশ করে, তখন ঐ ভাব অধিকতর উগ্র হইয়া উঠে। শতাব্দীর শেষভাগে নবীন ব্রিটনগণ একরূপ অজ্ঞাতসারেই মনে করিতেন যে, এই সাফল্য তাহাদের গ্ৰায্য প্ৰাপ্য।

“এই ধারণাৰ ভিত্তিতে বস্ত্ৰ ও ঘটনাৰ বিচারে অভ্যস্ত ব্রিটিশ ব্যবহাৰগুলি দেখিলে, উহা অতি লঘু ও সঙ্কীৰ্ণ সীমাৰ মধ্যে ব্রিটিশ মনস্তত্ত্বের উপৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া সঞ্চাৰ করে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। যে কেহ দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পাৰিবে যে, ইংলণ্ড তাহাৰ বৰ্ত্তমান সঙ্কটগুলিৰ কাৰণ নানা বাহ্য ব্যাপাৰের উপৰ আৰোপ করিতে চাহে। সে সৰ্ব্বদাই অপরের দোষ দেখে, এবং মনে করে ঐ অপৰ যদি আত্মসংশোধন করে, তাহা হইলেই ব্রিটিশ তাহাৰ পুৰাতন ঐশ্বৰ্য্য ফিৰিয়া পায়। নিজের কোন সংস্কাৰ বা পৰিবৰ্ত্তন না করিয়া ব্রিটিশগণ সৰ্ব্বদাই পরের সংশোধন ও সংস্কাৰ করিতে ব্যগ্র থাকে।”

যদি অবশিষ্ট জগতের প্ৰতি ইহাই ব্রিটিশ মনোভাব হয়, তাহা হইলে ভারতবৰ্ষেই তাহা সৰ্ব্বাধিক প্ৰত্যক্ষ। ভারতীয় সমস্ত সম্পৰ্কে ব্রিটিশ মনোভাব যদিও অত্যন্ত বিরক্তিকৰ তথাপি উহা কৌতূহলোদ্দীপক।

প্রাচীন ও নবীন ভারত

নিজেদের অশ্রান্ততা এবং অতি গুরুদায়িত্ব যোগ্যতার সহিত বহন করা সম্পর্কে অবিচলিত আস্থা, তাঁহাদের জাতীয় ভূগ্যা এবং নিজস্ব নমুনার সাম্রাজ্যনীতির উপর বিশ্বাস—এই সত্য বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সন্দেহাতুর অবিখ্যাসী, ও পাপীদিগের প্রতি ঘৃণা ও ক্রোধ—এই মনোভাব ধর্ম্মানুরাগের মতই গোঁড়ামিতে পরিপূর্ণ। প্রাচীনকালে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধবাদী পাষণ্ডদের উদ্ধার ও দলনের জন্ত যে দল গঠিত হইয়াছিল, সেই “ইনকুইজিটরদের” মতই, আমাদের মতামত অগ্রাহ্য করিয়াও তাঁহারা আমাদেরকে উদ্ধার করিতে ব্যগ্র। ঘটনাচক্রে এই ধর্ম্মের ব্যবসায়ে তাঁহাদের বেশ লাভ হয়। তাঁহারা সেই প্রাচীন প্রবচনের সত্যতা প্রমাণ করিয়া দেখাইতেছেন যে,—“সাধুতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতি।” ভারতকে সাম্রাজ্যিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে বাধ্য করা এবং বাছা বাছা ভারতীয়দিগকে ব্রিটিশ ছাঁচে গড়িয়া তোলা আর ভারতের উন্নতি একই কথা। ব্রিটিশ আদর্শ ও উদ্দেশ্য আমরা যত বেশী গ্রহণ করিব, আমরা ততই “স্বায়ত্ত-শাসনের” যোগ্য হইব। যদি আমরা কার্য্যতঃ প্রমাণ করি এবং প্রতিশ্রুতি দেই যে, ব্রিটিশ অভিপ্রায় অনুসারেই আমরা স্বাধীনতার ব্যবহার করিব, তাহা হইলে অবিলম্বে উহা পাইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অতীত ঘটনাবলী সম্পর্কে আমার আশঙ্কা হয়, ইংরাজ ও ভারতবাসীর মধ্যে মতানৈক্য দৃষ্ট হইবে। সম্ভবতঃ, ইহা স্বাভাবিক! কিন্তু যখন ভারত সচিবগণ ও অগ্রাগ্র উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কর্ম্মচারী ভারতের বর্ত্তমান ও অতীতের সম্পর্কে কল্পনাগ্রন্থত চিত্র অঙ্কিত করেন অথবা কোন বিবৃতি দেন—যাহা প্রকৃত ঘটনার সহিত সম্পর্কহীন—তখন উহা অত্যন্ত মর্মান্তিক হইয়া উঠে। মুষ্টিমেয় বিশেষজ্ঞ ও কতিপয় ব্যক্তি ব্যতীত ভারতবর্ষ সম্পর্কে ইংরাজের অজ্ঞতা অতিশয় গভীর। ঘটনাই যখন ইহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়, তখন ভারতের মর্মান্বিত সত্য ইহাদের আয়ত্তের কত বেশী বাহিরে? তাঁহারা ভারতের বাহ্য দেহ অধিকার করিয়াছেন; কিন্তু ইহা হিংসামূলক বাহুবলের অধিকার। তাঁহারা ভারতবর্ষকে জানেন না; জানিবার চেষ্টাও করেন না। তাঁহারা কখনও ভারতের চক্ষুর প্রতি চাহিয়া দেখেন নাই। কেন না, তাঁহাদের দৃষ্টি বিষয়াস্তরে নিবদ্ধ এবং লজ্জা ও অপমানে ভারতের দৃষ্টি অবনত। শতাব্দীচয়ের সংশ্রবের পরেও তাহারা পরস্পরের নিকট অপরিচিত এবং পরস্পরের প্রতি অপ্রীতিসম্পন্ন।

দারিদ্র্য ও অধঃপতন সত্ত্বেও এখনও ভারতের গর্ব্ব ও গৌরবের অনুরূপ কিছুই আছে। প্রাচীন পারম্পর্য্য ও বর্ত্তমানের দুঃখ-ভারপীড়িত ভারতের

চকুতে ক্লাস্তির ছায়া, তথাপি “তাহার অন্তরের সৌন্দর্য বাহ্য দেহে বিকশিত; কত আশ্চর্য্য চিন্তা, কত অপরূপ অহুধ্যান, কত মধুর আবেগ তাহার প্রাণের পরতে পরতে রহিয়াছে।” তাহার বিচূর্ণিত দেহের ভিতরে ও বাহিরে এখনও যে কেহ আত্মার মহিমা চকিতে দেখিতে পায়। কত যুগ ধরিয়া ইতিহাস পথে ভ্রমণ করিতে করিতে সে কত জ্ঞান অর্জন করিয়াছে, কত অপরিচিত অতিথি আসিয়া তাহার বৃহৎ পরিবারে মিলিয়া গিয়াছে, কত উত্থান, কত পতন, প্রচণ্ড বেদনা, গভীর অসম্মান, কত আশ্চর্য্য দৃশ্য সে পর্য্যায়ক্রমে দেখিয়াছে। কিন্তু এই দীর্ঘ ভ্রমণেও সে তাহার চিরস্মরণীয় সংস্কৃতিকে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহা হইতে শক্তি ও তেজ আহরণ করিয়াছে এবং অগ্ন্যাগ্নি দেশে তাহা বিতরণ করিয়াছে। উন্নতি, অধঃপতন—হু’য়েরই চরম সে দেখিয়াছে, তাহার দুঃসাহসী চিন্তা জীবন ও জগতের রহস্য মীমাংসা করিবার জন্য উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধলোকে গিয়াছে; আবার জঘন্য নরকের অতলে ডুবিবার তিক্ত অভিজ্ঞতাও তাহার আছে। কুসংস্কার ও অধঃপতনের কারণ স্বরূপ আচার ও প্রথাগুলি ক্রমশঃ জমিয়া উঠিয়া তাহাকে দৃঢ়বলে চাপিয়া ধরিয়া অধঃপতনের দিকে লইয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সে তাহার প্রাচীন ঋষিগণ প্রদত্ত প্রেরণা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যায় নাই, তাহার। ইতিহাসের প্রথম প্রভাতে তাহাকে উপনিষদের বাণী শুনাইয়াছিলেন। তাঁহাদের তীক্ষ্ণ মন অধীর আবেগে তন্ন তন্ন করিয়া তথ্যাসন্ধান করিয়াছে, কোনও যুক্তিহীন মতবাদ অথবা প্রাণহীন বাহ্য অহুষ্ঠানের পুনঃ পুনঃ আবর্তনের মধ্যে তাঁহারা নিশ্চিন্তে গা ঢালিয়া দেন নাই। তাঁহারা ইহলোকে ব্যক্তিগত সুখ অথবা পরলোকে স্বর্গ কামনা করেন নাই। তাঁহারা চাহিয়াছেন আলোক,—চাহিয়াছেন প্রজ্ঞা।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের সেই প্রার্থনা, ‘আমাকে অসত্য হইতে সত্য লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে অমৃত লইয়া যাও’! আজিও লক্ষ লক্ষ লোক প্রত্যাহ যে বিখ্যাত গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিয়া থাকে, তাহাও জ্ঞান লাভের, সত্যদৃষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষা।

রাজনীতির দিক দিয়া ছিন্নভিন্ন হইলেও সে তাহার সর্বজনীন পরম্পরাগত সম্পদ রক্ষা করিয়াছে এবং বাহ্যতঃ বহু বৈচিত্র্যের মধ্যেও এক আশ্চর্য্য ঐক্য রক্ষা করিয়াছে। * অগ্ন্যাগ্নি প্রাচীন ভূমির মতই তাহার মধ্যেও ভাল

* “ভারতে বহু স্ববিরোধিতার মধ্যে ও সমস্ত বৈচিত্র্যের উপর এক মহত্তর ঐক্য বিদ্যমান—যাহা সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। কেন না, ইহা রাষ্ট্রীয় ঐক্যরূপে কখনও সমগ্র দেশকে ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির দিক দিয়া এক করিতে পারে নাই। কিন্তু তথাপি ইহা

প্রাচীন ও নবীন ভারত

ও মন্দের মিশ্রণ ঘটানো হয়েছে। ভাল আজ লুপ্তায়িত, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। কিন্তু ধ্বংসের পচা গন্ধ সর্বত্রই প্রকাশিত এবং তীব্র সূর্যালোক নিঃস্বপ্নভাবে তাহার মন্দগুলি উদ্ঘাটিত করিতেছে।

ভারত ও ইতালীর মধ্যে অনেকটা ঐক্য বিদ্যমান। এই দুই প্রাচীন দেশের সুদীর্ঘকালের পরস্পরাগত সংস্কৃতি রহিয়াছে। তবে, ইতালী ভারতের তুলনায় অপেক্ষাকৃত নবীন এবং ভারতবর্ষ তুলনায় বিশালতর দেশ। উভয় দেশই রাষ্ট্রক্ষেত্রে বহু। বিভক্ত হইলেও ভারতের মত ইতালীর ঐক্যবোধ কখনও বিনষ্ট হয় নাই এবং তাহাদের সমস্ত বিভিন্নতার মধ্যেও এই ঐক্য সুপরিস্ফুট ছিল। ইতালীর ঐক্য প্রধানতঃ রোমান ঐক্য, সেই মহান নগরী সমগ্র দেশের উপর আধিপত্য করিয়াছে এবং ইহাই ঐক্যের উৎপত্তিস্থল ও প্রতীক ছিল। ভারতবর্ষে এরূপ কোন স্বতন্ত্র কেন্দ্র অথবা নগরীর আধিপত্য ছিল না। যদিও বারাণসীকে প্রাচ্যের চিরন্তন নগরী বলা যাইতে পারে। ইহা কেবল ভারতবর্ষের নহে, সমগ্র পূর্ব এশিয়ারই। কিন্তু রোমের মত বারাণসী কখনও সাম্রাজ্যলিপ্সু হয় নাই অথবা পাখিব সম্পদের কথা চিন্তা করে নাই। ভারতীয় সংস্কৃতি সমস্ত ভারতে এমন ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, দেশের কোন বিশেষ অংশকে ঐ সংস্কৃতির হৃৎপিণ্ড বলা যাইতে পারে না। কত্য়াকুমারী হইতে হিমালয়ের অমরনাথ ও বদ্রিনাথ, দ্বারক; হইতে পুরী পর্যন্ত একই ভাবধারা প্রবাহিত—যদি কোন স্থানে ভাবধারাগুলির মধ্যে সজ্জাত হইত, তাহা হইলে সে কোলাহল অনতিবিলম্বে দেশের অতি দূরবর্তী অঞ্চলগুলিতেও পৌছিত।

ইতালী যেমন সমস্ত পশ্চিম ইউরোপকে ধর্ম ও সংস্কৃতি দান করিয়াছে, ভারতবর্ষও পূর্ব এশিয়ায় তাহাই করিয়াছে। অবশ্য, চীনদেশ ভারতের মতই প্রাচীন ও শ্রেয়। এমন কি, যখন ইতালী রাষ্ট্রক্ষেত্রে ভূমিলুপ্তিত, তখনও তাহার জীবন ধারা ইউরোপের নাড়ীতে নাড়ীতে প্রবাহিত হইয়াছে।

মেটার্ণিক বলিয়াছেন যে, ইতালী একটি ‘ভৌগোলিক অভিব্যক্তি’ এবং অনেক পরবর্তী মেটার্ণিক ভারতবর্ষ সম্পর্কেও ঐ বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন এবং আশ্চর্য্য যে, এই উভয় দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যেও সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান। অষ্ট্রিয়ার সহিত ইংলণ্ডের তুলনাও কম কৌতূহলপ্রদ নহে। উনবিংশ শতাব্দীর অষ্ট্রিয়ার মতই বিংশ শতাব্দীর

অত্যন্ত বাস্তব এবং অত্যন্ত শক্তিশালী। এমন কি, ভারতের মুসলিম জগৎ পর্যন্ত স্বীকার করিয়া থাকেন যে, ইহার সংস্পর্শে আসিয়া তাহার গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছেন।”—তার ক্রেডেরিক হোয়াইট, ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভবিষ্যৎ’।

ইংলওও গর্কিত, উদ্ধত এবং প্রভুত্বপ্রবণ। কিন্তু যে শিকড় দিয়া সে শক্তি আহরণ করে, তাহা শুকাইয়া আসিতেছে এবং তাহার শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানগুলিতে ক্ষয় রোগ প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে উহা জীর্ণ করিতেছে।

কোন দেশের উপর দেবত্ব আরোপ করিবার প্রলোভন অনেকেই দমন করিতে পারেন না, আদিম চিন্তার এমনই প্রভাব। ভারতবর্ষ ভারতমাতা হইয়াছেন—সুন্দরী নারী, অতি প্রাচীন, কিন্তু চিরযৌবনা; বিষণ্ণ দৃষ্টি, ক্লিষ্ট মুখ, বিদেশী ও শত্রুর দ্বারা নিষ্ঠুর ব্যবহারে বিপন্ন হইয়া সন্তানগণকে রক্ষা করিবার জন্ত অশ্রুবারি করিতেছেন। এই শ্রেণীর চিত্র শত সহস্র হৃদয়ে ভাবাবেগ জাগ্রত করে এবং তাহাদিগকে আত্মত্যাগ ও কার্য্য করিতে প্রেরণা দেয়। কিন্তু ভারতবর্ষ প্রধানতঃ কৃষক ও শ্রমিকের দেশ,—দেখিতে সুন্দর নহে; কেন না, দারিদ্র্যের মধ্যে কোন সৌন্দর্য্য নাই। আমাদের কল্পিত এই সুন্দরী নারী কি উলঙ্গদেহ, বক্রমেরুদণ্ড কারখানা ও কৃষিক্ষেত্রের শ্রমিকদের প্রতিচ্ছবি? অথবা ইহা সেই মুষ্টিমেয় শ্রেণীর—বাহারা স্মরণাতীত কাল হইতে জনসাধারণকে পদদলিত করিয়া শোষণ করিয়াছে, তাহাদের উপর নিষ্ঠুর প্রথা নিয়ম চালাইয়াছে, এমন কি, বহু সংখ্যককে একেবারে অস্পৃশ্য করিয়া ফেলিয়াছে? আমরা কল্পনার মূর্ত্তি গড়িয়া সত্যকে আবৃত করিতে চাই, বাস্তবকে এড়াইবার জন্ত স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করি।

বিভিন্ন শ্রেণীগত পার্থক্য এবং তাহাদের পরস্পরের বিভেদ সত্ত্বেও ভারতবর্ষে সকলের মধ্যে এক সাধারণ ঐক্যমন্ত্র রহিয়াছে, ইহার অফুরন্ত প্রাণ শক্তি, অধ্যবসায়, দৃঢ়তা ও সহিষ্ণুতা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এই শক্তি কিসের? ইহা কেবল মাত্র নিষ্ক্রিয় শক্তির তামসিক জড়ত্বের ভার অথবা ঐতিহ্য নহে। অবশ্য যথাস্থানে ঐ গুলিও মহান। ইহার মধ্যে এক সংরক্ষণমূলক ক্রিয়াশীল নীতি রহিয়াছে। কেন না, ইহা অতি শক্তিশালী বাহিরের প্রভাবকে সাফল্যের সহিত প্রতিরোধ করিয়াছে এবং ভিতর হইতে উদ্ভূত বিরুদ্ধ শক্তিকেও গ্রাস করিয়াছে। কিন্তু তথাপি এত শক্তি লইয়াও ইহা রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে নাই অথবা রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনে চেষ্টা করিতে পারে নাই। এই বিষয়টিকে যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই, অত্যন্ত নির্বোধের মত ইহাকে অবজ্ঞা করা হইয়াছে এবং আমরা ইহার ফলভোগ করিতেছি। ইতিহাসের মধ্য দিয়া প্রাচীন ভারতের আদর্শের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, ইহা কখনও রাজনৈতিক অথবা

ব্রিটিশ শাসনের বিবরণ

সামরিক জয়কে গৌরব প্রদান করে নাই, ইহা অর্থ এবং অর্থ-উপার্জনকারী শ্রেণীগুলিকে ঘৃণার চক্ষেই দেখিয়াছে। সম্মান ও ঐশ্বর্য্য একত্র থাকিতে পারে না। অস্তিত্ব মতবাদের দিক হইতেও সে ব্যক্তি যৎসামান্য অর্থ লইয়া সমাজের সেবা করিত, সম্মান তাহারই প্রাপ্য ছিল।

বহু ঝড়-ঝাপটার আঘাতে বিপর্য্যস্ত হইয়াও প্রাচীন সংস্কৃতি কোন মতে বাঁচিয়া আছে; কিন্তু ইহা বাহিরের আকারই রহিয়াছে, ভিতরের বস্তু আর নাই। বর্তমান ভারত এক অভিনব শক্তিমান প্রতিপক্ষ—ধনতন্ত্রী পাশ্চাত্যের বণিক সভ্যতার সহিত নিঃশব্দে এবং জীবন-মরণ তুচ্ছ করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই নূতনের নিকট ইহার পরাজয় হইবে; কেন না, পাশ্চাত্যের হাতে বিজ্ঞান আছে এবং বিজ্ঞান লক্ষ লক্ষ ক্ষুধিতকে অন্ন দিতে পারে। এই নৃশংস সভ্যতার প্রতিবেদকও পাশ্চাত্য আনিয়াছে—সমাজতত্ত্ববাদের নীতি, সহযোগিতা এবং সকলের কল্যাণের জন্ত সমাজের সেবা। ইহা প্রাচীন ব্রাহ্মণগণের সেবার আদর্শ হইতে বিশেষ ভিন্ন নহে। ইহার উদ্দেশ্য সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়কে ব্রাহ্মণ করিয়া তোলা (অবশ্য, ধর্ম্মের দিক দিয়া নহে) এবং সর্ববিধ শ্রেণীভেদ বিলুপ্ত করা; এমনও হইতে পারে, যখন ভারত তাহার জরাজীর্ণ প্রাচীন বসন ত্যাগ করিয়া নববস্ত্র গ্রহণ করিবে, তখন উহা যে এমন ভাবে নির্মাণ করিয়া লগ্বে, যাহা বর্তমান অবস্থার ও তাহার প্রাচীন চিন্তা উভয়েরই উপযোগী হইবে। তাহার ভূমিতে সতেজে বর্দ্ধিত হইতে পারে, এমন ভাবেই সে উহা গ্রহণ করিবে।

৫৪

ব্রিটিশ শাসনের বিবরণ

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সমষ্টিগত বিবরণ কি? এই স্বদীর্ঘ কাহিনী নিরপেক্ষ ও বাস্তব দৃষ্টিতে দেখা কোন ভারতীয় বা ইংরাজের পক্ষে সম্ভব কি না, আমার সন্দেহ আছে এবং এমন কি, যদি ইহা সম্ভবপরও হয়, তাহা হইলেও সমসাময়িক মনস্তত্ত্ব ও অগ্রাগ্র ব্যাপারের মাপকাঠিতে তাহা বিচার করা অধিকতর কঠিন। আমরা শুনিয়াছি যে, ব্রিটিশ শাসন “ভারতবর্ষকে এমন এক গভর্ণমেন্ট দিয়াছে, যাহার প্রভুত্বে এই বিশাল দেশের কোন অংশে কেহ কোন প্রশ্ন করে না। অতীতের কোন শতাব্দীতেই

ভারতবর্ষের ইহা ছিল না।” * ইহা আইন এবং জ্ঞানপরায়ণ, কর্মক্ষম শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, ইহা ব্যক্তিস্বাধীনতা ও পাশ্চাত্যের পার্লামেন্টীয় গভর্নমেন্টের ধারণা ভারতবর্ষকে দিয়াছে এবং “সমগ্র ব্রিটিশ ভারতকে এক রাষ্ট্রে পরিণত করিয়া ভারতীয়দের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ঐক্যবোধ জাগ্রত করিয়াছে” ও এইরূপে জাতীয়তাবাদের প্রথম বিকাশের উদ্বোধন করিয়াছে।* ইহাই ব্রিটিশ পক্ষের বলিবার কথা—ইহার মধ্যে অবশ্য অনেক সত্য আছে—যদিও বহুবর্ষ যাবৎ আইনের শাসন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অস্তিত্ব নাই।

ভারতীয় দৃষ্টিতে এই ব্রিটিশ যুগের এমন অনেক ঘটনা প্রতিভাত হয়, যাহা হইতে বুঝা যায় যে, বিদেশী শাসনের ফলে আমাদের কি মানসিক, কি বাহ্যিক কত ক্ষতি হইয়াছে। উভয়ের বিচার প্রণালীর পার্থক্য এত বেশী যে, যে বিষয়ের প্রশংসায় ব্রিটিশ পক্ষমুখ, ভারতীয়েরা তাহারই নিন্দা করিয়া থাকেন। যেমন, ডক্টর আনন্দ কুমারস্বামী লিখিয়াছেন, “ভারতে ব্রিটিশ শাসনের এক স্মরণীয় নিদর্শন এই যে, ইহা বাহ্যতঃ ককণার মূর্ত্তি ধরিয়াই ভারতবাসীর সর্ব্বাধিক ক্ষতি করিয়াছে।”

কাঁধ্যতঃ বিগত শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যে পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল দেশেই অল্পাধিক ঘটিয়াছে। পশ্চিম ইউরোপে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি এবং পরে সমগ্র জগতে উহার প্রসারের সহিত জাতীয়তা বোধ আসিয়াছে এবং সর্বত্র রাষ্ট্রগুলি সংহত ও শক্তিশালী হইয়াছে। ব্রিটিশগণই প্রথম ভারতের দ্বার পশ্চিমের দিকে খুলিয়া দিয়াছে এবং পাশ্চাত্য শিল্প-বাণিজ্য ও বিজ্ঞানের বার্তা আনিয়াছে, এ গর্ব্ব তাঁহারা করিতে পারেন।} কিন্তু তৎসঙ্গেও ৪০তদিন পারিপার্শ্বিক ঘটনার চাপে পড়িয়া বাধা হন নাই, ততদিন পর্যন্ত তাঁহারা এই দেশের বাণিজ্যের উন্নতির কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে ইতিপূর্বেই পূর্ব এশিয়ার নিজস্ব সৃষ্টি সংস্কৃতির সহিত পশ্চিম এশিয়ার ঐসলামিক সংস্কৃতির মিলন ঘটিয়াছিল। তাহার পর আসিল অধিকতর শক্তিশালী হ্রদ্র পাশ্চাত্যের নূতন সভ্যতা এবং ভারতবর্ষ বহুতর প্রাচীন ও নবীন আদর্শের মিলনক্ষেত্র ও সংগ্রামভূমি হইয়া উঠিল। এই তৃতীয় শক্তি জয়ী হইয়া ভারতের বহু প্রাচীন সমস্তা সমাধান করিত সন্দেহ নাই; কিন্তু যে ব্রিটিশ জাতি ইহা আনিলেন, তাঁহারাই ইহার উন্নতির পথ বন্ধ করিতে উদ্যত হইলেন।

* ১৯০৪ সালের জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটির রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃতাংশগুলি গৃহীত।

ব্রিটিশ শাসনের বিবরণ

তাহারা আমাদের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি বন্ধ করিলেন—ইহাতে আমাদের রাজনৈতিক বিকাশের বিলম্ব ঘটিল এবং তাহারা এ দেশে বর্তমান কালের অল্পপযোগী সামন্ততান্ত্রিক ও অগ্রাণু যে সব প্রাচীন স্মৃতি পাইলেন, তাহাই সমস্তে বন্ধা করিতে লাগিলেন। আইন ও প্রথা-নিয়ম তাহারা যে আকারে তখন পাইয়াছিলেন, তাহাই জমাট করিয়া আমাদের অগ্রগতি বন্ধ এবং ঐ শৃঙ্খলগুলি হইতে মুক্তি পাওয়া অতিশয় কঠিন করিয়া তুলিলেন। তাহাদের সদিচ্ছা ও সহায়ত্বভূতিতে ভারতে বুজ্জিয়া শ্রেণী গড়িয়া উঠে নাই। কিন্তু ভারতে রেলপথ প্রবর্তিত হওয়ায় ও অগ্রাণু শিল্প-বাণিজ্যের প্রবর্তন হওয়ায় তাহারা পরিবর্তনের চক্রবোধ করিতে পারেন নাই। তবে তাহারা নিজেদের স্বার্থ ও স্ববিধার জন্য উহাকে সংযত করিয়াছেন এবং উহার গতিও ধীর করিয়াছেন।

“এই দুই ভিত্তির উপর ভারত গভর্ণমেণ্টের মহান সৌধ স্থাপিত। এবং ইহা দৃঢ়তার সহিত দাবী করা যাইতে পারে যে, ১৮৫৮ সালের পর হইতে যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে সমস্ত অধিকৃত ভূ-খণ্ডের উপর ব্রিটিশ মুকুটের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন হইতে ভারত শিক্ষার দিক দিয়া এবং পার্থিব উন্নতির দিক দিয়া যাহা অর্জন করিয়াছে, তাহার সুদীর্ঘ জটিল ইতিহাসের কোন যুগেই তাহা অর্জন করা তাহার ক্ষমতার অতীত ছিল।” * এই বিবরণ স্বতঃসিদ্ধবৎ প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ তাহা নহে; বরং বহুবার বলা হইয়াছে যে, ব্রিটিশ শাসনের পর হইতে শিক্ষার দিক দিয়া ভারত অবনত হইয়া পড়িয়াছে। যদি এই বিবৃতি সম্পূর্ণরূপে সত্যও হইত, তাহা হইলেও উহা আধুনিক যন্ত্রযুগের সহিত অতীত যুগগুলির তুলনার চেষ্টা মাত্র। বিজ্ঞান ও কলকারখানার জন্য বিগত শতাব্দীতে জগতের প্রায় সকল দেশেই শিক্ষা ও সম্পদের বিশ্বয়কর উন্নতি ঘটিয়াছে এবং ইহাও নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, কোনও দেশের ঐ শ্রেণীর উন্নতি “তাহার সুদীর্ঘ জটিল ইতিহাসের কোন যুগেই অর্জন করা তাহার ক্ষমতার অতীত ছিল।”—যদিও সেই দেশের ইতিহাস ভারতীয় ইতিহাসের সহিত তুলনায় তত দীর্ঘ নাও হইতে পারে। এমন কি, ব্রিটিশ শাসন ছাড়াও এই যন্ত্রযুগে ঐ শ্রেণীর কিছু উন্নতি লাভ করিতে আমরা সমর্থ হইতাম—এ কথা বলিলে কি তাহা আমাদের নির্বুদ্ধিতা ও বিকৃত রুচির পরিচায়ক হইবে? অন্যত্র দেশের সহিত আমাদের ভাগ্যের তুলনা করিয়া দেখিলে, আমরা কি কল্পনা করিতে পারি না যে,

* জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটির রিপোর্ট—১৯৩৪।

জওহরলাল নেহরু

উন্নতি আরও অধিকতর হইতে পারিত? কেন না, আমাদেরকে ব্রিটিশগণ কর্তৃক ঐ উন্নতির গতিরোধ চেষ্টার সহিত বিরোধিতা করিয়াই অগ্রসর হইতে হইতেছে। রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বেতার প্রভৃতি নিশ্চয়ই ব্রিটিশ শাসনের সদিচ্ছা ও উপকারের নিদর্শন নহে। এইগুলির প্রয়োজন আছে; কিন্তু যেহেতু ঘটনাক্রমে ব্রিটিশের মারফৎই এইগুলি প্রথম আসিয়াছে, সেইজন্য আমাদের তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কিন্তু তথাপি, ভারতে যন্ত্রশক্তির প্রথম প্রবর্তনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনকে দৃঢ়তর করা। ঐ সকল শিরা-উপশিয়ার মধ্য দিয়া জাতির রক্ত প্রবাহিত হইবে, তাহার বাণিজ্য বাড়িবে, কাঁচা মাল রপ্তানি হইবে এবং লক্ষ লক্ষ মানব নূতন জীবন ও ঐশ্বর্য লাভ করিবে। হয় ত দীর্ঘকাল পরে এইরূপ কিছু সম্ভবপর হইবে; কিন্তু বর্তমানে ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত ও প্রযুক্ত হইয়াছে—সাম্রাজ্যের বন্ধন দৃঢ় করা এবং ব্রিটিশ পণ্য দিয়া ভারতের বাজার দখল করা—এবং তাঁহারা সফলকাম হইয়াছেন। আমি কল-কারখানা ও আধুনিক যানবাহনের পক্ষপাতী; কিন্তু সময় সময় জীবনপ্রদ রেলগাড়ীতে আমি যখন ভ্রমণ করি, তখন দুইদিকে বিশাল প্রাস্তর মধ্যবর্তী রেলপথ দেখিয়া মনে হয়, উহা যেন ভারতবর্ষকে শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দী করিয়া রাখিয়াছে।

ভারত শাসন সম্পর্কে ব্রিটিশ ধারণা পুলিশ শাসিত রাষ্ট্রের অনুরূপ। গভর্ণমেণ্টের কাজ হইল রাষ্ট্রকে রক্ষা করা; অত্যাচারী কাজ অপরের উপর অর্পিত। সাধারণ রাজস্ব তাঁহারা সমরবিভাগ, পুলিশ, শাসনবিভাগ, ঋণের সুদে ব্যয় করেন। জনসাধারণের অর্থনৈতিক প্রয়োজন লক্ষ্য করা হয় না এবং ব্রিটিশ স্বার্থের নকট তাহা বলি দেওয়া হয়। অতি ক্ষুদ্র মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ব্যতীত, জনসাধারণের শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত প্রয়োজন উপেক্ষা করা হয়। সাধারণ রাজস্ব সম্পর্কে প্রাচীন ধারণার পরিবর্তনের সহিত, অবৈতনিক সার্বজনীন শিক্ষাপদ্ধতি, স্বাস্থ্যোন্নতি, দরিদ্র, উন্নাদ, দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিদের ভরণপোষণ, শ্রমিকদের রোগ, বৃদ্ধবয়স ও বেকারের জন্ত বীমার ব্যবস্থা ইত্যাদি অত্যাচারী দেশে প্রবর্তিত হইয়াছে; কিন্তু এখানে গভর্ণমেণ্টের তাহা ধারণারও বাহিরে। এই সকল ব্যয়বহুল কার্যে বিলাসিতা করিবার ইহার শক্তি নাই। ইহার ট্যাক্স আদায়ের পদ্ধতি নিম্নাভিমুখী, অর্থাৎ যাহার আয় যত কম তাহাকে অধিকতর উপার্জন অপেক্ষা হারাহারি স্তরে বেশী ট্যাক্স দিতে হয়। এবং ইহার দেশরক্ষা ও শাসনবিভাগের খরচ এত অধিক যে, রাজস্বের অধিকাংশই ইহাতে নিঃশেষিত হইয়া যায়।

ব্রিটিশ শাসনের বিবরণ

ব্রিটিশ শাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহারা দেশের উপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারকে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ করিবার জন্ত তাঁহাদের সমস্ত শক্তি ঐ সকল কেন্দ্রে সংহত করেন। বাদ বাকী আর যাহা কিছু, উপলক্ষ মাত্র। যদি তাঁহারা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট এবং কক্ষকুশল পুলিশ-বাহিনী গঠিত করিয়া থাকেন, তবে সে সাফল্যের জন্ত তাঁহারা নিশ্চয়ই গর্ববোধ করিতে পারেন। কিন্তু তাহাতে ভারতবাসীর নিজেকে ধন্য মনে করিবার কোনই কারণ নাই। ঐক্য খুব ভাল কথা—কিন্তু দাসত্বের ঐক্য লইয়া গর্ব করা চলে না। যে কোন স্বেচ্ছাচারী গভর্ণমেন্টের শক্তি জনসাধারণের নিকট দুর্বল ভাবে পরিণত হইতে পারে। পুলিশবাহিনী নানাদিকে প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু উহা যে জনসাধারণের রক্ষক বলিয়া কথিত হয়, তাহাদের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে এবং প্রায়শঃ তাহা করাও হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীকদের সহিত আধুনিক সভ্যতার তুলনা করিতে গিয়া বারট্রাও রাসেল লিখিয়াছেন, “আমাদের সহিত তুলনায় গ্রীক সভ্যতা কেবলমাত্র এই দিক দিয়া উন্নত ছিল যে, তাহাদের কক্ষকুশল পুলিশবাহিনী ছিল না, ফলে বহু ভদ্রব্যক্তি রক্ষা পাইতেন।”

ব্রিটিশ প্রাধান্য ভারতবর্ষে শান্তি আনিয়াছে। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতবর্ষ যে দুর্ভাগ্য ও বিপদের মধ্যে পড়িয়াছিল, তাহাতে ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই শান্তি কামনা করিয়াছিল। শান্তি বহুমূল্য সম্পদ; উন্নতির জন্ত ইহা আবশ্যক। আমরা ইহাকে বরণ করিয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু শান্তির জন্ত অত্যধিক মূল্য দিতে হইতে পারে। আমরা শাসনের শান্তিও পাইতে পারি। পিঞ্জর অথবা কারাগারের নিরাপদ জীবনও লাভ করিতে পারি। অথবা শান্তি আত্মোন্নতি সাধনে অক্ষম মানবের নিস্তেজ নৈরাশ্যও হইতে পারে। বিদেশী বিজেতা বলপূর্বক যে শান্তি স্থাপন করে, তাহার মধ্যে প্রকৃত শান্তির বিশ্রাম ও আরামের অবকাশ নাই। যুদ্ধ ভয়ঙ্কর বস্তু; উহা নিবারণ করাই উচিত। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক উইলিয়ম জেমসের মতে, উহাতে চরিত্রের বিবিধ সদগুণের বিকাশ হয়—বিশ্রুতি, সজ্ঞশক্তি, অধ্যবসায়, বীরত্ব, বিবেক, শিক্ষা, উদ্ভাবনী শক্তি, ব্যয়-সঙ্কোচ, শারীরিক স্বাস্থ্য এবং বীর্ঘ্য। এই সকল কারণে জেমস যুদ্ধের অনুরূপ একটা কিছু অন্বেষণ করিয়াছিলেন—যাহাতে যুদ্ধের ভয়াবহ কিছু থাকিবে না, অথচ এই সকল উদ্দীপ্ত করিবে। সম্ভবতঃ যদি তিনি অসহযোগ ও নিরুপদ্রব প্রতিরোধের নীতি অবগত হইতেন, তাহা হইলে হয়ত স্বীয় মনোমত বস্তু খুঁজিয়া পাইতেন—যাহা যুদ্ধের সমতুল্য, অথচ নৈতিক ও শান্তিপূর্ণ।

ইতিহাসে ‘যদি’ ও সম্ভাবনা লইয়া বিচার করা নিষ্ফল। আমার

জওহরলাল নেহরু

মতে ভারতবর্ষ যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রশিল্পে উন্নত পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসিয়াছে, তাহার ফল ভালই হইয়াছে। বিজ্ঞান পাশ্চাত্য জগতের এক মহৎ দান। ভারতে ইহা ছিল না এবং ইহার অভাবে সে ক্রমশঃ অধঃপতিত হইতেছিল। কিন্তু আমাদের যোগাযোগের ভঙ্গীটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের এবং তথাপি সম্ভবতঃ পুনঃ পুনঃ প্রচণ্ড আঘাত ব্যতীত আমাদের মোহনিদ্রা ভাঙিত না। এই দিক দিয়া বিচার করিলে প্রটেস্ট্যান্ট, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী, এংলো-সাক্সন ইংরাজেরাই অধিকতর উপযোগী। কেন না, অত্যন্ত পাশ্চাত্য দেশবাসী অপেক্ষা আমাদের সহিত তাহাদের পার্থক্য অনেক অধিক এবং আমাদের অধিকতর আঘাত করিতে সক্ষম।

তাহারা আমাদের রাজনৈতিক ঐক্য দিয়াছে—উহা আকাজ্জক বস্তু, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের ঐক্য থাকুক আর নাই থাকুক, ভারতীয় জাতীয়তা পরিপুষ্ট হইয়া ঐক্যের দাবী করিতেই। আরব জাতি বিভক্ত হইয়া বহুসংখ্যক স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে—স্বাধীন, রক্ষিত, ম্যাণ্ডেটের অধীন প্রভৃতি—কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে আরবের ঐক্যের আকাজ্জক প্রবাহিত। যদি পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পথ অবরোধ না করিতেন, তাহা হইলে আরব জাতীয়তা বহুল পরিমাণে সাফল্য অর্জন করিতে পারিত, নিঃসন্দেহ। কিন্তু ভারতের মতই এই সকল শক্তিই বিচ্ছেদমূলক ভাবগতিকে উদ্ভাইয়া তুলেন, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমস্যা সৃষ্টি করেন—যাহা জাতীয়তার প্রেরণাকে দুর্বল এবং অংশতঃ প্রতিরোধ করে এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে নিরপেক্ষ বিচারকের মূর্তিতে অবস্থান করিবার চলনাও যোগায়।

সাম্রাজ্যের অগ্রগতির মুখে উপলব্ধ্য হিসাবে ঘটনাচক্রে ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হইয়াছে। পরবর্তীকালে আমরা দেখিয়াছি, যখন এই ঐক্য জাতীয়তার সহিত যুক্ত হইয়া পর-শাসনের বিরুদ্ধে প্রবল উত্থাপন করিয়াছে, তখনই অনৈক্য ও সাম্প্রদায়িকতাকে ইচ্ছা করিয়া উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে,—যাহা আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে প্রবল বাধা।

ব্রিটিশ এদেশে আসিয়াছে, কত দীর্ঘকালের কথা, পোনে দুই শতাব্দী ধরিয়া তাহারা আধিপত্য করিতেছে! স্বৈচ্ছাচারী গভর্নমেণ্টের মতই তাহাদের কর্তৃত্ব ছিল অবাধ, তাহাদের ইচ্ছামতই ভারতবর্ষকে গড়িয়া তুলিবার স্বযোগ ছিল প্রচুর। এই কালের মধ্যে জগতে কত বিচিত্র পরিবর্তন হইয়াছে—প্রাচীনের কোন চিহ্নই নাই—ইংলণ্ডে, ইউরোপে, আমেরিকায়, জাপানে। অষ্টাদশ শতাব্দীর আটলান্টিক তীরবর্তী অতি নগণ্য

ব্রিটিশ শাসনের বিবরণ

আমেরিকান উপনিবেশগুলি আজ সর্বাধিক ঐশ্বর্যশালী, অধিক ক্ষমতামণ্ডলী এবং কলকজার দিক দিয়া অতিমাত্রায় অগ্রসর জাতিতে পরিণত হইয়াছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে জাপানের কি বিস্ময়কর পরিবর্তন হইয়াছে! অল্পদিন পূর্বেও রুশিয়ার যে বিশাল ভূখণ্ড—জার গভর্ণমেণ্টের স্থূল হস্তে পীড়িত হইয়া অবরুদ্ধ-গতি ছিল, আজ সেখানে নব জীবনের স্পন্দন এবং আমাদের চক্ষুর সম্মুখেই নূতন জগৎ গড়িয়া উঠিতেছে। ভারতেও বৃহৎ পরিবর্তন হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে বর্তমানে পার্থক্য কত বেশী—রেলওয়ে, সেচ ব্যবস্থা, কারখানা, স্থূল ও কলেজ, বিশাল সরকারী দপ্তরখানা প্রভৃতি।

কিন্তু এই পরিবর্তন সত্ত্বেও অন্ধকার ভারত কিরূপ? দাসবৎ পরপদলেহী রাষ্ট্র, ইহার অপূর্ণ শক্তি পিঞ্জরাবদ্ধ; সহজভাবে নিঃশ্বাস লইতেও ভীত, দূরদেশাগত অপরিচিত বিদেশী কর্তৃক শাসিত; জনসাধারণের দারিদ্র্যের তুলনা নাই; ক্রীণজীবী, ব্যাধি ও মড়কের হস্ত হইতে আত্মরক্ষায় অক্ষম, নিরক্ষরতায় দেশপূর্ণ, বিস্তীর্ণ অঞ্চলে স্বাস্থ্যরক্ষা বা চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নাই, মধ্যশ্রেণী ও জনসাধারণের মধ্যে তুল্যরূপে বিশাল বেকার সমস্তা। আমরা গুনিয়াছি, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, কম্যুনিজম প্রভৃতি, কর্মকৌশলহীন আদর্শবাদীর বাধাবুলি, ইহারা তত্ত্বোপদেশক ও প্রচারক, সমগ্র জনসাধারণের কল্যাণই হইল আসল পরীক্ষা। অবশ্য উহাই পরীক্ষার সর্বোত্তম মাপকাঠি, কিন্তু ইহা দ্বারা পরিমাপ করিলে বর্তমান ভারত কত হীন, কত দরিদ্র। অগ্ন্যাগ্ন দেশে দুর্গতিমোচন ও বেকার সমস্তা দূর করিবার জন্য কত বড় বড় পরিকল্পনার কথা আমরা পাঠ করি, কিন্তু আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ বেকার ও চিরস্থায়ী দেশব্যাপী দুঃখদৈত্যের কি প্রতিকার হইয়াছে? অগ্ন্যাগ্ন দেশে দরিদ্রদের গৃহনিষ্কাশনের পরিকল্পনার বিষয় পাঠ করি; কিন্তু আমাদের দেশের লক্ষকোটি নরনারীর গৃহ বলিতে কি আছে? কতকগুলি মাটির খোঁয়াড় অথবা বৃক্ষতল! আমরা যেখানে ছিলাম; সেইখানেই আছি, অথবা শব্দকের মত মত্তরগতিতে অগ্রসর হইতেছি; অথচ অগ্ন্যাগ্ন দেশ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসার ব্যবস্থা, শিক্ষা সংস্কৃতির সুবিধা, পণ্য উৎপাদন সকল দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে; ইহা দেখিয়া কি দীর্ষ হয় না? রুশিয়া মাত্র বার বৎসরের মধ্যে তাহার বিশাল রাজ্য হইতে নিরক্ষরতাকে নির্মূলাসিত করিয়াছে; জনসাধারণের জীবনের সহিত সামঞ্জস্যময় এক অপূর্ণ অভিনব শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছে। অনগ্রসর তুরস্কও আতাতুর্ক কামালের নেতৃত্বে শিক্ষাপ্রচারের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। ফারিস্ত ইতালী সূচনা হইতেই বিপুল বলে নিরক্ষরতাকে আক্রমণ করিয়াছে। শিক্ষামন্ত্রী জেনটাইল জাতিকে ডাকিয়া বলিয়াছেন, “সম্মুখ যুদ্ধে অশিক্ষাকে আক্রমণ কর। এই

দুর্ভিত কৃত আমাদের জাতিদেহকে দুর্বল করিতেছে, তপ্ত লৌহ দ্বারা উহার উচ্ছেদ কর।” বৈঠকী আলোচনার পক্ষে অত্যন্ত অশোভনীয় ভাষা, কিন্তু এই চিন্তার পশ্চাতে রহিয়াছে, দৃঢ়বিশ্বাস এবং বলিষ্ঠ সঙ্কল্প। আমরা এক্ষেত্রে অতি ভদ্র এবং ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কথা বলি। আমাদের কর্তারা অত্যন্ত অবসন্নভাবে অগ্রসর হন এবং কমিশন ও কমিটিতে শক্তিক্ষয় করেন।

কথা বেশী বলে, কাজ করে কম, ভারতবাসীর এ বদনাম আছে। এ অভিযোগ সত্য। কিন্তু আমরাও দেখিয়া অবাক হই যে কমিটি ও কমিশন করিবার ক্ষমতা ব্রিটিশের কত অফুরান, কত পরিশ্রমের পর জ্ঞানগর্ভ রিপোর্ট রচিত হয়—“অতি মূল্যবান সরকারী দলিল”—যথাবিহিত প্রশংসাবাদের পর, তাহাও কি দপ্তরখানার কুলুঙ্গীতে প্রস্থপ্ত থাকে না? এই ভাবে আমরা অগ্রসর হইতেছি, উন্নতি লাভ করিতেছি ভাবিয়া পুলক অনুভব করি, অথচ যেখানে ছিলাম, সেইখানে থাকার সুবিধাও পাই। আমাদের আত্মমগ্ন্যাদা বোধ তৃপ্ত হয়, কায়েমী স্বার্থ নিরাপদ থাকে। অগ্ন্যাত্ম দেশ চিন্তা করে, আমরা কেমন করিয়া অগ্রসর হইব, আর আমরা চিন্তা করি, অগ্রগতি যাহাতে দ্রুত না হয়, সেজ্ঞা বাধন কষণ ও রক্ষাকবচ আবশ্যক। জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটি বলিয়াছেন, মোগল আমলে “সাম্রাজ্যের জাঁকজমকই জনসাধারণের দারিদ্র্যের পরিমাপক হইয়া পড়িয়াছিল।” এই অভিমত সত্য। চিন্তায় আমরা আজিও কি ঐ মাপকাঠি প্রয়োগ করিতে পারি না? নয়াদিল্লীর অগ্গকার বড়লাটের জাঁকজমক শোভাযাত্রা এবং প্রাদেশিক গভর্নমেন্টগণের আড়ম্বর ও সমারোহ কি? এ সকলের পশ্চাতে রহিয়াছে অতি দীন ভয়াবহ দারিদ্র্য। ইহার বিরুদ্ধেই চিত্ত আহত হয়। হৃদয়বান মানুষ ইহা কেমন করিয়া সহ্য করেন, বুঝিয়া উঠা কঠিন। সম্মুখে সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্যের ঔজ্জ্বল্যের পশ্চাতে অগ্গকার ভারতবর্ষ দরিদ্র ও নিরানন্দ। বাহিরে অনেকখানি চুণকাম ও বাহ্য চাকচিক্যের পশ্চাতে বর্তমান অবস্থায় দুর্ভাগা নিম্নতর বুদ্ধোন্মাদা শ্রেণী দলিত হইতেছে। তাহার পশ্চাতে শ্রমিক শ্রেণী দারিদ্র্যপিষ্ট হইয়া দুঃখময় জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে। তারপর আছে ভারতবর্ষের প্রতীকরূপী কৃষক সম্প্রদায়—যাহাদের ভাগ্যে দুঃখ নিশা আর প্রভাত হয় না।

“শতাব্দীচয়ের দুর্বল ভারে সে বন্ধ-বন্ধনও হইয়া নিড়ানি হস্তে ভূমি নিবন্ধ দৃষ্টি, তাহার মুখে যুগ যুগান্তরের শূন্যতা, তাহার পৃষ্ঠে জগতের দুর্বল ভার।”...

“এই ভয়াবহ দৃশ্যের মধ্যে যুগ যুগান্তের দুঃখের প্রতিচ্ছবি। সেই বেদনাতুর আনমিত মূর্তির মধ্যে কালের বিয়োগান্তক দৃশ্য। এই ভয়াবহ

ব্রিটিশ শাসনের বিবরণ

মূর্তির মধ্য দিয়া কৃতজ্ঞতায় আহত, লুপ্তিত, কলুষিত এবং অধিকার হস্তিত
মহুশত্ব আর্ন্ত ক্রন্দনে, যে শক্তিসমূহ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার প্রতিবাদ
করিতেছে—ইহা প্রতিবাদও বটে, ভবিষ্যদ্বাণীও বটে !”*

ভারতের সর্ববিধ দুর্ভাগ্যের দ্রষ্টা ব্রিটিশকে দোষী করা বৃথা।
দায়িত্ব আমাদিগকেও বহন করিতে হইবে—আমাদের সঙ্কুচিত হওয়া
উচিত নয়, আমাদের নিজস্ব দৌর্বল্যের অনিবার্য পরিণামের জন্য
অপরকে দোষী সাব্যস্ত করা অশোভনীয়। প্রভুত্বপ্রবণ পদ্ধতির গভর্ণমেন্ট
বিশেষতঃ যাহা বৈদেশিক, তাহা নিশ্চয়ই দাস মনোভাব বৃদ্ধির উৎসাহ
দেয় এবং জনসাধারণের মানসিক দৃষ্টির সীমা সঙ্কুচিত করিতে চেষ্টা করে।
ইহা যুবকদের মধ্যে যাহা কিছু স্বন্দর ও মহান পিষিয়া কলে—
দুঃসাহসিক উত্তম, হৃদয়ভেরু সন্ধানের আগ্রহ, মৌলিকতা ও তেজস্বিতা
বিনষ্ট করিতে চায়; এবং ভীকু কাপুরুষতা, কঠোর নিয়মালুবর্তিতা,
খোসামোদ করিয়া প্রভুর মনোরঞ্জন চেষ্টা প্রভৃতিতে উৎসাহ দেয়।
এই প্রকার শাসন-পদ্ধতি কখনও প্রকৃত সেবার মনোবৃত্তি উদ্বোধিত
করিতে পারে না; জনসেবা বা আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জাগাইতে পারে
না। ইহা এমন সব লোক বাছিয়া লয়, যাহাদের মধ্যে পরার্থপর তেজ
বীৰ্য্য নাই, যাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, জীবনযাত্রা নির্বাহ করা। ভারতে
কোন্ প্রেণীর লোককে ব্রিটিশ তাহাদের দলে টানিয়া লন, আমরা
নিতাই দেখিতে পাই। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বুদ্ধিমান এবং ভাল
কাজ করিতে সক্ষম। অগ্রত্ব সুযোগ সুবিধার অভাবে ইহাবা সরকারী
বা আধা-সরকারী চাকুরী গ্রহণ করে এবং ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া এক
বৃহৎ যন্ত্রের অংশরূপে পরিণত হয়? বৈচিত্র্যহীন বাধা ধরা দৈনন্দিন
কর্মের মধ্যে তাহাদের মন বন্দী হইয়া পড়ে। “কেরাণীগিরির উপযোগী
জ্ঞান এবং আফিস চালাইবার কুটনীতি” রূপ আমলাতান্ত্রিক গুণাবলী
তাহারা আয়ত্ত করিয়া লয়। বড়জোর জনসাধারণের কার্যে তাহাদের
এক নিষ্ক্রিয় নিষ্ঠা দেখা যায়। জলন্ত উৎসাহ সেখানে নাই, হইতেও
পারে না—বিদেশী গভর্ণমেন্টের অধীনে তাহা সম্ভবও নহে।

ইহা ছাড়া, ক্ষুদ্র কর্মচারীদের অধিকাংশই মোটেই প্রশংসার যোগ্য
নহে। তাহারা কেবল শিথিয়াছে, উপরওয়ালাদের হীনভাবে তোষামোদ
করিতে এবং তাহাদের নিম্নপদস্থদের প্রতি ভীতি প্রদর্শনমূলক তর্জ্জন গর্জ্জন

* আমেরিকান কবি ই. মার্খামের “দি ম্যান ইইথ দি হো” নামক কবিতা
হইতে উদ্ধৃত।

করিতে। অপরাধ অবশ্য তাহাদের নহে। প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যেই তাহারা এই শিক্ষা পায়। এবং এই অবস্থায় যে তোষামোদী ও পক্ষপাতিত্ব প্রবল হইবে, যেমন হইয়া থাকে, তাহা কি খুব বেশী আশ্চর্যের? তাহাদের চাকুরীর কোন আদর্শ নাই, বেকার হইবার ভয় এবং তাহার ফল স্বরূপ উপবাস বিভীষিকার মত তাহাদের মনে জাগিয়া থাকে এবং তাহাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য, সর্বপ্রযত্নে চাকুরীতে লাগিয়া থাকা এবং আত্মীয় ও বন্ধুগণের জন্ত অল্প চাকুরী সংগ্রহ করিয়া দেওয়া। তাহাদের পশ্চাতে গোয়েন্দা এবং অতি ঘৃণ্যজীবী গুপ্তচর অহরহঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সেখানে লোকের মধ্যে বাহ্যনীয় সঙ্গুণের বিকাশ সহজ নয়।

আধুনিক ঘটনাবলীর পরিণতির ফলে হৃদয়বান পরার্থপর ব্যক্তিদের পক্ষে গভর্নমেন্টের চাকুরীতে যোগদান করা অধিকতর কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। গভর্নমেন্টও তাঁহাদিগকে চাহেন না এবং তাঁহারাও অর্থনৈতিক কারণে বাধ্য না হইলে গভর্নমেন্টের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে যাইতে ইচ্ছা করেন না।

কিন্তু সমস্ত জগৎ জানে যে, বাদামী রঙের লোকেরা নহে, খেতাজ লোকেরাই সাম্রাজ্যের ভার বহন করিতেছেন। আমাদের দেশে সাম্রাজ্যের পারম্পর্য্য রক্ষা করিবার জন্ত বহুতর ইম্পিরিয়াল সার্ভিস আছে। তাহাদের বিশেষ সুবিধা রক্ষার জন্ত প্রয়োজন মত রক্ষাকবচের ব্যবস্থাও আছে এবং কথিত হয়, এই সকলই নাকি ভারতের স্বার্থের জন্ত। এই সকল চাকুরীর উন্নতি ও স্বার্থের সহিত ভারতের কল্যাণও যেন একত্রে গ্রথিত। ভারতীয় ‘সিভিল সার্ভিস’-এর কোন সুবিধা অথবা পুরস্কার স্বরূপ কোন পদ যদি না দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমরা শুনি যে, তাহার ফলে অযোগ্যতা ও হীনতা বৃদ্ধি পাইবে। ভারতীয় ‘মেডিক্যাল সার্ভিস’-এর স্বরক্ষিত চাকুরীগুলির সংখ্যা যদি কমান হয়, তবে নাকি তাহা “ভারতের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক”। যদি সৈন্য বিভাগে ব্রিটিশ কর্মচারী কমান হইবার কথা উঠে, তাহা হইলে আমরা যে সর্ববিধ ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন হইব, ইহা বলাই বাহুল্য।

যদি উচ্চকর্মচারীরা সহসা চলিয়া যান, এবং তাহাদের বিভাগগুলির ভাগ নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের হস্তে অপিত হয়, তাহা হইলে যোগ্যতা ও কুশলতার অপহৃব ঘটবে; আমার মতে এই কথার মধ্যে কিছু সত্য আছে। কিন্তু সমস্ত পদ্ধতি এমনভাবে গঠন করা হইয়াছে যে, অধীনস্থ কর্মচারীরা কোনরূপেই সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি নহেন অথবা তাহাদিগকে

ব্রিটিশ শাসনের বিবরণ

দায়িত্ব বহন করিবার কোন শিক্ষাও দেওয়া হয় নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভারতে উপযুক্ত ব্যক্তির অভাব নাই এবং যথাযোগ্য উপায় অবলম্বন করিলে অল্পদিনের মধ্যেই তাহা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহার অর্থ, আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন অর্থাৎ এক নতুন রাষ্ট্রতাই। এই অবস্থার মধ্যে আমরা গুনিয়াছি যে, নিয়মতান্ত্রিক যন্ত্রের যে কোন পরিবর্তনই হউক না কেন, আমাদের হস্তাকর্ত্ত-বিধাতা স্বরূপ বড় বড় বিভাগীয় চাকুরীগুলির কাঠামো পূর্বের মতই থাকিবে। গভর্নমেন্টের পবিত্র রহস্তের একমাত্র নিগূঢ় বেড়া ও শিক্ষা-দাতারূপে তাহারা সরকারী মন্দির পাহারা দিবেন এবং ইতর সাধারণকে সেই পবিত্র প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে বাধা দিবেন। ক্রমশঃ আমরা ঐ সুবিধার উপযোগী হইব, তাহারা একের পর আর আবরণ মোচন করিবেন, অবশেষে, কোন এক সুদূর ভবিষ্য যুগে, যাহা পবিত্র হইতে পবিত্রতর, আমাদের বিস্মিত ও শ্রদ্ধালু দৃষ্টির সম্মুখে তাহার আবরণ উন্মোচিত হইবে।

সর্ববিধ ইম্পিরিয়াল সাভিসের মধ্যে ভারতীয় সিভিল সাভিসের স্থান সকলের উর্দ্ধে এবং ভারত গভর্নমেন্ট পরিচালনের নিন্দা বা প্রশংসার অধিকাংশই ইহাদের। এই সিভিল সাভিসের বহুতর গুণাবলী অহরহঃ পরিকীৰ্ত্তিত হয় এবং সাম্রাজ্যিক পরিকল্পনার মধ্যে ইহার মহত্ব এক নীতিবাক্যে পরিণত হইয়াছে। ভারতে ইহার অবিসম্বাদী প্রভুত্ব, ইহার স্বেচ্ছাচারী শক্তি এবং যে অপরিমিত প্রশংসা-বাক্য ও উৎসাহ-বাণী ইহার উপর বর্ষিত হয়, তাহা কখনই ব্যক্তির বা শ্রেণীর মানসিক স্বৈর্য্য ও স্বাস্থ্যের অনুকূল হইতে পারে না। এই সাভিসের প্রতি আমার শ্রদ্ধা সত্ত্বেও আমার আশঙ্কা হয় যে, কি ব্যক্তিগত, কি শ্রেণীগতভাবে ইহাদের সেই প্রাচীন অথচ ক্রিয়পরিমাণে আধুনিক ব্যাধি—মানসিক বিকৃতি (Paranoia) দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা অত্যধিক।

আই, সি, এস-এর গুণাবলী অস্বীকার করা কঠিন; আমাদের কাছে কিছুতেই উহা ভুলিতে দেওয়া হয় না। সিভিল সাভিসের জন্ম যে পরিমাণ প্রশংসা ও করতালিধ্বনি করা হয়, তাহাতে আমার মনে হয়, মাঝে মাঝে বিরূপ করতালিও আবশ্যক। আমেরিকান অর্থনীতিজ্ঞ ভেবলেন, সুবিধাভোগী শ্রেণীগুলিকে বলিয়াছেন, “রক্ষিতাশ্রেণী।” আমার মতে আই, সি, এস ও অন্যান্য ইম্পিরিয়াল সাভিসকেও “রক্ষিতাশ্রেণী” বলিয়া অভিহিত করিলে সত্য কথাই বলা হইবে। ইহার অত্যন্ত ব্যয়বহুল বিলাস।

জওহরলাল নেহরু

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ভূতপূর্ব সদস্য এবং ভারতীয় সমস্ত সম্পর্কে কোতূহলী মেজর ডি, গ্রেহাম পোল, কিছুদিন পূর্বে “মডার্ন রিভিউ” পত্রে লিখিয়া ছিলেন, “সিভিল সার্ভিসের যোগ্যতা ও কুশলতা সম্পর্কে কেহ কখনও কোন প্রশ্ন তুলে নাই।” এই শ্রেণীর কথা ইংলণ্ডে প্রায়ই প্রচার করা হয় এবং লোকে বিশ্বাসও করে। অতএব ইহার সত্যতা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক। এই প্রকার সৃষ্টি ও নিশ্চিত বিবৃতি প্রদান নিরাপদ নহে, কেন না সহজেই ইহা যে অমূলক তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। ঐ শ্রেণীর বিবৃতির কখনও প্রতিবাদ হয় নাই, ইহা কল্পনা করিয়া গ্রেহাম পোল অত্যন্ত ভুল করিয়াছেন। দীর্ঘকাল হইতেই ঐ শ্রেণীর অত্যুক্তির প্রতিবাদ হইয়া আসিতেছে, এমন কি, মিঃ জি, কে গোথলে পর্যন্ত সিভিল সার্ভিস সম্পর্কে অনেক কঠোর উক্তি করিয়াছিলেন। কংগ্রেসপন্থী ইউন আর নাই ইউন, সাধারণ ভারতবাসী এ বিষয় লইয়া মেজর গ্রেহাম পোলের সহিত নিশ্চয়ই আলোচনা করিতে পারেন। হয় ত উভয় পক্ষই আংশিকভাবে সত্য এবং সম্পূর্ণ পৃথক গুণ ও যোগ্যতার কথা ভাবিয়াছেন। যোগ্যতা ও কুশলতা কিসের? ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং এই দেশ শোষণে সহায়তা করা, এই দিক হইতে যদি যোগ্যতা ও কুশলতা বিচার করা যায়, তাহা হইলে সিভিল সার্ভিস নিশ্চয়ই প্রশংসার দাবী করিতে পারেন। ভারতীয় জনসাধারণের কল্যাণের দিক হইতে বিচার করিলে বলিতে হয়, তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থকাম হইয়াছেন। তাঁহারা যে জনসাধারণের সেবক, এবং যাহারা তাঁহাদের বেতন, ভাতা ও অগ্রাণু আরামের উপকরণ যোগায়, তাহাদের সহিত উপার্জন ও জীবনযাত্রাপ্রণালীর বিপুল ব্যবধানই তাঁহাদের ব্যর্থতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

অবশ্য ইহা সত্য যে সিভিল সার্ভিস মোটের উপর একটা ধারা বজায় রাখিয়া চলিয়াছেন, এবং ইহার আদর্শ অত্যন্ত মাঝারীগোছের; তবে দুইএকজন শক্তিশালী কদাচিৎ দেখা যায়। ভাল ও মন্দ লইয়া ইহা ব্রিটিশ পার্লিক স্কুলের ভাবে অনুপ্রাণিত (যদিও অনেক সিভিলিয়ান পার্লিক স্কুলের ছাত্র নহেন)। একটা সাধারণ আদর্শের একের মাপকাঠির কেহ বাহিরে গেলে, তাহার জন্ম অত্যন্ত বিরাগ প্রকাশ হয়, ব্যক্তিগত কোন বিশেষ যোগ্যতা থাকিলেও তাহা দৈনন্দিন নীরস কর্মের মধ্যে তলাইয়া যায়; সাধারণ ধারা হইতে পৃথক প্রতিভাত হইবার ভয়ও আছে। অনেক আগ্রহশীল ব্যক্তির সেবার অনুরাগ আছে; কিন্তু সে সেবা মুখাতঃ সাম্রাজ্যের সেবা, ভারতের কথা পরে। ইহাদের শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক

ব্রিটিশ শাসনের বিবরণ

অবস্থা একরূপ যে তাঁহারা একরূপ না করিয়া পারেন না। তাঁহারা সংখ্যায় অল্প, বিদেশী এবং প্রায়শঃই বন্ধুভাবাপন্ন নহে এমন জনসাধারণের আবেষ্টনীর মধ্যে তাঁহারা পরম্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ থাকিয়া একটা সাধারণ ধারা বজায় রাখিয়া চলেন। পদগৌরব ও জাতিগত মর্যাদাবোধও ইহার পশ্চাতে আছে। তাঁহাদের হাতে অপরিমিত স্বৈচ্ছাচারী ক্ষমতা আছে বলিয়া, তাঁহারা সর্ববিধ সমালোচনায় ত্রুদ্ধ হন এবং উহা এক প্রধান পাপ বলিয়া মনে করেন। তাহারা ক্রমে অসহিষ্ণু গুরুমহাশয় হইয়া পড়েন এবং দায়িত্বহীন শাসকস্বলভ নানাদোষ তাঁহাদের মধ্যে দেখা যায়। তাঁহারা আত্মতৃপ্ত, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, সন্ধীর্ণচেতা ও কৃপমণ্ডিত। এই পরিবর্তনশীল জগতে তাঁহারা চিরস্থির এবং উন্নতিশীল পারিপাশ্বিক অবস্থার অনুপযোগী। যখন তাঁহাদের অপেক্ষাও যোগ্য ও উদারহৃদয় ব্যক্তিরা ভারতীয় সমস্তায় হস্তক্ষেপ করেন, তখন তাঁহারা ত্রুদ্ধ হন, নানা আপত্তিকর বিশেষণে অভিহিত করিয়া তাঁহাদের দমন করেন এবং তাঁহাদের পথে নানাবিধ বিঘ্ন উপস্থিত করেন। মহাযুদ্ধের পর অভূতপূর্ব পরিবর্তনের গতিবেগের মধ্যে তাঁহারা দিশাহারা হইয়াছিলেন, এবং সেই অবস্থার সহিত নিজেদের সামঞ্জস্যবিধান করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের সীমাবদ্ধ বাধাধরা শিক্ষা এই অভিনব অবস্থা এবং সঙ্কটের সময় কোন কাজেই আসিল না। দীর্ঘকালের দায়িত্বজ্ঞানহীনতায় তাঁহাদের স্বভাব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। দল বা শ্রেণী হিসাবে তাঁহাদের হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা রহিয়াছে; তাঁহারা নামে মাত্র ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণের অধীন। “ক্ষমতা চরিত্রভ্রষ্টতা আনে”—লর্ড একটন বলিয়াছেন—“নিরঙ্কুশ ক্ষমতা চরিত্রভ্রষ্টতাকেও পূর্ণতা দান করে।”

মোটের উপর তাঁহারা সীমাবদ্ধভাবেও নির্ভরযোগ্য কর্মচারী, খুব কৃতিত্ব না দেখাইলেও দৈনন্দিন কর্ম বেশ যোগ্যতার সহিত চালাইতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি একরূপ যে, অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটিলেই তাঁহারা বিহ্বল হইয়া পড়েন; তবে তাঁহাদের আত্মবিশ্বাস, প্রশাসনিক কার্য করিবার অভ্যাস এবং শ্রেণীগত শৃঙ্খলাবদ্ধতার বলে তাঁহারা আশু বিঘ্নগুলি অতিক্রম করেন। বিখ্যাত মেসোপোটামিয়ার গোলমালে ব্রিটিশ ভারতীয় গভর্নমেন্টের অযোগ্যতা ও “নিপ্রাণ জড়ত্ব” প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু অল্পকাল অনেক অক্ষমতার কথা চাপা পড়িয়া থাকে। নিরুপদ্রব প্রতিরোধেও তাঁহাদের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত স্থূল। গুলি করিয়া, মৃগুর মারিয়া প্রতিপক্ষকে ক্ষণকালের জন্ত নিরস্ত করা যায়, কিন্তু তাহাতে সমস্কার সমাধান হয় না, এবং যে শ্রেষ্ঠত্বাভিমান তাঁহারা রক্ষা

জওহরলাল নেহরু

করিতে চাহেন, উহাতে তাহারই ভিত্তি শিথিল হয়। ক্রমবদ্ধিত ও আক্রমণশীল জাতীয় আন্দোলনকে দমন করিবার জন্ত তাঁহারা যে হিংসানীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। ইহা অপরিহার্য্য কেন না সাম্রাজ্যই বাহুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ঐ উপায় ছাড়া অন্য কোন ভাবে প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হইতে তাঁহারা শিক্ষালাভ করেন নাই। কিন্তু অতিরিক্ত ও অনাবশ্যক বলপ্রয়োগ হইতে বুঝা গিয়াছে যে সমস্তা আয়ত্তের মধ্যে রাখিবার শক্তি আর তাঁহাদের নাই; এবং সাধারণ অবস্থায় যে আত্মসংযম ও সহনশীলতা তাঁহাদের ছিল বলিয়া অনুমিত হইত, তাহাও আর নাই। স্নায়ুপুঞ্জ প্রায়ই বিক্ষিপ্ত হইত এবং তাঁহাদের সাধারণ বক্তৃতাতেও বিকারক্ষিপ্ত উত্তেজনার আভাষ পাওয়া যাইত। সঙ্কট অতি নিষ্ঠুরভাবে আমাদের আভ্যন্তরীণ দৌর্ব্বল্যগুলি প্রকাশ করিয়া দেয়। নিরুপদ্রব প্রতিরোধনীতি তেমনই একটা সঙ্কট ও পরীক্ষা এবং দুই পক্ষের—কংগ্রেস ও গভর্ণমেন্ট—অতি অল্পলোকই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সঙ্কটের দিনে প্রথম শ্রেণীর মেরুদণ্ড অতি অল্পসংখ্যক নরনারীর মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। মিঃ লয়েড জর্জ বলিয়াছেন, “সঙ্কটের দিনে অবশিষ্ট ব্যক্তিদের গণনার মধ্যেই আনা উচিত নহে। সাধারণ অবস্থায় যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতপিণ্ড সমুদ্রতীরে বলিয়া মনে হয়, বহু আশিলে সেগুলি ডুবিয়া যায়,—কেবল সর্ব্বোচ্চ শিখরগুলি জলের উপরে মাথা তুলিয়া থাকে।”

যাহা ঘটিয়াছে, তাহার জন্ত মিভিলিয়ানগণের মন বুদ্ধি ও হৃদয় প্রস্তুত ছিল না। ইহাদের অধিকাংশই প্রাচীন শিক্ষা প্রণালী হইতে মজ্জিত রুচি সংস্কৃতি ও চরিত্রমাধুর্য্য আহরণ করিয়াছেন। ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রাচীন জগতের, ভিক্টোরিয়াযুগের উপযোগী; কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে উহার কোন সার্থকতা নাই। তাঁহারা সঙ্গীর্ণ, সীমাবদ্ধ এক নিজস্ব জগতে বাস করেন—এংলো-ইণ্ডিয়া—যাহা ইংলণ্ডও নহে, ভারত নহে। সমসাময়িক সমাজে যে সকল শক্তি কার্য্য করিতেছে, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। নিজেদের ভারতীয় জনসাধারণের অভিভাবক ও অধিরূপে জাহীর করিবার হাঙ্গর ভঙ্গী সত্ত্বেও, তাঁহারা জনসাধারণকে অল্পই জানেন এবং নূতন আক্রমণশীল বুদ্ধেয়া শ্রেণীকে আরও কম জানেন। তাঁহারা মোসাহেব ও চাকুরীর উমেদারদের দেখিয়া ভারতবাসীকে বিচার করেন,—অগ্ন্যাগ্ন সকলকে হয় আন্দোলনকারী “এজিটেটর”, নয় প্রবঞ্চক জ্ঞানে উপেক্ষা করেন। মহাযুদ্ধের পর যে সকল পরিবর্ত্তন,—বিশেষভাবে অর্থনীতিক্ষেত্রে যাহা ঘটিয়াছে, সে সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান অতি অল্প এবং তাঁহারা চির অভ্যস্ত পথচিহ্নের সহিত এমনভাবেই আটকাইয়া গিয়াছেন যে, পরিবর্ত্তিত ধারার

ব্রিটিশ শাসনের বিবরণ

সহিত নিজেদের সামঞ্জস্য বিধান করা তাঁহাদের পক্ষে কঠিন। তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, তাহারা যে ব্যবস্থা চালাইতেছেন, বর্তমান অবস্থায় তাহার দিন ফুরাইয়াছে এবং শ্রেণী হিসাবে তাঁহারা টি, এস এলিয়টের “দি হলো মেনে” বর্ণিত চরিত্রের প্রতীক হইয়া পড়িতেছেন।

তথাপি যতদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আছে, ততদিন এই ব্যবস্থা চলিবে এবং এখনও ইহার যথেষ্ট শক্তি আছে, ইহার পশ্চাতে যোগ্য ও কুশলকর্মা নেতৃমণ্ডলী রহিয়াছেন। ভারতে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট পোকাধরা দাঁতের মত, তবে এখনও ইহা মাড়ীর সহিত শক্ত করিয়া লাগিয়া আছে। ইহা বেদনাদায়ক, তবে সহজে তুলিয়া ফেলিবার উপায় নাই। যতদিন না ইহা তুলিয়া ফেলা যায়, অথবা আপনা হইতে খসিয়া না পড়ে, ততদিন এই বেদনা চলিতে থাকিবে এবং বাড়িতেও পারে।

এমন কি ইংলণ্ডেও পার্বিক স্কুলে শিক্ষিত শ্রেণীর স্ত্রীদিগ চলিয়া গিয়াছে; সাধারণকার্যে এখনও তাহাদের কিছু প্রাধান্য থাকিলেও পূর্বের প্রভাব প্রতিপত্তি আর নাই। ইহার ভারতের পক্ষে অধিকতর অনুপযোগী; স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় উন্মুখ জাতীয়তাবাদের সহিত ইহার সহযোগিতা বা সামঞ্জস্যবিধান অসম্ভব; যাহারা সামাজিক পরিবর্তনপ্রয়াসী হইয়া কৰ্ম করিতেছেন, তাঁহাদের সহিত ত নহেই।

অবশ্য সিভিল সার্ভিসে অনেক ইংরাজ ও ভারতীয় ভাল লোক আছেন, কিন্তু যতদিন বর্তমান ব্যবস্থা থাকিবে ততদিন তাঁহাদের সদিচ্ছা এমন সমস্ত বিষয়ে নিযুক্ত হইবে, যাহার সহিত জনসাধারণের কল্যাণের কোন যোগ নাই। অনেক ভারতীয় সিভিলিয়ন বিলাতী পাবলিক স্কুলের ভাবে এতই অনুপ্রাণিত যে, “ইহাদের রাজভক্তি, স্বয়ং রাজা হইতেও অধিক।” একবার এক ভারতীয় যুবক সিভিলিয়নের সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল; তাঁহার নিজের সম্বন্ধে ধারণা এত উচ্চ যে হুর্ভাগ্যক্রমে আমি তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি নাই। তিনি সিভিল সার্ভিসের বহু সদৃশ বর্ণনা করিলেন; অবশেষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্কুলে এই অখণ্ডনীয় যুক্তি দেখাইলেন যে, ইহা কি অতীতের রোমসাম্রাজ্য অথবা চেক্সিস থা বা তৈমুরের সাম্রাজ্য অপেক্ষা ভাল নহে ?

সিভিলিয়নগণের ধারণা তাঁহারা অতিশয় যোগ্যতার সহিত তাঁহাদের কর্তব্য পালন করেন, অতএব তাঁহাদের দাবীগুলি তাঁহারা জোরের সহিতই প্রকাশ করিতে পারেন এবং তাঁহাদের নানাবিধ দাবীর অন্ত নাই। ভারতবর্ষ দরিদ্র, সেজন্ত তাহার সমাজব্যবস্থা, বেনিয়া ও কুশীদজীবীরা দায়ী, সর্বোপরি তাহার জনসংখ্যা অপরিমিত। কিন্তু ভারতে সকল

জওহরলাল নেহরু

বেনিয়ার শ্রেষ্ঠ বেনিয়া যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট, নিজেদের সুবিধার জন্য সে কথা উল্লেখ করা হয় না। আমি জানি না এই বিরাট জনসংখ্যা তাঁহারা কি ভাবে কমাইবেন। উচ্চতর মৃত্যুর হার সঙ্কেত এবং দুর্ভিক্ষ ও সংক্রামক ব্যাধির নিকট অনেক সাহায্য পাওয়া গেলেও, জনসংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব করা হইয়া থাকে, আমি স্বয়ং এ বিষয়ের জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারের পক্ষপাতী। কিন্তু এই উপায় অবলম্বন করিতে হইলে জনসাধারণের জীবনযাত্রা প্রণালী উন্নত হওয়া আবশ্যক, সাধারণ শিক্ষার উন্নতি আবশ্যক এবং দেশের সর্বত্র অসংখ্য ‘ক্লিনিক’ প্রতিষ্ঠা করা উচিত। বর্তমান অবস্থায় জন্মনিয়ন্ত্রণের উপায়গুলি গ্রহণ করা জনসাধারণের ক্ষমতা ও আয়ত্তের বাহিরে। মধ্যশ্রেণী ইহার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে এবং আমার বিশ্বাস তাহারা ইহা অধিকতর ভাবে গ্রহণ করিতেছে।

অতিরিক্ত জনসংখ্যার যুক্তি যে অসার তাহার অনেক প্রমাণ আছে। জগতের সম্মুখে আজ খাদ্যাভাব বা প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভারের অভাব সমস্তা নহে; সমস্তা এই যে কাহারো খাইবে পরিবে, অল্প কথায় বলিলে বলিতে হয়, যাহাদের প্রয়োজন তাহাদের খাওয়াই কিনিবার সামর্থ্য নাই। স্বতন্ত্র করিয়া দেখিলে, ভারতেও খাদ্যাভাব নাই, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন খাদ্যশস্যের পরিমাণও বাড়িয়াছে এবং এই হারে বাড়িবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। বহু ঘোষিত ভারতের বর্তমান জনসংখ্যার (গত ১৯২১-৩১ ছাড়া) বৃদ্ধির অনুপাত অধিকাংশ পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষা অনেক কম। অবশ্য ভবিষ্যতে পার্থক্য হইবে, কেন না নানা কারণে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হ্রাস পাইতেছে, কোনস্থলে বা সমান রহিয়াছে। হয়ত শীঘ্রই ভারতেরও ঐ কারণগুলি দেখা দিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত করিবে।

ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হইবে, ইচ্ছামত নিজের নূতন জীবন গড়িতে পারিবে, তখন সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উৎকৃষ্টতম নরনারীর আবশ্যক হইবে। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষ সর্বত্রই দুর্লভ, ভারতে উহা সুদুর্লভ, কেন না ব্রিটিশ শাসনাধীনে আমাদের অনেক সুবিধাই নাই। সর্বজনীন কার্যের বিভিন্ন বিভাগে বিশেষতঃ যেখানে বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্রবিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞান আবশ্যক সেখানে বহু বৈদেশিক বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন আছে। সিভিল সাভিসে এবং অগ্রাগ্র ইম্পিরিয়াল সাভিসে অনেক ইংরাজ ও ভারতীয় আছেন, নূতন ব্যবস্থায় যাহাদের প্রয়োজন আছে এবং তাঁহারা আনন্দের সহিতই গৃহীত হইবেন। কিন্তু যতদিন সরকারী চাকুরী ও সাধারণ শাসন ব্যবস্থায় সিভিলিয়ন মনোবৃত্তি প্রবল থাকিবে, ততদিন কোন নূতন ব্যবস্থা গঠন করা

ব্রিটিশ শাসনের বিবরণ

সম্ভব হইবে না, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। প্রভুত্বের অহংমিকা সাম্রাজ্যবাদের মিত্র; উহা স্বাধীনতার সহিত পাশাপাশি থাকিতে পারে না। ইহা হয় স্বাধীনতাকে ধ্বংস করিবে নয় নিজে বিনষ্ট হইবে। কেবল একমাত্র রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় ইহার স্থান হইতে পারে, সে হইল ফাসিস্ত রাষ্ট্র। অতএব, কোন নূতন ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার পূর্বে সিভিল সার্ভিস বা অল্পরূপ সার্ভিসগুলি বর্তমানে যে আকারে আছে, তাহার বিলুপ্তি সর্বাগ্রে প্রয়োজন। ঐ সকল সার্ভিসের কোন কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছুক হন এবং নূতন চাকুরীর যোগ্য হন, তাঁহাদের দাদরে গ্রহণ করা হইবে কিন্তু তাঁহাদের নূতন সর্তে রাজী হইতে হইবে। বর্তমানে তাঁহারা যেরূপ উচ্চহারে বেতন ও ভাতা পাইতেছেন, তাহাই পাইতে থাকিবেন, ইহা অবশ্যই কল্পনাভীত। নবীন ভারত তাহার সেবার জন্য চাহে আগ্রহশীল ও কৃপাকর্মী সেবক, যাহাদের উদ্দেশ্যের উপর গভীর বিশ্বাস আছে, যাহারা সাফল্যের জন্য প্রাণপণ করিবে; যাহারা আনন্দ ও গৌরবের জন্য কার্য্য করিবে, উচ্চ বেতনের প্রলোভনে নহে। অর্থই একমাত্র লক্ষ্য, এই ধারণা যথাসম্ভব বর্গাইতে হইবে। বৈদেশিক সাহায্য বহুল পরিমাণে আবশ্যক হইবে, কিন্তু আমার ধারণা বিশেষ-শিক্ষাহীন সাধারণ সিভিলিয়ন শাসকশ্রেণী কোন প্রয়োজনেই লাগিবে না। ভারতে এরূপ লোকের অভাব হইবে না।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতীয় লিবারেল ও অল্পরূপ শ্রেণীর লোকেরা ভারত-গভর্নমেন্ট সম্পর্কে ব্রিটিশ মতবাদ কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। সার্ভিসগুলি সম্পর্কেই উহা বিশেষ প্রত্যক্ষ, তাঁহারা “ভারতীয় করণ” দাবী করেন কিন্তু রাষ্ট্রের কাঠামো বা সার্ভিসের মনোবৃত্তির আমূল পরিবর্তন দাবী করেন না। কিন্তু এই মূল বিষয়ে আপোষ করা কঠিন। কেন না স্বাধীনভারত হইতে কেবল যে ব্রিটিশ সামরিক ও শাসক শ্রেণীকে সরাইতে হইবে তাহা নহে, তাহাদের বেতন ভাতা ও স্ববিধা-গুলিকেও নীচে নামাইয়া আনিতে হইবে। এই শাসন-তন্ত্র নির্মাণের যুগে, রক্ষাকবচ সম্পর্কে অনেক কথাই শুনিতে পাওয়া যায়। যদি ঐ রক্ষাকবচগুলি ভারতীয় স্বার্থেরই অল্পকূল হয় তাহা হইলে অগ্ৰাণ্য বিষয়ের সহিত ইহাও স্পষ্ট করিয়া লওয়া উচিত যে, সিভিল সার্ভিস বা অল্পরূপ সার্ভিসগুলি বিলুপ্ত হইবে অর্থাৎ তাহাদের বর্তমান ক্ষমতা স্ববিধা এ সকল থাকিবে না এবং নূতন শাসনতন্ত্রের উপর তাহাদের কোন প্রভুত্ব থাকিবে না।

তথাকথিত দেশরক্ষামূলক সামরিক চাকুরীগুলি অধিকতর রহস্যময়

জওহরলাল নেহরু

ও জরবদস্ত। আমরা তাহাদের সমালোচনা করিব না, তাহাদের বিরুদ্ধে কিছু বলিব না, কেন না আমরা ও সব ব্যাপারের কি জানি? আমরা কেবল বিপুল ব্যয়ভার যোগাইয়া চলিব—কোন আপত্তি করিব না। কিছুদিন পূর্বে ১৯৩৪-এর সেপ্টেম্বর মাসে, ভারতের প্রধান সেনাপতি স্ত্র ফিলিপ শেট্টউড, সিমলায় রাষ্ট্রপরিষদে, ঝাঁজালো সামরিক ভাষায় ভারতীয় রাজনৈতিকদিগকে তাঁহার কাজে দৃষ্টি না দিয়া নিজের চরকায় তৈল দিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কোন প্রস্তাবের সংশোধনী প্রস্তাবের উত্থাপককে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, “তিনি এবং তাঁহার বন্ধুরা কি মনে করেন যে, বহু যুদ্ধের অভিজ্ঞ ও রণনিপুণ ব্রিটিশ জাতি যাহারা তরবারীবলে সাম্রাজ্য জয় করিয়াছে এবং তরবারীবলে তাহা রক্ষা করিতেছে,—তাহারা আরামকেদারাবিলাসী সমালোচকদের নিকট জাতিগত অভিজ্ঞতা ও রণ-পাণ্ডিত্য বিসর্জন দিবে...?” তিনি এইরূপ আরও অনেক ভাল ভাল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমরা যাহাতে এরূপ মনে না করি যে তিনি সাময়িক উত্তেজনায় ঐ শ্রেণীর কথা বলিয়াছেন, সেইজন্য তিনি পূর্ব হইতে যত্নসহকারে লিখিত পাণ্ডুলিপি হইতে তাঁহার বক্তৃতা পাঠ করেন।

একজন অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সামরিক বিষয় লইয়া প্রধান সেনাপতির সহিত তর্ক করা ধুষ্টতা সন্দেহ নাই, তথাপি আরামকেদারাবিলাসী সমালোচককে তিনি সম্ভবতঃ কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশ করিবার অনুমতি দিবেন। যাহারা তরবারীবলে সাম্রাজ্য রক্ষা করিতেছেন এবং যাহাদের মস্তকের উপর ঐ উজ্জ্বল অস্ত্র অহরহ উত্তত, তাহাদের উভয়ের স্বার্থের পার্থক্য বুঝা যায়। ভারতীয় সৈন্যদল দিয়া ভারতের স্বার্থরক্ষা করা যাইতে পারে, সাম্রাজ্যের কার্যেও তাহাদের নিয়োগ করা যাইতে পারে,—ঐ দুই স্বার্থের পার্থক্য, এমন কি পরস্পরবিরোধী হইলেও তাহা সম্ভব। মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতার পর যদি কোন খ্যাতনামা সেনাপতি অপরের হস্তক্ষেপ হইতে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করেন তাহা হইলে যে কোন রাজনৈতিক ও আরামকেদারাবিলাসী সমালোচকও নিশ্চয়ই আশ্চর্য হইবেন। তৎকালে তাঁহাদের অনেকাংশে অবাধ স্বাধীনতা ছিল; এবং যুদ্ধের বিবরণ হইতে দেখা যায় যে তাঁহারা প্রায় সর্বক্ষেত্রে, প্রত্যেক সৈন্যদলে ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়াছেন—ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, অষ্ট্রিয়ান, ইতালীয়ান, রাশিয়ান, সর্বত্র। বিখ্যাত ব্রিটিশ সামরিক ইতিহাস লেখক ও রণ-নীতি বিশারদ ক্যাপ্টেন লিডেল হার্ট, তাঁহার ‘মহাযুদ্ধের ইতিহাসে’ লিখিয়াছেন, যুদ্ধের কোন এক বিশেষ অবস্থায় সৈন্যদল শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছে,

ব্রিটিশ শাসনের বিবরণ

আর ব্রিটিশ সেনাপতিরা পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন।' জাতীয় সঙ্কটেও তাঁহাদের চিন্তা ও চেষ্টার ঐক্য সম্ভব হয় নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "মহাযুদ্ধ, আমাদের পুরুষসিংহের উপর বিশ্বাস, বীর পূজায় বিশ্বাস, তাঁহারা যে স্বতন্ত্র উপাদানে গঠিত এ বিশ্বাস ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছে। নৈতার প্রয়োজন আছে, সম্ভবতঃ অধিকতর প্রয়োজন আছে, কিন্তু আমরা যদি বুঝি যে তাঁহারাও সাধারণ মানুষ, তাহা হইলে তাঁহাদের নিকট অত্যধিক প্রত্যাশা করিব না বা তাঁহাদিগকে অতিরিক্ত বিশ্বাস করিব না।"

রাজনীতিক চূড়ামণি লয়েড্ জর্জ তাঁহার "সমরস্মৃতি"তে মহাযুদ্ধের সেনাপতি, নৌ-সেনাপতিদের অতি ভয়াবহ ভুল, অববেচনা ও ক্রটির কথা উল্লেখ করিয়াছেন; যাহার ফলে শত সহস্র লোক প্রাণ হারাইয়াছে। ইংলণ্ড ও তাহার মিত্রগণ যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছে, কিন্তু ইহা "শোণিত-সিক্তপদে টলিতে টলিতে জয় লাভ।" উচ্চতম কর্মচারীরা মৃত্যুর জীবন ও ঘটনা সংস্থান লইয়া বেপরোয়া ও নির্বুদ্ধিতার সহিত খেলা করিয়াছেন এবং যাহার ফলে ইংলণ্ড প্রায় ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়াছিল; কিন্তু শত্রুপক্ষেরও অহুরূপ মৃত্যুর ফলেই ইংলণ্ড ও তাহার মিত্রগণ রক্ষা পাইয়াছে। ইহা মহাযুদ্ধের আমলে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর নিজের কথা, তিনি লিখিয়াছেন, লর্ড জেলিকোর মাথায় কোন ভাব ঢুকাইতে হইলে তাঁহার খুলিতে অস্ত্রোপচার করিতে হইয়াছে, বিশেষ ভাবে অতিরিক্ত রক্তদলের প্রস্তাব তাঁহাকে গ্রহণ করাইতে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইয়াছিল। ফ্রেঞ্চ মার্শাল জোফ্রে সম্বন্ধে তিনি মনে করেন, তাঁহার প্রধান গুণ ছিল, তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক মুখমণ্ডল, যাহা শক্তির প্রেরণা দিত। "বিপদে পড়িয়া আর্ন্ত মানব সহজাত বুদ্ধি হইতে ইহার শরণ লইত। তাহারা এই ভুল ধারণা পোষণ করিত যে, বুদ্ধির স্থান (মগজে নহে) চিবুকে।"

কিন্তু মিঃ লয়েড্ জর্জ প্রধান অভিযোগ করিয়াছেন, ব্রিটিশ সমর-নায়ক প্রধান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল হেইগের বিরুদ্ধে। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, লর্ড হেইগের অসংযত অহমিকা এবং রাজনীতিক ও অত্যাচার ব্যক্তির কথায় ক্ষুণ্ণপন্থিতার দরুণ তিনি ব্রিটিশ-মন্ত্রীসভার নিকটও অনেক গুরুতর ঘটনা গোপন করিয়াছেন, এবং ফ্রান্সে ব্রিটিশ সৈন্যদলকে, অগ্রতম প্রধান অনর্থের মধ্যে লইয়া গিয়াছিলেন। বার্তা যখন তিনি চক্ষুর সম্মুখে স্পষ্ট দেখিতেছেন, তখনও অন্ধ জিদের বশবর্তী হইয়া তিনি পাসেনদেল ও কামব্রেইর ভয়াবহ কর্তৃত্ব ক্ষেত্রে কয়েক মাস ধরিয়া আক্রমণমূলক যুদ্ধ চলাইয়াছেন, তাহার ফলে সতর হাজার সামরিক

জওহরলাল নেহরু

কর্মচারী মৃত বা মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়াছে এবং চার লক্ষ সাহসী ব্রিটিশ সৈনিক প্রাণ হারাইয়াছে। মৃত্যুর পর আজ “অপরিচিত সৈনিক”এর স্মৃতিপূজা চলিতেছে, ভালকথা, কিন্তু যখন সে জীবিত ছিল তখন সে কোন সুবিবেচনা পায় নাই, তাহার জীবনের মূল্য কত তুচ্ছ ছিল।

রাজনীতিকরাও অগ্ন্যান্ত লোকের মতই ভুল করিয়া থাকেন, কিন্তু গণতন্ত্রী রাজনীতিককে ব্যক্তি ও ঘটনা লক্ষ্য করিতে হয়, বৃক্ষিতে হয়, সকলের কথা শুনিতে হয়, এবং তাঁহারা সাধারণতঃ নিজেদের ভুল বৃক্ষিয়া সংশোধনের চেষ্টাও করেন। কিন্তু সৈনিক স্বতন্ত্র আবহাওয়ায় বর্ধিত হয়, সেখানে প্রভুত্বের রাজত্ব, সমালোচনা সহ্য করা হয় না। কাজেই সে ভুল করিলে অপরে উপদেশ দিতে গেলে ক্রুদ্ধ হয়, এবং সে নিখুঁত ভাবে ভুল করিতে থাকে এবং জিদের সহিত তাহা আঁকড়াইয়া ধরে। মন ও মগজ অপেক্ষা তাহার নিকট চিবুকের গুরুত্ব অনেক বেশী। ভারতে আমাদের বিশেষ সুবিধা এই যে, এখানে আমরা ঐ দুইশ্রেণী হইতে এক দো-আঁশলা শ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছি, এখানে সাধারণ শাসকশ্রেণীও এক অর্দ্ধ-সামরিক প্রভুত্ব ও আত্মতৃপ্ত আবহাওয়ায় বর্ধিত হন এবং তাঁহারাও অনেকাংশে সৈনিকের চিবুক ও অগ্ন্যান্ত গুণাবলী অর্জন করেন।

আমরা শুনিয়াছি, সামরিক বিভাগের “ভারতীয় করণ” উৎসাহের সহিত চলিতেছে, আগামী ত্রিশ বৎসর কি আরও কিছুকাল পরে ভারতের রক্তক্ষেত্র একজন ভারতীয় জেনারেল আবির্ভূত হইবেন। সম্ভবতঃ একশত বৎসরের মধ্যেই এই ভারতীয়করণ অনেকটা অগ্রসর হইবে। কোন সন্দেহ উপস্থিত হইলে, ইংলণ্ড কেমন করিয়া দুই এক বৎসরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ সৈন্যদল গড়িয়া তুলিবে তাহা বিশ্বাসের সহিত ভাবিবার কথা। যদি ইহাতে আমাদের উপদেষ্টা ও শিক্ষকগণ থাকিত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তাহারা অধিকতর সতর্কতা ও সাবধানতার সহিত অগ্রসর হইত। সম্ভবতঃ সুশিক্ষিত সৈন্যদল প্রস্তুত হইবার পূর্বেই যুদ্ধ শেষ হইয়া যাইত। রাশিয়ান সোভিয়েট সৈন্যদলের কথাও মনে হয়, যেখানে কিছু ছিল না, বহু শত্রুপক্ষের সহিত পাল্লা দিয়া সেখানে যে বিপুল চতুরঙ্গ বাহিনী গঠিত হইয়াছে, বর্তমান জগতে তাহা সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি। দেখা যাইতেছে, তাহাদের “যুদ্ধ করিতে ক রিতে পাকা এবং রণ-বিশারদ” জেনারেল উপদেষ্টা ছিল না।

আমাদের দেশে দেরাডুনে একটি সামরিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

ব্রিটিশ শাসনের বিবরণ

এখানে ভদ্রলোকের ছেলেদের সামরিক কৰ্মচারীরূপে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। আমরা শুনিয়াছি, তাহারা নাকি কুচকাওয়াজে বেশ পটু এবং ভবিষ্যতে উৎকৃষ্ট সামরিক কৰ্মচারী হইবে। কিন্তু আমি সময় সময় বিস্মিত হইয়া ভাবি, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যতীত ইহার মূল্য কি? আজকাল পদাতিক বা অশ্বারোহী সৈন্যদলের, সোমান গুরুভার তরবারীধারী সৈন্যবৃহের মতই অবস্থা এবং রাইফেল তীরধনুক অপেক্ষা একটু ভাল; কেন না এগুন যুদ্ধ হইবে আকাশে, বিষবাস্প পূর্ণ বোমা, ট্যাঙ্ক এবং শক্তিশালী কামান দিয়া। তাহাদের শিক্ষক ও উপদেষ্টাদের এ ধারণা আছে যন্দেহ নাই।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাস কি? যাহা আমাদের নিজেদের দুর্বলতার জগুই ঘটয়াছে, তাহার দোষ ত্রুটি লইয়া অভিযোগ করিবার আমরা কে? যদি আমরা পরিবর্তনের ধারার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া বন্ধ জলায় আটাইয়া পড়ি এবং উটপাখীর মত বালুকায় মাথা গুঁজিয়া ঘটনা না দেখি, তাহাতে আমাদেরই বিপদ। জগতের নূতন প্রাণবন্ত্যর তরঙ্গশীর্ষে ভাসিয়া ব্রিটিশ আমাদের নিকট আসিয়াছিল, ঐতিহাসিক শক্তিপুঞ্জের সে কি প্রবল রূপ, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারে নাই। শীতের তুহিনস্পর্শ বায়ুর বিরুদ্ধে আমরা কি অভিযান করিব? আইস আমরা অতীত এবং তাহার কলহ কোলাহল ছাড়িয়া ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করি। আমরা নিশ্চয়ই ইংরাজের নিকট কৃতজ্ঞ হইব। কেন না তাহাদের হাত হইতেই আমরা এক মহৎ দান পাইয়াছি—সে দান বিজ্ঞান এবং তাহার নব নব মূল্যবান আবিষ্কিয়া। অবশ্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যেভাবে ভারতে ভেদ, সংস্কারবিরোধিতা, প্রগতিবিরোধিতা, সাম্প্রদায়িকতা ও স্ববিধাবাদকে উৎসাহ ও প্রদ্রব্য দিতেছেন, তাহা বিস্মৃত হওয়া বা শাস্তভাবে নিরীক্ষণ করা কঠিন। সম্ভবতঃ এই পরীক্ষা এবং এই দ্বন্দ্বেরও আমাদের প্রয়োজন আছে; ভারতের নবজন্মের পূর্বে হয়ত আমাদের বাবদ্যর এই অগ্নিপরীক্ষায় শুদ্ধ হইতে হইবে; যাহা দুর্বল, যাহা অপবিত্র, যাহা দুর্নীতি তাহা পুড়িয়া ছাই হউক।

অসবর্ণ বিবাহ ও অক্ষর সমস্যা

১৯৩৩-এর সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগে এক সপ্তাহ পুণা ও বোম্বাই-এ কাটাইয়া আমি লঙ্কো ফিরিয়া আসিলাম। মাতা তখনও হাসপাতালে থাকিয়া অল্পে অল্পে আরোগ্যলাভ করিতেছিলেন, কমলাও লঙ্কো-এ থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতেছিল, তবে তাহার নিজের শরীরও ভাল ছিল না। আমার ভগ্নীও এলাহাবাদ হইতে সপ্তাহ অন্তে একবার করিয়া আসিত। আমি লঙ্কো-এ দুই তিন সপ্তাহ থাকিলাম, এলাহাবাদ অপেক্ষা এখানে আমি অবসর ও বিশ্রাম অনেক বেশী পাইলাম; আমার প্রধান কাজ ছিল প্রত্যহ দুইবার করিয়া হাসপাতালে যাওয়া। অবসর সময়ে আমি সংবাদপত্রের জন্ম :কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, এগুলি দেশে বহুল প্রচারিত হইয়াছিল। “ভারত কোন পথে?” এই নাম দিয়া আমি কয়েকটি প্রবন্ধে জগতের ঘটনাবলীর সহিত ভারতীয় অবস্থা বিচার করিয়া যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। আমি পরে শুনিয়াছি, এই প্রবন্ধগুলি পারসী ভাষায় অনূদিত হইয়া তিহারান ও কাবুলে প্রকাশিত হইয়াছিল। যাহারা আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সহিত সুপরিচিত, তাঁহারা ইহার মধ্যে নূতন বা মৌলিক কিছুই পাইবেন না। কিন্তু ভারতে, আমাদের স্বদেশবাসীরা ঘরের ব্যাপার লইয়া এত ব্যস্ত যে বাহিরে নজর দিবার অবসর পান না। আমার প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে আগ্রহ ও অন্ত্রান্ত্র ব্যাপারে আমি দেখিলাম যে, আমাদের দৃষ্টির সীমা উদার ও প্রসারিত হইতেছে।

মাতা হাসপাতালে থাকিতে থাকিতে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, আমরা তাঁহাকে এলাহাবাদ লইয়া যাওয়া স্থির করিলাম। আরও কারণ এই যে আমার ভগ্নী কৃষ্ণার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। আমার সহসা পুনরায় কারাগারের তলব আসিতে পারে এই আশঙ্কায় আমি যত সম্ভব সম্ভব বিবাহ ব্যাপার নির্বাহ করিতে ব্যগ্র হইলাম। আমি যে কতদিন বাহিরে থাকিতে পারিব, সে সম্বন্ধে নিজের কোন ধারণা ছিল না। কেন না তখনও নিরুপদ্রব প্রতিরোধ কংগ্রেসের সরকারী কার্যপদ্ধতি এবং কংগ্রেস ও অন্ত্রান্ত্র বহুতর প্রতিষ্ঠান বে-আইনী।

অসবর্ণ বিবাহ ও অক্ষর সমস্যা

এলাহাবাদে অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বিবাহের সময় নির্দিষ্ট হইল। ইহা অসবর্ণ বিবাহ। আমি আনন্দিত হইলেও এই ব্যাপারে আমাদের কোন হাত ছিল না। ব্রাহ্মণ ও অ-ব্রাহ্মণের মধ্যে বিবাহে কোন প্রকার ধর্মসংক্রান্ত অস্থিষ্ঠানই ব্রিটিশ ভারতীয় আইনমতে সিরূ নহে। সৌভাগ্যক্রমে সম্প্রতি আইনে পরিণত “সিভিল ম্যারেজ এক্ট” এ আমাদের স্ববিধা হইল। এরূপ দুইটি আইন আছে। যে আইনে আমার ভগ্নীর বিবাহ হইল তাহা কেবল হিন্দু এবং আবুযজ্জিক, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু যদি উভয়পক্ষ জন্ম বা ধর্মাস্তর গ্রহণ দ্বারা উল্লিখিত কোন সম্প্রদায়ভুক্ত না হন, তাহা হইলে এই আইনে বিবাহ চলিবে না; প্রথম ‘সিভিল ম্যারেজ এক্টের’ (১৮৭২-এর ৩ আইন) শরণ লইতে হইবে। এই আইনে উভয়পক্ষকে সমস্ত প্রধান ধর্মের নিন্দা করিতে হয়, অথবা এমন বিবৃতি দিতে হয়, যাহাতে তাঁহারা কোন ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত নহেন ইহা প্রকাশ পায়। এই অনাবশ্যক ধর্মদ্রোহিতা প্রদর্শন অত্যন্ত বিরক্তিকর ব্যাপার। ধর্মপ্রাণ না হইয়াও অনেকে উহাতে আপত্তি করেন বলিয়া ঐ আইনের স্ববিধা গ্রহণ চাহেন না। যাহাতে অসবর্ণ বিবাহের স্ববিধা হয়, এমন কোন পরিবর্তনের কথা উঠিলেই, সকল ধর্মের গোঁড়ার দল তারম্বরে প্রতিবাদ করিতে থাকেন। ইহার ফলে লোকে হয় ধর্মনিন্দা করিতে বাধ্য হয়, অথবা আইন বাঁচাইবার জন্য ধর্মাস্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, ব্যক্তিগত ভাবে আমি অসবর্ণ বিবাহে উৎসাহ দিবার পক্ষপাতী ; তবে উৎসাহ দেওয়া হউক আর নাই হউক এমন একটা সাধারণ অসবর্ণ বিবাহের আইন থাকা উচিত, যাহাতে সকল ধর্মের নরনারীই, ধর্ম নিন্দা বা ধর্ম পরিবর্তন না করিয়াও বিবাহিত হইতে পারে।

আমার ভগ্নীর বিবাহে কোন আড়ম্বর ছিল না, যথাসম্ভব সাদাসিধা ভাবে উহা নির্বাহ হইয়াছে। সাধারণতঃ আমাদের দেশে বিবাহ ব্যাপারে যে হৈ চৈ হয়, আমি তাহা পছন্দ করি না। একে মায়ের অস্থখ, তাহার উপর তখনও নিরূপদ্রব প্রতিরোধ চলিতেছিল, আমার বহু সহকর্মী কারাগারে, কাঁজ্জি লোক দেখান আড়ম্বরের কথা উঠিতেই পারে না। অল্প কয়েকজন আয়ীয কুটুম্ব ও স্থানীয় বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করা হইল। ইহাতে আমার পিতার অনেক পুরাতন বন্ধু মনোবেদনা পাইলেন, তাঁহারা ভুল করিয়া ভাবিলেন যে আমি ইচ্ছা করিয়াই তাঁহাদের অবজ্ঞা করিয়াছি।

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র ইংরাজী (লাতিন) অক্ষরে হিন্দুস্থানীতে লেখা হইয়াছিল। ইহা অভিনব, কেন না এই শ্রেণীর নিমন্ত্রণপত্র বরাবর নাগরী

কিছা পারসী অক্ষরে লেখা হয়, ইংরাজী অক্ষর ব্যবহার করা সৈন্তদল ও খৃষ্টান পাত্রী ব্যতীত অন্তত দৃষ্ট হয় না। আমি পরীক্ষা করিবার জন্যই ইংরাজী অক্ষর ব্যবহার করিলাম, লোকে উহা কি ভাবে গ্রহণ করে জানিবার কৌতূহল ছিল। অধিকাংশ লোকই ইহা পছন্দ করিলেন না। অল্প কয়েকগণা পত্রই দেওয়া হইয়াছিল; যদি অধিক সংখ্যায় পত্র বিতরিত হইত, তাহা হইলে প্রতিবাদ অধিকতর প্রবল হইত সন্দেহ নাই। গান্ধিজী আমার এই কার্য্য অনুমোদন করিলেন না।

আমি লাটিন অক্ষরের অনুরাগী হইলেও উহা প্রচলিত করিবার কোন উদ্দেশ্য লইয়া ব্যবহার করি নাই। তুরস্ক ও মধ্য এশিয়ায় ইহার অন্তর্কুল যুক্তিগুলিরও গুরুত্ব আছে। কিন্তু তৎসঙ্গেও আমি একেবারে নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই, হইলেও, আমি ইহা ভাল করিয়াই জানি যে, বর্তমানে ভারতে লাটিন অক্ষর গ্রহণ করিবার অতি ক্ষীণ আশাও নাই। সকল শ্রেণী হইতেই ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উত্থিত হইবে। জাতীয়তাবাদী, ধর্মসম্প্রদায়, হিন্দু, মুসলমান, প্রাচীন, নবীন কেহ বাদ যাইবেন না। এবং আমি ইহাও বুঝি যে এই প্রতিবাদ কেবল ভাবাবেগ নহে। যে ভাষার অতীত ঐশ্বর্য্য ও মহত্ত্ব আছে, তাহার অক্ষর পরিবর্তন এক গুরুতর পরিবর্তন, কেন না অক্ষর ভাষার মর্ম্মবস্তু। অক্ষর পরিবর্তন করিবামাত্র শব্দের চেহারা বদলাইয়া যায়,—স্বতন্ত্রধ্বনি, স্বতন্ত্র ভাব মনে আসে। ইহাতে প্রাচীন সাহিত্য ও নবীন সাহিত্যের মধ্যে এক অলঙ্ঘ্য প্রাচীর গড়িয়া উঠে এবং প্রথমোক্ত সাহিত্য বৈদেশিক ভাষার মত হইয়া অবশেষে বিলুপ্ত হয়। যেখানে রক্ষা করিবার মত কোন সাহিত্য নাই, সেখানেই এই দায়িত্ব গ্রহণ করা যাইতে পারে। ভারতে আমি কোন পরিবর্তন কল্পনাই করিতে পারি না, কেন না আমাদের ভাষা যে কেবল ঐশ্বর্য্যশালী ও মূল্যবান তাহা নহে, আমাদের ইতিহাস, আমাদের চিন্তার সহিত ইহার যোগ অবিচ্ছেদ্য এবং আমাদের জনসাধারণের জীবনের সহিত ইহা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। জোর করিয়া ইহা চালাইতে যাওয়া জীবন্তদেহে অস্ত্রোপচারের মতই নিষ্ঠুরতা এবং তাহাতে লোকশিক্ষার গতি রুদ্ধ হইবে।

এই প্রশ্ন আলোচনার সময় এখনও আসে নাই। আমার মতে অক্ষর সংস্কার করিতে আমাদের সংস্কৃত ভাষার কণ্ঠাস্বরূপা—হিন্দী, বাঙ্গলা, মারাঠী ও গুজরাটী ভাষার জন্ত এক সাধারণ অক্ষর গ্রহণের বিষয় প্রথমে চিন্তা করিতে হইবে। ঐ সকল ভাষার অক্ষরগুলির উৎপত্তিস্থল মূলতঃ এক এবং পার্থক্যও খুব বেশী নহে। কাজেই এক সাধারণ

অক্ষর নির্ণয় করা কঠিন নহে। ইহার ফলে এই চারিটি একশ্রেণীর প্রধান ভাষা পরস্পরের অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইবে।

ভারত সম্পর্কে এই গল্প আমাদের ব্রিটিশ শাসকেরা অত্যন্ত অধ্যবসায়ের সহিত সমগ্র জগতে প্রচার করিয়াছেন যে ভারতে কয়েক শত ভাষা প্রচলিত—নির্দিষ্ট সংখ্যাটা আমি ভুলিয়া গিয়াছি। প্রমাণ স্বরূপ আদমহুমারীর বিবরণ আছে। এই কয়েক শত ভাষার মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ইংরাজই অন্ততঃ একটি ভাষাও মোটামুটি জানেন। দীর্ঘকাল এদেশে বাস করিয়াও তাঁহারা উহা শিক্ষা করেন না—ইহা এক অনগ্রসাধারণ ঘটনা। এই সমস্ত ভাষাকে একত্র করিয়া তাঁহার নাম দিয়াছেন, “ভাণ্ডাকুলার” অর্থাৎ দাসজাতির ভাষা। (লাটিন ভাণ্ডা শব্দের অর্থ যে সকল দাস, পরিবারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে) আমাদের দেশের লোকেরাও অজ্ঞাতসারে না বুঝিয়া এই নাম গ্রহণ করিয়াছেন। সমস্ত জীবন ভারতে কাটাষ্টলেও ইংরাজেরা আমাদের ভাষা ভাল ভাবে শিক্ষা করিবার কোন চেষ্টাই করেন না, ইহা আশ্চর্য। তাঁহারা খানসামা ও আয়াদের সাহায্যে এক অদ্ভুত উচ্চারণভঙ্গীর অপভ্রংশ হিন্দুস্থানীকে প্রকৃত বস্তুর বলিয়া কল্পনা করেন। যে ভাবে তাঁহারা অধীনস্থ কর্মচারী ও মোসাহেবদের নিকট হইতে ভারতীয় জীবন সম্পর্কে ঘটনা সংগ্রহ করেন; তেমনই ভাবে চাকর-বাকরের নিকট হইতে হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষা করেন। এই চাকরেরা ‘সাহেব-লোগ’ বুলিতে পারিবেন না এই ভয়ে, তাঁহাদের পছন্দ মত বাজারিয়া হিন্দুস্থানীতে কথা বলে। হিন্দুস্থানী ও অগ্রাভ্য ভারতীয় ভাষার যে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক সৌন্দর্য্য ও বিপুল সাহিত্য আছে, এ সম্বন্ধে তাঁহারা গভীর ভাবেই অজ্ঞ।

আদমহুমারীর রিপোর্ট যদি বলে যে ভারতে দুই তিন শত ভাষা আছে, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস উহা হইতেই দেখা যাইবে যে জাখ্মানীতেও ৫০ কি ৬০টি ভাষা প্রচলিত আছে। এই ঘটনাকে জাখ্মানীর অনৈক্য বা ভেদের দৃষ্টান্তস্বরূপ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া আমার মনে পড়ে না। আদমহুমারীর বিবরণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাষার কথাও উল্লেখ করা হয়, কয়েক সহস্র লোকের কথা ভাষাকেও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুবিধার জন্য বহুতর কথা ভাষাকে পৃথক ভাষা হিসাবে শ্রেণীবিভাগ করা হয়। আয়তনের তুলনায় ভারতে অতি অল্প সংখ্যক ভাষাই প্রচলিত। ইউরোপের সহিত তুলনায় ভাষার দিক দিয়া ভারতবর্ষ অধিকতর ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু ব্যাপক নিরক্ষরতার দরুণ সাধারণ কথা ভাষা গড়িয়া উঠে নাই। কথা ভাষার নানারূপ ইতর বিশেষ আছে।

জওহরলাল নেহরু

ভারতের প্রধান ভাষা (ব্রহ্মদেশ বাদে) হিন্দুস্থানী (হিন্দী ও উর্দু), বাংলা, গুজরাটী ; মারাঠী, তামিল, তেলেগু, মালয়ালাম ও কানাড়ী ! ইহার সহিত যদি আসামী, উড়িয়া, সিন্ধী, পুস্ত ও পাঞ্জাবী জুড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে কয়েকটি পার্শ্বতা ও অরণ্যবাসী সম্প্রদায় ছাড়া ভারতের সমস্ত ভাষার কথাই বলা হয়। উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম ভারতে প্রচলিত ভারতীয় আৰ্য্য ভাষাগুলির পরস্পরের সহিত গভীর ঐক্য রহিয়াছে। দক্ষিণের দ্রাবিড় ভাষাগুলি স্বতন্ত্র হইলেও তাহার উপর সংস্কৃত ভাষার প্রভাব অত্যধিক, সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য্যও উহাতে কম নহে।

যে আটটি প্রধান ভাষার কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, ইহার প্রত্যেকটাই প্রাচীন সাহিত্য সম্পদে সমৃদ্ধ। এবং বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই সকল ভাষা কথা ভাষারূপে ব্যবহৃত হয়। অতএব কথাভাষার দিক দিয়া এগুলি পৃথিবীর অগ্রাগ্র প্রধান ভাষার সহিত একত্রে আসন পাইবার যোগ্য। পাঁচ কোটি লোক বাঙ্গলায় কথা কহে, অল্পবিস্তর উচ্চারণে পার্থক্য থাকিলেও আমার ধারণা (হাতের কাছে নির্দিষ্ট সংখ্যা নাই) ভারতে প্রায় ১৪ কোটি লোক হিন্দুস্থানী ভাষা ব্যবহার করে এবং এই ভাষা দেশের সর্বত্র বহুলোক অল্পবিস্তর বুঝিতে পারে। * এই ভাষার বিপুল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইহা সংস্কৃতের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং পারসী ভাষার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এই দুই ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার হইতে এই ভাষা পুষ্ট এবং সম্প্রতি ইংরাজী হইতেও ইহা অনেক কিছু সংগ্রহ করিতেছে। দাক্ষিণাত্যে অবশু হিন্দী ভাষা একেবারেই বিদেশী ভাষা, তবে সেখানেও হিন্দী-ভাষা শিক্ষাদানের বিপুল চেষ্টা চলিতেছে। দুই বৎসর পূর্বে (১৯৩২)

* একজন হিন্দুস্থানী অনুরাগী আমাকে নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলি দিয়াছেন। এগুলি ১৯৩১ কি ১৯২১ এর আদমশুমারীর বিবরণ হইতে গৃহীত জানি না, তবে মনে হয় ইহা ১৯২১ এর : বর্তমানে অবশ্য এই সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে।

| | | |
|---|-------|------|
| হিন্দুস্থানী (পশ্চিম অঞ্চলের হিন্দী, পাঞ্জাবী ও রাজস্থানী সহ) | ১৩,৯০ | লক্ষ |
| বাঙ্গলা | ৪,৯০ | " |
| তেলেগু | ২,৩৬ | " |
| মারাঠী | ১,৮৮ | " |
| তামিল | ১,৮৮ | " |
| কানাড়ী | ১,০৩ | " |
| উড়িয়া | ১,০১ | " |
| গুজরাটী | ৯৬, | " |

পুস্ত ; আসামী এবং ব্রহ্মদেশের ভাষার উৎপত্তি ও প্রকৃতি স্বতন্ত্র বলিয়া এই তালিকার তাহা ধরা হয় নাই।

অসবর্ণ বিবাহ ও অক্ষর সমস্যা

আম তত্রত্য হিন্দী প্রচার সমিতি প্রদত্ত সংখ্যা দেখিয়াছিলাম, তাঁহারা চৌদ্দ বৎসরের চেষ্টায় কেবলমাত্র মাদ্রাজ প্রদেশেই ৫,৫০,০০০ জন লোককে হিন্দী শিক্ষা দিয়াছেন। গভর্ণমেন্টের সাহায্য ব্যতীত স্বতঃপ্রবৃত্ত চেষ্টায় এই সাফল্য অল্প নহে, এবং ষাঁহারা হিন্দী শিখিয়াছেন, তাঁহারা আবার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অপরকে শিখাইতেছেন।

হিন্দুস্থানী যে ভারতের সাধারণ ভাষায় পরিণত হইবে, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সাধারণ কাজ চালাইবার জন্ত এখনও ইহা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। হিন্দুস্থানী নাগরীতে লেখা হইবে না পারসী অক্ষরে লেখা হইবে, ইহা সংস্কৃত শব্দবহুল হইবে না পারসী শব্দবহুল হইবে, ইহা লইয়া নির্বোধ তর্ক ও বাদানুবাদের ফলে উহার উন্নতি ব্যাহত হইতেছে। অক্ষরের অসুবিধা দূর করার উপায় নাই—কেন না দুই পক্ষের মনোভাবই প্রবল, অতএব দুই প্রকার অক্ষরই মানিয়া লইয়া লোককে ইচ্ছামত যে কোনটি ব্যবহার করিতে দেওয়াই সঙ্গত। তবে উভয়দিকের চরমপন্থা বর্জন করিয়া মোটামুটি কথ্যভাষার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সাহিত্যের ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন কর্তব্য। জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তনকালে ইহাই অবশ্যস্বার্থ। বর্তমানে ষাঁহারা নিজেদের সাহিত্যের লিখনভঙ্গী ও মাধুর্যের নিয়ামক বলিয়া বিবেচনা করেন, সেই মুষ্টিমেয় মধ্যশ্রেণী, প্রত্যেকে নিজ নিজ মত সম্পর্কে অতিমাত্রায় রক্ষণশীল ও সঙ্কীর্ণমনা। তাঁহারা প্রাচীন পদ্ধতি আঁকড়িয়া আছেন, যাহার সহিত তাঁহাদের পাঠক জনসাধারণের অথবা জগতের সাহিত্যের গতিভঙ্গীর যোগ নাই।

হিন্দুস্থানী ভাষার পরিপুষ্টি ও বিস্তারের সহিত বাকলা, গুজরাটি, মারাঠা, উড়িয়া বা দ্রাবিড় ভাষা প্রভৃতি ভারতের উৎকৃষ্ট ভাষাগুলির পরিপুষ্টি ও সমৃদ্ধির সংঘর্ষ হইবে না, হওয়া উচিতও নহে। ইহার মধ্যে কতকগুলি ভাষা অত্যন্ত সচেতন এবং হিন্দুস্থানী অপেক্ষাও বুদ্ধির দিক দিয়া সতর্ক; বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষা ও অগ্রগতি কার্যের জন্ত এই ভাষাগুলি রাষ্ট্র ভাষারূপেই থাকিবে। কেবল ঐগুলির সহায়তাতেই জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির দ্রুত বিস্তার সম্ভব।

কেহ কেহ কল্পনা করেন, ইংরাজীই ভারতের সর্বজনীন ভাষায় পরিণত হইবে। মুষ্টিমেয় উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিকে বাদ দিলে, ইহা আমার নিকট উন্নাদের কল্পনা বলিয়াই মনে হয়। ইহার সহিত জনসাধারণের শিক্ষা সংস্কৃতির কোন সম্পর্কই নাই। এখন যেরূপ আছে, হয় ত আরও ব্যাপকভাবে ইংরাজী ভাষা, ‘টেকনিক্যাল’, বৈজ্ঞানিক ও ব্যবসায় সম্পর্কিত ব্যাপারে এবং বিশেষভাবে আন্তর্জাতিক ব্যাপারে ব্যবহৃত হইবে। জগতের

জওহরলাল নেহরু

চিন্তা ও কর্মধারার সহিত যোগ রাখিবার জন্ত আমাদের অনেকেরই বিদেশী ভাষা শিক্ষা করা উচিত এবং আমার মনে হয় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইংরাজী ভাষা ছাড়াও, ফরাসী, জার্মান, রুশিয়ান, স্পেনীয় ও ইতালীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া উচিত। অবশ্য ইংরাজীকে অবজ্ঞা করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই, তবে জগতের মতামত তুলমূল বিচার করিতে হইলে আমাদের কেবল ইংরাজীর চশমা ব্যবহার করিলেই চলিবে না। ইতিমধ্যেই আমাদের মানসিক বিকাশের ধারা বহুল পরিমাণে একদেশদর্শী হইয়া পড়িয়াছে, কেন না আমরা কেবল একদিকের কথা ও মতবাদ ভাবিতে অভ্যস্ত। এমন কি আমাদের অতি উগ্র জাতীয়তাবাদীরা পর্য্যন্ত বৃষ্টিতে পারেন না যে ভারত সম্পর্কে তাঁহাদের ধারণা ব্রিটিশ দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা কি পরিমাণে আচ্ছন্ন।

কিন্তু অগ্ন্যাগ্নি বিদেশীভাষা শিক্ষায় আমরা যতই উৎসাহ দেই না কেন, বাহিরের সহিত বোণাযোগ রক্ষার জন্ত ইংরাজী ভাষাই আমাদের প্রধান অবলম্বন থাকিবে। ইহাই হওয়া উচিত, পুরুষানুক্রমে আমরা ইংরাজী শিখিতেছি এবং ইহাতে অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছি। এই দীর্ঘকালের শিক্ষার ধারা একেবারেই মুছিয়া ফেলিয়া নূতন কিছু গ্রহণ করিবার চেষ্টা নির্বুদ্ধিতাই হইবে। বর্তমানে ইংরাজী ভাষা বহু দূরপ্রসারী এবং ইহা দ্রুতগতিতে অগ্ন্যাগ্নি ভাষাকে অতিক্রম করিতেছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। আন্তর্জাতিক আলোচনায় এবং রেডিও ঘোষণায় এই ভাষাই প্রধান বাহন হইবে, যদি না “আমেরিকান” ইহার স্থান গ্রহণ করে। অতএব আমাদের ইংরাজী শিক্ষা বিস্তৃত কারতে হইবে। যথাসম্ভব ইহা আমাদের শিক্ষা করা উচিত, তবে এই ভাষার স্ফুর্জিতস্ফুর্জিত রস উপভোগ করিবার জন্ত অনেকে যেমন ভাবে অতিরিক্ত সময় ও শক্তি ব্যয় করেন, আমি তাহার কোন প্রয়োজন দেখি না। ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে ইহা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশের উপর এই বোঝা চাপাইয়া দিলে অন্যান্য দিকে তাহাদের উন্নতি অবরুদ্ধ হয়।

সম্প্রতি “বেসিক ইংলিশ” এর প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। আমার মনে হয় ইহাতে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার পথ অত্যন্ত সরল ও স্পষ্ট করা হইয়াছে, ভবিষ্যতে ইহার প্রচলনের সমধিক সম্ভাবনা রহিয়াছে। আমাদের পক্ষে এই “বেসিক ইংলিশ” শিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রবর্তন করাই ভাল, পণ্ডিতী ইংরাজী বিশেষজ্ঞ বা বিশিষ্ট ছাত্রের জন্ত নির্দিষ্ট থাকুক।

ব্যক্তিগতভাবে আমি হিন্দুস্থানী ভাষায় ইংরাজী ও অগ্ন্যাগ্নি বিদেশী ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণের পক্ষপাতী। ইহার প্রয়োজন আছে, কেন না আধুনিক

অসবর্ণ বিবাহ ও অক্ষর সমগ্রা

অনেক নাম ও শব্দের প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় নাই, সংস্কৃত, পারসী বা আরবী হইতে কঠিন শব্দ রচনা না করিয়া সর্বজন পরিচিত শব্দ ব্যবহার করাই ভাল। ভাষার পবিত্রতা রক্ষাকারীরা ইহাতে আপত্তি করিবেন, কিন্তু আমার মনে হয় ইহা মস্ত ভুল, অগ্ৰাণ্ড ভাষা হইতে শব্দ ও ভাব পরিপাক করিবার শক্তি ও সহজ নমনীয়তার দ্বারাষ্ট ভাষা সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে।

আমার ভগ্নীর বিবাহের পরেই আমি কাশী যাত্রা করিলাম। আমার পুরাতন বন্ধু ও সহকর্মী শিবপ্রসাদ গুপ্ত এক বৎসরকাল পীড়িত ছিলেন। লক্ষ্মী জেলে থাকিবার সময় তিনি পক্ষাঘাতরোগে আক্রান্ত হন, তখন হইতে অতি ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করিতেছেন। কাশীতে অবস্থান কালীন একটি ক্ষুদ্র হিন্দী-সাহিত্য সমিতি আমাকে একখানি মানপত্র প্রদান করেন এবং আমি সদস্যদের সহিত সাধারণভাবে কিছু আলোচনা করি। আমি বলিলাম, যে বিষয় আমি অল্প জানি, তাহা লইয়া বিশেষজ্ঞদের সহিত আলোচনায় আমার সন্মোচন হয়, তবুও আমি কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করিলাম। হিন্দী লিখিবার আলঙ্কারিক ও জটিল প্রচলিত প্রথার সমালোচনা করিয়া আমি বলিলাম যে কঠিন কঠিন সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ, কৃত্রিম ও আড়ষ্ট প্রাচীন রচনাপদ্ধতি ধরিয়া থাকার কোনই সার্থকতা নাই। আমি বলিলাম, মুষ্টিমেয় ব্যক্তির জ্ঞান এইরূপ রাজদরবারী রীতিতে সাহিত্য রচনা ত্যাগ করিয়া হিন্দী লেখকগণ দৃঢ়তার সহিত সর্বজনবোধ্য ভাষায় জনসাধারণের জ্ঞান সাহিত্য সৃষ্টি করুন। জনসাধারণের সহিত সংস্পর্শে ভাষা জীবন্ত ও অকৃত্রিম হইয়া উঠিবে,—লেখকগণও জনসাধারণের ভাবাবেগ হইতে শক্তি লাভ করিয়া অধিকতর উন্নতধরণে রচনা করিতে সমর্থ হইবেন। আমি আরও বলিলাম যে, হিন্দী গ্রন্থকারেরা যদি পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও সাহিত্যের প্রতি অধিকতর মনোযোগী হন, তাহা হইলে তাঁহারা বহুল পরিমাণে উপকৃত হইবেন। বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষা হইতে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য ও আধুনিক ভাবধারা সংক্রান্ত গ্রন্থগুলির অনুবাদ হওয়াও বাঞ্ছনীয়। প্রসঙ্গতঃ আমি উল্লেখ করিলাম যে আধুনিক হিন্দী অপেক্ষা, আধুনিক বাঙ্গলা, মারাঠী ও গুজরাটী ভাষা অধিক অগ্রসর, বিশেষভাবে আধুনিক বাঙ্গলা-সাহিত্যের মৌলিকতা ও সৃজনী-প্রতিভা হিন্দী হইতে অনেক অধিক।

এই সকল কথা বন্ধুভাবে আলোচনা করিয়া আমি ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু সভায় উহা যে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবে, এ ধারণাও আমার ছিল না,

জওহরলাল নেহরু

কিন্তু উপস্থিত কোন ব্যক্তি উহার বিবরণ হিন্দী সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশ করিয়া দিলেন।

আমার বিরুদ্ধে হিন্দী সংবাদপত্রগুলিতে তীব্র প্রতিবাদ উঠিল, যেহেতু আমি বাঙ্গলা, গুজরাটি ও মারাঠী অপেক্ষা হিন্দীকে হীন করিয়া সমালোচনা করিতে স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়াছি। আমাকে গভীরভাবে অজ্ঞ—এ বিষয়ে আমি অজ্ঞ তাহাতে সন্দেহ কি—ও আরও কঠিন কঠিন বিশেষণ দ্বারা পরাহত করা হইল। এই বাদামুবাদ পড়িবার আমি সময় পাই নাই, শুনিয়াছি কয়েকমাস ধরিয়া, আমি পুনরায় কারাগারে না যাওয়া পর্যন্ত উহা চলিয়াছিল।

এই ঘটনায় আমার একটা শিক্ষা হইল। আমি বুঝিলাম, হিন্দী সাহিত্যিক ও সাংবাদিকেরা অতিমাত্রায় অসহিষ্ণু, একজন হিতাকাঙ্ক্ষীর নিকট হইতেও তাঁহাদের সঙ্গত সমালোচনা শুনিবার মত ধৈর্য্য নাই। ইহার পশ্চাতে নিশ্চয়ই হীনতাবোধ রহিয়াছে। আত্মসমালোচনার একান্ত অভাব, সমালোচনার আদর্শ অতি দীন। গ্রন্থকার ও সমালোচক ব্যক্তিগত অভিসন্ধি আরোপ করিয়া কলহ করিতেছেন, এ দৃশ্য বিরল নহে। ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গী সঙ্কীর্ণ বুজ্জিয়া শ্রেণীর এবং কুপমণ্ডুকে পূর্ণ দেখিয়া মনে হয় যেন গ্রন্থকার ও সাংবাদিকেরা পরস্পরের জন্ত এবং অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তির জন্ত লিখিয়া থাকেন; জনসাধারণের স্বার্থ বা মনোভাব একেবারেই অবজ্ঞা করেন। যেখানে ক্ষেত্র প্রশস্ত এবং বিস্তৃত, সেখানে এভাবে শক্তির অপব্যয় করা কত শোচনীয়।

হিন্দী সাহিত্যে অতীত সম্পদ প্রচুর; কিন্তু কেবল অতীতের উপর নির্ভর করিয়া ইহা বাঁচিতে পারে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইহার মহৎ ভবিষ্যৎ আছে এবং হিন্দী সংবাদপত্রগুলি কালক্রমে দেশে বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। কিন্তু বর্তমান প্রচলিত প্রথা বর্জন করিয়া সাহসের সহিত জনসাধারণের জন্ত সাহিত্যরচনায় প্রবৃত্ত না হইলে উন্নতির আশা নাই।

সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রতিক্রিয়া

আমার ভগ্নীর বিবাহের প্রাক্কালে সংবাদ আসিল, ইউরোপে বিঠলভাই প্যাটেলের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি দীর্ঘকাল রোগভোগ করিতেছিলেন এবং এই কারণেই ভারতে তাঁহাকে কারাগার হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যু অত্যন্ত বেদনাবহ ঘটনা, আমাদের সংগ্রামের মধ্যে প্রধান নেতাদের একের পর আর এইভাবে মহাপ্রস্থান, অত্যন্ত অবসাদজনক। বিঠলভাই-এর ঔপকীর্তন করিয়া অনেকেই লিখিতে লাগিলেন। এবং প্রায় সকলেই তাঁহাকে একজন পার্লামেন্টীয় নীতিবিশারদ এবং ব্যবস্থা-পরিষদের সভাপতিরূপে তাঁহার সাফল্যের কথা উল্লেখ করিতে লাগিলেন। ইহা নিঃসংশয়ে সত্য কিন্তু ইহার বারম্বার পুনরুজ্জীবিত আশা অত্যন্ত বিরক্তিবোধ করিতে লাগিলাম। ভারতে কি পার্লামেন্টীয় কার্যে পরিপক্ব এবং যোগ্যতার সহিত সভাপতির কার্য পরিচালনা করিতে পারেন, এমন লোকের অভাব আছে? এই কাজের জন্ত আমাদের আইনজীবীরা যথেষ্ট শিক্ষিত। বিঠলভাই উহা অপেক্ষাও অনেক বড় ছিলেন—তিনি ছিলেন ভারতের স্বাধীনতার একজন দুর্দমনীয় যোদ্ধা।

আমার বারাণসীতে অবস্থানকালীন আমি হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের নিকট বক্তৃতা করিতে আহূত হইয়াছিলাম। আমি আনন্দের সহিত আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম,—এবং ভাইস-চ্যান্সেলর পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সভাপতিত্বে এক বিশাল সভায় বক্তৃতা করিলাম। প্রসঙ্গতঃ আমাকে সাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিতে হইল, আমি তীব্রভাষায় উহার নিন্দা করিলাম এবং বিশেষভাবে হিন্দু মহাসভার কার্যপ্রণালীরও নিন্দা করিলাম। আক্রমণ করিবার জন্ত পূর্ব হইতে আমি কোন সঙ্কল্প করি নাই। দীর্ঘকাল ধরিয়া আমার মনের মধ্যে বিভিন্ন দলের সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের প্রতিক্রিয়াশীল কাব্যপদ্ধতির জন্ত ক্রোধ সঞ্চিত ছিল; এবং আলোচনামুখে উৎসাহ ও উত্তেজনায় সেই ক্রোধের কিয়দংশ বাহিরে প্রকাশিত হইল। আমি বিশেষ জোরের সহিত হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের প্রগতি-বিরোধী চরিত্রের কথা বলিলাম, কেন না, সম্পূর্ণ হিন্দু শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের স্বরূপ বর্ণনার কোন

জওহরলাল নেহরু

অর্থ হয় না। তখন আমার একথা মনে হয় নাই যে, যে সভার সভাপতি মালব্যজী, সেই সভায় হিন্দু মহাসভার সমালোচনা করা স্বরূচির পরিচায়ক নহে, কেন না তিনি উহার অগ্রতম স্তম্ভ স্বরূপ। উহা আরও মনে না পড়িবার কারণ এই যে, ইদানীং তিনি উহার সহিত ততটা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন না, নূতন আক্রমণশীল নেতারা তাঁহাকে অনেকটা কোণ-ঠাসা করিয়া ফেলিয়াছিল। যতদিন তাঁহার প্রভাব ছিল, ততদিন মহাসভা সাম্প্রদায়িকতা সত্ত্বেও রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রগতিবিরোধী হইয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু পরবর্তীকালে ইহা প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে, এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইহাতে মালব্যজীর কোন হাত ছিল না এবং তিনি নিশ্চয়ই ইহা অন্তিমোদন করেন নাই। তথাপি আমার পক্ষে ইহা উচিত হয় নাই। আমি পরে বুঝিলাম যে, তাঁহার আমন্ত্রণের অপব্যবহার করিয়া আমি যে সকল মন্তব্য করিয়াছি, তাহাতে তাঁহাকে ক্ষুব্ধ করা হইয়াছে। এজন্য আমি দুঃখিত হইয়াছিলাম।

আমার নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত আর একটি ভুলের জন্তও আমি দুঃখিত হইয়াছি। একজন আমার নিকট একটি প্রস্তাবের নকল পাঠাইয়া লিখিয়াছিলেন, আজমীঢ় হিন্দু যুবক-সম্মেলনে ঐ প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবটি অত্যন্ত আপত্তিজনক এবং আমার বারাণসীর বক্তৃতায় উহা উল্লেখ করিয়াছিলাম। প্রকৃত প্রস্তাবে ঐরূপ কোন সম্মেলনে ঐ প্রস্তাব গৃহীতই হয় নাই, উহা দুষ্টলোকের ধাপ্লাবাজী মাত্র।

আমার বারাণসীর বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় হৈ হৈ পড়িয়া গেল। এই শ্রেণীর ব্যাপারে আমি অভ্যস্ত হইলেও হিন্দুমহাসভার নেতাদের আক্রমণে বিয়ের জ্বালা দেখিয়া আমি অবাধ হইলাম। এই সকল আক্রমণ ব্যক্তিগত এবং আলোচ্য বিষয়ের সহিত উহার কোন সংশ্লিষ্ট নাই। তাঁহারা সীমা অতিক্রম করিলেন, ইহাতে আমি আনন্দিতই হইলাম, কেন না, আমি এ বিষয়ে আমার বক্তব্য পরিষ্কৃত করিবার সুযোগ পাইলাম। মাসের পর মাস ধরিয়া, এমন কি যখন আমি কারাগারে ছিলাম, তখন হইতেই এই সকল কথা আমার মনের মধ্যে গর্জ্জন করিতেছিল, কিন্তু প্রকাশের পথ খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। ইহাতে যেন ভীমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়া হইল, যদিও ভীমরুল আমার গা-সহা, তথাপি যে বাদানুবাদ গালাগালিতে পর্য্যবসিত হয়, তাহাতে আনন্দ নাই। কিন্তু আমার বিচার করিবার অবসর রহিল না। আমার ধারণানুযায়ী যুক্তিজনাল বিস্তার করিয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর সাম্প্রদায়িকতাবাদ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিলাম,

সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রতিক্রিয়া

আমি উহাতে দেখাইলাম, দুই পক্ষের কেহই “খাটি” সাম্প্রদায়িকতাবাদী নহে, আসলে রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতিশীলরাধীরাই সাম্প্রদায়িকতার মুখোমুখি পরিয়া আত্মগোপন করিয়া আছে। সংবাদপত্র হইতে জেলে সংগ্রহ করা, সাম্প্রদায়িক নেতাদের বক্তৃতা ও বিবৃতির কতকগুলি বিবরণ আমার নিকট ছিল। আমার নিকট এত বেশী উপাদান ছিল যে, সেগুলিকে সংবাদপত্রের প্রবন্ধের মধ্যে সাজাইয়া গুছাইয়া ঠাসিয়া দিতে আমাকে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইয়াছে।

আমার এই প্রবন্ধটি ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতে বহুল প্রচার লাভ করিল। কিন্তু কি হিন্দু কি মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদী, কোন পক্ষ হইতেই কোন জবাব আসিল না; যদিও আমার প্রবন্ধে উভয়ের সম্বন্ধেই অনেক কথা ছিল। হিন্দু-মহাসভার যে সকল নেতা নানা ছন্দে জোরালো ভাষায় আমাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন, এখন তাঁহারা একেবারেই মৌনাবলম্বন করিলেন। মুসলমানদের পক্ষ হইতে কেবল আর মহম্মদ ইকবাল, দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক সম্বন্ধে আমার কয়েকটি ভ্রম সংশোধন করিতে, চেষ্টা করিলেন, ইহা ছাড়া তিনি আমার যুক্তিসম্বন্ধে শোন উচ্চবাচ্য করিলেন না। ইহার উত্তর দিতে গিয়াই আমি ইঙ্গিত করিলাম যে, রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সমস্যাগুলি গণ-পরিষদ আহ্বান করিয়া মীমাংসা করা উচিত। পরে সাম্প্রদায়িকতা লইয়া আমি আরও দুই একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। এই সকল প্রবন্ধ লোকে সদয়ভাবে গ্রহণ করায় এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিদের উপর উহার প্রভাব দেখিয়া আমি আশাবিত্ত হইলাম। অবশ্য আমি কল্পনাও করি নাই যে সাম্প্রদায়িকতার পশ্চাতে যে তীব্র মনোভাব বিद्यমান, তাহা আমি কোন যাহুমন্ত্রে উড়াইয়া দিতে পারিব। আমার কেবল দেখাইবার উদ্দেশ্য ছিল যে সাম্প্রদায়িক নেতারা ভারতের ও ইংলণ্ডের প্রতিক্রিয়াশীল অংশের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত এবং কার্যক্ষেত্রে তাঁহারা সর্ববিধ রাজনৈতিক, বিশেষভাবে সামাজিক উন্নতির বিরোধী। তাঁহাদের দাবীগুলির সহিত জনসাধারণের কোন সম্পর্ক নাই। উপরের দিকের মুষ্টিমেয় ব্যক্তির স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া উহার আর কোন সার্থকতা নাই। এই ভাবে যুক্তিতর্ক দ্বারা যখন আমি আক্রমণ করিতে সক্ষম করিলাম, তখনই কারাগারের ডাক আসিল। হিন্দু মুসলমান মিলনের জন্য পুনঃ পুনঃ আবেদনের সার্থকতা আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু অনৈক্যের কারণগুলি বুঝিবার চেষ্টা না করিলে, উহা শূন্যগর্ভ উক্তিমাত্র। যাহা হউক, অনেকে এরূপ কল্পনা করেন যে, ঐ যাহুমন্ত্রটি বারে বারে আওড়াইলেই একদিন মিলন আসিয়া পড়িবে।

জওহরলাল নেহরু

১৮৫৭-র বিদ্রোহের পর হইতে সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন সম্পর্কে ব্রিটিশ-নীতি খতাইয়া দেখিলে অনেক কিছু বুঝিবার উপাদান পাওয়া যায়। হিন্দু ও মুসলমানকে একত্র মিলিত হইয়া কাজ করিতে বাধা দেওয়া এবং এককে অপরের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা মূলতঃ অপরিহার্য নীতি ছিল। ১৮৫৭-র পর ব্রিটিশের কঠিন হস্ত হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের উপরই কঠোরভাবে পতিত হইল। তাঁহারা ভাবিলেন, মুসলমানেরাই অধিক আক্রমণশীল ও রণপ্রিয়, ভারত শাসনের অল্পদিন পূর্বের স্মৃতি তাঁহাদের রহিয়াছে, অতএব ইহারাই অধিকতর বিপজ্জনক। মুসলমানেরাও নূতন শিক্ষা পদ্ধতি হইতে সরিয়া রহিলেন, এবং গভর্ণমেন্টের অধীনে অল্প চাকুরীই তাঁহারা পাইলেন। এ সমস্তই তাঁহারা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। হিন্দুরা ইংরাজী ভাষা শিখিয়া কেরাণী শ্রেণীর চাকুরী আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতে লাগিল এবং তাহাদের বেশ নিরীহ মনে হইতে লাগিল।

উপরের দিকে অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী ভাষী শিক্ষিত সম্প্রদায়ে অভিনব জাতীয়তাবাদ জাগ্রত হইল এবং স্বাভাবিকভাবেই ইহা হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, কেন না, মুসলমানেরা তখন শিক্ষাক্ষেত্রে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। এই জাতীয়তাবাদের স্রব অতি শাস্ত ও নিরীহ হইলেও গভর্ণমেন্ট তাহা পছন্দ করিলেন না, তাঁহারা মুসলমানদিগকে উৎসাহ দিতে আরম্ভ করিলেন, যাহাতে তাঁহারা নূতন জাতীয়তাবাদ হইতে দূরে সরিয়া থাকেন। ইংরাজী শিক্ষার অভাবই ছিল মুসলমানদের প্রধান বাধা, কিন্তু তাহা ধীরে ধীরেই অন্তর্হিত হইবে সন্দেহ নাই। দূরদৃষ্টি লইয়া ব্রিটিশগণ ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত হইলেন, এবং এই কাণ্ডে তাহাদের প্রধান সহায় হইলেন, প্রখরব্যক্তিত্বশালী স্ত্র সৈয়দ আহম্মদ খাঁ।

সম্প্রদায়ের অন্তর্গত অবস্থা, বিশেষভাবে শিক্ষার শোচনীয় দুর্গতি দেখিয়া স্ত্র সৈয়দ ব্যথিত হইলেন; ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের উপর ইহাদের কোন প্রভাব নাই, গভর্ণমেন্টও ইহাদের কোন অন্তর্গ্রহ করেন না, ইহা তাঁহার নিকট অত্যন্ত দুঃখজনক হইয়া উঠিল। তৎকালীন অনেক সমসাময়িক ব্যক্তির মত তিনিও ব্রিটিশের অনুরাগী ছিলেন এবং বিলাত ভ্রমণ করিয়া অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ইউরোপ বিশেষভাবে পশ্চিম ইউরোপ বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে সভ্যতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, সমগ্র জগতে তাহার একাধিপত্য, বড় হইতে গেলে যে সকল গুণ আবশ্যক তাহা সর্বত্র প্রকাশিত। সমস্ত ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য উচ্চশ্রেণীর করায়ত্ত, প্রশ্ন করিবার সাধ্য কাহারও নাই। ইহা উদারনৈতিকগণের যুগ—ইহা ভবিষ্যতের মহৎ পরিণতির উপর

সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রতিক্রিয়া

দৃঢ়বিশ্বাসী। এই বিশ্বয়কর বাহু চাকচিক্য প্রত্যক্ষ করিয়া ভারতীয়েরা যে অভিভূত হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? হিন্দুরাই অধিকসংখ্যায় ইউরোপে ও ইংলণ্ডে গিয়া তাঁহাদের অত্যাচারী হইয়া স্বদেশে ফিরিতে লাগিলেন। ক্রমে বাহু চাকচিক্য ও আড়ম্বর সহিয়া গেল, প্রথম দর্শনের বিশ্বয় আর রহিল না। কিন্তু শূর সৈয়দের মনে প্রথম দর্শনের বিশ্বয় ও আসক্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল। ১৮৬২ সালে ইংলণ্ডে গিয়া তিনি দেশে কতকগুলি পত্র লেখেন। ইহার একখানি পত্রে তিনি লিখিয়াছেন,— “ভারতে ইংরাজদের অসৌজন্য এবং ভারতবাসীকে য়ুগারও অযোগ্য জীবজন্তুর মত ব্যবহারের জ্ঞাত যদিও আমি ইংরাজকে মার্জনা করিতে পারি না, তথাপি আমার মনে হয়, তাঁহারা ভ্রান্ত ধারণা হইতেই ঐরূপ করিয়া থাকেন, এবং কিছু সঙ্কোচের সহিত আমি একথাও স্বীকার করিব যে, আমাদের সম্পর্কে তাঁহাদের মতামত খুব বেশী ভুল নহে। ইংরাজের খোসামোদ না করিয়াও আমি একথা বলিতে পারি যে ভারতীয় নেটিভগণ, উচ্চ নীচ, ব্যবসায়ী ও ছোট দোকানদার, শিক্ষিত ও নিরক্ষরদের যদি আদব কার্যদা শিক্ষা ও চরিত্রের মহত্বের মাপকাঠিতে ইংরাজের সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে, শক্তিমান সুন্দর মানুষের সহিত একটা নোংরা জানোয়ারের যে পার্থক্য, পার্থক্য ঠিক ততখানি। ভারতে ইংরাজেরা যে আমাদের নপুংসক পশু বলিয়া মনে করে, তাহার যুক্তি ও কারণ আছে।যাহা আমি দেখিয়াছি, এবং প্রত্যাহ দেখিতেছি, ভারতের নেটিভেরা তাহা কল্পনাও করিতে পারিবে না।যাহা কিছু ভাল বস্তু, ঐহিক ও পারমাখিক, যাহা কিছু মহৎ মানুষের মধ্যে দেখা যায়, সে সমস্তই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ইউরোপ, বিশেষ ভাবে ইংলণ্ডকে দান করিয়াছেন।*

ইংলণ্ড ও ইউরোপের ইহাপেক্ষা অধিক প্রশংসা আর কেহই করিতে পারেন নাই, শূর সৈয়দ যে অতিমাত্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন তাহা স্বতঃসিদ্ধ। তুলনা করিতে গিয়া তিনি যে কঠিন ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, সম্ভবতঃ তাহার উদ্দেশ্য এই যে তাঁহার স্বদেশবাসীকে মোহ নিভ্রা হইতে জাগ্রত করিয়া সম্মুখে অগ্রসর করাইবার জ্ঞাত। এই অগ্রসর বলিতে তিনি নিঃসন্দেহে বুঝিলেন,—পাশ্চাত্য শিক্ষার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে, অগ্রথা তাঁহার সাম্রাজ্য অধিকতর শক্তিশালী ও অধঃপতিত হইয়া পড়িবে। ইংরাজী শিক্ষার অর্থই সরকারী চাকুরী, নিরাপত্তা, প্রতিপত্তি

* উদ্ধৃত অংশ হানস কোণের “প্রাচ্যের জাতীয়তাবাদের ইতিহাস” হইতে গৃহীত।

ও সম্মান। অতএব শিক্ষাবিস্তারে তিনি সর্বশক্তি নিয়োজিত করিলেন এবং তাঁহার সম্প্রদায়কে স্বয়ং আনয়ন করিতে লাগিলেন। তিনি অনন্যকন্ম হইয়া এই এক বিষয়ে মনঃসংযোগ করিলেন,—গতাহুগতিকতা ও সংশয় হইতে মুসলমানদিগকে মুক্ত করা অতিশয় কঠিন কাজ ছিল সন্দেহ নাই। হিন্দু বুর্জোয়া শ্রেণীর নবজাতীয়তাবাদ তাঁহার নিকট অবাস্তর বিষয়ে মনোনিবেশ করা বলিয়া বোধ হইয়াছিল বলিয়াই তিনি উহার বিবোধিতা করিয়াছিলেন। হিন্দুরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক অগ্রসর, তাহারা গভর্ণমেণ্টের সমালোচনার বিলাস করিতে পারে, কিন্তু তাঁহার শিক্ষা প্রচারে গভর্ণমেণ্টের পূর্ব সহযোগিতা আবশ্যক; এবং তিনি এখনই উহাতে যোগ দিয়া, তাঁহার উদ্দেশ্য পণ্ড হইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন না। অতএব তিনি শিশু জাতীয় কংগ্রেস হইতে মুখ ফিরাইলেন; ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট অতি আগ্রহের সহিত তাঁহাকে উৎসাহ দিলেন।

শ্রম সৈয়দের মুসলমানদের জন্ত পাশ্চাত্য শিক্ষায় সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিবার সঙ্কল্প যে ঠিকই হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা ব্যতীত তাহারা নূতন ধরণের ভারতীয় জাতীয়তাবাদ গঠন ব্যাপারে কোন কার্যকরী অংশ গ্রহণ করিতে পারিত না, এবং উন্নততর শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নত অবস্থাসম্পন্ন হিন্দুদের পো ধরিয়াই তাহাদের কাটাতে হইত। ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির পথে ও মতবাদের দিক দিয়া তখনও মুসলমানেরা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগ দিবার যোগ্যতা অর্জন করে নাই; কেন না হিন্দুদের মত তাহাদের বুর্জোয়া শ্রেণী গড়িয়া উঠে নাই। শ্রম সৈয়দের কার্যপ্রণালী দৃশ্যতঃ অতিমাত্রায় মডারেট হইলেও, উহা সম্যকরূপে বৈপ্লবিক পথেই প্রযুক্ত হইয়াছিল। যখন নবমুঠ হিন্দু মধ্যশ্রেণীরা ইউরোপীয় উদারনৈতিক মতবাদের দিক হইতে চিন্তা করিতেছিলেন, তখন মুসলমানেরা গণতন্ত্র-বিরোধী সামন্ততান্ত্রিক মতবাদে আচ্ছন্ন ছিলেন। কিন্তু উভয়শ্রেণী সম্পূর্ণরূপে মডারেট এবং ব্রিটিশ শাসনের উপর নির্ভরশীল ছিল। অল্পসংখ্যক ধনী মুসলমান জমিদার যে শ্রেণীর মডারেট, শ্রম সৈয়দ ছিলেন সেই শ্রেণীর। হিন্দুদের মডারেট নীতি ছিল, সতর্ক বৃত্তিজীবী ও বণিকের শিল্পবাণিজ্য ও টাকা খাটাইবার উপায় অন্বেষণ। ব্রিটিশ উদারনীতির দীপ্ত শিখা প্লাডষ্টোন, ট্রাইট প্রভৃতি হইতে হিন্দু রাজনৈতিকেরা আলোক গ্রহণ করিতেন। মুসলমানেরা তাহা করিয়াছেন কিনা, আমার সন্দেহ আছে। সম্ভবতঃ তাঁহারা ব্রিটিশ রক্ষণশীল ও ইংলণ্ডের জমিদার সম্প্রদায়ের অমুরাগী ছিলেন। আরমেনিয়ান হত্যাকাণ্ডের জন্ত, তুরস্কের

সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রতিক্রিয়া

পুনঃ পুনঃ নিন্দা করায় তাঁহারা প্রাভট্টোনকে ছুঁচক্ষে দেখিতে পারিতেন না। তবে ডিস্ট্রিক্ট তুরস্কের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন বলিয়া তাঁহারা তাঁহার প্রতি (অবশ্য অল্পসংখ্যক মুসলমানই তখন এই সদ্য ব্যাপারের খোঁজ রাখিতেন) একটু পক্ষপাত দেখাইতেন।

শ্রর সৈয়দ আহম্মদ খাঁর কতকগুলি বক্তৃতা আজকাল পড়িলে অত্যন্ত আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়। যখন কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হইতেছিল তখন, কংগ্রেসের অতি সাধারণ ও সামান্য দাবীরও সমালোচনা করিয়া ১৮৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি লঙ্কো-এ এক বক্তৃতা করেন। শ্রর সৈয়দ বলিয়াছিলেন,—“যদি গভর্নমেন্ট আফগানিস্থানের সহিত যুদ্ধ করেন অথবা ব্রহ্মদেশ জয় করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের নীতি সমালোচনা করিবার আমাদের কোন অধিকার নাই।.....গভর্নমেন্ট আইন প্রণয়নের জন্য একটি কাউন্সিল গঠন করিয়াছেন.....সকল প্রদেশ হইতে শাসনকার্য্যে দক্ষ এবং জনসাধারণের অবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ কর্মচারীদিগকে এই কাউন্সিলে লওয়া হয় এবং সমাজে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন এবং ঐ সভায় বসিবার উপযুক্ত কয়েকজন রইসুলেও (বড় জমিদার) উহাতে লওয়া হয়। কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারে যে, যোগ্যতার পরিবর্তে সামাজিক মর্যাদা দেখিয়া তাহাদের লওয়া হয় কেন?.....আমি তোমাদের জিজ্ঞাসা করি—একজন নিম্নশ্রেণীর অথবা সাধারণ বংশের লোক, হউক না কেন সে এম, এ বা বি, এ, থাকুক তাহার যোগ্যতা,—আমাদের অভিজাত সম্প্রদায় কি অহুমোদন করিবেন যে ঐ ব্যক্তি প্রভুত্বের আসনে বসিয়া তাঁহাদের সম্পত্তি ও জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট আইন প্রণয়নের ক্ষমতা লাভ করিবে? কদাচ নহে!একজন উচ্চবংশের লোক ব্যতীত, কাহাকেও বড়লাট তাঁহার সহকর্মীরূপে গ্রহণ করিয়া ভ্রাতার মত ব্যবহার করিতে পারেন না; যেখানে ডিউক এবং আর্লগণ থানা খাইবেন, সেই সকল ভোজসভাতেও তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে.....আমরা কি বলিতে পারি যে গভর্নমেন্ট আইন প্রণয়নের যে উপায় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় নাই? আমরা কি বলিতে পারি যে আইন প্রণয়নে আমাদের কোন হাত নাই?—না, নিশ্চয়ই নহে।” *

ভারতে ‘গণ-তান্ত্রিক ইসলামের’ নেতা ও প্রতিনিধির মুখে এই কথা! অদ্যকার দিনে অযোধ্যার তালুকদার, আগ্রা, বান্সলা, বিহারের জমিদারগণও ঐ শ্রেণীর বক্তৃতা করিতে সাহসী হইবেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু এ

* উদ্ধৃত অংশ হামস কোণের “প্রাচ্যের জাতীয়তাবাদের ইতিহাস” হইতে গৃহীত।

জওহরলাল মেহর

ব্যাপারে স্তর সৈয়দই একা নহেন। সেকালের অনেক কংগ্রেসের বক্তৃতায়ও এইরূপ আশ্চর্য্য বোধ হইবে। কিন্তু সেকালের হিন্দু-মুসলমান সমস্তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক এইরূপ ছিল;—উদীয়মান ও স্বচ্ছল আর্থিক অবস্থার মধ্যশ্রেণীকে (হিন্দু) সামন্ততান্ত্রিক জমিদার শ্রেণী (মুসলমান) কতকাংশে বাধা দিয়াছেন ও সংযত করিয়াছেন। হিন্দু জমিদারেরা তাহাদের বুজ্জিয়াশ্রেণীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হওয়ায় অনেকটা নিরপেক্ষ থাকিতেন, এমন কি মধ্যশ্রেণীর দাবীগুলির প্রতি সহানুভূতি দেখাইতেন, কেন না, ঐ সকল দাবীর পশ্চাতে প্রায়ই তাঁহাদের প্রভাব থাকিত। ব্রিটিশগণ সর্বদাই সামন্ততান্ত্রিক অংশের পক্ষে থাকিতেন। এই অভিনয়ের কোন পক্ষেই জনসাধারণ বা নিম্ন মধ্যশ্রেণীর স্থান ছিল না।

স্তর সৈয়দের শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব ভারতীয় মুসলমানদের উপর প্রভাব বিস্তার করিল এবং আলীগড় কলেজ তাঁহার আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হইয়া উঠিল। পরিবর্তনের সময় উন্নতিশীল আগ্রহ শীঘ্রই তাহার কর্তব্য শেষ করিয়া পরিণতির মুখে উন্নতির পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায়। ভারতীয় লিবারেলগণ তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁহাদের দেখিলে মনে হয়, তাঁহারা পুরাতন কংগ্রেসের ভাবধারার প্রকৃত উত্তরাধিকারী, আয়ুরাই উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছি। সত্য সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে জগৎ পরিবর্তিত হইতেছে, প্রাচীন কংগ্রেসের ভাবধারা প্রভাতের শিশিরের মত মিলাইয়া গিয়া এখন স্মৃতিমাত্রে পর্ধাবসিত। সেইরূপ স্তর সৈয়দের বার্তার প্রয়োজন ও উপযোগিতা তখন ছিল, কিন্তু ইহা কখনও উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের চরম আদর্শ হইতে পারে না। সম্ভবতঃ তিনি যদি আর এক পুরুষ পরেও জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহার বার্তাকে নূতন রূপ দিতেন। অথবা! অগ্ৰাণ্ত নেতারা তাঁহার বার্তার নূতন ব্যাখ্যা করিয়া তাহা পরিবর্তিত অবস্থায় প্রয়োগ করিতেন। কিন্তু স্তর সৈয়দের সাক্ষ্য এবং তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃ পুরাতন বিশ্বাস ছাড়িয়া অগ্রসর হওয়া অপরের পক্ষে কঠিন হইয়াছে এবং দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে, যাহারা নূতন পথ দেখাইতে পারেন এমন অনন্তসাধারণ যোগ্যব্যক্তির একান্ত অভাব। আলীগড় কলেজ অনেক ভাল কাজ করিয়াছে, বহুসংখ্যক যোগ্যব্যক্তি প্রস্তুত করিয়াছে, শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায়ের মানসিক গতি পরিবর্তন করিয়াছে; তথাপি উহা তাহার আদিম কাঠামো হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারে না—সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব ইহার উপর রাজত্ব করিতেছে এবং ছাত্রদের

সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রতিক্রিয়া

সাধারণ উচ্চাশার লক্ষ্য গভর্ণমেন্ট চাকুরী লাভ। হুলভের সন্ধানে গ্রহ-তারকায় ভ্রমণ করিবার দুবাকাজ্ঞা তাহার নাই, একটি ডেপুটি-কলেঙ্টারের পদ পাইলেই সে সুখী। মহান ইসলাম-গণতন্ত্রের সৈনিক, এই কথা স্বরণ করাইয়া দিয়া তাঁহার গর্বেকে তৃপ্ত করা হয়, এবং এই ভ্রাতৃত্বের প্রমাণ স্বরূপ সে মহানন্দে ‘তুর্কী-ফেজ্’ বলিয়া কথিত লালটুপী গর্ভিত ভঙ্গীতে মাথায় চাপায়, কিন্তু অল্পদিন হইল তুর্কীরা নিজেরাই ঐ টুপী সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিয়াছেন। সে তাহার অপরিবর্তনীয় গণতান্ত্রিক অধিকার,—যাহার বলে সে সমস্ত মুসলমান ভ্রাতার সহিত একত্রে আহার ও উপাসনা করিতে পারে,—সে সম্বন্ধে রুতনিশ্চয় হইয়া, ভারতে অন্য কোন প্রকার রাজনৈতিক গণতন্ত্রের অস্তিত্ব লইয়া মাথা ঘামায় না।

দৃষ্টির এই সঙ্কীর্ণতা, সরকারী চাকুরীর জগৎ লালায়িত হওয়া কেবল আলীগড় ও অত্রাণ স্থানের মুসলমান ছাত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। হিন্দু ছাত্রদের মধ্যেও ইহা সমানভাবেই দেখা যায়, এবং তাহাদের মধ্যেও ভাগ্যের সহিত সংগ্রামপ্রবণতার অত্যন্ত অভাব। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে তাহাদের কেহ কেহ গতানুগতিক পথ হইতে ছিটকাইয়া পড়ে। তাহাদের সংখ্যা প্রচুর অথচ চাকুরীর সংখ্যা কম, কাজেই তাহারা শ্রেণীভেদে শিক্ষিত সম্প্রদায়ে পরিণত হয়, এবং ইহারাই বৈপ্লবিক জাতীয় আন্দোলনগুলির মেরুদণ্ড।

শ্রর সৈয়দ আহম্মদ খান রাজনৈতিক বাস্তবতার ফলস্বরূপ পঞ্চদশ হইতে ষতন মুসলমান সম্প্রদায় সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারে নাই তখন বিংশ শতাব্দীর সেই প্রারম্ভিক বৎসর গুলিতে নবজাগ্রত জাতীয় আন্দোলনের সহিত মুসলমানদের ভেদ ঘটাইতে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট অনেক সূবিধা পাইয়াছিলেন। ১৯১৯ সালে শ্রর ভ্যালেন্টাইন চিরোল তাঁহার “ইণ্ডিয়ান আনরেট” নামক পুস্তকে লিখিয়াছিলেন,—“ইহা নিশ্চিতরূপেই জোর করিয়া বলা যায় যে, অদ্যকার মত আর কোন সময়েই ভারতীয় মুসলমানেরা সমগ্রভাবে নিজেদের স্বার্থ ও আশা আকাজ্ঞা, ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্ব ও প্রতিষ্ঠা সহিত ঘনিষ্ঠভাবে এক করিয়া দেখে নাই।” রাজনীতিক্ষেত্রে ভবিষ্যৎবাণী করা বিপজ্জনক। শ্রর ভ্যালেন্টাইনের উহা লিখিবার পাঁচ বৎসর পরেই মুসলমান শিক্ষিত সম্প্রদায়, দুঃসাধ্য উদ্যমে তাঁহাদের চরণ শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া কংগ্রেসের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দশ বৎসরের মধ্যে ভারতীয় মুসলমানেরা যেন কংগ্রেসকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন এবং ইহার নেতার আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই দশ বৎসরে মহাযুদ্ধ আসিয়াছে, গিয়াছে এবং রাখিয়া গিয়াছে, বিপর্যাস জগৎ।

জওহরলাল নেহরু

তথাপি শ্রম ভ্যালেনটাইনের ঐক্যপন্থী সিদ্ধান্তে আসিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল। আগা খাঁ মুসলমানদের নেতারূপে আবিষ্কৃত হইলেন এবং এই ঘটনায় প্রমাণিত হইল যে তাঁহারা মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারার কত অল্পরক্ত, কেন না—আগা খাঁ বুর্জোয়া-শ্রেণীর নেতা নহেন। তিনি একজন অতুল ঐশ্বর্যশালী সামন্ত এবং এক ধর্ম সম্প্রদায়ের নেতা, ব্রিটিশ শাসকসম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতার জগ্ন ইংরাজের দৃষ্টিতে তিনি একেবারে “মনের মানুষ”। তিনি মাজ্জিতরুচি ভদ্রব্যক্তি, অধিকাংশ সময়ই তিনি ইউরোপে থাকেন, ঘোড়দৌড় ও খেলা ধূলা লইয়া ধনী ইংরাজ জমিদারদের গ্রাম জীবন যাপন করেন, কাজেই ব্যক্তি হিসাবে তিনি শ্রেণী বা সম্প্রদায়গত ব্যাপারে সন্ধীর্ণচেতা হইতেই পারেন না। তাঁহার মুসলমানদের নেতৃত্বের অর্থ, মুসলমান জমিদার সম্প্রদায় ও ক্রমবর্ধিত বুর্জোয়া শ্রেণীকে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সহিত একসূত্রে গাঁথিয়া দেওয়া। সাম্প্রদায়িক স্বার্থ এক গোণ ব্যাপার হইলেও এই মূল উদ্দেশ্যের জগ্নই উহার উপর জোর দেওয়া হইত। শ্রম ভ্যালেনটাইন চিরোল আম্মাদিগকে সুনাইয়াছেন, আগা খাঁ, বড়লাট লর্ড মিন্টোকে বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, “বঙ্গ বিভাগের ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে মুসলমানদের অভিমত এই যে, যদি হিন্দুদের সহসা কোন রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর প্রাধান্য লাভের পথই প্রস্তুত হইবে, তাহা হইতে উহা, ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্বের পক্ষে এবং যাহাদের রাজভক্তি সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই সেই সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের পক্ষে সমান ভাবে বিপজ্জনক হইবে।

কিন্তু বাহ্যতঃ ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের অঞ্চল ধরিয়া দাঁড়াইবার অন্তরালে অগ্রাণু শক্তি কার্য্য করিতেছিল। নূতন মুসলমান বুর্জোয়া শ্রেণী অনিবার্যরূপে প্রচলিত ব্যবস্থার উপর ক্রমশঃ অসন্তুষ্ট হইয়া জাতীয় আন্দোলনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছিলেন। আগা খাঁ নিজেও ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং ব্রিটিশকে স্পষ্ট ভাষায় সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। ১৯১৪ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি ‘এডিনবরা রিভিউ’এ (ইহা যুদ্ধের অনেক পূর্বে) উপদেশ দিয়াছিলেন যে, “গভর্নমেন্টের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভেদ ঘটাইবার নীতি পরিত্যাগ করা উচিত; এবং সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়কে একটি দলভুক্ত করিয়া হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত নবভারতের নব জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রয়োগের ব্যবস্থা করা উচিত। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে তিনি মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ অপেক্ষা ভারতের রাজনৈতিক পরিবর্তনের গতিরোধের জগ্নই অধিক আগ্রহী ছিলেন।

সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রতিক্রিয়া

কিন্তু কি আগা থা কি ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট মুসলমান বুর্জোয়া শ্রেণীর জাতীয়তাবাদের অভিমুখে অপরিহার্য অগ্রগতি নিবারণ করিতে পারেন নাই। মহাযুদ্ধ এই অগ্রগতিকে দ্রুত করিল, নূতন নেতারা দেখা দিলেন, মনে হইতে লাগিল আগা থা পিছাইয়া পড়িলেন। আলীগড় কলেজেরও স্বর ঘুরিয়া গেল, নূতন নেতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী আলীদ্রাতৃ-দ্বয়, আলীগড় কলেজেরই ছাত্র। এখন হইতে ডাঃ এম, এ, আনসারী, মোলানা আবুল কালাম আজাদ ও অত্যান্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতারা মুসলমান রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করিতে লাগিলেন। একটু মডারেট ভাবে মিঃ এম, জিন্নাও যোগ দিলেন। গান্ধিজী এই সকল নেতার অধিকাংশকে (মিঃ জিন্না ছাড়া) এবং সাধারণ মুসলমানদিগকে অসংখ্য আন্দোলনে লইয়া আসিলেন, ইহারা ১৯১২-২৩ এর ঘটনাবলীতে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তারপর প্রতিক্রিয়া আসিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক ও নরমপন্থী অনগ্রসর ব্যক্তির তাঁহাদের নিভৃত কোটর হইতে পুনরায় বাহির হইয়া আসিলেন। মন্দগতিতে হইলেও ইহা চলিতে লাগিল। সাম্প্রদায়িক মন কষাকষির দরুণ এই প্রথম হিন্দু মহাসভা জাঁকিয়া উঠিল, তবে রাজনীতির দিক দিয়া ইহা কংগ্রেসের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। মুসলমান সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি মুসলমান জনসাধারণের উপর তাঁহাদের পুরাতন মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় অধিকতর সাফল্য লাভ করিল। তথাপি এক শক্তিশালী নেতৃমণ্ডলী বরাবর কংগ্রেসের দিকে ছিলেন। ইতিমধ্যে গভর্নমেন্ট মুসলমান সাম্প্রদায়িক নেতাদের সকল বিষয়ে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। ইহারা অবশ্য রাষ্ট্রক্ষেত্রে অতিমাত্রায় প্রতিক্রিয়াশীল। ইহাদের সাফল্য লক্ষ্য করিয়া, হিন্দু মহাসভাও তাঁহাদের সহিত পাল্লা দিয়া প্রতিক্রিয়া দেখাইতে লাগিলেন; আশা, এই উপায়ে তাঁহারাও গভর্নমেন্টের বিশ্বাসভাজন হইবেন। অনেক প্রগতিশীল ব্যক্তি হিন্দুসভা হইতে বহিষ্কৃত হইলেন, অনেকে স্বেচ্ছায় ছাড়িলেন; উহা ক্রমে উচ্চ-মধ্যশ্রেণী বিশেষভাবে ধনী ও মহাজনশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইল।

উভয় পক্ষীয় সাম্প্রদায়িক নেতারা, তাঁহারা আইনসভার আসন সংখ্যা লইয়া প্রায়ই তর্ক-বিতর্ক করেন, তাঁহারা গভর্নমেন্টের অগ্রগতি ও পৃষ্ঠপোষকতা দ্বারাই ইহা নিয়ন্ত্রিত হইবে, ইহা ছাড়া কিছু ভাবিতেই পারেন না। ইহা মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জগৎ চাকুরী ও কাজ সংগ্রহের সংঘর্ষ। সকলকে সন্তুষ্ট করিবার মত অধিক চাকুরী নাই, হিন্দু

জওহরলাল নেহরু

ও মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা উহা লইয়া কলহ করিতে লাগিলেন। হিন্দুদের হাতেই বর্তমানে অধিক চাকুরী আছে বলিয়া তাঁহারা উহা রক্ষার জন্ত দাবী করিতে লাগিলেন, অপর পক্ষের প্রার্থনার মাত্রা বাড়িয়া চলিল। চাকুরী লইয়া কলহের পশ্চাতে আরও অধিক কলহের কারণ ছিল; তাহা সাম্প্রদায়িক না হইলেও সাম্প্রদায়িক সমস্যাগুলির উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। মোটের উপর পঞ্জাব, সিন্ধু ও বাঙ্গলায় হিন্দুরা ধনী, মহাজন ও সহরবাসী, এই সকল প্রদেশে মুসলমানেরা দরিদ্র, খাতক ও পল্লীবাসী। অতএব উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ কতকাংশে অর্থনৈতিক হইলেও উহা সাম্প্রদায়িকতায় রঞ্জিত হইয়া প্রকাশিত হয়। পল্লীর ঋণের বোঝা কমাইবার জন্ত বিভিন্ন প্রাদেশিক আইন সভায় উত্থাপিত (বিশেষভাবে পঞ্জাবে) বিল লইয়া আলোচনায় ইহা স্পষ্টভাবে বুঝা গিয়াছিল। হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধিরা ধনী মহাজনশ্রেণীর পক্ষাবলম্বন করিয়া ঐগুলির বিরোধিতা করিয়াছিলেন।

মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা সমালোচনা করিতে গিয়া হিন্দু মহাসভা তাঁহাদের নির্দোষ জাতীয়তাবাদের উপর জোর দিয়া থাকেন। মুসলমান প্রতিষ্ঠানগুলি তাঁহাদের অনন্তসাধারণ সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির যে সকল পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সর্বজনবিদিত ও অতিমাত্রায় প্রত্যক্ষ। মহাসভার সাম্প্রদায়িকতা ততবেশী স্পষ্ট নহে, ইহা জাতীয়তার মুখোমুখি পরিয়া থাকে। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের স্বার্থের ক্ষতিজনক কোন জাতীয় ও গণতান্ত্রিক সমাধানের প্রস্তাব প্রায়ই পরীক্ষারূপে উপস্থিত হয়, এবং এই পরীক্ষায় হিন্দু মহাসভা পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়াছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠদের অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্ত তাঁহারা সিন্ধুপ্রদেশ স্বতন্ত্রীকরণের প্রস্তাবে অবিরত বাধাপ্রদান করিয়াছেন।

কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা গোলটেবিল বৈঠকে অতি আশ্চর্য্য জাতীয়তাবাদব্রোহিতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা দেখাইয়াছেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কেবলমাত্র পাকা সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানদের মনোনীত করিবার দাবী করিয়াছিলেন, এবং ইহারা আগা খান নেতৃত্বে অতিমাত্রায় প্রতিক্রিয়াশীল দলের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। ব্রিটিশ রাষ্ট্রক্ষেত্রে এই দল, কেবল ভারতের দৃষ্টিতেই নহে, ইংলণ্ডের উন্নতিশীল দলগুলির দৃষ্টিতেও অতিমাত্রায় প্রতিক্রিয়াশীল। আগা খান ও তাঁহার দলের সহিত লর্ড লয়েড ও তাঁহার দলের সম্মেলন এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। তাঁহারা আরও অগ্রসর হইয়া ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশন ও অন্যান্য দলের প্রতিনিধিদের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহা অত্যন্ত নৈরাশ্রপ্রদ,

সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রতিক্রিয়া

কেন না এই এসোসিয়েশন ভারতীয় স্বাধীনতার প্রবলতম এবং অতিমাত্রায় আক্রমণশীল প্রতিদ্বন্দী।

হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধিরা স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষার জন্ত নানাবিধ রক্ষাকবচ (বিশেষভাবে পঞ্চাবে) দাবী করিতে লাগিলেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের সহিত সহযোগিতা করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া, তাঁহারা মুসলমানদিগকেও হারাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনই ফল হইল না। তাঁহাদের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইল না, স্বাধীনতার প্রতিও বিশ্বাসঘাতকতা করা হইল। মুসলমানেরা অন্ততঃপক্ষে কিছু মর্যাদার সহিত কথা বলিয়াছিল, কিন্তু হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের তাহাও ছিল না।

আমার নিকট ইহা সর্বদাই আশ্চর্য্য মনে হয় যে, উভয় পক্ষের সাম্প্রদায়িক নেতারা ই উচ্চশ্রেণীর রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়াপন্থীদের প্রতিনিধি এবং এই সকল লোক জনসাধারণের ধর্মবুদ্ধির সুযোগ ও সুবিধা লইয়া কিরূপ সমানভাবে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করেন। উভয়পক্ষই অর্থনৈতিক সমস্তাগুলি গোপন করিবার অথবা এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু শীঘ্রই এমন সময় আসিবে, যখন ইহা আর দাবাইয়া রাখা সম্ভব হইবে না, তখন উভয়পক্ষের নেতারা আগা খার বিশ্ববৎসর পূর্বের সাবধানবাণীতে কর্ণপাত করিবেন এবং মডারেটরা একত্র হইয়া সমস্ত পরিবর্তনমূলক ভাবধারার বিরোধিতা করিবেন, ইহাতে আমার অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা কিয়ৎ পরিমাণে এখনই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে; হিন্দু ও মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা বাহিরে যতই কলহ করুন না কেন, কিন্তু 'ব্যবস্থা-পরিষদে ও অত্র, প্রতিক্রিয়াশীল আইনাদি প্রণয়ন ও প্রবর্তন করিতে ইহারা একমত হইয়া গভর্ণমেন্টকে সাহায্য করিয়া থাকেন। যে ক্ষেত্রে এই তিনপক্ষ একত্র বাধা, ওট্টাওয়া চুক্তি তাহার অগ্রতম।

ইতিমধ্যে রক্ষণশীল দলের অতিমাত্রায় দক্ষিণ-পন্থীদের সহিত আগা খার ঘনিষ্ঠতা কেমন সুন্দরভাবে চলিতেছে, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। ১৯৩৪-এর অক্টোবর মাসে তিনি ব্রিটিশ নেভী লিগের ভোজসভায় সম্মানিত অতিথিরূপে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। উহার সভাপতি ছিলেন লর্ড লয়েড। তিনি ব্রিটল রক্ষণশীল সম্মেলনে ব্রিটিশ নৌ-বল বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা আগা খা সর্বাস্তঃকরণে সমর্থন করেন। দেখা গেল, একজন ভারতীয় নেতা সাম্রাজ্য রক্ষা ও ইংলণ্ডের নিরাপত্তার জন্ত কত উৎকণ্ঠিত। মিঃ বলডুইন অথবা "গ্লাশনাল" গভর্ণমেন্ট অপেক্ষাও ব্রিটিশ রণসম্ভারবৃদ্ধির জন্ত তিনি অধিকতর ব্যস্ত। অবশ্য, শান্তির জন্তই তাঁহার এত মাথাব্যথা।

সংবাদে প্রকাশ, পরের মাসে, ১৯৩৪-এর নভেম্বরে লণ্ডনে ঘরোয়াভাবে একখানি ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়। উহার উদ্দেশ্য, “ব্রিটিশ রাজমুকুটের সহিত মুসলিম-জগতের চিরস্থায়ী বন্ধুত্বকে দৃঢ় করা।” শুনা গেল এক্ষেত্রেও আগা খাঁ এবং লর্ড লয়েড সম্মানিত অতিথি ছিলেন। দেখিয়া বোধ হয় যেন আগা খাঁ ও লর্ড লয়েড অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ দুইটি হৃদয়, এবং সাম্রাজ্যের ব্যাপারে একই ভাবে স্পন্দিত হয়;—আমাদের জাতীয় রাজনীতি-ক্ষেত্রে যেমন সপ্র-জয়াকর। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে যখন দুইজনের মধ্যে এত বেশী দহরম-মহরম, তখন লর্ড লয়েড, ভারতকে অনেক বেশী দেওয়া হইতেছে, এই দুর্বলতার জন্ত নাস্তাল গভর্নমেন্ট ও সরকারী রক্ষণশীল দলের নেতাদিগকে ক্রমাগত তীব্রভাবে আক্রমণ করিতেছিলেন।*

কিছুদিন হইল মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতাদের বক্তৃতা ও বিবৃতিতে একটি নূতন বিষয় লক্ষ্য করা যাইতেছে। ইহার কোন বাস্তব গুরুত্ব নাই, এবং অনেকে সেরূপ ভাবেন কিনা আমি সন্দেহ করি। তৎসত্ত্বেও ইহার মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি স্পষ্ট এবং ইহাকে অনেক বেশী প্রাধান্য দেওয়া হইতেছে। ভারতে ‘মুসলিম নেশন’, ‘মুসলিম কালচার’ প্রভৃতি কথাটির উপর জোর দিয়া দেখান হইতেছে যে, হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতি পরস্পরবিরোধী পৃথক বস্তু, যাহার কোন সম্মেলন হইতে পারে না। ইহা হইতে অনিবার্যরূপে এই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে (যদিও কথাটা খোলাখুলিভাবে বলা হয় নাই) ব্রিটিশ চিরকালের জন্ত ভারতে তুলানো হইতে উপস্থিত থাকিয়া উভয় “সংস্কৃতি”র মধ্যস্থতা করিবেন।

অল্পসংখ্যক হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতাও ঠিক এইভাবে চিন্তা করিয়া থাকেন; তবে পার্থক্য এই যে তাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়া আশা করেন, তাঁহাদের সংস্কৃতিই পরিণামে জয়ী হইবে।

হিন্দু ও মুসলিম ‘সংস্কৃতি’ এবং “মুসলিম নেশন” এই শব্দগুলি অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ লইয়া গবেষণা করিবার কত চিন্তাকর্ষক নূতন নূতন পথের সন্ধান দেয়! ভারতে মুসলমান জাতি—জাতির মধ্যে আর একটা জাতি—মোটাই সজীব নহে; এবং সম্বিতহীন, সর্বত্র বিস্তৃত ও অনিয়ন্ত্রিত। রাজনীতিক্ষেত্রে এই ভাব অর্থহীন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইহা অসম্ভব কল্পনা; ইহা আলোচনারও অধুপযুক্ত, তথাপি ইহা হইতে আমরা

* সম্প্রতি কয়েকজন ব্রিটিশ লর্ড এবং ভারতীয় মুসলমান লইয়া একটি কাউন্সিল গঠিত হইয়াছে। অতিমাত্রায় রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াপন্থীদের মধ্যে মিলন ও ঐক্য সাধনই ইহার উদ্দেশ্য।

সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রতিক্রিয়া

একপ্রকার মনোবৃত্তি বৃদ্ধিতে পারি। মধ্যযুগে এবং তাহার পরও এই শ্রেণী স্বতন্ত্র এবং স্বয়ম্পূর্ণ “বিভিন্ন জাতি” একত্রে বাস করিত। অটোম্যান সুলতানদের প্রথম আমলে কনষ্টান্টিনোপল-এ এই শ্রেণীর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতি পৃথকভাবে বাস করিত এবং ল্যাটিন খৃষ্টান, গৌড়া খৃষ্টান, ইহুদী প্রভৃতির অনেকটা রাজনৈতিক স্বাভাবিকতা ছিল। ইহাই ভৌগোলিক সীমার বাহিরে জাতিগত প্রেমের সূচনা, যাহা বর্তমানকালে বহু প্রাচ্যদেশের বৃহৎ নৈশত্বঃস্বপ্নের মত চাপিয়া আছে। অতএব ‘মুসলিম নেশন’ বলিতে ইহাই বুঝায় যে জাতি বলিয়া কিছু নাই,—কেবল ধর্মের বন্ধন আছে; ইহার অর্থ আধুনিকভাবে জাতি বলিতে যাহা বুঝায় তাহা কিছুতেই গঠন করিতে দেওয়া হইবে না, ইহার অর্থ আধুনিক সভ্যতা বিসর্জন দিয়া আবার মধ্যযুগে ফিরিয়া যাইতে হইবে, ইহার অর্থ, হয় স্বচ্ছাচারী গভর্ণমেণ্ট নয় বৈদেশিক গভর্ণমেণ্ট; চূড়ান্তভাবে ইহার অর্থ, এক মানসিক ভাববিলাস, যাহা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বাস্তবের বিশেষভাবে অর্থনৈতিক বাস্তবের সম্মুখীন হইতে অনিচ্ছুক। ভাবাবেগের নিকট অনেক সময় যুক্তি পরাহত হইয়া যায় : অতএব অযৌক্তিক বলিয়াই আমরা উহার প্রতি উদাসীন থাকিতে পারি না। মুসলিম জাতির ধারণা কয়েকজন লোকের উর্ধ্বর কল্পনাগ্রন্থত, খবরের কাগজে প্রচার না হইলে অতি অল্প লোকই ইহার কথা জানিতে পারিত। তবুও যদি অধিকাংশ লোকের ঐরূপ বিশ্বাস থাকে, তাহা বাস্তবের স্পর্শে বিলুপ্ত হইবে।

হিন্দু ও মুসলমান ‘সংস্কৃতি’ সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা চলে। অগ্র পরের কথা, জাতীয় সংস্কৃতির দিনই চলিয়া যাইতেছে, সমগ্র জগতে একটা সংস্কৃতিগত ঐক্য ফুটিয়া উঠিতেছে। জাতিগুলি থাকিবে—দীর্ঘকাল তাহাদের বিশিষ্ট ভাষা, অভ্যাস, চিন্তাপ্রণালী লইয়া থাকিবে, কিন্তু যন্ত্রযুগ ও বিজ্ঞান, দ্রুত যাতায়াত, অবিশ্রান্ত জগতের সংবাদ আদান প্রদান, রেডিয়ো, সিনেমা প্রভৃতি তাহাদিগকে ক্রমশঃ একই ছাঁচে গড়িয়া তুলিবে। কেহই ইহার গতিরোধ করিতে পারিবে না! যদি কোন খণ্ডপ্রলয়ে বর্তমান সভ্যতা ধ্বংস হইয়া যায় তাহা হইলেই উহা সম্ভব। পরম্পরাগত জীবনের দার্শনিক ব্যাখ্যা লইয়া হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে নিশ্চয়ই ভেদ আছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ও কলকারখানার দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া উহাদের তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে পূর্বোক্ত দুই-এর সহিত ইহার ব্যবধান এত বেশী যে, এই ভূমি হইতে উহাদের পার্থক্য বুঝাই যায় না। ভারতে যে সংঘর্ষ চলিতেছে, তাহা হিন্দু সংস্কৃতির সহিত মুসলমান সংস্কৃতির নহে; এই উভয়ের সহিত জয়দৃপ্ত আধুনিক সভ্যতার

বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির সংঘর্ষ। যাহারা মুসলমান সংস্কৃতি রক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহাদের হিন্দু সংস্কৃতি লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই; পাশ্চাত্যের এই নূতন বীরের সহিত তাঁহাদের লড়াই। ব্যক্তিগত ভাবে, আমার কোন সন্দেহ নাই যে, এই চেষ্টা হিন্দুই করুক আর মুসলমানই করুক, আধুনিক বৈজ্ঞানিক কলকারখানার সভ্যতাকে বাধা দিবার চেষ্টা ব্যর্থই হইবে; এবং এই ব্যর্থতা আমি বিনা-চিন্তিতাপে পর্যবেক্ষণ করিব। যখন রেলওয়ে ও অগ্নি জ্বলিষ আসিয়াছে, তখন জাতসারে বা অজাতসারে আমরা উহা গ্রহণ করিয়াছি। সুর সৈয়দ আহম্মদ খা যখন আলীগড় কলেজ স্থাপন করেন, তখন মুসলমানদের পক্ষ হইতে তিনি উহা বরণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাতে আমাদের কাহারও কোন হাত ছিল না; জলমগ্ন ব্যক্তি উদ্ধারের আশায় হাতের কাছে যাহা পায় তাহাই আঁকড়াইয়া ধরে, ইহা অনেকটা সেইরূপ।

কিন্তু এই মুসলমান সংস্কৃতি বস্তুটা কি? ইহা কি আরব, পারস্য তুরস্ক প্রভৃতির মহৎ কার্যগুলির সম্প্রদায়গত স্থিতি সমষ্টি? অথবা ভাষা? অথবা শিল্প ও সঙ্গীত? অথবা আচার নিয়ম? মুসলমান শিল্প, মুসলমান সঙ্গীত এই শ্রেণীর কথা আজকাল কেহ বলে 'আমি ইহা শুনি নাই'। আরবী ও পারসী এই দুইটি ভাষা, বিশেষভাবে পারসী ভাষা ভারতে মুসলমান চিন্তার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কিন্তু পারসী ভাষার প্রভাবের মধ্যে ধর্মের কোন সংশ্রব নাই। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া পারস্যের ভাষা, আচার নিয়ম ভারতে আসিয়াছে এবং সমগ্র উত্তর ভারতে তাহার প্রভাব প্রত্যক্ষ। পারস্য প্রাচ্যের ফ্রান্স—ইহার ভাষা ও সংস্কৃতি সমস্ত প্রতিবেশীরাই গ্রহণ করিয়াছে। ভারতে আমরা সকলেই এই সাধারণ ও মূল্যবান সম্পদের উত্তরাধিকারী।

ইসলামিক দেশ ও সম্প্রদায়গুলির অতীত কৃতিত্বই সম্ভবতঃ ইসলামিক ঐক্যের সর্বাপেক্ষা দৃঢ়বন্ধন। বিভিন্ন জাতির মুসলমানগণের অতীত মহত্বের স্থিতির জগৎ কেহ কি মুসলমানদিগকে বিদেহ দৃষ্টিতে দেখে? যতদিন পর্যন্ত তাঁহারা ইহা স্মরণে রাখিবেন, ইহার সমাদর করিবেন, ততদিন কেহ তাঁহাদের নিকট হইতে ইহা কাড়িয়া লইতে পারিবে না। কার্যতঃ এই সকল অতীত সম্পদের আমরা সকলেই উত্তরাধিকারী। যখন আমরা ইউরোপের আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের সাধারণ ঐক্য অন্বেষণ করি, সম্ভবতঃ তখন আমরা নিজদের এশিয়াবাসীরূপেই বিবেচনা করি। আমি জানি, যখনই আমি স্পেনে আরবদের যুদ্ধ অথবা ক্রুসেডের ইতিহাস পাঠ করিয়াছি, তখন আমার সহানুভূতি তাহাদের দিকেই

সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রতিক্রিয়া

গিয়াছে। আমি মনে মনে নিরপেক্ষ থাকিয়া উদ্দেশ্য বিচার করিতে চাই, কিন্তু যতই চেষ্টা করি না কেন, যেখানে এশিয়াবাসী জড়িত, সেখানে আমার ভিতরের এশিয়াবাসী আমার বিচারবুদ্ধির উপর প্রভাব বিস্তার করে।

মুসলমান সংস্কৃতি কি, তাহা বুঝিবার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু আমি অসঙ্কোচে বলিব যে আমি কৃতকার্য হই নাই। আমি দেখি যে উত্তর ভারতের মুষ্টিমেয় হিন্দু মুসলমান পারসী ভাষা ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবান্বিত। জনসাধারণের মধ্যে মুসলমান সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রতীক এই যে, খাটোও নহে, বেশী লম্বাও নহে এক প্রকার পায়জামা, একপ্রকার বিশেষ ভঙ্গীতে গোঁফ কামান নয় ছাঁটা, এবং বদনা ব্যবহার, যেমন হিন্দুদের ধুতিপরা, টিকি রাখা এবং লোটা ব্যবহার। এবং এই ভেদও সহরেই বেশী প্রত্যক্ষ এবং তাহাও ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছে। মুসলমান কৃষক ও শ্রমিকদের হিন্দু হইতে স্বতন্ত্রভাবে চেনা কঠিন। শিক্ষিত মুসলমানেরা দাড়ির বাহার বড় পছন্দ করেন না, তবে আলীগড় এখনও টিকিওয়ালা তুর্কী টুপীর অনুরক্ত। (ইহাকে তুর্কী টুপী বলা হইলেও তুর্কদের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই।) মুসলমান মহিলারা সাড়ী পরিয়া থাকেন এবং ধীরে ধীরে পর্দার বাহিরে আসিতেছেন। এই সকল অভ্যাসের কতকগুলির সহিত আমার নিজের রুচি খাপ খায় না, দাড়ি গোঁফ অথবা টিকির আমি ভক্ত নহি, কিন্তু আমার নিজের রুচি অপরের উপর বলপূর্বক চাপাইবার কোন ইচ্ছা না থাকিলেও এ কথা স্বীকার করিতে দ্বিধা নাই যে, যখন কাবুলে আমানুল্লা দাড়ির বংশ ধ্বংস করিতে লাগিয়া গিয়াছিলেন, তখন আমি আনন্দিত হইয়াছিলাম।

যে সকল হিন্দু মুসলমান সর্বদাই পশ্চাদৃষ্টিপরায়ণ এবং যাহা চলিয়া যাইতেছে তাহা ধরিয়া রাখিবার জন্য ব্যগ্র—তাহারা বর্তমান জগতে অতি করুণ দৃশ্য। আমি অতীতকে নিছক মন্দও বলিতে চাই না, উহা বর্জন করিতেও চাই না, কেন না আমাদের অতীতের মধ্যেও অনেক সুন্দর, অনেক মহান বস্তু রহিয়াছে। তাহা যে টিকিয়া থাকিবে, ইহাতে আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহা সুন্দর ও মহান, ঐ সকল ব্যক্তি তাহাই ধরিয়া রাখিতে চাহেন না, যাহা তুচ্ছ, এমন কি অনিষ্টকর তাহা লইয়াই আগ্রহ দেখান।

অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতীয় মুসলমানেরা বারম্বার আঘাত পাইয়াছেন, তাঁহাদের কতকগুলি চিরপোষিত ধারণা ভাঙিয়া গিয়াছে। যে খিলাফতের জন্য ভারতীয় মুসলমানেরা ১৯২০-এ সাহসের সহিত যুদ্ধ

করিয়াছিলেন, তুর্কী—ইসলামের প্রধান ঘোষা—সেই ষিলাকং ত বিলোপ করিয়াছেই, এক পা এক পা করিয়া ধর্ম হইতেও তাহারা সরিয়া যাইতেছে। তুরস্কের নূতন শাসন-তন্ত্রের একটি স্ত্রে ছিল যে, তুরস্ক মুসলিম-রাষ্ট্র; কিন্তু যদি কাহারও কোন ভুল হয়, সে জন্ম ১৯২৭ সালে কামাল পাশা বলিয়াছিলেন, “শাসনতন্ত্রে তুরস্ককে মুসলিম রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করা, একটা আপোষ মাত্র; প্রথম স্ত্রযোগেই উহা পরিত্যক্ত হইবে।” আমার যতদূর স্মরণ হয়, পরে তিনি এই কথামত কার্য্য করিয়াছেন। মিশর যদিও অধিকতর সাবধানে অগ্রসর হইতেছে; তথাপি সে ধর্ম হইতে রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। আরব জাতির অধ্যুষিত দেশগুলিতেও সেইরূপ; তবে খাটি আরবদেশ অবশ্য এখনও অনেক বেশী পশ্চাৎপদ। সংস্কৃতিগত প্রেরণা লাভ করিবার জন্ম পারশ্ব তাহার প্রাক-ইসলামিক অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে। সর্বত্রই ধর্ম পশ্চাতে সরিয়া যাইতেছে; জাতীয়তাবাদ যোদ্ধাবেশ পরিয়া মুখ্য হইয়া উঠিতেছে; তাহার পশ্চাতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রাগ্র মতবাদ। তাহা হইলে ‘মুসলমান জাতি’ বা মুসলমান সংস্কৃতি কি? ভবিষ্যতে উহা কি কেবল দয়ালু ব্রিটিশ শাসনের অধীনে কেবল উত্তর ভারতেই দেখা যাইবে?

যাহা কিছু রাজনীতি তৎসম্পর্কে ব্যক্তির উদার ধারণা পোষণ যদি উন্নতি হয়, তাহা হইলে আমাদের সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ও গভর্নমেন্ট তাহার বিপরীত লক্ষ্যেই ইচ্ছা করিয়া চলিয়াছেন—এই ধারণাকে যথাসম্ভব সঙ্কীর্ণ করিয়া।

বন্ধ পথ

আমার পুনরায় গ্রেফতার ও কারাদণ্ডের সম্ভাবনা সর্বদাই মাথার উপর ঝুলিতে লাগিল। যখন সমগ্র দেশ অর্ডিন্যান্স বা অল্পরূপ ব্যবস্থায় শাসিত এবং কংগ্রেস বে-আইনী প্রতিষ্ঠান তখন নিশ্চয়ই ইহা সম্ভাবনা অপেক্ষাও অনেক বেশী। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যে ভাবে গঠিত এবং আমি যেভাবে গঠিত তাহাতে আমাকে দমন করা অনিবার্য। এই নিত্যসংক্রান্ত সম্ভাবনার মধ্যেই আমি কাজকর্ম করিতে লাগিলাম। কোন কাজই ধীরভাবে করা হইয়া উঠে না, তবুও আমি ব্যস্তভাবে যতটা পারি কাজ করিতে লাগিলাম।

তথাপি আমার গ্রেফতার হইবার ইচ্ছা আদৌ ছিল না, যে সকল কাজে গ্রেফতারের সম্ভাবনা, আমি তাহা বহুলাংশে এড়াইয়া চলিতাম। আমাদের প্রদেশের নানাস্থান ও বাহির হইতেও প্রচারকার্যের জগু আহ্বান আসিতে লাগিল। আমি সম্মত হইলাম না, কেন না, বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতে গেলে তাহা সহসা বন্ধ হইয়া যাইবার সম্ভাবনাই অধিক। আমার পক্ষে মাঝামাঝি কোন পথ নাই। অন্য কোন উদ্দেশ্য লইয়া কোন স্থানে গেলেও,—যেমন গান্ধিজীর সহিত বা কার্য্যকরী সমিতির সদস্যদের সহিত দেখা করা—আমি জনসভায় স্বাধীন ভাবেই বক্তৃতা করিতাম। জব্বলপুরে এক বিরাট শোভাযাত্রা ও বিশাল জনতা হইয়াছিল; দিল্লীতে যে জনসভা হইয়াছিল, অতবড় জনতা আমি সেখানে আর দেখি নাই। এই সকল সভার সাফল্য হইতে বুঝা গেল যে গভর্নমেন্ট মাঝে মাঝেই ইহার পুনরাবৃত্তি সহ্য করিবেন না। দিল্লীতে সভার অব্যবহিত পরেই প্রবল জনরব উঠিল যে আমার গ্রেফতার আসন্ন; কিন্তু আমি সে যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম এবং এলাহাবাদে ফিরিবার পথে আলীগড়ে আসিয়া মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সভায় বক্তৃতা করিলাম।

যখন গভর্নমেন্ট সর্ববিধ রাজনৈতিক কার্য্য পিষিয়া মারিতেছেন তখন অ-রাজনৈতিক কোন জনসাধারণের কার্য্যে যোগ দেওয়া আমার নিকট অপ্রীতিকর মনে হইত। আমি লক্ষ্য করিলাম, অনেক কংগ্রেসপন্থীই

অন্যান্য কাজের মধ্যে গিয়া পড়িতেছেন, ঐ কাজগুলি ভাল হইলেও আমাদের সংঘর্ষের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। অন্যদিকে বুঁকিয়া পড়িবার প্রবণতা স্বাভাবিক হইলেও আমার মনে হইল ইহাতে উৎসাহ দিবার সময় তখনও আসে নাই।

১৯৩৩-এর অক্টোবর মাসের মধ্যভাগে, এলাহাবাদে যুক্ত-প্রদেশের কংগ্রেসকর্মীদের একসভা এলাহাবাদে আহূত হইল। সভার উদ্দেশ্য বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া ভবিষ্যত কর্মনীতি স্থির করা। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বে-আইনীয় প্রতিষ্ঠান, আইন অমান্য না করিয়া মিলিত হইবার জন্ত আমরা কংগ্রেস কমিটির সভা আহ্বান করিলাম না। কিন্তু যে সকল সদস্য জেলের বাহিরে ছিলেন এবং অগ্ৰাণ্ড বাছা বাছা কর্মীকে আমরা ঘরোয়া বৈঠকে আহ্বান করিলাম। ঘরোয়া বৈঠক হইলেও এই সভা সম্বন্ধে কোন গোপনতা ছিল না এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা জানিতাম না যে ইহাতে গভর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিবেন কি না! এই সভায় জগতের বর্তমান অবস্থা লইয়া অনেক আলোচনা হইল—অর্থনৈতিক সঙ্কট, নাংসীজম, কমুনিজম প্রভৃতি। আমাদের অভিপ্রায় ছিল এই যে অগ্ৰত যাহা যাহা ঘটিতেছে, আমাদের সহকর্মীরা ভারতের সংঘর্ষও তাহার সহিত যুক্ত করিয়া দেখুক। অবশেষে এই সম্মেলনে আমাদের উদ্দেশ্য নির্দেশ করিয়া এক সমাজতান্ত্রিক প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং নিরুপদ্রব প্রতিরোধ নীতি বর্জনের প্রতিবাদ করা হইল। সকলেই উত্তমরূপে জানিত যে ব্যাপক ভাবে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ নীতি চলিবার কোন সম্ভাবনা নাই, ব্যক্তিগত প্রতিরোধও মন্দীভূত হইয়া অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হইতেছে। কিন্তু প্রত্যাহারের ফলে আমাদের দিক দিয়া অবস্থার কোনই পরিবর্তন হইবে না, কেন না, গভর্ণমেণ্টের অর্ডিন্যান্সী আইনের আক্রমণ চলিতেই থাকিবে। কাজেই কেবল একটা বাহিরের ঠাট বজায় রাখিবার মতই আমরা নিরুপদ্রব প্রতিরোধ চালাইবার সঙ্কল্প করিলাম, কিন্তু আমরা কর্মীদেরকে উপদেশ দিলাম যে, তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যেন কারাবরণ না করে। তাহারা সাধারণ ভাবে কাজ করিয়া যাইবে তাহার ফলে যদি গ্রেফতার হইতে হয়, তাহা হইলে হাসিমুখে তাহা গ্রহণ করিবে। বিশেষভাবে তাহাদিগকে পঞ্জীঅঞ্চলের সহিত যোগস্থাপন করিতে বলা হইল, সরকারী দমননীতি ও খাজনা মাপের ফলে বর্তমানে কৃষকদের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাও অনুসন্ধান করিতে বলা হইল। তখন খাজনাবন্ধ আন্দোলনের কোন প্রশ্ন ছিল না। পুণা-সম্মেলনের পর উহা আনুষ্ঠানিক ভাবে

প্রত্যাহার করা হইয়াছিল, এবং বর্তমান অবস্থায় উহার পুনঃপ্রবর্তন যে অসম্ভব তাহা বলাই বাহুল্য।

এই কার্যপদ্ধতি অত্যন্ত নরম ও নির্দোষ, ইহাতে বে-আইনী কিছুই ছিল না, কিন্তু তথাপি আমরা জানিতাম ইহার ফলেও গ্রেফতার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আমাদের কর্মীরা গ্রামে কিরিয়া যাইবার পরই তাহাদের গ্রেফতার করা হইতে লাগিল, এবং অত্যন্ত অগ্রায় ভাবে তাহাদের উপর খাজনাবদ্ধ এচারের (অর্ডিন্যান্সীয় অপরাধ) অভিযোগ আনিয়া কারাদণ্ড দেওয়া হইতে লাগিল। আমার বহু সহকর্মীর গ্রেফতারের পর আমি নিজে ঐ সকল পল্লীঅঞ্চলে যাইবার সঙ্কল্প করিলাম, কিন্তু অগ্রাত্ত কাজের চাপে আমার যাওয়া ঘটয়া উঠিল না।

এই কয়মাসে ভারতের অবস্থা বিবেচনার জন্য দুইবার কার্যকরী সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। সমিতি হিসাবে ইহার কোন কাজ ছিল না, বে-আইনী বলিয়া নহে, পূণা-সম্মেলনের পর গান্ধিজীর নির্দেশে সমস্ত কংগ্রেস কমিটি ও আনুষ্ঠানিক পদগুলি প্রত্যাহৃত হইয়াছিল। জেল হইতে বাহির হইয়া আমি অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে পড়িলাম, এই আত্ম-বিলোপমূলক অর্ডিন্যান্স মানিয়া লইতে আমার মন সায় দিল না। আমি আমাকে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলাম। কিন্তু আমি শূণ্যে ভাসিতে লাগিলাম। কোন শৃঙ্খলাবদ্ধ কার্যালয় নাই, কর্মচারী নাই, কার্যকরী সভাপতি নাই, গান্ধিজীর সহিত পরামর্শ করা সম্ভবপর হইলেও তিনি তখন হরিজন কার্যোপলক্ষ্যে সমগ্র ভারত ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। আমরা কোন রকমে জবলপুর ও দিল্লীতে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া, কার্যকরী সমিতির সদস্যগণ সহ কিছু আলোচনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। ইহা হইতে প্রত্যেকের মতভেদ স্পষ্ট করিয়া বুঝা গেল। অন্ধ গলির মধ্যে আমরা আটকাইয়া গেলাম, কোন সর্বসম্মত পথ খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। নিরুপদ্রব প্রতিরোধ-নীতি যাহারা প্রত্যাহার করিতে ইচ্ছুক এবং যাহারা প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে তাহাদের মতামত গান্ধিজীর সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিতে লাগিল। তিনি প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে ছিলেন বলিয়া পূর্বের মতই চলিতে লাগিল।

কংগ্রেসের পক্ষ হইতে আইন সভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা মাঝে মাঝে কংগ্রেসপন্থীরা আলোচনা করিতেন, যদিও কার্যকরী সমিতির সদস্যরা তৎকালে উহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। তখনও অবশ্য এ কথা উঠে নাই,—অস্পষ্ট জল্পনা কল্পনা মাত্র। তখন “রিফর্ম” আসিতেও দুই তিন বৎসর বিলম্ব ছিল এবং ব্যবস্থা

জওহরলাল নেহরু

পরিষদের নব-নির্বাচনও ঘোষিত হয় নাই। ব্যক্তিগত ভাবে মতবাদের দিক দিয়া নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমার কোন আপত্তি ছিল না; এবং আমার মনে নিশ্চিত ধারণা ছিল যে যখন সময় আসিবে, কংগ্রেস উহাতে যোগ দিবে। কিন্তু তখনই সে প্রশ্ন তোলা, কেবল চিত্তবিক্ষেপ সৃষ্টি করা মাত্র। আমি আশা করিয়াছিলাম যে, সংঘর্ষ চলিতে থাকিলেই উপস্থিত কর্তব্য স্পষ্ট হইয়া উঠিবে, এবং আপোষ রক্ষায় উন্মুখ ব্যক্তিদের ঘটনার উপর প্রভাব বিস্তারে বাধা দিবে।

ইতিমধ্যে আমি প্রবন্ধ ও বিবৃতি লিখিয়া সংবাদপত্রে প্রেরণ করিতে লাগিলাম। আমাকে সংযত ভাবে লিখিতে হইত,—কেন না আমার উদ্দেশ্য ছিল ঐগুলি প্রকাশ করা; সেন্সর ও বহুতর আইনের বেড়াঞ্জালও সর্বত্র বিস্তৃত। এমন কি, আমি যদি নিজেকে দায়িত্ব লই, তাহা হইলেও মুদ্রাকর, প্রকাশক ও সম্পাদক রাজী হইবেন না। মোটের উপর সংবাদপত্রগুলি আমার উপর সদয় ব্যবহারই করিয়াছেন এবং আমার অল্পকূলে অনেক যুক্তি দিয়াছেন। তবে সব সময় নহে। সময় সময় বিবৃতি বা অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া হইত; একবার আমার অনেক কষ্ট করিয়া লেখা একটি প্রবন্ধ দিবালোক দেখিবার সুযোগ পাইল না। ১৯৩৪ সালের জ্বাহুয়ারী মাসে যখন আমি কলিকাতায়, তখন অগ্রতম প্রধান দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক আমার সহিত দেখা করিতে আসেন। তিনি বলিলেন যে, আমার বিবৃতিটি তিনি কলিকাতার সমস্ত সংবাদপত্রের ‘প্রধান সম্পাদকের’ নিকট তাঁহার মতামতের জ্ঞাপক পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু প্রধান সম্পাদকের মনঃপুত না হওয়ায়, উহা প্রকাশিত হয় নাই। এই ‘প্রধান সম্পাদক’ হইলেন, গভর্নমেন্টের কলিকাতার প্রেস অফিসার।

সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের সহিত সাক্ষাৎকালে অথবা বিবৃতিতে আমি অনেক সময় ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষের তীব্র সমালোচনা করিতাম। ইহাতে অনেকে কষ্ট হইতেন, ইহার অগ্রতম কারণ এই যে গান্ধিজীৱ জ্ঞাত এই ধারণা সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে কংগ্রেসকে সকল অবস্থাতেই সমালোচনা বা আক্রমণ করা যাইতে পারে এবং তাহাতে প্রতি-আক্রমণের ভয় নাই। গান্ধিজীৱ এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন এবং অল্পবিস্তর প্রধান কংগ্রেসপন্থীরা তাঁহাকে অগ্রসরণ করিতেন, কিন্তু সকল সময়েই যে একরূপ হইত তাহা নহে। সাধারণতঃ আমরা অনিশ্চিত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত বচন আওড়াইতাম, এবং আমাদের সমালোচকেরা ইহার সুবিধা গ্রহণ করিয়া তাহাদের ব্রাস্ত যুক্তি এবং সুবিধাবাদীর কৌশল দিয়া স্বচ্ছন্দে চালাইত। প্রকৃত সমস্তা উভয় পক্ষই এড়াইয়া চলেন; যুক্তি ও তর্ককৌশলের

বন্ধ পথ

ঘাতপ্রতিঘাত সমন্বিত আলোচনা কদাচিৎ দেখা যায়। অথচ পাশ্চাত্য দেশে ফাসিস্ত দেশগুলি ব্যতীত সর্বত্রই এরূপ হইয়া থাকে।

আমার একজন বান্ধবী আমাকে লিখিলেন যে সংবাদপত্রে আমার কতকগুলি বিবৃতিতে জোরালো লেখা দেখিয়া তিনি একটু আশ্চর্য্য হইয়াছেন—আমি প্রায় ‘কুপিত বিড়ালের’ মত হইয়া পড়িয়াছি। ইহার মতামতের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। ইহা কি সত্যই আমার ‘আশাভঙ্গজনিত’ ক্ষোভের বিকাশ? আমি অবাক হইয়া ভাবি। আংশিকভাবে ইহা সত্য, কেন না জাতীয়ভাবে আমরা প্রায় সকলেই আশাভঙ্গের দুঃখে দুঃখী। ব্যক্তিগতভাবেও ইহা অনেকাংশে সত্য। তথাপি এই ভাব সম্পর্কে আমি বিশেষ সচেতন নহি; কেন না ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে কোন পরাভব বা ব্যর্থতার ক্ষোভ নাই। যেদিন হইতে আমি রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধিজীর সংশ্রবে আসিয়াছি, তাঁহার নিকট আমি অন্ততঃ একটি বিষয় শিক্ষা করিয়াছি—ফল কি হইবে এই ভয়ে আমি মনের ভাব গোপন করি না। এই অভ্যাস বলে রাজনীতিক্ষেত্রে কাৰ্য্য করিতে গিয়া (অন্য ক্ষেত্রে ইহার অনুসরণ করা অধিকতর কঠিন এবং বিপজ্জনক) আমি প্রায়ই বিপদে পড়িয়াছি; কিন্তু ইহাতে আমি সন্তোষও লাভ করিয়াছি প্রচুর। আমার মনে হয়, এই উপায়েই আমরা চিন্তের তিক্ততা ও শোচনীয় ব্যর্থতার হানি হইতে অব্যাহতি পাই। বহুলোক একজনকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখে, এই ধারণায় চিন্তদাহ জুড়াইয়া যায়,—পরাভব ও ব্যর্থতার বেদনার উপর ইহা স্নিগ্ধ বিরাম আনে। আমার মনে হয় সর্বজনবিশ্বস্ত নিঃসঙ্গ একাকিত্বই সমস্ত চিন্তা অপেক্ষা ভয়াবহ।

কিন্তু যাহাই হউক না কেন, এই আশ্চর্য্য দুঃখময় জগতে ব্যর্থতার বেদনা হইতে কে অব্যাহতি পায়? কতবার মনে হয় সমস্তই ভুল, তথাপি কাজ করিতে হয়, আমাদের চারিদিকে জনমগুলীর অবস্থা দেখিয়া মন সংশয়ে পূর্ণ হইয়া উঠে। নানা ব্যাপারে ও নানা ঘটনায়, এমন কি, মানুষ ও দলের বিরুদ্ধে আমার চিন্তে রোষ ও ক্রোধের সঞ্চার হয়। ক্রমে আমি বৈঠকখানা বিলাসী অলস জীবনের উপর অধিকতর ঝুট হইয়া উঠিয়াছি। তাঁহারা মূলসমস্যাগুলির প্রতি উদাসীন, ঐগুলি আলোচনা করাও ভাল মনে করেন না, কেন না তাহাতে আর্থিক ক্ষতি বা চিরপোষিত কোন সংস্কারে আঘাত লাগিতে পারে। এই সকল রোষ, আশাভঙ্গজনিত বেদনা এবং ‘কুপিত বিড়ালের স্বভাব’ সত্ত্বেও, আমার ভরসা এই যে আমি এখনও আমার নিজের ও অপরের নির্ভুলতা দেখিয়া হাসিবার ক্ষমতা হারাই নাই।

জওহরলাল নেহরু

দয়ালু ঈশ্বরের উপর লোকের বিশ্বাস দেখিয়া আমি সময় সময় অবাক হইয়া যাই; আঘাতের পর আঘাত, সর্বনাশেও ইহা অটল থাকে; এবং দয়ার বিপরীত প্রমাণগুলি বিশ্বাসের পরীক্ষারূপে বিবেচনা করা হয়। জেদ্দা হপকিন্সের নিম্নোক্ত কবিতাংশ অনেকের হৃদয়েই প্রতিধ্বনি তুলিবে,—

“তুমি নিশ্চয়ই গায়বান, হে প্রভু, কিন্তু আমি যদি তোমার সহিত বাদে প্রবৃত্ত হই, আমার যুক্তিও গায়সঙ্গত হইবে। পাপীদের পাপের পথে শ্রীবৃদ্ধি হয় কেন? আমার সমস্ত চেষ্টাই নৈরাশ্রে পর্য্যবসিত হয় কেন? হে আমার বন্ধু, তুমি কি আমার শত্রু ছিলে? আমি আশ্চর্য্য হইয়া ভাবি, তুমি আমাকে পরাজিত ও ব্যর্থ করা ছাড়া আর কি অধিক মন্দ করিতে পার? হায়, মতপ ও কামুকও অবসরকালে দিব্য উন্নতিলাভ করে, কিন্তু প্রভু, আমি সারাক্ষণ তোমার কাজ করিয়াও তাহা পারি না।”

উন্নতিতে বিশ্বাস, কোন কাজ, আদর্শ, মানবের সাধুতা ও মানব নিয়তিতে বিশ্বাস কি দৈবের উপর বিশ্বাসের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত নহে? যদি আমরা গায় ও যুক্তি দ্বারা উহা প্রমাণ করিতে যাই, তাহা হইলেই বিব্রত হইতে হয়। কিন্তু আমাদের ভিতরে এমন একটা বস্তু আছে, যাহা আশা ও বিশ্বাস আঁকড়িয়া ধরে,—উহা হইতে বঞ্চিত হইলে জীবন তরুণুল্লহীন মরুভূমি হইয়া পড়ে।

আমি সমাজতন্ত্রবাদ প্রচার করি বলিয়া কার্য্যকরী সমিতির আমার সহকর্মীরা পর্য্যন্ত বিব্রত হইয়া উঠেন। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া তাঁহারা যেভাবে আমার এই প্রচারকার্য্য সহ করিয়া আসিতেছেন; সেই ভাবেই তাঁহাদিগকে বিনা আপত্তিতে ইহা সহ করিতে হইবে; কিন্তু এখন আমি দেশের কায়েমী স্বার্থবাদীদের অনেকাংশে ভীত করিয়া তুলিয়াছি এবং আমার কার্য্যপ্রণালীকে এখন আর নির্দোষ বলা চলে না। আমি জানি আমার কোন কোন সহকর্মী সমাজতন্ত্রী নহেন, কিন্তু আমি সর্বদাই ইহা মনে করি যে কংগ্রেসের কার্য্যকরী সভার সদস্য হিসাবে কংগ্রেসকে দায়ী বা জড়িত না করিয়াও ব্যক্তিগতভাবে সমাজতন্ত্রবাদ প্রচারের আমার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কার্য্যকরী সমিতির কোন কোন সদস্য আমার এই স্বাধীনতা আছে বলিয়া বিবেচনা করেন না, একথা শুনিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি। আমি তাঁহাদিগকে অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্যে ফেলিতেছি বলিয়া তাঁহারা রুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু আমি কি করিব? আমার কাজের মধ্যে যাহাতে আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব আরোপ করি, তাহা বর্জন করিতে পারি না। যদি ইহা লইয়া বিরোধ বাধে, তাহা হইলে আমাকে কার্য্যকরী সমিতির পদত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু যখন সমিতি বে-আইনী

বন্ধ পথ

ও কার্যতঃ ইহার কোন অস্তিত্ব নাই, তখন কাহার নিকট কোথায় পদত্যাগ পত্র দিব ?

পরে পুনরায় আর এক বিপদ উপস্থিত হইল,—আমার মনে হয়, ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে মান্দ্রাজ হইতে লিখিত গান্ধিজীর একখানি পত্র পাইলাম। ‘মান্দ্রাজ মেইল’ হইতে তাঁহার একটি সাক্ষাতের বিবরণ তিনি কাটিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সাক্ষাৎকারী তাঁহাকে আমার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং তিনি আমার কাব্যপদ্ধতির জন্য প্রায় ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলেন ; আমার সভতার উপর তাঁহার বিশ্বাস আছে যে—আমি কংগ্রেসকে এই নূতন পথে লইয়া যাইব না। আমার সম্পর্কে এই কথায় আমি বিশেষ কিছু মনে করি নাই, কিন্তু এই সাক্ষাৎকারে তিনি যে ভাবে বড় জমিদারীপ্রথা সমর্থন করিয়াছেন, তাহাতে আমি ব্যথিত হইলাম। তিনি যেন পল্লীর ও জাতীয় অর্থনৈতিক অবস্থার দিক দিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ইহাতে আমি আশ্চর্য্য হইলাম, কোন বড় জমিদারী বা তালুকদারীর ইদানীং সমর্থকের সংখ্যা অত্যন্ত বিরল। সমগ্র জগতে এগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ভারতেও অধিকাংশ ব্যক্তি মনে করেন এগুলি আর টিকিতে পারে না। যদি জমিদারেরা উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পান, তাহা হইলে তাঁহারাও আনন্দের সহিত ইহার বিলোপে সম্মতি দিবেন। ১৯৩৪-এর ২৩শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় জমিদার সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে মিঃ পি, এন, ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “আয়র্লণ্ডে যাহা হইয়াছে, সেইভাবে জমিদারদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়া যদি জমিদারদের ভূসম্পত্তি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়, তাহা হইলে ব্যক্তিগত ভাবে আমি মোটেই দুঃখিত হইব না।” বাঙ্গলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে, কাজেই যে অঞ্চলে উহা নাই, সেখানের জমিদার অপেক্ষা বাঙ্গলার জমিদারদের অবস্থা অনেক ভাল, একথা মনে রাখিতে হইবে। জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা সম্পর্কে মিঃ পি, এন, ঠাকুরের ধারণা অস্পষ্ট বলিয়াই মনে হয়। এই প্রথা নিজেদের ভাবেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। তথাপি গান্ধিজী ইহার স্বপক্ষে এবং গ্রায়রক্ষক ও অগ্রাগ্রহণ কণা এই সম্পর্কে ব্যবহার করিয়াছেন। আমাদের উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী কত স্বতন্ত্র এবং আমি বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, ভবিষ্যতে আমি তাঁহার সহিত কি পরিমাণ সহযোগিতা করিতে পারিব ? আমি কি কার্য্যকারী সমিতির সদস্যরূপে কাজ করিতে থাকিব ? তখনই অবশ্য কিছু করিবার ছিল না, ইহার কয়েক সপ্তাহ পরে আমার কারাদণ্ড হওয়ায়, এ প্রশ্নটাই অপ্রাসঙ্গিক হইয়া গেল।

পারিবারিক ব্যাপারে আমাকে অনেক সময় দিতে হইল। আমার

মাতার স্বাস্থ্য অতি ধীরে উন্নত হইতেছিল। তিনি শয্যাশায়িনী হইলেও বিপদ কাটিয়া গিয়াছিল। আমি আমার আর্থিক অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম, দীর্ঘকালের অবহেলায় উহা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা সাধারণ অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া চলিয়াছি অথচ খরচ কমাইবার কোন পরিকার পথও দেখিতে পাইলাম না। আয়ের অল্পপাতে ব্যয় করিবার আমার কোন আগ্রহ ছিল না। যখন আমার আর অর্থ বলিয়া কিছু থাকিবে না, আমি প্রায় সেই অবস্থার জগুই অপেক্ষা করিতেছি। বর্তমান জগতে অর্থ ও সম্পত্তির উপযোগিতা প্রচুর, কিন্তু যে দীর্ঘপথের যাত্রী অনেক সময়ই তাহার নিকট উহা ভারস্বরূপ বলিয়া মনে হয়। ক্ষতির সম্ভাবনা আছে, এমন কাজ করা অর্থশালীব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। তাহারা সর্বদাই তাহাদের স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি ও দ্রব্যাদি হারাইবার ভয়ে ভীত। এই অর্থ ও সম্পত্তির মূল্য কতটুকু,—যখন গভর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলেই যে কোন সময় ইহা দখল লইতে বা বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন? আমার মনে হইল, যৎসামান্য যাহা আছে, তাহা গেলেই ভাল। আমাদের প্রয়োজন অতি অল্প এবং আমার নিজের প্রয়োজন মত উপার্জনের ক্ষমতার উপরও বিশ্বাস আছে। আমার প্রধান চিন্তা হইল মাকে লইয়া। এই জীবন সায়াহ্নে তিনি অসুবিধা বোধ করিতে পারেন কিম্বা জীবন যাত্রাপ্রণালীর ব্যবস্থার সন্ধান দেখিয়া ব্যথিত হইতে পারেন। আমার কন্যার শিক্ষায় বাধা উপস্থিত না হয়, সে চিন্তাও আমার ছিল, কেন না তাহাকে ইউরোপে শিক্ষাদানের অভিপ্রায় আমার আছে। ইহা ছাড়া কি আমি, কি আমার স্ত্রী, আমাদের অধিক অর্থের আবশ্যক নাই। অথবা অর্থের অভাববোধ করিতে অনভ্যস্ত বলিয়াই আমরা ঐরূপ ভাবিয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস যখন এমন সময় আসিবে আমরা অর্থাভাবে পড়িব, তখন নিশ্চয়ই আমরা সুখী হইব না। এক বিষয়ে এখনও আমার ব্যয়বাহুল্য আছে; ইহা বই কেনার অভ্যাস, এই অভ্যাস ছাড়া আমার পক্ষে কঠিন।

আমি অর্থাভাব দূর করিবার জগু আমরা আমার স্ত্রীর অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করার সঙ্কল্প করিলাম। কতকগুলি রূপার জিনিষ এবং অগাধ তৈজসপত্র সহ কয়েক গাড়ী আসবাবও বিক্রয় করা হইল। কমলা প্রায় বার বৎসর যাবৎ গহনাগুলি ব্যবহার করেন নাই, উহা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ছিল, কিন্তু তথাপি তিনি উহা ত্যাগ করিতে রাজী হইলেন না। তিনি উহা আমাদের কন্যাকে দান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

১৯৩৪-এর জানুয়ারী মাস। কোন বে-আইনী কাজ না করা সত্ত্বেও এলাহাবাদ জিলার গ্রামে গ্রামে আমাদের কর্মীরা গ্রেফতার হইতে লাগিল;

বন্ধ পথ

এমতাবস্থায় আমাদের পক্ষেও তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ঐ সকল গ্রামে যাওয়া কর্তব্য হইয়া উঠিল। আমাদের যুক্ত-প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কুশলকর্মা সম্পাদক রফি আহম্মদ কিদোয়াই গ্রেফতার হইলেন। এদিকে ২৬ শে জানুয়ারী—স্বাধীনতা দিবস আসিতেছে, উহা উপেক্ষা করা চলে না। অভিজ্ঞান্স, নিবেদাজ্ঞা প্রভৃতি সত্ত্বেও ১৯৩০ হইতে প্রতি বৎসর দেশের বিভিন্ন অংশে এই অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু কে পুরোভাগে আসিয়া ইহা করিবে? কি ভাবে ইহা করিবার নির্দেশ দিবে? আমি ছাড়া আর কেহ নিখিল ভারত কংগ্রেসের কোন পদে আছেন, ইহা ধরিয়া লইবার উপায় নাই। আমি কয়েকজন বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিলাম, কিছু করা সম্বন্ধে সকলেই একমত হইলেন; কিন্তু সেই কিছু কি, সে সম্বন্ধে মতভেদ ঘটিল। অনেক লোক একসঙ্গে গ্রেফতার হয় এরূপ কাজ না করাই ভাল, এই সাধারণ মনোভাব আমি লক্ষ্য করিলাম। অবশেষে স্বাধীনতা দিবস যথাবিহিতভাবে পালন করিবার জন্ত আমি একটি সংক্ষিপ্ত আবেদন প্রচার করিলাম। কি ভাবে করিতে হইবে, সে ভার স্থানীয় লোকদের উপর রহিল। এলাহাবাদ জিলাব নানাস্থানে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আমরা ঠিক করিলাম।

আমরা বুঝিলাম, স্বাধীনতাদিবসের অনুষ্ঠাতাগণ ঐ দিন গ্রেফতার হইবেন। জেলে যাইবার পূর্বে আমার একবার বাঙ্গলায় যাইবার ইচ্ছা হইল। পুরাতন সহকর্মীদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যেও ছিল; কিন্তু কার্যতঃ গত কয়েক বৎসর ধরিয়া যাহারা অবর্ণনীয় পীড়ন সহ করিয়াছে, বাঙ্গলার সেই জনমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধানিবেদনের জন্তই আমি উন্মুখ হইলাম। আমি ভাল করিয়াই জানি যে আমি তাহাদের কোন সাহায্যই করিতে পারিব না। সহানুভূতি ও আত্মীয়তা যদিও আকাজক্ষার, তথাপি উহার মূল্য কতটুকুই বা। প্রয়োজনের সময় সমস্ত ভারতবর্ষ তাহাকে ভুলিয়া আছে, বিশেষভাবে এই ধারণাও বাঙ্গলায় ছিল। এরূপ ধারণার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ অবশ্য নাই, তথাপি ইহা ছিল।

কমলাকে লইয়া কলিকাতায় গিয়া তাঁহার চিকিৎসা সম্পর্কে ডাক্তারদের সহিত পরামর্শ করার ইচ্ছাও আমার ছিল। তাঁহার শরীর ভাল ছিল না, কিন্তু আমরা উভয়েই ইহা কতকাংশে উপেক্ষা করিয়াছিলাম; কলিকাতা বা অন্ত্র থাকিয়া দীর্ঘকাল চিকিৎসা করিতে হইতে পারে, এই ধারণায় আমরা উহা স্থগিত রাখিয়াছিলাম। জেলের বাহিরে যতদিন আছি, ততদিন যথাসম্ভব উভয়ে একত্র থাকিবার আকাজক্ষা আমাদের ছিল। আমি জেলে ফিরিয়া গেলে তিনি ডাক্তার ও চিকিৎসার যথেষ্ট

সময় পাইবেন। এখন গ্রেফতার নিকটবর্তী বলিয়া মনে হওয়ায় আমি কলিকাতায় আমার উপস্থিতিতে ডাক্তারদের সহিত পরামর্শ করা স্থির করিলাম। অগ্ন্যান্ত বাবস্থা পরে হইতে পারিবে।

আমি ও কমলা ১৫ই জানুয়ারী কলিকাতা যাত্রার দিন স্থির করিলাম। স্বাধীনতাদিবসের সভার পূর্বে ফিরিয়া আসিবার যথেষ্ট সময় হাতে রহিল।

৫৮

ভূমিকম্প

১৯৩৪-এর ১৫ই জানুয়ারীর অপরাহ্ন! আমি এলাহাবাদের বাড়ীর বারান্দায় বসিয়া একদল কৃষকের সহিত কথা বলিতেছিলাম। বার্ষিক মাঘমেলা আরম্ভ হইয়াছে, আমাদের বাড়ীতে সারাদিন দর্শকের অভাব ছিল না। সহসা আমার পা টলিতে লাগিল, পড়িতে পড়িতে নিকটস্থ একটা থাম ধরিয়া টাল সামলাইলাম। দরজা জানালা কাঁপিতে লাগিল, নিকটস্থ স্বরাজভবন হইতে গুরুগম্ভীর ধ্বনি আসিতে লাগিল, সেখানে ছাদ হইতে টালি খসিয়া পড়িতেছিল। ভূমিকম্প সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকার দরুণ প্রথমে আমি কিছু বুঝিতেই পারিলাম না, তবে বুঝিতে বেশী বিলম্ব হইল না। এই অভিনব অভিজ্ঞতায় আমার বড় কোতুক বোধ হইল, আমি কৃষকদের সহিত কথা চালাইতে লাগিলাম এবং তাহাদিগকে ভূমিকম্পের বিষয় বলিতে লাগিলাম। আমার বৃদ্ধা জেঠীমা দূর হইতে চীংকার করিয়া আমাকে দালান ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে বলিলেন। এই আহ্বান আমার নিকট অত্যন্ত হাস্তকর বলিয়া মনে হইল। প্রথমতঃ ভূমিকম্পটা আমি গুরুতর বলিয়া বিবেচনা করি নাই। দ্বিতীয়তঃ আমার রুগ্না মাতা দোতলায় রহিয়াছেন, আমার স্ত্রীও সম্ভবতঃ দোতলায় যাত্রার জন্ত জিনিষপত্র গুছাইতেছেন; তাহাদের কেলিয়া আমি কোনক্রমেই নিজে নিরাপদ স্থানে যাইতে পারি না। মনে হইল বেশ কিছুকাল কম্পন চলিল, তারপর বন্ধ হইয়া গেল। এ বিষয়ে কয়েক মিনিট আলাপের পর আমরা উহা ভুলিয়া গেলাম। আমরা তখন জানিও না, কল্পনাও করিতে পারি নাই যে এই দুই তিন মিনিটের মধ্যে বিহার এবং অগ্ন্যান্ত অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ লোকের কি সর্বনাশ হইয়া গেল!

ভূমিকম্প

সেইদিন সন্ধ্যায় আমি ও কমলা কলিকাতা যাত্রা করিলাম। রাত্রির অন্ধকারে আমাদের ট্রেন যে ভূমিকম্পপীড়িত দক্ষিণ অঞ্চল দিয়া চলিয়া গেল, তাহা বুঝিতেও পারিলাম না। পরদিন কলিকাতায় ধ্বংসলীলার বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। তার পরদিন কিছু কিছু সংবাদ আসিতে লাগিল। তৃতীয় দিবসে আমরা সেই দুর্ভিক্ষপাকের কথা অস্পষ্টভাবে বুঝিতে আরম্ভ করিলাম।

কলিকাতায় আমাদের কাজকর্ম লইয়া ব্যস্ত থাকিলাম। বহু ডাক্তারের সহিত বারম্বার পরামর্শ করিয়া স্থির হইল, দুই একমাস পরে কমলা চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিবেন। দীর্ঘকাল অদর্শনের পর বন্ধুবান্ধব ও কংগ্রেসের সহকর্মীদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সমস্ত সময় আমি এক ভয়াবহ মানসিক অবসাদ অনুভব করিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল, সকলেই যেন বিপদে পড়িবার ভয়ে যে কোন কাজ করিতে ভীত। ইহারা অনেক সহ্য করিয়াছে। ভারতের অগ্ন্যাগ্ন অঞ্চল অপেক্ষা এখানে সংবাদপত্রগুলি অধিক সতর্ক। অগ্ন্যাগ্ন হানের গ্যায় এখানেও ভবিষ্যৎ কার্য্যপদ্ধতি সম্পর্কে সন্দেহ ও অনিশ্চিত মনোভাব দেখিলাম। ভয় অপেক্ষা এই অনিশ্চিত সন্দেহই কার্য্যকরী রাজনৈতিক কর্মধারা অরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ফাসিস্ত মনোভাব অতিমাত্রায় প্রত্যক্ষ—সমাজতান্ত্রিক বা কম্যুনিষ্ট প্রবণতাও আছে—তবে এই সমস্তই মিলিত মিশ্রিত এবং অস্পষ্ট। এই সকল বিভিন্ন দলের সৌম্যরেখা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা কঠিন। টেরোরিষ্ট আন্দোলন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু দেখিবার বা জানিবার সুযোগ ও সময় আমি পাইলাম না। সরকারী তরফ হইতে উহার সম্বন্ধে ঘোষণা এবং বিশেষভাবে উহার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হইতেছিল। আমি যতদূর জানিতে পারিলাম, উহার রাজনৈতিক গুরুত্ব কিছু ছিল না, ঐ দলের প্রবীণ সদস্যদের টেরোরিজম্-এর উপর কোন বিশ্বাস আর ছিল না। তাহাদের চিন্তাপ্রবাহ স্বতন্ত্র পথে চালিত হইতেছিল। বাহা ইউক গভর্নমেন্টের কাছে বাঙ্গলাদেশে যথেষ্ট ক্ষোভ ছিল; এবং তাহার ফলে এখানে ওখানে ব্যক্তিবিশেষ সংঘম হারাইয়া শত্রুভাব প্রদর্শন করিত। উভয়পক্ষেই এই বৈরভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল সন্দেহ নাই। ব্যক্তিবিশেষ টেরোরিষ্টের মধ্যে ইহা যথেষ্ট প্রত্যক্ষ। রাষ্ট্রের মনোভাবের মধ্যেও মাঝে মাঝে প্রতিহিংসা সাধন এবং চিরবৈরিতার ভাব অতিমাত্রায় প্রবল; ধীরভাবে সমাজদ্রোহী কাজগুলি আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া দমনের চেষ্টার অভাব। যে কোন গভর্নমেন্ট টেরোরিজম্ সংক্রান্ত কার্য্যের সম্মুখীন হইলে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে এবং উহা দমন করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু

গভর্নমেন্টের পক্ষে প্রশান্ত সংযম রক্ষা করা আবশ্যক। দোষী নির্দোষী নির্বিশেষে সকলের বিরুদ্ধে নির্বিচারে অতিরিক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে নির্দোষীর সংখ্যা বহুল পরিমাণে বেশী বলিয়া তাহার আঘাত তাহাদেরই উপর গিয়া পড়ে। এইরূপ ভীতিপ্রদর্শনের সম্মুখে ধীর ও সংযত থাকা সম্ভবতঃ সহজ নহে। টেরোরিজম-সংক্রান্ত কার্য বিরল হইলেও তাহার সম্ভাবনা সর্বদাই বিজ্ঞমান, এই ধারণাই, যাহাদের হাতে উহা দমনের ভার তাহাদিগকে দৈর্ঘ্যহীন করিবার পক্ষে যথেষ্ট। এই সকল কাজ ব্যাধি নহে, ব্যাধির লক্ষণ—ইহা স্পষ্ট। ব্যাধির চিকিৎসা না করিয়া লক্ষণের চিকিৎসা করা নিষ্ফল।

যে সকল যুবক যুবতীর টেরোরিষ্টদের সহিত সংশ্রব আছে বলিয়া বিবেচনা করা হয়, কার্যতঃ তাহারা গোপন কাজের মোহে আকৃষ্ট হয়, আমার ইহাই বিশ্বাস। গোপনতা ও বিপদ দুঃসাহসী যৌবনকে চিরদিনই আকর্ষণ করে; কিসের জ্ঞাত এত কোলাহল, যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া কাহারো কার্য করিতেছে জানিতে কোতূহল হয়। ইহা ডিটেক্টিভ উপক্লাসের আকর্ষণ। আসলে এই সকল লোকের কোন কাজ করিবার মতলব থাকে না, টেরোরিষ্ট কার্য ত নহেই, কেবলমাত্র সন্দেহভাজনদের সংস্পর্শে গিয়া তাহারা নিজেদের পুলিশের সন্দেহভাজন করিয়া তোলে। যদি তাহাদের অধিক দুর্ভাগ্য না হয়, তাহা হইলে সহজে ও অবিলম্বে তাহারা গিয়া অন্তরীণদের দলভুক্ত হয় অথবা বন্দিশালায় উপনীত হয়।

আমরা শুনিয়াছি, আইন ও শৃঙ্খলা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের গৌরবময় কীর্তি। আমার মনের স্বাভাবিক গতি উহার পক্ষে। আমি জীবনে শৃঙ্খলা ভালবাসি, অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা ও অযোগ্যতা আমার নিকট অপ্রীতিকর। কিন্তু রাষ্ট্র ও গভর্নমেন্ট জনসাধারণের উপর যে আইন ও শৃঙ্খলা চাপাইয়া দেন, তিন্ত অভিজ্ঞতা হইতে তাহার মূল্য সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ জাগিয়াছে। সময় সময় লোকে ইহার জ্ঞাত অত্যধিক মূল্য দিয়া থাকে। আইন আসলে প্রভাবশালী অংশের ইচ্ছামাত্র এবং শৃঙ্খলা সর্বব্যাপী ভীতির রূপান্তর। সময় সময় আইন ও শৃঙ্খলার অভাবকেই আইন ও শৃঙ্খলা বলা হয়। এক সর্বব্যাপী ভীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যে কোন সাফল্য কাহারও নিকট প্রীতিপ্রদ হইতে পারে না। রাষ্ট্রের দমননীতিমূলক ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত “শৃঙ্খলা”, যাহা উহা ব্যতীত টিকিতে পারে না, তাহার সহিত অ-সামরিক শাসন অপেক্ষা সামরিক জবর-দখলের সাদৃশ্যই বেশী। সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত কবি কঙ্কনের কাশ্মীরী ঐতিহাসিক মহাকাব্য ‘রাজতরঙ্গিনীতে’ আমি দেখিয়াছি,

ভূমিকম্প

আইন ও শৃঙ্খলার সমানার্থবোধক, রাষ্ট্র ও শাসকগণের যাহা রক্ষা করা কর্তব্য, তৎসম্পর্কে পুনঃ পুনঃ ধর্ম ও অভয় এই দুইটি শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। আইন বলিতে কেবলমাত্র নিছক আইন ছাড়া আরও কিছু বুঝায় এবং শৃঙ্খলা বলিতে জনসাধারণের ভয়হীনতা বুঝায়। ভীত জনসাধারণের উপর বলপূর্বক শৃঙ্খলা স্থাপন করা অপেক্ষা এই অভয় জাগ্রত করা কত বেশী আকাজকার।

আমরা তিনদিন ও একবেলা কলিকাতায় ছিলাম, এই সময়ে আমি তিনটি জনসভায় বক্তৃতা দিয়াছি। আমি পূর্বে কলিকাতায় যে ভাবে বক্তৃতা করিয়াছিলাম, এবারও সেই ভাবে হিংসামূলক উপায়ের নিন্দা ও তাহার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিলাম, তারপরে বাঙ্গলায় অবলম্বিত সরকারী উপায়গুলি আলোচনা করিলাম। এই প্রদেশের ঘটনাবলীর বিবরণ শুনিয়া আমি অতিমাত্রায় অভিভূত হইয়াছিলাম, ফলে আমার বক্তৃতা অত্যন্ত আন্তরিক হইয়াছিল। কোন অঞ্চলের সমগ্র জনতার উপর নির্বিচারে নির্যাতন চালাইয়া যে ভাবে মনুষ্যত্বের মর্যাদাকে অপমানিত করা হইয়াছে, তাহার বিবরণ শুনিয়া আমি ব্যথিত হইয়াছিলাম। রাজনৈতিক সমগ্রা গুরুতর হইলেও, তাহার স্থান মনুষ্যত্বের সমগ্রার পরে। এই তিনটি বক্তৃতাই পরে কলিকাতায় আমার বিচারকালে তিনটি স্বতন্ত্র অভিযোগরূপে উপস্থিত করা হইয়াছিল এবং আমার বর্তমান কারাদণ্ড তাহারই ফল।

কলিকাতা হইতে আমরা কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দর্শন করিবার জন্য শান্তি-নিকেতনে আসিলাম। তাঁহাকে দেখিলে সর্বদাই আনন্দ হয়, এত নিকটে আসিয়া, তাঁহাকে না দেখিয়া যাইতে মন সরিল না। আমি পূর্বে আরও দুইবার শান্তি-নিকেতনে আসিয়াছি; কমলার পক্ষে এই প্রথম; তিনি বিশেষভাবে স্থানটি দেখিতে আসিলেন, কেন না আমাদের কন্যাকে এখানে রাখার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। ইন্দিরা শীঘ্রই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবে, কাজেই তাহার ভবিষ্যৎ শিক্ষা লইয়া আমরা চিন্তিত ছিলাম। তাহার সরকারী বা অর্দ্ধ-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যোগ দেওয়ার আমি সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলাম, কেন না এ গুলি আমি আদৌ পছন্দ করি না। ইহার চারিদিক ব্যাপিয়া, প্রভুত্বপ্রবণ পীড়াদায়ক সরকারী আবহাওয়ার পরিমণ্ডল। অবশ্য অতীতেও ইহা হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ নরনারীর উদ্ভব হইয়াছে, এবং আরও হইবে। অল্পসংখ্যক ব্যক্তির কথা ছাড়িয়া দিলে, যৌবনের স্বকুমার বৃত্তিগুলি নিজ্জীব ও দমন করিবার অভিযোগ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অব্যাহতি পাইতে পারে না।

জওহরলাল নেহরু

শান্তি-নিকেতনে এই মৃত্যুকঠোর হস্তের অভাব বলিয়াই আমরা ইহা নির্বাচন করিয়াছিলাম। যদিও অনেক দিক দিয়া অগ্ন্যাগ্নি বিশ্ববিদ্যালয়ের মত আধুনিক ব্যবস্থা বা সাজ-সরঞ্জাম ইহার নাই।

ফিরিবার পথে পাটনায় নামিয়া রাজেন্দ্র বাবুর সহিত ভূমিকম্পের সেবাকার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। তিনি সদ্য কারামুক্ত হইয়াই বে-সরকারী সেবাকার্য্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের আগমন অপ্ৰত্যাশিত, কেন না আমাদের একথানা তারও বিলি হয় নাই। কমলার ভ্রাতার সহিত যে বাড়ীতে আমাদের থাকার কথা ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; ইহা একটি বৃহৎ দোতলা ইটের বাড়ী ছিল। অতএব অগ্ন্যাগ্নি সকলের মত আমরা মুক্ত-প্রান্তরে বাস করিতে লাগিলাম।

পরদিন আমি মজঃফরপুর দেখিতে গেলাম। ভূমিকম্পের পর ঠিক সাতদিন অতিবাহিত হইয়াছে, অথচ কয়েকটি প্রধান রাস্তা ছাড়া, ধ্বংসস্তূপ সরাইবার কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। এই সকল রাস্তা হইতে মৃতদেহ বাহির হইতেছে, দেহগুলির অবয়বে বিশেষ ভঙ্গী, যেন পতিত দেওয়াল বা ছাদ ঠেকাইবার চেষ্টা। ধ্বংসস্তূপের দিকে চাহিলে আতঙ্কে অভিভূত হইতে হয়, যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহারাও অভিভূত, মানসিক তীব্র আঘাতে স্তিমমাণ।

এলাহাবাদে ফিরিয়াই, টাকাকড়ি ও জিনিষপত্র সংগ্রহের ব্যবস্থা হইল, কংগ্রেসের ও কংগ্রেসের বাহিরের লোক সকলে একযোগে একাগ্রভাবে কার্য্য আরম্ভ করিলাম। আমার কোন কোন সহকর্মী ভূমিকম্পের আতঙ্ক পূর্ণ স্বাধীনতা দিবসের অলুপ্তান হৃদিত রাগিবার পরামর্শ দিলেন। আমি এবং আমার অগ্ন্যাগ্নি সহকর্মী, ভূমিকম্প হইলেও কার্য্যপ্রণালী স্থগিত রাখার অলুপ্তানে কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাইলাম না। অতএব ২৬শে জানুয়ারী এলাহাবাদ জিলার গ্রামগুলিতে বহু সভা হইল, সহরেও সভা হইল এবং আমরা প্রত্যাশাতীত সাফল্য লাভ করিলাম। অনেকে পুলিশ কর্তৃক বাধাদান ও গ্রেফতারের সম্ভাবনা অলুপ্তান করিয়াছিলেন, কোথাও কোথাও সামান্য বাধা দেওয়াও হইয়াছিল। কিন্তু আমরা আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলাম, আমাদের সভা নির্বিবাদে স্বেচ্ছায় হইল। কোন কোন গ্রামে ও সহরে কিছু লোক গ্রেফতার করা হইয়াছিল।

বিহার হইতে ফিরিবার অব্যবহিত পরেই ভূমিকম্পের বিবরণ দিয়া উপসংহারে অর্থ সাহায্যের জগ্ন আবেদন করিয়া আমি এক বিবৃতি প্রচার করিলাম, এই বিবৃতিতে আমি ভূমিকম্পের অব্যবহিত পরের কয়েক দিন বিহার গভর্নমেন্টের চূপচাপ বসিয়া থাকার সমালোচনা করিয়াছিলাম।

ভূমিকম্প

পীড়িত অঞ্চলের কর্মচারীদিগকে সমালোচনা করিবার আমার কোন অভিপ্রায় ছিল না, কেন না তাঁহারা যে সঙ্গীন অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছিলেন, অতি বড় সাহসী ব্যক্তির নিকটও তাহা মহাপরীক্ষা, আমার কয়েকটি কথার ঐক্যপ ব্যাখ্যা হইতে পারে ইহাতে আমি আন্তরিক দুঃখিত হইলাম। কিন্তু আমি গভীরভাবে অনুভব করিয়াছি যে, বিহার গভর্নমেন্টের কেন্দ্রস্থলে, প্রারম্ভে কোন তৎপরতাই দেখা যায় নাই। বিশেষতঃ ধ্বংসস্তূপ সরাইতে পারিলে অনেকের জীবন রক্ষা হইত।

একমাত্র মুন্সের সহরেই সহস্র ব্যক্তি নিহত হইয়াছিল, তিন সপ্তাহ পরেও আমি দেখিয়াছি, অনেক ধ্বংসস্তূপে তখনও হাত দেওয়া হয় নাই; অথচ পাঁচ মাইল দূরে জামালপুরে সহস্র সহস্র রেলওয়ে শ্রমিকের উপনিবেশ রহিয়াছে, ভূমিকম্পের কয়েক ঘণ্টা পরেই তাহাদিগকে আনিয়া এই কাজে লাগান সম্ভবপর ছিল। এমন কি ভূমিকম্পের বার দিন পরেও জীবন্ত মানুষ বাহির করা হইয়াছে। গভর্নমেন্ট ধন সম্পত্তি রক্ষার জন্ত অবিলম্বেই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু বাড়ীর তলায় চাপা পড়া জীবন্ত মানুষকে উদ্ধার করিতে সেরূপ তৎপরতা দেখাইতে পারেন নাই। এই অঞ্চলের মিউনিসিপালিটিগুলির কাজ কর্ম একেবারেই অচল হইয়া গিয়াছিল।

আমার সমালোচনা আমি সঙ্গত বলিয়াই মনে করি এবং পরে দেখিয়াছি, ভূকম্পপীড়িত অঞ্চলের অধিকাংশ লোকই উহার সহিত একমত। কিন্তু সঙ্গতই হউক আর অসঙ্গতই হউক, উহার উদ্দেশ্য সাধু ছিল, গভর্নমেন্টকে অপবাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে নহে, তাঁহাদিগকে কর্মতৎপর করিয়া তোলাই আমার অভিপ্রায় ছিল। এ সম্পর্কে কোন কাজ করা না করা লইয়া তাঁহারা কোন ইচ্ছাকৃত পাপ করিয়াছেন, এমন অপবাদ কেহই দেয় নাই। ইহা এক অভিনব অভূতপূর্ব অবস্থা, এ ক্ষেত্রে ভুল ত্রুটি মার্জনীয়। আমি যতদূর জানি (কেন না তখন আমি জেলে) তাহাতে বিহার গভর্নমেন্ট পরে, ধ্বংসের উপর পুনর্নির্মাণে উৎসাহ ও যোগ্যতার সহিত কাজ করিয়াছিলেন।

কিন্তু আমার সমালোচনায় ক্রোধের সঞ্চার হইল, অল্পদিন পরেই, ভারসাম্য রক্ষার জন্ত বিহারের কতিপয় ভদ্রলোক গভর্নমেন্টের অনুকূলে একখানি প্রশংসাপত্র প্রচার করিলেন। ভূমিকম্প এবং তাহার সেবাকার্য্য যেন গোপ ব্যাপার। গভর্নমেন্টকে সমালোচনা করা হইয়াছে, ইহাই যেন মুখ্য ব্যাপার, এবং রাজভক্ত প্রজাবৃন্দ নিশ্চয়ই তাঁহাদের সমর্থন করিবেন। গভর্নমেন্টের সমালোচনায় অপ্রীতি প্রকাশ, ভারতের সর্বত্রই দেখা যায়; অথচ পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ইহা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। ইহা সমালোচনা অসহিষ্ণু সামরিক মনোবৃত্তি। রাজার মতই ভারতে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এবং উচ্চপদস্থ

কর্মচারীরা কোন অগ্রাধিকার করিতে পারেন না। উহার উল্লেখ করাও রাজদ্রোহ।

ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে গভর্নমেন্ট কঠোর, অথবা অত্যাচারী এ অভিযোগ অপেক্ষা অযোগ্যতা ও অক্ষমতার অভিযোগ আনিলে ক্রোধের সঞ্চার হয় বেশী। প্রথমোক্ত অভিযোগ করিলে যে কেহ কারাগারে যাইতে পারে; তবে গভর্নমেন্ট উহা শুনিত্তে অভ্যস্ত, কার্যাত: উহা গ্রাহ্য করেন না। যাহাই হউক, সাম্রাজ্যের অধীশ্বর যে জাতি তাহার নিকট উহা স্তুতিবাদেরই লক্ষ্যসম্পন্ন; কিন্তু অযোগ্য বলিলে, মানসিক বলের অভাব আছে বলিলে, তাঁহারা আহত হন, ইহাতে তাঁহাদের আত্মমর্যাদার মূল দেশে আঘাত লাগে; নিজেদের বিধাতাপ্রেরিত পুরুষ মনে করিয়া ভারতে ইংরাজ কর্মচারীরা যে মোহে মশগুল থাকেন, ইহাতে সেই মোহ ব্যাহত হয়। তাঁহারা সেই অ্যাংলিকান বিশপের মত, যিনি খৃষ্টানের পক্ষে অহুচিত ব্যবহারের অভিযোগ বিনয়ের সহিত মানিয়া লইতে রাজী, কিন্তু কেহ তাঁহাকে নির্দোষ ও অযোগ্য বলিলে কষ্ট হইয়া অতুষ্ণ প্রত্যুত্তর দেন।

ইংরাজদের মনে এক সাধারণ বিশ্বাস আছে, সেই বিশ্বাসকে তাঁহারা প্রায়ই অপরিবর্তনীয় সত্যরূপে জাহীর করিয়া থাকেন যে, ভারত গভর্নমেন্টে ইংরাজ কর্মচারীর সংখ্যা কমিলে কিম্বা তাঁহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি হ্রাস হইলে, গভর্নমেন্ট অতিশয় মন্দ ও অযোগ্য হইয়া পড়িবে। এই বিশ্বাস বজায় রাখিয়া পরিবর্তনপন্থী ও অগ্রগামী অগ্রগামী ইংরাজেরা উৎসাহপূর্ণ উদারতার সহিত বলিয়া থাকেন যে, ভাল গভর্নমেন্ট অপেক্ষা স্বায়ত্তশাসন অনেক শ্রেষ্ঠ; এবং যদি ইচ্ছা করিয়া ভারতবাসীরা অধঃপাতে যাইতে চায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে বাধা দেওয়া উচিত নহে। ব্রিটিশ প্রভাব অন্তর্হিত হইলে ভারতের ভাগ্য কি ঘটবে তাহা আমি জানি না। কি ভাবে ব্রিটিশগণ সরিয়া যাইবেন, তাঁহারা যাইবার পর ক্ষমতা কাহাদের হাতে আসিবে, এবং আরও অগ্রগামী অনেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনার উপর তাহা নির্ভর করে। আমার মনে হয়, ব্রিটেনের সহায়তায় এমন সব ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যাইতে পারে, যাহা অধিকতর অকর্মণ্য এবং বর্তমান ব্যবস্থা অপেক্ষা সর্বত্রই মন্দ হইবে, কেন না ইহাতে বর্তমান ব্যবস্থার দোষগুলি থাকিবে, অথচ উহার ভালগুলি থাকিবে না। পক্ষান্তরে আমি ইহাও ভাবিতে পারি যে, ভারতবাসীর দিক হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যবস্থাও প্রবর্তন করা যাইতে পারে যাহা বর্তমান ব্যবস্থা অপেক্ষাও অধিকতর কর্মকুশল এবং কল্যাণকর হইবে। সম্ভবত: দমননীতিমূলক ব্যবস্থাগুলি খুব বেশী কর্মকুশল না হইতে পারে, শাসনব্যবস্থায় এত জাঁকজমক নাও থাকিতে

ভূমিকম্প

পারে, কিন্তু শস্ত ও পণ্য উৎপাদন লোকের তাহাতে ভোগ করিবার সুবিধা বাড়িবে; জনসাধারণের দৈহিক, নৈতিক ও সংস্কৃতির আদর্শ উন্নত হইবে। আমার বিশ্বাস স্বায়ত্ত-শাসন সব দেশের পক্ষেই ভাল। কিন্তু প্রকৃত ভাল গভর্নমেন্টের বিনিময়ে আমি স্বায়ত্ত-শাসনও গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। স্বায়ত্ত-শাসন যদি তাহার যৌক্তিকতা প্রমাণ করিতে চাহে, তাহা হইলে পরিণামে তাহাকে জনসাধারণের জন্য উৎকৃষ্টতর গভর্নমেন্টে পরিণত হইতে হইবে। কেন না আমি বিশ্বাস করি অতীতে ভারতে ব্রিটিশ-গভর্নমেন্টের যে দাবীই থাকুক না কেন বর্তমানে ইহা ভারতে উত্তম গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা ও জনসাধারণের জীবন-যাত্রার উন্নতি সাধনে অক্ষম, এবং বর্তমান আকারে ভারতে ইহার উপযোগিতা শেষ হইয়াছে, ইহাই আমার ধারণা। ভারতের স্বাধীনতার প্রকৃত যৌক্তিকতা এই যে, ইহা উৎকৃষ্টতর গভর্নমেন্ট চাহে, জনসাধারণের জীবনযাত্রা উন্নত করিতে চাহে, শিল্পবাণিজ্য ও শিক্ষা সংস্কৃতির পরিপুষ্টি চাহে, বৈদেশিক সাম্রাজ্যনৈতিক শাসনপ্রণালী হইতে অনিবার্যরূপে সৃষ্ট দমন ও ভয়ের আবহাওয়া হইতে মুক্তি চাহে। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ও সিভিলিয়ানগণের ভারতের উপর তাঁহাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছা চাপাইয়া দিবার ক্ষমতা প্রচুরই আছে; কিন্তু বর্তমান ভারতের সমস্যাগুলি সমাধানে ইহাদের ক্ষমতাও নাই, যোগ্যতাও নাই, ভবিষ্যতের আশা আরও কম, কেন না তাঁহাদের ভিত্তি ও পূর্বনির্দিষ্ট ধারণা সমস্তই ভুল; বাস্তবের সহিত তাঁহাদের যোগসূত্র ছিন্ন হইয়াছে। কোন গভর্নমেন্ট বা শাসক সম্প্রদায়ের যোগ্যতা যেখানে অতি কম এবং এক অতীত ব্যবস্থার তাঁহারা সমর্থক; সেখানে দীর্ঘকাল নিজেদের ইচ্ছাও তাঁহারা চালাইতে পারেন না।

এলাহাবাদের ভূকম্প-সাহায্য সমিতি আমাকে পীড়িত অঞ্চলে কি ভাবে সেবাকার্য্য হইতেছে, তাহার বিবরণ পাঠাইতে বলিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ রওনা হইলাম, এবং একাকী দশ দিন সেই বিধ্বস্ত ধ্বংসের শ্মশানে ভ্রমণ করিলাম। এই ভ্রমণ অত্যন্ত ক্লেশকর, আমি প্রায়ই ঘুমাইতে পারি নাই। প্রভাত পাঁচটা হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত আমরা বিদীর্ণ ও বহুভাবে বক্র রাস্তার উপর দিয়া মোটরযোগে চলিতাম, সাকো ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় নৌকায় নদী পার হইতে হইত; কোথাও বা জমি অবনত হওয়ায় রাস্তা জলে ডুবিয়া থাকিত। সহরগুলিতে ধ্বংস-স্তূপের ভয়াবহ দৃশ্য; রাস্তাগুলি যেন কোন দৈত্য ছিঁড়িয়া মোচড়াইয়া দিয়াছে; কোথাও বা রাস্তাগুলি বাড়ীর ভিত্তি ছাড়াইয়া উপরে উঠিয়া

গিয়াছে। এই সকল রাস্তার উপর বড় বড় ফাটল দিয়া তীব্রবেগে উৎসারিত জল ও বালুকায় মানুষ পশু একসঙ্গে ভাসিয়া গিয়াছে। এই সকল সহর ছাড়াও উত্তর বিহারের সমতল অঞ্চল;—যাহা বিহারের উত্তান বলিয়া কথিত হয়—তাহার সর্বক্ষেত্রে ধ্বংস ও অশানের ভয়ঙ্কর রূপ। ক্রোশের পর ক্রোশ বালুকায় আচ্ছন্ন, কোথাও বা বিস্তীর্ণ জলরাশি, বিদৌর্ণ ভূপৃষ্ঠে গভীর গহ্বর, অজস্র ফাটল হইতে জল ও বালুকা উখিত হইতেছে। কয়েকজন ব্রিটিশ সামরিক কর্মচারী, যাহারা এই অঞ্চলের উপর দিয়া এরোপ্লেনে ধ্বংসলীলা দর্শন করিয়াছিলেন, তাহারা বলিলেন, মহাযুদ্ধের সময় এবং তাহার অব্যবহিত পরের উত্তর ফ্রান্সের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।

ইহা এক নিদারুণ অভিজ্ঞতা। পাশাপাশি দুইদিক হইতে প্রবল আলোড়নে ভূকম্পের সূচনাতেই প্রত্যেকে ধরাশায়ী হইল। তাহার পর উপরে ও নীচে, উত্থান পতনের ধ্বংসলীলা চলিল—অজস্র কামান যেন গজিয়া উঠিল; যেন শত শত বিমানপোত হইতে বোমাবৃষ্টি হইতেছে; দেখিতে দেখিতে বিদৌর্ণ ফাটল ও গহ্বর দিয়া প্রবল বেগে জল উঠিয়া ১০।১২ ফিট উর্ধ্বে ছিটাইয়া পড়িতে লাগিল। সম্ভবতঃ তিন মিনিট কি আরও কিছুকাল থাকার পর ইহা শান্ত হয়, কিন্তু এই তিন মিনিটের কি ভয়াবহ অভিজ্ঞতা! অনেকে ভাবিয়াছিল পৃথিবীতে বৃষ্টি প্রলয়ান্তকাল উপস্থিত, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। সহরে বাড়ী পড়ার শব্দ, জলোচ্ছ্বাস এবং ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন বায়ুমণ্ডলে কয়েক গজ দূরের জিনিসও দেখা যায় নাই। পল্লী অঞ্চলে ধূলি ছিল না, কিছুদূর দেখা যাইত—কিন্তু মাথা ঠিক করিয়া দেখিবে কে? যাহারা রক্ষা পাইয়াছিল, তাহারা ভূমিতে গড়াইতেছিল অথবা ভয়ে অর্ধ অচেতন হইয়া পড়িয়াছিল।

ভূমিকম্পের দশদিন পরে বার বংসরের একটি ক্ষুদ্র বালককে (আমার মনে হয় মজঃফরপুরে) খুঁড়িয়া বাহির করা হইল। সে বিহ্বল ও বিমূঢ়, যখন সে পড়িয়া গেল এবং ভাস্কাবাড়ীর মধ্যে বন্দী হইল, তখন তাহার মনে হইয়াছিল যে জগত শেষ হইয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র সে-ই বাঁচিয়া আছে।

এই মজঃফরপুরেই যখন ভূমিকম্প চারিদিকে বাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, শত শত নরনারী সহসা মৃত্যু কবলিত হইতেছে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একটি বালিকা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। অনভিজ্ঞ যুবক-দম্পতী কিংকর্তব্য-বিমূঢ় ও বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। যাহা হউক আমি শুনিলাম, প্রসূতি ও শিশু ভালই আছে। ভূমিকম্পের স্মৃতি স্মরণ করিয়া বালিকার নাম রাখা হইয়াছে, কম্প দেবী।

ভূমিকম্প

আমাদের ভ্রমণ শেষ হইল মুন্সের সহরে আসিয়া। নেপালের প্রান্তসীমা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভ্রমণ করিয়া ধ্বংসের বহু ভয়াবহ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বিধ্বস্ত জনপদ ও ধ্বংসস্তূপ দেখিতে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিলেও সমুদ্রকিনারী মুন্সের নগরীর শোচনীয় পরিণতির সম্মুখে দাঁড়াইয়া শিহরিয়া উঠিলাম। সে ভয়াবহ দৃশ্য জীবনে ভুলিব না।

কি সহর কি পল্লীতে সর্বত্র অধিবাসীদের মধ্যে নিজেদের চেষ্টায় আত্মরক্ষার অভাব দেখিয়া ব্যথিত হইলাম, সম্ভবতঃ সহরের মধ্যশ্রেণীই এ বিষয়ে সর্বাধিক অপরাধী। তাহারা অপরের সাহায্য-প্রার্থী হইয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া আছে, হয় গভর্ণমেন্ট নয় বে-সরকারী সাহায্য প্রতিষ্ঠানগুলি সাহায্য করিবেই। অবশ্য ভূমিকম্পের ভীতিবিধ্বলতা-জনিত মানসিক বিভ্রম ইহার জন্য কতকটা দায়ী; কালে হয়ত ইহা কমিয়া গিয়াছে।

ইহার মধ্যে বিহারের অগ্ন্যাশু জিলা এবং বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত সেবাত্রীতীদের শক্তি ও যোগ্যতা দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইলাম। এই সকল তরুণ নর-নারীরা বিভিন্ন সেবাপ্রতিষ্ঠানের অন্তিম সঙ্কেত পরস্পরের সহযোগিতায় যেরূপ কুশলতার সহিত সেবা করিতেছিলেন তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

ধ্বংসস্তূপ খনন ও অপসারণ আন্দোলনে স্থানীয় জনসাধারণকে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য মুন্সেরে আমি এক নাটকীয় ভঙ্গীতে অভিনয় করিলাম। আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া কাজ আরম্ভ করিলাম, কিন্তু ফল ভাল হইল। সমস্ত সেবাপ্রতিষ্ঠানের নায়কদের সহিত আমি কোদাল বুড়ি হস্তে সারাদিন খনন কার্য চালাইলাম; আমরা একটি বালিকার মৃতদেহ বাহির করিলাম। সেই দিনই আমি মুন্সের পরিত্যাগ করিলাম, কিন্তু খনন কার্য চলিতে লাগিল, বহু লোক আসিয়া উহাতে যোগ দিল, বেশ সুন্দর কাজ হইতে লাগিল।

সমস্ত বে-সরকারী সেবাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ পরিচালিত সেন্ট্রাল রিলিফ কমিটির গুরুত্বই অধিক ছিল। ইহা কেবলমাত্র কংগ্রেসপন্থীদের লইয়া গঠিত হয় নাই; ক্রমে ইহা এক নিখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল। বিভিন্নদল ও দাতারা ইহার প্রতিনিধি ও সদস্য হইয়াছিলেন। পল্লী অঞ্চলের কংগ্রেস কমিটিগুলির সহায়তা পাওয়ায় ইহার অবশ্য অনেক সুবিধা হইয়াছিল। এক গুজরাট এবং যুক্ত-প্রদেশের কয়েকটি জিলা ছাড়া বিহারের মত আর কোথাও কংগ্রেসকর্মীদের সহিত কৃষকদের যোগ নাই। বিহার কৃষক-প্রধান

জওহরলাল নেহরু

প্রদেশ, এখানের কংগ্রেসকর্মীদের অধিকাংশই কৃষক শ্রেণীর। এমন কি মধ্যশ্রেণীও কৃষকদের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট। কিছুদিন পূর্বে আমি কংগ্রেসের সম্পাদক হিসাবে, বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যালয় পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলাম। আফিস সংক্রান্ত কাজ কর্মের শৈথিল্য ও অনিয়ম দেখিয়া আমি কঠোর ভাষায় তিরস্কার করিয়াছিলাম। দাঁড়াইবার পরিবর্তে বসা, বসার পরিবর্তে শুইয়া পড়ার ভাবই যেন প্রবল। আফিসে সাজ-সরঞ্জাম কিছুই নাই, সাধারণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ব্যতিরেকেই যেন তাহারা কাজ চালাইতে সচেষ্ট। কার্যালয় সম্পর্কে.. আমার আলোচনা সত্ত্বেও আমি ভাল করিয়াই জানিতাম, এই প্রদেশ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত একাগ্রচিত্তে কংগ্রেসের কাজ করিয়া থাকে। এখানে কংগ্রেসের কোন আড়ম্বর নাই বটে, কিন্তু ইহার পশ্চাতে কৃষক শ্রেণীর সজ্জবদ্ধ সমর্থন রহিয়াছে। এমন কি, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতেও বিহারের সদস্যরা কখনও কোন ব্যাপারে উগ্রভাব প্রদর্শন করেন না; এখানে তাঁহাদের দেখিলে মনে হয়, তাঁহারা যেন আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনে বিহারের কীর্ণি উজ্জল। এমন কি, পরবর্তী ব্যক্তিগত প্রতিরোধ নীতিতেও বিহার কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে।

রিলিফ কমিটি এই উৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় কৃষকদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। অল্প কোন প্রতিষ্ঠান, এমন কি, গভর্নমেন্টও এতখানি সাহায্য করিতে পারিতেন না। কি কংগ্রেস, কি রিলিফ কমিটি উভয় প্রতিষ্ঠানের নায়কই বিহারের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা রাজেন্দ্রপ্রসাদ। বিহারের আদর্শ সন্তানের মতই রাজেন্দ্রবাবুর আকৃতি কৃষকের মত; প্রথম দর্শনে তাঁহার মধ্যে আকর্ষণের কিছুই নাই। কিন্তু তাঁহার সরল চক্ষুর উজ্জল দৃষ্টি ভোলা কঠিন; উহার মধ্যে যে সত্যের দীপ্তি, তাহা কেহই সন্দেহ করে না। কৃষকদের মতই তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী সীমাবদ্ধ, আধুনিক জগতের মতে তিনি কিয়ৎ পরিমাণে সভ্যতার কলুষমুক্ত, কিন্তু তাঁহার অসামান্য দক্ষতা, তাঁহার সর্বোজ্জ্বল সারল্য, তাঁহার কর্মশক্তি এবং ভারতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনে তাঁহার নিষ্ঠার জগ্গ তিনি কেবল বিহারে নহেন, সমগ্র ভারতের ঞ্জা ও প্রীতির পাত্র। রাজেন্দ্রবাবু বিহারে ঘেরূপ সর্ববাদিসম্মত নেতৃত্ব লাভ করিয়াছেন, ভারতের আর কোন প্রদেশে কেহই সেরূপ নেতৃত্ব লাভ করিতে পারেন নাই। গান্ধিজীর বাণীর সম্পূর্ণ মর্মগ্রহণ করিতে সক্ষম, তিনি ছাড়া এরূপ ব্যক্তি থাকিলে অল্পই আছেন।

ভূমিকম্প

বিহার সেবাকার্যে যে তাঁহার জ্ঞান ব্যক্তির নেতৃত্ব লাভ করা গিয়াছে ইহা সৌভাগ্যের বিষয়, তাঁহার নামের জ্ঞানই ভারতের সকল দিক হইতে অজস্র অর্থ আসিতে লাগিল। দুর্বল দেহ লইয়াও তিনি সেবাকার্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। কেন না তিনি সমস্ত কর্মের কেন্দ্র স্বরূপ ছিলেন এবং সকলে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে আসিত।

পীড়িত অঞ্চলে ভ্রমণকালীন অথবা যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে আমি সংবাদপত্রে গান্ধিজীর বিবৃতি পাঠ করিয়া মগ্ন হইলাম; তিনি বলিয়াছেন অস্পৃশ্যতার পাপের শাস্তি এই ভূমিকম্প। এরূপ মন্তব্য শুনিলে বিহ্বল হইতে হয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার যে উত্তর দিলেন তাহা আমার মনঃপূত হইল এবং আমি আনন্দিত হইলাম। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর ইংপক্ষে অধিক বিরোধী কথা, কল্পনা করাও কঠিন। জড় প্রকৃতির উপর ভৌতিক ঘটনাগুলি মনোরাজ্যে যে ভাবাবেগ উদ্বোধিত করে, তাহার সম্বন্ধে বিজ্ঞানও সম্ভবতঃ বর্তমানে এতখানি যুক্তিহীন মতবাদ সমর্থন করিবে না। মানসিক আঘাতে কোন ব্যক্তির অজীর্ণ রোগ বা হারও কিছু কঠিন ব্যাধি হইতে পারে। কিন্তু মানুষের কোন আচার ব্যবহার বা ক্রটির ফলে ভূপৃষ্ঠের স্তরগুলি সঞ্চালিত হয় এমন কথা শুনিলে বিমূঢ় হইতে হয়। পাপবোধ, ঐশ্বরিক ক্রোধ এবং সৌরজগতের ব্যাপারে মানুষের আপেক্ষিক সম্পর্ক প্রভৃতি আমাদেরকে কয়েক শতাব্দী পিছাইয়া লইয়া যায়;—যখন ইউরোপে ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদীদের বিচার করিবার জন্য খৃষ্টান যাজকদের বিচারালয়ের প্রাবল্য ছিল, যখন ধর্মবিরোধী বৈজ্ঞানিক কথা বলার দরুণ জিত্তরদানো ক্রনোকে পুড়াইয়া মারা হইয়াছিল এবং আরও অনেককে ‘ডাইনী’ প্রভৃতি বলিয়া পুড়াইয়া মারা হইত! এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকার বোষ্টনের প্রধান ধর্মযাজকগণ বলিয়াছিলেন, গৃহের উপর বজ্রপাত নিবারক লৌহদণ্ড স্থাপনের ফলেই মাসাচুসেট্‌স-এ ভূমিকম্প হইয়াছে।

এই ভূমিকম্প যদি আমাদের পাপের ঐশ্বরিক শাস্তি হয়, তাহা হইলে কি বিশেষ পাপের ফলে আমরা এই শাস্তি পাইলাম, কেমন করিয়া নির্ণয় করিব? হায়, আমাদের বহুতর প্রায়শ্চিত্ত বাকী রহিয়াছে? প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার পছন্দমত ভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারে? আমরা বৈদেশিক শাসনের বশতা স্বীকারের পাপের দণ্ড পাইলাম, অত্যাচার সমাজ ব্যবস্থা সহ্য করিতেছি বলিয়া দণ্ড পাইলাম। বিপুল ভূসম্পত্তির মালিক দ্বারভাঙ্গার মহারাজাই ভূমিকম্পে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। আমরা

জওহরলাল নেহরু

তাহা হইলে বলিতে পারি, জমিদারী প্রথার জগ্ৰহ এই শাস্তি। দক্ষিণ-ভারতের লোকের অস্পৃশ্যতাবোধের শাস্তি আসিয়া পড়িল অল্প বিস্তর নির্দোষ বিহারের লোকের উপর, একথা বলা অপেক্ষা পূর্বের কথাগুলি লক্ষ্যের অধিকতর নিকটবর্তী। যে দেশে ছুঁতামার্গের প্রাবল্য সর্বাধিক, সেখানে ভূমিকম্প হইল না কেন? অথবা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টও বলিতে পারেন, এই দৈবহুর্কিপাক, আইন অমান্য আন্দোলন করার জগ্ৰহ ঐশ্বরিক শাস্তি। কার্যতঃ ভূকম্পে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত উত্তর বিহারই স্বাধীনতা আন্দোলনে অধিকতর অগ্রগামী ছিল।

এইভাবে গবেষণা করিতে থাকিলে তাহা শেষ হইবে না। তারপর অবগ্ৰহই এ প্রশ্ন উঠিবে যাহা ঈশ্বরের কার্য, সেখানে ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে আমরা মানবীয় চেষ্টায় তাহাতে হস্তক্ষেপ করিব কেন? আমরা বিশ্বিত হইয়া ভাবি, ঈশ্বর আমাদের সহিত এই নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ করিলেন কেন? আমাদেরিগকে বহুতর অপূর্ণতা সহ সৃষ্টি করিয়া, আমাদের চারিদিকে বহু প্রলোভনের জাল পাতিয়া, পতনের গহ্বর রচনা করিয়া, এই দুঃখময় নিষ্ঠুর জগৎ সৃষ্টি করা হইয়াছে; বাঘ ও মেঘ একসঙ্গে সৃষ্টি করিয়া তারপর আমাদের শাস্তির ব্যবস্থা।

পাটনায় আমার যাত্রার পূর্বদিন রাত্রিতে, সেবাকার্য্যে সমবেত বিভিন্ন প্রদেশের বন্ধু ও সহকর্মীদের সহিত বসিয়া গল্প করিতে লাগিলাম। রজনী গভীর হইল। যুক্ত-প্রদেশের কর্মীসংখ্যা যথেষ্ট ছিল, আমাদের কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মী যোগ দিয়াছিলেন। যে বিষয় লইয়া অনেকের মনে আলোড়ন চলিতেছিল, তাহাই ছিল আমাদের আলোচ্য বিষয়; এই ভূমিকম্পের সেবাকার্য্যে আমরা কতখানি জড়াইয়া পড়িব? ইহার অর্থ অন্ততঃ কিছু পরিমাণে রাজনৈতিক কার্য্য পরিত্যাগ করা। সেবাকার্য্যে গভীর অভিনিবেশ আবশ্যক, আর দশটা কাজের সহিত ইহা করা যায় না। ইহাতে যোগ দিলে দীর্ঘকাল রাজনীতিক্ষেত্র হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে হইবে, তাহার ফলে আমাদের প্রদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিবে। যদিও কংগ্রেসে বহুলোক আছেন, তথাপি যাহারা ঘটনার গতি নির্দেশ করিতে পারেন এরূপ লোকের সংখ্যা কম, তাহাদের অগ্ৰ কাজের জগ্ৰ ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। আবার অগ্ৰদিকে ভূমিকম্পে সেবাকার্য্যের আহ্বানও অগ্রাহ্য করা যায় না। ব্যক্তিগতভাবে সম্পূর্ণরূপে সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবার আমার ইচ্ছা ছিল না। আমি অনুভব করিলাম এক্ষেত্রে লোকের অভাব হইবে না; কিন্তু বিপজ্জনক কার্য্যের জগ্ৰ অতি অল্প লোকই আছেন।

ভূমিকম্প

এইভাবে আলোচনায় রাজি গভীর হইতে গভীরতর হইল। বিগত স্বাধীনতা দিবসে আমাদের কতিপয় সহকর্মী কি ভাবে গ্রেফতার হইলেন এবং কেমন করিয়া আমরা পরিত্রাণ পাইলাম, তাহাও আমরা আলোচনা করিলাম। আমি হাশু পরিহাস করিয়া তাহাদের বলিলাম যে, নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদে রাখিয়া সামরিক রাজনীতি চালাইবার গোপন রহস্য আমি আবিষ্কার করিয়াছি।

অশ্রান্ত ভ্রমণে অতিমাত্রায় ক্লান্ত হইয়া আমি ১১ই ফেব্রুয়ারী এলাহাবাদের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। দশ দিনের পরিশ্রমে আমাকে রুক্ষ ও পাংশু দেখাইতেছিল, আমার চেহারা দেখিয়া পরিবারস্থ লোকেরা আশ্চর্য্য হইলেন। এলাহাবাদ রিলিফ কমিটির জন্ত আমি আমার ভ্রমণের বিবরণ লিখিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ঘুমে আমার চক্ষু জড়াইয়া আসিল। পরবর্ত্তী ২৫ ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ ১২ ঘণ্টা আমি ঘুমাইয়া কাটাইয়াছি।

পরদিন অপরাহ্নে আমি ও কমলা চা খাওয়া শেষ করিয়াছি এমন সময় পুরুষোত্তম দাস টাণ্ডন আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দিলেন। আমরা বারান্দায় বসিয়া গল্প করিতেছি, এমন সময় একখানি মোটর আসিয়া থামিল, একজন পুলিশ কর্মচারী নামিয়া আসিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ বুঝিলাম, আমার সময় আসিয়াছে। আমি অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে বলিলাম, “বহুত দিনে সে আপুকা ইন্তেজার থা”—আপনার জন্ত দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করিতেছি। তিনি একটু অপ্রস্তুত হইয়া দুঃখিত স্বরে বলিলেন, তাঁহার কোন দোষ নাই। কলিকাতা হইতে পরোয়ানা আসিয়াছে।

পাঁচ মাস তের দিন বাহিরে কাটাইয়া আমি পুনরায় নিঃসঙ্গ নির্জনতার মধ্যে ফিরিয়া চলিলাম। কিন্তু প্রকৃত ভার আমার নহে, নারীদের স্বন্ধেও ইহার ভার পড়িবে, যেমন পূর্বেও আমার রুগ্না জননী, আমার পত্নী, আমার ভগ্নী ইহা বহন করিয়াছেন।

আলীপুর জেল

সেই রাত্রেই আমাকে কলিকাতা চালান করা হইল। হাওড়া স্টেশন হইতে এক বিপুলকায় কৃষ্ণবর্ণ বাস আমাকে লালবাজার পুলিশ স্টেশনে হাজির করিল। কলিকাতা পুলিশের এই বিখ্যাত ঘাঁটির কথা আমি অনেক পড়িয়াছি; কাজেই কোতূহলের সহিত চারিদিক লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। বহু ইংরাজ সার্জেন ও ইন্সপেক্টর; উত্তর ভারতের অগ্রাগ্র পুলিশের প্রধান ঘাঁটিতে ইহা এত দেখা যায় না। কনেষ্টবলদিগকে দেখিয়া মনে হইল, ইহারা অধিকাংশই যুক্ত-প্রদেশের পূর্বাঞ্চল এবং বিহারের লোক। জেলের লরীতে উঠিয়া আমি বহুবার এক জেল হইতে অন্য জেলে কিম্বা জেল হইতে আদালত, আদালত হইতে জেলে আসিয়াছি; এই ভ্রমণকালে গাড়ীর মধ্যে কয়েকজন করিয়া ঐ শ্রেণীর কনেষ্টবল আমার সঙ্গে থাকিত। তাহাদিগকে অত্যন্ত বিষয় দেখাইত, তাহারা যেন কাজটা পছন্দ করিত না। আমার প্রতি তাহাদের সহানুভূতি স্পষ্টই বুঝিতাম। কখনও কখনও তাহাদের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিত।

আমাকে প্রথমে প্রেসিডেন্সী জেলে রাখা হইল, সেখান হইতে আমাকে বিচারের জন্ত চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে লইয়া যাওয়া হইত। ইহা এক নূতন অভিজ্ঞতা। আদালত গৃহ ও বাড়ীখানি দেখিলে প্রকাণ্ড আদালত অপেক্ষা স্বরক্ষিত দুর্গ বলিয়াই মনে হয়। কয়েকজন সাংবাদিক ও উকীলগণ ব্যতীত কাহাকেও নিকটে ঘেঁসিতে দেওয়া হয় নাই। পুলিশ-বাহিনী অবশ্য উপস্থিত ছিল। আমার জন্তই বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, দেখিয়া এরূপ মনে হইল না, ইহা দৈনন্দিন ব্যাপার। আদালতে যাইবার সময় আমাকে উপরে নীচে তার দিয়া ঘেরা (ঘরের মধ্যে) এক দীর্ঘ পথের মধ্য দিয়া যাইতে হইল; একটা খাঁচার মধ্য দিয়া যাওয়ার মত। ম্যাজিস্ট্রেটের আসন হইতে ডক অনেক দূরে। আদালতগৃহ পুলিশ এবং কাল কোর্ট, কাল গাউনধারী উকীলে বোঝাই।

আদালতের বিচারে আমি বেশ অভ্যস্ত। আমার পূর্ব পূর্ব অনেক বিচার জেলের মধ্যেই হইয়াছে। সর্বক্ষেত্রেই বন্ধু বান্ধব, আত্মীয়স্বজন এবং

আলীপুর জেল

পরিচিত মুখ থাকিত, সমস্ত আবহাওয়া সহজ মনে হইত। পুলিশেরা সাধারণতঃ নেপথ্যে থাকিত এবং এরকম তারের খাঁচার মত ব্যবস্থা কোথাও দেখি নাই। কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার, আমি অপরিচিত ও আশ্চর্য মুখগুলির প্রতি চাহিয়া দেখিলাম তাহাদের সহিত আমার কোন সামঞ্জস্য নাই। এই জনতার মধ্যে চিত্তাকর্ষক কিছুই নাই। একটু ভয়ে ভয়ে বলি, গাউনপরা উকীলের দলটি মোটেই মনোহর দৃশ্য নয়, বিশেষতঃ পুলিশ আদালতের উকীলদের চেহারায় এক বিশিষ্ট অপ্রীতিকর ভঙ্গী আছে বলিয়া মনে হয়। অবশেষে সেই কাল পোষাকের সারির মধ্যে আমি একজন পরিচিত উকীলের মুখ দেখিলাম, কিন্তু তিনিও জনারণ্যে হারাইয়া গেলেন।

বিচার আরম্ভ হইবার পূর্বেও বারান্দায় বসিয়া আমি নিজেকে নিঃসঙ্গ ও সকল হইতে বিচ্ছিন্ন মনে করিতে লাগিলাম। আমার নাড়ীর গতি একটু চঞ্চল হইল, পূর্ব পূর্ব বারের বিচারকালে যেমন মানসিক প্রশান্তি ছিল, এখানে তাহা ছিল না। সহসা আমার মনে পড়িল, বিচার ও কারাদণ্ডের বহু অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও আমার মানসিক অবস্থা যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে অনভিজ্ঞ যুবকের মনে এই সন্দেহ অবস্থায় কি ভাবের উদ্বেগ হইবে ?

ডকে আসিয়া অনেকটা আরাম বোধ করিলাম। পূর্বের মতই এখানেও আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন ব্যবস্থা ছিল না, আমি একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি পাঠ করিলাম। পরদিন ১৬ই ফেব্রুয়ারী আশা করি দুই বৎসর কারাদণ্ড হইল। আমার সপ্তমবার কারাদণ্ড ভোগ আরম্ভ হইল।

বাহিরের সাড়ে পাঁচ মাসের কথা ভাবিয়া আমি সন্তোষ লাভ করিলাম। এই সময়টা নানা কাজে সর্বদাই ব্যাপৃত ছিলাম এবং কতকগুলি প্রয়োজনীয় কাজ আমি সমাধা করিতে পারিয়াছি। আমার মার স্বাস্থ্যের গতি ফিরিয়াছে, আশু কোন আশঙ্কার কারণ নাই। আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী কৃষ্ণার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আমার কন্ঠার ভবিষ্যৎ শিক্ষার ব্যবস্থাও ঠিক হইয়াছে। আমার পারিবারিক ও আর্থিক কতকগুলি জটিল ব্যাপার আমি মীমাংসা করিয়াছি। যে সকল ব্যক্তিগত ব্যাপার দীর্ঘকাল অবহেলা করিয়াছি, তাহাও একরূপে ঠিকঠাক করিয়াছি। বাহিরের কার্যক্ষেত্রে তখন কাহারও বেশী কিছু করিবার ছিল না, তাহা আমি জানিতাম। অন্ততঃ আমি কংগ্রেসের মনোভাব একটু দৃঢ় হইতে সাহায্য করিয়াছি এবং উহাকে কিয়ৎপরিমাণে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছি। পুণায় গান্ধিজীর নিকট চিঠিপত্র এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধগুলির ফলে একটু পরিবর্তন দেখা গিয়াছিল। সাম্প্রদায়িক সমস্যার উপর লিখিত আমার প্রবন্ধগুলিতে ভাল ফল হইয়াছিল। আমি দুই বৎসরেরও অধিককাল

জওহরলাল নেহরু

পর গাঙ্কিজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি, অত্যাশ্চর্য্য অনেক বন্ধু ও সহকর্ম্মীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে ; এবং কিছুকালের জন্য আমার মন ও হৃদয় নতুন আবেগ ও শক্তিতে ভরিয়া লইয়াছি ।

কমলার স্বাস্থ্যহীনতা—আমার মনে কেবল এই একটি ক্লম্ভছায়া ঘনাইয়া ছিল। তিনি যে কত বেশী অল্পস্থ আমার তাহা ধারণাই ছিল না, কেন না একেবারে শয্যাশায়ী না হইলে কিছু বলা তাঁহার অভ্যাস ছিল না, কিন্তু আমার দুশ্চিন্তা হইল। তথাপি আমি মনে করিলাম, আমি জেলে থাকার দরুণ তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবেন। আমি বাহিরে থাকিলে ইহা অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে, কেন না তিনি দীর্ঘকাল আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে চাহেন না।

আমার আর একটি ক্ষোভ রহিয়া গিয়াছে। এলাহাবাদ জিলার পল্লী অঞ্চলে একবারের জন্যও যাইতে পারি নাই বলিয়া আমার মনে দুঃখ হইল। আমাদের নির্দেশ মত কাজ করিতে গিয়া সেখানে অনেক তরুণ সহকর্ম্মী সম্প্রতি গ্রেফতার হইয়াছেন, এবং তাহাদের অল্পসরণ না করাটা অল্পরাগহীনতার মত প্রতীয়মান হইতেছে।

আবার সেই কাল লরী আমাকে কারাগারে লইয়া চলিল। পথে মেসিন-গান ও সাঁজোয়া গাড়ী লইয়া অনেক সৈন্য কূচকাওয়াজ করিতেছে দেখিতে পাইলাম। আমি ভাবিলাম, যে সাঁজোয়া গাড়ী ও ট্যাকগুলি দেখিতে কি কুৎসিত। ঐ গুলি যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায প্রাণী ভাইনোসারস বা আর কিছু।

আমাকে প্রেসিডেন্সী জেল হইতে আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে বদলী করা হইল এবং আমাকে প্রায় ১০ ফিট X ২ ফিট একটি সেলে রাখা হইল। ইহার সম্মুখে একটি বারান্দা এবং ছোট উঠান। উঠানটি প্রায় সাত ফিট উচু প্রাচীর দিয়া ঘেরা, তাহার উপর দিয়া এক আশ্চর্য্য দৃশ্য আমার চক্ষুর সম্মুখে জাঁসিয়া উঠিল। নানা ধরণের বিচিত্র দালান—এক তলা, দোতলা, গোল, সমচতুর্কোণ, নানা ছাদের ছাদ—নানাদিকে মাথা তুলিয়া আছে, কতকগুলি, অপরগুলিকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। দেখিয়া মনে হইল এই ইমারতগুলি একের পর আর এই ভাবে তৈয়ারী হইয়াছে, যতটুকু স্থান পাওয়া যায় তাহার পূর্ণ স্ববিধা গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহা দেখিতে অনেকটা গোলকধাঁধার মত, কিম্বা ভবিষ্যৎ-বাদীর অদ্ভুত পরিকল্পনার মত। তথাপি আমি শুনিলাম যে ইমারতগুলি সাবধানতার সহিত হিসাব করিয়া তৈরী করা হইয়াছে এবং মধ্যস্থলে একটি ঘন্টাঘর (উহা খুঁটান কয়েদীদের গির্জা বাটী) স্থাপন করা

আলীপুর জেল

হইয়াছে। জেলটি সহরের মধ্যে বলিয়া স্থান সঙ্গীর্ণ এবং প্রত্যেক স্থানটুকু ব্যবহার করিতে হইয়াছে।

এই সকল অপূর্ণ দর্শন ইয়ারতের প্রথম দর্শন-জনিত বিষয় কাটাইয়া উঠিতে না উঠিতে আর একটি ভয়াবহ দৃশ্য আমার চোখে পড়িল। আমার সেল ও উঠানের সম্মুখেই দুইটি চিমনী হইতে ঘনকৃষ্ণ ধূম কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতেছে, সময় সময় বাতাসে ধূম আমার সেলে আসিয়া পড়ে, আমার শ্বাসরোধের উপক্রম হয়। উহা জেলের রন্ধনশালার চিমনী। পরে আমি সুপারিন্টেন্ডেন্টকে বলিয়াছিলাম যে এই বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্ত কয়েদীদিগকে গ্যাস মুখোস দেওয়া উচিত।

আলীপুর জেলের এই লাল ইটের বাড়ীগুলি দেখা আর রান্নাঘরের চিমনীর ধূম সেবন করা, আরম্ভটা মোটেই প্রীতিপ্রদ হইল না, ভবিষ্যতের ভরসাও কিছু পাইলাম না। আমার উঠানে কোন গাছ বা সবুজ কিছু ছিল না। সবটাই শান বাঁধান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তবে প্রত্যাহই চিমনীর কালী জমিত—তাহা ছাড়া নিরাবরণ ও নীরস। পাশে ইয়ার্ডের একটি কি দুইটি গাছের মাথা দেখিতে পাইতাম। যখন আমি আসিলাম তখন ঐগুলিতে পাতা বা ফুল কিছু ছিল না। ক্রমে রহস্যময় পরিবর্তন দেখা দিল, শাখা প্রশাখায় কচি সবুজ রং-এর আভাষ দেখা দিল। পল্লব হইতে পত্র বিকশিত হইল, অতি দ্রুত মনোহর হরিৎ শোভায় শাখাগুলি আচ্ছন্ন হইয়া গেল। এই আনন্দদায়ক পরিবর্তনে আলীপুর জেলও শোভাময় বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

একটি গাছে চিল বাসা করিয়াছিল, আমি কোতূহলের সহিত উহা প্রায়ই লক্ষ্য করিতাম। ছোট ছোট বাচ্চাগুলি ক্রমে বড় হইতেছে এবং জাতিগত ব্যবসায় পটু লাভ করিতেছে। সময় সময় ইহার অবার্ণ লক্ষ্যে ছোঁ মারিয়া কয়েদীদের হাত হইতে রুটি লইয়া যাইত।

সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয় পর্য্যন্ত (অল্পবিস্তর) আমাদের সেলে তালাবদ্ধ করিয়া রাখা হইত, শীতের দীর্ঘ সন্ধ্যা সহজে কাটিতে চাহিত না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া লেখাপড়া করিতে করিতে বিরক্ত হইয়া উঠিতাম, তখন ক্ষুদ্র সেলের মধ্যে এদিক ওদিক পাইচারী করিতাম—সম্মুখে চার পাঁচ পা গিয়াই আবার ফিরিতে হইত। পশুশালায় খাঁচার মধ্যে ভল্লুকগুলি যেমনভাবে এদিক ওদিক করে আমার তাহা মনে পড়িত। যখন আমি অত্যন্ত বিরক্তিবোধ করিতাম, তখন আমার প্রিয় প্রতিষেধক ‘শিরশাসন’ (মাটিতে মাথা রাখিয়া পদদ্বয় উত্তোলন) করিতাম।

রাত্রির প্রথমভাগ বেশ নিশ্চক্ৰ মনে হইত—নগরের শব্দ ভাসিয়া

আসিত—ট্রাম গাড়ীর শব্দ, গ্রামোফোন অথবা দূরগত সঙ্গীত ধ্বনি। দূরগত সঙ্গীতের যুহু স্বর শুনিতে ভাল লাগে। রাজ্যে শান্তি পাওয়া যাইত না, অনবরত শাস্ত্রীরা যাতায়াত করিত, ঘণ্টায় ঘণ্টায় এক এক প্রকার পরিদর্শন চলিত। কোন কর্মচারী লণ্ঠন হাতে ঘুরিয়া দেখিতেন যে আমরা কেহ পলাইয়া গিয়াছি কিনা। প্রত্যহ রাজি তিনটার সময় বাসন মাজা ঘসার তুমুল শব্দ উঠিত; বুঝা যাইত রান্নাঘরের কাজ শুরু হইয়াছে।

আলৌপুর এবং প্রেসিডেন্সী জেলেও, ওয়ার্ডার, সিপাহী শাস্ত্রী কর্মচারী ও কেরানীর আয়োজন প্রচুর। এই দুইটি জেলের জনসংখ্যা প্রায় নৈনীর সমান হইবে,—২২০০ কি ২৩০০। কিন্তু নৈনীজেল অপেক্ষা এখানে কর্মচারীর সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশী। ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার ও পেনসনপ্রাপ্ত সামরিক কর্মচারীও ইহার মধ্যে আছে। যুক্ত-প্রদেশ অপেক্ষা কলিকাতায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাজকর্মের আয়োজন প্রচুর, ব্যয়ও বেশী। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শক্তির চিহ্ন ও তাহা বারম্বার স্মরণ করিবার জন্য উচ্চকর্মচারীদের সম্মুখীন হইলে কয়েদীদের চীংকার করিয়া বলিতে হয়, “সরকার সেলাম”। দীর্ঘায়ত স্বরে ঐ কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ প্রকার শারীরিক ভঙ্গীও করিতে হয়। কয়েদীদের এই চীংকারধ্বনি দিনের মধ্যে বহুবার শুনিতে হইত, জেল সুপারিনটেনডেন্টের প্রাত্যহিক পরিদর্শনের সময় ইহা বিশেষভাবে শোনা যাইত। আমার ৭ ফুট উচ্চ দেওয়ালের উপর দিয়া সুপারিনটেনডেন্টের মস্তকোপরি ধৃত বৃহদাকার রাজহত্ব দেখিতে পাইতাম।

আমি বিশ্বয়ের সহিত ভাবি, এই ‘সরকার সেলাম’ ধ্বনি এবং তাহার সহিত বিশেষ শারীরিক ভঙ্গী প্রাচীনকালের স্মৃতিচিহ্ন না কোন ইংরাজ কর্মচারীর আবিষ্কার? আমি ঠিক জানি না, তবে আমার মনে হয় ইহা কোন ইংরাজের আবিষ্কার। ইহার ধ্বনি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান গঙ্গী। সৌভাগ্যক্রমে যুক্ত-প্রদেশের জেলে ইহার প্রচলন নাই, সম্ভবতঃ বাকলা ও আসাম ছাড়া আর কোন প্রদেশেই ইহা নাই। ‘সরকারের’ প্রবল প্রতাপের নিকট এই ভাবে বলপূর্বক নীতি স্বীকার করাইয়া লইবার ধ্বনি মানব-চরিত্রের পক্ষে অত্যন্ত অবনতিকর বলিয়াই আমার মনে হয়।

আলৌপুরে একটি পরিবর্তন দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। এখানে সাধারণ কয়েদীদের খাদ্য যুক্ত-প্রদেশের জেলের খাদ্য অপেক্ষা অনেক ভাল। অগ্রাগ্র প্রদেশের তুলনায় যুক্ত-প্রদেশের জেলের খাদ্য অনেকাংশে মন্দ।

দেখিতে দেখিতে শীত চলিয়া গেল, বসন্তকেও পশ্চাতে ফেলিয়া গ্রীষ্ম আসিল। প্রতিদিন গরম বাড়িতে লাগিল। কলিকাতার আবহাওয়া আমার

গণতন্ত্র—প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে

ভাল লাগে না ; এমন কি কয়েকদিনের মধ্যেই আমি কাহিল হইয়া পড়িলাম । জেলের মধ্যে অবস্থা স্বভাবতঃই অধিকতর মন্দ ; আমার শরীর খারাপ হইতে লাগিল । ব্যায়াম করিবার স্থানের অভাব এবং এই আবহাওয়ায় দীর্ঘকাল তালাবদ্ধ হইয়া থাকার দরুন, আমার স্বাস্থ্য একটু খারাপ হইল, অতি দ্রুত শরীরের ওজন কমিতে লাগিল । এই তালা, লোহার ঝপাট, শিক, প্রাচীর দেখিলেই ঘৃণায় মন ভরিয়া উঠে !

আলীপুরে একমাস পর আমাকে উঠানের বাহিরে গিয়া ব্যায়াম করিতে দেওয়া হইত । এই পরিবর্তনে আমি খুসী হইলাম, প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় আমি প্রধান প্রাচীরের পার্শ্বে হাঁটিতাম । ক্রমে আলীপুর জেল ও কলিকাতার আবহাওয়া আগার সহিয়া গেল, এমন কি রন্ধনশালার চিমনির ধূম এবং বাসন মাজার শব্দও এত বিরক্তিকর মনে হইত না । আমার মন বিষমাস্তরে দাবিত হইল, নানারূপ হুশিস্তা আসিল । বাহির হইতে যে সকল সংবাদ পাইলাম, তাহা সুসংবাদ নহে ।

৬০

গণতন্ত্র—প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে

আলীপুর জেলে আমি বিম্বিত হইয়া দেখিলাম যে, আমার দণ্ডের পর আমাকে কোন দৈনিক কাগজ দেওয়া হইল না । বিচারাধীন আসামী রূপে আমি প্রত্যহ কলিকাতার ‘ষ্টেটসম্যান’ পাইতাম ; কিন্তু যে দিন আমার বিচার শেষ হইল, তার পর হইতেই কাগজখানা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল । ১৯৩২ সাল হইতে সংযুক্ত প্রদেশে ‘এ’ ক্লাস কিম্বা প্রথম শ্রেণীর বন্দীদের জন্য একটি দৈনিক পত্রিকা (গভর্ণমেন্টের ‘পছন্দসই’) দেওয়া হইত ; অত্যাগত অধিকাংশ প্রদেশেই এই ব্যবস্থা ছিল । সুতরাং আমার সম্পূর্ণ ধারণা ছিল যে, বাঙ্গলা দেশেও এই নিয়ম প্রচলিত । যাহা হউক, দৈনিক ষ্টেটসম্যানের বদলে আমাকে সাপ্তাহিক ‘ষ্টেটসম্যান’ দেওয়া হইত । স্পষ্টতঃই এই কাগজখানা তাঁহাদের জন্য, যাহারা অবসর-প্রাপ্ত ব্রিটিশ অফিসার কিম্বা ইংলণ্ডের স্বর্ণহুঁহে প্রত্যাগত ব্যবসায়ী । ভারতবর্ষের যে সমস্ত সংবাদ তাঁহাদের রুচিকর হইতে পারে এই পত্রিকাটিতে সাধারণতঃ তাহারই সারমর্ম থাকে । এই সংস্করণে একটি

মাত্র বিদেশী সংবাদও নাই, অথচ বিদেশী সংবাদ খুব মনোযোগের সঙ্গে পড়াই আমার অভ্যাস ছিল, ফলে বিদেশী সংবাদের অভাব আমি খুব বেশী পরিমাণে অনুভব করিতাম। সৌভাগ্যক্রমে ‘সাপ্তাহিক মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান’ রাধিব্যার অনুমতি আমাকে দেওয়া হইত। এই পত্রিকাটি পড়িয়া আমি ইউরোপ ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে যোগ রাখিতাম।

ফেব্রুয়ারী মাসে আমার গ্রেফতার ও বিচারের সময় ইউরোপের নানা বিপর্যয় ও তিক্ত সংঘর্ষ চলিতেছিল। ফ্রান্সে যে বিক্ষোভ দেখা দিয়াছিল তাহার ফলে ফাসিস্তরা দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধাইল এবং শ্রাশনাল বা জাতীয় গভর্নমেন্ট গঠিত হইল। অঙ্গিয়ার অবস্থা আরও শোচনীয়—চ্যামেলার ডলফাস শ্রমিকদিগকে গুলি করিয়া মারিতেছিলেন, সমাজ-তাত্ত্বিক গণতন্ত্রবাদের যে বৃহৎ সৌধ সেখানে গড়িয়া উঠিতেছিল, তিনি তাহার ধ্বংস সাধনে ব্যাপৃত ছিলেন। অঙ্গিয়ার রক্ত-ক্ষরণের এই সকল সংবাদে আমি অত্যন্ত বিমর্ষ হইলাম। এই পৃথিবী কি ভয়াবহ শোণিত-সিক্ত স্থান! মানুষ তাহার কায়েমী স্বার্থ রক্ষার জগ্ন কত বর্ষের হইতে পারে! লক্ষণ দেখিয়া মনে হইল ফাসিজম সমগ্র ইউরোপে ও আমেরিকায় অগ্রসর হইতেছে। হিটলার যখন জার্মানীর শক্তিদ্বর হইলেন, আমি তখন ভাবিয়াছিলাম যে, তাঁহার শাসন বেশী দিন টিকিবে না; কারণ জার্মানীর আর্থিক দুর্গতির কোন মীমাংসা তিনি করিতে পারেন নাই। অগত্যা যে সমস্ত স্থানে ফাসিজমের বিস্তার হইয়াছিল, সেই সব রাজ্য সম্পর্কেও আমি এই বলিয়া নিজেকে প্রবোধ দিয়াছিলাম যে, প্রতিক্রিয়ার ইহাই শেষ অধ্যায়! ইহার পর নিশ্চয়ই দেখা দিবে বন্ধন-মুক্তি। কিন্তু আমি বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম আমি যাহা চাই তাহা হইতেই আমার এই প্রকার চিন্তার উদ্ভব হয় নাই ত? আমি কি এমন কোন সুস্পষ্ট লক্ষণ পাইয়াছি যে, এই ফাসিস্ত প্রতিক্রিয়ার ঢেউ এত সহজে এবং এত দ্রুত মিলাইয়া যাইবে? এমন কি ফাসিস্ত ডিক্টেটরদের পক্ষে চারিদিকের অবস্থা ও ঘটনাবলী যদি অসহনীয়ও হইয়া উঠে তথাপি কি তাঁহাদের স্বদেশকে এক ধ্বংসকর সংগ্রামে না লইয়া গিয়া ডিক্টেটারি পরিত্যাগ করিবেন? এই প্রকার সংঘর্ষেরই বা কি পরিণতি হইবে?

ইতিমধ্যে ফাসিজম নানা আকারে ও প্রকারে দেখা দিতে লাগিল। যে স্পেনকে ‘সংলোকদের নূতন প্রজাতাত্ত্বিক রাষ্ট্র’—los hombres honrados—অথবা কাহারও কাহারও মতে ইহাকে সমস্ত গভর্নমেন্টের “সেরা গভর্নমেন্ট” বলা হইত, তাহাও বহুদূর পশ্চাতে প্রতিক্রিয়ার গভীর পক্ষে ডুবিয়া গেল। সেখানকার ‘সং ও সাধু’ লিবারেল নেতাদের যত কিছু মনোহর বক্তৃতা তাহাও

গণতন্ত্র—প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে

তাহাকে পতনের মুখ হইতে রক্ষা করিতে পারিল না। সর্বত্রই দেখা গেল যে লিবারেলিজম বা উদারনৈতিক মতবাদ আধুনিক অবস্থার সহিত লড়িতে গিয়া একেবারে ব্যর্থ হইতেছে। কারণ এই মতবাদ কেবল কথা ও বচন-সমষ্টিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে, নেতারা ভাবিয়াছিলেন কাজের বদলে কেবল কথার দ্বারাই কার্যোদ্ধার হইবে। কিন্তু যখন কোন সঙ্কট আসিল, তখন দেখা গেল যে, চলচ্চিত্রের পদ্ধতির উপর যেমন শেষ ছবিখানি মিলাইয়া যায়, লিবারেলিজমও ঠিক তেমনই সহজে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে।

অস্ত্রিয়ার দুর্ঘটনা সম্পর্কে আমি ‘মাক্কেষ্টার গার্ডিয়ানের’ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ-গুলি গভীর আগ্রহে ও প্রশংসামান দৃষ্টির সহিত পড়িতে লাগিলাম। “এ কোন অস্ত্রিয়া শোণিত সিক্ত সংঘর্ষ হইতে অবিভূত হইতেছে? ইউরোপে যাহারা সর্বাধিক প্রতিক্রিয়া-পন্থী, সেই ষড়যন্ত্রকারীদের রাইফেল ও মেশিনগানে শাসিত অস্ত্রিয়াকেই আজ দেখিতেছি।” “কিন্তু ইংলও যদি মাহুষের স্বাধীনতারই রক্ষী হইয়া থাকে, তবে, তাহার প্রধানমন্ত্রীর কি কিছুই বলিবার নাই? তাঁহার মুখে আমরা ডিক্টেটারির গুণকৌর্ভন শুনিয়াছি; আমরা তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে শুনিয়াছি যে ‘ডিক্টেটরগণ একটি জাতির আত্মাকে জীবন্ত করিয়া তোলেন’ এবং ‘নূতন দৃষ্টি ও নূতন শক্তি তাঁহার সঞ্চার করেন।’ “কিন্তু ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে এই সমস্ত অত্যাচার সম্পর্কে, সে অত্যাচার যে দেশেই ঘটুক না কেন, নিশ্চয়ই কিছু বলিবার থাকা উচিত। এই সমস্ত লাজ্জনা প্রায়শঃই দেহকে এবং তাহার চেয়েও বেশী সময় আত্মাকে হত্যা করে—এবং এই মৃত্যু অধিকতর শোচনীয়”।

যদি ‘মাক্কেষ্টার গার্ডিয়ান’ মাহুষের স্বাধীনতার এত বড় রক্ষী হন, তবে ভারতের স্বাধীনতা যখন পিষ্ট ও চূর্ণ হইতেছে, তখন কি তাহার কিছুই বলিবার নাই? আমাদের পক্ষেও কেবল দৈহিক নির্ধ্যাতনই ঘটে নাই, আত্মার সেই কঠোরতর অগ্নি-পরীক্ষাও আমরা অহুভব করিয়াছি।

“অস্ত্রিয়ার গণতন্ত্রের ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু ধ্বংসের পূর্বে ইহা সংগ্রাম করিয়া অক্ষয় কীর্তি অর্জন করিয়া গিয়াছে। এই সংগ্রাম এমন এক কাহিনীর সৃষ্টি করিয়া গেল, যাহা কোনও দূর ভবিষ্যতে ইউরোপীয় স্বাধীনতার সন্তাকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারে।”

“স্বাধীনতাশূণ্য ইউরোপের আর নিঃশ্বাস পড়িতেছে না। সূস্থ ও উৎসাহদীপ্ত মনের আদান-প্রদান বন্ধ হইয়াছে; তাহার নিঃশ্বাস যেন ক্রমে ক্রমে রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। যে মানসিক মূর্ছা সম্মুখে আসিতেছে, তাহার গতিরোধ করিবার একমাত্র উপায় কোন নিদারুণ আলোড়ন কিম্বা আভ্যন্তরীণ কোন বিপর্যয় এবং বাম ও দক্ষিণ উভয় দিক দিয়া

জওহরলাল নেহরু

ইহার উপর আক্রমণ ও আঘাত।.....রাইন নদী হইতে উরলের গিরি-সীমান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র ইউরোপ এক বিশাল কারাগারে পরিণত হইয়াছে।”

আমার হৃদয় যেন এই সমস্ত ভাবোদ্বেগ, রচনার মধ্যে তাহার প্রতিধ্বনিকে খুঁজিয়া পাইল। কিন্তু আমি বিশ্বয়বিমূঢ় চিন্তে ভাবিলাম; ভারতবর্ষের বেলায় কি? ‘মাক্কেটার গার্ডিয়ান’ কিম্বা তাহার মত আরও অনেক স্বাধীনতা-প্রেমিক ইংলণ্ডে আছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা আমাদের দুর্ভাগ্য সম্পর্কে এতটা বিস্মৃত হইয়া আছেন কিরূপে? যাহা তাঁহারা এখানে দেখিতেই পান না, তাহাই তাঁহারা অগ্ৰত্ব এতটা দৃঢ়তার সঙ্গে নিন্দা করেন কিরূপে? ইংলণ্ডেরই একজন বিখ্যাত উদারনীতিক নেতা, যিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতিতে মানুষ, যিনি স্বভাবতঃই সাবধানী এবং যাহার ভাষা সংযত, প্রায় ২০ বৎসর পূর্বে বিগত মহাসংগ্রামের পূর্বে মুহূর্ত্তে তিনি বলিয়াছিলেন, “শান্তি ও শৃঙ্খলার উপর পাশবিক শক্তির এই শোচনীয় জয় নিঃশব্দে লক্ষ্য করার চেয়ে আমি বরং প্রার্থনা করি যে, আমার এই স্বদেশ ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া যাউক।” বীৰ্য্যপূর্ণ এই চিন্তা, উচ্ছ্বসিত ভাষায় ইহার প্রকাশ—ইংলণ্ডের লক্ষ লক্ষ বীর যুবক ইহারই রক্ষায় অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ভারতবাসী যদি মিঃ স্কাইবের মত এমন কথা বলিতে সাহসী হয়, তবে, তাদের অদৃষ্টে কি ঘটিবে?

জাতীয় মনোবিজ্ঞান একটা জটিল ব্যাপার। আমাদের মধ্যে অধিকাংশেই কল্পনা করেন যে আমরা কত ত্যাগপরায়ণ ও নিরপেক্ষ। আর যত কিছু দোষ, তাহা অগ্র সমস্ত দেশের! আমাদের মনের অন্তরালে কোন এক জায়গায় এই বন্ধমূল ধারণা আছে যে, আমরা অস্ত্রের মত নহি। এই বৈষম্যের ফলটা আমাদের ভদ্র জীবনযাত্রার জন্ত আমরা সাধারণতঃ জোরের সঙ্গে প্রকাশ করি না। আর যদি আমরা এতটা সৌভাগ্যশালী হইয়া থাকি যে, আমরা কোন সাম্রাজ্যের মালিক, অগ্ৰত্ব দেশের ভাগ্য আমরা নিয়ামক, তবে এমন কথা আমরা বিশ্বাস না করিয়া পারি না যে, যথাসম্ভব এই সর্বোত্তম পৃথিবীর সমস্তই উত্তম। যাহারা ইহার পরিবর্তনের জন্ত আন্দোলন করিতেছে, তাহারা আত্মস্বার্থান্বেষী কিম্বা বিভ্রান্ত মূর্খের দল—যে উপকার আমরা তাহাদের করিয়াছি, তাহার প্রতিও তাহারা অকৃতজ্ঞ।

বৃটিশ জাতি দ্বীপবাসী; দীর্ঘকালের সাফল্য ও ঐশ্বর্য্য তাহাদিগকে প্রায় সমস্ত জাতির প্রতি তাজিল্য দৃষ্টি আনিয়া দিয়াছে। তাহাদের

গণতন্ত্র—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে

পক্ষে কোনও ভদ্রলোকের সেই উক্তিটা প্রযুক্ত্য—“ফ্রান্সের কালে বন্দর হইতেই নিগ্রো বসতি আরম্ভ হইয়াছে।” কিন্তু এই প্রকার উক্তি অত্যন্ত ব্যাপক। বোধ হয় ইংলণ্ডের অভিজাত শ্রেণীর দৃষ্টিতে পৃথিবীর বিভাগটা কতকটা এই. রকমের—(১) ব্রিটেন—তারপর দীর্ঘ ফাঁক এবং তারপর (২) ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন (কেবল শ্বেতকায় জাতি অধ্যুষিত) ও আমেরিকা (কেবল এংলো-সাক্সন জাতি, দাগো বা ওয়াপ প্রভৃতি নহে) (৩) পশ্চিম ইউরোপ (৪) ইউরোপের বাকী অংশ (৫) দক্ষিণ আমেরিকা (লাটিন ভাষাভাষী জাতি সহ), তারপর দীর্ঘ ফাঁক এবং তারপর (৬) এশিয়া ও আফ্রিকার কাল, বাদামী ও পীত রংয়ের মানুষ; এইগুলি অল্পবিস্তর পরস্পরের সঙ্গে একত্র গ্রথিত।

ইহাদের মধ্যে সকলের শেষ শ্রেণীতে আমরা—আমাদের শাসকেরা যে উচ্চশিক্ষণে বাস করেন, তাহা হইতে আমরা কত দূরে! সুতরাং আমাদের দিকে তাকাইতে গিয়া যখন তাঁহাদের দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া আসে কিম্বা যখন আমরা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের কথা বলি, তখন যে তাঁহারা বিরক্তি বোধ করেন, ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে? স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র এই শব্দগুলি আমাদের জগৎ তৈয়ারী হয় নাই। জন মল্লির মত একজন খ্যাতিমান উদারনীতিক নেতাও কি এমন কথা বলেন নাই যে, কোন স্ফূর্ত অস্পষ্ট ভবিষ্যতেও তিনি ভারতবর্ষে কোন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের কল্পনা করিতে পারেন না? পশুর লোমে তৈয়ারী কানাডার ফার কোর্টের মত গণতন্ত্রও ভারতের আবহাওয়ার পক্ষে অল্পপযোগী। পরবর্তীকালে ব্রিটেনের শ্রমিক দল, যাহারা সমাজতন্ত্রের পতাকাবাহী, নির্ধাতাদের যাহারা বান্ধব, তাঁহারাও তাঁহাদের জয়ের পরে ১৯২৪ সালে আমাদের জগৎ বেঙ্গল অর্ডিগ্যান্স পুনঃ প্রবর্তিত করেন। তাঁহাদের দ্বিতীয় গভর্নমেণ্টের আমলে আমাদের অদৃষ্ট বরং আরও শোচনীয় হইয়াছিল। আমি নিশ্চয় জানি যে তাঁহারা আমাদের অন্তর্ভুক্ত কামনা করেন না। যখন তাঁহারা ধর্ম্মবাজকের ভদ্রীতে বক্তৃতার বেদীমঞ্চ হইতে আমাদেরিকে সম্বোধন করিয়া বলেন, “হে আমাদের প্রিয় ভ্রাতাগণ” তখন তাঁহারা সচেতন শুভ বুদ্ধিরই উত্তেজনা অল্পভব করেন। কিন্তু তাঁহাদের নিকট আমরা ও তাঁহারা এক নহি, সুতরাং অল্প কোন মানদণ্ডে আমাদের বিচার করিতে হইবে। ভাষা ও সংস্কৃতিগত বৈষম্যের জগৎ একজন ফরাসী ও একজন ইংরাজের পক্ষে যখন সমভাবে চিন্তা করা কঠিন, তখন একজন ইংরাজ ও একজন এশিয়াবাসীর বেলায় সেই বৈষম্য কত বৃহৎ।

জওহরলাল নেহরু

সম্প্রতি লর্ড সভায় ভারতের শাসন সংস্কার লইয়া বিতর্ক হইয়াছে। মাননীয় লর্ডগণ অনেক মনোহর বক্তৃতা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ভারতের কোনও প্রদেশের ভূতপূর্ব গভর্ণর লর্ড লিটন যিনি কিছুকাল বড়লাটের কার্য্য করিয়াছিলেন, তিনিও এক বক্তৃতা দিয়াছেন। প্রকাশ যে, তিনি এই মর্মে বক্তৃতা * করিয়াছেন,—“সমগ্র ভারতের হিসাবে কংগ্রেস রাজনৈতিকগণের অপেক্ষা ভারতের গভর্ণমেন্ট অনেক অধিক প্রতিনিধি স্থানীয়। অফিসারবর্গ, সমর বিভাগ, পুলিশ, রাজস্ববর্গ, সেনাদল, এবং হিন্দু ও মুসলিম পক্ষ হইতে ভারত গভর্ণমেন্ট কথা বলিতে পারেন। কিন্তু কংগ্রেস-রাজনৈতিকগণ ভারতের একটি বৃহৎ সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতেও প্রতিনিধিত্ব করিতে পারেন না।” তিনি তাঁহার বক্তব্যকে আরও পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন, “আমি যখন ভারতীয় জনমতের কথা বলি, তখন আমি তাঁহাদের কথাই বলি, ইহাদের সহযোগিতার উপর আমাকে নির্ভর করিতে হয় এবং ইহাদের সহযোগিতার উপর ভবিষ্যৎ লাট ও বড়লাটদিগকে নির্ভর করিতে হইবে।”

তাঁহার এই বক্তৃতায় দুইটি কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য পাওয়া যাইতেছে :— প্রথম সেই ভারতবর্ষই হিসাবের মধ্যে ধরিতে হইবে যে ভারতবর্ষ ব্রিটিশকে সাহায্য করে এবং দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষের ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট সর্বাপেক্ষা প্রতিনিধিস্থানীয়, সুতরাং ইহা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। এমন ধরণের যুক্তিও যখন গুরুত্বের সহিত দেখান হয়, তখনই বুঝা উচিত যে স্বয়ং খাল পার হইয়া আসিলে ইংরাজী শব্দগুলিরও যেন অর্থের পরিবর্তন হয়। ইহার পর অনিবাধ্যরূপে এই যুক্তিই আসে যে, স্বৈচ্ছাচারী গভর্ণমেন্টই সর্বাপেক্ষা প্রতিনিধিমূলক এবং গণতান্ত্রিক ধরণের, কারণ সম্রাট সকলেরই প্রতিনিধিস্থানীয়। আমরা রাজাদের স্বর্গীয় অধিকারকে আবার ফিরিয়া পাইলাম, আর পাইলাম—“আমিই রাষ্ট্র”। প্রকৃত কথা এই যে সম্প্রতি বিস্তৃত স্বৈচ্ছাতন্ত্রবাদেরও নামজাদা সমর্থক জুটিয়া গিয়াছে। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের উজ্জল রত্ন—শ্রম ম্যালকলম হেলী গত ১৯৩৪ সালের ৫ই নবেম্বর বারাণসীতে যুক্ত-প্রদেশের গবর্ণররূপে বক্তৃতা দিতে গিয়া দেশীয় রাজ্যসমূহে স্বৈরতন্ত্রের পক্ষে ওকালতি করিয়াছেন। কিন্তু এই উপদেশের কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ কোন দেশীয় রাজাই স্বৈচ্ছায় স্বৈরতন্ত্র পরিত্যাগ করিবেন এমন সম্ভাবনা নাই। বর্তমানে একটা মজার ব্যাপার ঘটিয়াছে

* লর্ড সভা, ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪।

গণতন্ত্র—প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে

এই যে ইউরোপে গণতন্ত্রের পতন হইতেছে, এই ছুতা দেখাইয়া শ্বৈরতন্ত্রের প্রসারের চেষ্টা চলিতেছে। “সর্বত্রই যখন পার্লামেন্টীয় গণতন্ত্রের মৃত্যু ঘটিতেছে তখন চরম সংস্কারের সমর্থন” দেখিতে পাইয়া মহীশূরের দেওয়ান স্তর মীর্জা ইসমাইল তাঁহার “বিশ্বায়” প্রকাশ না করিয়া পারেন নাই। “আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, রাজ্যের মধ্যে যাহারা সচেতন লোক, তাঁহারা অল্পকাল করিতেছেন যে আমাদের বর্তমান শাসনতন্ত্র সমস্ত প্রকার বাস্তব উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ গণতান্ত্রিক।” * মহীশূরের “চেতনা” সম্ভবতঃ মহীশূরের রাজা ও দেওয়ানের স্ব স্ব মনোবিজ্ঞানেরই একটা ছায়া মাত্র। সেখানে যে গণতন্ত্র প্রচলিত আছে, তাহার সঙ্গে শ্বৈরতন্ত্রের বৈষম্য নির্দেশ করা কঠিন।

যদি ভারতবর্ষের পক্ষে গণতন্ত্র উপযুক্ত না হয়, তবে বাহ্যতঃ উহা মিশরের পক্ষেও যোগ্য নহে। এইমাত্র আমি “ষ্টেটসম্যানে” † (কারাগারে ইদানীং আমাকে একথণ্ড দৈনিক সংস্করণ দেওয়া হইতেছে) প্রকাশিত কায়রো হইতে একটি দীর্ঘ বিবৃতি পাঠ করিলাম। ইহাতে বলা হইয়াছে যে প্রধান মন্ত্রী নাশিম পাশা “তাঁহার এক ঘোষণার দ্বারা দায়িত্বসম্পন্ন রাজনৈতিক মহলে কম আতঙ্ক জাগ্রত করেন নাই। কারণ; এই ঘোষণায় তিনি রাজনৈতিক দলসমূহকে, বিশেষভাবে ওয়াকফদিগকে পরস্পরের সহযোগিতায় আবদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্য হইতেছে একটা নূতন শাসনতন্ত্রের পরিকল্পনা এবং তাহার জন্ম একটা জাতীয় সম্মেলন অথবা গণ-পরিষদ গঠনের জন্ম নির্বাচন অনুষ্ঠান। ইহার অর্থ হইতেছে পরিণামে জনসাধারণের গণতন্ত্রমূলক গবর্ণমেণ্টের আমলে ফিরিয়া যাওয়া। কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায় মিশরের পক্ষে এই প্রকার শাসন সর্বদাই সর্বনাশকর হইয়াছে, কারণ অতীতে ইহা জনতার সর্বাপেক্ষা নীচ প্রবৃত্তির খঞ্জরে পড়িয়াছে। মিশরীয় রাজনৈতির ও তাহার জনগণের ভিতরের কার্যকলাপের সন্ধান রাখেন এমন যে কেহ নিঃসন্দেহে বলিতে পারিবেন যে, নির্বাচনের ফলে পুনরায় ওয়াকফ দলই ক্ষমতায় আসীন হইবেন এবং তাঁহাদেরই সংখ্যাধিক্য হইবে। সুতরাং এই কার্য্য-পদ্ধতিকে নিবারণের জন্ম যদি কোন প্রতীকার ব্যবস্থা অবলম্বিত না হয়, তবে আমরা শীঘ্রই এক অতিমাত্রায় গণতন্ত্রবাদী বিদেশী-বিদ্রোহী বৈপ্রবিক শাসনের সম্মুখীন হইব।”

* মহীশূর ২১ জুন, ১৯৩৪।

‡ ৬২ অধ্যায়ে মন্তব্য দেখুন।

† ডিসেম্বর ১৯, ১৯৩৪।

জওহরলাল নেহরু

এ সম্পর্কে এমন একটা প্রস্তাবও উঠিয়াছে যে, ‘কমিউনিস্টদের পাকিস্তান’ শাসন বিভাগীয় ‘চাপ’ দিয়া নির্বাচন “অস্থিতি” হউক, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রধান মন্ত্রী “এত অতিরিক্ত রকমের আইননিষ্ঠ” যে তিনি তেমন কিছু করিতে চাহিতেছেন না। এই অবস্থায় একমাত্র উপায় এই আছে, ব্রিটিশ মন্ত্রী-সভার হস্তক্ষেপ এবং “তঁাহাদের ঘোষণা করা উচিত যে তঁাহারা এই ধরনের কোন শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সহ্য করিবেন না।

ব্রিটিশ মন্ত্রীরা কি করিবেন না করিবেন অথবা মিশরে কি ঘটিবে তাহা আমি জানি না।* সম্ভবতঃ এই যুক্তি দেখাইয়াছেন কোন স্বাধীনতা-প্রিয় ইংরাজ এবং এই যুক্তির দ্বারা আমরা ভারতীয় ও মিশরীয় অবস্থার জটিলতা কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারিতেছি। ষ্টেটসম্যান পত্রিকা প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধে যেমন বলিতেছেন,—“যে ধরনের জীবনযাত্রা ও মনোবৃত্তি হইতে গণতন্ত্রের প্রসার ঘটে, তাহার সহিত একজন সাধারণ মিশরীয় ভোটদাতার জীবনযাত্রা ও মনোবৃত্তির কোন সামঞ্জস্য নাই, গোড়াকার গলদ এইখানে।” এই সামঞ্জস্য-হীনতার আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে,—“ইউরোপে অনেক সময় গণতন্ত্রের পতন ঘটিয়াছে অতিরিক্ত সংখ্যক দলের জন্ম, আর মিশরের পক্ষে বাধা এই যে সেখানে ওয়াফদ ছাড়া আর কোন দলই নাই।”

ভারতবর্ষে আমাদের কাছে বলা হইয়া থাকে যে, আমাদের গণতান্ত্রিক উন্নতির পথে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষই প্রধান বাধা, সুতরাং অকাট্য যুক্তির দ্বারা এই সমস্ত বিপদই চিরকালের জন্ম জীয়াইয়া রাখা হইয়াছে। আমাদের কাছে আরও বলা হইয়া থাকে যে, আমাদের মধ্যে ঐক্য খুব যথেষ্ট নহে। মিশরে কোন সাম্প্রদায়িক বিরোধ নাই এবং সেখানে যে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ঐক্যের প্রশ্ন, তাহাও প্রকাশমান। তথাপি এই ঐক্যই সেখানে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার পক্ষে বিঘ্ন স্বরূপ। গণতন্ত্রের পথ যে সোজা ও সর্কীর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচ্য দেশের গণতন্ত্রের জন্ম কেবল একটা অর্থ আছে বলিয়া মনে হয়, সাম্রাজ্যবাদীয় শাসনশক্তির হুকুমগুলি মানিয়া চলা এবং তঁাহাদের কোন স্বার্থে কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ না করা। এই সর্ভাধীনে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা অবোধে প্রসার লাভ করিতে পারে।

* ১৯৩৫ এপ্রিল মাসে মিশরে ব্রিটিশ দখলের প্রতিবাদে ব্যাপক রাজনৈতিক দাঙ্গা ঘটিয়াছিল।

বিষাদ

“স্বিচ্ছ কোমল দুর্বাদলে
শব্দের জন্ত আমার চিত্ত ব্যাকুল !
মাগো, তোমার চরণতলে পতিত ক্লান্ত
সন্তানের সকল স্বপ্নই ভাঙিয়া গেল ॥”

এপ্রিল আসিল ! বাহিরের ঘটনাবলীর কিছু কিছু গুজব আলীপুরের কারাকক্ষে আমার কাণে আসিল, কিন্তু এই গুজব অপ্রীতিকর এবং অশান্তিজনক ! একদিন কথায় কথায় জেল-সুপারিন্টেন্ডেন্ট আমাকে বলিলেন যে, মিঃ গান্ধী আইন অমান্ত আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়াছেন। ইহার বেশী কিছু আমি জানিতে পারিলাম না। এই সংবাদ শুভ নহে, বহু বৎসর যাহাকে আমি এত গুরুত্ব দিয়া আসিতেছিলাম তাহার এই প্রকার উপসংহারে আমি অভ্যস্ত ক্লেশ বোধ করিলাম। তথাপি আমি নিজেকে-নিজেকে এই যুক্তি দিলাম যে, ইহার সমাপ্তি অনিবার্য ছিল। আমি মনে মনে জানিতাম যে, কোন না কোন সময় অন্ততঃ সাময়িক ভাবে হইলেও আইন অমান্ত আন্দোলন প্রত্যাহার করিতে হইবে। ব্যক্তি বিশেষ কলাকলের দিকে না তাকাইয়াও প্রায় অনিশ্চিত কাল পর্যন্ত আন্দোলন চালাইতে পারেন, কিন্তু জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ এই ভাবে চলে না। অধিকাংশ কংগ্রেসসেবীর এবং দেশবাসীর চিত্ত গান্ধিজী যে যথাযথ অনুধাবন করিয়াছেন, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। আমি এই নূতন অবস্থার সঙ্গে, অপ্রীতিকর হইলেও, নিজেকে খাপ খাওয়াইতে চেষ্টা করিলাম।

পুরাতন স্বরাজ্যদলকে পুনরায় চাক্ষু করিয়া আইন সভায় প্রবেশের যে নূতন চেষ্টা চলিতেছে, তাহারও বিষয় আমি কিছু কিছু অস্পষ্টভাবে শুনিলাম। ইহাও আমার কাছে অনিবার্য মনে হইল, দীর্ঘকাল আমি এই মতই পোষণ করিয়াছিলাম যে, ভবিষ্যৎ কাউন্সিল-নির্বাচনে কংগ্রেস দূরে সরিয়া থাকিতে পারে না। যে পাঁচ মাস আমি কারাগারের বাহিরে স্বাধীন ছিলাম, তখন আমি এই মনোবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কারণ, আমি ভাবিয়াছিলাম যে, এখনও সময় আসে নাই, সুতরাং ইহা দ্বারা একদিকে প্রত্যক্ষ আন্দোলন এবং অল্প দিকে নূতন সামাজিক পরিবর্তনের ভাবধারাকে,

যে ভাবধারা লইয়া কংগ্রেসীমহল আন্দোলিত হইতেছে, তাহার গতিকে ব্যাহত করিয়া আমাদের দৃষ্টিকে হৃদয় ভিন্ন পথে লইয়া যাইবে। আমি আরও ভাবিলাম, সঙ্কট যত দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে, আমাদের জনসাধারণ ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ততই এই সমস্ত ভাবধারার বিস্তার হইবে এবং আমাদের আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পশ্চাতে যে কঠিন বাস্তবতা আছে, তাহা আত্মপ্রকাশ করিবে। লেনিন যেমন এক জায়গায় বলিয়াছেন, “যে কোন রাজনৈতিক সঙ্কটের উপযোগিতা আছে, কারণ যাহা গুপ্ত ছিল, এই সঙ্কটের যুগে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে, রাজনীতির সঙ্গে যে সমস্ত বাস্তব শক্তি জড়িত ছিল, সেগুলি আত্মপ্রকাশ করে, বাক্য ও কল্পনার ফাঁকিবাঁজি এবং মিথ্যা ধরা পড়ে, প্রকৃত ঘটনাবলীকে ইহা স্বস্পষ্টরূপে বুদ্ধির গোচর করে এবং প্রকৃত বাস্তবতার অর্থ কি, তাহা জনসাধারণকে জোর করিয়া বুঝাইয়া দেয়।” আমি আশা করিয়াছিলাম যে, এই কার্যক্রমের ফলে কংগ্রেস একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য লইয়া থাকিবে, স্পষ্টমনা এবং অধিকতর সুস্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানরূপে দেখা দিবে। দুর্বলতর উপাদানগুলির কিছু কিছু ইহার ফলে ধরিয়া পড়িতে পারে, কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। এবং যখন প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের পুঁথিগত মতবাদের দিনও ফুরাইয়া আসিবে, আর তথাকথিত নিয়মতান্ত্রিক ও আইন মার্কিন উপায়ের পুনঃপ্রবর্তন ঘটবে, তখন কংগ্রেসের অগ্রগামী ও প্রকৃত কর্মনিরত অংশ এই সমস্ত উপায়কেও কাজে লাগাইবে আমাদের চরম লক্ষ্যের এক বৃহত্তর দৃষ্টি লইয়া।

বাহ্যতঃ সেই সময় আসিয়াছিল। কিন্তু আমি বিমর্ষ চিত্তে দেখিলাম যে, ঠাঁহারাই আইন অমান্য আন্দোলনের এবং কংগ্রেসের সকল কর্মব্রতের মেরুদণ্ড স্বরূপ ছিলেন, তাঁহারাই পশ্চাতে হটিয়া যাইতেছেন, আর ঠাঁহারাই তেমন কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারাই নেতৃত্বের ভার লইতেছেন।

কয়েকদিন পরে সাপ্তাহিক ‘ষ্টেটসম্যান’ আসিল, গান্ধিজী আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া যে বিবৃতি দিয়াছিলেন, তাহা এই কাগজটিতে পাঠ করিলাম। নিতান্ত বিষ্ময়ে এবং অবসন্নপ্রায় চিত্তেই পাঠ করিলাম। আমি পুনঃ পুনঃ এই বিবৃতি পড়িলাম, আইন অমান্য আন্দোলন ও অগ্রগত অনেক বস্তু আমার মন হইতে মুছিয়া গেল এবং তাহার স্থলে নানা বিরোধ ও সন্দেহ দেখা দিল। গান্ধিজী লিখিয়াছিলেন, “সত্যগ্রহ আশ্রমের বাসিন্দা ও সহকর্মীগণের সহিত ব্যক্তিগত ভাবে আমি যে আলাপ করিয়াছি, এই বিবৃতির মূলে তাহার প্রেরণা রহিয়াছে। বিশেষভাবে এই প্রেরণার মূলে রহিয়াছে দীর্ঘকালের প্রতিষ্ঠাবান একজন শ্রদ্ধেয় সহকর্মীর কথা, তাঁহার সম্পর্কে আমি কথায় কথায় এই তথ্যপূর্ণ সংবাদ পাইয়াছিলাম যে তিনি

বিষাদ

কারাগারের সম্পূর্ণ কর্তব্য পালন করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, তাঁহার নির্দিষ্ট কাজের বদলে তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত পড়াশুনাই বেশী পছন্দ করিতেন। নিঃসন্দেহে ইহা সত্যগ্রহের মূলনীতি বিরোধী। যে বন্ধুকে আমি ভালবাসি তাঁহার অসম্পূর্ণতার চেয়ে এই বার্তা আমার নিজের অসম্পূর্ণতা অধিকতর উল্কাটিত করিল। বন্ধুটি বলিলেন, তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, আমি তাঁহার দুর্বলতার কথা জানি। আমি অন্ধ ছিলাম এবং কোন নেতার মধ্যে অন্ধতা মার্জনীয় নহে। আমি তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলাম যে, নিশ্চয়ই আপাততঃ কিছু সময়ের জন্য সত্যগ্রহের বাস্তব ক্ষেত্রে একমাত্র আমিই প্রতিনিধি থাকিব।”

‘বন্ধুর’ অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটি যদি কিছু থাকিয়া থাকে, তবে তাহা নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপারেই ছিল। আমি স্বীকার করি যে, আমি প্রায়শঃই এই অপরাধে পরাধী ছিলাম। এবং তজ্জন্য আমি বিন্দুমাত্র অহুতপ্ত নহি। কিন্তু এই ব্যাপারটা যদি সত্যই একটা গুরুতর কিছু হইত, তথাপি এক বিশাল জাতীয় আন্দোলন, যাহার সহিত সহস্র সহস্র লোক মুখাভাবে এবং লক্ষ লক্ষ লোক গোপভাবে জড়িত, সেই আন্দোলন কোন ব্যক্তির একটা ভুলের জন্য পরিত্যাগ করিতে হইবে? আমার কাছে এমন প্রস্তাব বীভৎস এবং দুর্নীতিপূর্ণ মনে হইল। কিসে সত্যগ্রহ হয় এবং হয় না, তেমন কথা আমি জানি বলিয়া দিয়া লইতেছি না, কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় আমি আমার আচরণে কতকগুলি মূলনীতি অহুতপ্তের চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু গান্ধিজীর এই বিরতির দ্বারা আমার সেই সমস্ত নীতি বিপর্যস্ত ও আহত হইল। আমি জানি যে, গান্ধিজী সাধারণতঃ তাঁহার সহজাত বুদ্ধির প্রেরণায় কাজ করিয়া থাকেন (inner voice বা ‘অন্তরের আদেশ’ কিম্বা কোন ‘প্রার্থনার উত্তর’ অপেক্ষা আমি ইহাকে ‘সহজাত বুদ্ধি’ বলাই অধিক পছন্দ করি) এবং প্রায়শঃ তাহা ঠিক হইয়া থাকে। জন-চিত্তকে অহুতপ্ত করিবার এবং তাহাদের মন বুঝিয়া উপযুক্ত মুহূর্ত্তে কাজ করিবার বিশ্বয়কর কৌশল তিনি বারম্বার প্রমাণিত করিয়াছেন। কিন্তু কাজ করিবার পর উহা সমর্থন করিয়া যে সমস্ত যুক্তি তিনি পরে দেখাইয়া থাকেন, তাহা প্রায়শঃই তাঁহার পরবর্ত্তী চিন্তা হইতে উদ্ভূত। এবং এই সমস্ত যুক্তি কাহাকেও খুব বেশী দূর অগ্রসর করিয়া দেয় না। কোন সঙ্কটের সময় কোনও জননায়ক কর্মী প্রায় সর্বদাই নিজের অজ্ঞাতসারে কাজ করিয়া থাকেন এবং কাজের পর তিনি উহার যুক্তি খুঁজিয়া থাকেন। আমিও অহুতপ্ত করিলাম যে, সত্যগ্রহ স্বর্গিত রাখিয়া গান্ধিজী ঠিকই করিয়াছেন। কিন্তু যে সমস্ত যুক্তি তিনি দেখাইয়াছেন,

জওহরলাল নেহরু

তাহা আমাদের বুদ্ধির পক্ষে অপমানকর এবং এত বড় জাতীয় আন্দোলনের নেতার পক্ষে এক বিস্ময়কর অভিনয় বলিয়া মনে হইল। তাঁহার আশ্রমের বাসিন্দাগণের আচরণকে যে ভাবে খুসী বিচার করিয়া দেখায় সম্পূর্ণ অধিকার তাঁহার আছে, আশ্রমবাসিগণ সমস্ত প্রকার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছেন এবং একটা স্থনির্দিষ্ট শাসন মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু কংগ্রেস তেমন কিছু করে নাই, আমিও তাহা করি নাই। কিন্তু যে সমস্ত যুক্তি আমার নিকট আধ্যাত্মিক এবং রহস্যচ্ছন্ন বলিয়া মনে হইল এবং যাহার সহিত আমার কোনই সম্পর্ক নাই, তাহারই জগ্নু আমাদিগকে একবার এদিকে আর একবার ওদিকে ঠেলিয়া দেওয়া হইবে কেন? কোন রাজনৈতিক আন্দোলন, এমন কোন ভিত্তির উপর চালান সম্ভব বলিয়া কল্পনাও করা যায় কি? আমি যতটা নিজে বুঝি (আমি স্বীকার করি যে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে) তদনুসারে আমি সত্যগ্রহের নৈতিক দিকটা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলাম। ইহার মূলনীতি আমার চিন্তা স্পর্শ করিয়াছিল। আমি ভাবিয়াছিলাম যে, ইহা দ্বারা রাজনীতি এক উচ্চতর ও মহত্তর স্তরে পৌঁছবে। আমি ইহাও মানিয়া লইতে সম্মত যে, কেবল সমাপ্তি দেখিয়াই যে কোন প্রকার উপায়কে সমর্থন করা যায় না। কিন্তু এই নূতন মতবিকাশ কিম্বা ইহার ব্যাখ্যা এমন একটা বস্তু যাহা বহু দূর প্রসারী এবং ইহার মধ্যে এমন সম্ভাবনা রহিয়াছে, যাহা আমাকে ভীত করিয়া তুলিল।

এই সমগ্র বিবৃতি আমাকে অত্যন্ত ত্রস্ত ও উৎপীড়িত করিল। এবং এই বিবৃতির শেষে তিনি কংগ্রেসসেবকদিগকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা এই, “তাঁহারা আত্মত্যাগ ও স্বেচ্ছারূত দারিদ্র্যের রীতি ও সৌন্দর্য্য অবশ্য শিক্ষা করিবেন। তাঁহারা অবশ্যই জাতি সংগঠনের কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করিবেন এবং এই পদ্ধতি হইতেছে,—নিজ হাতে সূতা কাটিয়া ও সূতা বুনিয়া খদ্দেরের প্রচার, জীবনের প্রত্যেক পদক্ষেপে পরস্পরের প্রতি অনিন্দনীয় আচরণের দ্বারা অকৃত্রিম সাম্প্রদায়িক ঐক্যের প্রসার, ব্যক্তিগত জীবনে কোন আকার ও প্রকারের সর্ববিধ অস্পৃশ্যতা পরিহার, মাদক দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে বর্জন—বিভিন্ন নেশাসক্তের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসিয়া এবং সাধারণতঃ স্বকীয় পবিত্রতার অহুশীলন করিয়া মাদক দ্রব্য বর্জনের প্রচার, এই সমস্ত কাজ ও সেবার দ্বারাই দরিদ্রের মত জীবনযাত্রা সম্ভব হইবে। কিন্তু যাহাদের পক্ষে এই দরিদ্র জীবন সম্ভব নহে, তাঁহারা জাতীয় উপযোগিতা-সম্পন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রমশিল্প—যে শিল্প এখনও সুসংগঠিত হয় নাই, তাহাই অবলম্বন করিতে পারেন, ইহাতে অপেক্ষাকৃত কিছু বেশী আয় হইবে।”

ইহাই হইতেছে রাজনৈতিক কর্মতালিকা এবং এই তালিকা আমাদের

বিবাদ

অনুসরণ করিতে হইবে! দেখা যাইতেছে গান্ধিজী ও আমার মধ্যে বহু দূর ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে। অত্যন্ত বেদনাবিধুর হৃদয়ে আমি অনুভব করিলাম যে, বহু বৎসর ধরিয়া তাঁহার প্রতি আমার যে অনুরক্তির বন্ধন ছিল তাহা যেন ছিন্ন হইয়াছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া আমার মধ্যে এক মানসিক সংগ্রাম চলিতেছিল। গান্ধিজী এমন অনেক কিছু বরিয়াছেন, যাহা আমি বুঝি নাই কিম্বা প্রশংসা করিতেও পারি নাই। তিনি উপবাস আরম্ভ করিলেন, নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন চলিবার সময় বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিলেন, অথচ তাঁহার সহকর্মীরা আন্দোলনের সহিত যুক্ত রহিলেন। তাঁহার ব্যক্তিগত ও স্বৈচ্ছাকৃত বন্ধনজাল, বাহার ফলে এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে তিনি যখন কারাগারের বাহিরে থাকিবেন তখনও রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। তাঁহার নূতন অনুরাগ ও নূতন সঙ্কল্প তাঁহার পুরাতন সঙ্কল্প ও কার্যপদ্ধতি ঢাকিয়া ফেলিল, অথচ বহুতর সহকর্মীর সহিত একযোগে তিনি যে সঙ্কল্প ও কর্মভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল, এ সমস্ত দেখিয়া আমি বিষন্ন হইলাম। আমার স্বল্পকাল কারামুক্তির সময় আমি ইহা অনুভব করিয়াছি এবং অন্যান্য পার্থক্যগুলিও গভীরভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। গান্ধিজী বলিয়াছেন, আমাদের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য রহিয়াছে। সম্ভবতঃ উহা প্রকৃতিগত অপেক্ষাও অনেক অধিক, আমি জানি অনেক বিষয়ে আমার যে সকল স্পষ্ট ও নিশ্চিত ধারণা আছে তাহা তাঁহার বিশ্বাসের বিরোধী, তথাপি কংগ্রেস যে জাতীয় স্বাধীনতার জগ্নু কার্য করিতেছে, তাহার প্রতি বৃহত্তর আনুগত্য প্রয়োজন এই ধারণায় আমি অতীতে আমার ঐ সকল ধারণা যথাসম্ভব চাপিয়া রাখিয়াছি। আমার নেতা ও সহকর্মীদের নিকট আনুগত্য ও বিশ্বস্ত থাকিতে আমি চেষ্টা করিয়াছি, কেন না আমার মানসিক গঠনই এইরূপ যে কোন আদর্শ এবং স্বীয় সহকর্মীদের প্রতি অকৃত্রিম আনুগত্যকে আমি অতি উচ্চস্থান দিয়া থাকি। আমার এই অন্তর্নিহিত বিশ্বাস হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম কতবার হইয়াছে, কতবার আমাকে নিজের সহিত যুক্ত করিতে হইয়াছে। পাকে চক্রে আমি আপোষ রক্ষা করিয়া লইয়াছি। সম্ভবতঃ আমি অন্তায় করিয়াছি, কেন না স্বীয় বিশ্বাসের আশ্রয় ত্যাগ করা কাহারও পক্ষে ভাল হইতে পারে না। কিন্তু আদর্শের সংঘাতের মধ্যেও আমি আমার সহকর্মীদের প্রতি আনুগত্য রক্ষা করিয়াছি এবং আশা করিয়াছি ঘটনার গতিপথে আমাদের জাতীয় সংঘর্ষের বিকাশের সহিত বাধাগুলি অন্তর্হিত হইবে, আমার মানসিক দুশ্চিন্তা দূর হইবে, আমার সহকর্মীরা আমার মতবাদের নিকটবর্তী হইবেন।

জওহরলাল নেহরু

কিন্তু এখন ? আলীপুর জেলের সেলের মধ্যে বসিয়া সহসা আমি নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করিতে লাগিলাম। জীবন তরুণুলুহীন উষর মরুভূমির মত নীরস মনে হইতে লাগিল। জীবনে যত কঠিন শিক্ষা পাইয়াছি তাহাঙ্গ মধ্যে কঠিনতম এবং অত্যন্ত বেদনাদায়ক শিক্ষার সম্মুখীন হইলাম,—কোন চরম ব্যাপারে কাহারও উপর নির্ভর করা উচিত নহে। জীবনের পথে একাই চলা উচিত। অপরের উপর নির্ভর করাই আশাভঙ্গজনিত বেদনাকে আমন্ত্রণ করা।

আমার সঞ্চিত ক্ষোভের কিয়দংশ ধর্ম ও ধর্মভাবের উপর গিয়া পড়িল। আমি ভাবিলাম, ইহা চিন্তার স্পষ্টতা এবং উদ্দেশ্যের একাগ্রতার এক মহাশত্রু ; ইহার ভিত্তি কি কেবল ভাবাবেগ ও প্রবৃত্তির উপর নহে ? আধ্যাত্মিক হইতে গিয়া ইহা প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা এবং আত্মা হইতে কত দূরে সরিয়া যায়। পরলোকের দিক দিয়া ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়া, মানুষের মূল্য, সমাজের মূল্য, সামাজিক জীবিতার মূল্য সম্পর্কে ইহার ধারণা অতি অল্প। পূর্ব নিদিষ্ট ধারণা লইয়া ইহা বাস্তবের প্রতি অন্ধ হইয়া থাকে, কেন না, ইহাদের ভয় পাছে ধারণার সহিত ঘটনার অসামঞ্জস্য ঘটে। ধর্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, এইটুকু জানিয়াই ইহারা সবখানি জানা হইয়াছে মনে করে এবং অপরের নিকট তাহাই প্রচার করিবার কর্তব্য শেষ করে। বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি ও সত্যানুসন্ধানের আগ্রহ এক বস্তু নহে। ধর্ম শাস্তির বুলি আওড়ায়, অথচ এমন সব ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান সমর্থন করে, যাহা হিংসা ব্যতীত টিকিতেই পারে না। ধর্ম তরবারীর হিংসার নিন্দা করিয়া থাকে, কিন্তু যে হিংসা নিঃশব্দ গতিতে শাস্তির ছদ্মবেশ পরিয়া অনশন ও মৃত্যু বিতরণ করিতেছে অথবা তাহা অপেক্ষাও অধিকতর গর্হিত উপায়ে বাহ্যতঃ শারীরিক আঘাত না করিয়া মনের উপর অত্যাচার করিতেছে, তেজোবীৰ্য্য পিষিয়া দিতেছে, হৃদয় ভাঙ্গিয়া দিতেছে, সে সম্বন্ধে ইহা একেবারেই নীরব।

আমার মনের মধ্যে এই সকল আলোড়নের কারণ যিনি, তারপর তাঁহার কথা আমি ভাবিলাম। যাহাই হউক, এই গান্ধিজী কি আশ্চর্য্য মানুষ, কি বিশ্বয়কর অনিবার্য্য তাঁহার আকর্ষণ,—লোকের উপর তাঁহার প্রভাব কত সূক্ষ্ম। তাঁহার লেখা বা বক্তৃতা পাঠ করিয়া মানুষটিকে বুঝিবার উপায় নাই ;—লোকে যাহা ধারণা করে, তাহাপেক্ষাও তাঁহার ব্যক্তিত্ব অনেক বড়। তিনি ভারতের কি বিপুল সেবা করিয়াছেন। তিনি জনসাধারণের মধ্যে সাহস ও মনুষ্যত্ব সঞ্চার করিয়াছেন, শৃঙ্খলা ও সম্মতি শিখাইয়াছেন, স্বয়ং অতি বিনয়ী হইয়াও, তাহাদিগকে গর্ব ও আনন্দের

বিষাদ

সহিত আত্মত্যাগ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি বলেন, সাহসই চরিত্রের হৃদয় ভিত্তি, সাহস ব্যতীত নীতি, ধর্ম, প্রেম কিছু থাকিতে পারে না। “যে ব্যক্তি ভয়াতুর, সে কখনও সত্য ও প্রেমের পথের পথিক হইতে পারে না।” হিংসা সম্পর্কে তাঁহার আতঙ্ক থাকিলেও তিনি আমাদের বলিয়াছেন,—“কাপুরুষতা, হিংসা অপেক্ষাও ঘৃণাই।” এবং “যে ব্যক্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া চলে সে কর্মের রহস্য বুঝিয়াছে। আত্মত্যাগ, শৃঙ্খলা এবং আত্মসংযম ব্যতীত মুক্তি নাই, কোন আশা নাই। শৃঙ্খলাহীন আত্মোৎসর্গ নিষ্ফল।” এগুলি কেবল কথার কথা, সাধু বাবা এবং অনেকটা শূন্যগর্ভ বচন বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু এই সকল কথার পশ্চাতে শক্তি আছে, কেন না ভারতবর্ষ জানে এই ক্ষুদ্র মনুষ্যটির বাক্যানুযায়ী কাজ করিবার সামর্থ্য আছে।

তিনি ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরূপেই আসিয়াছেন। এই প্রাচীন ও বিজিত দেশের মর্মকথা তিনি আশ্চর্যরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি যেন ভারতের মূর্তি বিগ্রহ, এমন কি তাঁহার দুর্বলতাগুলিও ভারতীয় দুর্বলতা। তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা কদাচিৎ ব্যক্তিগত বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা যেন জাতির অপমান; বড়লাট ও অগ্রাণ্ড অনেকে যখন তাঁহার প্রতি অহমিকাপূর্ণ অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, তখন তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে কি বিপজ্জনক বীজ তাঁহারা বপন করিতেছেন। ১৯৩১-এর ডিসেম্বরে গোলটেবিল হইতে ফিরিবার পথে গান্ধিজী রোমে পোপের সহিত সাক্ষাৎকামনা করিলে তিনি অস্বীকৃত হইয়াছিলেন, এই সংবাদ প্রথম শুনিয়া আমি যে কি মর্মাহত হইয়াছিলাম, তাহা এখনও ভুলি নাই। এই অস্বীকৃতি আমার নিকট ভারতের অপমান বলিয়াই মনে হইয়াছিল; তিনি ইচ্ছা করিয়াই দেখা করেন নাই তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে অপমানের কথা হয়ত ভাবিয়া দেখেন নাই। ক্যাথলিক চার্চ তাহার বাহিরে সাধু বা মোহান্ত থাকিতে পারে, ইহা মানেন না এবং যেহেতু কোন কোন প্রটেস্ট্যান্ট চার্চপন্থী গান্ধিজীকে ধর্মজগতের মহাপুরুষ এবং প্রকৃত খৃষ্টান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, সেইজগতই রোম ঐ ধর্মবিরুদ্ধ পাপ হইতে দূরে থাকিবার অধিকতর প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন।

ঠিক এই সময় আলীপুর জেলে ১৯৩৪-এর এপ্রিল মাসে বার্নার্ড শ'-এর কয়েকখানি নূতন নাটক পড়িয়াছিলাম। “অন দি রক্স” এর ভূমিকায় যীশুখৃষ্ট ও পাইলেটের কথোপকথন পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইলাম। ইহার মধ্যে যেন আধুনিক অর্থও নিহিত রহিয়াছে, কেন না আর একটি সাম্রাজ্য আর একটি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির সম্মুখীন হইয়াছে। এই ভূমিকায় যীশু পাইলেটকে

জওহরলাল নেহরু

বলিতেছেন,—“আমি বলিতেছি, তুমি ভয় ত্যাগ কর। রোমের মহত্ব লইয়া তুমি আমার নিকট বৃথা বাগাড়ম্বর করিও না। তুমি যাহাকে রোমের গৌরব বলিতেছ, তাহা ভয় ছাড়া আর কিছুই নয়; অতীতের ভয় এবং ভবিষ্যতের ভয়, দরিদ্রের জন্ম ভয়, ধনীর জন্ম ভয়, পুরোহিতদিগের ভয়, শিক্ষিত বুদ্ধিমান ইহুদী ও গ্রীকদের ভয়, বর্বর গল, গথ ও হনদের ভয়। কার্থেজের ভয় হইতে তোমরা পরিত্রাণ পাইবার জন্ম উহা ধ্বংস করিয়াছ, এখন তদপেক্ষাও অপকৃষ্ট ভয়ে তোমরা স্বহস্তে যে বিগ্রহ গড়িয়াছ সেই সাম্রাজ্যগর্কী সিজারের ভয়ে ভীত এবং উপহসিত, নির্যাতিত কপর্দকহীন গৃহহারা আমার ভয়েও তোমরা ভীত; এক ঈশ্বরের নিয়ম ছাড়া তোমাদের সকল বস্তুকেই ভয়। স্বর্ণ, লোহ ও রক্ত ছাড়া তোমাদের কিছুতেই বিশ্বাস নাই। তোমরা যাহারা রোমের সমর্থক, তাহারা সকলেই কাপুরুষ, আর আমি ঈশ্বরের রাজ্য চাহিয়াছি, সাহসের সহিত সব কিছুর সম্মুখীন হইয়াছি, সর্বস্ব হারাইয়াছি এবং এক চিরস্থায়ী মুকুট লাভ করিয়াছি।”

কিন্তু গান্ধিজীর মহত্ব, তাঁহার দেশসেবা অথবা আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার নিকট কত ঋণী, প্রশ্ন তাহা নহে। ইহা সত্ত্বেও, অনেক ব্যাপারে তিনি মারাত্মক ভ্রম করিতে পারেন। যাহাই হউক, তাঁহার উদ্দেশ্য কি? বহু বর্ষ তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াও তাঁহার উদ্দেশ্য আমি স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারি নাই। আমার সন্দেহ হয়, তাঁহার নিজেস্ব ধারণা স্পষ্ট কিনা? তিনি বলেন, আমার পক্ষে একপদ অগ্রসর হওয়াই যথেষ্ট, তিনি ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাতও করেন না অথবা কোন সূনির্দিষ্ট পরিণতি স্থির করেন না। তোমরা উপায়ের উপর দৃষ্টি রাখ, উদ্দেশ্য আপনা হইতেই সিদ্ধ হইবে, একথা পুনঃ পুনঃ বলিতে তিনি ক্লান্ত হন না। তুমি তোমার ব্যক্তিগত জীবনকে ভাল করিয়া তোল, আর সব আপনা হইতেই হইবে। ইহা রাজনৈতিক অথবা বৈজ্ঞানিক মনোভাব নহে কিংবা সম্ভবতঃ নৈতিক মনোভাবও নহে। ইহা অতি সঙ্গীর্ণ নীতিবাদীর কথা এবং ইহাতে একই প্রশ্ন ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে। সাধুতা কি? ইহা কি কেবল ব্যক্তিগত ব্যাপার না সামাজিক ব্যাপার? গান্ধিজী চরিত্রের উপরই বেশী জোর দেন, বুদ্ধির উৎকর্ষসাধন ও পুরিপুষ্টিকে মোটেই কোন গুরুত্ব দেন না। চরিত্র ব্যতীত বুদ্ধি বিপজ্জনক হইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিকে বাদ দিলে চরিত্রের মূল্য কি? কি ভাবে চরিত্র গড়িয়া উঠে? গান্ধিজীকে মধ্যযুগীয় খৃষ্টান সাধুদের সহিত তুলনা করা হইয়াছে; তাঁহার অনেক কথা উহার সহিত মিলিয়া যায়। কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা ও উপায়ের সহিত উহা সামঞ্জস্যহীন।

বিষাদ

ইহা যাহাই হউক, উদ্দেশ্যের অস্পষ্টতা আমার নিকট অতি শোচনীয়। প্রচেষ্টাকে কার্যকরী কবিতা ভুলিতে হইলে তাহাকে হুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত করা কর্তব্য। জীবন ত্রায়শাস্ত্রের সূত্র নহে, মাঝে মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য লক্ষ্যের পরিবর্তন করিতে হইবে, কিন্তু সব সময়েই চক্ষের সম্মুখে একটা লক্ষ্য স্থাপন করিতে হইবে।

আমার ধারণা এবং সময় সময় মনে হয়, গান্ধিজী উদ্দেশ্য সম্পর্কে ততটা অস্পষ্ট নহেন। তিনি আবেগের সহিত একটা বিশেষ পথে চলিতে চাহেন, কিন্তু তাহার সহিত আধুনিক ভাব বা অবস্থার সম্পূর্ণ অনৈক্য আছে, এবং আজ পর্যন্ত তিনি এ দুই-এর সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারেন নাই অথবা তাঁহার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিবାର আশু উপায়গুলি সমগ্রভাবে নির্দেশ করিতে পারেন নাই। এই কারণেই অস্পষ্টতা থাকে এবং তিনি স্পষ্টতা এড়াইয়া চলেন। যখন হইতে দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি তাঁহার দার্শনিক তত্ত্বাধেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহার পর হইতে পঁচিশ বৎসর কাল তাঁহার মনের গতি কোন দিকে তাহা অতিশয় স্পষ্ট। আমি জানি না তাঁহার প্রথম দিকের রচনাগুলির সহিত এখনও তাঁহার মতের মিল আছে কিনা। সন্দেহ হয়, হয় ত সমগ্রভাবে উহা তাঁহার আধুনিক মত নহে। কিন্তু উহা হইতে তাঁহার চিন্তার পটভূমিকা আমরা বুঝিতে পারি।

১৯০৯ সালে তিনি লিখিয়াছিলেন, “ভারত যদি মুক্তি চাহে; তাহা হইলে গত পঞ্চাশ বৎসরে সে যাহা শিখিয়াছে তাহা ভুলিতে হইবে। রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, হাসপাতাল, উকীল, ডাক্তার এবং ঐ শ্রেণীর সমস্ত অবসান করিতে হইবে এবং তথাকথিত উচ্চশ্রেণীগুলিকে সচেতন ভাবে ধর্ম্মানুরাগের সহিত ক্লবক জীবনে অভ্যস্ত হইতে হইবে, জানিতে হইবে ঐ জীবনই প্রকৃত আনন্দের।” তিনি আরও লিখিয়াছেন,— “যতবার আমি রেলগাড়ীতে উঠি অথবা কোন মোটর বাস ব্যবহার করি, ততবারই মনে হয় আমি অন্তর্নিহিত সত্যের বিরুদ্ধে ব্যভিচার করিতেছি।” “অতিমাত্রায় কৃত্রিম দ্রুত যন্ত্রপাতির সাহায্যে জগতের সংস্কার চেষ্টা, অসাধ্য সাধনের চেষ্টা মাত্র।”

এই সকল মত ও পথ আমার নিকট ভুল ও অনিষ্টকর বলিয়াই মনে হয়, এবং উহা কার্যে পরিণত করাও অসম্ভব। ইহার পুচ্ছাতে রহিয়াছে গান্ধিজীর দারিদ্র্য, দুঃখবরণ ও তপস্বী জীবনের প্রতি অহুরাগ ও গৌরব বোধ। তাঁহার মতে ক্রমোন্নতি ও সভ্যতার অর্থ মাহুষের অভাব বৃদ্ধি করাও নহে, জীবনযাত্রার প্রণালীর উৎকর্ষ সাধন নহে;

“পরন্তু দৃঢ়তার সহিত স্বেচ্ছায় অভাব কমাইতে হইবে, উহাই সুখ ও সম্ভোগের পথ এবং সেবার শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে।” এই সকল পূর্ব সিদ্ধান্ত একবার স্বীকার করিয়া লইলে গান্ধিজীর অগ্ৰান্ত চিন্তার অনুসরণ করা সহজ হইয়া উঠে এবং তাঁহার কার্য প্রণালীও বুঝিবার অধিকতর সুবিধা হয়। কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ঐ সকল পূর্ব-সিদ্ধান্ত মানিয়া লই না এবং তথাপি যখন দেখি যে তাঁহার কার্যপ্রণালী আমাদের মনোমত নহে, তখন অভিযোগ করিতে থাকি।

দারিদ্র্য ও দুঃখভোগের প্রশংসা করা ব্যক্তিগতভাবে আমার মোটেই ভাল লাগে না। আমি উহা কাম্য বলিয়া কখনই মনে করি না। আমার মতে উহা বিলুপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে ভাল হইলেও সামাজিক আদর্শ হিসাবে তপস্বী জীবনের সার্থকতা আমি বুঝি না। আমি সারল্য, সাম্য, আত্মসংযমের মূল্য ও মর্যাদা বুঝি, কিন্তু দেহকে পীড়ন করিবার অর্থ বুঝি না। ব্যায়ামবীর যে ভাবে নিয়মের সহিত দেহ গড়িয়া তোলে, সেইভাবে আমি বিশ্বাস করি, মন ও অভ্যাসও নিয়ন্ত্রিত করিয়া আয়ত্তের মধ্যে আনিতে হয়। যে ব্যক্তি অতি মাত্রায় অসংযমী, সে সঙ্কটের সময়ে দুঃখ সহ করিবে কিম্বা অসাধারণ আত্ম-সংযম দেখাইবে অথবা বীরের মত ব্যবহার করিবে, ইহা অবিশ্বাস্য। শরীর ভাল করিতে হইলে যেরূপ নিয়ম পালন আবশ্যক, চরিত্র ভাল করিতে হইলেও সেইরূপ নিয়ম আবশ্যক। কিন্তু তাহা যে তপস্বী জীবন বা আত্মপীড়ন হইবে, এমন কোন অর্থ নাই।

সরল ‘কৃষক জীবন’কে আদর্শ করিয়া তোলার মর্ম্মও আমি বুঝিতে পারি না। আমার উহা দেখিলে আতঙ্ক হয়, আমি কৃষকদিগকেই ঐ জীবন হইতে টানিয়া তুলিতে চাহি, আমি পল্লীকে সহর করিতে চাহি না, তবে সহরের সুখ সুবিধা ও সংস্কৃতি পল্লী অঞ্চলে লইয়া যাইতে চাহি। ঐ জীবন হইতে আমি প্রকৃত আনন্দ ত পাইবই না, বরং আমার নিকট উহা কারাদণ্ডের মতই মন্দ মনে হইবে। ‘কোদাল হাতে মানুষকে আদর্শবাদীর দৃষ্টিতে রমণীয় করিয়া তুলিবার কি আছে? বহুকাল বংশ-পরম্পরায় শোষিত ও নির্ধ্যাতিত হইয়া তাহাদের সহচর পশু হইতে তাহাদের পার্থক্য বড় বেশী নাই।

“কে তাহাকে আনন্দবঞ্চিত ও তাহার স্বকুমার বৃত্তিগুলি হত্যা করিয়াছে। সে জড় বস্তুর মত শোকহীন, কখনও কিছু কামনা করে না, কে তাহাকে, নির্কোষ ও বিমূঢ় এবং বলীবৃদ্ধের ভ্রাতাস্বরূপ করিয়া তুলিয়াছে?”

বিবাদ

মাহুঘের মন আধুনিক সংস্কারমুক্ত হইয়া আদিম অবস্থায় ফিরিয়া যাইবে, আমার নিকট তাহা সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য। যাহা মাহুঘের গৌরব ও জয়লঙ্ক সম্পদ, তাহারই নিন্দা করিতে হইবে, তাহার প্রতি নিরুৎসাহ প্রদর্শন করিতে হইবে এবং মনের পক্ষে অবসাদকর ও বিকাশের অবসর-হীন এক বাহ্যব্যবস্থা আকাঙ্ক্ষার বলিয়া ভাবিতে হইবে। বর্তমান সভ্যতার অনেক দোষ আছে, আবার ইহার মধ্যে অনেক ভালও আছে। এবং মন্দগুলিকে অতিক্রম করিবার মত শক্তিও ইহার মধ্যে আছে। ইহাকে সমূলে ধ্বংস করিয়া ফেলিলে পুনরায় বিরস, নিরানন্দ একঘেয়ে অস্তিত্ব বহন করার অবস্থা আসিবে। যদি আধুনিক সভ্যতাকে বর্জন করাই স্থির হয়, তাহা হইলেও তাহা এক অসম্ভব চেষ্টা মাত্র। এই পরিবর্তনের শ্রোতধারার দ্রুত করা বা ইহা হইতে সরিয়া যাওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন এবং মানসিক অবস্থার দিক দিয়া আমরা যাহারা জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাইয়াছি, তাহাদের পক্ষে উহা একেবারে ভুলিয়া গিয়া আদিম অবস্থায় ফিরিয়া যাওয়া কঠিন।

এ বিষয় লইয়া আলোচনা করা কঠিন, কেন না দুইটি দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। গান্ধিজী সর্বদাই ব্যক্তিগত মুক্তি ও পাপের দিক হইতে চিন্তা করেন এবং আমরা অধিকাংশই সামাজিক কল্যাণের দিক হইতে চিন্তা করিয়া থাকি। পাপবোধ ব্যাপারটা আমার পক্ষে বুঝা কঠিন এবং সম্ভবতঃ এই কারণেই আমি গান্ধিজীর সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী বুঝিতে পারি না। সমাজ অথবা সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, তিনি ব্যক্তির জীবন হইতে পাপ উন্মূলিত করিতে চাহেন। তিনি লিখিয়াছেন, “স্বদেশীর অহুগামিগণ কখনই জগতের সংস্কার করিবার নিফল চেষ্টা করেন না, কেন না তাঁহাদের বিশ্বাস ঈশ্বর-নির্দিষ্ট নিয়মে জগৎ চলিতেছে এবং সর্বদাই চলিবে।” অথচ তিনি নিজে জগৎকে সংস্কার করিতে সততই সচেষ্ট; কিন্তু যে সংস্কার তাঁহার লক্ষ্য তাহা ব্যক্তির চরিত্র সংশোধন—ইন্দ্রিয়গ্রাম এবং ভোগাকাঙ্ক্ষা জয় করা, কেন না উহা পাপ। একজন রোমান ক্যাথলিক লেখক ফাসিজম্ সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া, স্বাধীনতার যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, সম্ভবতঃ তিনি তাহার সহিত একমত হইবেন। “পাপের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ ছাড়া স্বাধীনতা আর কিছু নহে।” আর ঠিক এই কথাই দুইশত বৎসর পূর্বে লণ্ডনের বিশপ লিখিয়াছিলেন, “খৃষ্টধর্ম যে স্বাধীনতা দেয়, তাহা পাপ ও শয়তানের বন্ধন হইতে মুক্তি, মাহুঘের লালসা, রিপু ও অসদ্বৃত্ত কামনা হইতে মুক্তি।*

* “ধর্ম কি ?” এই অধ্যায়ে এই পত্রখানি হইতে কিয়দংশ পূর্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে।

জওহরলাল নেহরু

এই মত যদি কেহ মানিয়া লয়, সে গান্ধিজীর যৌন ব্যাপার সম্পর্কে মনোভাব কিছু বুঝিতে পারিবে, আধুনিক সাধারণ লোকের নিকট তাহা যতই অসাধারণ বলিয়া মনে হউক না কেন। তাহার মতে “সন্তান কামনাহীন মিলন মাত্রেই পাপ।” এবং “কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিলে তাহার অবশ্যস্বাভাবী ফলস্বরূপ ক্লৈব্য ও স্নায়বিক দৌর্বল্য দেখা দিবে।” “কৃতকর্মের পরিণাম হইতে ত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা অত্যাশঙ্কিত ও দুর্নীতিমূলক।...কাহারও পক্ষে রিপূর ক্ষুধা তৃপ্তির পরিণাম এড়াইবার জন্ত বলকারক বা অত্যাশঙ্কিত ঔষধ সেবন অত্যাশঙ্কিত। স্বীয় পার্শ্ববর্তী রিপূ চরিতার্থ করিয়া তাহার পরিণাম ফল হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা আরও শোচনীয়।”

ব্যক্তিগত ভাবে এই মনোভাব আমার নিকট অস্বাভাবিক ও বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়। যদি তাহার কথাই সত্য হয়, তাহা হইলে আমি একজন অপরাধী এবং ক্লৈব্য ও স্নায়বিক দৌর্বল্যের সীমারেখায় আসিয়া পৌছিয়াছি। রোমান ক্যাথলিকেরাও অবশ্য জন্ম-নিয়ন্ত্রণের তীব্র বিরোধিতা করেন, কিন্তু তাহারা গান্ধিজীর মত তাহাদের যুক্তিজাল লইয়া ততটা অগ্রসর হন নাই। তাহারা কালের গতি বুঝিয়া তাহাদের ধারণামুযায়ী মনুষ্য-স্বভাবের সহিত আপোষ করিয়াছেন। * কিন্তু গান্ধিজী তাহার যুক্তিজাল একেবারে চরম সীমায় লইয়া গিয়াছেন; পুত্র উৎপাদনের সময় ব্যতীত অল্প কোন সময়ে কোন প্রকার যৌন মিলনের যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করেন না। নর নারীর স্বাভাবিক যৌন-আকর্ষণও তিনি স্বীকার করেন না। তিনি বলিয়াছেন, “আমি যে নরনারীর মধ্যে স্বাভাবিক আকর্ষণ স্বীকার করি না, ইহাকে অনেকে অসম্ভব আদর্শ বলিয়াছেন। এ স্থলে উল্লিখিত যৌন-মিলনাকাজক্ষাকে স্বাভাবিক বলিয়া লোকে বিবেচনা করিবে, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমরা যেন ধ্বংস হইয়া যাই। নরনারীর মধ্যে স্বাভাবিক অলুয়াগ হইল, ভ্রাতার প্রতি ভগ্নীর, মাতার প্রতি পুত্রের, পিতার প্রতি কন্যার অলুয়াগ। এই স্বাভাবিক আকর্ষণই

* পোপ একাদশ পায়াস, ১৯৩১-এর ৩১শে ডিসেম্বর “খুষ্টান-বিবাহ” সম্পর্কে তাহার ঘোষণায় বলিয়াছেন, “সময়ের দরুন অথবা কোন শারীরিক ত্রুটির জন্ত যদি সন্তান নাও হয়, তাহা হইলেও বিবাহিত নরনারী যদি তাহাদের অধিকার সম্যক ও স্বাভাবিক বুদ্ধিভাৱা পরিচালনা করে, তাহা হইলে তাহা প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম বলিয়া বিবেচনা করা হইবে না।” “সময়ের দরুন” অর্থ যখন তথাকথিত “নিরাপদ সময়” অর্থাৎ যখন পর্জোৎপাদন হইতে নাও পারে।

বিষাদ

জগৎকে রক্ষা করিতেছে।” তিনি আরও জোরের সহিত বলিয়াছেন,—
“না, আমার সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া ঘোষণা করিব যে যৌন আকর্ষণ
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হইলেও তাহা অস্বাভাবিক।”

এই ‘ইন্ডিপাস কমপ্লেক্স,’ ফ্রেড এবং মনোবিকলন তত্ত্বের ছড়াছড়ির
যুগে এই সকল অতি সাহসিক উক্তি অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও সেকেলে মনে
লোকে ইহা হয় নিশ্চিচারে বিশ্বাস করিবে নয় অগ্রাহ্য করিবে। আমি
গান্ধিজীর এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভুল মনে করি। * তাঁহার উপদেশ
ব্যক্তিগত ভাবে কাহারও কাজে লাগিতে পারে। কিন্তু সকলের জন্তই
এই বিধান দিলে জীবনে ব্যর্থতার বেদনা, ইন্দ্রিয়দমনজনিত আক্ষেপ
ও স্নায়বিক দৌর্বল্য এবং নানা শ্রেণীর দৈহিক ও মানসিক ব্যাধি দেখা
দিবে। কামরিপু সংযত করা অবশ্যই ভাল, কিন্তু গান্ধিজীর পন্থা
অনুসরণ করিলে ব্যাপকভাবে ঐ ফল লাভ হইবে কিনা সন্দেহ। ইহা
একেবারে চরম মত, অধিকাংশ লোক উহা সাধ্যাতীত মনে করিয়া
সাধারণ ভাবে চলিতে থাকিবে অথবা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কলহ হইবে।
দেখা যাইতেছে গান্ধিজী মনে করেন, জন্মনিয়ন্ত্রণের উপায় অবলম্বন
করিলে যৌন উচ্ছ্বলতা বৃদ্ধি পাইবে এবং নর ও নারীর মধ্যে যৌন-আকর্ষণ
স্বাভাবিক বলিয়া ধরিয়া লইলে কোন পুরুষ যে কোন নারীর পশ্চাতে
এবং নারী যে কোন পুরুষের পশ্চাতে ধাবিত হইবে, ইহার কোন
অনুমানই যুক্তিসঙ্গত নহে, এবং আমি বুঝিতে পারি না, যৌনসমস্তা
তাঁহার মনকে এমন ভাবে অধিকার করিয়া বসিল কেন। অবশ্য
বিষয়টি গুরুতর সন্দেহ নাই। তাঁহার নিকট ইহা “কাল অথবা সাদার”
সমস্তা, তিনি মাঝামাঝি কোন বর্ণ মানেন না। দুই প্রান্তেই তাঁহার
মতবাদ চরম, আমার নিকট ইহা অত্যন্ত অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে
হয়। আজকাল যৌন ব্যাপার সম্পর্কিত পুস্তকের যে বণ্টা আসিয়াছে,
সম্ভবতঃ ইহা তাহারই প্রতিক্রিয়া। আমি একজন স্বাভাবিক মানুষ,
আমার জীবনেও ইন্দ্রিয় তাহার ভূমিকা অভিনয় করিয়াছে, কিন্তু ইহা
আমাকে অভিভূত করিতে পারে নাই অথবা অগ্ন্যাগ্ন কর্তব্য হইতে
ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। ইহা গোণ ব্যাপার মাত্র।

যে সকল তপস্বী জগৎ ও জাগতিক ব্যাপার বর্জন করিয়াছেন,
জীবনের স্বাভাবিক গতিকে অগ্ন্যাহ মনে করিয়া বর্জন করিয়াছেন,
তাঁহার মনোভাব অনেকটা সেইরূপ। একজন তপস্বীর পক্ষে ইহা স্বাভাবিক,
কিন্তু সাধারণ নরনারী যাহারা জগৎ ও জীবনকে গ্রহণ করিয়া উহা
যথাসম্ভব ভোগ করিতে চাহে, তাহাদের জীবনে ঐ নীতি প্রয়োগ করা

কষ্টকল্পনা মাত্র। এবং একটি অগ্নায়কে ঠেকাইতে গিয়া, সে অগ্নি
অনেক গুরুতর অগ্নায় সহ করে।

কথায় কথায় আমি বিষয়াস্তরে আসিয়া পড়িয়াছি, কিন্তু আলীপুর
জেলের দুঃখময় দিনগুলিতে এই সকল ভাব ও কথা আমার মনে বিশৃঙ্খল
সামঞ্জস্যহীন ভাবে উদ্ভূত হইত, সমস্ত কথা জটা পাকাইয়া আমাকে
বিহ্বল ও অবসন্ন করিয়া তুলিত। সর্বোপরি নিঃসঙ্গতা ও বিবাদ, আমার
জনহীন ক্ষুদ্র সেল ও জেলের অবরুদ্ধ আবহাওয়ায় মর্মান্তিক হইয়া
উঠিত। বাহিরে থাকিলে ইহা আমার মনে এতটা আঘাত করিত না,
আমি সহজেই উহা ভুলিয়া বিষয়াস্তরে মনোনিবেশ করিতে পারিতাম এবং
মনের কথা বলিয়া ও কাজ করিয়া আরাম পাইতাম। কিন্তু জেলের
মধ্যে পরিজ্ঞান পাওয়ার উপায় নাই; কতকগুলি দিন আমাকে দুষ্টিস্তায়
কাটাইতে হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে আমার মন শান্ত হইয়া আসিল এবং
নৈরাশ্যের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম। আমি মনের অবসাদ কাটাইয়া
উঠিলাম এবং তখন জেলে কমলার সহিত একবার সাক্ষাৎ হইল।
ইহাতে আমি অত্যন্ত প্রফুল্ল হইলাম, আমার নিঃসঙ্গতা দূর হইল। যাহাই
ঘটুক, আমরা দুইজন অন্ততঃ পরস্পরের উপর নির্ভর করিতে পারিব।

৬২

স্ববিরোধিতা

যে সকল লোক কখনও গান্ধিজীকে দেখেন নাই, কেবল তাঁহার
লেখা পড়িয়াছেন, তাঁহাদের মনে হইতে পারে, তিনি একজন পাদ্রী-
শ্রেণীর লোক, অতিমাত্রায় পবিত্রতাবাদী, গম্ভীরবদন, নিরানন্দ, একপ্রকার
“কৃষ্ণবাস পরিহিত খৃষ্টান সাধুদের মত তিনি বিচরণ করিয়া থাকেন।”
কিন্তু তাঁহার লেখা পড়িয়া তাঁহাকে ধারণা করিতে গেলে অবিচার করা
হয়, তাঁহার লেখা অপেক্ষা তিনি অনেক বড়, তাঁহার কোন লিখিত
উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার সমালোচনা করা সম্ভব ও শোভন নহে। তিনি
খৃষ্টান সাধু পাদ্রীর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহার স্মিতমুখ আনন্দদায়ক,
তাঁহার হাস্তে যাহু আছে, তাঁহার কাছে বসিলে হৃদয় লঘু হইয়া যায়।
তাঁহার শিশুর মত সারল্য সকলকে মুগ্ধ করে। তিনি যখন কোন
ক্ষেপে প্রবেশ করেন তখন চারিদিক নির্মল ও স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠে।

অবিরোধিতা

তাঁহার মধ্যে এক অনন্তসাধারণ অবিরোধিতা রহিয়াছে। আমার মনে হয়, প্রত্যেক লিখ্যাত ব্যক্তির মধ্যেই উহা অল্পবিস্তর থাকে। বহুবর্ষ আমি এই সমস্তা চিন্তা করিয়াছি যে, বঞ্চিত জনসাধারণের জন্ত তাঁহার অসীম প্রেম ও ব্যাণ্ডলতা সত্ত্বেও তিনি এমন এক ব্যবস্থা সমর্থন করেন যাহা অপরিহার্য্যরূপেই জনসাধারণকে বঞ্চিত ও পীড়িত করে, অহিংসার প্রতি তাঁহার গভীর অমুরাগ থাকা সত্ত্বেও তিনি কেন এমন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা সমর্থন করেন, যাহা সম্পূর্ণরূপে হিংসা ও পরপীড়নের উপর প্রতিষ্ঠিত? সম্ভবতঃ তিনি ঐ-শ্রেণীর ব্যবস্থা সমর্থন করেন, একথা বলা সম্ভব হইবে না; তিনি অল্পবিস্তর একজন দার্শনিক নৈরাজ্যবাদী। কিন্তু আদর্শ নৈরাজ্যবাদীর অবস্থা এখনও বহুদূরে, উহা সহজে প্রতিষ্ঠিত হইবার নহে, কাজেই তিনি প্রচলিত ব্যবস্থা মানিয়া লন। তাঁহার নিকট আপত্তিজনক উপায়গুলির বিষয় আমি চিন্তা করিতেছি না, কেন না, হিংসামূলক উপায়ে পরিবর্তন সাধনের তিনি সর্বদাই বিরোধী। বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন সাধনের জন্ত কি উপায় অবলম্বিত হইবে, সে কথা ছাড়িয়া দিলেও, এক আদর্শ উদ্দেশ্য অবধারণ করা যাইতে পারে, যাহা অদূর ভবিষ্যতেই সিদ্ধ হওয়া সম্ভবপর।

সময় সময় তিনি নিজেকে সমাজতান্ত্রিক বলেন, কিন্তু তিনি যে অর্থে ঐ শব্দটি ব্যবহার করেন তাহা তাঁহার নিজস্ব, তাহার সহিত, সমাজতন্ত্রবাদ বলিতে যাহা বুঝায়, সেই অর্থনৈতিক সমাজবিজ্ঞানসের কোন সম্পর্ক নাই। তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া একদল বিখ্যাত কংগ্রেসপন্থীও ঐ শব্দটি ব্যবহার করেন, যাহার অর্থ এক প্রকার ভ্রান্ত মানবতাবাদ। এই অস্পষ্ট রাজনৈতিক নামটি যাহারা ব্যবহার করিয়া ভুল করেন, তাঁহাদের দলে অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি আছেন, এবং তাঁহারা ব্রিটিশ গ্রাশনাল গভর্ণমেণ্টের প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টান্তই গ্রহণ করিয়াছেন। * আমি গান্ধিজী এবিষয়ে অজ্ঞ নহেন, তিনি অর্থনৈতিক, সমাজতান্ত্রিক, এমন কি, মার্কসীয় অনেক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন এবং উহা লইয়া অপরের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু আমি অধিকতর স্পষ্ট রূপে

* ১৯৩৫-এর জানুয়ারী মাসে এডিনবার্গ ফেডারেশান অফ কমন্সারভেটিভ এণ্ড ইউনিয়নিস্ট এসোসিয়েশানের নিকট এক বাগী দিতে গিয়া মিঃ রামজে ম্যাকডোনাল্ড বলিয়াছিলেন,— “সকটকালে প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই পূর্ণতর ও ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। ইহাই খাঁটি সমাজতন্ত্রবাদ, এবং ইহা খাঁটি জাতীয়তাবাদও বটে এবং কাজে কাজেই ইহাই আসল ব্যক্তিস্বাভাব্যবাদ।

বুঝিতেছি যে কোন প্রধান ব্যাপারে মনের সম্মতির বিশেষ কোন মূল্য নাই। উইলিয়ম জেমস্ বলিয়াছেন, “যদি তোমার হৃদয় সায় না দেয় তাহা হইলে তোমার মস্তিষ্ক তোমাকে কিছুতেই বিশ্বাস করাইতে পারিবে না।” ভাবাবেগই আমাদের সাধারণ বিচার বিবেচনা নিয়ন্ত্রিত করে এবং মনকে আয়ত্তের মধ্যে রাখে। সোপেনহাওয়ার বলিয়াছেন, “মানুষ যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, কিন্তু মানুষ কি ইচ্ছা করিবে, তাহা ইচ্ছামত স্থির করিতে পারে না”।

দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম দিকে গান্ধিজী এক মহান দীক্ষা গ্রহণ করেন, এই পরিবর্তনে তাঁহার সমগ্র জীবনই রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। ইহার পর হইতেই তাঁহার সমস্ত ভাবের পশ্চাতে এই দৃঢ় স্থির ভূমি রহিয়াছে, যে কারণে তাঁহার মন নূতন কিছু গ্রহণ করিতে পারে না। কেহ তাঁহার নিকট কোন নূতন প্রস্তাব করিলে তিনি অতিশয় ধৈর্য্য ও মনোযোগের সহিত তাহা শ্রবণ করেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত সৌজ্ঞেয় মধ্যেও লোকে সহজেই বুঝিতে পারে যে সে বন্ধ দরজায় করাঘাত করিতেছে। তাঁহার ধারণাগুলি এত বদ্ধমূল যে, অগ্ৰাণ্য বিষয় তাঁহার নিকট তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়; অগ্ৰাণ্য গোণ ব্যাপারের উপর জোর দিলে, বৃহত্তর পরিকল্পনা বিকৃত ও মন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। মূল বিষয়টি ঠিক থাকিলেই অগ্ৰাণ্য বিষয়ের যথাযথ সামঞ্জস্য বিধান হইবে। যদি উপায় অভ্রান্ত হয়, ফলও অভ্রান্ত হইবেই।

আমার ধারণা ইহাই তাঁহার মনের প্রধান পটভূমিকা। হিংসার সহিত সম্পর্ক আছে বলিয়া তিনি সমাজতন্ত্রবাদ বিশেষ ভাবে মার্কসীয় মতবাদকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেন। ‘শ্রেণীসংগ্রাম’ এই শব্দটাই তাঁহার নিকট হিংসা ও সংঘর্ষরূপে প্রতিভাত হয়, এবং সেই কারণেই উহা তাঁহার নিকট বিরক্তিকর। তিনি জনসাধারণের জীবনযাত্রার ব্যবস্থা সাদাসিধে একটা নির্দিষ্ট হারের উর্দ্ধে উঠুক ইহা পছন্দ করেন না, কেন না বেশী প্রাচুর্য্য ঘটিলে বিলাসিতা ও পাপ বৃদ্ধি পাইবে। মুষ্টিমেয় ধনীরা যে বিলাস সন্তোষ করে তাহাই অতি মন্দ, তাহার উপর তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হইলে ফল শোচনীয় হইয়া পড়িবে। ১৯২৬ সালে তাঁহার লিখিত একখানি পত্র হইতে এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। কয়লার খনির মজুরদের ধর্ম্মঘটের সময় ইংলণ্ড হইতে প্রাপ্ত একখানি পত্রের উত্তরে তিনি উহা লেখেন। পত্রলেখক এই যুক্তি দিয়াছিলেন যে, অত্যন্ত অধিকসংখ্যক বলিয়াই খনি-মজুরেরা হারিয়া যাইবে, অতএব জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া তাহাদের সংখ্যা কমান উচিত।

অবিরোধিতা

উত্তর দিতে গিয়া প্রসঙ্গতঃ গান্ধিজী বলিয়াছিলেন, “শেষ কথা এই, যদি খনির মালিকেরা অগ্নায়কারী হইয়াও জয়লাভ করে, তাহার কারণ মজুরদের সন্তানসন্ততির সংখ্যা অধিক বলিয়া নহে, তাহার কারণ মজুরেরা এ পর্য্যন্ত সংঘম শিক্ষা করে নাই। যদি শ্রমিকদের সন্তানসন্ততি না থাকিত, তাহা হইলে তাহার ব্যবস্থার উন্নতির জন্ত কোন চেষ্টাই করিত না, বেতন বৃদ্ধিরও কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ থাকিত না। তাহার কি মদ্যপান, জুয়াখেলা ও ধূমপান করে? খনির মালিকেরাও উহা করে অথচ স্বচ্ছন্দে আছে, এই কথা কি উহার উত্তর হইবে? যদি ধনীদের অপেক্ষা খনির মজুরদের চরিত্র ভাল না হয়, তাহা হইলে জগতের সহানুভূতি দাবী করিবার তাহাদের কি অধিকার আছে? আমরা কি ধনীর সংখ্যা বাড়াইয়া ধনতন্ত্রকে শক্তিশালী করিব? গণতন্ত্র পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে জগৎ ভাল হইবে, এই আশ্বাসে আমরা গণতন্ত্রের উপাসনা করিতেছি। ধনী ও ধনতন্ত্রকে আমরা যে সকল অগ্নায়ের জন্ত দায়ী করিয়া থাকি, আমরা যেন ব্যাপক ভাবে তাহা বৃদ্ধি না করি।” *

এই পত্র পড়িবার সময় আমার মানসপটে সেই ইংরাজ খনি-মজুর ও তাহাদের স্ত্রীপুত্রের ক্ষুধিত শুষ্ক মুখগুলি ভাসিয়া উঠিল। ১৯২৬ সালের গ্রীষ্মকালে আমি দেখিয়া আসিয়াছি, এক পীড়নমূলক পাশবিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কি নৈরাশ্য লইয়া তাহারা এক বেদনাবহ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে। গান্ধিজীর প্রদত্ত বিবরণ ঠিক নহে। মজুরেরা বেতন বৃদ্ধি চাহে নাই, তাহাদের বেতন কমাইয়া দেওয়ার প্রতিবাদের ফলে, খনির মালিকেরা খনি বন্ধ করার ফলেই তাহারা সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আমাদের আলোচনার সহিত এখন এ বিষয়ের সম্বন্ধ নাই। মজুরদের জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যিক, এ প্রসঙ্গ আমাদের আলোচ্য নহে। তবে কারখানার মালিক-মজুর সংঘর্ষের প্রতিকারের জন্ত জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব অতি অভিনব। আমি গান্ধিজীর পত্র উদ্ধৃত করিয়াছি, কেন না উহা হইতে আমাদের বৃদ্ধিবার সুবিধা হইবে যে, শ্রমিকদের ব্যাপারে এবং তাহাদের জীবনযাত্রার প্রণালী উন্নত করার সাধারণ দাবী সম্পর্কে তিনি কিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। গান্ধিজীর মনোভাব যেমন সমাজতন্ত্রবাদ হইতেও বহুদূরে, তেমনই ধনতন্ত্রবাদ হইতেও তাহার ব্যবধান তেমনই দূরবর্তী। বর্তমান জগতে যদি কায়েমী স্বার্থবাদীরা প্রতিবাদী না হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞান ও কলকারখানা

* গান্ধিজীর “আত্মসংঘম ও উচ্ছৃঙ্খলতা” নামক গ্রন্থ হইতে এই পত্রখানি উদ্ধৃত।

জওহরলাল নেহরু

সহায়ে প্রত্যেক ব্যক্তিকে খাণ্ড বস্ত্র ও গৃহ দিয়া তাহাদের জীবনযাত্রা প্রণালী বহুলাংশে উন্নত করা যাইতে পারে, এই সকল কথায় তাঁহার কোন আগ্রহ নাই, কেন না এক নির্দিষ্ট সীমার অতিরিক্ত কিছুই জন্ম তিনি আগ্রহশীল নহেন। অতএব সমাজতত্ত্ববাদের সম্ভাবনার উপর তাঁহার কোন আগ্রহ নাই; ধনতন্ত্র অংশতঃ সহ্য করা যাইতে পারে, কেন না ইহা অত্যায়ে অনেক সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছে। তিনি দুই-ই অপছন্দ করেন, তবে তুলনায় কম অত্যায়ে বলিয়া শোষণটি সহ্য করেন, কেন না উহা রহিয়াছে এবং উহা তাঁহাকে মানিতেই হইবে।

তাঁহার উপর এই সকল ভাব আরোপ করা সম্ভবতঃ আমার ভুল হইতে পারে। কিন্তু আমি গভীরভাবে অনুভব করি তাঁহার চিন্তাধারা ঐরূপ। (তাঁহার উক্তির মধ্যে যে স্ববিরোধিতা ও বিভ্রান্তি দেখিয়া আমরা বিচলিত হই, তাহার কারণ তিনি সম্পূর্ণ বিভিন্ন সিদ্ধান্তের দিক হইতে বিচার করেন। ক্রমবর্দ্ধিত আরাম ও বিশ্রামের অবসরকে লোকে আদর্শ করিয়া তোলে ইহা তিনি চাহেন না; তাঁহার মতে লোকে নৈতিক জীবনের বিষয় চিন্তা করুক, তাহাদের কদভ্যাসগুলি বর্জন করুক, ভোগ প্রবৃত্তি দমন করুক এবং উহা দ্বারা নিজের আধ্যাত্মিকতা ও ব্যক্তিত্ব গড়িয়া তুলুক। যাহারা জনসাধারণের সেবা করিবে, তাহারা আর্থিক উন্নতির চেষ্টার পরিবর্তে জনসাধারণের সমান স্তরে নামিয়া তাহাদের সহিত সমানভাবে মেলামেশা করিবে।) এই ভাবেই তাহারা জনসাধারণকে উন্নত করিতে পারে। তাঁহার মতে ইহাই প্রকৃত গণতন্ত্র। ১৯৩৪-এর ১৭ই সেপ্টেম্বর প্রকাশিত এক বিবৃতিতে তিনি লিখিয়াছেন, “আমাকে ঠেকাইয়া রাখা সম্বন্ধে অনেকেই নিরাশ হইয়াছেন। আমার মত জন্ম হইতে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ব্যক্তির পক্ষে ইহা অত্যন্ত লজ্জার কথা। মনুষ্য সমাজের দরিদ্রতম ব্যক্তির সহিত এক হওয়া, তাহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর জীবনযাপনে আকাজক্ষাহীনতা এবং লোকের সাধ্যমত সচেতনভাবে তাহাদের স্তরে থাকিবার চেষ্টা দ্বারা যদি কেহ নিজেকে গণতান্ত্রিক বলিয়া দাবী করিতে পারে, তবে আমিও সেই দাবী করি।”

এই যুক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত আধুনিক গণতান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক অথবা সমাজতান্ত্রিক কেহই একমত হইবেন না; তবে অনেকেই স্বীকার করিবেন যে জনসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিলাসভুষণের আড়ম্বর দেখান, বিশাল জনসম্মুখ, যাহাদের অতি প্রয়োজনীয় বস্তুরও অভাব, তাহাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্য লইয়া জীবন যাপন অত্যায়ে ও নিন্দনীয়।

স্ববিরোধিতা

কিন্তু প্রাচীন ধর্মভাবাপন্ন গান্ধিজীর উক্তির ও উহার মধ্যে কিছু ঐক্য খুঁজিয়া পাইবেন, কেন না উভয়েরই অতীতের প্রতি অহুসারগ্ৰস্ত বহিয়াছে এবং তাঁহারা সর্বদাই অতীতকালের মাপকাঠিতে বিচার করিয়া থাকেন। যাহা আছে, যাহা হইবে অপেক্ষা যাহা ছিল তাহাতেই তাঁহাদের চিন্তা অধিক আবদ্ধ। অতীতের প্রতি দৃষ্টি আর ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি এই দুই মানসিক অবস্থার জন্তই ভগতে সর্বপ্রকার পার্থক্য দৃষ্ট হয়। দরিদ্র জনসাধারণ চিরদিনই অশুভ। সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে মুষ্টিমেয় ধনীব্যক্তি একটা প্রধান অংশ; ধনোৎপাদন ব্যবস্থার জন্ত ইহাদের আবশ্যক। এই কারণে নীতিবাদী সংস্কারক এবং কোমলপ্রাণ ব্যক্তিরা উহাদের মানিয়া লন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতি ধনীদিগের কর্তব্যও স্মরণ করাইয়া দেন। তাঁহাদিগকে দরিদ্রদের অছি স্বরূপ হইতে হইবে। তাঁহারা দয়াবু ও দাতা হইবেন। প্রত্যেক ধর্মের বিধানে দান একটি মহৎ কর্ম। সামান্ত নৃপতি, বড় জমিদার এবং ধনী বণিকদিগকে অছি স্বরূপ ভাবিবার উপর গান্ধিজী সর্বদাই জোর দিয়া থাকেন। এক্ষেত্রে তিনি পরস্পরগত ধার্মিক ব্যক্তিদেরই অহুসরণ করেন। পোপ ঘোষণা করিয়াছেন, “ধনীরা নিজেদের ঈশ্বরের দাস এবং তাহাদের ধনের রক্ষক ও বিতরণ-কর্তা বলিয়া মনে করিবে। তাহাদের হাতেই স্বয়ং যীশুখৃষ্ট দরিদ্রদের ভাগ্য অর্পণ করিয়াছেন”। সাধারণ হিন্দুধর্ম এবং ইসলাম এই ভাবেরই কথা বলে এবং সর্বদাই ধনীদিগের দান করিবার জন্ত প্রেরণা দেয়, এবং ধনীরাও তদনুসারে মন্দির মসজিদ ধর্মশালা নির্মাণ করিয়া অথবা তাঁহাদের অভুল ঐশ্বর্য্য হইতে কিছু তাম্র বা রৌপ্যখণ্ড দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করিয়া, নিজেদের ধর্ম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া স্থখী হন।

সেকালের ধার্মিক মনোভাবের একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, ১৮৯১ সালের মে মাসে পোপ ত্রয়োদশ লিওর ধর্মযাজকদের নিকট প্রেরিত ও প্রচারিত ঘোষণাপত্রে। নূতন কলকারখানার জন্ত পরিবর্তিত অবস্থা সম্পর্কে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন—

“অতএব হুঃখভোগ ও সহ্য করা মানুষের বিধিলিপি। মানুষ যতই কেন চেষ্টা করুক না, এমন কোন শক্তি নাই, এমন কোন কৌশল নাই, যাহা মনুষ্য জীবন হইতে হুঃখ ও হৃদ্বিনের প্রতিবন্ধ দূর করিতে সাফল্য লাভ করিবে। যদি কেহ ভিন্নরূপ ভাণ করে—যাহারা মানুষকে হুঃখদৈন্ত্যযুক্ত বিরক্তিহীন শান্তি ও চির আনন্দ উপভোগের লোভ দেখায়—তাহারা জনসাধারণকে প্রতারণা করে, বঞ্চনা করে এবং তাহাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ফলে মানুষের অবস্থা আরও শোচনীয় হইবে মাত্র।

এই জগৎ যেকোনো, সেই ভাবেই ইহাকে গ্রহণ করা ভাল এবং ইহার দুঃখদৈন্তের প্রতিকার আমাদেরকে অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে।” এই ‘অন্যত্র’ সম্পর্কে তিনি আরও বলিয়াছেন,—

“যে জীবন আসিবে অর্থাৎ অনন্ত জীবনকে বাদ দিয়া জাগতিক বস্তুগুলি বুঝা বা তাহার প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করা যাইতে পারে না। প্রকৃতি আমাদেরকে যে মহাসত্য শিক্ষা দিয়াছে, তাহাই মহান খৃষ্টীয় মতবাদ এবং সেই ভিত্তির উপরই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত—বর্তমান জীবন আমরা যখন শেষ করিব, তখনই আমাদের প্রকৃত জীবন আরম্ভ হইবে। এই জগতের নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী বস্তুর জন্য ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেন নাই—স্বর্গীয় ও অনন্ত সম্পদ লাভের জগতই আমরা সৃষ্টি হইয়াছি। তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া এইখানে আমাদের নির্বাসিত করিয়াছেন, ইহা আমাদের প্রকৃত দেশ নহে। অর্থ ও অন্যান্য বস্তু যাহা মানুষ ভাল বলিয়া কামনা করে—আমরা তাহা প্রচুর পাইতে পারি অথবা আমরা তাহা কামনা করিতে পারি। কিন্তু অনন্ত আনন্দের তুলনায় উহা কিছুই নহে……।”

এই ধর্মভাব অতি প্রাচীনকাল হইতে জগতের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত, বর্তমান দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার ভরসা একমাত্র পরলোক। যদিও অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে, অতীতে কেহ যাহা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে নাই, মানুষের বাহ্য সম্পদ তদপেক্ষাও বহুগুণে বাড়িয়াছে, তথাপি প্রাচীন সংস্কারের বন্ধন রহিয়া গিয়াছে এবং এখনও একপ্রকার অনির্দিষ্ট ও অনির্দেশ্য আধ্যাত্মিক মূল্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ক্যাথলিকগণ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর দিকে দৃষ্টিপাত করেন—এই কালকে অন্যান্য সকলে “অন্ধকার যুগ” বলিলেও—খৃষ্টধর্মের পক্ষে উহা ‘স্বর্ণ যুগ’,—যখন সাধুরা সমাদৃত হইতেন, খৃষ্টান নৃপতি ও শাসকগণ ধর্মযুদ্ধে (ক্রুসেড্) প্রবৃত্ত হইতেন এবং গথিক গীর্জাসমূহ নির্মিত হইত। তাঁহাদের মতে ইহাই ছিল, “প্রকৃত খৃষ্টান গণতন্ত্রের যুগ—মধ্যযুগীয় সমবায় সাহায্য প্রথায় (গিল্ড) উহা নিয়ন্ত্রিত হইত,—যাহা পূর্বেও ছিল না এবং আর হয় নাই।” মুসলমানগণ আগ্রহের সহিত অতীতের দিকে চাহিয়া প্রথমদিগের খলিফাগণ নিয়ন্ত্রিত “ইসলাম গণতন্ত্র” নিরীক্ষণ করেন এবং তাঁহাদের জয়গৌরব দেখিয়া বিস্মিত হন। হিন্দুরাও তেমনি বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রামরাজ্যের ধ্যানে বিভোর হন। তথাপি সমস্ত ইতিহাস একবাক্যে বলিতেছে যে, ঐ অতীতকালে অধিকাংশ লোক অতি

স্ববিরোধিতা

দুর্দশাগ্রস্ত জীবনযাপন করিত,—খাত্তের অভাব, জীবনযাত্রার অত্যাবশ্যক দ্রব্যের অভাবে পীড়িত হইত। উপরের দিকে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি আধ্যাত্মিক জীবন লইয়া বিলাস করিতেন, তাহাদের সে অবদর ও উপায় ছিল, অন্যান্য সকলে কেবলমাত্র বাচিয়া থাকিবার জন্য দুনিবাস প্রয়াস ছাড়া আর কি করিত, কল্পনা করা কঠিন। ক্ষুধিত ব্যক্তির পক্ষে সংস্কৃতিগত ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভবপর নহে; তাহার সমস্ত চিন্তা খাদ্য এবং উহা প্রাপ্তির উপায়ের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে।

এই যন্ত্রযুগের সহিত অনেক অগ্রায় আসিয়াছে, তাহা আমরা খুব বড় করিয়াই দেখিতে পাই, কিন্তু আমরা তুলিয়া যাই যে জগৎকে সমগ্রভাবে দেখিলে, অন্ততঃ যেখানে যন্ত্রসভ্যতা সমধিক প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে সেই অংশে দৃষ্টিপাত করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে ইহা বাহ্যজীবন যাগনের স্বথ স্ববিধার একটা ভিত্তি গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছে, যাহার ফলে অধিকাংশ ব্যক্তির সংস্কৃতিগত ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভবপর। ভারতবর্ষও অগ্রায় পবাধীন দেশে ইহা দেখা যায় না, কেন না, যন্ত্র-বিজ্ঞান দ্বারা আমরা লাভবান হই নাই। আমরা কেবল উহা দ্বারা শোষিত হইয়াছি মাত্র, অনেক দিক দিয়া এমন কি বাহ্য সম্পদের দিক দিয়াও আমাদের অবস্থা অবনত হইয়া পড়িয়াছে, এবং আমাদের শিক্ষা সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষতি হইয়াছে আরও বেশী। তথাকথিত পাশ্চাত্য প্রভাব, ভারতে সাময়িকভাবে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করিয়াছে এবং আমাদের সমস্তাগুলি সমাধান করার পরিবর্তে উহাকে অধিকতর তীব্র করিয়া তুলিয়াছে মাত্র।

ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য, কিন্তু ইহা দ্বারা আমরা যেন বর্তমান জগৎকে ভুল করিয়া না দেখি। বর্তমান অবস্থায় কি ধন ও পণ্যোৎপাদনের, কি সমগ্র সমাজের পক্ষে ধনী ব্যক্তিদের আর প্রয়োজন নাই, তাহারা বাঞ্ছনীয়ও নহে। ইহারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভার মাত্র এবং উন্নতির বিঘ্নস্বরূপ। ধনীদের দয়ালু হইতে উপদেশ দেওয়া আর দরিদ্রদিগকে অদৃষ্ট-নির্ভর, সন্তোষের সহিত ভাগ্যকে গ্রহণ, সঞ্চয়ী এবং সদ্ব্যবহার করিতে উপদেশ দেওয়ার ধর্মপ্রচারকগণের প্রাচীন ব্যবসায় বর্তমান যুগে একান্তই অর্থহীন। মানবসাধ্য উপায়ের সংখ্যা আজ বহুগুণে বাড়িয়াছে, মানুষ আজ সাহসের সহিত জাগতিক সমস্তাগুলির সম্মুখীন হইয়া তাহা সমাধান করিতে পারে। অধিকাংশ ধনীই আজ সমাজদেহের পরগাছায় পরিণত হইয়াছে, এবং এই পরবিস্ত্রজীবী শ্রেণীর অস্তিত্ব কেবলমাত্র বাধা নহে, উহা মানুষের সর্ববিধ সম্পদের অতি বৃহৎ অপচয় মাত্র।

জওহরলাল নেহরু

এই শ্রেণী এবং যে ব্যবস্থায় এই শ্রেণীর উদ্ভব হয়, তাহা কার্যতঃ ধনোৎপাদন ও কর্মক্ষেত্র সঙ্কুচিত করিয়াছে এবং একদিকে অপরের প্রমোদিত বিত্তভোগী, অপরদিকে ক্ষুধিত বেকার সৃষ্টি করিয়াছে। কিছুদিন পূর্বে গান্ধিজীও লিখিয়াছিলেন,—“ক্ষুধিত ও কর্মহীন ব্যক্তির ঈশ্বরের একমাত্র নির্দেশ মানিতে পারে যে কর্মের বিনিময়ে খাও পাওয়ার প্রতিশ্রুতি। ঈশ্বর মানুষকে শ্রম করিয়া খাও সংগ্রহের জন্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন, যে কর্ম ব্যতীত আহার করে, সে চোর।”

আধুনিক যুগের জটিল সমস্যাগুলি বুঝিতে গিয়া, যখন এই সকল সমস্যার অস্তিত্বই ছিল না, সেই প্রাচীন যুগের উপায় বা নির্দিষ্ট নিয়ম প্রয়োগ করি, অথবা সে কালের বাধা বচন আওড়াই, তাহা হইলে আমরা বিভ্রান্ত ও ব্যর্থ হইব। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা, যাহা কেহ কেহ জগতের এক মূল ধারণা বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহারও প্রতিনিয়তই পরিবর্তন হইয়াছে। এককালে দাসগণ সম্পত্তির মধ্যে গণ্য ছিল, স্ত্রীলোক ও বালকদিগকে তাহাই ভাবা হইত, নববধূকে প্রথম রজনী উপভোগের অধিকার সম্ভ্রান্ত ভূস্বামীর ছিল, রাস্তা, মন্দির, খেয়াঘাট, সেতু, সাধারণের ব্যবহারের ব্যবস্থা, ভূমি ও আকাশে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল। পশুপক্ষী এখনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি রহিয়াছে, তবে অনেক দেশে আইন করিয়া এই অধিকার সংযত করা হইয়াছে। যুদ্ধের সময় ক্রমাগতই ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইয়া থাকে। আজ কাল সম্পত্তি ক্রমেই ক্ষুণ্ণ হইয়া উঠিতেছে, যথা—কোম্পানীর শেয়ার, বিবিধ ঋণপত্র প্রভৃতি। সম্পত্তি সম্পর্কে ধারণা যতই পরিবর্তিত হইতেছে, জনমতের চাপে ততই নূতন নূতন আইন দ্বারা সম্পত্তির মালিকের অবাধ অধিকার সঙ্কুচিত করা হইতেছে। নানাবিধ গুরু করভার স্থাপন করিয়া (যাহা বাজেয়াপ্তির নামান্তর মাত্র) ব্যক্তিগত সম্পত্তির একটা অংশ লইয়া জনহিতকর কার্যে ব্যয় করা হইতেছে। সর্বজনীন কল্যাণকেই ভিত্তি করিয়া সাধারণ ব্যবস্থা পরিচালিত হইতেছে; এবং স্বীয় সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষা করিতে গিয়াও কেহ সর্বজনীন কল্যাণবিরোধী কার্য করিতে পারে না। যাহাই হউক, অধিকাংশ ব্যক্তির অতীতকালে কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না, তাহারাই ছিল অপরের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। বর্তমান কালেও অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিরই সেরূপ কোন অধিকার আছে। কায়মী স্বার্থ সম্পর্কে আমরা অনেক কথাই শুনিতে পাই। বর্তমানে আর এক কায়মী স্বার্থের কথা সকলকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, প্রত্যেক নরনারীর

অবিরোধিতা

বাঁচিবার এবং শ্রম করিবার ও শ্রমাজ্জিত ফল ভোগ করিবার অধিকার আছে। সম্পত্তি ও মূলধন সম্পর্কে এই পরিবর্তিত ধারণার ফলেও ঐগুলি যখন বিলুপ্ত হইতেছে না, বরং বিস্তৃত হইতেছে, অল্পসংখ্যক লোকের হাতে গিয়া ঐগুলি জমা হওয়ার দরুণ তাহারা অস্ত্রের উপর প্রভুত্ব করিতেছে, তখন সমাজ উহা সমগ্রভাবে তাহাদের নিজেদের হাতে ফিরিয়া পাইতে চাহে।

গান্ধিজী চাহেন ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সাধন দ্বারা বাহ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন। তিনি চাহেন, লোকে কদভ্যাস ও বিলাস ব্যসন ছাড়িয়া পবিত্র হউক। তিনি কামেন্দ্রিয় উপভোগ বিরতি, মত্তপান ও ধূমপান বর্জন প্রভৃতির উপর বিশেষ জোর দেন। এই সকল ব্যসনের মধ্যে তুলনায় কোনটা অধিক নিন্দনীয় তাহা লইয়া মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু এ সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহের অবকাশ আছে যে ব্যক্তিগত দিক হইতেই হউক, অথবা ব্যাপকভাবে সামাজিক দিক হইতেই হউক, ঐ সকল ব্যক্তিগত দুর্বলতা অপেক্ষা, লোভ, স্বার্থপরতা, সম্পত্তি অধিকার করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, ব্যক্তিগত লাভের আশায় পরস্পরের সহিত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা, গোষ্ঠী বা শ্রেণীর দয়াহীন প্রচেষ্টা, এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীকে দমন ও শোষণ, জাতিতে জাতিতে ভয়াবহ যুদ্ধ কি অধিকতর ক্ষতিকারক নহে? অবশ্য তিনি এই সকল হিংসা ও অধঃপতনমূলক সংঘর্ষ ঘৃণা করেন। কিন্তু বর্তমান ধন-লোলুপ সমাজের মধ্যেই কি উহার বীজ নিহিত নাই,— ইহার আইনই হইল প্রবল দুর্বলকে শোষণ করিবে এবং ইহার উদ্দেশ্য সেই প্রাচীনকালের “যাহার ক্ষমতা আছে সে গ্রহণ করুক এবং যে পারে সে রক্ষা করুক”? বর্তমান কালের লাভ করিবার লোভই সংঘর্ষের প্রসূতি। বর্তমান ব্যবস্থাই মানুষের লুপ্ত প্রবৃত্তিকে বাঁচাইয়া রাখিয়া সর্ববিধ স্ত্রবিধা প্রদান করে; অবশ্য ইহা অনেক সং-প্রবৃত্তিকেও উৎসাহ দেয় সন্দেহ নাই, কিন্তু মানুষের নিকট প্রবৃত্তিগুলিই ইহা অধিকতর উৎসাহিত করে। এখানে সাফল্য বলিতে বুঝায় অপরকে ভূপতিত করিয়া সেই পরাজিত ক্রীতদাসদের উপর আরোহণ করা। যদি সমাজ ঐ সকল প্রবৃত্তি ও উচ্চাশাকে উৎসাহ দান করে, যদি উহা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে আকর্ষণ করে তাহা হইলে গান্ধিজী কি মনে করেন যে এই পারিপার্শ্বিক অবস্থায় তাঁহার আদর্শনীতিপরায়ণ মহত্ব সম্ভব? গান্ধিজী সেব্যবৃত্তিকে বিকশিত করিতে চাহেন, কোন কোন ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে তিনি উহাতে কৃতকার্য হইতে পারেন, কিন্তু যতদিন সমাজ এই ধনলোলুপ সমাজে জয়ী ব্যক্তিদের

জওহরলাল নেহরু

আদর্শরূপে তুলিয়া ধরিবে এবং যতদিন ব্যক্তিগত লাভই মানুষের মুখ্য প্রবৃত্তি থাকিবে, ততদিন অধিকাংশ মানুষ এই পথেই চলিবে।

কিন্তু সমস্তা এখন আর নৈতিক বা নীতিশাস্ত্রঘটিত নহে। অন্ধকার সমস্তা বাস্তব ও ঐকান্তিক, সমস্ত জগৎ ইহা লইয়া বিভ্রান্ত। মুক্তির একটা উপায় বাহির করিতেই হইবে। একটা কিছু ঘটবে এই আশায় আমরা অপেক্ষা করিতে পারি না। অথবা কেবলমাত্র নেতিবাচক ভাব লইয়া ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, কম্যুনিজম প্রভৃতির মন্দদিকগুলির সমালোচনা করিয়া আমরা বাঁচিতে পারি না, কিম্বা এমন প্রত্যাশাও করা উচিত নহে যে প্রাচীন ও নূতন সর্ববিধ ব্যবস্থাগুলির কেবলমাত্র ভালগুলিকে লইয়া একটা সন্তোষজনক আপোষ হইতে এক সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা আবিষ্কৃত হইবে। আমাদেরকে রোগ নির্ণয় করিতে হইবে, আরোগ্যের উপায় নির্ধারণ করিতে হইবে, তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে। আমরা পিছু হটিতে পারি, কিম্বা সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারি, কিন্তু কি জাতীয় কি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমরা স্থির হইয়া একই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারি না। সম্ভবতঃ এ বিষয়ে বিচার করিবার কিছুই নাই, কেন না পশ্চাদ্গমন করা আর সম্ভবপর নহে।

তথাপি গান্ধিজীর অনেক কার্য্যপদ্ধতি দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে তিনি একটা সীমাবদ্ধ স্বয়ম্পূর্ণ অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে চাহেন, তিনি কেবল জাতিকেই স্বয়ম্পূর্ণ দেখিতে চাহেন না, গ্রামকেও স্বয়ম্পূর্ণ করিতে চাহেন। আদিম যুগের মানব সমাজে গ্রামগুলি স্বয়ম্পূর্ণ ছিল এবং অশন বসন ও অগ্ন্যাগ্ন প্রয়োজনীয় বস্তু গ্রামেই পাওয়া যাইত। এখানে প্রয়োজন বলিতে সর্বনিম্নস্তরের জীবনযাত্রা বুঝিতে হইবে। আমি মনে করি না যে গান্ধিজী স্থায়ীভাবে এই লক্ষ্যে কাজ করিতেছেন, কেন না, সে উদ্দেশ্য সাধন অসম্ভব। বর্তমানের বিশাল জনসম্মত কতকগুলি দেশে জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইবে না, এবং তাহারা অভাব ও ক্ষুধার মধ্যে ফিরিয়া যাইতে চাহিবে না। আমি মনে করি, ভারতবর্ষের মত কৃষিপ্রধান দেশে যেখানে জীবনযাত্রা প্রণালী অতি নিম্নস্তরের, সেখানে কুটীরশিল্পের উন্নতি হইলে জনসাধারণের অবস্থা সম্ভবতঃ উন্নত হইতে পারে। কিন্তু অগ্ন্যাগ্ন দেশের মতই আমরা অবশিষ্ট জগতের সহিত নানা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, সে বন্ধন ছিন্ন করা অসম্ভব। অতএব আমাদেরকে সমস্ত জগতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই চিন্তা করিতে হইবে, সস্বীর্ণ স্বয়ম্পূর্ণতার প্রস্ন উঠে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি সকল দিক দিয়াই ইহা অবাঞ্ছনীয় মনে করি।

স্ববিরোধিতা

অতএব সকল দিক বিবেচনা করিয়া আমরা একমাত্র সম্ভবপর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি, তাহা হইল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। প্রথমতঃ জাতীয় ভৌগোলিক সীমার মধ্যে এবং পরে সমগ্র জগতে ঐ ব্যবস্থা দ্বারা, পণ্যোৎপাদন নিয়ন্ত্রণ এবং সেই সম্পদ সাধারণের কল্যাণের জন্ত বণ্টন করা। কি উপায়ে ইহা সম্ভব সে কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু যাহারা বর্তমান ব্যবস্থার স্বযোগে লাভবান হইতেছে, তাহাদের আপত্তির জন্ত, একটা জাতি কিম্বা মনুষ্যজাতির কল্যাণের পথ অবরুদ্ধ থাকিতে পারে না, ইহা স্পষ্ট। যদি রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি ইহার অন্তরায় হয়, তাহা হইলে উহা অপসারিত করিতে হইবে। এই বাঙ্কনীয় ও কাধাকরী আদর্শকে ছোট করিয়া ঐগুলির সহিত আপোষ করিলে তাহা বিশ্বাসঘাতকতা হইবে। এই পরিবর্তন হয় ত অবশুস্বাবীরূপে আসিবে অথবা জগতের অবস্থাধীনে অতি দ্রুত সাধিত হইবে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের অধিকাংশের সম্মতি ও আত্মগত্যা ব্যতীত ইহা সম্ভবপর নহে। অতএব তাহাদিগকে এই মতে আনয়ন করিয়া তাহাদের চিন্তা জয় করিতে হইবে। মুষ্টিমেয় ব্যক্তির ষড়যন্ত্রমূলক হিংসানীতি দ্বারা ইহার কোন সহায়তা হইবে না। বর্তমান ব্যবস্থায় যাহারা লাভবান হইতেছে, তাহাদিগকেও এই মতে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, তবে তাহারা অধিকসংখ্যায় এই মত গ্রহণ করিবে কি না সন্দেহ।

গান্ধিজীর বিশেষ প্রিয় খাদি-আন্দোলন—চরকা ও তাঁত, পণ্যোৎপাদনের ব্যক্তিগত উত্তমের উগ্র প্রচেষ্টা, অতএব ইহা পুনরায় প্রাক-যন্ত্রযুগে ফিরিয়া যাওয়া। বর্তমানের কোন গুরুতর সমস্যা সমাধানের মধ্যে ইহার গুরুত্ব অধিক নহে, এবং ইহার ফলে এমন এক প্রকার মনোবৃত্তির উদ্ভব হয়, যাহা সঙ্গত পথে অগ্রসর হইবার পক্ষে বিঘ্নকর হইতে পারে। তথাপি আমি বিশ্বাস করি, সাময়িকভাবে ইহাতে অনেক উপকার হইয়াছে, এবং যতদিন পর্যন্ত না রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে কৃষি ও শিল্পসমস্যা সমাধানের দেশব্যাপী কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, ততদিন হয় ত ইহার কিছু উপযোগিতা থাকিবে। ভারতের বিপুল বেকার-সমস্যা়ার কোন হিসাব নাই এবং পল্লী অঞ্চলে তদপেক্ষাও বেশী আংশিক বেকার-সমস্যা রহিয়াছে। রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে এই বেকার-সমস্যা দূর করিবার কোন চেষ্টা হয় নাই অথবা বেকারদিগকে সাহায্য করিবার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। আর্থিক দিক দিয়া খাদি সম্পূর্ণ বা আংশিক বেকারদিগকে কিছু সাহায্য করিয়াছে এবং ইহা সম্পূর্ণরূপে তাহাদের নিজের চেষ্টা হইতে সৃষ্ট বলিয়া ইহা তাহাদের আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করিয়াছে। ইহার ফল

জওহরলাল নেহরু

মাহুঘের মনের উপরই বেশী প্রত্যক্ষ। নগর ও পল্লীর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টায় খাদি কিছু সাফল্যলাভ করিয়াছে। ইহা কৃষক ও নিম্ন মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত সম্প্রদায়কে পরস্পরের সান্নিধ্যে আনিয়াছে। বস্ত্র যে পরিধান করে এবং দেখে, উভয়ের মনেই একটা প্রভাব বিস্তার করে। মধ্যশ্রেণী সরল গুপ্ত খাদি পরিধান করিতে আরম্ভ করায়, বসন সহজ ও সরল হইয়াছে, স্থলরুচির আড়ম্বর কমিয়া গিয়াছে এবং জনসাধারণের সহিত ঐক্য স্থাপিত হইয়াছে। নিম্নমধ্যশ্রেণীর লোকেরা আর ধনীদেব বসনভূষণ হাস্তকরভাবে নকল করিবার চেষ্টা করে না এবং সস্তা কাপড় চোপড়ের জন্ত লজ্জাবোধ করে না। তাহারা ইহার জন্ত কেবল মর্যাদা বোধ করে না, বরং যাহারা রেশম-সাঁটিনের জাঁকজমক দেখায়, তাহাদের অপেক্ষা নিজেদের শ্রেষ্ঠ বোধ করে। এমন কি, দরিদ্রতম ব্যক্তিরও ইহার জন্ত মর্যাদা ও আত্মসম্মান বোধ করে। খাদিপরিহিত বৃহৎ জনতার মধ্যে ধনী দরিদ্রের প্রভেদ বুঝা কঠিন এবং সহকর্মীমূলভ অস্তরঙ্গতা সহজেই জাগ্রত হয়। খাদি কংগ্রেসকে জনসাধারণের চিত্ত স্পর্শ করিতে সহায়তা করিয়াছে নিঃসন্দেহ। ইহা জাতীয় স্বাধীনতার বিশিষ্ট পরিচ্ছদে পরিণত হইয়াছে।

খাদি দ্বারা মিল-মালিকদের কাপড়ের দাম বৃদ্ধি করিবার নিত্য-বিজ্ঞান আকাজ্জা সংঘত হইয়াছে। অতীতে ভারতীয় কলওয়ালারা বিদেশী প্রতিযোগিতা, বিশেষভাবে লাক্ষাশায়ারের প্রতিযোগিতায় সংঘত থাকিতেন। যখনই এই প্রতিযোগিতার অভাব হয়, যেমন বিগত মহাযুদ্ধের সময় হইয়াছিল, তখনই ভারতে কাপড়ের মূল্য অসম্ভব হারে চড়িয়া যায়, এবং ভারতীয় কলগুলি প্রচুর টাকা উপার্জন করে। স্বদেশী এবং বিদেশীবস্ত্র বর্জন আন্দোলনেও ভারতীয় মিলগুলি যথেষ্ট লাভবান হইয়াছে, কিন্তু খদ্দের আবির্ভাবে এক নূতন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, অল্প অবস্থায় কাপড়ের দাম যতটা চড়িতে পারিত, বর্তমানে তাহা আর সম্ভব নহে। অবশ্য মিল-মালিকেরা (এবং জাপানও) জনসাধারণের খাদিপ্রীতির সুযোগ লইয়া এক শ্রেণীর মোটা কাপড় তৈয়ারী করেন, যাহার সহিত খাদির পার্থক্য ধরা কঠিন। পুনরায় যদি কোন সঙ্কটকাল দেখা দেয়, যদি যুদ্ধ বাধিয়া বিদেশীবস্ত্র আমদানী না হয়, তাহা হইলে মিলের মালিকেরা ১৯১৪ সালের মত আর ক্রেতাদিগকে শোষণ করিতে পারিবে না। খাদি-আন্দোলন তাহা প্রতিরোধ করিবে এবং খদ্দের উৎপাদনের প্রতিষ্ঠানগুলি অল্প সময়ের মধ্যেই অধিকতর বস্ত্র উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

অবিরোধিতা

বর্তমানে খাদি-আন্দোলনের এই সকল সুবিধা থাকা সত্ত্বেও আমার মনে হয়, ইহা সাময়িক মধ্যবর্তী ব্যবস্থামাত্র। পরে উন্নততর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেও ইহা একপ্রকার সহায়ক শিল্পরূপে টিকিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতের মূল প্রচেষ্টা হইবে, ভূমিসংক্রান্ত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এবং শিল্পবাণিজ্যের বিস্তার। জোড়াতালি দিয়া, লক্ষ লক্ষ টাকা বায়ে কমিশন বসাইয়া এবং উপরের দিকে তুচ্ছ সংস্কারের পরামর্শ দিয়া কিছুমাত্র ভাল হইবে না। আমাদের ভূমিসংক্রান্ত ব্যবস্থা আমাদের চক্ষুর সম্মুখেই ভাসিয়া পড়িতেছে, ইহা উৎপাদন, শস্তবন্টন অথবা বৃহৎ আকারে বৈজ্ঞানিক কৃষিব্যবস্থার অন্তরায় স্বরূপ। বর্তমান কালের উপযোগী করিয়া ইহার আমূল পরিবর্তন করিতে হইবে, সম্ভবদ্র সমবায় প্রণায় চাষ প্রবর্তন করিতে হইবে, তাহাতে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণও বাড়িবে, পরিশ্রমও কম হইবে। কৃষিকার্য্য সকলকে কম দিতে পারে না এবং বড় বড় কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা হইলে (যেমন গান্ধিজী আশঙ্কা করেন) কৃষিকার্য্যে কর্ম্মীর সংখ্যা অনেক কমিয়া যাইবে। অত্যাগ্ন সকলের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র অংশ কুটীরশিল্পে আত্মনিয়োগ করিবে কিন্তু অবশিষ্ট বেশীর ভাগ লোককেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় চালিত বৃহৎ কারখানা কিম্বা জনকল্যাণমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।

কোন কোন অঞ্চলে খাদি যে লোকের অন্নসংস্থান করিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ, কিন্তু ইহার এই সাফল্যের মধ্যে বিপদের আশঙ্কাও রহিয়াছে। ইহার অর্থ এই যে ইহা ধ্বংসোন্মুখ ভূমিসংক্রান্ত ব্যবস্থাকে ঠেকা দিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছে এবং কিয়ৎপরিমাণে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিলম্ব ঘটাইতেছে। ইহার ফলে কোন বড় রকম পরিবর্তন হয় নাই, কিন্তু তাহার ঝোঁক রহিয়াছে। প্রজা অথবা জমির মালিক কৃষকেরা জমি হইতে উৎপন্ন ফসলের যে অংশ পায়, তাহাতে বর্তমানে তাহারা যে শোচনীয় অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাও আর বজায় রাখিতে পারিতেছে না। তাহাকে তাহার সামান্য উপার্জনের সহিত আরও কিছু রোজগারের ব্যবস্থা করিতে হয়। অথবা সাধারণতঃ তাহারা যাহা করে অর্থাৎ ঋণ করিয়া খাজনা শোধ করিতে হয়। কাজেই অতিরিক্ত উপার্জনের সুবিধা জমিদার ও গভর্নমেন্ট ভোগ করেন; উহা হইতে তাহাদের প্রাপ্য আদায় করিয়া লন, অত্যাগ্ন তাহারা উহা করিতে পারিতেন না। যদি অতিরিক্ত রোজগার বেশ মোটা রকম হয়, তাহা হইলে উহার সহিত সমতা রক্ষা করিয়া খাজনাবৃদ্ধিরও সম্ভাবনা রহিয়াছে। বর্তমান ব্যবস্থায় কৃষকের অতিরিক্ত শ্রমার্জিত অর্থ এবং তাহার

জওহরলাল নেহরু

মিতব্যয়িতার ফলে পরিণামে জমিদারেরাই লাভবান হইয়া থাকেন। আমার যতদূর মনে পড়ে, হেনরি জর্জ তাঁহার “উন্নতি ও দারিদ্র্য” নামক গ্রন্থে এ বিষয় আলোচনা করিয়াছেন এবং এ বিষয়ে বিশেষতঃ আয়র্লণ্ডের অনেক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

গান্ধিজীর কুটীরশিল্প পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা, তাঁহার খাদি কার্ঘ্যেরই ব্যাপকতর ব্যবস্থা। ইহাতে আশু কিছু উপকার হইবে, ইহার কিয়দংশ অল্পবিস্তর স্থায়ী কাজ; কিন্তু অধিকাংশই সাময়িক। ইহাতে বর্তমান দুরবস্থার মধ্যে কৃষকের কিছু সুবিধা হইবে এবং কতকগুলি কারুশিল্প ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইবে। কিন্তু যন্ত্র অথবা কলকারখানার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দিক দিয়া ইহার কোন সাফল্যের আশা নাই। কুটীরশিল্প সম্পর্কে গান্ধিজী সম্প্রতি হরিজন পত্রিকায় লিখিয়াছেন,— “যেখানে কাজ বেশী অথচ লোক কম, সেখানে যন্ত্রের ব্যবস্থা ভাল, কিন্তু ভারতের মত যেখানে কাজ অপেক্ষা লোকসংখ্যা বেশী, সেখানে উহা অনিষ্টকর।……পল্লীবাসী লক্ষ লক্ষ লোককে কি ভাবে বিশ্রাম দেওয়া যায়, তাহা আমাদের সমস্যা নহে। আমাদের সমস্যা এই যে বৎসরে গড়পড়তা ছয় মাস অলস হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়, সেই সময়টা কি ভাবে কাজে লাগান যায়।” যে সমস্ত দেশে বেকার-সমস্যা রহিয়াছে, সেই সকল দেশেই অল্পবিস্তর এই আপত্তি খাটে। কিন্তু করিবার মত কোন কাজ নাই, দোষ নিশ্চয়ই তাহা নহে; আসল দোষ হইল এই যে বর্তমান লাভমূলক ব্যবস্থায়, মালিকেরা লোক খাটাইয়া লাভ করিতে পারিতেছে না। অথচ চারিদিকে কত কাজ করিবার রহিয়াছে—রাস্তা তৈয়ারী, জলসেচের ব্যবস্থা, আবাস-গৃহ নিৰ্মাণ, স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা ও চিকিৎসার সুবিধা বিধান, কলকারখানা, বিদ্যুৎ, সামাজিক ও সংস্কৃতি বিস্তার কার্য, শিক্ষাবিস্তার, জনসাধারণ যে সকল নিত্য-প্রয়োজনীয় বস্তু পায় না, তাহার উৎপাদন ব্যবস্থা। আমাদের লক্ষ লক্ষ নরনারীর আগামী পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া কঠোর পরিশ্রম করিবার কত কিছু আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু লাভের লোভ হইতে নহে, সামাজিক উন্নতির প্রেরণা হইতেই ইহা সম্ভবপর, কিম্বা যদি লোককল্যাণকর কার্য করিবার সম্বল লইয়া সমাজ সম্বন্ধ হইয়া উঠে। কৃষীয় সোভিয়েট রাষ্ট্রের আর যে কোন ক্রটিই থাকুক না কেন, এখানে কেহ বেকার নাই। আমাদের দেশে লোকে কাজের অভাবে বসিয়া থাকে না, কাজের সুবিধা তাহারা পায় না এবং তাহাদিগকে শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত করিবার কোন ব্যবস্থা নাই। অল্পবয়স্কদিগকে

স্ববিরোধিতা

শ্রমসাধ্য কর্মে নিয়োগ আইনদ্বারা রোধ করিলে এবং একটা যুক্তিসঙ্গত নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে, মজুরীর বাজারে লক্ষ লক্ষ ইচ্ছুক শ্রমিক অনেকটা আসন পাইতে পারে।

চরকা ও তক্তির কারখানায় শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য গান্ধিজী চেষ্টা করিয়াছেন এবং কতকটা সফলকামও হইয়াছেন। যন্ত্র ও কলকল্লার উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা এবং সে চেষ্টা যদি চলিতে থাকে, (কুটারশিল্পও বৈদ্যুতিক শক্তি বলে চালান যায়) তাহা হইলে, আবার সেই লাভের ইচ্ছা দেখা দিবে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদন সম্ভ্রা ও বেকার-সম্ভ্রাও দেখা দিবে। কুটারশিল্পের মধ্যে আধুনিক শিল্পকৌশল প্রবর্তন না করিলে আমাদের প্রয়োজনীয় ও পছন্দ মত পণ্য উহা দ্বারা প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা নাই। কলের সহিত উহা প্রতিযোগিতা করিতেও পারে না। আমাদের দেশে বৃহত্তর কল-কারখানাগুলির কাজ বন্ধ করা সম্ভব কি না এবং উচিত কি না? গান্ধিজী পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, কলকল্লার মাদ্রেরই তিনি বিরোধী নহেন; তবে তিনি সম্ভবতঃ বিবেচনা করেন যে বর্তমান ভারতে উহার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমরা কি লোহ ও হস্তাতেদ্র মত মূল শিল্পের কারখানাগুলি এবং অন্যান্য ছোটখাট কারখানাগুলি বন্ধ করিয়া দিতে পারি?

তাহা আমাদের সাধ্যাতীত সন্দেহ নাই। যদি আমাদের রেলওয়ে, সেতু, যানবাহনের স্ববিধা প্রভৃতির প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে হয় সেগুলি আমাদের নিজেদের প্রস্তুত করিতে হইবে নয় তাহার জন্য অপরের উপর নির্ভর করিতে হইবে। যদি আমাদের দেশের দেশরক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহা হইলে মূল শিল্পগুলির প্রয়োজন ত হইবেই, তাহা ছাড়া কল-কারখানার প্রভূত উন্নতি করিতে হইবে। যে কোন মূল শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সহকারী ও পরিপূরক হিসাবে অন্যান্য কারখানার প্রয়োজন হইয়া পড়ে; এবং পরিণামে আমাদের দেশকে নিজেদের কলকল্লার প্রস্তুতের কারখানাও স্থাপন করিতে হইবে। যদি এই প্রকার মূল শিল্পের কারখানা চলিতে থাকে, তাহা হইলে ছোট ছোট কারখানাও বিস্তার লাভ করিবেই। কলকারখানার বিস্তার বন্ধ হইতে পারে না; কেন না ইহার সহিত আমাদের আর্থিক ও সভ্যতার উন্নতি জড়িত এবং আমাদের স্বাধীনতাও উহার উপর নির্ভর করিতেছে। যতই বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান বিস্তৃতিলাভ করিবে, ততই সামান্য আকারের কুটারশিল্পের তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করা কঠিন হইয়া পড়িবে।

জওহরলাল নেহরু

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোন আকারে উহা টিকিয়া থাকিতে পারে; কিন্তু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাহা সম্ভবপর নহে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও যে সকল দ্রব্য অধিক সংখ্যায় কলে প্রস্তুত করা সম্ভব নহে, কুটীরশিল্প সেই সকল বিশেষ কারুকার্যের ভার লইবে।

কোন কোন কংগ্রেস নেতা যন্ত্রশিল্পের নামে আতঙ্কগ্রস্ত হন এবং মনে করেন যে বর্তমানে শিল্পবাণিজ্যে উন্নত দেশগুলিতে যে অশান্তি দেখা দিয়াছে তাহার কারণ কলকারখানায় দ্রুত এবং পাইকারী ভাবে পণ্যোৎপাদন। প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ইহা অত্যন্ত ভুল ধারণা*। জনসাধারণ যে সকল বস্তু পায় না, তাহা তাহাদের জন্ত প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করা কি মন্দ? প্রচুর পণ্য উৎপাদন করা অপেক্ষা তাহার অভাবের মধ্যেই থাকুক, ইহাই কি কাম্য? দোষ উৎপাদন প্রণালীর মধ্যে নহে, বর্টন ব্যবস্থার নিকোঁধ সম্পূর্ণতাই উহার জন্ত দায়ী।

গ্রাম্য শিল্পের উৎসাহ-দাতাদের সম্মুখে আর এক বিষয় যে আমাদের কৃষি জগতের বাজারের উপর নির্ভরশীল। জগতের বাজারদরের উপর নির্ভর করিয়া কৃষকদিগকে অর্থকরী কৃষিপণ্য বাধ্য হইয়া উৎপাদন করিতে হয়। পণ্য মূল্যের তারতম্য ঘটিলেও তাহাকে নগদ টাকা নির্দিষ্ট খাজনা ও ট্যাক্স জোগাইতে হয়। এই টাকা যে কোন প্রকারে হউক তাহাকে জোগাড় করিতে হইবে অথবা অন্ততঃপক্ষে সে চেষ্টা করিতে হইবে এবং এই কারণেই যে ফসলে সর্বোচ্চ মূল্য পাওয়া যাইবে বলিয়া তাহার বিশ্বাস সে তাহাই বপন করে। এমন কি, যে ফসলে তাহার পারিবারিক খাদ্যের সংস্থান হইবে, তাহা সে ইচ্ছা থাকিলেও উৎপন্ন করিতে পারে না।

অধুনা কয়বৎসরে খাদ্য শস্য ও অন্যান্য কৃষিপণ্যের মূল্য কমিয়া যাওয়ায় লক্ষ লক্ষ কৃষক, বিশেষভাবে যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে ইক্ষুর আবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছে। চিনির উপর সংরক্ষণ শুল্ক স্থাপিত হওয়ায় অনেক চিনির কল ব্যাঙ্কের ছাতার মত গজাইয়া উঠিয়াছে, কাজেই ইক্ষুর চাহিদা আছে। কিন্তু শীঘ্রই উৎপন্ন ইক্ষুর পরিমাণ চাহিদার অতিরিক্ত হইয়া পড়িল, কলের মালিকেরা নিষ্ঠুর ভাবে কৃষকদের শোষণ করিতে লাগিল, ইক্ষুর মূল্য পড়িয়া গেল।

* সরদার বল্লভভাই প্যাটেল ১৯৩৫-এর ৩রা জানুয়ারী আহম্মদাবাদে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, “গ্রাম্য-শিল্পের উন্নতি সাধনই প্রকৃত সমাজতন্ত্রবাদ। পাশ্চাত্যদেশে বপুল ভাবে পণ্য উৎপাদনের কলে যে বিপর্যয় অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, আমরা আমাদের দেশে তাহার পুনরভিনয় করিতে চাই না।”

অবিরোধিতা

এই সকল বিষয় ও অত্যাশ্চর্য বহুতর বিষয় বিবেচনা করিয়া আমার মনে হইতেছে কোন সন্ধীর্ণ বাধাধরা পথে আমাদের কৃষি ও শিল্পের সমস্তাগুলি সমাধানের সম্ভাবনা নাই এবং তাহা আকাজ্জকও নহে। ইহা আমাদের জাতীয় জীবনের প্রত্যেক অবস্থার উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে। অর্থহীন ভাবুকতার বুলি আওড়াইয়া আমরা পরিচাণ পাইব না, আমাদেরিগকে ঘটনাবলীর সম্মুখীন হইতে হইবে, এবং ঐগুলির সহিত নিজেদের সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে, যাহাতে আমরা ইতিহাসের নিয়ামক হইতে পারি, যেন উহারদ্বারা অসহায় ভাবে নিয়ন্ত্রিত না হই।

অবিরোধিতার মূর্ত্ত প্রতীক গান্ধিজী * কথা শ্রাব্য আমার মনে পড়িল। তাঁহার এত তীক্ষ্ণবুদ্ধি, পদদলিত ও নিখাদিত্যের অবস্থার উন্নতিকল্পে এত আগ্রহ, তিনি কেন এই ব্যবস্থা সমর্থন করেন, যাহা আমাদের চক্ষুর সম্মুখেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, যাহা বর্তমানের দুঃখ ও অপচয়ের স্রষ্টা? তিনি পথ খুঁজিতেছেন, সত্য কথা, কিন্তু অতীতে কিরিয়া যাইবার পথ কি চিরদিনের মত অবরুদ্ধ নহে? এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি অগ্রগতির অন্তরায়রূপ দণ্ডায়মান প্রাচীন ব্যবস্থার প্রত্যেকটি নিদর্শনের কল্যাণ কামনা করিতেছেন—সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র, বৃহৎ জমিদারী ও তালুকদারী এবং বর্তমান ধনতান্ত্রিক প্রথা। একজন ব্যক্তির হস্তে অবাধ ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য দিয়া প্রত্যাশা করিতে হইবে যে, সে উহা কেবলমাত্র জনসাধারণের কল্যাণেই নিয়োগ করিবে, এইরূপ অছি বা অভিভাবক প্রথার উপর বিশ্বাস করা কি যুক্তিসঙ্গত? আমাদের মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ তাঁহারা কি এত নিখুঁত যে এই ভাবে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? এমন কি প্রেটো-কল্পিত দার্শনিক রাজারাও এইরূপ ভার মর্যাদার সহিত বহন করিতে পারেন নাই। একজন দয়ালু অতিমানবের অধীনে থাকাই কি লোকের পক্ষে কল্যাণকর?

* ১৯৩১-এ গোলটেবিল বৈঠকের একটি বক্তৃতায় গান্ধিজী বলিয়াছেন, “সর্বোপরি কংগ্রেস মূলতঃ লক্ষ কোটি মুক অর্দ্ধাশ্রিত জনসাধারণের প্রতিনিধি, যাহারা ব্রিটিশ-ভারত অথবা ভারতীয় ভারতের (দেশীয় রাজ্য) সাংলক্ষ গ্রামে, ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়াইয়া আছে। প্রত্যেকটি স্বার্থ, যাহা কংগ্রেসের মতে রক্ষা করা উচিত, তাহার স্থান মুক জনসাধারণের স্বার্থের নিম্নে; আপনারা প্রায়ই যে বিভিন্ন স্বার্থের সংঘাত দেখিতে পান, তাহার মধ্যে যদি কোন প্রকৃত সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে লক্ষ লক্ষ মুক জনসাধারণের স্বার্থের নিকট কংগ্রেস অত্যাশ্চর্য সমুদয় স্বার্থ বলি দিবে।”

কিন্তু অতি-মানবও নাই, দার্শনিক রাজাও নাই, সকলেই দুর্বল মানব, সকলেই নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ বা স্ব স্ব ধারণাভূমায়ী কার্য্যই সর্বসাধারণের কল্যাণ, ইহা চিন্তা না করিয়া পারে না। জন্ম, পদমর্যাদা ও অর্থনৈতিক শক্তির গতানুগতিকতাকে চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টা চলিতেছে এবং তাহার ফল অনেকদিক দিয়াই শোচনীয় হইয়াছে।

আমি পুনরায় বলিতেছি, কি উপায়ে পরিবর্তন সম্ভব, পথের বাধাগুলি কিসে অপসারিত হইতে পারে, বলপ্রয়োগে বাধ্য করা না হৃদয়ের পরিবর্তন, হিংসা অথবা অহিংসা, এই সকল প্রশ্ন বর্তমান মুহূর্ত্তে আমি বিচারে প্রবৃত্ত হই নাই। এ বিষয়ে আমি পরে আলোচনা করিব। কিন্তু পরিবর্তনের প্রয়োজন স্বীকার করিতে হইবে এবং উহা স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক। যদি নেতা ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরূপে ইহাকে স্পষ্টভাবে না দেখেন এবং ব্যক্ত না করেন, তাহা হইলে তাঁহারা অপরকে স্বমতে আনয়ন করিবার প্রত্যাশা কিরূপে করিবেন অথবা অত্যাশঙ্ক মতবাদ কি ভাবে জনসাধারণের মধ্যে বিকশিত করিয়া তুলিবেন? অবশ্য ঘটনাই সর্বাপেক্ষা শক্তিমান শিক্ষক, কিন্তু ঘটনারও কার্য্য কারণ ও ফল সম্যকরূপে অনুধাবন ও বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে হইবে, যাহার ফলে কর্ম্মধারা সম্যক পথে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হইবে।

আমার কথাবার্তায় ধৈর্য্য হারাইয়া আমার অনেক বন্ধু ও সহকর্ম্মী প্রশ্ন করিয়াছেন, তুমি কি দয়ালু নৃপতি, দাতা জমিদার এবং উদারহৃদয় বিনয়ী ধনী দেখ নাই? নিশ্চয়ই দেখিয়াছি। যে শ্রেণীর মধ্যে আমার জন্ম, তাঁহারা ঐ সকল বড় জমিদার ও ধনীদেব সহিত মেলামেশা করিয়া থাকেন। আমি নিজেই একজন খাটি বুজ্জোয়া, বুজ্জোয়া পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে লালিত পালিত হইয়াছি এবং উহা হইতেই আমার প্রথম জীবনের সংস্কারগুলি গঠিত হইয়াছে। কমুনিষ্টগণ যে আমাকে ‘পেটি বুজ্জোয়া’ বলেন তাহা সর্ব্বাংশে সত্য। সম্ভবতঃ এখন তাঁহারা আমাকে ‘অল্পতপ্ত বুজ্জোয়া’ বলিয়া অভিহিত করিতে পারেন। কিন্তু আমি যাহাই হই, এখানে তাহা বিচার্য্য বিষয়ের বহির্ভূত। একজন ব্যক্তির মাপকাঠিতে জাতীয়, আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক সমস্যাগুলি বিবেচনা করা অযৌক্তিক। যে সকল বন্ধু আমাকে প্রশ্ন করেন, তাঁহারা বারম্বার একথা শুনাইতে ভুলেন না যে আমাদের কলহ পাপকে লইয়া, পাপিকে লইয়া নহে। আমি অতদূরও অগ্রসর হইতে চাহি না। আমি বলি, আমার কলহ একটা বিশেষ ব্যবস্থার সহিত, কোন ব্যক্তির সহিত নহে। অবশ্য এই ব্যবস্থা ব্যক্তি বা গোষ্ঠিকে আশ্রয় করিয়াই রূপ গ্রহণ

স্ববিরোধিতা

করিয়াছে এবং এই সকল ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে হয় স্বমতে আনিতে হইবে অথবা ইহাদের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে। যদি কোন ব্যবস্থার প্রয়োজন অবসান হইয়া তাহা ভারস্বরূপ হইয়া উঠে, তাহা হইলে উহা বর্জন করিতে হইবে এবং যে সকল শ্রেণী বা গোষ্ঠী ঐ ব্যবস্থার সহিত জড়িত, তাহাদের পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে। যথাসম্ভব কম ক্লেশ ও দুঃখ দ্বারাই পরিবর্তন হওয়া উচিত, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দুঃখ ও বিশৃঙ্খলা অনিবার্য। কোন ক্ষুদ্র অত্যাচার ভয়ে আমরা বৃহত্তর অত্যাচারে সহ্য করিতে পারি না; কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অত্যাচারের প্রতিকার অবশ্য আমাদের আয়ত্তের বাহিরেই থাকিয়া যাইবে।

রাজনৈতিক, সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক মাল্যুষের সৃষ্ট প্রত্যেক প্রকার সঙ্ঘের পশ্চাতে একটা তত্ত্ব রহিয়াছে। যখন সঙ্ঘের পরিবর্তন হয় তখন উহার সহিত সামঞ্জস্যরক্ষা করিবার জন্ত এবং উহাকে সুপরিচালিত করিবার জন্ত দার্শনিক তত্ত্বের ভিত্তির ও পরিবর্তন আবশ্যক। কিন্তু ঘটনার সহিত তত্ত্ব সমানতালে চলিতে পারে না, ইহার ফলেই অশান্তি দেখা দেয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে গণতন্ত্র ও ধনতন্ত্র পাশাপাশি বর্দ্ধিত হইয়াছে, কিন্তু একের সহিত অপরের প্রকৃতিগত ঐক্য নাই। উভয়ের মধ্যে মূলেই বিরোধিতা রহিয়াছে, কেন না গণতন্ত্র অধিকাংশের হাতে ক্ষমতা দিবার দাবী করে, আর ধনতন্ত্র প্রকৃত ক্ষমতা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে রাখিতে চাহে। অসামঞ্জস্য লইয়াও এই দুইটি কোন প্রকারে কাজ চালাইতেছে, কেন না রাজনৈতিক পার্লামেন্ট গণতন্ত্র একপ্রকার সীমাবদ্ধ গণতন্ত্র মাত্র, একচেটিয়া অধিকারের বিস্তার এবং ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিবার চেষ্টার উপর ইহা হস্তক্ষেপ করে না।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও গণতন্ত্রের ভাব প্রসারলাভ করার ফলে বিচ্ছেদ অনিবার্য ও আসন্ন। পার্লামেন্ট গণতন্ত্রের আজকাল কেহ প্রশংসা করে না এবং উহার প্রতিক্রিয়ার ফলে নানাবিধ মতবাদে আকাশ বাতাস ধ্বনিত। এই কারণেই ভারতে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া উঠিয়াছেন এবং ঐ ধূয়া ধরিয়া আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার একটা বাহু কাঠামো দিতেও অনিচ্ছুক। আশ্চর্য্য এই, দেখাদেখি ভারতীয় রাজারাও তাঁহাদের অবাধ স্বৈরাচার ঐ যুক্তি দ্বারাই সমর্থন করেন এবং দম্ভভরে ঘোষণা করেন যে, জগতের আর কোথাও না থাকিলেও, তাঁহাদের রাজ্যে মধ্যযুগীয় ব্যবস্থাই বলবৎ রাখিবেন। *

* ১৯৩৫-এর ২২শে জানুয়ারী দিল্লীতে নরেন্দ্র-মণ্ডলে চ্যান্সেলর পাতিয়ালার মহারাজা, বড়তাপ্রসাদ, বাঁহারা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষপাতী এবং আশা করেন উহার ফলে এমন অবস্থার

জওহরলাল নেহরু

অধিকদূর অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া পার্লামেন্ট গণতন্ত্র বার্থ হয় নাই, অগ্রসর না হওয়াতেই ইহা বার্থ হইয়াছে। ইহাতে অর্থ নৈতিক গণতন্ত্র নাই বলিয়া ইহা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক নহে এবং ইহার ধীর মন্থর জটিল ব্যবস্থা এই দ্রুত পরিবর্তনের যুগের অতুপযোগী।

সম্ভবতঃ বর্তমানে দেশীয় রাজ্যগুলি জগতে স্বৈরশাসনের প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত। অবশ্য এইগুলি সর্বদাই ব্রিটিশ কর্তৃত্বের অধীন, কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট, ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষা অথবা উহার প্রসার সাধন ছাড়া বড় হস্তক্ষেপ করেন না, অতীত কালের এই সকল সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র চারিদিকে বৈদেশিক শাসন দ্বারা বেষ্টিত হইয়াও, প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় কি ভাবে বিংশশতাব্দীর মধ্যভাগেও বিরাজিত রহিয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। যেখানে বাতাস ভারাক্রান্ত ও রুদ্ধশ্বাস, জল মন্থর গতিতে বহে; পরিবর্তন ও গতিতে অভ্যস্ত নবাগত কেহ এখানে আসিলে উহার মধ্যে সম্ভবতঃ ক্লান্ত হইয়া উঠে, অবসাদ বোধ করে এবং এক মোহ তন্দ্রা তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। এখানে কিছুই বাস্তব বলিয়া মনে হয় না, সময় যেন চিত্রার্পিতবৎ স্থির এবং একই অপরিবর্তিত দৃশ্য চোখে পড়ে। প্রায় অজ্ঞাতসারে তাহার মন অতীতে ভাসিয়া যায়, শৈশবের স্বপ্ন মনে পড়ে,—মনে পড়ে মণিময়

সৃষ্টি হইবে, যাহার ফলে দেশীয় নৃপতিরাও তাহাদের রাজ্যে গণতান্ত্রিক শাসনপ্রণালী স্থাপন করিতে বাধ্য হইবেন, সেই সকল ভারতীয় রাজনৈতিকের অন্তিমত উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি বলেন, “ভারতীয় নৃপতিরা তাহাদের প্রজাবৃন্দের পক্ষে বাহা সর্বোৎকৃষ্ট, তাহা করিতে সর্বদাই প্রস্তুত এবং সময়োপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে তাহারা সর্বদাই আগ্রহান্বিত। কিন্তু আমরা স্পষ্ট করিয়া বলিব যদি ব্রিটিশ ভারত প্রত্যাশা করে যে আমরা আমাদের সর্বোচ্চমানের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে তাহারা নিদ্রিত ও পরিত্যক্ত কোন প্রকার রাজনৈতিক মতবাদ ঢুকাইয়া দিতে পারিবে, তবে সে প্রত্যাশা আকাশবসুন্ধর মাত্র” (৬. অধ্যায়ে মহীশূরের দেওয়ানের বক্তৃতা উষ্টব্য।) ৩ দিনই নরেন্দ্রমণ্ডল বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বিকানীর মহারাজা বলেন, “ভারতীয় দেশীয় রাজ্যের শাসকগণ আমরা, ভাগ্যবান রাজ্যেরই নই। আমি আপনাদের নিকট সর্বভাবে বলিব, আমরা বহু শতাব্দীর বংশাধিকৃত গুণে, শাসনক্ষমতা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছি; এবং আমি বিশ্বাস করি আমাদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাও কিছু আছে, ভয়ে আমরা বিক্ষিপ্ত না হইয়া পড়ি অথবা সহসা কোন সিদ্ধান্ত না করিয়া বসি, সেদিকে আমাদের যথাসাধ্য সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। আমি বিনয়সহকারে বলিব, কাহারও দ্বারা নিজেদের বিনষ্ট হইতে দিবার অভিপ্রায় নৃপতিবৃন্দের নাই এবং ছুর্ভাগ্যক্রমে যদি সে সময় আসে, যখন ব্রিটিশ-মুকুট আর আমাদের সজ্জির সর্ভাঙ্গুণী, প্রয়োজনমত আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিতে পারিবেন না, তখন রাজস্বল্প শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়াই মরিবেন।”

অবিরোধিতা

উকীষধারী অস্ত্র ও বর্ষে সুসজ্জিত বীর, সুন্দরী নির্ভীক রাজকন্যার কথা, —উচ্চগধুজমণ্ডিত রহস্যময় প্রাসাদ এবং বীরভগাথা! মনে পড়ে আত্মমর্যাদা ও আত্মাভিমানের অসম্ভব ধারণা এবং অতুলনীয় সাহস এবং মৃত্যুর প্রতি ক্রক্ষেপহীন অবজ্ঞা। বিশেষভাবে সে যদি অলৌকিক বীরত্বের ও নিষ্ফল ও অসম্ভব কাহিনীপূর্ণ রহস্যের লীলাভূমি রাজপুতানায় যায়।

কিন্তু অবিলম্বেই স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়,—নির্ধ্যাতনের অমুভূতি ফিরিয়া আসে; ইহার আবহাওয়া অপরূপ, শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয় এবং নিম্নে জলশ্রোত নিস্তব্ধ অথবা মন্দগতি হইলেও, তাহার মধ্যে বন্ধ তলের পঙ্কিলতা। প্রত্যেকে নিজের চারিদিকে গভীর সঙ্কীর্ণতা অনুভব করে, দেহ ও মন যেন শৃঙ্খলিত। নৃপতির ঐশ্ব্যের আড়ম্বরপূর্ণ প্রাসাদের ঔজ্জ্বল্যের পার্শ্বে ই লোকে দেখে জনসাধারণ কি অপরিমাম দারিদ্র্য ও অধঃপতনের মধ্যে বাস করিতেছে। রাজ্যের সমস্ত ঐশ্ব্য আসিয়া নৃপতির ব্যক্তিগত ভোগবিলাসের জন্য সেই প্রাসাদে জমা হইতেছে; তাহার কতটুকু অংশ জনাহিতকর কার্যের জন্য লোকে ফিরিয়া পায়! আমাদের নৃপতিদিগকে সৃষ্টি করা এবং ভরণপোষণ করা অতি ভয়াবহ রূপে ব্যয়বহুল। তাহাদের জন্য এত অধিক ব্যয়ভরণের বিনিময়ে তাহারা কি দিয়া থাকে?

এই সকল দেশীয় রাজ্য এক রহস্য যবনিকায় আবৃত। সংবাদপত্র এখানে প্রশ্রয় পায় না, বড় জোর সাহিত্য বিষয়ক অথবা আধা-সরকারী সাপ্তাহিক পত্র চলিতে পারে। বাহিরের সংবাদপত্র প্রায়ই বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ত্রিবাঙ্কোর, কোচীন প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের কয়েকটি দেশীয় রাজ্য ছাড়া (এখানে ব্রিটিশ-ভারত অপেক্ষাও শিক্ষিতের হার অধিক) অগ্ন্যান্ত রাষ্ট্রে শিক্ষিতের সংখ্যা অতিমাত্রায় অল্প। দেশীয় রাজ্যের সর্বপ্রধান সংবাদ হটল, বড়লাটের আগমন এবং তত্পলক্ষ্যে শোভাযাত্রা সাজ-সজ্জার আড়ম্বর, দরবারের জাঁকজমক এবং পরম্পরের প্রশংসামূলক বক্তৃতা অথবা বিবাহোৎসবের অনাবশ্যক ব্যয়বাহুল্য, অথবা রাজ্যের জন্মদিনের উৎসব, কিংবা প্রজা-বিদ্রোহ। রাজাদিগকে সমালোচনা হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ আইন আছে, এমন কি ব্রিটিশ ভারতেও তাহা বিद्यমান, রাজ্যের অভ্যন্তরে অবশ্য অতি মৃদু সমালোচনাও কঠোর হস্তে দমন করা হইয়া থাকে। সাধারণ জনসভার কথা সেখানে লোকের অজ্ঞাত, এমন কি সামাজিক সম্মেলনও বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় *

* ১৯৩৪-৩৫-৩৬ অক্টোবরের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হায়দ্রাবাদের একটি সংবাদে প্রকাশ, “স্থানীয় বিবেকবজ্জিনী নাট্যসঙ্ঘে মহাত্মা গান্ধীর জন্মতিথি উপলক্ষ্যে একটি

জওহরলাল নেহরু

বাহিরের প্রধান জননায়কদিগকে প্রায়ই রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। ১৯২২ সালে মি: সি, আর, দাশ গুরুতর পীড়ার পর কান্মীরে বায়ুপরিবর্তনে ঘাইবার সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহার কোন রাজনৈতিক অভিপ্রায় ছিল না। তিনি কান্মীরের সীমান্তে উপস্থিত হইলে তাঁহার গতিরোধ করা হয়। এমন কি মি: এম, এ, জিন্নাও হায়দ্রাবাদে প্রবেশাধিকার হইতে বঞ্চিত; ক্রীযুক্ত সরোজিনী নাইডুর বাড়ী হায়দ্রাবাদ সহরে হইলেও, দীর্ঘকাল তাঁহাকে সেখানে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় নাই।

দেশীয় রাজ্যগুলির এই অবস্থায় কংগ্রেসের কর্তব্য ছিল, তত্রত্য প্রজাবৃন্দের মৌলিক সাধারণ অধিকারলাভের চেষ্টা করা এবং উহা অপহরণ করার সমালোচনা করা। কিন্তু দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে গান্ধিজী এক অভিনব নীতি কংগ্রেসে প্রবর্তন করিলেন—“দেশীয় রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করা।” দেশীয় রাজ্যে অত্যন্ত বেদনাজনক ঘটনা সত্ত্বেও, এমন কি কংগ্রেসের উপর অহেতুক আক্রমণ সত্ত্বেও তিনি এই চূপচাপ থাকিবার নীতি আঁকড়িয়া থাকিলেন। বুঝা গেল কংগ্রেসের সমালোচনায় দেশীয় নৃপতি ও শাসকগণ ক্রুদ্ধ হইতে পারেন এবং তাহাতে তাঁহাদিগকে স্বপক্ষে আনয়ন অধিকতর কঠিন হইবে এই আশঙ্কা ছিল। দেশীয় রাজ্যের প্রজা সমিতির সভাপতি মি: এন, সি, কেলকারের নিকট ১৯৩৪-এর জুলাই মাসে গান্ধিজী যে পত্র লেখেন তাহাতে তিনি তাঁহার পূর্ব মত সমর্থন করিয়া বলেন, হস্তক্ষেপ না করার নীতি অভ্রান্ত ও যুক্তিযুক্ত; এবং দেশীয় রাজ্যগুলির আইনত: ও নিয়মতন্ত্রগত ক্ষমতা সম্পর্কে তিনি যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা অতিশয় চমকপ্রদ। তিনি লিখিয়াছেন, “দেশীয় রাজ্যগুলির ব্রিটিশ আইনের অধীনে স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা রহিয়াছে। ভারতের যে অংশ ব্রিটিশ বলিয়া কথিত হয় সেই

সাধারণ সভা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তাহা হয় নাই। হায়দ্রাবাদের হরিজন সেবক সমাজ এই সভার উদ্যোগে ছিলেন। সংবৎসর সম্পাদক সংবাদপত্রে এক পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, সভারস্তের নির্দিষ্ট সময়ের চব্বিশ ঘণ্টা পূর্বে কর্তৃপক্ষ জানান যে নিম্নলিখিত সন্তে সভা করার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে যে, দুই হাজার টাকা নগদ জামীন স্বরূপ দিতে হইবে এবং লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে যে সভায় কোন রাজনৈতিক বক্তৃতা হইবে না, সরকারী কর্মচারীদের কোন সরকারী কাজের সমালোচনা হইতে পারিবে না। সভার উদ্যোক্তাদের পক্ষে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্তৃপক্ষের সহিত বুঝাপড়া করা অসম্ভব বলিয়া সভা বন্ধ করিতে হইয়াছে।”

স্ববিবোধিতা

অংশের যেমন সিংহল বা আফগানিস্থানের উপর কোন ক্ষমতা নাই, তেমনি দেশীয় রাজ্যের শাসননীতি নির্ণয়ের কোন অধিকার নাই।” নরমপন্থী দেশীয় রাজ্যের প্রজা সম্মেলন এবং লিবারেলগণ যে গান্ধিজীর এই উক্তি ও পরামর্শে ব্যথিত হইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

কিন্তু দেশীয় রাজ্যের শাসকগণ এই মতবাদে সন্তুষ্ট হইলেন এবং ইহার সম্পূর্ণ স্বয়োগ গ্রহণ করিলেন। এক মাসের মধ্যেই ত্রিবাঙ্কুর দরবার তাঁহাদের এলাকার মধ্যে কংগ্রেস বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং উহার সভাসমিতি ও সদস্যসংগ্রহ বন্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহারা ঘোষণা করিলেন, “দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন নেতারা এইরূপ করিবার উপদেশ দিয়াছেন—ইহা যে গান্ধিজীর বিবৃতির প্রতি ইঙ্গিত মাত্র, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ইহা উল্লেখযোগ্য যে ব্রিটিশ ভারতে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ নাতি বর্জিত হওয়ার পর (দেশীয় রাজ্যগুলিতে আইন অমান্য আন্দোলন হয় নাই) এবং ভারত সরকার কতক কংগ্রেস পুনরায় বৈধ প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকৃত হওয়ার পর এই নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছিল। ইহাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে ঐ কালে স্যার সি, পি, রঙ্গস্বামী আয়ার ত্রিবাঙ্কুর দরবারের প্রধান রাজনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন (এখনও আছেন)। ইনি পূর্বের কংগ্রেস ও হোমরুল-লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, পরে লিবারেল বা মডারেট হন এবং ভারত-গভর্নমেন্ট ও মাদ্রাজ-গভর্নমেন্টের অধীনে উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

গান্ধিজীর পরামর্শানুযায়ী কংগ্রেসের নীতি অনুসারে, সাধারণ অবস্থাতেও ত্রিবাঙ্কুর দরবারের কংগ্রেসের প্রতি এই অহেতুক আক্রমণের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলা হইল না। * কোন কোন লিবারেল পর্য্যন্ত ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। ইহা সত্য যে দেশীয়রাজ্য সম্পর্কে গান্ধিজীর নীতি লিবারেলদের অপেক্ষাও সংযত ও নরমপন্থী। সম্ভবতঃ প্রধান জননায়কদের মধ্যে একমাত্র পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যই (তাঁহার সহিত বহু দেশীয় নৃপতির ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা আছে) অল্পরূপ সংযত এবং যাহাতে দেশীয় নৃপতিদের মনে কোনরূপ অসন্তোষের উদয় না হয়, সেজগ্ন তিনি সততই যত্নবান থাকেন।

* ১৯০৫ সালের ৬ই জানুয়ারী বরোদায় এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে সরদার বল্লভভাই পাটেল নিম্নপেক্ষতার নীতির উপর জোর দিয়া বলেন,—“ভারতীয় রাজ্যগুলির কর্ম্মদিগকে দেশীয় রাজ্যের নিয়মকানুন মানিয়াই কাজ করিতে হইবে এবং শাসনপ্রণালীর সমালোচনার পন্থিবেষ্টে বাহ্যতে শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্ভাব থাকে সেই চেষ্টাই করা উচিত।”

দেশীয় নৃপতিবৃন্দ সম্পর্কে গান্ধিজী সর্বদাই অল্পরূপ সাবধানী ছিলেন না। ১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, বারাণসীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উদ্বোধনের স্মরণীয় দিবসে এক দেশীয় নৃপতির সভাপতিত্বে আহূত সভায় তিনি এক বক্তৃতা করেন; ঐ সভায় আরও বহুতর নৃপতি উপস্থিত ছিলেন। তিনি দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে সদ্য দেশে আসিয়াছেন, ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে নেতৃত্বের দায়িত্ব তখনও তাঁহার স্কন্ধে পতিত হয় নাই। তিনি মহাপুরুষোচিত আবেগময়ী জলন্ত ভাষায় তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, তাঁহাদের আত্মসংশোধন করিতে হইবে এবং বৃথা আড়ম্বর ও বিলাস বর্জন করিতে হইবে। তিনি বলিলেন, “হে নৃপতিবৃন্দ আপনারা এখনই যান এবং আপনাদের মণিমাণিক্য বিক্রয় করিয়া ফেলুন।”—তাঁহারা মণিমাণিক্য অবশ্যই বিক্রয় করেন নাই, কিন্তু তখনই সভাভাগ করিয়াছিলেন। ভয়চকিত নৃপতিরা একে একে উঠিয়া যাইতে লাগিলেন, এমন কি. সভাপতি পর্য্যন্ত বক্তাকে একক ফেলিয়া স্বদলের অনুসরণ করিলেন। ঐ সভায় মিসেস্ এনি বেসান্ট উপস্থিত ছিলেন, তিনিও বিরক্ত হইয়া সভাস্থল পরিত্যাগ করিলেন।

মিঃ এন, সি, কেলকারের নিকট লিখিত পত্রে গান্ধিজী আরও বলিয়া-ছিলেন,—“আমার মতে দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের আত্মনিয়ন্ত্রণমূলক স্বাভাব্য পাওয়া উচিত এবং দেশীয় রাজারা নিজেদের কাঁধাতঃ স্ব স্ব প্রজাবৃন্দের অধিস্বরূপ মনে করিবেন।.....এই অছিগিরির আদর্শের মধ্যে যদি কিছু বস্তু থাকে তাহা হইলে ব্রিটিশ-গভর্নমেন্ট যখন নিজেদের ভারত-গভর্নমেন্টের অছি বলিয়া দাবী করেন, তখন আমরা আপত্তি করিব কেন? ভারতে তাঁহারা বিদেশী, ইহা ছাড়া আমি আর কোন আপত্তির কারণ দেখি না। গাত্রচর্মের বর্ণ, জাতিগত এবং সংস্কৃতিগত অল্পরূপ ভেদ ভারতের বিভিন্নশ্রেণীর মধ্যে বিद्यমান রহিয়াছে।

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতীয় রাজ্যগুলিতে অতি দ্রুত ব্রিটিশ শাসন ঢুকাইয়া দেওয়া হইতেছে; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনিচ্ছুক ও অসহায় নৃপতিদিগকে উহা গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইতেছে। ভারত-গভর্নমেন্ট উপর হইতে চিরদিনই দেশীয় রাজ্যগুলি নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিতেছেন, এখন কতকগুলি প্রধান রাজ্যের অভ্যন্তরেও উহার অতিরিক্ত কর্তৃত্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করা হইতেছে। সেই কারণে এই সকল রাজ্যের পক্ষ হইতে যে সকল কথা বলা হয়, তাহা ভারত-গভর্নমেন্টেরই রূপান্তরিত বাণী এবং উহাতে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পূর্ণ স্বযোগ গ্রহণেরও অপ্রতুল নাই।

অবিরোধিতা

দেশীয় রাজ্যে বা অগ্রজ একই কার্যধারা অবলম্বন করা সম্ভবপর নহে। ইহা আমি বুঝিতে পারি। এমন কি, ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশ-গুলিতেও কৃষিকার্য, শিল্প-বাণিজ্য, সাম্প্রদায়িক ও শাসন সম্পর্কিত প্রচুর পার্থক্য বিদ্যমান, যাহার ফলে একই প্রকার কার্য-প্রণালী অবলম্বন সুবিধাজনক নহে। কিন্তু যদিও কার্য-প্রণালী নিশ্চয়ই পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করিবে, তথাপি আমাদের সাধারণ নীতি স্থানভেদে বিভিন্ন প্রকার হওয়া উচিত নহে। একস্থানে যাহা মন্দ, অগ্রজও তাহা নিশ্চয়ই মন্দ। অগ্রজ! আমাদের উপর এই অভিযোগ আসিবে এবং তাহা করাও হইয়া থাকে যে, আমাদের কোন সুনির্দিষ্ট নীতি অথবা আদর্শ নাই এবং আমরা কেবল নিজেদের ক্ষমতা প্রদ্বির ফিকির খুঁজিয়া থাকি।

ধর্মসম্প্রদায় বা অগ্রজ সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্ত পৃথক নির্বাচন প্রথার বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা সঙ্গত ভাবেই করা হইয়া থাকে। উহা গণতন্ত্রের সহিত সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যহীন একথাও বলা হয়। অবশ্য কি গণতন্ত্র, কি যাহাকে দায়িত্বপূর্ণ শাসন পদ্ধতি বলা হয়, তাহা কিছুতেই সম্ভব নয়, যদি নির্বাচকমণ্ডলীকে বিভিন্ন ধর্মের গণ্ডী দিয়া পৃথক করিয়া রাখা হয়। কিন্তু পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও হিন্দুমহাসভার অগ্রজ নেতারা উহার অতি মাত্রায় উগ্র ও অবিশ্রান্ত সমালোচক হইয়াও, দেশীয় রাজ্যের ব্যবস্থাগুলিতে মৌন-সম্মতি প্রদান করেন এবং দৃশ্যতঃ তাঁহারা দেশীয় রাজ্যের স্বৈরশাসনের সহিত অবশিষ্ট ভারতের গণ-তন্ত্রের (ইহাই বলা হইয়া থাকে) যুক্তরাষ্ট্রিক ঐক্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। ইহা-পেক্ষা সামঞ্জস্যহীন ও অযৌক্তিক ঐক্য কল্পনা করা কঠিন। কিন্তু হিন্দু-মহাসভার গণ-তন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের সমর্থক বীরগণ ইহা অক্লেশে গলাধঃকরণ করেন। আমরা গায় ও সঙ্গতিরক্ষার কথা মুখে বলি কিন্তু আসলে আমরা ভাবাবেগে চালিত হই।

কংগ্রেস ও দেশীয় রাজ্যের অবিরোধিতার মধ্যে ঘিরিয়া আসা যাউক। আমার মনে পড়ে টমাস পেইনের কথা,—প্রায় শতাব্দীপূর্বে তিনি বার্ককে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, “তিনি পালকের জন্ত দুঃখ করেন, কিন্তু মরণোন্মুখ পাখীর কথা ভুলিয়া যান।” গান্ধিজী নিশ্চয়ই মরণোন্মুখ পাখীর কথা ভুলেন না। কিন্তু পালকের জন্ত এত বেশী দরদ প্রকাশ কেন?

তালুকদারী বা বৃহৎ জমিদারী প্রথা সম্পর্কেও এই কথা অল্পবিস্তর বলা চলে। এই সকল অর্দ্ধ-সমাপ্ত তাত্ত্বিক ব্যবস্থা বর্তমান যুগে অচল

এবং ইহা উৎপাদন ও সাধারণ উন্নতির বিষয়, ইহা লইয়া তর্ক করাও বিড়ম্বনা মাত্র। ক্রমবর্দ্ধিত ধনতন্ত্রবাদের সহিত ইহার বিরোধিতা বিদ্যমান এবং প্রায় সমগ্র জগতে বৃহৎ জমিদারীগুলি ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়াছে এবং তাহার স্থলে কৃষক-মালিক শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে। আমি সর্বদাই মনে করি ভারতে একমাত্র সম্ভবপর ও সঙ্গত প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাহা হইল ক্ষতিপূরণের কথা; কিন্তু গত বৎসর বা ইহার কাছাকাছি কোন সময়ে আমি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে, তালুকদারী প্রথা বর্তমান আকারেই চলিতে থাকুক, ইহা গান্ধিজী অমুমোদন করেন। ১৯৩৪-এর জুলাই মাসে তিনি কাণপুরে বলিয়াছিলেন,—“জমিদার ও প্রজার মধ্যে সম্ভাব-স্থাপন উভয় পক্ষের হৃদয়ের পরিবর্তন দ্বারা সাধন করা যাইতে পারে। যদি তাহা করা যায়, তাহা হইলে উভয়েই শান্তি ও সৌহার্দ্যের সহিত বাস করিতে পারে। তিনি কখনও তালুকদারী বা জমিদারী প্রথা বিলোপের পক্ষপাতী নহেন। এবং যাহারা মনে ভাবে উহা বিলুপ্ত করাই উচিত, তাহারা নিজেদের মনোভাবই বৃদ্ধিতে পারে না (শেষোক্ত অভিযোগটি অন্ততঃ পক্ষে হ্রবিবেচনা নহে)।

তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে,—“যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত ভূস্বামীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়ার দলে আমি নহি। আমার উদ্দেশ্য হইল তোমাদের হৃদয়-স্পর্শ করিয়া তোমাদিগকে স্বমতে আনয়ন করা; (তিনি বড় জমিদারদের এক ডেপুটেশনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলেন) যাহাতে তোমরা তোমাদের প্রজাবৃন্দের অছি স্বরূপ সম্পত্তি রক্ষা কর এবং প্রধানতঃ তাহাদের কল্যাণের জগুই উহা ব্যয় কর।……কিন্তু ধরিয়া লওয়া ষাউক, যদি কেহ অগ্নায় রূপে তোমাদের সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চাহে, তাহা হইলে তোমরা দেখিবে, আমি তোমাদের হইয়া সংগ্রাম করিব। পাশ্চাত্যের সমাজতন্ত্রবাদ অথবা কমুনিজম এমন কতকগুলি ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত, যাহা আমাদের মূলবিশ্বাস হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। উহাদের ধারণাগুলির মধ্যে একটি এই যে, উহার মনুষ্যস্বভাবের মধ্যে স্বার্থপরতার প্রাধান্য বিশ্বাস করিয়া থাকে।……আমাদের সমাজতন্ত্রবাদ বা কমুনিজম অহিংসার উপর এবং ধনী ও শ্রমিক, জমিদার ও প্রজার সামঞ্জস্যপূর্ণ সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত।”

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধারণাগুলির মধ্যে এরূপ মূলগত কোন পার্থক্য আছে কিনা আমার জানা নাই। সম্ভবতঃ তাহা আছে। কিন্তু অল্পদিন হইল একটি দৃশ্য দেখিতেছি যে ভারতীয় ধনী ও জমিদারেরা, তাহাদের

অবিরোধিতা

পাশ্চাত্য সহধর্মীদের তুলনায়, শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতি অধিকতর উদাসীন। প্রজাতন্ত্রের মঙ্গলের জন্ত কোন জনহিতকর কার্যে অহুসার প্রদর্শনের কোন চেষ্টা ভারতীয় জমিদারগণ করেন না। পাশ্চাত্যদেশবাসী মিঃ এইচ, এন, ব্রেইলস্‌ফোর্ড অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন,— “সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে ভারতীয় মহাজন ও জমিদারদের মত অর্থগুরু পরগাছা আর কোথাও নাই।” * সম্ভবতঃ দোষ ভারতীয় জমিদারদের নহে। প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফলে তাহাদের ক্রমাবনতি ঘটিয়াছে এবং বর্তমানে তাহারা এমন সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়াছে যে নিষ্কৃতির পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না। অনেক বড় জমিদারের ভূসম্পত্তি মহাজনের কবলে গিয়াছে, ছোট খাট জমিদার যাহারা পূর্বে যে জমির মালিক ছিল এখন তাহারই প্রজার স্তরে নামিয়া গিয়াছে। সহরবাসী ধনী মহাজনেরা জমিদারী বন্ধক ও রেহান রাখিয়া টাকা দান করিয়াছে এবং তারপর নিজেরা জমিদার হইয়া বসিয়াছে। গান্ধিজীর মতে এই সকল ব্যক্তি যাহাদের জমি কাড়িয়া লইয়াছে, তাহাদেরই অছি স্বরূপ হইবে এবং প্রত্যাশা করিতে হইবে যে ইহারা তাহাদের উপার্জন প্রধানতঃ প্রজাসাধারণের কল্যাণে ব্যয় করিবে।

যদি তালুকদারী প্রথা ভালই হয়, তাহা হইলে সমস্ত ভারতে উহা প্রবর্তন করা হয় না কেন? ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বহু কৃষক-জমিদার হইয়াছে। গুজরাটে বড় বড় জমিদারী বা তালুকদারী সৃষ্টি করিতে গান্ধিজী রাজী হইবেন কি? আমার ত মনে হয় না। কিন্তু যুক্তপ্রদেশ বাঙ্গলা ও বিহারের পক্ষে একপ্রকার ভূমিসংক্রান্ত ব্যবস্থা ভাল কেন, আর কেনই বা গুজরাট ও পাঞ্জাবের জন্ত ভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা ভাল? ভারতের উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম বা দক্ষিণের জনসাধারণের মধ্যে কোন মর্যাস্তিক ব্যবধান নাই এবং তাহাদের মূল ধারণাগুলির ভিত্তি এক। তাহা হইলে কথা এই দাঁড়ায় যে যাহা আছে তাহাই চলিতে থাকুক এবং বর্তমান ব্যবস্থা রক্ষা করিতেই হইবে। জনসাধারণের পক্ষ হইতে কি বাঞ্ছনীয় অথবা হিতকর সে সম্বন্ধে অর্থনৈতিক কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই, বর্তমানে ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনের কোন চেষ্টার আবশ্যক নাই; কেবল জনসাধারণের হৃদয়ের পরিবর্তন সাধন করাই প্রয়োজন। ইহা জীবন ও তাহার সমস্তকে নিছক ধর্মের দিক হইতে দেখিবার চেষ্টা মাত্র। ইহার সহিত রাজনীতি অর্থনীতি অথবা সমাজবিজ্ঞানের

* ব্রেইলস্‌ফোর্ড প্রণীত ‘প্রপারটি অর পিস’ ?

কোন সম্পর্ক নাই। তথাপি গান্ধিজী রাজনীতি ও জাতীয়তার ক্ষেত্রে ইহাকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হন।

অদ্যকার ভারতবর্ষ এই শ্রেণীর কতকগুলি স্ববিরোধিতার সম্মুখীন হইয়াছে। আমরা যে কোন প্রকারেই হউক কতকগুলি জটিল বন্ধনে নিজেকে আবদ্ধ করিয়াছি, এখন ঐগুলি খুলিয়া না ফেলিলে অগ্রসর হওয়া কঠিন। কেবল মাত্র ভাবাবেগের দ্বারা বন্ধন মুক্তি আসিবে না। শ্রেষ্ঠতর কি? স্পিনোজা বহু পূর্বেই প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—“জ্ঞান ও উপলব্ধির মধ্য দিয়া মুক্তি অথবা ভাবাবেগের বন্ধন?” তিনি প্রথমটিই বাছিয়া লইয়াছিলেন।

৬৩

হৃদয়ের পরিবর্তন না বলপ্রয়োগ

ষোল বৎসর পূর্বে গান্ধিজী অহিংসা-নীতি প্রচার করিয়া ভারতবর্ষকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিলেন। তখন হইতে ইহা ভারতের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হইতেছে। বহু লোক চিন্তা না করিয়া ইহা সমর্থন করিয়াছে, কেহ বা ইহার সহিত তর্ক ও বিচার করিয়া আংশিক অথবা সমগ্রভাবে ইহা গ্রহণ করিয়াছে, কেহ প্রকাশ্যে ইহা লইয়া ব্যঙ্গ করিয়াছে। আমাদের রাজনৈতিক ও সমাজজীবনে ইহার প্রভাব অত্যন্ত অধিক, এবং ইহা জগতের দৃষ্টিও বহুল পরিমাণে আকর্ষণ করিয়াছে। অহিংসা-তত্ত্ব অতি প্রাচীন, কিন্তু সম্ভবতঃ গান্ধিজীই প্রথম উহা ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে প্রয়োগ করেন। পূর্বে ইহা বিশেষভাবে ব্যক্তিগত এবং প্রধানতঃ ধর্মের সহিত যুক্ত ছিল। ইহা ছিল মুক্তিকামীর বৈরাগ্য-সাধনার আত্মসংযম, যাহার সহায়ে সে জগতের স্বার্থসংঘাত হইতে নিজেকে উদ্ধে তুলিয়া লইত। বৃহত্তর সামাজিক সমস্যা সমাধান অথবা সামাজিক পরিবর্তনের জন্য ইহার প্রয়োগ অপরিজ্ঞাত ছিল, থাকিলেও তাহা অত্যন্ত গোপ ব্যাপার। সমস্ত বৈষম্য ও অবিচার সহ প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা প্রায় সকলেই মানিয়া লইত। ব্যক্তিগত জীবনের এই আদর্শকে গান্ধিজী সমাজের সমষ্টিগত আদর্শে পরিবর্তিত করিবার

হৃদয়ের পরিবর্তন না বলপ্রয়োগ

চেষ্টা করিলেন। তিনি রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন প্রয়াসী, এবং সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি বিশেষ বিবেচনাসহকারে অহিংসানীতি ব্যাপকভাবে এবং সম্পূর্ণ পৃথক ক্ষেত্রে প্রবর্তন করিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, “মানুষের অবস্থা ও পারিপার্শ্বিকের আমূল পরিবর্তন সাধন করিতে হইলে, সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি ব্যতীত তাহা সম্ভবপর নহে। দুই উপায়ে ইহা সম্ভবপর হইতে পারে, বলপ্রয়োগ দ্বারা কিংবা অহিংসা দ্বারা। হিংসার উৎপীড়ন দেহধারী মানুষ অল্পভব করে; ইহা বলপ্রয়োগকারীকে অধঃপতিত করে, নিপীড়িতকে অবসন্ন করে; কিন্তু অহিংসার প্রভাব আত্মনিগ্রহ হইতে উৎসারিত (যেমন উপবাস) এবং ইহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন উপায়ে কার্য্য করে। ইহা দেহকে স্পর্শও করে না, যাহাদের বিরুদ্ধে ইহা প্রয়োগ করা হয়, তাহাদের নৈতিক বোধকে ইহা জাগ্রত করিয়া তুলে।” *

এই ভাবের সহিত ভারতীয় চিন্তাধারার কিছু সামঞ্জস্য আছে বলিয়া ভাসা ভাসা ভাবে হইলেও, দেশ উৎসাহের সহিত ইহা গ্রহণ করিল। ইহার দূরপ্রসারী গভীরতা অল্প লোকেই বুঝিতে পারিয়াছিল এবং এই অল্পসংখ্যক ব্যক্তিও বিশ্বাস ও কর্ম্মের মধ্যে ইহা একরূপ অস্পষ্টভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন কার্য্যের উৎসাহ শিথিল হইয়া আসিল, তখন লোকের মনে অগণিত প্রশ্ন জাগিতে লাগিল, তখন সকলের জিজ্ঞাসার সত্ত্বেও দেওয়া কঠিন হইয়া উঠিল। এই সকল প্রশ্নের রাজনৈতিকক্ষেত্রে উপস্থিত উপায়ের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। অহিংস প্রতিরোধের ভাবের পশ্চাতে যে দার্শনিক তত্ত্ব রহিয়াছে, প্রশ্নগুলি তাহার সহিতই জড়িত। রাজনৈতিকভাবে এ পর্য্যন্ত অহিংস আন্দোলন সফলতা লাভ করে নাই, কেন না ভারত সাম্রাজ্যবাদের পাপ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ। সমাজেও ইহা কোন আমূল পরিবর্তন সাধন করিতে পারে নাই। তথাপি যাহার সামান্য দূরদৃষ্টিও আছে, তিনিই লক্ষ্য করিবেন, ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবনে ইহা কি বিচিত্র পরিবর্তন আনিয়াছে। ইহা তাহাদিগকে চরিত্রবল দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে, আত্মনির্ভরতা শিখাইয়াছে, এই সকল গুণ ব্যতীত রাষ্ট্র ও সমাজে কোন উন্নতি সাধন বা রক্ষা করা কঠিন। ইহা অহিংসা হইতে উদ্ভূত না সংঘর্ষ হইতেই সম্ভব হইয়াছে, বলা কঠিন। হিংসামূলক সংঘর্ষেও বহু ব্যক্তি বৎ ঘটনায় ঐ প্রকার গুণাবলী অর্জন করিয়াছে। তথাপি আমি দৃঢ়তার সহিত বলিব, অহিংস

* ১৯৩২-এর ৪ঠা ডিসেম্বর গান্ধিজীর অনশনের প্রাক্কালে প্রদত্ত বিবৃতি হইতে গৃহীত।

জওহরলাল নেহরু

উপায়ে আমরা যাহা লাভ করিয়াছি, তাহা অমূল্য। ইহা গান্ধিজী কথিত সামাজিক আলোড়ন সৃষ্টির সহায়তা করিয়াছে, অবশ্য মূলদেশে আলোড়নের কারণ ও অবস্থা বিद्यমান ছিল, ইহাও নিঃসন্দেহ। তবে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পূর্ববর্তী আয়োজনে ইহা জনগণের মধ্যে গতিবেগ সঞ্চার করিয়াছে।

ইহা অহিংসার স্বপক্ষে অল্পকূল যুক্তি হইলেও ইহা আমাদের অধিক দূর লইয়া যায় না। প্রকৃত প্রশ্নগুলি, প্রশ্নই রহিয়া যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে সমস্তা সমাধানে গান্ধিজীও আমাদের সাহায্য করেন না। তিনি এ বিষয়ে বহুবার বলিয়াছেন, বহুবার লিখিয়াছেন, কিন্তু কি বৈজ্ঞানিক *, কি দার্শনিক ভাবে ইহার সমগ্র দিক প্রকাশভাবে বিচার বিশ্লেষণ করেন নাই। তিনি উদ্দেশ্য অপেক্ষা উপায়কে অধিক গুরুত্ব দিয়া তাহার উপর জোর দেন, পীড়ন অপেক্ষা হৃদয়ের পরিবর্তন উৎকৃষ্টতর বলেন এবং অহিংসার সহিত সত্য ও অত্যাচার সঙ্গুণ প্রায় সমানার্থক করিয়া তোলেন। সময় সময় তিনি সত্য ও অহিংসা একই অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। যাহারা ইহার সহিত একমত নহেন, তাহাদিগকে অন্তরঙ্গমণ্ডলীর বাহিরের লোক বলিয়া গণ্য করিবার ভাবও রহিয়াছে, যেন তাহারা নৈতিক বিধির ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী। তাঁহার কোন কোন অনুগামী ইহাকে আত্মপবিত্রতা সাধন বলিয়াও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

আমাদের মধ্যে যাহারা এই বিশ্বাস দুর্ভাগ্যক্রমে পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা অবশ্য বহুতর সংস্কারপীড়িত হন। এই সন্দেহের সহিত উপস্থিত প্রয়োজনের সামঞ্জস্য নাই, কিন্তু মানুষ তাহার কণ্ঠের এমন একটা সঙ্গতিবিশিষ্ট দর্শন চাহে যাহা ব্যক্তির দিক হইতে নৈতিক হইবে এবং সমাজ জীবনে হইবে কার্যকরী। আমি অকপটে স্বীকার করিব যে, আমি এই সন্দেহ হইতে মুক্ত হইতে পারি নাই, এবং সমস্তার কোন সন্তোষজনক সমাধানও আমি দেখি না। আমি হিংসা অত্যন্ত অপছন্দ করিলেও আমার নিজের মন হিংসায় পরিপূর্ণ; জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমি অপরকে পীড়ন করিতে চেষ্টা করি। কিন্তু গান্ধিজী যে ভাবে মানসিক পীড়ন করেন তাহা অপেক্ষা অধিক পীড়ন আর কি হইতে পারে? যাহার ফলে তাঁহার অন্তরঙ্গ অনুগামী ও সহকর্মীদের মন একেবারে তালগোল পাকাইয়া যায়।

* রিচার্ড, বি, থ্রেগ, তাঁহার “পাওয়ার অফ্‌ নন-ভাওলেন্স” পুস্তকে এই বিষয়টি বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার এই হৃৎপাঠ গ্রহণানিতে চিন্তা করিবার অনেক বিষয় আছে।

হৃদয়ের পরিবর্তন না বলপ্রয়োগ

কিন্তু প্রকৃত প্রশ্ন এই—জাতীয় বা সামাজিক শ্রেণীগুলি কি ব্যক্তিগত অহিংসার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে পারে? কেন না, মানুষজাতি প্রেম ও সততার উচ্চস্তরে উঠিলেই ইহা সম্ভব হইতে পারে। মনুষ্যজাতিকে এই উচ্চস্তরে তুলিয়া ঘণা, কদর্ঘতা ও স্বার্থপরতার অবসান করার চরম আদর্শ যে কাম্য, তাহা সত্য। ইহা সম্ভব কি অসম্ভব, কোন কালে ইহা হইবে কি না, তাহা অবশ্যই বিচারের বিষয়, কিন্তু এইরূপ আশা ব্যতীত জীবন লক্ষ্যহীন অর্থহীন কোলাহল মাত্র। এই আদর্শ লাভ করিতে হইলে কি আমরা প্রত্যক্ষভাবে এই সদগুণগুলি প্রচার করিব, বাধাগুলি গণনার মধ্যে আনিব না? কিন্তু দেখা যাইতেছে বাধাগুলি শাকল্যের অন্তরায় হইয়া বিপরীত প্রবৃত্তি জাগ্রত করিতেছে। অথবা সর্বাগ্রে বাধাগুলি দূর করিয়া, প্রেম, সৌন্দর্য ও সততার অমূল ও উপযোগী আবহাওয়া আমরা সৃষ্টি করিব? অথবা উভয় উপায় লইয়াই কার্য করিতে হইবে?

তার পর হিংসা ও অহিংসা, হৃদয়ের পরিবর্তন ও বলপ্রয়োগের মধ্যে সীমারেখা কি খুব স্পষ্ট? দৈহিক বলপ্রয়োগ অপেক্ষাও সময় সময় নৈতিক শক্তি অধিকতর পৌড়াদায়ক হইয়া উঠে। এবং অহিংসা ও সত্য কি সমানার্থবাচক? সত্য কি, এই প্রাচীন প্রশ্নের সহস্র উত্তর দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তথাপি প্রশ্ন, প্রশ্নই আছে। ইহা যাহাই হউক, নিশ্চয়ই ইহাকে অহিংসার সহিত একত্র করিয়া দেখা যায় না। হিংসা মল হইলেও, ইহা স্বভাবতঃই দুর্নীতিমূলক একথা বলা যায় না। ইহারও নানা রূপ বা স্তর আছে, সময় সময় অধিকতর হীন কার্য হইতে হিংসা অবলম্বন প্রশস্ত। গান্ধিজী নিজেও বলিয়াছেন, কাপুরুষতা, ভয় ও দাসত্ব হইতে ইহা শ্রেষ্ঠ; আরও অনেক অস্তায় এই তালিকায় জুড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। হিংসার সহিত প্রায়ই কুভাব জড়িত থাকে সত্য, কিন্তু তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলে সর্বদাই যে ঐরূপ হইবে এমন কোন কথা নাই। সদিচ্ছা হইতেও হিংসা সম্ভব (যেমন অস্ত্রচিকিৎসক) এবং সদিচ্ছা বাহার ভিত্তি তাহা কখনও স্বরূপতঃ দুর্নীতি হইতে পারে না। যাহা হউক, সাধু ইচ্ছা ও কুঅভিপ্রায় এই দুইটিই হইল শিষ্টাচার ও নীতির চরম পরীক্ষা! নৈতিক যুক্তির দিক দিয়া হিংসা প্রায়ই অস্তায়, এমন কি বিপজ্জনকও হইতে পারে; কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই যে হইবে এমন কোন কথা নাই।

সমস্ত জীবনই হিংসা ও সংঘর্ষে ভরা। হিংসা হইতে হিংসার উদ্ভব হয় এবং হিংসা দ্বারা হিংসাকে জয় করা যায় না, ইহাও সত্য। কিন্তু

জওহরলাল নেহরু

তথাপি শপথ গ্রহণ করিয়া ইহা সর্বতোভাবে বর্জন করিলে জীবনের সহিত সম্পর্কহীন এক নেতিবাচক অবস্থায় উপনীত হইতে হয়। আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার হিংসাই প্রাণবন্ত। রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগে বাধ্য করার ব্যবস্থাগুলি না থাকিলে ট্যাক্স আদায় হইত না, জমিদারেরা খাজনা পাইত না, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলুপ্ত হইত। আইন সশস্ত্র শক্তির সাহায্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর অপরের হস্তক্ষেপ নিবারণ করে। আক্রমণ ও প্রতিরোধ উভয়বিধ হিংসার উপরই জাতীয় রাষ্ট্রগুলি প্রতিষ্ঠিত।

গান্ধিজীর অহিংসা নিশ্চয়ই নিছক নেতিবাদক ব্যাপার নহে, ইহা সত্য। ইহা অপ্রতিরোধ নহে। ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অহিংস-প্রতিরোধ— ইহা প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয়। যাহারা প্রচলিত ব্যবস্থা নিরীহভাবে মানিয়া লয়, ইহা তাহাদের জ্ঞান নহে। “সামাজিক আলোড়ন” আনিবার উদ্দেশ্যেই ইহা পরিকল্পিত হইয়াছে, যাহা হইতে বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব হইবে। ইহার মধ্যে হৃদয়ের পরিবর্তনের যে প্রকার উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন, বলপূর্বক বাধ্য করিবার পক্ষেও ইহা এক শক্তিশালী অস্ত্র— তবে ইহার বলপ্রয়োগভঙ্গী অতিমাত্রায় শিষ্ট এবং তাহাতে আপত্তি করিবার বিশেষ কিছু নাই। গান্ধিজী তাঁহার প্রথম দিকের লেখাগুলিতে “বাধ্য করা” এই শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। পাঞ্জাব সামরিক আইনের অন্তায় সম্পর্কে ১৯২০ সালে বড়লাটের (লর্ড চেমসফোর্ড) বক্তৃতার সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছিলেন,—

“.....আইনসভার উদ্বোধন করিয়া বড়লাট যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে আমি যে মনোভাবের পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে কোন আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে তাঁহার কিম্বা তাঁহার গভর্নমেন্টের সংশ্রবে যাওয়া অসম্ভব।

“পাঞ্জাব সম্পর্কে মন্তব্যের অর্থ ক্ষতিপূরণ করিতে সরাসরি অস্বীকার। তিনি চাহেন আমরা আসন্ন ‘ভবিষ্যতের’ দিকে অধিকতর মনোযোগী হই। আসন্ন ভবিষ্যতে পাঞ্জাবের ঘটনার জ্ঞান গভর্নমেন্টকে অনুতাপ করিতে বাধ্য হইতে হইবে। কিন্তু তাহার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। পক্ষান্তরে বড়লাট তাঁহার সমালোচকদের উত্তর দিতে বিরত থাকিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, ভারতের মর্য্যাদার সহিত সংশ্লিষ্ট গুরুতর ব্যাপারগুলি সম্পর্কে তাঁহার মতের কোন পরিবর্তন হয় নাই। তিনি “ইতিহাস ইহার বিচার করিবে, এই ভাবিয়াই নিশ্চিন্ত।” আমার মতে, এই শ্রেণীর ভাষা ভারতীয়দের মনকে অধিকতর ক্ষুব্ধ করিবার জ্ঞান ইচ্ছা করিয়াই ব্যবহার করা হইয়াছে। ইতিহাসের সিদ্ধান্ত অল্পকাল হইলোই বা তাহাদের কি

হৃদয়ের পরিবর্তন না বলপ্রয়োগ

আসে যায়, যাহারা অগ্রায় সহ্য করিয়াছে এবং যখন যে সকল কর্মচারী দায়িত্বপূর্ণ বিশ্বস্তপদে থাকিবার অযোগ্যতা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছে, তাহাদেরই পায়ের তলায় এখনও থাকিতে হইতেছে? পাক্সাবের স্থবিচারের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া, সহযোগিতার কথা উত্থাপন করা ভণ্ডামী মাত্র।”

গভর্নমেন্টগুলি অতি নিম্ননীয় হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত, কেবল সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীর প্রকাশ্য হিংসার উপর নহে; অধিকতর ভয়াবহ হিংসা অতি সূক্ষ্মভাবে প্রয়োগ করা হয়, তাহার অস্ত্র গোয়েন্দা, গুপ্তচর, প্ররোচক চর, শিক্ষাবিভাগ, সংবাদপত্র প্রভৃতির মধ্য দিয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মিথ্যা প্রচার কাব্য, ধর্ম ও অগ্ন্যাগ্ন ভীতি, অর্থনৈতিক শোষণ এবং অনশন। দুইটি গভর্নমেন্টের মধ্যে, ধরা না পড়িলে সকল প্রকার মিথ্যা ও বিশ্বাসঘাতকতা সর্বদাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হয়। শান্তির সময়ও ইহা চলে, যুদ্ধের সময় ত কথাই নাই। তিনশত বৎসর পূর্বে স্তর হেনরী ওটন, কবি এবং স্বয়ং একজন ব্রিটিশ রাজদূত হইয়াও, রাজদূতের এই সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন যে, “একজন সাধু ব্যক্তিকে, স্বদেশের মঙ্গলের জন্ত বিদেশে মিথ্যা প্রচারের জন্ত প্রেরণ করা হয়।” অধুনা রাষ্ট্রদূতগণ সামরিক, নৌ-বহর, ব্যবসায়-সংক্রান্ত পরামর্শদাতাদের লইয়া দূতাবাসে বাস করেন, তাহাদের প্রধান কাধ্যই হইল, ঐ দেশে গোয়েন্দাগিরি করা। তাহাদের পক্ষে থাকে, গুপ্তচর বিভাগের সুবিস্তৃত দূরপ্রসারিত শাখা প্রশাখার বেড়া জাল; কত ষড়যন্ত্র ও শঠতার আয়োজন, ইহার গোয়েন্দা এবং গোয়েন্দার উপর গোয়েন্দা, সমাজের গোপন স্তরের অপরাধীদের সহিত সম্পর্ক, উৎকোচ ও মনুষ্যকে চরিত্রভ্রষ্ট করিবার আয়োজন এবং গুপ্ত হত্যাকাণ্ড। শান্তির সায়ে ইহা গহিত সন্দেহ নাই, কিন্তু যুদ্ধের সময় ইহার গুরুত্ব অতিমাত্রায় বাড়িয়া যায়, এবং ইহার মারাত্মক প্রভাব চারিদিকে বিস্তৃত হয়। গত মহাযুদ্ধের সময় প্রচার-কাণ্ডের কতকগুলি দৃষ্টান্ত আজকাল পড়িলে অবাক হইতে হয়, কি ভাবে শত্রু-রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জঘন্য মিথ্যা প্রচার করা হইয়াছে এবং ইহার জন্ত ও গোয়েন্দা বিভাগের জন্ত কি বিপুল অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে। আজকাল শান্তির অর্থ দুইটি যুদ্ধের মধ্যে বিরাম মাত্র—যুদ্ধের আয়োজন চলিতে থাকে এবং কতক পরিমাণে অর্থনৈতিক ও অগ্ন্যাগ্ন ক্ষেত্রে সংঘর্ষ লাগিয়াই থাকে। বিজ্ঞতার সহিত বিজ্ঞিতের, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহিত তাহাদের অধীন ঔপনিবেশিক দেশগুলির, সুবিধাবাদী শ্রেণীর সহিত শোষিত শ্রেণীর সংঘর্ষ লাগিয়াই আছে। হিংসা ও মিথ্যার সমস্ত আয়োজন লইয়া যুদ্ধের আবহাওয়া, তথাকথিত শান্তির সময়ও বিদ্যমান থাকে; কি সৈনিক কি সাধারণ কর্মচারী সকলকে এই একই অবস্থার উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হয়। “যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের

কর্তব্য” শীর্ষক পুস্তকে লর্ড উলস্লে লিখিয়াছেন,—“আমরা সত্যতঃই এই বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করিব যে,—‘সত্যতাই সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি’ এবং পরিণামে জয়ী হয়, এই সুন্দর বাক্যটি শিশুদের হস্তলিপি পুস্তকে বেশ মানায়, কিন্তু সত্যই যুদ্ধে যে উহা প্রয়োগ করিতে চাহে, তাহার পক্ষে তরবারী কোষবদ্ধ করিয়া রাখাই ভাল।”

জাতির বিরুদ্ধে জাতি, শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণী লইয়া বর্তমান ব্যবস্থার ভিত্তিতে হিংসা ও মিথ্যা অপরিহার্য বলিয়াই মনে হয়। সুবিধাভোগী জাতি ও শ্রেণীগুলি তাহাদের ক্ষমতা ও সুবিধা বজায় রাখিবার জন্ত, এবং যাহাদের উপর তাহারা অত্যাচার করে, তাহাদের উন্নতির সুবিধাগুলি দাবাইয়া রাখিবার জন্ত, হিংসা, বলপূর্বক বাধ্য রাখা এবং মিথ্যার উপর নির্ভর করিতে বাধ্য। জনমত শক্তিশালী হইলে এবং এই সংঘর্ষ ও দমন ব্যবস্থার বাস্তব রূপ অতিমাত্রায় প্রত্যক্ষ হইলে, হিংসা মন্দীভূত হইতে পারে। ইহা সম্ভবপর। কিন্তু আধুনিক অভিজ্ঞতা ইহার বিপরীত, প্রচলিত প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যতই শক্তিশালী হইতেছে, হিংসানীতিও ততই প্রবল হইতেছে। এমন কি, যখন প্রকাশ্য ভাবে হিংসা মন্দীভূত হইয়াছে, তখনই ইহা অধিকতর সূক্ষ্ম ও মারাত্মক রূপে প্রকাশ পাইতেছে। কি যুক্তিবাদের প্রসার, কি ধর্মজীবন, কি নৈতিক শিক্ষা কিছুতেই এই হিংসাপ্রবণতাকে সংযত করিতে পারিতেছে না। ব্যক্তিবিশেষের উন্নতি হইয়াছে, মহুঘাতের তুলাদণ্ডে তাহারা অনেক উর্দ্ধে উঠিয়াছে। সম্ভবতঃ ঐতিহাসিক আর কোন যুগের সহিত তুলনায় বর্তমান জগতে উন্নতমনা ব্যক্তির (সর্বোচ্চশ্রেণীর ব্যক্তি ছাড়া) সংখ্যা অধিক, সমগ্রভাবে সমাজেরও উন্নতি হইয়াছে; কিয়ৎপরিমাণ আদিম ও বর্বর প্রবৃত্তি সংযত করার ভাব জাগ্রত হইয়াছে। কিন্তু মোটের উপর শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। ব্যক্তি-বিশেষ অধিকতর সভ্য হইয়া তাহার আদিম প্রবৃত্তিও পাপ সম্প্রদায়ের মধ্যেই ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছে; এবং ঐ সকল সম্প্রদায়ের নৈতিক মাপকাঠিতে দ্বিতীয়শ্রেণীর লোকদের হিংসার প্রতি সর্বদাই অতুরাগ আছে বলিয়া, সম্প্রদায়গুলির প্রথম শ্রেণীর নরনারীরা কদাচিৎ নেতৃত্ব করিতে পারেন।

কিন্তু যদি আমরা ধরিয়াও লই যে, হিংসার চরম ও নিষ্ঠুর ব্যবস্থা-গুলি ক্রমশঃ রাষ্ট্র হইতে অন্তর্হিত হইবে, তাহা হইলেও গভর্নমেন্ট ও সমাজজীবনের পক্ষে কি বল-প্রয়োগের প্রয়োজন থাকিয়া যাইবে? ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সমাজ জীবনের জন্ত যে কোন

হৃদয়ের পরিবর্তন না বলপ্রয়োগ

আকারেই হউক গভর্ণমেন্টের আবশ্যক, এবং যে সকল লোকের হাতে ক্ষমতা থাকিবে তাহাদিগকে ব্যক্তি বা দেশের প্রকৃতিতে স্বার্থপরতা সংযত ও দমন করিতেই হইবে, নতুবা সমাজের ক্ষতি হইতে পারে। সাধারণতঃ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রয়োজনের অতিবিক্ত বলপ্রয়োগ করে, কেন না ক্ষমতা চরিত্রকে কলুষিত ও অধঃপতিত করে। যাহা হউক, শাসকগণ যত স্বাধীনতা-প্রেমিক হউন এবং বলপ্রয়োগ যতই ঘৃণা করুন না কেন, ব্যক্তিশেষ বেয়াড়া ব্যক্তিকে শাস্ত করিবার জন্ত তাঁহাদের বলপ্রয়োগ করিতেই হইবে। যতদিন না রাষ্ট্রের প্রত্যেক অধিবাসী সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও সর্বজনীন কল্যাণের অন্তরঙ্গী হইতেছে, ততদিন ইহার আবশ্যক। কিন্তু ঐ আদর্শ রাষ্ট্রের শাসকগণকেও, বাহিরের পরধনলোভীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করিতে হইবে অর্থাৎ তাঁহাদিগকে আত্মরক্ষা করিতে হইবে, বল লইয়াই বলের সম্মুখীন হইতে হইবে। যখন সমগ্র জগতে একরাষ্ট্র হইবে, তখনই ইহার প্রয়োজন অন্তর্হিত হইবে।

বহিরাক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা রক্ষার জন্ত যদি বল ও কর্মের ভাবে বাধ্য করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে কোথায় সীমারেখা নির্দেশ করা যাইবে? রাইনহোল্ড নাইবুর * বলিতেছেন, “নীতিশাস্ত্র যদি একবার রাষ্ট্রনীতিকে এই চরম স্বাধীনতা দিয়া থাকে, এবং বলপ্রয়োগ সামাজিক সাম্যরক্ষার প্রয়োজনীয় অঙ্গরূপে গৃহীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, হিংসা কি অহিংসধরণের বলপ্রয়োগ, গভর্ণমেন্টের বলপ্রয়োগ কিম্বা বিপ্লবীর বলপ্রয়োগ, এই উভয়ের মধ্যে স্থনির্দিষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন।”

আমি নিশ্চিতরূপে না জানিলেও, আমার মনে হয়, গান্ধিজীও স্বীকার করিবেন, এই অপূর্ণ জগতে বাহির হইতে, অত্যাচার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্ত যে কোন জাতীয় রাষ্ট্রকে বাহুবল প্রয়োগ করিতে হইবে। অবশ্য সেই রাষ্ট্র, প্রতিবেশী ও অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতি সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ মৈত্রীভাব প্রদর্শন করিবে, কিন্তু তথাপি আক্রমণের সম্ভাবনা একেবারেই অস্বীকার করা অযৌক্তিক। রাষ্ট্রকে কতকগুলি বলপ্রয়োগমূলক আইনও প্রণয়ন করিতে হইবে, একদিক দিয়া ঐগুলি কোন কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের কতকগুলি অধিকার ও সুবিধা হরণ করিবে এবং কাজকর্মের স্বাধীনতা সংযত করিবে। সমস্ত আইনই কিয়দংশে ভীতিপ্রদর্শনমূলক। কংগ্রেসের করাচী সিদ্ধান্তে উল্লিখিত হইয়াছে, “জনসাধারণের শোষণের অবসান

* মর্যাল ম্যান এণ্ড ইম্মর্যাল সোসাইটি।

জওহরলাল নেহরু

করিবার জ্ঞান, রাজনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে অনশনক্লিষ্ট কোটি কোটির প্রকৃত অর্থনৈতিক স্বাধীনতারও স্থান থাকিবে।” এই সাধু অভিপ্রায়কে কার্যে পরিণত করিতে হইলে অতিরিক্ত স্ববিধাবাদীদের স্ববিধাহীনদের জ্ঞান কিছু ছাড়িতে হইবে। তাহা ছাড়া ইহাও বলা হইয়াছে যে, শ্রমিকেরা বাঁচিয়া থাকিবার মত মজুরী ও অগ্ন্যাগ্ন স্ববিধা পাইবে; ধনসম্পত্তির উপর বিশেষ কর ধার্য হইবে, “মূল শিল্পগুলি, সাধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবসায়, রেলওয়ে, জলপথ, নৌবাণিজ্য প্রভৃতি ও সাধারণের যানবাহনাদি রাষ্ট্রের অধিকারে আসিবে এবং নিয়ন্ত্রিত হইবে”; এবং “সর্ববিধ মাদক দ্রব্যের প্রচলন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে”। বহু সংখ্যক ব্যক্তিই এই সকলের প্রতিবাদ করিবে, সে সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাহারা অধিকাংশের ইচ্ছার বশীভূত হইতে পারে, কিন্তু অবাধ্যতার পরিণাম চিন্তা করিয়া ভয়েই তাহারা ঐরূপ করিবে। গণতন্ত্রের অর্থই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বলপ্রয়োগে সংখ্যালঘিষ্ঠ দলকে নিরস্ত রাখা।

সম্পত্তির উপর অধিকার সঙ্কোচ করিয়া অথবা বহুলাংশে বিলোপ করিয়া, সংখ্যাগরিষ্ঠদল যদি কোন আইন প্রণয়ন করে, তাহাকে বলপ্রয়োগ বলিয়া কি আপত্তি করা হইবে? প্রকাশ্য ভাবে তাহার উপায় নাই; কেন না গণতান্ত্রিক আইন এই প্রথাতেই প্রণীত হয়। বড় জোর বলা যাইতে পারে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠদল অগ্নায় বা অনীতিক কার্য করিতেছেন। তখন বিবেচনার বিষয় হইবে এই যে, সংখ্যাগরিষ্ঠদল নীতিশাস্ত্রের কোন বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন কিনা? কে ইহার মীমাংসা করিবে? যদি ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে স্ব স্ব স্বার্থের অল্পকূল করিয়া নীতিশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অবসান হইবে। ব্যক্তিগতভাবে আমার ধারণা এই, ব্যক্তিগত সম্পত্তির ফলে (খুব সীমাবদ্ধ ও স্তূর্ণির্দিষ্ট সম্পত্তি ছাড়া) সমগ্র সমাজের উপর আধিপত্য করিবার মারাত্মক ক্ষমতা লোকের হাতে দেওয়া হয়, অতএব উহা সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর। আমি উহাকে মণ্ডপান অপেক্ষাও দুর্নীতি বলিয়া মনে করি। কেন না, মণ্ডপান দ্বারা সমাজ অপেক্ষা ব্যক্তিরই অধিক ক্ষতি হয়।

যাহা হউক, ঈহারা অহিংসপন্থায় বিশ্বাসী এমন অনেক লোকের নিকট আমি শুনিয়াছি যে, মালিকের সম্মতি ব্যতীত ব্যক্তিগত সম্পত্তি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবার চেষ্টা অহিংসনীতি বিরোধী। এই কথা আমাকে এমন সব বড় জমিদার বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, ঈহারা গভর্নমেন্টের সাহায্য লইয়া বলপূর্বক খাজনা আদায় করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না, এমন সব বহু কায়খানার মালিক বলিয়াছেন, ঈহারা তাঁহাদের এলাকায়

হৃদয়ের পরিবর্তন না বলপ্রয়োগ

স্বাধীন শ্রমিকসম্মেলন গঠনের প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। জনসাধারণের অধিকাংশের পরিবর্তনের ইচ্ছা থাকিলেই চলিবে না, যে সকল বস্তির ক্ষতি হইবে, তাহাদেরও হৃদয়ের পরিবর্তন করিতে হইবে; ইহাই কথা। কিন্তু এ ভাবে মুষ্টিমেয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যে কোন আকাজক্ষিত পরিবর্তনের গতি রোধ করিতে পারে।

ইতিহাসের মধ্যে এই সত্যটি ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, অর্থনৈতিক স্বার্থই দল বা শ্রেণীর রাজনৈতিক মত গড়িয়া তোলে। যদিও ইহা বিরল, তথাপি ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়ের পরিবর্তন করা শইতে পারে, তাহারা বিশেষ সুবিধা ত্যাগও করিতে পারে; কিন্তু দল বা শ্রেণী কখনও তাহা করে না। শাসক অথবা সুবিধাভোগী শ্রেণীর হৃদয়ের পরিবর্তন দ্বারা ক্ষমতা ও বিশেষ সুবিধা বর্জন করাইবার চেষ্টা এতাবৎ কাল ব্যর্থই হইয়াছে, এবং এমন কোন যুক্তি আছে বলিয়া মনে হয় না যে, ভবিষ্যতে তাহা সফল হইবে। রাইনহোল্ড নাইবুর তাঁহার পুস্তকে নীতিবাদীদের বিরুদ্ধে এই যুক্তি দিয়াছেন যে,—“যাহারা মনে করে যে, ‘মানুষের আত্মাভিমান যুক্তিবাদের পরিপূষ্টির সহিত অথবা ধর্মোচ্ছিন্নপ্রসূত সদিচ্ছার দ্বারা অধিকতর সংযত হইবে, এবং সমস্ত মনুষ্য সমাজ ও সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সামাজিক সাম্য স্থাপনের জন্ত এই উপায়েরই প্রয়োজন।’—এই সমস্ত নীতিবাদী, মনুষ্যসমাজে স্তব্ধতার জন্ত আগ্রহের মধ্যে রাজনৈতিক প্রয়োজনগুলি গণনার মধ্যে আনিতে পারে না, তাহারা ইহাও বুঝিতে পারে না যে, মানুষের ব্যবহারের মধ্যে যে সকল বস্তু রহিয়াছে, তাহা প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে বিস্তৃত এবং তাহা কখনও সম্পূর্ণরূপে যুক্তি বা বিবেকের আয়ত্তে আনা সম্ভবপর হইবে না। তাহারা ইহাও বুঝিতে পারে না যে, সম্মিলিত শক্তি, তাহা সাম্রাজ্যনীতিরই হউক আর শ্রেণী-প্রাধান্যেরই হউক, যখন দুর্বলকে শোষণ করে তখন তাহার বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ ব্যতীত উহাকে কিছুতেই স্থানচ্যুত করা যায় না।” আরও বলিয়াছেন, “যখন দেখা যাইতেছে যুক্তি অনেকাংশে সামাজিক ও বিশেষ বস্তু হইতে উদ্ধৃত স্বার্থের দাস, তখন কেবলমাত্র নৈতিক বা যৌক্তিক প্ররোচনা দ্বারা কোন সামাজিক সুবিচারের মীমাংসা করা যায় না।……সংঘর্ষ অনিবার্য; এবং এই সংঘর্ষ শক্তির বিরুদ্ধে শক্তিই প্রয়োগ করিতে হইবে।”

অতএব কোন জাতি বা শ্রেণীর সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ের পরিবর্তন সম্ভব কিংবা যুক্তিসঙ্গত তর্ক বা সুবিচারের দোহাই দিয়া সংঘর্ষ নিবারণ সম্ভব, একথা যাহারা ভাবেন, তাঁহারা আত্মসম্মোহন করেন মাত্র। বলপ্রয়োগের সমতুল্য কার্য্যকরী চাপ না দিলে, কোন শ্রেণী তাহার সুবিধা ও উন্নত প্রতিষ্ঠা

জওহরলাল নেহরু

ত্যাগ করিবে অথবা কোন দেশের উপর প্রভুত্বের আসনে সমাসীন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাহার ক্ষমতা ত্যাগ করিবে, এরূপ চিন্তা বাতুলতা মাত্র।

গান্ধিজী এইরূপ চাপই দিতে চাহেন, কিন্তু তাহাকে বলপ্রয়োগ বলিতে চাহেন না। তাঁহার মতে তাঁহার উপায় হইল আত্মপীড়ন। ইহা লইয়া বিচার করা কঠিন, কেন না ইহার মধ্যে এমন একটা দার্শনিক বস্তু আছে, যাহা কোন বাস্তব উপায়ে ধরা ছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া যায় না। প্রতিপক্ষের উপর ইহা প্রচুর প্রভাব বিস্তার করে সন্দেহ নাই। ইহাতে আত্মপক্ষ সমর্থনের জগু যে নৈতিক যুক্তি দিতে অগ্রসর হয়, সে বিচলিত হইয়া পড়ে, তাহার চিত্তে মানবোচিত ভাবের উদ্রেক হয়; ইহাতে আপোষের পথ সর্বদাই উন্মুক্ত থাকে। প্রেম ও স্বৈচ্ছায় দুঃখবরণ, প্রতিপক্ষ এমন কি, দর্শকদের উপরও এক শক্তিশালী মানসিক প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অধিকাংশ শিকারীই জানেন যে, বন্যপশুর সম্মুখীন হইবার ভঙ্গীর মধ্যে অনেক তারতম্য আছে। দূর হইতে সে হিংস্র উন্মাদনা অনুভব করিয়া তাহার প্রতিক্রিয়ায় কার্য্য করিতে চায়। মানুষ ভয় পাইয়াছে, তাহা পশু বুঝিতে পারিয়াছে, অতি চকিতে সম্পূর্ণ অনুভব করিতে না করিতে, মানুষ ভয় পাইয়া আক্রমণ করিয়া বসে। সিংহশিকারী যদি এক মুহূর্তের জগুও দুর্বলতা প্রকাশ করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আক্রমণের আশঙ্কা উপস্থিত হয়। অতি অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা না ঘটিলে, সম্পূর্ণরূপে নির্ভীক ব্যক্তির বন্য পশুর নিকট কদাচিৎ বিপদের আশঙ্কা থাকে। অতএব যে মানুষ মানসিক প্রভাবের দ্বারাও অভিভূত হইবে ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষ প্রভাবিত হইলেও, শ্রেণী বা দল প্রভাবিত হয় কিনা সন্দেহস্থল। কেন না, কোন শ্রেণী সমগ্রভাবে অপরপক্ষের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে না; এমন কি, যে সমস্ত সংবাদ তাহারা শুনিতে পায়, তাহা আংশিক ও বিকৃত। যাহাই ঘটুক না কেন, কোন দল প্রতিষ্ঠা ভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে, ইহা শুনিবামাত্র লোকের মনে স্বতঃস্ফূর্ত ক্রোধের সঞ্চার হয়; এবং এই ক্রোধ এত বেশী হয় যে অন্ত্যন্ত ছোটখাট ভাবাবেগ তাহার মধ্যে তলাইয়া যায়। সমাজের ভালর জগুই তাহাদের উন্নততর প্রতিষ্ঠা ও সুবিধা আবশ্যক, দীর্ঘকাল এই কথা যাহারা ভাবিতে অভ্যস্ত, তাহাদের কর্ণে বিপরীত যুক্তি, পাণীর কুযুক্তি বলিয়া মনে হয়। আইন, শৃঙ্খলা ও চিরাচরিত ব্যবস্থা রক্ষাই তাহাদের নিকট প্রধান ধর্ম্ম হইয়া উঠে এবং ঐগুলির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াই মহাপাপ।

হৃদয়ের পরিবর্তন না বলপ্রয়োগ

অতএব বিরুদ্ধ পক্ষের দিক হইতে হৃদয়ের পরিবর্তন অধিকদূর অগ্রসর হয় না। সময় সময় তাহাদের প্রতিপক্ষের বিনয় ও সাধুতাই তাহাদিগকে অধিকতর ক্রুদ্ধ করে; কেন না, উহাতে তাহাদেরই দোষী বলিয়া মনে হয়। যখন কোন ব্যক্তি সন্দেহ করে যে, তাহার স্বক্ষেই দোষ নিষ্ক্ষেপের চেষ্টা হইতেছে, তখন তাহার নৈতিক ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়। তৎসঙ্গেও অহিংস-নীতির প্রয়োগ কোশলের ফলে বিরুদ্ধ পক্ষের কতকগুলি লোক প্রভাবান্বিত হয় এবং তাহার ফলে বিরুদ্ধতার শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। তাহার উপর ইহা নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের সহানুভূতি আকর্ষণ করে; এবং জগতের মতামতের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার ইহা এক শক্তিশালী অস্ত্র। কিন্তু শাসক সম্প্রদায় সংবাদ গোপন করিতে পারেন অথবা বিরুদ্ধ করিতে পারেন, সে সম্ভাবনাও রহিয়াছে; কেন না, বাস্তবিক প্রতিক্রিয়াগুলি তাহাদেরই হাতে বলিয়া প্রকৃত ঘটনা প্রচার হওয়া অসম্ভব। যাহা হউক অহিংস উপায় লইয়া যে দেশে কাঁচা করা হয়, সেই দেশের অসংখ্য উদাসীন নরনারীর উপর ইহা দূরপ্রসারী ও গভীর প্রভাব বিস্তার করে। তাহাদের নিশ্চয়ই হৃদয়ের পরিবর্তন হয় এবং তাহারা ইহার অন্তর্কূলে উৎসাহী হইয়া উঠে; কিন্তু যাহারা সাধারণতঃ উদ্বেগকে সমর্থন করে, তাহাদের বেশী হৃদয়ের পরিবর্তন আবশ্যক করে না। কিন্তু যাহারা পরিবর্তনে ভয় পায় তাহাদের উপর প্রভাব তত স্পষ্ট নহে। ভারতে অসহযোগ ও নিরুপদ্রব প্রতিরোধের দ্রুত বিস্তার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, অহিংস আন্দোলন বিশাল জনসংখ্যার উপর কি আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করে এবং বহু সংশয়াতুরকে কি ভাবে বিশ্বাসী করিয়া তোলে। কিন্তু যাহারা সূচনা হইতেই ইহার প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন, তাহাদের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না। এমন কি, আন্দোলনের সাক্ষ্যে তাহারা অধিকতর ভীত হয় এবং অধিকতর শত্রুভাবাপন্ন হয়।

হিংসামূলক উপায়ে তাহার স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জগ্ন রাষ্ট্রের যুক্তিসঙ্গত অধিকার আছে, ইহা যদি স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে ঐ স্বাধীনতা অর্জন করিবার জগ্ন অনুরূপ হিংসা ও বলপ্রয়োগ অবলম্বন করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না কেন, স্বাধীনতা কঠিন। হিংসামূলক উপায় অবাস্তব ও অনুরূপগামী হইতে পারে, কিন্তু উহা সম্পূর্ণরূপে অমৌলিক ও নিষিদ্ধ হইতে পারে না। গভর্ণমেণ্টই সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী অংশ এবং সশস্ত্র সৈন্যদলের নিয়ামক বলিয়া হিংসামূলক উপায় প্রয়োগ করিবার অধিকার অস্ত্রের তুলনায় তাহার বেশী হইতে পারে না। অহিংস বিপ্লব সাফল্য লাভ করিয়া যদি রাষ্ট্রের রশ্মি হস্তগত করে, তাহা হইলে পূর্বে তাহার যাহা ছিল না,

জওহরলাল নেহরু

সেই বলপ্রয়োগের অধিকার কি সে তৎক্ষণাৎ লাভ করিবে? ইহার প্রভুত্বের বিরুদ্ধে যদি বিদ্রোহ হয়, তাহা হইলে কি দিয়া তাহা দমন করা হইবে? স্বভাবতঃই ইহা বলপ্রয়োগ করিতে অনিচ্ছুক হইবে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্তা মীমাংসার চেষ্টা করিবে, কিন্তু তাই বলিয়া সে তাহার বলপ্রয়োগের অধিকার ত্যাগ করিবে না। জনসাধারণের একাংশ নিশ্চয়ই পরিবর্তনের বিরোধী হইবে এবং পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইতে চেষ্টা করিবে। যদি তাহারা মনে করে যে, তাহাদের হিংসার বিরুদ্ধে নূতন রাষ্ট্র তাহার বলপ্রয়োগের শক্তিগুলি ব্যবহার করিবে না, তাহা হইলে তাহারা অধিকতর উৎসাহে উহা চালাইবে। অতএব মনে হয়, হিংসা ও অহিংসা, বলপ্রয়োগ ও হৃদয়ের পরিবর্তনের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট সীমারেখা নির্দেশ করা কঠিন। রাজনৈতিক পরিবর্তনের দিক দিয়া চিন্তা করিলে অসুবিধা ত আছেই; শোষণ ও শোষিত শ্রেণীর মধ্যে ইহা আরও শোচনীয়।

কোন আদর্শের জগৎ দুঃখবরণ সর্বদাই লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে; প্রতিঘাত না করিয়া এবং সঙ্কল্পত্যাগ না করিয়া কোন মহৎ উদ্দেশ্যের জগৎ দুঃখবরণের মধ্যে এক মহত্বের গরিমা আছে, যাহার নিকট অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা নত করিতে হয়। কিন্তু দুঃখের জগৎই দুঃখবরণের সহিত ইহার প্রভেদ অতি সামান্য, এবং এই শ্রেণীর আত্মনিগ্রহ বিষাদ-রোগে পর্য্যবসিত হয়, এমন কি, ইহাতে একটু অধঃপতনও হয়। হিংসা যদি সচরাচর অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতা হয়, তাহা হইলে অহিংসাও তাহার নিষ্ক্রিয়তার দিক দিয়া অন্ততঃ উহার বিপরীত দিকে ভুল করে। কাপুরুষতা ও অকর্মণ্যতার আবরণ রূপে এবং প্রচলিত ব্যবস্থা রক্ষা করিবার ইচ্ছাকে গোপন করিবার জগৎ অহিংসা ব্যবহৃত হইতে পারে, সর্বদাই এরূপ সম্ভাবনা আছে।

ভারতে কয়েক বৎসর হইতে, যখন হইতে সামাজিক পরিবর্তনের ভাব কিছু গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে, তখন হইতেই একদল লোক বলিয়া আসিতেছেন যে, বলপ্রয়োগ ব্যতীত এরূপ পরিবর্তন সম্ভব নহে, অতএব ওসব কথা না তোলাই ভাল। শ্রেণীসংঘর্ষের কথা (যদিও তাহা অতিমাত্রায় বিদ্যমান) উল্লেখ করা উচিত নহে। কেন না, তাহা সম্পূর্ণ সহযোগিতা—অহিংসার পথে উন্নতি অথবা ভবিষ্যতের যে লক্ষ্যই হউক না কেন, তাহার সহিত খাপ খায় না। কোন এক স্তরে বলপ্রয়োগ না করিয়া সামাজিক সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে না, ইহা সত্য, কেন না, সুবিধাভোগী সম্প্রদায় তাহাদের বর্তমান অবস্থা রক্ষা করিবার জগৎ নিশ্চয়ই হিংসা-নীতি অবলম্বন করিতে ইতস্ততঃ করিবে না। কিন্তু

হৃদয়ের পরিবর্তন না বলপ্রয়োগ

মতবাদের দিক দিয়া যদি অহিংস উপায়ে বৃহৎ রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্ভব হয়, তবে ঠিক সেই ভাবে উহা দ্বারা সামাজিক আনুল পরিবর্তন সম্ভব হইবে না কেন? অহিংস উপায়ে যদি আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে মুক্ত হইয়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারি, তাহা হইলে দেশীয় নৃপতিবৃন্দ, জমিদারগণ ও অগ্রাণু সামাজিক সমস্যাগুলি অল্পরূপ উপায়ে সমাধান করিয়া সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপন করিতে পারিব না কেন? এ সকলই অহিংস উপায়ে সম্ভব কি না, তাহা মুখ্য প্রশ্ন নহে। প্রধান কথা এই যে, এই উভয় উদ্দেশ্যই অহিংসাদ্বারা সিদ্ধ করা সম্ভব কি অসম্ভব। একথা নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে না যে, অহিংস উপায় কেবলমাত্র বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করিতে হইবে। দৃশ্যতঃ ইহা অধিকতর সহজে দেশের মধ্যে স্বদেশীয় স্বার্থপরতা ও বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কেন না অন্যান্য ক্ষেত্র অপেক্ষা তাহাদের চিন্তারাজ্যে উহার প্রভাব অধিকতর হইবে।

কেবল অহিংসার বিরোধী কল্পনা করিয়া, রাজনীতি বা কোন উদ্দেশ্যকে নিন্দা করার ভাব, ভারতে অধুনা দেখা যাইতেছে, আমার মতে সমস্যাগুলিকে সত্যদৃষ্টি দ্বারা না দেখিয়া উহা সম্পূর্ণ উন্ট দিক হইতে দেখিবার মত। ১৫ বৎসর পূর্বে আমরা অহিংস অসহযোগ গ্রহণ করিয়াছিলাম, কেন না উহা আমাদের সর্বোচ্চ বাঞ্ছনীয় ও সাফল্যের পথে লক্ষ্যস্থানে লইয়া যাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। তখন লক্ষ্য অহিংসা হইতে স্বতন্ত্র ছিল, উহা অহিংসার শাখামাত্রও ছিল না, অথবা অহিংসা হইতে উহা উদ্ভূত হয় নাই। তখন কেহই একথা বলিতে পারেন নাই যে, স্বাধীনতা বা অধীনতা পাশ ছেদন যদি কেবলমাত্র অহিংস উপায়ে সম্ভব হয়, তাহা হইলেই উহার জন্য চেষ্টা করা যাইতে পারে। কিন্তু এখন আমাদের লক্ষ্যক্ষেত্র অহিংসার মানদণ্ডে বিচার করা হইতেছে এবং যাহা অহিংসার সহিত সামঞ্জস্যহীন তাহা অগ্রাহ্য করা হইতেছে। এইভাবে অহিংসা এক অনমনীয় যুক্তিহীন গোঁড়ামীতে পরিণত হইতে চলিয়াছে, যাহার বিরুদ্ধে কোন প্রশ্নই তোলা সম্ভব নহে। ইহার ফলে বুদ্ধির উপর ইহা প্রভাব হারাইয়া ফেলিয়া ক্রমে বিশ্বাস ও ধর্মের কোর্টরে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। এমন কি, কায়েমী স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিরাও ইহা আঁকড়িয়া ধরিয়া, ইহাকে বর্তমান ব্যবস্থা রক্ষা করার অল্পকূলে ব্যবহার করিতেছে।

ইহা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা, কেন না আমি দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করি যে অহিংস প্রতিরোধ এবং অহিংসামূলক উপায় দ্বারা সংগ্রামের

জওহরলাল নেহরু

ভারতে অত্যন্ত উপযোগিতা রহিয়াছে; জগতের অন্যান্য অংশের পক্ষেও তাহা সম্ভব। গান্ধিজী আধুনিক চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগকে উহা বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত করিয়া এক মহৎ কাজ করিয়াছেন। আমি বিশ্বাস করি ইহার ভবিষ্যৎ মহান। এমনও হইতে পারে যে মহত্ত্বজ্ঞাতি ইহা সমগ্র ভাবে গ্রহণ করিবার মত উন্নত হয় নাই। এ, ই লিখিত “ইনটারপ্রেটাস” নাটকের একটি চরিত্রের মুখ দিয়া বলান হইয়াছে, “তুমি অন্ধের হস্তে দর্শনের মোমবাতি তুলিয়া দিতেছ; অন্ধ ইহা লাঠি ছাড়া আর কিরূপে ব্যবহার করিতে পারে?” বর্তমানে এই নূতন নীতি হয় ত বিশেষ কার্যকরী হইবে না, কিন্তু অন্যান্য মহৎভাবের মত ইহার প্রভাব বর্দ্ধিত হইবে এবং ইহা ক্রমশঃ আমাদের কর্ম নিয়ন্ত্রিত করিবে। অসহযোগ, কোন দুর্নীতিপূর্ণ রাষ্ট্র বা সমাজের সহিত সহযোগিতা করিতে অস্বীকার—এক শক্তিশালী এবং সক্রিয় ধারণা। এমন কি মুষ্টিমেয় চরিত্রবান ব্যক্তি যদি ইহা অবলম্বন করেন, তাহা হইলে উহার প্রভাব বিস্তৃত হয় এবং তাহা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অধিকাংশ ব্যক্তি যোগদান করিলে বাহ্যতঃ ইহা অধিক প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু তাহার ফলে মনের গতি অন্যান্য দিকে গিয়া নৈতিক একাগ্রতা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। বিতৃষ্ণার ফলে ইহার গভীরতা কমিয়া যায়। সমষ্টি মানব ক্রমশঃ ব্যক্তিকে পশ্চাতে ঠেলিয়া দেয়।

নির্ভাজ অহিংসার উপর অতি মাত্রায় জোর দেওয়ার ফলে ইহা জীবন হইতে স্বতন্ত্র ও দূরবর্তী হইয়া গিয়াছে, লোকে ইহা হয় অন্ধের মত ধর্ম-ভাবে অহুপ্রাণিত হইয়া গ্রহণ করে, অথবা একেবারেই গ্রহণ করে না। বুদ্ধিমান ব্যক্তির পশ্চাতে সরিয়া থাকেন। ১৯২০ সালে ইহা ভারতের টেররিষ্টদের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, অনেকে দলত্যাগ করিয়াছিলেন, ষাঁহারা তাহা করেন নাই তাঁহারাও সন্দেহাতুর হইয়া হিংসামূলক কার্য হইতে বিরত ছিলেন। কিন্তু আজ ইহাদের উপর উহার সে প্রভাব আর নাই। এমন কি, কংগ্রেসের মধ্যে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ষাঁহারা অসহযোগ ও নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনে প্রশংসার সহিত কার্য করিয়াছেন এবং অকৃত্রিম আগ্রহে অহিংসানীতি-সম্বন্ধ জীবন যাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, আজ তাঁহাদিগকে অবিশ্বাসী মনে করিয়া বলা হইতেছে যে, যখন তাঁহারা অহিংসাকে জীবনের মূলনীতি অথবা ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন, তখন কংগ্রেস-পন্থীরূপে তাঁহাদের থাকিবার প্রয়োজন নাই। অথবা যে একমাত্র লক্ষ্যের জন্ত উত্তম প্রকাশ করা তাঁহারা সার্থক বলিয়া বিবেচনা করেন,

হৃদয়ের পরিবর্তন না বলপ্রয়োগ

তাহা ত্যাগ করুন, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সকলের জ্ঞান সমান বিচার ও সমান সুবিধা, সুবিহীন সমাজ তখনই সম্ভব হইতে পারে, যখন অত্যাচার সম্পত্তির উপর অধিকার ও বিশেষ সুবিধাগুলি বিলুপ্ত হইবে। অবশ্য গান্ধিজী এক প্রবল শক্তিরূপেই বিद्यমান থাকিবেন, তাঁহার অহিংসা কর্মপ্রবণ ও আক্রমণশীল, কেহ জানে না, কখন তিনি সমস্ত দেশকে নূতন শক্তিতে অনুপ্রাণিত করিয়া আবার আন্দোলনে অগ্রগতি সঞ্চার করিবেন। সমস্ত মহত্ত্ব, সমস্ত স্ববিরোধিতা, জ্ঞানসাধারণকে অঙ্গুলী হেলনে পরিচালনা করিবার সমস্ত শক্তি লইয়া তিনি সাধারণ মাপকাঠির অনেক উর্দ্ধে। অপরকে বিচার করিবার মাপকাঠি দিয়া তাঁহাকে পরিমাপ করা যায় না, বিচার করা যায় না। তাঁহার অনুগামী বলিয়া যাঁহারা দাবী করেন, তাঁহাদের আনেকেই অকর্মণ্য শাস্তিবাদী অথচ টলষ্টয়-কথিত অ-প্রতিরোধী অথবা কোন সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়ের ভক্ত হইয়া পড়েন, জীবন ও বাস্তবের সহিত তাঁহাদের কোন খোঁগ থাকে না। এবং তাঁহাদের চারিদিকে এমন কতকগুলি দোক জড় হয়, যাঁহারা বর্তমান ব্যবস্থা রক্ষার জন্য উন্মুখ এবং সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অহিংসার আশ্রয় গ্রহণ করে। এই ভাবে সুবিধাবাদ দেখা দেয়, এবং প্রতিপক্ষকে স্বমতে আনয়ন করিতে গিয়া অহিংসা নীতির খাতিরে তাঁহারাই নিজেদের হৃদয়ের পরিবর্তন সাধন করেন এবং প্রতিপক্ষদলে গিয়া দণ্ডায়মান হন। যখন উৎসাহ কমিয়া আসে এবং আমরা দুর্বল হইয়া পড়ি, তখন একটু পিছু হটিয়া আপোষ করিতে ইচ্ছা হয় এবং তাহাকে প্রতিপক্ষের চিত্ত জয় করিবার কৌশল-রূপে অভিহিত করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করি। এবং সময় সময় আমরা আমাদের পুরাতন সহকর্মীদের ত্যাগ করিয়াই ঐটুকু লাভের লোভে ছুটিয়া যাই। আমরা পুরাতন সহকর্মীদের, যে সকল কথায় নূতন বন্ধুরা বিরক্ত হয় এবং তাহাদের বাড়াবাড়ির নিন্দা করি, এবং দলের ঐক্য নষ্ট করিবার জন্য তাহাদের উপর দোষারোপ করি। সমাজব্যবস্থার প্রকৃত পরিবর্তনের পরিবর্তে, বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যেই, দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়; কায়েমী স্বার্থ সংক্ষেপে কোন উচ্চবাচ্য করা হয় না।

উপায়ের গুরুত্বের উপর অধিক জোর দিয়া গান্ধিজী এক মহৎ কার্য করিয়াছেন, সে সংক্ষেপে আমি নিঃসন্দেহ। তথাপি আমার মনে হয় উদ্দেশ্য বা অভিপ্রেত লক্ষ্যের উপরও পরিণামে অনুরূপ জোর দিবার নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। যদি আমরা উহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের অবস্থা লক্ষ্যহীন পথিকের মত হইবে, কতকগুলি অবাস্তব বিষয় লইয়া আমরা বৃথা শক্তিক্ষয় করিব। কিন্তু উপায়কেও

জওহরলাল নেহরু

অবজ্ঞা করা যায় না, কেন না নৈতিক দিক ছাড়াও উহার একটি কার্যকরী দিক আছে। মন্দ ও দুর্নীতিপূর্ণ উপায় গ্রহণ করিলে অভিপ্রেত উদ্দেশ্য পণ্ড হইয়া যায়, অথবা নব নব সমস্যা তীব্রভাবে দেখা দেয়। যাহাই হউক, আমরা মানুষকে তাহার ঘোষিত উদ্দেশ্য দিয়া নহে, তাহার অবলম্বিত উপায় দিয়াই বিচার করিয়া থাকি। যে উপায় অবলম্বন করিলে অনাবশ্যক সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, ঘৃণা ও বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে, তাহা লক্ষ্যকে দূরবর্তী ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ কঠিন করিয়া তোলে। উপায় ও উদ্দেশ্য অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে জড়িত, উভয়কে পৃথক করা যায় না। অতএব উপায় প্রধানতঃ এমন হওয়া উচিত, যাহা সংঘর্ষ ও ঘৃণাকে উগ্র হইতে দিবে না, অন্ততঃপক্ষে উহাকে যথাসাধ্য নির্দিষ্ট সীমার (কেন না, কিয়ৎপরিমাণে উহা অপরিহার্য) মধ্যে রাখিতে চেষ্টা করিবে এবং সদিচ্ছা জাগ্রত করিতে প্রয়াসী হইবে। ইহা কোন নির্দিষ্ট কার্যপ্রণালী অপেক্ষা ব্যক্তির অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য ও প্রকৃতির উপরই অধিক নির্ভর করে। এই মূল অভিপ্রায়কেই গান্ধিজী অপিকতর গুরুত্ব দিয়া থাকেন, এবং যদি তিনি মনুষ্য-চরিত্রে কোন বৃহৎ পরিবর্তন সাধনে অকৃতকার্য হইয়া থাকেন, তাহা হইলেও লক্ষ লক্ষ নরনারী চালিত বিরাট জাতীয় আন্দোলনকে ঐ অভিপ্রায় দ্বারা অনুপ্রাণিত করিতে তিনি আশ্চর্য সাফল্য লাভ করিয়াছেন। তিনি যে নৈতিক সংযম দাবী করেন, তাহারও বিশেষ প্রয়োজন আছে, তবে তাঁহার ব্যক্তিগত সংযমের আদর্শ, সম্ভবতঃ তর্কের বিষয়। তিনি আত্মগত পাপ ও দুর্বলতার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেন, অথচ সামাজিক পাপগুলি প্রায় লক্ষ্যই করেন না। এই শৃঙ্খলা ও সংযমের প্রয়োজন আছে সন্দেহ নাই; কেন না, এই মরুভূমি ত্যাগ করিয়া সুবিধাভোগী শ্রেণীর সহিত যোগ দিয়া প্রতিষ্ঠালাভের প্রলোভন অনেক কংগ্রেসপন্থীকে সরাইয়া লইয়া গিয়াছে। কেন না, বিশিষ্ট কংগ্রেস-সেবীদের জ্ঞান অনুগ্রহের দ্বার সর্বদাই খোলা।

সমগ্র জগৎ আজ বহুবিধ সংকটের সম্মুখীন, কিন্তু মানবের প্রাণশক্তি ও নৃজ্ঞানীপ্রতিভার সঙ্কটই ইহার মধ্যে প্রধান। প্রাচ্যে ইহা অধিকতর প্রবল, কেন না, অধুনা অগ্রাগ্র দেশ অপেক্ষা এশিয়ায় অতি দ্রুত পরিবর্তন চলিয়াছে এবং ইহার সহিত সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টার বেদনা প্রচুর। যে রাজনৈতিক সমস্যা আমরা অত্যন্ত মুখ্যরূপে দেখিতেছি, ইহার সহিত তুলনায় তাহার গুরুত্ব বেশী নহে, যদি আমাদের নিকট ইহাই প্রাথমিক সমস্যা এবং ইহার সম্ভাষণজনক সমাধান ব্যতীত প্রকৃত প্রশ্নগুলিতে আমরা হস্তক্ষেপই করিতে পারিব না। যুগ যুগান্ত ধরিয়া আমরা এক পরিবর্তনহীন ভিত্তির উপর

হৃদয়ের পরিবর্তন না বলপ্রয়োগ

প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থায় অভ্যস্ত, এবং আমাদের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাস যে সমাজের উহাই সম্ভবপর ও সঙ্গত ভিত্তি এবং আমাদের জ্ঞান অজ্ঞানের ধারণাগুলিও উহার সহিত জড়িত। কিন্তু এই অতীত ভিত্তির উপর বর্তমানকে প্রতিষ্ঠা করিবার আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে; উহা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। আমেরিকান অর্থনীতিবিদ ভেবলেন লিখিয়াছেন, “রেমে অর্থনৈতিক সমীতি, অর্থনৈতিক প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে।” বর্তমান প্রয়োজনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া নূতন নীতি আমাদের কাছে নির্ণয় করিয়া লইতে হইবে। যদি আমরা জীবনের এই সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতির পথ খুঁজিতে চাহি, যদি বর্তমানযুগের প্রকৃত আত্মোন্নতির মূল্য বুঝিতে চাহি, তাহা হইলে আমাদের সবার সাহসের সহিত সমস্যাগুলির সম্মুখীন হইতে হইবে। কোন ধর্মের অর্থোত্তিক মতবাদের গোড়ামীর মধ্যে আশ্রয় খুঁজিলে চলিবে না। ধর্ম যাহা বলে তাহা ভাল বা মন্দ হইতে পারে; কিন্তু ইহা যে ভাবে বলে এবং আমাদের কাছে বিশ্বাস করিতে বলে, তাহা নিশ্চয়ই কোন সমস্যাকে বুদ্ধির দিক দিয়া বিচার করিতে সহায়তা করে না। ধর্মের বিচার-নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে যেমন ফ্রেড বলিয়াছেন, “উহা বিশ্বাস করিতেই হইবে, প্রথমতঃ যেহেতু আমাদের আদিম পূর্বপুরুষেরা উহা বিশ্বাস করিতেন, দ্বিতীয়তঃ, অতি প্রাচীন কাল হইতে পরম্পরাক্রমে উহার প্রমাণ আমাদের হাতে আছে, এবং তৃতীয়তঃ যেহেতু ঐগুলির সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা একেবারেই নিষিদ্ধ।” (দি ফিউচার অফ্‌ এন ইলিউশান)

যদি আমরা অহিংসা ও তৎসংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলি ধর্ম বা অনুরূপ মতবাদের দিক হইতে বিবেচনা করি, তাহা হইলে তর্ক করিবার কিছুই থাকে না। কোন সমস্যার সঙ্গীর্ণ মতবাদে উহা পর্যাবসিত হইলে লোকে উহা গ্রহণ করিতেও পারে, নাও পারে। উহার কার্যকরী শক্তি ইহাতে হ্রাস হয় এবং বর্তমান সমস্যাগুলিতে উহার প্রয়োগের সার্থকতা থাকে না। কিন্তু বর্তমান অবস্থার উপযোগী ভাবে যদি আমরা উহা লইয়া আলোচনা করি, তাহা হইলে এই জগতের পুনর্গঠন চেষ্টায় বহুল পরিমাণে উহা হইতে সাহায্য পাইব। সমষ্টি মানবের দুর্বলতা ও প্রকৃতির কথা মনে রাখিয়াই এই বিবেচনা করিতে হইবে। যে কোন ব্যাপক কাজ, বিশেষতঃ আমূল পরিবর্তনমূলক বৈপ্লবিক কার্যপদ্ধতি, কেবল নেতাদের চিন্তাধারার উপর নির্ভর করে না, বর্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরও উহা নির্ভর করে, বেকীর ভাগ নির্ভর করে, যে সকল মানুষ লইয়া তাঁহারা কাজ করেন, তাহাদের মনোভাবের উপর।

জগতের ইতিহাসে হিংসানীতির অভিনয় বহুবার হইয়া গিয়াছে। বর্তমানেও ইহা সমান প্রবল, সম্ভবতঃ আরও দীর্ঘকাল ইহা ঐরূপই থাকিবে।

জওহরলাল নেহরু

হিংসা ও বলপূর্বক বাধ্য করিয়াই অতীতের প্রায় অধিকাংশ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। ডাবুউ, ই, গ্লাডষ্টোন একদা বলিয়াছিলেন, “আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি, রাজনৈতিক সঙ্কটের সময় এই দেশের জনসাধারণকে আর কোন উপদেশ না দিয়া যদি বলা হইত যে, হিংসাকে ঘৃণা করিতে তুলিও না, শৃঙ্খলা ভালবাসিও, সর্বদা ধৈর্য্যাবলম্বন করিও, তাহা হইলে এই দেশ কখনও স্বাধীনতা পাইত না।”

অতীত ও বর্তমানে হিংসানীতির গুরুত্ব তুলিয়া থাকা অসম্ভব; তাহা হইলে জীবনকেই অস্বীকার করিতে হয়। তথাপি হিংসা মন্দ এবং ইহা অশেষ অকলাণের প্রসূতি। ঘৃণা, নিষ্ঠুরতা, প্রতিশোধ প্রবৃত্তি এবং শাস্তির ভাব হিংসা হইতেও শোচনীয়, কিন্তু এইগুলি প্রায়ই হিংসার সহিত জড়িত থাকে। হিংসা স্বরূপতঃ মন্দ না হইলেও ঐ সকল উদ্দেশ্যের জগৎ মন্দ হইয়া পড়ে। ঐ সকল উদ্দেশ্য ব্যতীতও হিংসা সম্ভব এবং তাহার ভাল মন্দ দুই উদ্দেশ্যই থাকিতে পারে। কিন্তু ঐ সকল উদ্দেশ্য হইতে হিংসাকে স্বতন্ত্র করা অতিমাত্রায় কঠিন, অতএব যথাসম্ভব হিংসাকে পরিহার করাই ভাল। অবশ্য ইহাকে বর্জন করিতে গিয়া কেহ নিষ্ক্রিয় হইয়া অগ্রাগ্র অথবা অধিকতর অগ্রায় সম্বন্ধ করিতে পারে না। হিংসার নিকট বশতা স্বীকার অথবা হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত শাসনপদ্ধতি গ্রহণ, অহিংসানীতির মূলতত্ত্ব অস্বীকারেরই নামান্তর। অহিংস উপায়ের যৌক্তিকতা প্রমাণ করিতে হইলে উহাকে অতিমাত্রায় ক্রিয়াশীল এবং রাষ্ট্র বা সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনে সক্ষম করিতে হইবে।

উহা দ্বারা সম্ভব কিনা তাহা আমি জানি না। আমার মনে হয় ইহা আমাদের অনেক দূর লইয়া যাইতে পারে, তবে ইহা দ্বারা চরম লক্ষ্যে পৌঁছান সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে। যে ভাবেই হউক, কিছু না কিছু বলপ্রয়োগ অপরিহার্য বলিয়াই মনে হয়, কেন না ক্ষমতা ও সুবিধা তাহাদের হাতে তাহারা বলপূর্বক বাধ্য না হইলে উহা ছাড়িতে চাহিবে না অথবা যতদিন পর্যন্ত না এমন অবস্থা সৃষ্টি করা যায় যে, ক্ষমতা ও সুবিধা ছাড়িয়া দেওয়া অপেক্ষা হাতে রাখাই তাহাদের পক্ষে অধিকতর বিপজ্জনক, ততদিন বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হইবে। বর্তমানে সমাজে যে দ্বন্দ্ব চলিয়াছে,—জাতীয় ও শ্রেণী সংঘর্ষগুলি বলপ্রয়োগ ব্যতীত সমাধান হইবে না। ব্যাপকভাবে জন্মের যে পরিবর্তন আবশ্যক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেন না, উহা ব্যতীত সামাজিক পরিবর্তনের আন্দোলনের অগ্র কোন ভিত্তি নাই। কিন্তু কিয়দংশের উপর বলপ্রয়োগ করিতেই হইবে। মূলে যে সকল সংঘর্ষ রহিয়াছে, সেগুলি ঢাকিয়া রাখিয়া, তাহাদের অস্তিত্ব বিস্মৃত হইবার চেষ্টা আমাদের পক্ষে শুভ নহে। ইহা কেবল সত্য গোপন করা নহে, ইহা

কমন্সের পরিবর্তন না বলপ্রয়োগ

বর্তমান ব্যবস্থাকে ঠেলিয়া উপরে তুলিয়া প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা এবং শাসক সম্প্রদায় তাহাদের বিশেষ সুবিধাগুলির যৌক্তিকতা প্রমাণ করার জন্য যে নৈতিক ভিত্তি অন্বেষণ করেন, ইহা তাহাই জোগাইয়া দেওয়া। অত্যাধিক ব্যবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে হইলে উহা যে সকল মিথ্যা প্রতিশ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা উদ্ঘাটিত করিতে হইবে এবং উহার স্বরূপমূর্তি প্রকাশ করিতে হইবে। অসহযোগের একটা প্রধান গুণ এই যে, উহা ঐ সকল মিথ্যা প্রতিশ্রুতির স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া দেয়,—এবং ঐগুলির বশত স্বীকার অথবা উহা কায়েম রাখিবার জন্য সহযোগিতা না করার ফলে মিথ্যাগুলি প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

আমাদের চরম উদ্দেশ্য হইল শ্রেণীবর্জিত সমাজ—যেখানে সকলের অর্থনৈতিক সুবিচার ও সুবিধা সমান হইবে। সমাজ এমন ভিত্তির উপর পরিকল্পনা করিতে হইবে যাহা মনুষ্যজাতিকে সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতির উন্নততর স্তরে লইয়া যাইবে, মানসিক উৎকর্ষ বিধানের ব্যবস্থা করিবে, সহযোগিতা, নিঃস্বার্থপরতা ও সেবার ভাবে অনুপ্রাণিত করিবে, সদিচ্ছা, প্রেম ও প্রকৃত কাজ করার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিবে—পরিণামে যাহা সমগ্র জগতের ব্যবস্থায় পরিণত হইবে। সম্ভব হইলে ভদ্রভাবে, প্রয়োজন হইলে বলপূর্বক ইহার পথের প্রত্যেকটি বাধা অপসারিত করিতে হইবে। বলপ্রয়োগ যে প্রায়ই দরকার হইবে, সে সম্বন্ধে অল্প সন্দেহই আছে। কিন্তু যদি বলপ্রয়োগের প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তাহা ঘৃণা বা নিষ্ঠুরতার সহিত প্রয়োগ করা উচিত নহে, কেবল বাধা অপসারণের উদ্দেশ্যজন্যই আকাঙ্ক্ষা লইয়াই প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহা অতি কঠিন। ইহা সহজ কাজ নহে; কিন্তু সহজ পথও নাই;—পতনের গহ্বর অগণিত। কিন্তু বাধা বিঘ্ন পতনের গহ্বর, আমরা ভুলিবার ভাণ করিলেই অন্তর্হিত হইবে না; বরং তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিয়া লইয়া সাহসের সহিত উহার সম্মুখীন হইতে হইবে। এ সকলই অবাস্তব কল্পনা বলিয়া মনে হইবে, এবং এই সকল মহৎ ভাব বহুলোকের চিত্ত বিগলিত করিবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু এগুলি আমাদের সম্মুখে রাখিতে হইবে, ইহার উপর জোর দিতে হইবে এবং এমনও হইতে পারে যে, যে সকল ঘৃণা ও রিপূর আবেগে আমরা বশীভূত, তাহা ধীরে ধীরে শিথিল হইবে।

আমাদের উপায়গুলি ঐ লক্ষ্যের অনুকূল এবং ঐ মনোভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু আমাদের স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইবে যে, জনসাধারণের মধ্যে মানব প্রকৃতি যে রূপ, তাহাতে সর্বদাই তাহারা

জওহরলাল নেহরু

আমাদের আবেদন ও অনুরোধে কর্ণপাত করিবে না অথবা উচ্চাঙ্গের নৈতিক আদর্শানুযায়ীও কার্য্য করিবে না। হৃদয়ের পরিবর্তনের সহিত বলপ্রয়োগে বাধ্য করিবারও প্রয়োজন হইবে; তবে আমরা এই মাত্র করিতে পারি যে, বলপ্রয়োগে বাধ্য করিবার কালে যতটা সম্ভব সীমাবদ্ধরূপে এমন ভাবে উহা প্রয়োগ করিতে হইবে, যাহাতে অত্যাশঙ্কনীয় ঘটনাসম্ভব কম হয়।

৬৪

পুনরায় দেরা জেলে

আলীপুর জেলে আমার শরীর ভাল ছিল না। আমার শরীরের ওজন অনেক কমিয়া গেল। কলিকাতায় গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি কাতর হইয়া পড়িলাম। অপেক্ষাকৃত ভাল স্থানে আমাকে বদলী করার গুজব শুনিলাম। ৭ই মে আমাকে জিনিষপত্র গুছাইয়া জেলের বাহির হইবার নির্দেশ দেওয়া হইল। আমাকে দেরাডুন জেলে পাঠান হইতেছে। কয়েকমাস অপরিচরিত নিষ্কিন্তায় বাস করিবার পর, কলিকাতার মধ্য দিয়া মোটরে সাক্ষ্য-সমীক্ষণ অতিশয় ভাল লাগিল; বৃহৎ হাওড়া স্টেশনের জনতা দেখিয়াও মুগ্ধ হইলাম।

এই বদলীতে আমি আনন্দিত হইলাম, এবং দেরাডুন ও সম্বন্ধিত পৰ্ব্বতমালায় জন্ম ব্যাকুল হইলাম। আমি উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, এখান হইতে নয় মাস পূর্বে আমি যখন নৈনী গিয়াছিলাম, তখনকার ব্যবস্থা আর নাহি। একটি পুরাতন গোশালা পরিষ্কার করিয়া ও সাজাইয়া আমার নূতন বাসস্থান নির্দিষ্ট করা হইল।

‘সেল’ হিসাবে ইহা মন্দ নহে, ইহার সহিত একটি ছোট বারান্দাও ছিল। সংলগ্ন উঠানটিও প্রায় পঞ্চাশ ফিট লম্বা হইবে। আমার দেরাডুনের পুরাতন বাসস্থান অপেক্ষা ইহা ভালই মনে হইল, কিন্তু কয়েকদিন পরেই বুঝিতে পারিলাম,—অনেকগুলি পরিবর্তন মোটেই ভাল হয় নাই। চারিদিকে দশ ফুট উচ্চ প্রাচীর আমার সুবিধার জন্ম আরও ৪৫ ফুট উচ্চ করা হইয়াছে। ফলে আমার আকাজক্ষিত পৰ্ব্বতের দৃশ্য একেবারেই ঢাকা পড়িয়াছে, কয়েকটি গাছের মাথা দেখা যায় মাত্র। এই জেলে

পুলরায় দেৱা জেলে

তিন মাস কাটাইবার পূৰ্ণ একবার চকিতেও কৰ্ত দৰ্শন কৰিতে পাবিলাম না। পূৰ্ব্ববাবুৰে মত বাহিৰে গিয়া জেলেৰ দৰজা পৰ্য্যন্ত আমাকে ভ্ৰমণ কৰিতে দেওয়া হইত না। ব্যায়ামেৰ পক্ষে আমাৰ ক্ষুদ্ৰ উঠানটাই যথেষ্ট বিবেচিত হইয়াছিল।

এই সকল ও অগ্ৰাণ্ণ নূতন বিধি-নিষেধে আমি অত্যন্ত বিৰক্ত ও নিরাশ হইলাম। আমি অধীৰ হইয়া উঠিলাম, এমন কি, আমাৰ উঠানে সামান্য ব্যায়াম কৰাৰ অধিকাৰ থাকা সত্ত্বেও উহাতে আমাৰ প্ৰৱৃতি হইল না। সমগ্ৰ জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন এমন নিঃসঙ্গ নিৰ্জনতা আমি জীৱনে কমই অনুভৱ কৰিয়াছি। এই নিৰ্জন কাৰাবাস আমাৰ পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল, আমাৰ দৈহিক ও মানসিক অবস্থাৰ অবনতি হইতে লাগিল। আমাৰ মনে হইতে লাগিল, প্ৰাচীৰেৰ অপৰ দিকে কয়েক গজ দূৰেই নিৰ্মল মুক্ত বায়ু, ফুলেৰ সুবাস, মাটি ও তৃণেৰ গন্ধ, দীপ কান্তাৰ ও গিৰিমালা। কিন্তু উহা আমাৰ আয়ত্তেৰ বাহিৰে, সৰ্বদা প্ৰাচীৰে দৃষ্টি প্ৰতিহত হইয়া আমাৰ চক্ষুৰ ভাৱাঙ্গস্ত ও ক্লান্ত হইয়া উঠিল। এমন কি কাৰাজীৱনেৰ নিত্যনৈমিত্তিক কোলাহলও আমাৰ কানে আসিত না, —আমাকে দূৰে সৰাইয়া স্বতন্ত্ৰভাবে রাখা হইয়াছিল।

ছয় সপ্তাহ পৰেই গ্ৰীষ্ম শেষ হইয়া বৰ্ষা আসিল,—মূলধাৰে বৃষ্টি। প্ৰথম সপ্তাহেই বৰ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হইল। আবহাওয়ায় পৰিবৰ্তন দেখা দিল,—যেন নব জীৱনেৰ কানাকানি চলিয়াছে—শীতল বাতাসে শৰীৰ জুড়াইল। কিন্তু চক্ষু ও মনেৰ কোন আৰাম মিলিল না। সময় সময় আমাৰ ইয়াৰ্ডেৰ লৌহদ্বাৰ খুলিয়া এক জন ওয়াৰ্ডাৰ যাতায়াত কৰিত—তখন কয়েক মুহূৰ্তেৰ জন্ত চকিতে বহিৰ্জগৎ দেখিতে পাইতাম—সবুজ ক্ষেত্ৰ এবং তৰুশ্ৰেণী, মুক্তাবলীৰ মত বাৰিবিব্দু শোভিত হইয়া যৌদ্ৰালোকে অপূৰ্ণ শোভা ধারণ কৰিয়াছে—কিন্তু কেবল মুহূৰ্তেৰ জন্ত, পৰক্ষণেই উহা বিহ্বলচমকেৰ মত মিলাইয়া যাইত। দৰজাটি কখনও সম্পূৰ্ণ উন্মুক্ত কৰা হইত না। বেশ বৃষ্টিতে পাৰিতাম; ওয়াৰ্ডাৰেৰ উপৰ আদেশ ছিল যে আমি নিকটে দাঁড়াইয়া থাকিলে দৰজাটি যেন না খোলা হয়, খুলিলেও, একটা মানুহ প্ৰবেশ কৰিতে পাৰে তাহাৰ বেশী ফাঁক যেন না বন্ধ হয়। বাহিৰেৰ মুক্ত সবুজ শোভা ক্ষণিকেৰ জন্ত দৰ্শন কৰিয়া আমাৰ তৃপ্তি হইত না। অথচ উহা আমাৰ চিত্তে গৃহে প্ৰত্যাবৰ্তনেৰ আকাঙ্ক্ষা জাগাইত, মন্তকে বেদনা অনুভৱ কৰিতাম, এবং দৰজা খোলা হইলেও আমি ইচ্ছা কৰিয়াই সে দিকে তাকাইতাম না।

অবশ্য আমাৰ এই সকল মনোবেদনাৰ জন্ত কাৰাগাৰট দায়ী নহে,

জওহরলাল নেহরু

উহাতে তীব্রতা বাড়িয়াছে মাত্র। ইহা বাহিরের ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়া—কমলার রোগ এবং আমার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, কমলা পুনরায় তাঁহার পুরাতন রোগের দ্বারা কবলিত, এ সময় তাঁহার কোন কাজে লাগিতে পারিলাম না ভাবিয়া এক অসহায় বেদনা অনুভব করিতে লাগিলাম। আমি এ সময় তাঁহার নিকটে থাকিলে তিনি অনেক উপশম বোধ করিতেন।

আলীপুরে যাহা পাইতাম না, দেৱাদুনে আসিয়া সেই দৈনিক সংবাদপত্র পাইতে লাগিলাম এবং ইহাতে বাহিরের রাজনৈতিক ও অন্যান্য ঘটনার সহিত আমি যোগসূত্র রক্ষা করিতে পারিতাম। প্রায় তিন বৎসর পর পাটনায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন (ইহা পূর্বে বে-আইনীই ছিল) আহূত হইল; ইহার বিবরণ পাঠ করিয়া আমি বিস্ময় হইলাম। আমি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, এই প্রথম অধিবেশনে ভারত ও পৃথিবীতে এত ঘটনা ঘটার পরও, বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার কোন চেষ্টা হইল না। গতানুগতিকতা হইতে মুক্ত হইবার জন্য কোন বিশদ আলোচনা হইল না। দূর হইতে গান্ধিজী আমার নিকট প্রাচীন ডিক্টেটরী মূর্তিতে প্রতিভাত হইলেন। তিনি বলিলেন, “আমার নেতৃত্ব যদি তোমরা গ্রহণ করিতে চাহ তাহা হইলে আমার সর্ব মানিতে হইবে।” তাঁহার এই দাবী সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, কেন না, আমরা তাঁহার নেতৃত্ব চাহিব এবং তাঁহাকে তাঁহার স্বকীয় গভীর বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে বলিব, এরূপ হয় না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মনে হইল, যেন উপর হইতে একটা ব্যবস্থা চাপাইয়া দেওয়া হইল, পরস্পরের আলোচনা ও ভাব বিনিময় দ্বারা কোন কর্ম্মপন্থা নির্ণয় করা হইল না। গান্ধিজী লোকের মনের উপর আধিপত্য করেন, আবার তিনিই জনসাধারণ অসহায় বলিয়া অভিযোগ করেন, ইহা আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়। আমার মনে হয়, তাঁহার মত জনসাধারণের আহুগত্য ও গভীর শ্রদ্ধা অতি অল্প লোকেই লাভ করিয়াছেন,—তিনি যে উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, জনসাধারণ তাহার যোগ্য হইতে পারে নাই বলিয়া তাহাদের নিন্দা করা, আমার বিবেচনায় সঙ্গত নহে। এমন কি পাটনার সভায় তিনি শেষ পর্য্যন্ত থাকিলেন না, তাঁহার হরিজন আন্দোলন উপলক্ষ্যে ভ্রমণে চলিয়া গেলেন। তিনি নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতিতে তৎপরতার সহিত কার্য্যকরী সমিতির প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়া সভা ত্যাগ করিলেন।

সম্ভবতঃ ইহা সত্য যে দীর্ঘ আলোচনায় অবস্থার বেশী উন্নতি হইত

পুনরায় দেয়া জেলে

না। সকলেই যেন হতবুদ্ধি, সদস্যদের চিন্তা যেন আচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট; অনেকে সমালোচনা করিতে উন্মুখ থাকিলেও, কাহারও কোন গঠনমূলক প্রস্তাব ছিল না। অবস্থাধীনে ইহা স্বাভাবিক, কেন না, সংঘর্ষের ভাৱের অধিকাংশ বিভিন্ন প্রদেশের এই সকল নেতার স্বল্পে পতিত হইয়াছিল; তাঁহারাও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের মনও সতেজ ছিল না। তাঁহারা অস্পষ্টভাবে অনুভব করিতেছিলেন যে, তাঁহাদেরকে সংঘর্ষের অবসান ঘোষণা করিয়া নিরুপদ্রব প্রতিরোধ বন্ধ করিতে হইবে, কিন্তু তাহার পর? দুইটি দল দেখা গেল; একদল আইন সভার মধ্যে নিছক নিয়মতান্ত্রিক কার্যপদ্ধতির জন্ত লালায়িত, অল্পদল সমাজতান্ত্রিক দিক দিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অধিকাংশ সদস্য এ দুই-এর কোন দলই ভূত নহেন। নিয়মতান্ত্রিকতায় প্রত্যাভর্তনও তাঁহাদের মনঃপূত হইল না, পক্ষান্তরে সমাজতন্ত্রবাদ দেখিয়াও তাঁহারা ভীত হইলেন, ভাবিলেন ইহাকে প্রশ্রয় দিলে কংগ্রেসের মধ্যে ভেদ দেখা দিবে। তাঁহাদের কোন গঠনমূলক ধারণা ছিল না, তাঁহাদের একমাত্র আশা ও ভরসা স্থল গান্ধিজী। পূর্বের মতই তাঁহারা গান্ধিজীর মুখাপেক্ষী হইয়া তাঁহার অগ্রগামী হইলেন, যদিও অনেকেই মনে মনে গান্ধিজীর মতে সায় দিতে পারিলেন না। নিয়মতান্ত্রিক মডারেটগণ গান্ধিজীর সমর্থন পাইয়া নিঃশঙ্কঃ রাষ্ট্রীয় সমিতি ও কংগ্রেসের উপর প্রভাব বিস্তার করিলেন।

যাহা অপ্ৰত্যাশিত তাহাই ঘটিল। কিন্তু আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম, প্রতিক্রিয়ার মুখে কংগ্রেস তদপেক্ষাও অধিক পিছাইয়া পড়িল। অসহযোগের পর গত পনের বৎসরের মধ্যে কখনও কংগ্রেস নেতারা এমন অতি-নিয়মতান্ত্রিক কাণ্ডদায় কথা বলেন নাই। এমন কি বিংশ দশকের মধ্যভাগে প্রতিক্রিয়া হইতে উদ্ভূত স্বরাজ্য দলও, এই নবীন নেতৃমণ্ডলী অপেক্ষা বহু অগ্রগামী ছিলেন এবং স্বরাজ্যদলের প্রথর ব্যক্তিত্বশালী নেতৃত্বও বর্তমান ক্ষেত্রে ছিল না। বর্তমানে বিপদের সম্ভাবনা ছিল, ততদিন যাহারা সাবধানতার সহিত দূরে সরিয়া ছিলেন, আজ তাহারা ই আসিয়া হোমরা-চোমরা হইয়া উঠিলেন।

গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের উপর হইতে বিধিনিষেধ তুলিয়া লইলেন, উহা পুনরায় বৈধ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল। কিন্তু কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট ও অনুগামী বহু প্রতিষ্ঠান বে-আইনী হইয়া রহিল। কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী 'সেবাদল', বহু কৃষকসভা, ছাত্রসমিতি, যুবকসমিতি, এমন কি, কতকগুলি শিশুদের সমিতি পর্যন্ত বে-আইনী হইয়া রহিল। এই সঙ্গে সীমান্ত প্রদেশের "খোদাই খিদমৎগার" দল বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য। এই প্রতিষ্ঠানটি সীমান্ত প্রদেশের প্রতিনিধিরূপে ১৯৩১ সাল হইতে কংগ্রেসের অন্যতম শাখায় পরিণত হইয়াছিল। অতএব, কংগ্রেস যদিও প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক কার্যপ্রণালী পরিত্যাগ করিয়া নিয়মতান্ত্রিক উপায় পুনরায় গ্রহণ করিল, তথাপি গভর্নমেন্ট আইন অমান্য আন্দোলনের জন্ত রচিত বিশেষ আইনগুলি প্রত্যাহার করিলেন না এবং কংগ্রেসের বহুতর শাখাপ্রশাখা বে-আইনী করিয়া রাখিলেন। কৃষক ও শ্রমিকদের প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষভাবে দমন করিবার ব্যবস্থা করা হইল, অথচ বড় বড় সরকারী কর্মচারীরা তখন জমিদার ও ভূস্বামিবর্গকে সম্মুখীন হইবার জন্ত উৎসাহিত করিতে লাগিলেন, ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেল। জমিদার সভাগুলিকে সকল প্রকার সুবিধা দেওয়া হইতে লাগিল। যুক্ত-প্রদেশের দুইটি প্রধান সভার চাঁদা, সরকারের সহায়তায় খাজনা বা ট্যাক্সের সহিত একত্র আদায়ের ব্যবস্থা হইল।

আমার আশঙ্কা হয়, কি হিন্দু, কি মুসলমান কোন সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের উপর আমার কোন পক্ষপাতিত্ব নাই, তথাপি একটি ঘটনায় হিন্দুমহাসভার প্রতি আমার চিত্র বিশেষভাবে তিক্ত হইয়া উঠিল। উহার একজন সম্পাদক ‘লালকোর্ভা দল’ বে-আইনী প্রতিষ্ঠান ঘোষণা করার সমর্থন করিয়া গভর্নমেন্টের কার্যের প্রশংসা করিলেন। যখন কোন আক্রমণশীল আন্দোলন নাই, তখন জনসাধারণের প্রাথমিক রাষ্ট্রিকের অধিকার বঞ্চিত করার ব্যবস্থার এই সমর্থনে আমি বিস্মিত হইলাম। এই সকল মনোভাবের কথা ছাড়িয়া দিলেও, সংঘর্ষের কালে কয়েক বৎসর সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসীরা আশ্চর্য্য ক্রুতিত্বের সহিত কার্য্য করিয়াছে, ইহা সর্বজনবিদিত এবং তাহাদের নেতা, যিনি এখনও অনির্দিষ্টকালের জন্ত রাজবন্দী, তিনি ভারতের একজন সাহসী ও শক্তিশালী সন্তান। আমার মনে হইল সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ইহার অধিক আর কি অগ্রসর হইতে পারে! আমি প্রত্যাশা করিলাম যে হিন্দুমহাসভার নেতারা, উহার সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিবেন। কিন্তু, আমি যতদূর জানি কেহই সেরূপ কিছু করিলেন না।

হিন্দুসভার সম্পাদকের বিবৃতিতে আমি অত্যন্ত বিচলিত হইলাম। ইহা নিশ্চয়ই মন্দ কিন্তু আমি ইহার মধ্যে দেখিলাম, দেশের নূতন হাওয়া কোন দিকে বহিতেছে। গ্রীষ্মের অপরাহ্নের উত্তাপে আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়াছি, এমন সময় আমি এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলাম। যেন আব্দুল গফুর খাঁ চারিদিক হইতে আক্রান্ত হইয়াছেন এবং আমি তাঁহাকে রক্ষা করিতেছি। আমি চৈতন্য পাইয়া অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ করিলাম, মন বিরল

পুলরায় দেৱা জেলে

হইয়া গেল, আমার বালিস যশসিক্ত লক্ষ্য করিলাম। আমি আশ্চৰ্য্য হইলাম, কেন না জাগ্রত অবস্থায় আমি কখনও এরূপ ভাবাবেগে অধীৰ হই না।

এইকালে আমার আয়ুপুঞ্জ কিঞ্চিৎ দুৰ্বল হইয়া পড়িয়াছিল; আমার স্থন্দিয়া হইত না, ইহা আমার গাঙ্গে অত্যন্ত অস্বাভাবিক, এবং নানাপ্রকার দুঃস্থলে চমকিত হইতাম। সময় সময় আমি ঘুমের মধ্যে চীৎকার করিতাম। একবার আমি অত্যন্ত অস্বাভাবিক জ্বরের সহিত চীৎকার করিয়াছিলাম, কেন না প্রবল ঝাঁকুনির সহিত আমি জাগিয়া উঠিয়া দেখি, দুইজন জেল ওয়ার্ডার আমার শয্যাপাশে দাঁড়াইয়া আছে, আমার চীৎকার শুনিয়া তাহারা যে উদ্বিগ্ন হইয়াছে ইহা বুঝিতে পারিলাম। আমার যেন বুক চাপিয়া শ্বাসরোধ হইতেছে এরূপ স্থপ দেখিয়াছিলাম।

এই সময় কংগ্রেসের কার্যাকরী সমিতির একটি প্রস্তাবেও আমি মৰ্ম্মাহত হইয়াছিলাম। এই প্রস্তাবটিতে বিবৃত হইয়াছে যে, “ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এবং শ্রেণীসংঘর্ষের শিথিল আলোচনা হইতেছে দেখিয়া” এতদ্বারা কংগ্রেসপন্থীদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, করাচী-সিদ্ধান্তে, “স্বত্বত কারণ ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ব্যতীত ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার কল্পনাও নাই, অথবা ইহা শ্রেণীসংঘর্ষেরও অন্তিমোদন করে না। কার্যাকরী সমিতির আবণ্ড অভিমত এই যে, বাজেয়াপ্তকরণ অথবা শ্রেণীসংঘর্ষ কংগ্রেসের অহিংসনীতির বিরোধী।” এই প্রস্তাবটি অত্যন্ত শিথিল ভাষায় রচিত এবং ইহার রচয়িতারা শ্রেণীসংঘর্ষ বুঝাইতে গিয়া অনেকাংশে অজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছেন। নবগঠিত কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদলকে লক্ষ্য করিয়াই এই প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু কার্যতঃ, বৰ্ত্তমান অবস্থায় শ্রেণীসংগ্রামের অস্তিত্ব রহিয়াছে, ইহা প্রাথমিক উল্লেখ ব্যতীত, ঐ দলের দাখিলজ্ঞানসম্পন্ন সদস্যগণের পক্ষ হইতে বাজেয়াপ্ত করার কোন কথাই উঠে নাই। কার্যাকরী সমিতির প্রস্তাবের মধ্যে এই ইঙ্গিত স্পষ্ট যে, যে কোন ব্যক্তি শ্রেণীসংগ্রামের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, সে কংগ্রেসের সাধারণ সভাও হইতে পারিবে না। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী হইয়াছে, অথবা ইহা ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরোধী, কেহই এরূপ অভিযোগ উপস্থিত করে নাই। কোন কোন সদস্য এরূপ মত পোষণ করিয়া থাকেন মাত্র, কিন্তু এখন দেখা গেল, এই সৰ্ব্বশ্রেণীর সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সৈন্স সামন্তরূপেও তাহাদের স্থান নাই।

ইহা প্রায়ই ঘোষণা করা হয় যে, কংগ্রেস জাতির প্রতিনিধি, ইহাতে

জওহরলাল নেহরু

সকল দল, সকল স্বার্থ, রাজা ও প্রজা সকলেরই স্থান আছে। জাতীক্ষ আন্দোলন সর্বদাই এইরূপ দাবী করিয়া থাকে এবং ইহাও ধরিয়া লওয়া হয় যে, তাহারাই দেশের অধিকাংশের প্রতিনিধি এবং সকল শ্রেণীর স্বার্থের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তাহাদের কর্মনীতি পরিচালিত হইতেছে। এই দাবী কোনমতেই যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা যায় না, কেন না, কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানই পরস্পরবিরোধী স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে না। তাহা হইলে উহা বিশেষত্বহীন ও নিদ্বিষ্ট লক্ষ্যহীন জড়পিণ্ডে পরিণত হয়। হয় কংগ্রেস এমন এক রাজনৈতিক দল, যাহার নিদ্বিষ্ট (অথবা অনিদ্বিষ্ট) লক্ষ্য আছে, রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করিবার এবং তাহা দ্বারা জাতীয় কল্যাণ করিবার নিদ্বিষ্ট মতবাদ আছে; নয়, ইহা এক দয়ালু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান মাত্র, যাহার নিজস্ব কোন মত নাই, সকলের কুণল কামনাই ইহার উদ্দেশ্য। ইহা কেবল তাহাদেরই প্রতিনিধি হইতে পারে, যাহারা ইহার লক্ষ্য ও মতবাদের সহিত সাধারণভাবে একমত। যাহারা ইহার বিরোধী—তাহাদিগকে জাতীয়তাবিরোধী, সমাজবিরোধী ও প্রতিক্রিয়াপন্থী বিবেচনা করিয়া,— নিজস্ব মতবাদ কার্য্যকরী করিবার জন্ত, তাহাদের প্রভাব বিনষ্ট অথবা সংযত করিতে হইবে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে একমত হইবার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র রহিয়াছে, কেন না ইহার সহিত সামাজিক সংঘর্ষগুলির সংশ্লিষ্ট নাই। এইভাবেই কংগ্রেস নানাভাবে ভারতীয় জনসাধারণের অধিকাংশের প্রতিনিধি এবং এই কারণেই বিভিন্ন স্বার্থ সম্বন্ধে বিভিন্ন দল কেবল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার ভিত্তিতে ইহাতে যোগদান করিয়াছে, কিন্তু এক্ষেত্রেও এক এক দলের জোর দিবার ভঙ্গী স্বতন্ত্র। যাহারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার মূল ভিত্তি সম্পর্কেও ভিন্ন মতাবলম্বী তাহারা কংগ্রেসের বাহিরেই আছেন এবং অল্পবিস্তর ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন। এইরূপে কংগ্রেস এক স্থায়ী সর্বদলের কংগ্রেসে পরিণত হইয়াছে, ইহার মধ্যে পরস্পরকে আবৃত্ত করিয়া বহু দল অবস্থান করিতেছে, এক সাধারণ বিখ্যাসের সূত্রে পরস্পর আবদ্ধ এবং গান্ধিজীর অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের প্রভাবে একাবদ্ধ।

পরে কার্য্যকরী সমিতি শ্রেণীসংগ্রাম সম্পর্কিত প্রস্তাবটি ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিলেন। ঐ প্রস্তাবের গুরুত্ব তাহার ভাষায় নহে অথবা উহার বিষয়বস্তুতে নহে, আসলে কংগ্রেস কোন পথে চলিয়াছে উহা তাহারই ইচ্ছিত। আগতপ্রায় ব্যবস্থাপরিষদের নির্বাচনে যাহারা ধনী সম্প্রদায়গুলির সমর্থন লাভ করিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন, কংগ্রেসের

পুনরায় দেয়া জেলে

সেই নূতন পার্লামেন্টি সাফাই ঐ প্রস্তাব রচনার প্রেরণা জাগাইয়াছিল। তাঁহাদেরই অভিপ্রায় অনুসারে কংগ্রেস দক্ষিণদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং দেশের মডারেট ও রক্ষণশীল ব্যক্তিদের চিত্ত জয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যাহারা অতীতে কংগ্রেসী আন্দোলনের বিরোধিতা করিয়াছেন, নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনে সরকারপক্ষে যোগ দিয়াছেন, এমন কি তাঁহাদের পর্য্যন্ত মিষ্ট কথায় তুষ্ট করা হইতে লাগিল। বামমার্কীদের কোলাহল ও সমালোচনা এই মিলন বা “হৃদয়ের পরিবর্তনের” পথে অন্তরায়স্বরূপ বোধ হইতে লাগিল, এবং কায্যকরী সমিতির প্রস্তাব ও অত্যাশ্রিত ব্যক্তিগত উক্তি হইতে বুঝা গেল যে, বামমার্কীদের বাধা সত্ত্বেও কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের এই নূতন পথ হইতে ভ্রষ্ট হইবেন না। যদি বামমার্কীদের আচরণ সংযত না হয়, তাহা হইলে অসুসঙ্গান করিয়া তাহাদিগকে কংগ্রেসের দল হইতে বাদ দেওয়া হইবে। কংগ্রেসের পার্লামেন্টি বোর্ড তাঁহাদের ঘোষণাপত্রে অতি সাবধানী যে কথ্যপদ্ধতি জ্ঞাপন করিলেন, গত পনের বৎসরে তদপেক্ষা অধিক মডারেট কোন কম্মনীতি কংগ্রেস গ্রহণ করে নাই।

গান্ধিজীর কথা ছাড়িয়া দিলেও কংগ্রেসের নেতৃমণ্ডলীর মধ্যে এমন অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি রহিয়াছেন, যাহারা জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে কৃতিত্বের সহিত কার্য্য করিয়াছেন, যাহারা সত্যতা ও নিষ্ঠার গুণ সমগ্র দেশে সম্মানিত। কিন্তু নূতন কম্মনীতি ফলে দ্বিতীয় স্তরের লোকেরা সম্মুখে আসিল; এমন কি কংগ্রেসের সর্ব্বাগ্রামী দলেও এমন অনেকে আছেন, যাহাদের কোনমতেই আদর্শবাদী বলা চলে না। কংগ্রেসের নানা স্তরে নিশ্চয়ই বহুসংখ্যক আদর্শবাদী আছেন, কিন্তু ভাগ্যান্বেষী ও সুবিধাবাদীদের কংগ্রেসে প্রবেশের পথ এক্ষণে পুরোপুরি অধিক প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইল। গান্ধিজীর দুর্ব্বোধ্য এবং রহস্যময় ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছাড়িয়া দিলেও মনে হইতে লাগিল, কংগ্রেসের যেন দুইটি মূল, একটি নিছক রাজনৈতিক দিক, যাহা ক্রমশঃ উপদলীয় প্রভুত্বের চক্রান্তে পরিণত হইতেছে, এবং অপর দিক একটি প্রাধিকারভার মত দয়া দাক্ষিণ্য এবং ভাবুকতায় ভরপুর।

গভর্নমেন্টপক্ষে জয়ের উল্লাস,—নিরুপদ্রব প্রতিরোধ এবং তাহার আলুসঙ্গিক উপসর্গগুলি দমন করিতে তাঁহাদের নীতি সফল হইয়াছে বিবেচনা করিয়া তাঁহারা জয়গর্ভ চাকিয়া রাগিতে পারিলেন না! অস্ত্রোপচার সফল হইয়াছে; আপাততঃ রোগী ঠাটুক কি মরুক তাহা নহিয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। কংগ্রেস বহুল পরিমাণে পথে আসিলেও

জওহরলাল নেহরু

তাহারা এক আধটু রদবদল করিয়া ঐ নীতিই চালাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাহারা জানেন যে, যতদিন মূল সমস্যাগুলি থাকিবে, ততদিন জাতীয় কর্মধারার এই পরিবর্তন সাময়িক এবং শাসনদণ্ড শিথিল করিলে যে কোন মুহূর্ত্তে ইহা পুনরায় প্রবল হইয়া উঠিতে পারে। সম্ভবতঃ তাহারা ইহাও চিন্তা করিয়াছিলেন যে, কংগ্রেসের অধিকতর অগ্রগামী অংশ ও শ্রমিক ও কৃষকদলের বিরুদ্ধে দমননীতি চালাইতে কংগ্রেসের সাবধানী নেতারা বিশেষ বিরক্ত হইবেন না।

দেরাদুন জেলে আমার চিন্তাধারা কতকটা এইভাবে বহিতে লাগিল। ঘটনার গতি সম্পর্কে আমার পক্ষে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা কঠিন; কেন না আমি বিচ্ছিন্ন হইয়া আছি। আলীপুর জেলে আমি বাহিরের ঘটনাবলী হইতে সম্পূর্ণরূপেই বিচ্ছিন্ন ছিলাম, দেরাদুন জেলে গভর্ণমেন্ট অল্পমোদিত সংবাদপত্রে আমি আংশিক ও একদেশদর্শী সংবাদ কিছু কিছু পাইতাম। সম্ভবতঃ যদি বাহিরের সহকর্মীদের সহিত আমার যোগ থাকিত এবং ঘটনাবলী প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করিবার সুবিধা পাইতাম, তাহা হইলে আমার মতের কোন কোন দিক পরিবর্তিত হইত।

ক্লেশকর বর্তমান ছাড়িয়া আমি অতীতের কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম; আমার কর্মক্ষেত্রে আগমনের সূচনা হইতে অত্যাধি ভারতের কি রাজনৈতিক পরিবর্তন হইয়াছে। আমরা যাহা করিয়াছি,—তাহা কতখানি সঙ্গত হইয়াছে? কতখানি অসঙ্গত? আমার মনে হইল, যদি আমার চিন্তাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখি, তবে তাহা স্মরণশক্তি হইবে এবং প্রয়োজনে আসিবে। এইভাবে নিজেকে একটা নির্দিষ্ট কাজে নিযুক্ত রাখিলে,—মানসিক ক্লেশ ও অবসাদ হইতেও মুক্তি পাইব। এই ধারণা হইতেই আমি দেরাদুন জেলে ১৯৩৪-এর জুন মাসে এই “আত্মচরিত-বর্ণনা” লিখিতে আরম্ভ করি এবং গত আটমাস কাল যখনই মনে আবেগ আসিয়াছে, তখনই ইহা লিখিয়াছি। মাঝে মাঝে লিখিবার ইচ্ছা হইত না; তিনবার প্রায় এক মাস ধরিয়া কিছুই লিখি নাই। তথাপি আমি কোনমতে চালাইয়া গিয়াছি; আমার এই মানসপথে ভ্রমণ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। ইহার অধিকাংশই অত্যন্ত ক্লেশকর অবস্থার মধ্যে লিখিতে হইয়াছে;—এই কালে আমি মানসিক অবসাদ ও বিবিধ ভাবাবেগে পীড়িত হইয়াছি। সম্ভবতঃ আমার লেখার মধ্যেও তাহার ছাপ পড়িয়াছে; কিন্তু এই লেখার দ্বারাই আমি নিজেকে বর্তমান ও তাহার বহুবিধ দৃষ্টিভঙ্গি হইতে অনেকখানি মুক্ত রাখিতে সক্ষম হইয়াছি। আমি যখন লিখিতাম—তখন বাহিরের পাঠক-সমাজের কথা আমার কদাচিৎ মনে পড়িত; আমি

এগার দিন

নিজের সহিত বিচার করিতাম, আত্মকল্যাণের জন্তই প্রসন্ন গড়িয়া তুলিয়া তাহার উত্তর দিতাম,—কখনও কখনও ইহাতে কৌতুকও অনুভব করিয়াছি। আমি যথাসম্ভব সরলভাবে চিন্তা করিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং আমার মনে হয়, অতীতের এই আলোচনা, এ বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

জুলাই মাসের শেষভাগে কমলার অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইয়া পড়িল এবং কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁহার শ্বাসসংশয় অবস্থা হইল। ১১ই আগষ্ট সহসা আমাকে দেৱাছুন জেল ত্যাগ করিবার আদেশ দেওয়া হইল এবং সেই রাত্রেই পুলিশ পাহারায় আমাকে এলাহাবাদ পাঠান হইল। পরদিন অপরাহ্নে আমরা এলাহাবাদের প্রয়াগ স্টেশনে অবতরণ করিলাম। সেখানে জিলা ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে বলিলেন যে, আমার পৌড়িতা পত্নীকে দেখিবার জন্ত আমাকে সাময়িকভাবে কারামুক্তি দেওয়া হইতেছে। আমার প্রযাত্রার দিন হইতে আশু পঞ্চম একদিন কম ছয়মাস হইল।

৬৫

এগার দিন

“তরবারী তাহার পিধান জীর্ণ করে,—এবং আত্মাও হৃদয়কে জীর্ণ করিয়া ফেলে”—বায়রণ।

আমার কারামুক্তি সাময়িক। আমাকে বলা হইল যে, ইহা একদিন অথবা দুইদিন হইতে পারে; অথবা ডাক্তারগণ যতদিন অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিবেন, ততদিনও হইতে পারে। এই অনিশ্চিত অবস্থা, অতিমাত্রায় অশান্তিজনক, স্থির হইয়া কোন কাজই করা যায় না। সময় নিদ্রিষ্ট হইলে নিজের অবস্থা বিবেচনায় কাজের ব্যবস্থা করিতে পারিতাম। এ অবস্থায়, যে কোন দিন যে কোন মুহূর্ত্তে আমাকে কারাগারে ফিরিয়া যাইতে হইতে পারে।

এই আকস্মিক পরিবর্তনের জন্ত আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। নির্জন কারাবাস হইতে একেবারে ডাক্তার, নার্স, আত্মীয়স্বজনপূর্ণ গৃহে জনতার মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। আমার কন্যা ইন্দিরাও শান্তিনিকেতন হইতে আসিয়াছিল। কমলার স্বাস্থ্যের সংবাদ লইবার জন্ত এবং আমার

জওহরলাল নেহরু

সহিত দেখা করিবার জন্য বহু বন্ধু আসিতে লাগিলেন। এখানে জীবনযাত্রার প্রণালী স্বতন্ত্র—গৃহের আরাম ও ভাল খাওয়ার ব্যবস্থা। কিন্তু এ সকলের মূলে রহিয়াছে কমলার সঙ্কটজনক অবস্থার জন্য উদ্বেগ।

তাঁহার দেহ শীর্ণ দুর্বল, যেন কমলার ছায়ামূর্তি তাহার রোগের সহিত ক্ষীণভাবে সংগ্রাম করিতেছে; তাঁহাকে চিরদিনের মত হারাইব, এই চিন্তা অসহজপে মন্থাস্তিক হইয়া উঠিল। আমাদের বিবাহের পর সাড়ে আঠার বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে; সেইদিনের কথা আমার মনে পড়িল,—তারপর দীর্ঘকালের কত স্মৃতি! আমার বয়স তখন ছাব্বিশ বৎসর, তাঁহার বয়স তখন প্রায় সত্তর,—যেন ভুল করিয়া বালিকা হইয়াছে; সাংসারিক ব্যাপারে একেবারে অনভিজ্ঞ। আমাদের মধ্যে বয়সের ব্যবধান প্রচুর, আমাদের মানসিক গঠনের পার্থক্য আরও বেশী; আমার মানসিক বিকাশ তাঁহার চেয়ে অনেক অধিক। তথাপি বাহ্যতঃ জাগতিক অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ভাব সম্বন্ধে, আসলে আমি বালকের মত, চপল ছিলাম এবং আমি বুঝিতেই পারি নাই যে, বালিকার কোমল ও ভাবপ্রবণ মন পুষ্পের মতই ধীরে ধীরে বিকশিত হয় এবং সেজন্ত কত সযত্ন ও সম্বেদ আদর আবশ্যক। আমরা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম এবং ভাল ব্যবহার করিতাম; কিন্তু আমাদের মনের পটভূমিকা ছিল স্বতন্ত্র, সর্বদাই সামঞ্জস্যের অভাব বোধ করিতাম। এই সামঞ্জস্যের অভাব হইতে সময় সময় ঠোকাঠুকি হইত এবং তুচ্ছ বিষয় লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলহও হইত। কিন্তু বালক বালিকার এই মনোমালিন্য ক্ষণস্থায়ী, দ্রুত মিলনের মধ্যে তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিত। আমাদের উভয়েরই মেজাজ চড়া ও অনুভূতিপ্রবণ এবং আত্মমর্যাদা সম্বন্ধে উভয়েরই ধারণা অত্যন্ত বালকোচিত ছিল। ইহা সম্বন্ধে আমাদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তবে সামঞ্জস্যের অভাবে তাহা ধীরে ধীরে হইয়াছে। আমাদের বিবাহের একুশ মাস পরে আমাদের কন্যা ও একমাত্র সন্তান ইন্দিরার জন্ম হয়।

আমাদের বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রক্ষেত্রে নবরূপান্তরের সূচনা হইল; আমি ক্রমে সেইদিকে ঝুঁকিয়া পড়িলাম। তখন হোমরুল আন্দোলনের দিন, কিছু পরেই আসিল পঞ্জাবের সামরিক আইন ও অসহযোগ,— আমি ক্রমে জনসাধারণের কাজের ধূলিতলে গড়াইয়া পড়িলাম। এই সকল কাজে আমি এত বেশী জড়াইয়া পড়িলাম যে, একরূপ অজ্ঞাতসারেই আমি তাঁহার দিকে লক্ষ্যও করিতাম না; যখন আমার সঙ্গ তাঁহার অধিক প্রয়োজন ছিল, সেই সময়েই তিনি কেবল নিজেকে লইয়া থাকিতেন। তাঁহার প্রতি আমার ভালবাসা বরাবর ছিল, এমন কি বাড়িয়াছে; তিনি

এগার দিন

তাঁহার স্নিগ্ধ হৃদয় লইয়া সর্বদাই আমার সেবা ও সাহসনার জন্ত প্রস্তুত রাখিয়াছেন, একথা ভাবিয়া আমি অপূৰ্ণ সন্তোষ লাভ করিতাম। তিনি আমাকে বল দিয়াছেন, কিন্তু নিশ্চয়ই তিনি মনে দুঃখ পাইতেন এবং নিজেকে একটু অবজ্ঞাত মনে করিতেন। এই আঁর্ন বিশ্বাসিত ও অনিশ্চিত মনোভাব অপেক্ষা তাঁহার প্রতি দয়াহীন ব্যবহার হইতে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠতর হইতে পারিত।

তারপর আসিল তাঁহার ব্যাধি এবং আমার কারাদণ্ডজনিত দীর্ঘ অসুস্থিতি—এইকালে আমাদের মধ্যে কেবল জেলে দেখাশুনা হইত। নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনে তিনি আমাদের সংগ্রামের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং তিনিও কারাদণ্ড লাভ করার কত আনন্দিতা হইয়াছিলেন। আমরা যেন পরস্পরের অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিলাম। আমাদের পরস্পরের বিলম্বিত ও বিরল দেখা সাক্ষাৎ কত দুর্লভ সম্পদ মনে হইত—আমরা ঐ দিনের জন্ত প্রতীক্ষা করিয়া প্রত্যেকটি দিবস গণনা করিতাম। আমাদের দেখা সাক্ষাৎ কিম্বা পরস্পরের সহিত স্বল্প অবস্থিতিকালে আমরা কখনও পরস্পরের প্রতি বিলক্তিবোধ কবিতাম না, ভাল লাগে না, এমন ভাব মনেও উঠিত না, সর্বদাই অগ্নান অভিনয় উপভোগ করিতাম। আমরা পরস্পরের মধ্যে কত কি নূতন আবিষ্কার করিতাম, যদিও তাহার সবগুলি আমাদের পছন্দ হইত না। এমন কি বড় হইয়াও আমাদের কোন বিষয়ে মতভেদ হইলে তাহা অনেকটা বালক-বালিকার মত মনে হইত।

আঠার বৎসর বিবাহিত জীবন যাপনের পরও তাঁহাকে ঠিক কুমারী কন্যার মত দেখায়; তাঁহার অবয়বে গৃহিণীর মাতুরূপ নাই। দীর্ঘকাল পূর্বে তিনি যেমন বধূ-বেশে আমাদের গৃহে আসিয়াছিলেন, যেন অনেকটা তেমনই আছেন। কিন্তু আমার প্রভূত পরিবর্তন হইয়াছে; যদিও বয়সের তুলনায় আমার দেহ সুগঠিত স্বচ্ছন্দগতি ও কর্মক্ষম এবং লোকে বলে এখনও আমার মধ্যে কিছু কিছু বালকোচিত চাপলা রাখিয়াছে—কিন্তু আমাকে দেখিলে তাহা বুঝা যায় না। আমার মাথায় অংশিক টাক পড়িয়াছে, চুল পাকিয়াছে, আমার মুখে কৃষ্ণিত রেগাবলী ফুটিয়াছে; চক্ষুর চারিদিকে ক্রম হ্রাস; গত চারিবৎসরের দুঃখকষ্ট ও ভিক্ষা আমার উপর অনেক আঘাতের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। ইদানীং আমি ও কমলা কোন অপরিচিত স্থানে গেলে, লোকে তাঁহাকে আমার কন্যা বলিয়া ভ্রম করিয়াছে, এবং আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছি। তাঁহাকে ও ইন্দিরাকে দুই বোনের মত দেখায়।

আঠার বৎসরের বিবাহিত জীবন! কিন্তু ইহার মধ্যে কত দীর্ঘ বৎসর আমি কারাগারে অন্ধ-গৃহে এবং কমলা হাসপাতালে ও স্বাস্থ্যনিবাসে কাটাইয়াছে! এখনও আমি পুনরায় কারাদণ্ড ভোগ করিতেছি; দুদিনের জন্ত মুক্ত মাত্র; আর কমলা রোগশয্যায় জীবনের আশায় সংগ্রাম করিতেছে। তাঁহার নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলার জন্ত আমি তাঁহার উপর একটু বিরক্ত হইলাম। কিন্তু তথাপি আমি কি করিয়া তাঁহাকে দোষ দেই; জাতীয় সংগ্রামে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিবার দুর্নিবার আগ্রহে তিনি স্বীয় অক্ষমতা ও কর্মহীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা দেহের সাধ্যাত্ত ছিল না, তিনি যথাযথ ভাবে কাজও করিতে পারেন নাই, চিকিৎসাও করিতে পারেন নাই,—এবং তাঁহার ভিতরের অনলে দেহ জলিয়া গিয়াছে।

এখনই যে তাঁহাকে আমার সর্বাধিক প্রয়োজন, তিনি কি আমাকে ছাড়িয়া যাইবেন? আমরা যে এতদিনে পরস্পরকে জানিতে ও বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি—আমাদের মিলিত জীবন এই ত আরম্ভ হইল। আমাদের পরস্পরের উপর এত নির্ভরতা,—আমাদের একত্রে কত কিছু করিবার আছে!

দিনের পর দিন, দণ্ডের পর দণ্ড তাঁহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া এইরূপ কত কথাই মনে পড়িতে লাগিল।

সহকর্মী ও বন্ধুরা আমার সহিত দেখা করিতে আসিতেন। আমি যাহা জানিতাম না, এমন অনেক ঘটনার কথা তাঁহাদের নিকট শুনিলাম। তাঁহারা প্রচলিত রাজনৈতিক সমস্যাগুলি আলোচনা করিয়া, আমাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আমার পক্ষে উত্তর দেওয়া কঠিন। একে কমলার অস্থির জন্ত মন বিক্ষিপ্ত, তাহার উপর জেলে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র থাকার দরুণ এই সকল সুস্পষ্ট প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার জন্ত আমি প্রস্তুত ছিলাম না। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা হইতে আমি এই শিক্ষালাভ করিয়াছি যে, জেলে প্রাপ্ত সীমাবদ্ধ সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া কোন রাজনৈতিক অবস্থা বিচার করা সম্ভবপর নহে। মনকে আলোচনায় উন্মুখ করিয়া তুলিবার জন্ত ব্যক্তিগত সংস্পর্শের প্রয়োজন, নতুবা মত প্রকাশ করিতে গেলে তাহা বাস্তবতাবিজ্ঞিত পণ্ডিতী আলোচনায় পর্যাবসিত হইতে পারে। গান্ধিজী এবং কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সহকর্মীদের সহিত আলোচনা না করিয়া, কংগ্রেসের কর্মনীতি সম্পর্কে কোন নিশ্চিত মত প্রকাশ করিলে তাঁহাদের প্রতিও অবিচার করা হইবে। কংগ্রেসে যাহা কিছু ঘটিয়াছে, তাহার সমালোচনায় আমার মন পরিপূর্ণ থাকিলেও, কোন

এগার দিন

প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট প্রস্তাব উপস্থিত করিবার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। তখন আমার কারামুক্তির সম্ভাবনা ছিল না বলিয়া এই ধারায় চিন্তা করিতে পারি নাই।

আমার পীড়িতা পত্নীর রোগশয্যা পার্শ্বে আসিতে দিয়া গভর্ণমেন্ট যে সৌজন্য প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই স্বযোগ লইয়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব হইবে না, এ ভাবও আমার মনের মধ্যে ছিল। ঐ শ্রেণীর কোন কাজ করিব না বলিয়া কোন লিখিত স্তম্ভ অথবা প্রতিশ্রুতি অবশ্য আমি দেই নাই, তথাপি পূর্বোক্ত কারণে আমার মনে সঙ্কোচ আসিত।

কয়েকটি মিথ্যা গুজবের প্রতিবাদ ছাড়া আমি কোন বিবৃতি প্রচার করি নাই। এমন কি ঘরোয়া ভাবেও আমি কোন হুনিদ্বিষ্ট কথ্যপদ্ধতির কথা বলি নাই, কিন্তু অতীত ঘটনা সম্পর্কে মুক্তকণ্ঠে সমালোচনা করিয়াছি। কংগ্রেস, সমাজতন্ত্রী দল তখন সবমাত্র গঠিত হইয়াছে, এবং আমার অনেক অন্তরঙ্গ সহকর্মী উহাতে যোগ দিয়াছিলেন। আমি যতদূর জানিতে পারিলাম তাহাতে উহার মোটামুটি কখনোই আমার নিকট সম্ভাষণজনক বলিয়া মনে হইল। কিন্তু ইহা এমন এক বিচিত্র ও বিমিশ্র দল বলিয়া মনে হইল যে যদি আমি সম্পূর্ণ স্বাধীনও থাকি, তাহা হইলেও আমি সহসা ইহাতে যোগ দিতাম না। স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যাপারে আমাকে কিছু সময় দিতে হইল, কেন না অন্যান্য স্থানের ন্যায় এলাহাবাদেও স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির নির্বাচন লইয়া এক অভূতপূর্ব তীব্র আন্দোলন স্বরূপ হইয়াছিল। ইহার মধ্যে নীতিগত কোন ব্যাপার ছিল না; ইহা নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার মাত্র এবং কতকগুলি ব্যক্তিগত কলহ মীমাংসার সাহায্যের জন্য আমার ডাক পড়িয়াছিল।

এই সকল ব্যাপারে জড়িত হইয়া পড়িতে আমার ইচ্ছাও ছিল না, তথাপি কতকগুলি ব্যাপার দেখিয়া আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। স্থানীয় কংগ্রেসের নির্বাচন লইয়া লোকের এত উত্তেজনা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়। ইহাদের মধ্যে বাহারা প্রধান তাহারা অনেকেই সংঘর্ষ হইতে নানা ব্যক্তিগত কারণ দেখাইয়া সরিয়া পড়িয়াছিলেন। নিরুপদ্রব প্রতিরোধ বজ্জিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ কারণগুলিরও কোন গুরুত্ব রহিল না এবং তাহারা সহসা বাহির হইয়া আসিয়া পরস্পরের বিরুদ্ধে অতি তীব্র এবং অশিষ্ট আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন। অন্য দলকে দাবাইয়া দিবার ঐকান্তিক আগ্রহে মাহুষ কি ভাবে অতি সাধারণ শিষ্টাচার পর্যন্ত ভুলিয়া যায়! আমি দেখিয়া মর্মান্বিত হইলাম যে

স্থানীয় নির্বাচনে জয় লাভের উদ্দেশ্যে কমলার নাম, এমন কি, তাহার গীড়ার কথা পর্য্যন্ত ব্যবহার হইতে লাগিল।

ব্যাপক প্রশ্নগুলির মধ্যে ব্যবস্থা পরিষদের আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জ্ঞাত কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের বিষয় আলোচিত হইতে লাগিল। সুবকের দল এই সিদ্ধান্তের বিরোধী ছিলেন। কেন না তাহাদের মতে ইহা নিয়মতান্ত্রিক আপোষের পথে প্রত্যাঘর্ষন মাত্র। কিন্তু ইহার পরিবর্তে তাহারা কোন কার্য্যকরী উপায় নির্দেশ করিতে পারিল না। প্রতিবাদীরা কেহ কেহ উচ্চাঙ্গের নীতির কথা তুলিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে কংগ্রেস ছাড়া অন্যান্য দলের নির্বাচনে যোগ দেওয়ায় তাহাদের কোন আপত্তি ছিল না। দেখিয়া মনে হইল তাহাদের উদ্দেশ্য সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির পথ স্তূগম করিয়া দেওয়া।

এই সকল স্থানীয় কলহ রাজনীতির গতি ও পরিণতি দেখিয়া আমি অতিমাত্রায় বিরক্ত হইলাম। তাহাদের সহিত আমার যেন প্রাণগত যোগ নাই এবং আমার নীজের জন্মভূমি এলাহাবাদে আমি নিজেকে নিঃসঙ্গ অপরিচিত বলিয়া মনে করিতে লাগিলাম। আমি বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম যখন এই সকল ব্যাপারে যোগ দিবার সময় আসিবে, তখন এই পারিপার্শ্বিক অবস্থায় আমি কি করিব ?

আমি গান্ধিজীকে কমলার অবস্থা লিখিয়া জানাইলাম। আমাকে শীঘ্রই জেলে ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং শীঘ্রই আর স্ত্রযোগ নাও পাইতে পারি, ইহা মনে করিয়া আমার মনের ভাবও ঐ পত্রে জানাইলাম। আধুনিক ঘটনাগুলিতে আমার মন বিশেষ রূপে তিক্ত ও বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আমার পত্রে তাহারও আভাষ ছিল। কি করিতে হইবে, কি হওয়া উচিত অথবা কি হওয়া উচিত নয় আমি তাহা লিখিবার চেষ্টা করি নাই, কেবল যাহা ঘটিয়াছে তাহাই কতকাংশে লিখিয়াছিলাম। এই পত্র আমার অবরুদ্ধ ভাবাবেগের নিদর্শন মাত্র এবং পরে আমি জানিতে পারিয়াছিলাম যে গান্ধিজী ইহাতে বড়ই ব্যথিত হইয়াছিলেন।

দিনের পর দিন আমি কারাগারের আস্থান অথবা গভর্নমেন্টের নিকট হইতে অন্য কোন প্রকার সংবাদের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম, মাঝে মাঝে আমাকে সংবাদ দেওয়া হইতে লাগিল যে পরদিবস অথবা তৎপর দিবসই আমাকে সরকারী নির্দেশ জানান হইবে। ইতিমধ্যে আমার পত্নীর অবস্থার বিবরণ প্রত্যহ জানাইবার জ্ঞাত ডাক্তারদিগকে অশ্রুরোধ করা হইল। আমার আগমনের পর কমলার অবস্থার অতি সামান্য উন্নতি দেখা গেল।

কারাগারে প্রত্যাবর্তন

সাধারণের মনে ধারণা হইল, এমন কি, যাহারা সাধারণতঃই গভর্ণমেন্টের বিশ্বাসভাজন তাঁহারাও মনে করিতে লাগিলেন যে দুইটা অসম ঘটনা না হইলে আমাকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি দেওয়া হইত—আগামী অক্টোবর মাসে বোম্বাইয়ের কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশন এবং নভেম্বর মাসে কাবুল পরিষদের নির্বাচন। জেলের বাহিরে থাকিলে এই সকল ব্যাপারে আমি উপদ্রব সৃষ্টি করিতে পারি এই কারণে সম্ভবতঃ আমাকে আরও তিন মাসের জন্য জেলে রাখিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। অবশ্য আমাকে পুনরায় জেলে পাঠান হইবে না, এই সম্ভাবনাও ছিল এবং এই বিশ্বাসই দিনে দিনে বদ্ধিত হইতে লাগিল। আমি স্থায়ীভাবে কাজ কর্ষে মনোযোগ দিবার সঙ্কল্প করিলাম।

আমার মুক্তির এগার দিন পর ২৩শে আগষ্ট পুলিশের গাড়ী উপস্থিত হইল। পুলিশ কর্মচারী আমাকে বলিলেন যে আমার সময় শেষ হইয়াছে, আমাকে এখনই নৈনীজ্জেলে ফিরিয়া যাইতে হইবে। আমি আশ্চর্যবশতঃ নিকট বিদায় লইলাম। আমি পুলিশের গাড়ীতে যাইতেছি এমন সময় আমার রুগ্না মাতা বাহু বিস্তার করিয়া আমার নিকট দৌড়াইয়া আসিলেন। তাঁহার সেই মুখ দীর্ঘকাল আমার স্মৃতি-পটে উদ্ভিত হইয়া মন বিষণ্ণ করিয়া তুলিত।

৬৬

কারাগারে প্রত্যাবর্তন

“অন্ধকারের একই রূপ, তাহার পথ অবিমুক্ত, কিন্তু স্থখ্যালোকই তাহার গতি পথে শত শত বিভিন্ন বর্ণে প্রতিভাত হয়। দুঃখ ও যুগের মধ্যেও সেই পার্থক্য ; যুগের পথে দুঃখের আঘাত বেদনার প্রচুর বাধা।”

—রাজতঃ সঙ্গী।

আমি পুনরায় নৈনীজ্জেলে ফিরিয়া আসিলাম, মনে হইতে লাগিল যেন আমি এক অভিনব দণ্ডদেশ লইয়া কারাগারে আসিয়াছি। ভিতর বাহির, বাহির ভিতর করিতে করিতে আমি যেন বালকের ক্রীড়াকন্দে পরিবর্তিত হইয়াছি। এই শ্রেণীর আকস্মিক পরিবর্তনে স্নায়ুপুঞ্জ যে আবেগের সঞ্চার হয়, পুনঃ পুনঃ পরিবর্তনের মধ্যে তাহাকে শান্ত করিয়া আনা কাহারও পক্ষে

সহজসাধ্য নহে। আমি আশা করিয়াছিলাম যে, আমাকে নৈনীতে পুরাতন জেলে রাখা হইবে। ইতঃপূর্বে দীর্ঘ অবস্থিতিকালে আমি উহাতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। সেখানে আমার ভগ্নীপতি রঞ্জিত পণ্ডিতের রোগিত কিছু ফুলগাছ ছিল এবং একটা স্থলর বারান্দা ছিল। কিন্তু এই পুরাতন ডনং ব্যারাকে বিনা বিচার ও বিনা কারাদণ্ডে একজন রাজবন্দী ছিলেন, তাঁহার সহিত আমার সাহচর্য্য অভিপ্রেত নহে বলিয়া আমাকে জেলের অগ্র প্রান্তে লইয়া রাখা হইল। এই স্থানটি অনেক বেশী আবৃত এবং ফুলবাগানের কোন চিহ্ন সেখানে ছিল না।

কিন্তু যে স্থানেই আমি দিবারাত্রি যাপন করি না, কোন কিছুই আসে যায় না, কেন না আমার মন ছিল অগ্রজ। আমার আশঙ্কা হইতে লাগিল, কমলার অবস্থার যেটুকু উন্নতি হইয়াছিল, আমার পুনরায় গ্রেফতারের আঘাতে সেটুকু থাকিবে না। ঘটিলও তাহাই। কয়েকদিন আমাকে কারাগারে ডাক্তারদের সংক্ষিপ্ত দৈনিক বিবরণ দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। ইহা অনেক হাত ঘুরিয়া আসিত। ডাক্তার টেলিফোন যোগে ইহা পুলিশের সদর অফিসে জানাইতেন, তাহারা আবার উহা কারাগারে পাঠাইয়া দিত। জেল কর্মচারীদের সহিত ডাক্তারের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ কর্তৃপক্ষের ভাল লাগে নাই। দুই সপ্তাহ কাল অনিয়মিত হইলেও আমি প্রত্যহ এই বিবরণ পাইয়াছি। তাহার পর উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। অথচ তখন কমলার অবস্থা ক্রমশঃ অবনতির দিকে যাইতেছিল।

দুঃসংবাদ এবং সংবাদের জগৎ প্রতীক, দিবসকে অসহনীয় রূপে দীর্ঘ করিয়া তুলিত এবং রাত্রি অধিকতর অসহনীয় বলিয়া বোধ হইত। সময় যেন স্থির অথবা শব্দকের মত মস্তুর গতি, একটি ঘণ্টা যেন আর একটি ঘণ্টার উপর দুঃস্বপ্নের দুর্ভেদ্য বোঝা। জীবনে কখনও আমি উহা এত তীব্র ভাবে অনুভব করি নাই। তখন আমি মনে ভাবিতাম যে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের অধিবেশনের পরেই মাস দুইয়ের মধ্যে আমি মুক্তি লাভ করিব। কিন্তু এই দুই মাস অনন্তকাল বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

আমার পুনরায় গ্রেফতারের ঠিক এক মাস পরে একদিন একজন পুলিশ কর্মচারী আসিয়া আমার পত্নীর সহিত কিছু কাল সাক্ষাতের জগ্ন আমাকে কারাগার হইতে লইয়া গেলেন। আমি শুনিলাম আমাকে সপ্তাহে দুইবার করিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে দেওয়া হইবে। এমন কি সময় পর্য্যন্ত নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। আমি চারিদিন অপেক্ষা করিলাম, কেহ আমাকে লইতে আসিল না, পঞ্চম, ষষ্ঠ,

কারাগারে প্রত্যাবর্তন

সপ্তম দিনও অতিবাহিত হইল। প্রতীক্ষা করিতে করিতে আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। তাঁহুর অবস্থা পুনরায় সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাইলাম। আমাকে সপ্তাহে দুইবার তাঁহার সহিত দেখা করিতে লইয়া যাওয়া হইবে, এই কথা বলিয়া পরিহাস করিবার কি প্রয়োজন ছিল।

অবশেষে সেপ্টেম্বর মাসও অতিবাহিত হইল। এমন দীর্ঘতম ক্রেশ-কর ত্রিশটি দিন জীবনে আমি আর কখনও অনুভব করি নাই।

অনেক মধ্যস্থের মাধ্যমে আমাকে এরূপ পরামর্শ দেওয়া হইল যে যদি আমি প্রতিশ্রুতি দেই, এমন কি মৌখিক প্রতিশ্রুতিও দেই যে আমার কারাদণ্ডকাল পর্যন্ত আমি রাজনীতি হইতে দূরে থাকিব তাহা হইলে কমলার গুপ্তবার জ্ঞাত আমি মুক্তি পাইতে পারি। সে মুহূর্তে আমার চিন্তায় কোন রাজনীতি ছিল না, বিশেষতঃ এগার দিন বাহিরে থাকিয়া যে রাজনীতি আমি দেখিয়া আসিয়াছি তাহাতেই আমার মন তিক্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিব? আমার নিজের সংকল্পের প্রতি, উদ্দেশ্যের প্রতি, আমার সহকর্মীদের প্রতি, আমার নিজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিব? যাহাই ঘটুক না কেন ইহা অসম্ভব সর্ব! ইহা করার অর্থ নিজের সত্তার ভিত্তিকে মর্যাদাসিক আঘাত করা, আমার মধ্যে যাহা কিছু পবিত্র বলিয়া আমি মনে করি, তাহারই অপমান করা। আমি শুনিলাম, কমলার অবস্থা দিনে দিনে মন্দ হইয়া পড়িতেছে। এই জীবন যুতুর সন্ধিক্ষণে তাঁহার শয্যা পার্শ্বে আমার অবস্থিতিও তাঁহাকে অনেকখানি সাহুনা দিতে পারিত। আমার ব্যক্তিগত অহমিকা ও গৌরব-বুদ্ধিই বড়, না তাঁহাকে সেবা করিবার আকাঙ্ক্ষা বড়? অমঙ্গলের এই পূর্বাভাস আমার নিকট অত্যন্ত ভয়াবহ হইয়া উঠিতে পারিত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অন্ততঃ তখন আমি এ ভাবে এই সমস্তার সম্মুখীন হই নাই। আমি জানিতাম আমি কোন সর্বোত্তম আবদ্ধ হইলে কমলা নিজেই তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেন, এবং আমি যদি এরূপ কিছু করিতাম তাহা হইলে তিনি আহত হইতেন এবং তাহাতে তাঁহার অনিষ্টই হইত।

অক্টোবর মাসের প্রথম ভাগে আমাকে পুনরায় তাঁহাকে দেখিতে লইয়া যাওয়া হইল। প্রবল জরে তিনি মৃচ্ছিতবৎ পড়িয়া আছেন। তিনি আমাকে নিকটে রাখিবার জ্ঞাত ব্যাকুলতা দেখাইলেন। কিন্তু আমাকে তাঁহাকে ছাড়িয়া জেলে ফিরিয়া যাইতেই হইবে। তিনি মুখে সাহস আনিয়া আমার দিকে চাহিয়া হাসিলেন এবং আমাকে মন্তক অবনত করিতে ইঙ্গিত করিলেন। আমি সেরূপ করিলে তিনি কানে কানে

জওহরলাল নেহরু

কহিলেন, “গভর্নমেন্টের নিকট তুমি প্রতিশ্রুতি দিবে? এ কি সব জনিতেছি? তুমি কিছুতেই উহা করিও না।”

আমার এগার দিন জেলের বাহিরে থাকার সময় স্থির হইয়াছিল মে, কমলা একটু স্বস্থ হইলেই তাঁহাকে কোন উপযুক্ত স্থানে লইয়া গিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইবে। তখন হইতে তাঁহার অপেক্ষাকৃত ভাল হওয়ার জ্ঞান আমরা অপেক্ষা করিতেছি, কিন্তু ভাল হওয়া ত দূরের কথা ছয় সপ্তাহ পরে তাঁহার অবস্থা অধিকতর মন্দ হইয়া পড়িল। এ ভাবে তাঁহার ক্রমাবনতি লক্ষ্য করা নিষ্ফল বিবেচনা করিয়া, এই অবস্থাতেই তাঁহাকে ভাওয়ালী পাঠান স্থির হইল।

তাঁহার ভাওয়ালী যাত্রার পূর্বদিন আমাকে জেল হইতে লইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে দেওয়া হইল। আমি তাঁহাকে আবার কবে দেখিতে পাইব? ভাবিয়া কুল পাইলাম না। তাঁহাকে কি আর দেখিতে পাইব? কিন্তু সেদিন তাঁহাকে বেশ হাসিখুসী দেখিয়া আমি বহুদিন পর সন্তোষলাভ করিলাম।

তিন সপ্তাহ পরে কমলার নিকটে থাকিবার জ্ঞান আমাকে আলমোড়া জেলে বদলী করা হইল। ভাওয়ালীর পথে বলিয়া আমি ও আমার রক্ষী পুলিশ কর্মচারী কয়েকঘণ্টা সেখানে রহিলাম। কমলার অনেক উন্নতি হইয়াছে দেখিয়া আমার বড় আনন্দ হইল, লঘু হৃদয়ে আমি আলমোড়া যাত্রা করিলাম। তবে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের পূর্বেই গিরিশ্রেণী দেখিয়া আমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিল।

পর্বতের কোড়ে ফিরিয়া আসিয়া আমার কত আনন্দ! আমাদের মোটরগাড়ী সপিল পথে চলিয়াছে, প্রভাতের শীতল বায়ু, পর পর উদ্ঘাটিত দৃশ্যরাজি কত মনোহর। আমরা উর্ধ্বে উঠিতে লাগিলাম, পর্বত সঙ্কটের গভীরতা বাড়িতে লাগিল, শৃঙ্খলা মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়িল। নব নব তরুলতা দেখিতে দেখিতে আমরা দেবদারু ও পাইনের রাজ্যে আসিয়া পড়িলাম। বাস্তব ঝাঁক ঘুরিলেই অভিনব বিশাল গিরিশ্রেণী চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়, নিম্নে উপত্যকায় কলনাদিনী ক্ষুদ্র তটিনী। দেখিয়া আশা মিটে না, ক্ষুধিত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহি, এইরূপে স্মৃতিসম্পূর্ণ ভরিয়া লইতে চাহি; যখন এই দৃশ্য আমার চক্ষুর অন্তরালে চলিয়া যাইবে, তখন যেন স্মৃতি-পটে ইহা পুনরায় দেখিতে পাই।

পর্বত গাত্রে কূটীরশ্রেণী—তাহা ঘিরিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শস্তক্ষেত্র, কত পরিচরমে পর্বতের গাত্রে এগুলি খুদিয়া বাহির করিতে হইয়াছে। দূর হইতে এগুলি অলিন্দের মত দেখায়, কখনও বা মনে হয় দীর্ঘ সোপানাবলী

কারাগারে প্রত্যাবর্তন

গিরিগাত্র হইতে শীর্ষে উঠিয়া গিয়াছে। জনবিরল বসতিঃ মুষ্টিমেয় মানব প্রকৃতির নিকট হইতে অতি সামান্য শস্য পাইবার জ্ঞা কি অসামান্য পরিশ্রম করিয়াছে। তাহাদের প্রয়োজনের পক্ষে যাহা পর্যাপ্ত নহে, তাহাই পাইবার জ্ঞা কত দীর্ঘকালব্যাপী অবিরত শ্রম ইহারা করিতেছে। পর্বতের পার্শ্বে সমতলভূমির কবিত ফেত্রগুলি, গার্হস্থ্য জীবনের আত্ম বহিয়া আনে,—তাহারই পার্শ্বে, উর্দ্ধে, কৃষ্ণ অরণ্যানীর সম্পূর্ণ বিভিন্ন আশ্চর্য্য রূপ!

দিবাভাগ অত্যন্ত আরামপ্রদ—বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পর্বতে পর্বতে জীবনের স্পন্দন জাগিল; দূরত্বের ব্যবধান যেন রহিল না, তাহাদের সহিত পরিচিত বন্ধুর ঘনিষ্ঠতা অনুভব করিতে লাগিলাম। কিন্তু দিবাবসানে তাহাদের এই প্রসন্ন মূর্তির কি আমূল পরিবর্তন। “জগতের উপর দিয়া দীর্ঘ পদক্ষেপে রজনীর যাত্রারস্তুর” সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিকের পর্বতমালা শীতল গাভীর্ঘ্যে ভরিয়া উঠে, জীবন গুহার অতলে আত্মগোপন করে, কেবল বহুপ্রকৃতি আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। চন্দ্রালোকে অথবা তারকার মূহুভাতিতে পর্বতমালা, চরাচর পরিবাণ্ড ভীতি-মিশ্রিত রহস্যময় বলিয়া মনে হয়, কঠিন বাস্তব বলিয়া যেন মনে হয় না, উপত্যকা হইতে উপত্যকায় বাতাস কাঁদিয়া ফেরে। একক পথিক জনহীন পথে ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠে, সে সর্বত্র দেখে আতঙ্কের ছায়া। এমন কি, বায়ুর শব্দ উদ্ধত পরিহাসের মত মনে হয়। কখনও বা বায়ুহীন শব্দহীন নিষ্কম্প নিস্তক্ৰতায় বক্ষ ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। কেবল টেলিগ্রাফের তার হইতে মৃদু গুঞ্জনধ্বনি উঠিতে থাকে, তারাগুলি অধিকতর উজ্জল ও নিকটবর্তী বলিয়া মনে হয়। ‘পর্বতমালা নিষ্করণ গাভীর্ঘ্যে চাহিয়া থাকে, তাহার রহস্তের সম্মুখে মুখোমুখী দাঁড়াইতে ভয় হয়। পাদকালের মতই মনে হয়, “এই অসীম বিস্তারের অনন্ত নিস্তক্ৰতায় আমি ভীত।” সমতলক্ষেত্রে রজনী এত নিস্তক্ৰ নহে; কাঁটপতঙ্গ ও পশুপক্ষীর শব্দে রজনীর নিস্তক্ৰতা ভাঙিয়া যায়।

কিন্তু শীত রজনীর নিরানন্দ আবির্ভাব তখনও বহুদূরে—আমরা মোটরে আলমোড়ায় চলিয়াছি। আমাদের গন্তব্যস্থান নিকটবর্তী, এমন সময় পথের মোড় ঘুরিতেই, মেঘমুক্ত এক অপূর্ণ দৃশ্য উন্মোচিত হইল। আমি বিশ্মিত আনন্দে চাহিয়া দেখিলাম। তুমার-মোলী হিমগিরির শৃঙ্গরাজি, অরণ্যানীমণ্ডিত পর্বতমালার উর্দ্ধে সমুদ্র-শির। যুগযুগান্তের জ্ঞান গভীর প্রশান্তি লইয়া ইহারা যেন বিশাল ভারতের শিরেরে সমাজাগ্রত প্রহরী। ইহাদের দেখিয়া হৃদয় ও মন জুড়াইল; সমতলক্ষেত্রে

জওহরলাল নেহরু

তাহার সহিত এই সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতের সুযোগ আমার পক্ষে দুর্লভ সৌভাগ্য,—সম্ভবতঃ তাহার পক্ষেও। আমাদের সাক্ষাতের দিন ডাক্তারেরা তাহাদের বাঁধাধরা নিয়ম স্থগিত রাখিতেন, এবং আমি অনেকক্ষণ তাহার সহিত আলাপের সুবিধা পাইতাম। আমরা পরস্পরের গাঢ় সান্নিধ্য অল্পভব করিতাম, তাহাকে ছাড়িয়া যাইবার সময় বেদনা অল্পভব করিতাম। আমাদের মিলন যেন বিচ্ছিন্ন হইবার জন্মই। তখন আমার বেদনার সহিত মনে পড়িত, এমন দিন আসিবে যখন আমাদের আর সাক্ষাৎ হইবে না।

আমার মাতা সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া চিকিৎসার্থ বোম্বাই গিয়াছিলেন। শুনিলাম তাহার অবস্থার উন্নতি হইতেছে। জাহুয়ারী মাসের মধ্য ভাগে একদিন প্রভাতে তারযোগে এক অপ্রত্যাশিত সংবাদ পাইয়া আহত হইলাম। তাহাকে পক্ষাঘাত রোগ আক্রমণ করিয়াছে। তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ম আমার বোম্বাই জেলে বদলী হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তাহার অবস্থার একটু উন্নতি হওয়ায় আমাকে সেখানে পাঠান হইল না।

জাহুয়ারী গিয়া ফেব্রুয়ারী আসিল। বাতাসে বসন্ত আগমনের কানাকানি শুনিলাম। বুলবুল ও অগ্ন্যাগ্ন পাখী আসিয়া পুনরায় কুজন আরম্ভ করিল, ক্ষুদ্র তৃণাকুরগুলি রহস্যের অন্তরাল হইতে বাহিরে আসিয়া আশ্চর্য্য পৃথিবীর দিকে নিনিমেষে চাহিতে লাগিল। রডোডেগুন গুচ্ছ, পর্বতগাত্র শোণিতাভ লোহিত বর্ণে রঞ্জিত করিল এবং তরুরাজিতে নবপল্লব ফুটিতে লাগিল। আমি বসিয়া বসিয়া দিন গণি, কবে আবার ভাওয়ালীতে যাইব। বিরহ নিষ্ঠুরতা ও ব্যর্থতার পর জীবনে মহার্ঘ পুরস্কার আসে, এই কথার মধ্যে কি সত্য আছে, আমি বিস্মিত হইয়া ভাবি। সম্ভবতঃ উহা ব্যতীত পুরস্কারের যোগ্য মূল্য আমরা বুঝিতে পারিতাম না। চিন্তাকে স্পষ্ট করিয়া লইবার জন্ম যেমন দুঃখের প্রয়োজন আছে, কিন্তু দুঃখের আতিশয্য মস্তিষ্কে আচ্ছন্ন করিতে পারে। কারাগারে মানুষকে আত্মবিশ্লেষণে প্রবৃত্ত করে। আমি কারাগারের দীর্ঘ বর্ষগুলিতে আপনাতে আপনি সমাহিত হইতে বাধ্য হইয়াছি। স্বভাবতঃ আমার প্রকৃতি অন্তর্মুখী নহে, কিন্তু কারাজীবন কড়া কফি অথবা কুচিলা বিষের মত মানুষকে অন্তর্মুখী করিয়া তোলে। সময় সময় নিজেকে লইয়া কৌতুক করিবার জন্ম আমি অধ্যাপক ম্যাকডুগালের পদ্ধতিতে অন্তর্মুখ অবস্থা পরিমাপ করিতাম এবং আমি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতাম যে কত দ্রুত তাহার অবস্থান্তর ঘটে।

কতকগুলি আধুনিক ঘটনা

“রজনীর যাত্রাপথ উষার তরণরাগে রঞ্জিত হয়, কিন্তু আমাদের জীবনের দিন আব ফিরিয়া আসে না। দূর দিখলয় রেখায় চক্ষু ভরিয়া উঠে, কিন্তু বেদনার উৎস হৃদয়ের গভীর অতলে সমাহিত থাকে”।

-লি তাই-পো :

সংবাদপত্র হইতে বোম্বাই কংগ্রেসের বিবরণ জানিতে পারিলাম। ইহার রাজনীতি এবং কে কি করিলেন তাহা জানিবার জন্য আমার স্বভাবতঃই আগ্রহ ছিল। বিশ বৎসরের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের ফলে কংগ্রেসের সহিত আমার প্রাণগত যোগ অতি নিবিড়। আমার ব্যক্তিতকে প্রায় উহার মধ্যেই বিসর্জন দিয়াছি। কোন পদ বা দায়িত্ব অপেক্ষা এই মহান প্রতিষ্ঠান এবং আমার সহস্র সহস্র পুরাতন সহকর্মী বন্ধুর সহিত স্নেহবন্ধন অধিকতর শক্তিশালী। কিন্তু ইহার বিবরণ পাঠ করিয়া আমি উৎসাহ বা উত্তেজনার কিছুই খুঁজিয়া পাইলাম না। কয়েকটা উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত ব্যতীত সমগ্র ব্যাপারটাই নিরানন্দ ও অবসাদজনক। আমার মনে হইল, আমি সেখানে থাকিলে কি করিতাম। নূতন ভাবনা এবং আমার পারিপার্শ্বিক অবস্থায় আমার চিন্তে কি ভাবের উদয় হইত তাহা বলা কঠিন। জেলে বসিয়া নিজের মনকে জোর করিয়া কোনও বস্তুনিষ্ঠ সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য করা অত্যন্ত অযৌক্তিক; কেন না একপক্ষ সিদ্ধান্তের এখন কোন প্রয়োজন নাই। সময় আসিলে আমাকে তৎকালীন সমস্যাগুলির সম্মুখীন হইয়া কর্তব্য স্থির করিতে হইবে। কি করিব, তাহা পূর্বে হইতে কল্পনা করা নির্বুদ্ধিতা মাত্র। এমন কি, কোন কিছু ঠিক করার পূর্বেই আমার মনের মধ্যেও ভাবান্তর ঘটিতে পারে।

এই দূর হিমগিরির কোলে বসিয়া যতদূর সম্ভব আমি কংগ্রেসের দুইটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিলাম। এক গান্ধীভীর ব্যক্তিত্বের অসামান্য প্রভাব, অপর পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং শ্রীযুক্ত আনের কীৰ্ত্তি দ্বারা সাম্প্রদায়িক প্রতিবাদ। যাহারা ভারতীয় জনসাধারণ ও মধ্যশ্রেণীর মানসিক গতি প্রকৃতি অবগত আছেন, গান্ধীভীর ভারতবর্ষের উপর এই অতুলনীয় প্রভাব দেখিয়া তাঁহারা নিশ্চয়ই বিস্মিত হইবেন না। সরকারী

জওহরলাল নেহরু

কর্মচারীরা এবং কোন কোন রাজনৈতিক কল্লনা করেন এবং ভাবিয়া আনন্দিত হন যে রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধিজীর খেলা শেষ হইয়া গিয়াছে, অন্ততঃপক্ষে তাঁহার প্রভাব বহুল পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। কিন্তু তিনি যখন পুরাতন কর্মশক্তি ও প্রভাব লইয়া পুনরায় আবির্ভূত হন, তখন তাঁহারা এই দৃশ্যমান পরিবর্তনের নূতন কারণ খুঁজিতে আরম্ভ করেন। তিনি যে কংগ্রেস ও দেশের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন তাহার কারণ তাঁহার কোন বিশেষ মত নহে। (সাধারণতঃ তাহা গৃহীত হইয়া থাকে) তাহা তাঁহার অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের জন্ত। ব্যক্তিত্বের প্রভাব সর্ব দেশেই বিद्यমান, তবে অত্যাচ্ছ দেশ অপেক্ষা ভারতেই ইহার প্রভাব সমধিক দৃষ্ট হয়।

তাঁহার কংগ্রেস হইতে অবসর গ্রহণ এই অধিবেশনের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বাহ্যতঃ ইহা দ্বারা কংগ্রেসী আন্দোলনের ইতিহাসের এক মহান অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটিল। কিন্তু মূলতঃ ইহা তত বৃহৎ ব্যাপার নহে। কেন না তিনি ইচ্ছা করিলেও এই নেতৃত্বের আসন হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না। তাঁহার এই প্রতিষ্ঠা কোন পদগৌরব বা অন্য কোন প্রকার যোগাযোগের উপর নির্ভর করে না। অত্বেকার কংগ্রেসে পূর্বের মতই তাঁহারই মতবাদ প্রতিবিম্বিত; কংগ্রেস যদি তাঁহার নির্দিষ্ট পথ হইতে সরিয়াও যায় তাহা হইলেও গান্ধিজীর প্রভাব কংগ্রেস ও দেশের উপর বহুল পরিমাণে বিद्यমান থাকিবে। এই ভার ও দায়িত্ব হইতে তিনি নিজেকে মুক্ত করিতে পারেন না। ভারতে প্রচলিত অবস্থা হইতে উদ্দেশ্যগুলির দিক দিয়া বিচার করিলে তাঁহার ব্যক্তিত্ব যে কোন ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে এবং তাহা ভুলিবার উপায় নাই।

বর্তমানে কংগ্রেস যাহাতে বিব্রত না হয় এই জন্তই তিনি উহা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি ব্যক্তিগতভাবে কোনপ্রকার প্রত্যক্ষ উপায় অবলম্বনের চিন্তা করিয়াছেন যাহার ফলে গভর্নমেন্টের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে। ইহাকে তিনি কংগ্রেসের মধ্যদিয়া পরিচালনা করিতে চাহেন না।

দেশের শাসনতন্ত্র নির্ণয়ের জন্ত কংগ্রেস গণপরিষদের আদর্শ গ্রহণ করায় আমি আনন্দিত হইলাম। আমার মনে হয় সমস্তা সমাধানের অন্য কোন পথ নাই এবং আমার বিশ্বাস, কোন না কোন সময়ে ঐরূপ পরিষদ আহ্বান করিতে হইবে। যদি কোন বিপ্লব সাফল্যলাভ করে, সে স্বতন্ত্র কথা, অন্যথা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সম্মতি ব্যতীত ইহা অবশ্য হইতে পারে না এবং ইহাও স্পষ্ট যে, বর্তমান অবস্থায় ঐরূপ সম্মতি পাওয়া যাইবে

কতকগুলি আধুনিক ঘটনা

না। অতএব প্রকৃত পরিষদ আহ্বান করিতে হইলে দেশের মধ্যে প্রকৃত শক্তির উদ্বোধন হওয়া আবশ্যক। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, উহা ব্যতীত রাজনৈতিক সমস্যাগুলিরও সমাধান হইবে না। কোন কোন কংগ্রেস নেতা গণপরিষদের আদর্শ গ্রহণ করিলেও উহাকে পুরাতন ছাঁচের এক বৃহৎ সর্বদল সম্মিলনীতে নামাইয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা নিফল হইতে বাধ্য। কেন না স্বয়ং নির্বাচিত সেই পুরাতন ব্যক্তিরা আসিয়া মিলিত হইবেন এবং কিহুতেই একমত হইবেন না। গণপরিষদের মর্মকথা এই যে উহা ব্যাপকভাবে গণসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবে এবং গণসাধারণ হইতে উহা প্রেরণা এবং শক্তি সংগ্রহ করিবে। এইরূপ সম্মেলন সোজাসজি প্রকৃত সমস্যাগুলির সম্মুখীন হইতে পারিবে এবং পূর্বের মত সাম্প্রদায়িক বা অন্য কোনপ্রকার বাধা রাস্তায় থাকিবে না।

এই প্রস্তাবে সিমলা ও লগুনে অভ্যন্তরীণ কৌতূহলোদ্দীপক প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। আধা সরকারীভাবে জানাইয়া দেওয়া হইল যে গভর্নমেন্টের ইহাতে কোন আপত্তি নাই; তাঁহারা মুকুন্ধির মত ইহা অতুমোদন করিলেন। কেন না তাঁহাদের আশা ছিল যে পুরাতন ধরণের সর্বদল সম্মিলনীর মত ইহা বার্থ হইবেই এবং তাহাতে তাঁহাদেরই শক্তি বাড়িবে। পরে অবশ্য তাঁহারা এই প্রস্তাবের বিপদ-সম্ভাবনা বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত জোরের সহিত প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

বোম্বাই কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচন আসিল। কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক কার্যপ্রণালীর প্রতি আমার নিকটসহ মতেও আমি কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম এবং কংগ্রেসপ্রার্থীদের সাফল্য কামনা করিতে লাগিলাম, অথবা আরও সত্য করিয়া বলিলে বলিতে হয় আমি তাহাদের বিরোধীদের পরাজয় প্রত্যাশা করিতে লাগিলাম। এই সকল বিরোধীদের মধ্যে ভাগ্যান্বেষী সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও বিশ্বাসঘাতক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক ছিল এবং ইহারা গভর্নমেন্টের দমননীতি দ্রুততার সহিত সমর্থন করিয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই যে পরাজিত হইবে সে সম্বন্ধে অগুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু চূর্তাগাক্রমে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা মূল লক্ষ্য দুর্নিরীক্ষা করিয়া তুলিয়াছিল এবং তাহাদের অনেকে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির সুবিস্তৃত পক্ষপৃষ্ঠে আশ্রয় লইয়াছিল। ইহা সত্ত্বেও কংগ্রেস আশ্চর্য সাফল্যলাভ করিল এবং আমি দেখিয়া সুখী হইলাম যে বহু অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তি ব্যবস্থা পরিষদে প্রবেশ করিতে পারিল না।

তথাকথিত কংগ্রেস জাতীয়দলের মনোভাব আমার নিকট অতিমাত্রায় শোচনীয় মনে হইল, সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার প্রতি তাহাদের তীব্র

জওহরলাল নেহরু

বিরোধিতার অর্থ বুঝা যায়, কিন্তু তাঁহারা নিজেদের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির আশায় অতিমাত্রায় সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত মিলিত হইলেন। এমন কি, ভারতে রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়া সর্বাধিক প্রতিক্রিয়াপন্থী সনাতনীদের সহিত, এবং সেই সঙ্গে বহু নিম্নিত চরিত্র রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াপন্থীর সহিত একত্র মিলিত হইলেন। বাংলাদেশে অবশ্য কতকগুলি বিশেষ কারণে একটা শক্তিশালী কংগ্রেসী দলের সমর্থন তাঁহারা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ছাড়া তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সকল দিক দিয়াই কংগ্রেস বিরোধী ছিলেন। এমন কি অনেকে খ্যাতনামা কংগ্রেস বিদ্রোহী। এই সকল বিরুদ্ধ শক্তি এবং জমিদার ও লিবারেলগণের এবং সরকারী কর্মচারীগণের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও কংগ্রেসপ্রার্থীরা অনেকাংশে সাকল্য লাভ করিয়াছিলেন।

সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের মনোভাব অভূতপূর্ব, তথাপি অবস্থা বিবেচনায় ইহার অতি অল্প ইতর বিশেষই হইতে পারিত। ইহা তাহাদের অতীতের নিরপেক্ষ দুর্বলনীরতির অবশ্যস্বাভাবী ফল। সূচনাতেই আশু পরিণাম গ্রাহ্য না করিয়া দৃঢ়তার সহিত কর্মপন্থা নির্বাচন করিয়া লইলে তাহা অধিকতর মর্যাদাসূচক এবং নিভুল হইতে পারিত। কিন্তু কংগ্রেস উহা করিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় বর্তমান সিদ্ধান্ত ব্যতীত অগ্র কোন পথ তাঁহারা দেখিতে পাইলেন না। সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা অত্যন্ত অযৌক্তিক এবং উহা মানিয়া লওয়া অসম্ভব; কেন না যতদিন উহা বিদ্যমান থাকিবে ততদিন কোন স্বাধীনতাই সম্ভবপর নহে। ইহার কারণ ইহা নহে যে মুসলমানদিগকে অনেক বেশী দেওয়া হইয়াছে। সম্ভবতঃ তাঁহারা যাহা চাহিয়াছিলেন, ভিন্ন প্রকার উপায়ে তাহা দেওয়া যাইতে পারিত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভারতবর্ষকে কতকগুলি স্বতন্ত্র-ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন, প্রত্যেকে প্রত্যেকের ভারসাম্য রক্ষা করিবে এবং একে অন্নের প্রভাব হ্রাস করিবে, যাহাতে বৈদেশিক ব্রিটিশ প্রতিনিধিগণই সর্বোৎকর্ষ হইয়া থাকিতে পারেন। ইহাতে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রতি নির্ভরতা অনিবার্য।

বিশেষতঃ বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ইউরোপীয় সম্প্রদায়কে অধিক সংখ্যক আসন দিয়া হিন্দুদের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হইয়াছিল। এই প্রকার বাটোয়ারা অথবা সিদ্ধান্ত অথবা ইহাকে যাহাই বলা হউক না কেন তাহার বিরুদ্ধে তিস্ত্রী জোখ উদ্দীপ্ত হইবেই এবং ইহা জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া যাইতেও পারে অথবা রাজনৈতিক কারণে সাময়িকভাবে লোকে সহ্য করিতে পারে, কিন্তু ইহার মধ্যে নিয়ত সংঘর্ষের

কতকগুলি আধুনিক ঘটনা

সম্ভাবনা থাকিয়াই যাইবে। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি ইহার অন্তর্নিহিত অন্ত্যায়ই ইহার একটা অন্তকূল দিক, কেন না এই অন্ত্যায় কোন কিছুই স্থায়ী ভিত্তি হইতে পারে না।

জাতীয়দল এবং তদপেক্ষাও অধিকভাবে হিন্দু মহাসভা ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি স্বভাবতঃই এই বলপ্রয়োগে ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের সমালোচনার প্রকৃত ভিত্তি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মতবাদের স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং উহার সমর্থকগণও উহাকেই ভিত্তিকপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহার ফল হইল এই যে তাঁহারা এমন এক আশঙ্ক্য কৰ্মনীতি গ্রহণ করিতে লাগিলেন যাহা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে অত্যন্ত সমস্যার বিষয়। বাটোয়ারা লইয়া অতিমাত্রায় মাতামাতির ফলে অন্যান্য গুরুতর ব্যাপারে তাঁহাদের বিরুদ্ধতা মন্দীভূত হইল এবং তাহারা আশা করিতে লাগিলেন যে উৎকোচ দিয়া অথবা তোষামোদ করিয়া গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক তাহাদের অন্তকূলে বাটোয়ারা পরিবর্তন করিতে সক্ষম হইবেন। এইপথে হিন্দু মহাসভা সকলের চেয়ে অধিক অগ্রসর হইলেন। কিন্তু এই কথা তাঁহাদের মনে হইল না যে ইহা কেবল অপমানজনক অবস্থা নহে, পরন্তু ইহার ফলে বাটোয়ারার পরিবর্তন অধিকতর কঠিন হইয়া উঠিবে, কেন না ইহাতে কেবলমাত্র মুসলমানেরা অধিকতর বিরক্ত হইবে এবং আরও দূরে সরিয়া যাইবে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে জাতীয়তাবাদীদের চিত্ত জয় করা অসম্ভব—ব্যবধান অতি বৃহৎ এবং বিপণীত স্বার্থের সংঘাতও স্পষ্ট, অতি সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থের ব্যাপারও তাহাদের পক্ষে হিন্দু এবং মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীদেরকে সমানভাবে সম্বোধন করা অসম্ভব। একটাকে বাছিয়াই লইতে হইবে এবং তাঁহাদের দিক হইতে তাঁহারা মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীদেরকে সম্বোধন করিয়া থাকি করিয়াছেন। মুষ্টিমেয় হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীকে দলে টানিবার জন্য তাঁহারা কি এত প্রচেষ্টা লাভজনক নীতি তাগ করিবেন এবং মুসলমানদিগের মনে ব্যথা দিবেন?

সম্প্রদায় হিসাবে হিন্দুরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকতর অগ্রসর এবং তাহারা ই বিশেষভাবে জাতীয় স্বাধীনতার দাবী করিয়া থাকে। এই ঘটনাই তাহাদিগকে অন্তগ্রহণ না করিবার প্রধান কারণ, কেন না ছোটখাট সাম্প্রদায়িক অন্তগ্রহণ (ছোটখাট ছাড়া উহা আর কিছুই হইতে পারে না) দ্বারা রাজনৈতিক বিরোধিতার কোন ইতর বিশেষ হইবে না। তবে ঐ সকল অন্তগ্রহণ দ্বারা মুসলমানদিগের মনোভাবের সাময়িক পরিবর্তন হইতে পারে মাত্র।

ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচনে হিন্দু মহাসভা এবং মুসলিম কনফারেন্স এই দুই অতিমাত্রায় প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের পশ্চাতে যে সকল

জওহরলাল নেহরু

লোক আছেন তাঁহাদের স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িল। তাহাদের প্রার্থী এবং সমর্থকগণ বড় জমিদার অথবা ধনী মহাজনশ্রেণীর। আধুনিক ঋণ লাঘব বিলগুলির তীব্র বিরোধিতা করিয়া মহাসভা মহাজনশ্রেণীর প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ প্রদর্শন করিলেন। হিন্দু সমাজের উপরের স্তরের এক সামান্য অংশ লইয়া হিন্দু মহাসভা গঠিত এবং উহারই আর এক অংশ কতকগুলি বৃত্তিজীবী ব্যক্তিসহ লিবারেল দল নামে পরিচিত। হিন্দুদের মধ্যে নিম্ন মধ্যশ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সচেতন বলিয়া উহাদের গুরুত্ব অধিক নহে। কলকারখানার মালিকেরাও ইহাদের মধ্য হইতে নিজেদের স্বতন্ত্র করিয়া লইয়াছেন। কেন না উদীয়মান কলকারখানার দাবীর সহিত অর্দ্ধ সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বার্থের বিরোধ রহিয়াছে। কলকারখানার মালিকেরা প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ অথবা অন্ত কোনপ্রকার বিপজ্জনক উপায় গ্রহণ করিতে সাহস পান না, তাঁহারা জাতীয়তাবাদ এবং গভর্নমেন্ট উভয়ের সহিতই সম্ভাব রাখিতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা মডারেট অথবা সাম্প্রদায়িক দলগুলির প্রতিও বড় বেশী আগ্রহশীল নহেন। কলকারখানার উন্নতি এবং মোটা রকমের লাভ এই উদ্দেশ্যেই তাঁহারা পরিচালিত হন।

মুসলমানদের মধ্যে নিম্ন ও মধ্যশ্রেণীতে এখনও জাগরণ আসে নাই এবং শিল্প বাণিজ্যেও তাহারা পশ্চাৎপদ। এই কারণেই আমরা দেখিতে পাই অতি মাত্রায় প্রতিক্রিয়াপন্থী সামন্ততান্ত্রিক এবং পেন্সনভোগী সরকারী কর্মচারীরা তাহাদের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ন্ত্রিত করেন এবং সম্প্রদায়ের উপর অনেক খানি প্রভাব বিস্তার করিয়া আছেন। মুসলিম কনফারেন্স একদল নাইট, ভূতপূর্ব মন্ত্রী এবং জমিদার লইয়া গঠিত, তথাপি আমার বিবেচনায় মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে হিন্দু জনসাধারণের অপেক্ষাও অধিকতর প্রস্থপ্ত শক্তি রহিয়াছে, কেন না সামাজিক ব্যাপারে তাহাদের কতকগুলি স্বাধীনতা আছে এবং ইহারা যদি একবার চলিতে সুরু করে, তাহা হইলে তাহারা সমাজতান্ত্রিক পথে অধিকতর দ্রুত অগ্রসর হইবে। কিন্তু বর্তমানে মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা কি মানসিক কি দৈহিক উভয় দিকেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া আছেন, ইহাদের মধ্যে কোন গভীর চাঞ্চল্য নাই, ইহারা পুরাতন মুরুব্বিদের প্রদ্বন্দ্ব করিতেও সাহস পান না।

রাজনীতিক্ষেেত্রে সর্বাধিক অগ্রগামী বৃহৎ দল কংগ্রেসের নেতৃমণ্ডলীও, জনসাধারণের অবস্থার অল্পপাতে প্রয়োজন অপেক্ষাও অধিক সাবধানী। তাঁহারা জনসাধারণের সমর্থন চাহেন কিন্তু কদাচিৎ তাহাদের মতামতের উপর নির্ভর করেন, অথবা তাহাদের অভাব অভিযোগ অস্বীকার

কতকগুলি আধুনিক ঘটনা

করেন। ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচনের পূর্বে, তাঁহারা অ-কংগ্রেসী মডারেট-দিগকে দলে টানিবার জন্য কার্যপদ্ধতি যথাসম্ভব নরম করিবার চেষ্টা করিলেন। এমন কি, মন্দির প্রবেশ বিলের মত ব্যাপারেও তাঁহাদের মধ্যে নানারূপ মত দেখা গেল, মাদ্রাজের হোড়া সনাতনীদের মন ভিজাইবার জন্য আশ্বাস দেওয়া হইল। সরল নিভীক এবং আক্রমণশীল কর্মপদ্ধতি উপস্থিত করিলে, দেশে অধিকতর উৎসাহ দেখা যাইত এবং জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষাও সহায়তা হইত। কিন্তু কংগ্রেস নিয়মতান্ত্রিক পার্লামেন্ট কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করার ফলে, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থগুলির সহিত, ব্যবস্থা পরিষদে কয়েকটি ভোটের আশায়, নানাভাবে আপোষ রক্ষা করিতে হইবে এবং তাহার ফলে জনসাধারণ ও কংগ্রেসের নেতৃমণ্ডলীর মধ্যে ব্যবধান আরও প্রশস্ত হইবে। চমৎকার বক্তৃতা হইবে, পার্লামেন্টি আদর্শ কায়দার অনুকরণ চলিবে,—মাঝে মাঝে গভর্নমেন্ট পরাজিত হইবেন—এবং অতীতের মতই এই সকল পরাজয় গভর্নমেন্ট অল্পদিন চিতে উপেক্ষা করিবেন।

যখন কংগ্রেস আইনসভাগুলি বর্জন করিয়াছিল, সেই কয় বৎসর সরকারপক্ষের লোকেরা আমাদের প্রায়ই শুনাইয়াছেন যে, ব্যবস্থা পরিষদ ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলি জনসাধারণের যথার্থ প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান এবং এইখানেই জনমত প্রতিক্রিয়া হয়। কিন্তু যখন অগ্রগামী দল গিয়া ব্যবস্থাপরিষদে প্রভাব বিস্তার করিলেন তখন সরকারী মতেরও পরিবর্তন হইল। যখনই নির্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্যের কথা উঠে, তখনই অপর পক্ষ বলেন নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যা অতিশয় কম—৩২কোটি লোকের মধ্যে মাত্র ৩০লক্ষ ভোটার। যে কোটি কোটি লোকের ভোটাধিকার নাই, তাহারা সরকারপক্ষের মতে একযোগে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে সমর্থন করিয়া থাকে। সহজেই ইহার প্রতিকার হইতে পারে। প্রাপ্যবয়স্ক নর-নারীদের ভোটাধিকার দিলেই অন্ততঃ আমরা ঐ সকল লোকের চিন্তাধারা বুঝিতে পারিব।

ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে জয়েন্ট পার্লামেন্টি কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইল। ইহার বহুবিধ ও ব্যাপক সমালোচনার মধ্যে একটি ক্রটি বারবার উদ্ঘাটিত করিয়া দেখান হইতে লাগিল যে, ভারতবাসীর প্রতি “সন্দেহ” ও “অবিশ্বাস” লইয়া ইহা রচিত হইয়াছে। আমাদের জাতীয় ও সামাজিক সমস্তার দিক হইতে দেখিলে ঐ মন্তব্য অত্যন্ত বিস্ময়কর। আমাদের জাতীয় স্বার্থ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের মধ্যে কি মর্মগত কোন বিরোধ

নাই? মুখ্য প্রশ্ন হইল যে কোনটা টিকিবে? সাম্রাজ্যনীতি চালাইবার জগুই :কি আমরা স্বাধীনতা চাহিতেছি? অন্ততঃ ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের ঐক্যপই ধারণা; তাঁহাদের মতে ব্রিটিশ-নীতির প্রয়োজনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া আমরা যতদিন সম্ভবে স্বায়ত্ত-শাসনে আমাদের যোগ্যতা প্রমাণের চেষ্টা করিব, ততদিন “রক্ষাকবচ” গুলি ব্যবহার করা হইবে না। যদি ব্রিটিশ-নীতিই ভারতে চলিতে থাকে, তাহা হইলে শাসন-রশ্মি আমাদের হাতে আনিবার জগু এত চাঁৎকারের আবশ্যক কি?

এক ভারতীয় বাণিজ্য * ব্যতীত, ওটাওয়া চুক্তিতে ইংলণ্ডের বিশেষ আর্থিক লাভ হয় নাই, ইহা সর্বজনবিদিত। ভারতীয় রাজনৈতিক ও ব্যবসায়ীদের মতে, ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের ক্ষতি সাধন করিয়া ইহা দ্বারা ভারতে ব্রিটিশ-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু উপনিবেশগুলিতে বিশেষভাবে কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার ণ অবস্থা হইয়াছে বিপরীত। তাহার ব্রিটেনের সহিত দর কষাকষি করিয়া ব্রিটেন অপেক্ষাও অনেক বেশী সুবিধা আদায় করিয়া লইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও তাহার ওটাওয়া চুক্তির বন্ধন হইতে সততই মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতেছে; কেন না তাহার নিজের শিল্পবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি চাহে এবং স্বাধীনভাবে অগ্রাগ্র দেশের সহিত বাণিজ্য করিতে চাহে। ‡ কানাডার সর্বপেক্ষা শক্তিশালী লিবারেল

* ভারতীয় বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করিয়া স্তর উইলিয়ম কারী বলেন, ওটাওয়া চুক্তির ফলে ব্রিটেন সুনিশ্চিত সুবিধা পাইয়াছে।—১৯৩৪-এর ৫ই ডিসেম্বর লণ্ডনে পি এণ্ড ও জাহাজ কোম্পানীর সভায় স্তর উইলিয়ম সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

† দি লণ্ডন ইকনমিস্ট (জুন, ১৯৩৪) বলিতেছেন, “ওটাওয়া বৈঠক সার্থক হইতে পারিত যদি ইহা দ্বারা সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইত অথচ অবশিষ্ট জগতের সহিত সাম্রাজ্যের বাণিজ্য হ্রাস না হইত। কার্যতঃ ইহা দ্বারা সাম্রাজ্যের আন্তঃসরূপ বাণিজ্য কিছু বাড়িলেও সাম্রাজ্যের সর্বমোট বাণিজ্য হ্রাস হইয়াছে। এবং এই পরিবর্তনে খ্রিষ্ট ব্রিটেন অপেক্ষা উপনিবেশগুলিরই সুবিধা হইয়াছে বেশী। সাম্রাজ্য হইতে আমাদের আমদানী ১৯৩১-সালে ২৪কোটি ৭০লক্ষ পাউণ্ড হইতে ১৯৩৩ সালে ২৪কোটি ৯০লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু আমাদের রপ্তানী ১৭কোটি ৬লক্ষ পাউণ্ড হইতে ১৬কোটি ৩৫লক্ষ পাউণ্ডে আদিয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৯২৯ এবং ১৯৩৩-এর মধ্যে সাম্রাজ্যে আমাদের রপ্তানীর পরিমাণ শতকরা ৫০.২ ভাগ কমিয়াছে, কিন্তু সাম্রাজ্য হইতে আমাদের আমদানী মাত্র ৩২.৯ ভাগ কমিয়াছে। অগ্রাগ্র বৈদেশিক রাষ্ট্রে আমাদের রপ্তানী তত বেশী কমে নাই, তবে ঐ সকল দেশ হইতে আমদানী বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে।”

‡ মেনবোর্ণ ‘এজ’ ওটাওয়া চুক্তি পছন্দ করেন না। ইহার মতে ঐ চুক্তি “সর্বদাই বিরক্তির কারণ এবং ক্রমেই বুঝা যাইতেছে যে উহা এক প্রকাণ্ড ভুল।” (১৯৩৪, ১৯শে অক্টোবর, সাপ্তাহিক মার্কেটার গার্ডিয়ান হইতে উদ্ধৃত।)

কতকগুলি আধুনিক ঘটনা

দল বাহারা শীঘ্রই গ্ৰন্থমন্ডলের ভার গ্রহণ করিবে এরূপ সম্ভাবনা আছে ; তাহারা গুট্টাওয়া চুক্তির অবসান করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।* অষ্ট্রেলিয়ার গুট্টাওয়ার কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা করিয়া কোন কোন শ্রেণীর কার্পাসবস্ত্র ও সূতার উপর শুদ্ধ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ইহার ফলে লাক্সামায়ারের কাপড়ের কলওয়ালারা বিষম ক্রুদ্ধ হইয়াছেন এবং ইহাতে গুট্টাওয়া চুক্তি ভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া নিন্দা করিতেছেন। ইহার প্রতিবাদ ও প্রতিশোধ লইবার জন্য লাক্সামায়ারে অষ্ট্রেলিয়ান পণ্য বয়কটের আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। এই ভীতিপ্রদর্শনে অষ্ট্রেলিয়া মোটেই বিচলিত হয় নাই, বরং তাহারাও প্রতি-আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।†

কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসীদের ব্রিটেনের প্রতি যে কোন বিদ্বেষ ভাবই থাকুক না কেন, অর্থনৈতিক সংঘর্ষের কারণ তাহা নহে। অবশ্য আয়ারলণ্ডের ক্ষেত্রে এই বিদ্বেষ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করা যায়। স্বাধের বিরোধ হইতেই সংঘর্ষ দেখা দেয়, এবং এইরূপ সংঘর্ষ যদি ভারতে দেখা যায় সেই আশঙ্কায় ব্রিটিশ স্বার্থকেই প্রাধান্য দিবার জন্য রক্ষাকবচের ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারতীয় বাবসায়ীদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও এবং সরকারের নিকট গোপন রাখিয়া অথচ ব্রিটিশ বণিকদিগের সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে অদূর যে ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্যচুক্তি হইল, যাহা ব্যবস্থা পরিসরে অগ্রাহ্য হইয়া সত্ত্বেও গভর্নমেন্ট তাগ করিতেছেন না, তাহা হইতেই বুঝা যায় “রক্ষাকবচের” গতি কোন দিকে। মনে হয়, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ঐ শ্রেণীর ‘রক্ষাকবচের’ অধিক আবশ্যক হইয়া পাড়িয়াছে।

* এমন কি কানাডায় বর্তমান রক্ষণশীল প্রশাসনমন্ত্রী মিঃ মেনেট পশ্চাত্তম বৎসর ব্যাপারে ব্রিটিশ গ্ৰন্থমন্ডলের পক্ষে কটকটক করিয়াছেন। এখন তিনি “নিউজিল্যান্ড” কথা বলিতেছেন এবং অতি আশ্চর্যরূপে স্বমত পরিবর্তন করিয়াছেন। মিঃ লিউটিনন্ট, স্তর স্ট্র্যাফোর্ড ক্রিপস এবং মিঃ জন ট্রাচার ভয়াবহ প্রভাবের ফলে তিনি এখন “স্ট্র্যাফোর্ড ক্রিপস” হইয়াছেন। ইহা হইতে রক্ষণশীল, উদারনৈতিক, মন্তিল মালিস প্রভৃতি সকলেরই সাবধান হওয়া কর্তব্য। অত্যাধা তাহারাও ঐ সকল বিপজ্জনক মতবাদের প্রতি আঁকড় হইতে পারেন। (এই কথা লিখিবার কালে মিঃ ক্রিপস এর নেতৃত্বে কানাডার উদারনৈতিক দল ভোটটিংয়ে জয়ী হইয়া শাসনস্বত্ব অধিকার করিয়াছেন।)

† দি মেলবোর্ণ ‘এক’ ঘোষণা করিয়াছেন যে, যদি লাক্সামায়ারের প্রস্তাবিত বয়কট নীতি প্রত্যাহার না হয়, তাহা হইলে এখনও লাক্সামায়ারের হেটুকু বাণিজ্য অংশিত আছে, অষ্ট্রেলিয়া তাহার উপর কঠোর আঘাত করিবে। ‘এই কথা পুনঃ পুনঃ দুইবার সহিত উল্লেখ করিয়া’ লাক্সামায়ারের জবাব দিতে হইবে” (১৯০৪-এর নভেম্বরের সাপ্তাহিক মার্কেটার গার্ডিয়ান হইতে উদ্ধৃত)।

কেবল বাণিজ্য ব্যাপারে নহে, সাম্রাজ্যের ঐক্য ও নিরাপত্তার অধিকতর প্রয়োজনীয় ব্যাপারে ঐ সকল উপনিবেশের অধিবাসীরা যাহাতে বিরোধিতা না করে, সেজন্যও ‘রক্ষাকবচ’ আবশ্যক। *

সাম্রাজ্য ঋণগ্রস্ত; অতএব যাহাতে সাম্রাজ্যবাদী মহাজন, তাহার দুর্ভাগ্য খাতকের উপর আধিপত্য এবং তাহার বিশেষ স্বার্থ ও ক্ষমতা অব্যাহত রাখিতে পারে; সেই জন্তই ‘রক্ষাকবচের’ ব্যবস্থা করা হইয়াছে; এমন কথাও শুনা যায়। গান্ধিজী ও কংগ্রেস এই শ্রেণীর ‘রক্ষাকবচ’ সম্মত হইয়াছেন, কেন না ১৯৩১-এর দিল্লীচুক্তিতে “ভারতের স্বার্থের জন্ত রক্ষাকবচ” গ্রহণের নীতি স্বীকৃত হইয়াছিল, সরকারপক্ষ হইতে এই আশ্চর্য্য যুক্তি বারবার বলা হইয়াছে।

যাহাই হউক, ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কিত রক্ষাকবচগুলি এবং ওট্টাওয়া তুলনায় অতি সামান্য ব্যাপার মাত্র। † ভারতবাসীর উপর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রত্যেকটি মূল ক্ষমতা ও অধিকার কায়েম করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে যে সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছে, ঐগুলিই বিশেষ ভাবে মারাত্মক। কেন না, অতীতে ও বর্তমানে উহা এই দেশ শোষণে সহায়তা করিয়াছে। এই সকল ব্যবস্থা ও ‘রক্ষাকবচ’ যতদিন থাকিবে, ততদিন কোন দিকে কোন উন্নতি অসম্ভব। কোন পরিবর্তন করিবার নিয়মতান্ত্রিক চেষ্টার স্থান ইহাতে নাই। ঐরূপ প্রত্যেকটি চেষ্টা ‘রক্ষাকবচের’ কঠিন প্রাচীরে ব্যাহত হইবে এবং দিনে দিনে ইহা স্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে যে, যাহা একমাত্র সম্ভবপর পথ, তাহা নিয়মতান্ত্রিক নহে। রাজনৈতিক দিক দিয়া, পৈশাচিক যুক্তরাষ্ট্র-সহ প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র অস্বাভাবিক এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক হইতে ইহা অতিশয় নিকৃষ্ট ব্যবস্থা। সমাজতন্ত্রের পথ ইচ্ছা করিয়াই বন্ধ করা হইয়াছে। বাহির হইতে

* দক্ষিণ আফ্রিকার দেশরক্ষা সচিব মিঃ ও, পির্ক বলিয়াছেন, ইউনিয়ন, সাম্রাজ্যরক্ষার সাধারণ ব্যবস্থার মধ্যে কোন অংশ গ্রহণ করিবে না এবং বৈদেশিক কোন যুদ্ধে ইংলণ্ড যোগ দিলেও ইউনিয়ন যোগ দিবে না। “যদি গভর্নমেন্ট হঠকান্ধিতার সহিত কোন বৈদেশিক যুদ্ধে লিপ্ত হন, তাহা হইলে দেশবাসীরা অশান্তির সৃষ্টি হইতে পারে। সম্ভবতঃ গৃহযুদ্ধও বাধিতে পারে। অতএব গভর্নমেন্ট সাম্রাজ্যের কোন সাধারণ ব্যবস্থার অংশ গ্রহণ করিবেন না।” প্রধানমন্ত্রী জেনারেল হার্টজগ এই ঘোষণা সমর্থন করিয়া বলেন যে ইহাই ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের নীতি। (রয়েটার প্রদত্ত সংবাদ, কেপটাউন, ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫।)

† দি লণ্ডন ইকনমিস্ট (অক্টোবর, ১৯৩৪) বলিয়াছেন,—“কিন্তু দেখা যাইতেছে, ব্রিটিশ শাসনের সুবিধার মধ্যে, উচ্চমূল্যে লাক্সাসারের মাল কিনিবার সন্দেহজনক হযোগ বলপূর্বক জগতের নানা প্রান্তে “মোটরদেহের” উপর চাপাইয়া দেওয়া হইবে।” সিংহল ইহার অতি আধুনিক জাঅল্যামান দৃষ্টান্ত।

কতকগুলি আধুনিক ঘটনা

দেখিলে অনেকখানি দায়িত্ব হস্তান্তরিত করা হইয়াছে, (তাহাও অবশ্য “নিরাপদ” শ্রেণীর হস্তে) কিন্তু কোন প্রকৃত কাজ করিবার ক্ষমতা বা উপায় দেওয়া হয় নাই। উল্লেখ্য স্বৈরাচারের লজ্জা নিবারণের জন্ত এক টুকরা লেংটির ব্যবস্থাও করা হয় নাই। প্রত্যেকেই জানেন, বর্তমান যুগে শাসনতন্ত্র এমন হওয়া উচিত, যাহা জগতের দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারে। দ্রুত সিদ্ধান্তের প্রয়োজন এবং তাহা কার্যে পরিণত করিবার ক্ষমতার আবশ্যক। এমন কি, পার্লামেন্ট গণতন্ত্র, যাহা এখনও কয়েকটি পাশ্চাত্য দেশে আছে, তাহা বর্তমান জগতের সহিত সামঞ্জস্য বিধানের জন্ত অতি আবশ্যক পরিবর্তন সাধন করিতে পারে কিনা সন্দেহ। কিন্তু আমাদের দেশে এ প্রশ্ন উঠে না, কেন না এখানে শৃঙ্খল ও বেড়ী দিয়া সর্ববিধ গতি ইচ্ছা করিয়া রোধ করা হইয়াছে এবং আমাদের সম্মুখে সমস্ত দরজা সাবধানতার সহিত অবরুদ্ধ। আমাদিগকে এমন একখানি গাড়ী দেওয়া হইয়াছে, যাহার এঞ্জিন নাই অথচ থামাইবার অসংখ্য ব্যবস্থা রহিয়াছে। যে সকল ব্যক্তির মন সামরিক আইনে ভরপুর, তাঁহারাই এই শাসনতন্ত্র রচনা করিয়াছেন। বাহুবলে বিশ্বাসী ব্যক্তির পক্ষে হয় সামরিক আইন নয় মৃত্যু,—কোন মধ্যপথ নাই।

ব্রিটেন কতখানি স্বাধীনতা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা মাপিতে গেলে দেখা যায় যে মডারেট অপেক্ষাও মডারেট এবং রাজনীতিক্ষেত্রে সর্বাধিক পশ্চাৎপদ দলগুলিও ইহাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। যাহারা সর্বদা সকল অবস্থায় গভর্ণমেন্টের সমর্থন করিয়া থাকে, তাহারাও সমস্তই নতজানু হইয়া ইহার সমালোচনা করিয়াছে। অত্যাগত সকলের সমালোচনা অধিকতর তীব্র।

এই সকল প্রস্তাব দেখিয়া লিবারেলগণও প্রমাদ গণিলেন। ভারতকে ব্রিটিশ কর্তৃত্বাধীনে স্থাপনকারী ঈশ্বরের দুর্জয় দূরদর্শিতার উপর তাঁহাদের অটল বিশ্বাস পূর্ণরূপে রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিল। তাঁহারা তীব্র-সমালোচনা করিলেন; কিন্তু বাস্তবের প্রতি অবজ্ঞা লইয়া এবং বাধা বুলি ও উদার ‘ইঙ্গিত’ের প্রতি অহুরক্তি বশতঃ তাঁহারা রিপোর্টে অথবা বিলে “ডোমিনিয়ন ষ্টেটস্” এই শব্দটি না দেখিয়া মাতামাতি করিতে লাগিলেন, ইহা লইয়া তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল, এবিষয়ে স্তর স্তরমুয়েল হোর উহাদের সমুদ্র করিবার জন্ত একটা বিবৃতি দান করিলেন। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন এক অজ্ঞাত ভবিষ্যতের অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি হইতে পারে—সেই দূর হইতে স্বদূরবর্তী দেশে আমরা কোনকালে পৌছাইতে নাও পারি, কিন্তু অন্ততঃপক্ষে আমরা তাহার স্বপ্ন দেখিতে পারি

এবং উহার বহুমুখী সৌন্দর্য্য বর্ণনায় মুগ্ধ হইয়া উঠিতে পারি। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এবং ব্রিটিশ জনসাধারণ সম্পর্কে সম্ভবতঃ সংশয়ে আন্দোলিত হইয়া স্তর তেজ বাহাদুর সপ্ত ব্রিটিশ রাজমুকুটের মধ্যে সাস্থনা অন্বেষণ করিতে ব্যাগিলেন। তিনি একজন প্রথিতযশা ব্যবহারজীবী, তিনি আমাদের এক অভিনব নিয়মতান্ত্রিক পথ দেখাইলেন। তিনি বলিলেন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এবং জনসাধারণ ভারতের জগৎ যাহাই কিছু করুক আর নাই করুক, “সকলের উর্দ্ধে রহিয়াছেন ব্রিটিশ রাজমুকুট, যিনি ভারতীয় প্রজাদের স্বার্থ এবং ভারতবর্ষের শান্তি ও সমৃদ্ধির জগৎ স্বতঃই আগ্রহশীল।” * ইহা অতিশয় সাস্থনার পথ, এখানে নিয়মতন্ত্র, আইন এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন লইয়া আমাদের মাথা ঘামাইবার কিছুই নাই।

কিন্তু লিবারেলগণ প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের প্রতি তাঁহাদের বিরুদ্ধতা শিথিল করিয়াছিলেন এই কথা বলিলে অগ্রায় করা হইবে। তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ভারতের উপর জোর করিয়া এই অনভিপ্রেত পুরস্কার চাপাইয়া দেওয়া অপেক্ষা মন্দ হইলেও তাঁহারা বর্তমান ব্যবস্থা ভাল মনে করেন। এই কথা উপর জোর দেওয়া ব্যতীত আর কিছু করা তাঁহাদের নিয়মবিরুদ্ধ। তবে তাঁহারা যে ক্রমাগত এই কথা উপর জোর দিতে থাকিবেন ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। একটি পুরাতন প্রবচনকে আধুনিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করিলে তাঁহাদের মূল নীতি এই দাঁড়ায় যে—“যদি তুমি প্রথমে সাফল্য লাভ না কর, তাহা হইলে পুনরায় ক্রন্দন কর!”

লিবারেল নেতাগণ এবং কতিপয় কংগ্রেসপন্থী সহ অগ্রায় অনেকের এক ভরসা ও আশা এই যে ব্রিটেনে শ্রমিকদল জয়লাভ করিয়া শ্রমিক গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা করিলেই একটা স্তরহা হইবে। ব্রিটেনের অগ্রগামী দলগুলির সহিত সহযোগিতা করিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা অথবা শ্রমিক গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা হইলে তাহার স্তবিধা গ্রহণ করিবার চেষ্টা ভারতবর্ষের না করিবার কোন সম্ভব কারণ নাই। কিন্তু ইংলণ্ডে ভাগ্যচক্র বিবর্তনের উপর অসহায় ভাবে নির্ভর করা মর্যাদাসূচকও নহে কিম্বা জাতীয় সম্মানের সহিত সম্মতিসূচকও নহে। মর্যাদার কথা ছাড়িয়া দিলেও সাধারণ বুদ্ধিরও কিছু ইহাতে নাই। কেন আমরা ব্রিটিশ শ্রমিকদলের নিকট অধিক প্রত্যাশা করিব? আমরা দুই দুইবার শ্রমিক গভর্নমেন্ট

* ১৯৩৫-এর ২৯শে জানুয়ারী লঙ্কো-এ এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে।

কতকগুলি আধুনিক ঘটনা

দেখিয়াছি এবং তাঁহারা ভারতবর্ষকে যে পুরস্কার দিয়াছেন তাহা সম্ভবতঃ আমরা ভুলিব না। মিঃ রান্জে ম্যাকডোনাল্ড শ্রমিকদল পরিত্যাগ করিলেও তাঁহার পুরাতন সহকর্মীদের অধিক পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ১৯৩৪-এর অক্টোবর মাসে, সাউথপোর্ট শ্রমিক দল সম্মেলনে মিঃ ভি, কে, ক্লক মেনন প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, “আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আত্মনিয়ন্ত্রণের অলঙ্ঘনীয় নীতি অনুসারে ভারতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন অবিলম্বে প্রতিষ্ঠা করা কর্তব্য।” মিঃ আর্থার হেগারসন প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করিতে অনুরোধ করেন এবং অত্যন্ত সরল ভাবে স্বীকার করেন যে, শ্রমিকদলের কার্য্যকরী সমিতির পক্ষ হইতে ভারতে আত্ম নিয়ন্ত্রণের নীতি পরিচালন করিবার কোন প্রতিশ্রুতি দিতে তিনি অক্ষম। তিনি বলিয়াছেন,—“আমরা অতি স্পষ্ট ভাবেই জানাইয়া দিয়াছি যে আমরা সম্ভব হইলে সকল শ্রেণীর ভারতীয়দের সহিতই আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছি। ইহাতেই সকলের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত।” সম্ভবতঃ এই সন্তোষ আরও গভীর হইবে, কেন না, অতীতের শ্রমিক গভর্নমেন্ট ও মন্ত্রাণাল গভর্নমেন্টও উহাই ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং তাহাব ফলেই গোলটেবিল বৈঠক, হোয়াইট পেপার, জয়েন্ট কমিটির রিপোর্ট এবং অবশেষে ইণ্ডিয়া এক্ট।

সাম্রাজ্যনীতির ব্যাপারে, ইংলণ্ডে শ্রমিক ন্য রক্ষণশীলের মধ্যে পার্থক্য নাই বলিলেই হয়। শ্রমিকদলের সাধারণ সদস্যদের মধ্যে অনেকে অনেক বেশী অগ্রসর হইলেও, তাঁহাদের রক্ষণশীল নেতৃত্বের উপর বড় বেশী প্রভাব নাই। এমন হইতে পারে যে, বামপন্থী শ্রমিকদল শক্তিশালী হইয়া উঠিবে, কেন না অধুনা অবস্থার অতি দ্রুত পরিবর্তন হইতেছে। কিন্তু জাতীয় ও সামাজিক আন্দোলনগুলি কি হাত গুটাইয়া ঘুমাইয়া পড়িবে এবং অগ্রত্ব সমগ্রাসঙ্কুল পরিবর্তনের জন্ত অপেক্ষা করিবে?

আমাদের দেশে লিবারেলদের, ব্রিটিশ শ্রমিকদলের উপর নির্ভরতার একটি কোতুককর দিক আছে। যদি দৈবক্রমে এই দল বামপন্থী হইয়া ইংলণ্ডে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করে, তাহা হইলে ভারতে আমাদের লিবারেল ও অগ্রাণ্ড মজারোট-দলগুলির উপর তাহার কি প্রতিক্রিয়া হইবে? ইহাদের অধিকাংশই সামাজিক ব্যাপারে অতিমাত্রায় রক্ষণশীল। তাঁহারা শ্রমিকদলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন দেখিয়া অগ্রসর হইবেন এবং ভারতে উহা প্রবর্তনের ভয়ে ভীত হইবেন। এমন কি ব্রিটিশ সম্পর্কের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ একেবারেই ভিন্ন আকার ধারণ করিবে, কেন না সে অবস্থায় ব্রিটিশ সম্পর্কের অর্থই হইবে সামাজিক ওলট-

পালট। তখন এমনও হইতে পারে, আমার মত বাহারা জাতীয় স্বাধীনতাকামী ও ঐ সম্পর্ক ছিন্ন করিতে চাহে, তাহাদের মনোভাব পরিবর্তন হইবে এবং সমাজতান্ত্রিক ব্রিটেনের সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিবে। ব্রিটিশ জনসাধারণের সহিত সহযোগিতা করিতে আমাদের কাহারও নিশ্চয়ই কোন আপত্তি নাই। তাহাদের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই আমাদের আপত্তি। যেদিন তাহারা উহা পরিত্যাগ করিবে, সেইদিনই সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত হইবে। কিন্তু মডারেটগণ তখন কি করিবেন? সম্ভবতঃ নূতন ব্যবস্থাকেও তাঁহারা বিধির আর এক রহস্যময় নির্দেশরূপে বরণ করিয়া লইবেন।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব এবং গোলটেবিল বৈঠকের এক প্রধান পরিণতি হইল এই যে, ভারতের দেশীয় নৃপতিবৃন্দকে চেলিয়া সম্মুখে খাড়া করা হইল। গৌড়া রক্ষণশীলদের তাঁহাদের জ্ঞা এবং তাঁহাদের ‘স্বাধীনতার’ জ্ঞা ব্যাকুলতা, তাঁহাদের মধ্যে এক নূতন প্রাণের সঞ্চার করিল। ইতিপূর্বে তাঁহাদিগকে কখনও এতটা প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। ইতিপূর্বে তাঁহারা ব্রিটিশ ‘রেসিডেন্টের’ (রাজদূত বলিয়া অভিহিত) ইঙ্গিতের উত্তরে ‘না’ বলিতে সাহস পাইতেন না, এবং অগণিত নৃপতিবৃন্দের প্রতি ভারত গভর্নমেন্টের মনোভাব প্রকাশভাবেই অবজ্ঞাপূর্ণ ছিল। তাঁহাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সর্বদাই হস্তক্ষেপ করা হইয়া থাকে; অবশ্য তাহা প্রায়ই যুক্তিযুক্ত সন্দেহ নাই। এমন কি, বর্তমানেও বহু রাজ্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্রিটিশ কর্মচারী দ্বারা (ইহাদিগকে রাজ্যের অহুরোধে ও প্রয়োজনে “ধার” দেওয়া হয়) শাসিত হয়। কিন্তু মিঃ চার্চিল ও লর্ড রদারমিয়ারের প্রচার কার্যের ফলে ভারত গভর্নমেন্ট একটু ঘাবড়াইয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হয় এবং দেশীয় রাজ্যগুলির সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করিতে ইদানীং তাঁহারা একটু সাবধান হইয়াছেন। নৃপতিরাও ইদানীং মাথা তুলিয়া কথা বলিতেছেন।

ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের এই সকল বাহুলক্ষণগুলি আমি কথঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি; তথাপি আমি জানি যে এগুলি অবাস্তব, এবং ইহার পশ্চাতে যে ভারত রহিয়াছে, তাহার কথা ভাবিলে অবসন্ন হই। সেখানে চলিয়াছে, সর্ববিধ স্বাধীনতা দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা, বৃহৎপীড়ন ও ব্যর্থতা, সদিচ্ছার বিকৃতি এবং বহু অগ্রায় প্রবৃত্তিকে উৎসাহ দান। বহু ব্যক্তি কারাগারে বসিয়া তাহাদের তরুণ জীবন বৎসরের পর বৎসর ক্ষয় করিতেছে, হৃদয় তাহাদের জরাজীর্ণ হইয়া গেল।* তাহাদের পরিবারবর্গ,

* ১৯৩৪-এর ২৩শে জুলাই স্বরাষ্ট্র-সচিব শ্রম হ্যারী হেগ ব্যবস্থা পরিষদে বলিয়াছেন যে, জেলে ও বিশেষ বন্দিশালায় বিনাখিচায়ে আটক বন্দিসংখ্যা, বাঙ্গলায় ১৫০০ হইতে ১৬০০

কতকগুলি আধুনিক ঘটনা

বন্ধু ও পরিচিত ব্যক্তি এবং সহস্র সহস্র ব্যক্তির চিত্ত তিস্ত হইয়া আছে। তাহারা যে পাশব শক্তির দ্বারা কবলিত হইয়াছে, তাহার সম্মুখে নিরুপায় শক্তিহীনতা ও তীব্র অপমানবোধ ছাড়া আর কিছু নাই। সাধারণ অবস্থাতেও বহুতর সমিতি ও প্রতিষ্ঠান বে-আইনী করিয়া রাখা হইয়াছে এবং গভর্নমেন্টের অস্ত্রাগারে “জরুরী ক্ষমতা”, “শান্তিরক্ষা আইন” প্রভৃতি স্বায়ীভাবে বাসা বাধিয়াছে। স্বাধীনতা সঙ্কোচক ব্যবস্থাগুলিই যেন সাধারণ নিয়মের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। বহু সংখ্যক পুস্তক এবং সাময়িক পত্রিকা বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে এবং “সামুদ্রিক বাণিজ্য আইন” দ্বারা ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে। কাহারও নিকট “ভয়াবহ” পুস্তক বা লেখা পাওয়া গেলে দীর্ঘকাল কারাদণ্ড হয়, সমসাময়িক রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে অভিমত ব্যক্ত করাতে অথবা রুশিয়ার সামাজিক ও সংস্কৃতিগত ব্যাপারে অগ্রকুল মন্তব্য প্রকাশ করাতে, ‘সেন্সর’ তীব্র আপত্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রুশিয়া দেখিয়া ফিরিয়া আসিবার পর রুশিয়া সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখেন, ঐ প্রবন্ধটি প্রকাশ করার দ্রষ্ট, বাঙ্গলা গভর্নমেন্ট “মতাবগ-রিভিউ” পত্রিকাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। পার্লামেন্টে সহকারী ভারত সচিব আমাদের সংবাদ দিয়াছিলেন যে, “ঐ প্রবন্ধে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সাফল্যগুলি সম্পর্কে বিকৃত মত প্রচার করা হইয়াছে” বলিয়াই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল।* সাফল্যগুলির একমাত্র বিচারক ‘সেন্সর’, আমাদের ভিন্নমত থাকাও উচিত নহে, তাহা প্রকাশ করাও উচিত নহে। তাবলিনে “সোসাইটি অফ ফ্রেন্ডস্”এর নিকট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রেরিত একটি সংক্ষিপ্ত বার্তাও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় গভর্নমেন্ট আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঠাকুরের মত ঋষিভূলা ব্যক্তি, যিনি রাজনীতি হইতে ইচ্ছা করিয়াই দূরে থাকিয়া শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত ব্যাপার লইয়া আছেন; যিনি জগদ্বিখ্যাত এবং ভারতের সর্বত্র সম্মানিত, তাহার লেখাই যখন বন্ধ করিবার চেষ্টা হয়, তখন সাধারণ লোকের কি কথা ?†

শত, দেউলীতে ৫০০ শত, মোট ২০০০ কি ২১০০ শত। ইহা ছাড়া রাজনৈতিক কারাদণ্ডিত বন্দী আছে; তাহাদের অধিকাংশই দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত। ইদানীং কলিকাতার একটি আমলায় এ, পি সংবাদ দিতেছেন, (১৭ই ডিসেম্বর ১৯৩৪) বিনা লাইসেন্সে অস্ত্র ও গুলি ইত্যাদি রাখিবার অপরাধে হাইকোর্ট একজনকে নয় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। অভিব্যক্ত ব্যক্তি একটি রিভলবার ও ছয়টি কার্তুজ সহ ধৃত হইয়াছিল।

* ১২ই নবেম্বর, ১৯৩৪।

† ১৯৩৫-এর ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ভারত সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে ব্যবস্থা পরিষদে সরকার পক্ষ হইতে একটি বিবৃতি দেওয়া হয়। উহাতে প্রকাশ ১৯৩০ সাল হইতে

কার্যতঃ প্রত্যক্ষভাবে দমন করা অপেক্ষা যে ভীতির আবহাওয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহা অধিকতর শোচনীয়। এই অবস্থার মধ্যে সত্যতার সহিত সংবাদপত্র পরিচালন সম্ভবপর নহে অথবা ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি অথবা সমসাময়িক ঘটনা সম্পর্কে সম্যক আলোচনা বা শিক্ষাদানও কঠিন। শাসন-সংস্কার এবং দায়িত্বপূর্ণ শাসনপদ্ধতি বা ঐক্যপন্থী কিছু প্রতিষ্ঠার পক্ষে ইহা এক অপরূপ ব্যবস্থা।

প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই জানেন যে বর্তমান জগৎ, বুদ্ধিভেদজনিত চাঞ্চল্যে পীড়িত, ইহার অশুভুতি কোথাও বা মৃদু কোথাও বা তীব্র, কিন্তু যাহাই হউক, বর্তমান অবস্থার প্রতি প্রবল অসন্তোষ সর্বত্রই বিদ্যমান। আমাদের চক্ষুর সম্মুখেই এই ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিতেছে, ভবিষ্যতে ইহা যে রূপই গ্রহণ করুক না কেন, ইহা খুব দূরবর্তী নহে। ইহা এমন একটা দূর ভাবী কালের বিষয় নহে, যাহা লইয়া অনাসক্তভাবে দার্শনিক, সমাজনৈতিক এবং অর্থশাস্ত্রের পণ্ডিতগণ গবেষণা করিতে পারেন। ইহার সহিত প্রত্যেক মানবের গুণাণ্ড জড়িত। ইহার মধ্যে যে সকল শক্তি কার্য করিতেছে তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝা এবং বুঝিয়া স্বীয় কর্তব্য স্থির করিয়া লওয়া প্রত্যেকেরই অবশ্য কর্তব্য। পুরাতন জগতের অবসানের উপর এক নূতন জগৎ গড়িয়া উঠিতেছে। কোন সমস্তার উত্তর খুঁজিতে হইলে তাহা উত্তমরূপে জানা আবশ্যক। সমস্তাকে জানা এবং তাহার সমাধান অন্বেষণ করা উভয়ের গুরুত্বই সমান।

দূর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের রাজনৈতিকগণ জগতের ঘটনাবলী সম্পর্কে অতি আশ্চর্যরূপে অজ্ঞ অথবা উদাসীন। সম্ভবতঃ এই অজ্ঞতা ভারতের শাসকশ্রেণীর অধিকাংশের মধ্যেও রহিয়াছে; কেন না আমাদের দেশের সিভিলিয়নগণ তাঁহাদের সক্ষীর্ণ নিজস্ব জগতে সুখ ও সন্তোষ লইয়া বাস করেন। কেবলমাত্র উচ্চতম সরকারী কর্মচারীদিগকে এই সকল সমস্তা ভাবিতে হয়। অবশ্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট জগতের ঘটনাবলী নিরীক্ষণ করিয়াই

এ পর্যন্ত ৫১৪টি সংবাদপত্রের নিকট জামানতের টাকা দাবী ও বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে জামানতের টাকা না দিতে পারায় ৩৮৪টি সংবাদপত্র বন্ধ হইয়াছে এবং ১৬৬ খানি সংবাদপত্র মোট ২,৫১,৮৫২ টাকা জামানত জমা দিয়াছে।

ইদারী (১৯৩৫-এর শেষভাগে) ব্যক্তিস্বাধীনতা সঙ্কটক কতকগুলি আইন পুনরায় পাকাপাকিভাবে করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে সর্বপ্রধান, সংশোধিত কোর্জদারী আইন— ইহা সারা ভারতেই প্রযোজ্য। ব্যবস্থা পরিষদে ইহা পরিত্যক্ত হইলেও, বড়লাট তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা বলে উহা আইনে পরিণত করেন। প্রাদেশিক আইন সভাগুলিতেও ঐরূপ আইন পাশ হইয়াছে।

কর্তৃত্বশীল আধুনিক ঘটনা

তদনুসারে তাঁহাদের কর্তৃনীতি নিরূপণ করিয়া লন। ভারতের উপর কর্তৃত্ব এবং উহা রক্ষা করার দ্বারা যে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতি বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়, ইহা সকলেই জানেন। কয়জন ভারতীয় রাজনীতিক জানেন যে, জাপানী সাম্রাজ্যবাদ অথবা গোটিয়েট রাষ্ট্রের ক্রমবর্দ্ধিত শক্তি অথবা সিংকিয়াং এ ইংরাজ-রুশ-জাপানের কুট-চক্রান্ত, অথবা মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান ও পারস্যের ঘটনাবলী ভারতীয় রাজনীতিতে কি প্রভাব বিস্তার করে? মধ্য এশিয়ার পরিস্থিতির প্রভাব কান্ধীকে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং উহা ব্রিটিশ-নীতি ও ভারতবক্ষ্যের অন্ততম কেন্দ্রে পরিণত হয়।

কিন্তু ইহা অপেক্ষাও সমগ্ৰ জগতে অতি দ্রুত অর্থনৈতিক পরিবর্তনের গুরুত্ব অনেক বেশী। আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইবে যে উর্নাবংশ শতাব্দীর ব্যবস্থার দিন চলিয়া গিয়াছে; বর্তমানের প্রয়োজন পূরণে উহার কোন সার্থকতাই নাই। এক নজীর হইতে অল্প নজীরে উপনীত হওয়ার যে আইনজীবী-স্বল্প মনোবৃত্তি ভারতে বিद्यমান, যেখানে অতীতের কোন নজীর নাই, সেখানে উহা কোনই কাজে লাগিবে না। লৌহবর্ষের উপর গরুর গাড়ী চাপাহা দিয়া উহাকে আমরা বেলগাড়ী বলিতে পাবি না। উহা বর্তমান যুগে অচল বলিয়া বাতিল করিতেই হইবে। রুশিয়া ছাড়িয়া দিলেও অল্প আমরা “নিউডিল” ও অন্যান্য বিপুল পরিবর্তনের আলোচনা দেখিতেছি। আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রনায়ক রুজভেল্ট, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা রক্ষা এবং উহা শক্তিশালী করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াও সাহসেব সহিত যে সকল বিপুল পরিকল্পনার প্রবর্তন করিতেছেন, তাহাব ফলে আমেরিকাব জীবনযাত্রা প্রণালীর পরিবর্তন হইতে পারে। “অতিরিক্ত সুবিধাভোগীদের উচ্ছেদ এবং সুবিধা বঞ্চিতদের অবস্থার উন্নতি সাধন” এই শ্রেণীব কথাও তিনি বলিতেছেন। তিনি কৃতকার্য হইতে পারেন, নাও হইতে পারেন, কিন্তু তিনি একজন সাহসী পুরুষ এবং তিনি যে তাঁহার স্বদেশকে গতানুগতিকতা হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না। তিনি তাঁহার কর্তৃনীতির পরিবর্তন অথবা ভুল স্বীকার করিতে ভীত নহেন। ইংলণ্ডেও মিঃ লয়েড্ জর্জ্জ এক “নিউডিল” (নূতন ব্যবস্থা) প্রণয়ন করিয়াছেন। ভারতেও আমাদের অনেক “নূতন ব্যবস্থা” আবশ্যক। “যাহা জানিবার তাহা জানা হইয়াছে, যাহা কিছু করার ছিল, তাহাও করা হইয়া গিয়াছে” এই প্রাচীন ধারণার মত ভয়ঙ্কর নির্বুদ্ধিতা আর কিছু নাই।

আমাদিগকে বহু প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে এবং আমরা নিশ্চয়ই সাহসের সহিত ঐ প্রশ্নের সম্মুখীন হইব। বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলির টিকিয়া থাকিবার কি অধিকার আছে,

যদি না, ঐগুলি জনসাধারণের অবস্থার বহুল উন্নতি সাধনে সক্ষম হয়? অল্প কোন ব্যবস্থার মধ্যে কি ব্যাপক উন্নতির সম্ভাবনা আছে? কেবলমাত্র রাজনৈতিক পরিবর্তন কতখানি সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে সক্ষম? যদি কায়েমী স্বার্থগুলি, অতিমাত্রায় আকাজক্ষিত পরিবর্তনের বিরোধী হয়, তাহা হইলে জনসাধারণের দুঃখ দারিদ্র্য সঙ্গেও ঐগুলি রক্ষা করার চেষ্টা কি দূরদশিতা অথবা নীতিজ্ঞানের পরিচায়ক হইবে? কায়েমী স্বার্থের ক্ষতি হউক আমাদের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই এরূপ নহে; উহারা যাহাতে অপরের ক্ষতি না করিতে পারে তাহাই নিবারণ করিতে হইবে। যদি কায়েমী স্বার্থগুলির সহিত কোন আপোষ করা সম্ভব হয়, তদপেক্ষা আকাজক্ষার কিছুই নাই। ইহার গ্রায ও অগ্রায লইয়া মতভেদ ঘটিতে পারে, কিন্তু অতি মুষ্টিমেয় ব্যক্তিই আপোষের সমীচীনতায় সন্দেহ প্রকাশ করিবেন। এক প্রকারের কায়েমী স্বার্থের অবসান করিয়া, অল্প শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থ সৃষ্টি করা নিশ্চয়ই ঐ আপোষের লক্ষ্য নহে। যেখানে সম্ভবপর এবং প্রয়োজন, সেখানে যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ করা যাইতে পারে, কেন না সংঘর্ষ দ্বারা কিছু করিতে গেলে অনেক বেশী ব্যয় হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সমস্ত ইতিহাস একবাক্যে বলিতেছে যে কায়েমী স্বার্থবাদীরা এই শ্রেণীর আপোষে কখনও রাজী হয় না। যে সকল শ্রেণীর সমাজের উপর প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে দূরদশিতার অভাব। তাহারা হয় ষোল আনা নয় কিছুই না, এই পণ লইয়া জুয়াখেলায় প্রবৃত্ত হয় এবং এই কারণেই ধ্বংস পায়।

বাজেয়াপ্ত বা ঐ শ্রেণীর ‘শিথিল কথা’ (কংগ্রেস কার্যাকরী সমিতির ভাষায়) অনেক হইয়াছে। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থার ভিত্তিতেই রহিয়াছে অবিরত ঐকান্তিকভাবে পরধন শোষণ—উহার অবসানকল্পেই সামাজিক পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। শ্রমিকের শ্রমজাত উৎপন্ন দ্রব্যের অংশ প্রত্যহই বাজেয়াপ্ত করা হইতেছে। ক্রমবর্দ্ধিত খাজনা ও অগ্নাত দাবী পূরণ করিতে অক্ষম হওয়ার ফলে কৃষকের জমি প্রায়ই বাজেয়াপ্ত হইতেছে। অতীতে সাধারণের জমি ব্যক্তিবিশেষ বাজেয়াপ্ত করিয়াই বৃহৎ জমিদারী করিয়াছে এবং এই ভাবে কৃষক-মালিকেরা লুপ্ত হইয়াছে। বাজেয়াপ্ত করাই বর্তমান ব্যবস্থার ভিত্তি ও প্রাণস্বরূপ।

উহার আংশিক প্রতিকারের জন্য সমাজও নানা প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে, যাহা এক প্রকার বাজেয়াপ্ত ছাড়া কিছুই নহে—উচ্চহারে ট্যাক্স, যুতের সম্পত্তির উপর শুল্ক, ঋণ-লাঘব আইন, অত্যধিক

কতকগুলি আধুনিক ঘটনা

নোট বা কাগজের মুদ্রা প্রচার প্রভৃতি। অধুনা আমরা দেখিতেছি, বিপুল জাতীয় ঋণ পরিশোধ অস্বীকার করা হইতেছে; কেবল সোভিয়েট ইউনিয়ন নহে, বড় বড় ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিও তাহা করিতেছেন। ইহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত যে ব্রিটিশগণও যুক্তরাষ্ট্রের প্রাপ্য ঋণ পরিশোধ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন—ভারতের সম্মুখে ইহা অত্যন্ত বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত! কিন্তু এই বাজেয়াপ্ত বা ঋণ-পরিশোধে অস্বীকৃতি দ্বারা অতি সামান্য সুবিধাই হয়, মূল কারণ দূর করা যায় না। নূতন করিয়া গড়িতে হইলে মূল কারণ দূর করা আবশ্যক।

বর্তমান প্রচলিত ব্যবস্থা পরিবর্তনের উপায় আলোচনা কালে আমাদেরকে বাহ্য সম্পদ ও মানসিক দিক দিয়া কি মূল্য দিতে হইবে, তাহাও পরিমাপ করা আবশ্যক। আমাদের অদ্রদশী হইলে চলিবে না। আমাদেরকে দেখিতে হইবে পরিণামে উহা দ্বারা মানুষের সুখ সমৃদ্ধি, মানসিক ও সামাজিক উন্নতির কি সহায়তা হইবে। কিন্তু আমাদের ইহাও মনে রাখিতে হইবে, বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তন না করিয়া আমরা কি ভয়াবহ মূল্য দিতেছি; আমাদের অগ্ণতার সমাজে কত নিষ্ফল বঞ্চিত ও বিকৃত জীবনের দুর্দহ ভার, কত দুঃখ দৈহিক অনশন, কি শোচনীয় মানসিক ও নৈতিক অধঃপতন। বারম্বার বস্তার মত, বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্কটগুলি অসংখ্য মানবকে প্রতিনিয়ত ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। এই বস্তা আমরা ঠেকাইতে পারি না; অথবা কতকগুলি লোক কলসী লইয়া বস্তার জ্বল সরাইয়া মানুষকে বাঁচাইতে পারে না। আমাদের বাধ বাধিতে হইবে, খাল কাটিতে হইবে, বস্তার জ্বলের ধ্বংস শক্তিকে আয়ত্তে আনিয়া মানুষের উপকারে লাগাইতে হইবে।

সমাজতত্ত্ববাদ যে বিপুল পরিবর্তনের প্রস্তাব লইয়া সাহসের সহিত অগ্রসর, সহসা কয়েকটি আইন প্রণয়ন করিয়া তাহা প্রবর্তন করা যায় না। ভিত্তিতেই এমন আইন ও ক্ষমতার প্রয়োজন যাহার বলে অগ্রগতি নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং নূতন সমাজ বিপ্লবের ভিত্তি স্থাপন করা যায়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজ পুনর্গঠন করিতে হইলে দৈবের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, আকস্মিক উত্তেজনা বা মাঝে মাঝে প্রাচীন ব্যবস্থা ভাঙিয়া ফেলিলেও উহা সম্ভব হইবে না। আসল বাধাগুলি অপসারিত করিতে হইবে। উদ্দেশ্য হইবে কাহাকেও বঞ্চিত করা নহে, সকলের অভাব পূরণ করা, বর্তমানের অভাব অনটনকে ভবিষ্যতে প্রাচুর্য্যে ভরিয়া তোলা। ইহা করিতে গেলে পথের বাধাগুলি দূর

করিতে হইবে, যে সকল স্বার্থপরতা সমাজকে অবনত করিয়া রাখিয়াছে তাহা অপসারিত করিতে হইবে। যে পথ আমরা গ্রহণ করিব, তাহা ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের উপর নির্ভর করিবে না, এমন কি স্বপ্ন ছাড়া বিচারের দিক হইতে দেখিলেও চলিবে না; দেখিতে হইবে, অর্থনীতির দিক দিয়া তাহা অভ্যস্ত কিনা, পরিবর্তিত ব্যবস্থায় তাহা দ্বারা উন্নতি ও সামঞ্জস্য সাধন সম্ভব কিনা, অধিকাংশ মানবের পক্ষে উহা কল্যাণকর কিনা।

স্বার্থের সংঘাত অনিবার্য বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু কোন মধ্যপথ নাই। আমাদের প্রত্যেককে কোন পক্ষ অবলম্বন করিব, তাহা বাছিয়া লইতে হইবে। বাছিয়া লইবার পূর্বে আমাদেরকে জানিতে হইবে, বৃদ্ধিতে হইবে। সমাজতন্ত্রবাদের ভাবাবেগ জাগ্রত করাই যথেষ্ট নহে। তর্ক, যুক্তি, তথ্য এবং বিশদ সমালোচনা দ্বারা, উহাকে বুদ্ধি-গ্রাহ্য করিয়া তুলিতে হইবে। পাশ্চাত্য দেশে এ সম্বন্ধে বহু পুস্তক আছে, ভারতে তাহার একান্ত অভাব এবং অনেক ভাল ভাল বই এ দেশে আনিতে দেওয়া হয় না। কিন্তু কেবল অগ্ন্যাগ্ন দেশের বই পড়িলেই চলিবে না। ভারতে সমাজতন্ত্রবাদ গড়িয়া তুলিতে হইলে, ভারতীয় অবস্থার মধ্য দিয়াই উহাকে বিকশিত করিতে হইবে, অতএব ভারতীয় অবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভই হইল গোড়ার কথা। আমরা এমন সব বিশেষজ্ঞ চাহি যাহারা অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান করিয়া বিশদ পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের বিশেষজ্ঞগণ অধিকাংশই সরকারী চাকুরীয়া অথবা আধা সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরী করেন, তাহারা এ দিকে অগ্রসর হইবার সাহস পান না।

বুদ্ধির পটভূমিকাই সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। অগ্ন্যাগ্ন শক্তিও আবশ্যক। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ঐ পটভূমিকা ব্যতীত বিষয়টি আমরা সম্যক আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারিব না, কিংবা কোন শক্তিশালী আন্দোলন সৃষ্টি করিতে পারিব না। বর্তমানে ভারতে কৃষকদের সমস্তাই প্রধান সমস্যা এবং ইহা সম্ভবতঃ মুখ্য হইয়াই থাকিবে। কিন্তু কলকারখানার গুরুত্ব কম হইলেও, উহা বাড়িতেছে। আমাদের উদ্দেশ্য কি,—কৃষক-রাষ্ট্র না কলকারখানার শ্রমিক-রাষ্ট্র? আমাদের প্রধানতঃ কৃষিকার্য্যই করিতে হইবে; তবে অগ্ন্যাগ্ন অনেকের মত আমিও মনে করি, আমাদের শিল্প-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিও করিতে হইবে।

আমাদের কলকারখানার পরিচালকগণের ধারণা কত সেকালের ধরণের, তাহা দেখিয়া অবাক হইতে হয়; এমন কি তাহারা আধুনিক

কতকগুলি আধুনিক ঘটনা

জনতান্ত্রিকও নহেন। জনসাধারণ এত দরিদ্র যে তাহাদিগকে ইহারা তাহাদের পণ্যের ক্রেতা হিসাবে দেখেন না, বেতন বৃদ্ধি অথবা কাজের সময় কমাইবার প্রস্তাব উঠিলেই ইহারা প্রাণপণে প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি কাপড়ের কলে কাজের সময় দশ ঘণ্টা হইতে কমাইয়া নয় ঘণ্টা করা হইয়াছে। ইহাতেই আহাম্মদাবাদের কলওয়ালারা শ্রমিকদের বেতন কমাইয়া দিয়াছেন এমন কি টিকা কাজের মজুরীও হ্রাস করিয়াছেন। অতএব কাজের সময় কম করার অর্থই উপার্জন কম এবং দরিদ্র শ্রমিকের জীবিকা নির্বাহেব অবস্থাও অবনত করা। যাহা হউক, কারখানায় বৈজ্ঞানিক সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা অগ্রসর হইতেছে, তাহার ফলে শ্রমিকদের উপর চাপ পড়িতেছে, তাহাদের ক্লেশ বাড়িতেছে কিন্তু সে অল্পপাতে তাহাদের বেতন বাড়িতেছে না। আমাদের দেশের ব্যসা বাণিজ্যের অবস্থা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের মত। সুযোগ পাইলে তাহারা প্রচুর লাভ করিয়া থাকেন, শ্রমিকদের অবস্থা পূর্ববংই চলিতে থাকে এবং যখন মন্দা উপস্থিত হয় তখন মালিকেরা বলেন যে বেতনের হার না কমাইলে ব্যবসা চালান যায় না। তাহারা কেবল যে রাষ্ট্রের সাহায্য পাইয়া থাকেন, তাহা নহে, আমাদের দেশের মধ্যশ্রেণীর রাজনীতিকেরাও স্বভাবতঃ তাহাদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন। তথাপি বোম্বাই ও অন্ধ্রাঙ্গ স্থান অপেক্ষা আহাম্মদাবাদের কাপড়ের কলের শ্রমিকদের ভাগ্য অনেকটা ভাল। বান্দলার পাটকলের শ্রমিক এবং খনির শ্রমিকগণ অপেক্ষা কাপড়ের কলের শ্রমিকদের অবস্থা অনেক ভাল। ছোট ছোট অনিয়ন্ত্রিত কলকারখানার মজুরদের বেতনের হার তুলনায় সর্বনিম্ন বলিলেই চলে। চটকল ও কাপড়ের কলের মালিকদের প্রাসাদতুল্য অটালিকা, তাহাদের বিলাস ও আড়ম্বরের জাঁকজমকের সহিত, জীর্ণ কুটারবাসী অর্ধদগ্ন শ্রমিকদের জীবনযাত্রার তুলনা করিলে, অনেক শিক্ষালাভ করা যাইতে পারে। কিন্তু আমরা এই নিদারুণ অসামঞ্জস্য অতি স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করি; উহাতে আমাদের চিতে কোন ভাবোদ্বেগ হয় না।

ভারতীয় শ্রমজীবীদের ভাগ্য মন্দ হইলেও, উপার্জনের দিক দিয়া তাহাদের অবস্থা কৃষকদের অপেক্ষা বহুগুণে ভাল। কৃষকদের একটা সুবিধা আছে তাহারা প্রচুর আলোক ও বাতাসে বাস করে, বস্তীর কদম্ব্য অধঃপতন সেখানে নাই। কিন্তু তাহাদেরও অবস্থা এত মন্দ হইয়া পড়িয়াছে যে তাহারা প্রত্যেকটি গ্রাম গান্ধিজীর ভাষায় “গোবর গাদা” করিয়া তুলিয়াছে। সহযোগিতা অথবা সমবেত চেষ্টায়, সম্প্রদায়

অথবা শ্রেণীগত উন্নতির কোন ধারণাই তাহাদের মধ্যে নাই। তাহাকে নিন্দা বা ঔৎসনা করা সহজ, কিন্তু সেই দুর্ভাগা জীব কি করিবে? জীবন তাহার নিকট এক বিরামহীন তিক্ত সংগ্রাম, প্রত্যেকের হাত তাহার বিরুদ্ধে উত্তোলিত রহিয়াছে। কেমন করিয়া সে বাঁচিয়া আছে, ইহা এক পরম রহস্য। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, পঞ্জাবের এক সাধারণ কৃষক পরিবারের মাথা পিছু উপার্জন প্রায় নয় আনা (১২২৮-২৯)। ইহাই ১৯৩০-৩১ এ জন প্রতি তিন পয়সায় নামিয়াছে! বাকলা, বিহার ও যুক্তপ্রদেশের কৃষকগণ অপেক্ষা পঞ্জাবের কৃষকদের অবস্থা অনেক ভাল বলিয়া ধরা হয়। যুক্তপ্রদেশের পূর্ব-প্রান্তের জিলাগুলিতে (গোরক্ষপুর প্রভৃতি) মন্দার পূর্বের ভাল সময়ে জনমজুরদের দৈনিক মজুরী ছিল দুই আনা। এই ভয়াবহ অবস্থায় দয়ালু ব্যক্তিদের দান এবং পল্লীর উন্নতিমূলক স্থানীয় চেষ্টা দ্বারা উন্নতি হইবে, একথা বলিলে কৃষক এবং কৃষকের দুঃখকে ব্যঙ্গ করা হয়।

এই কর্দম-গহ্বর হইতে আমরা কেমন করিয়া উদ্ধার পাইব? উপায় অবশ্য নির্ধারণ করা যাইতে পারে, কিন্তু জনসাধারণকে এই গভীর নিম্ন হইতে টানিয়া তোলা কঠিন। কিন্তু পরিবর্তনবিরোধী স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট শ্রেণী হইতেই প্রকৃত বাধা আসিয়া থাকে, সাম্রাজ্যনীতির অধীনতায় কোন প্রকার পরিবর্তনের প্রশ্নই উঠে না। ভারত ভবিষ্যতে কোনদিকে দৃষ্টিপাত করিবে? একদিকে কম্যুনিজম, অগ্ৰ দিকে ফাসিজম, এই দুই-ই আজকাল প্রবল হইয়া উঠিতেছে এবং এ দুইয়ের মধ্যবর্তী অনিশ্চিত দলগুলি ক্রমেই বিলুপ্ত হইতেছে। স্তর ম্যালকম হেইলী ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, ভারতবর্ষ ন্যাশনাল সোস্টিয়ালিজম গ্রহণ করিবে অর্থাৎ কোন না কোন আকারে ফাসিজম গ্রহণ করিবে। আন্ত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সম্ভবতঃ তাহার উক্তি সত্য। ভারতের যুবক-যুবতীদের মধ্যে ফাসিস্ত মনোবৃত্তি স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। বাকলায় বিশেষভাবে এবং কতকটা পরিমাণে অগ্ন্যাগ্ন প্রদেশে এবং কংগ্রেসের মধ্যেও উহার প্রতিচ্ছায়া দেখা যাইতেছে। ফাসিজম-এর সহিত অতি উৎকট হিংসানীতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া অহিংসাপন্থী প্রাচীন কংগ্রেসনেতার স্বাভাবিকরূপেই উহাকে ভয় করিয়া থাকেন। কিন্তু ফাসিজমের পশ্চাতে তথাকথিত দার্শনিক তত্ত্ব—সমবায়নীতিতে চলিত রাষ্ট্র যাহাতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সুরক্ষিত থাকিবে, কায়মীস্বার্থ বিলুপ্ত না করিয়া তাহাকে সীমাবদ্ধ করা হইবে,—ইহার প্রতি সম্ভবতঃ তাহাদের আকর্ষণ আছে। প্রথম দৃষ্টিতে দেখিলে মনে হয়, পুরাতন ব্যবস্থাকে

কতকগুলি আধুনিক ঘটনা

রক্ষা করিয়াও নূতন সৃষ্টির ইহা প্রশস্ত রাজপথ। কিন্তু উভয়েরই সমান উদয়-পুষ্টি সম্ভব কিনা, সে স্বতন্ত্র কথা।

কিন্তু ফাসিজম-এর প্রকৃত শক্তি আসিবে, মধ্যশ্রেণীর যুবকদের নিকট হইতে। কার্য্যতঃ বর্ত্তমানে ভারতে মধ্যশ্রেণীর একটা অংশই বৈপ্লবিক ভাবে চিন্তা করে। শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে উহা ততটা নাই, তবে শ্রমিকদের মধ্যে বৈপ্লবিক ভাবের সম্ভাবনা অনেক অধিক। এই জাতীয়তাবাদী মধ্যশ্রেণীই ফাসিস্ত আদর্শ প্রচারের অল্পকুলক্ষেত্র। কিন্তু যতদিন বৈদেশিক গভর্ণমেন্ট থাকিবে, ততদিন ইউরোপীয় ধরণের ফাসিজম বিস্তার লাভ করিতে পারে না। ভারতীয় ফাসিজম নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা চাহিবে, সে কখনও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বন্ধু হইতে পারে না। ইহাকে জনসাধারণের সমর্থন লাভ করিতে হইবে। যদি ব্রিটিশ কর্ত্তব্য পূর্ণভাবে অপসারিত হয় তাহা হইলে সম্ভবতঃ ফাসিজম অতি দ্রুত বিস্তার লাভ করিবে এবং মধ্যশ্রেণীর ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা যে ইহার প্রধান সমর্থক হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ।

কিন্তু ব্রিটিশ কর্ত্তব্য সত্ত্বর যাইবার সম্ভাবনা নাই এবং ইতিমধ্যে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের তীব্র দমননীতি সত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক এবং কম্যুনিষ্ট মতবাদ ভ্রুত প্রচারলাভ করিতেছে; কম্যুনিষ্ট-দল বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে এবং ঐ নামটি অতি শিথিল ভাবে ব্যবহার করা হয়, সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তির, অথবা অগ্রগামী কর্ম্মপদ্ধতির সমর্থক শ্রমিক-সম্মিলিতও উহার আওতায় পড়ে।

ফাসিজম ও কম্যুনিজম এর মধ্যে আমার সহানুভূতি সর্ব্বতোভাবে কম্যুনিজম-এর দিকে; কিন্তু এই গ্রন্থখানি পড়িলেই বুঝা যাইবে, আমি কম্যুনিষ্ট হইতে অনেক দূরে রহিয়াছি। আমার মূল অংশতঃ এখনও উনবিংশ শতাব্দির মধ্যে রহিয়াছে। এবং আমি মানবতার উদারনৈতিক ভাবধারার দ্বারা এবং এত বেশী প্রভাবান্বিত যে উহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি পাই নাই। আমার চারিদিকে এই বুদ্ধোন্মাদ প্রতিবেশ দেখিয়া স্বভাবতঃই অনেক কম্যুনিষ্ট বিরক্তি-বোধ করিয়া থাকেন। আমি মতবাদের গোড়ামী ভালবাসি না। কার্ল মার্কস-এর রচিত পুস্তক এবং অগ্ন্যাগ্ন গ্রন্থকে ঈশ্বর-প্রেরিত ধর্ম্মশাস্ত্রের মত বিনা বিচারে গ্রহণ করিতে হইবে, সৈনিকের মত উহা মানিতে হইবে, অগ্রথা করিলে পাষাণ বলিয়া অতিবাহিত করিতে হইবে, আধুনিক কম্যুনিজম-এর ইহা এক লক্ষণরূপে পরিণত হইয়াছে। রুশিয়াতে অনেক ব্যাপার, বিশেষভাবে সাধারণ অবস্থাতেও অতিমাত্রায় বলপ্রয়োগ আমার ভাল লাগে না। কিন্তু তথাপি আমি ক্রমশঃ কম্যুনিষ্ট দর্শনের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছি।

মার্কস-এর কতকগুলি বিবৃতি অথবা তাঁহার মূল্য নিরূপণের গবেষণা ভুল হতে পারে, সে বিচার 'করিবার ক্ষমতা আমার নাই'। কিন্তু মনে হয়, সামাজিক ব্যাপারে তাঁহার অগ্ৰান্ত সাধারণ দূরদৃষ্টি ছিল, এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশ্লেষণ করিতে গিয়াই তিনি এই দূরদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। এই উপায়ে আমরা অতীত ইতিহাস ও বক্ষ্যমাণ ঘটনাবলী অগ্ৰান্ত উপায় অপেক্ষা অধিকতর সঙ্গতরূপে বুঝিতে পারি, এই কারণেই মার্কসপন্থী লেখকগণ বর্তমানে জগতের পরিবর্তনের ধারাগুলি অধিকতর নিপুণ উপায়ে বিশ্লেষণ করিয়া 'উহার' রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারেন। কতকগুলি পরবর্তী সামাজিক প্রবণতা মার্কস উল্লেখ করেন নাই, অথবা ঐগুলিকে সম্যক গুরুত্ব প্রদান করেন নাই, ইহা সহজেই দেখান যাইতে পারে,—যেমন মধ্যশ্রেণী হইতে বৈপ্লবিক অংশের অভ্যুত্থান যাহা আজকাল আমরা দেখিতে পাইতেছি। কোন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর উপর জোর দিতে গিয়া, বিশিষ্ট বিচার প্রণালী এবং কোন কার্যের প্রতি মনোভাব সম্পর্কে মার্কসপন্থার কোন স্থানে কোন মতবাদের গোঁড়ামী নাই এবং ইহাই উহার প্রকৃত মূল্য বলিয়া আমার মনে হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আমরা সমসাময়িক সামাজিক ব্যাপারগুলি বুঝিতে পারি; কর্তব্য কি, পরিজ্ঞানের পথ কোথায় তাহারও নির্দেশ পাই।

এই কৰ্মপদ্ধতিরও কোন অতি-নির্দিষ্ট বা অপরিবর্তনীয় পথ নাই—অবস্থার সহিত উহার সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে। অন্ততঃপক্ষে ইহাই লেনিনের মত ছিল এবং তিনি পরিবর্তিত অবস্থার সহিত অতি সূক্ষ্মভাবে কৰ্মের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি আমাদেরকে বলিয়াছেন,—“কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন বাস্তব অবস্থার তৎকালীন গতি ও প্রকৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা না করিয়া সংঘর্ষের স্থানান্তরিত উপায়ের প্রস্তাব 'হাঁ', কি 'না' উত্তর দিবার চেষ্টা করার অর্থ মার্কসীয় ভূমি হইতে একেবারেই দূরে সরিয়া যাওয়া।” তিনি আরও বলিয়াছেন,—“কিছুই চরম নহে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে আমাদের সতত শিক্ষা লাভ করিতে হইবে।”

এই উদার ও দূরপ্রসারী দৃষ্টির ফলেই একজন কম্যুনিষ্ট, অদ্বাদী-সম্বন্ধে আবদ্ধ সমাজ-জীবনের সমগ্র রূপ বুঝিতে পারে। রাজনীতি তাহার নিকট কেবল মাত্র সুবিধাবাদের ব্যাপার নহে, অন্ধকারে হাতড়ানও নহে। যে আদর্শ ও উদ্দেশ্য লইয়া সে কাজ করে, তাহারই আলোকে সংঘর্ষের মর্মকথা বুঝিতে সমর্থ হয় এবং স্বেচ্ছায় ত্যাগস্বীকার করে। সে জানে মানব নিয়তি বা ভাগ্যকে অন্বেষণের জন্ত বহির্গত বিপুল

কতকগুলি আধুনিক ঘটনা

বাহিনীর সে অগ্রতম সৈনিক, সে বুঝে যে, 'ই' হিসেবের সহিত সমান ভালে পা ফেলিয়া সে অগ্রসর হইতেছে।'

অধিকাংশ কম্যুনিষ্টই এই ভাবে অনুপ্রাণিত নাও হইতে পারেন। সম্ভবতঃ একজন লেনিনই মানবজীবনের সমগ্রতা পরিপূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, যাহার ফলে তাঁহার প্রত্যেকটি কার্য সার্থক ও সফল হইয়াছে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম হইলেও, প্রত্যেক কম্যুনিষ্টের উহা আছে এবং সে তাহার কর্মের মর্মগত তত্ত্ব ভাল করিয়াই জানে।

এমন অনেক কম্যুনিষ্ট আছেন, যাহাদের সহিত আলোচনাকালে ধৈর্য্যরক্ষা করা কঠিন, অপরকে বিরক্ত করিবার এক অভিনব কৌশল তাঁহারা আয়ত্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা অনেক আঘাত সহ্য করিয়াছেন এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের বাহিরে তাঁহাদিগকে বিপুল বিশ্বের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। আমি তাঁহাদের সাহস ও তাগত্বীকারের সর্বদাই প্রশংসা করিয়া থাকি। যেমন লক্ষ লক্ষ নরনারী দুর্ভাগ্যক্রমে নানা ভাবে বহু দুঃখ সহ্য করিতেছে, তেমনই তাঁহারাও দুঃখ সহ্য করেন, তবে তাঁহারা অপমানকর সর্বশক্তিমান ভাগ্যকে অন্ধভাবে গ্রহণ করেন না। তাঁহারা মাহুষের মত দুঃখ সহ্য করেন, তাহার মধ্যে এক মহিমাম্বিত বেদনা রহিয়াছে।

কৃষিয়ার সমাজ গঠনের পরীক্ষামূলক কার্যগুলির সাক্ষ্য বা ব্যর্থতার দ্বারা মার্কসীয় মতবাদের সত্যতার কোন অপহব ঘটেনা। কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনাট্রে অথবা বিবিধ বিরুদ্ধ শক্তির সম্মেলনে ঐ পরীক্ষা-কার্য বিপর্য্যস্ত হইতে পারে,—যদিও তাহার কোন সম্ভাবনা নাই, তথাপি উহা কল্পনা করা যাইতে পারে। কিন্তু তথাপি ঐ সকল সামাজিক আলোড়নের যথার্থ মূল্য সর্বদাই থাকিবে। সেখানকার অনেক ঘটনার প্রতি আমার প্রকৃতিগত যত আপত্তিই থাকুক না কেন, তাহারা আজ জগতের সম্মুখে এক বৃহৎ আশার আলোক তুলিয়া ধারিয়াছে। আমি এত বেশী জানিনা যে তাহাদের কার্যের বিচার করিতে পারি। আমার প্রধান আশঙ্কা, অতিমাত্রায় বলপ্রয়োগ ও দমননীতি তাহার পশ্চাতে যে অগ্রাঘের রেশ রাখিয়া যাইবে, তাহা হইতে পরিব্রাণ পাওয়া কঠিন হইতে পারে। কিন্তু বর্তমান কৃষিয়ার পরিচালকদের স্বপক্ষে একটা বড় কথা বলিবার আছে যে, তাঁহারা কখনও ভুল স্বীকার করিতে ভীত নহেন। তাঁহারা পিছনে হটিয়া নুতন করিয়া গড়িয়া তোলেন। এবং তাঁহাদের আদর্শ সর্বদাই সম্মুখে থাকে। আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট সম্মেলন দ্বারা অগ্রাণু দেশে তাঁহাদের প্রচারকার্য নিখল হইয়াছে, কিন্তু আজকাল দেখা যায়, ঐ সকল কার্যপদ্ধতি যথাসম্ভব কমাইয়া ফেলা হইয়াছে।

জওহরলাল নেহরু

ভারতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, বাহিরের ঘটনার স্রোত গতিবেগ সঞ্চার না করিলে, এখানে কমুনিজম সোশ্যালিজম অনেক দূরের কথা। আমাদের সমস্যা ‘কমুনিজম’ নহে। উহার সহিত আর দুই একটি অঙ্কর জুড়িয়া দিয়া আমাদের সমস্যা হইল ‘কমুনালিজম।’ সম্প্রদায় হিসাবে ভারতবর্ষ এখনও অঙ্ককারময় মধ্যযুগে রহিয়াছে। এখানে কাজের লোকেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়, ঘড়ঘড় ও কৌশল নইয়া বুধা শক্তিক্ষয় করেন এবং পাল্লা দিয়া একে অত্রের উপরে উঠিতে চাহেন। জগতের কল্যাণ করিবার আগ্রহ ইহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকেরই আছে। সম্ভবতঃ এই সাময়িক অবস্থা শীঘ্রই দূর হইবে।

এই সাম্প্রদায়িক অঙ্ককার হইতে কংগ্রেস বহুল পরিমাণে বাহিরে আছে, তবে ইহার দৃষ্টিভঙ্গী ‘পেটি বুর্জোয়া’ শ্রেণীর। সাম্প্রদায়িকতা ও অগ্ন্যাগ্ন সমস্যার প্রতিকারোপায় তাঁহারা ‘পেটি বুর্জোয়া’ শ্রেণীর স্বার্থের দিক হইতে অন্বেষণ করেন। কিন্তু এ পথে সাফল্যলাভ সম্ভবপর হইবে না। কংগ্রেস অধুনা নিম্ন মধ্যশ্রেণীর প্রতিনিধি, বর্তমানে এই শ্রেণীই সচেতন এবং বৈপ্লবিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন। কিন্তু তৎ সত্ত্বেও ইহাকে যতটা প্রধান বলিয়া মনে হইতেছে, ইহা আসলে তাহা নহে। ইহাকে দুই দিক হইতে দুই শক্তি চাপ দিতেছে,—এক শক্তি সজ্জবদ্ধ ও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত, অপর শক্তি দুর্বল হইলেও দ্রুত বলসঞ্চয় করিতেছে। বর্তমানে নিম্ন মধ্যশ্রেণীর অস্তিত্বই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে,—ভবিষ্যতে ইহার কি অবস্থা হইবে তাহা বলা কঠিন। জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের ঐতিহাসিক অভিপ্রায় পূর্ণ না করিয়া ইহা প্রথমোক্ত সজ্জবদ্ধ শ্রেণীর সহিত যোগ দিতে পারে না। কিন্তু ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধির পূর্বেই অগ্ন্যাগ্ন শক্তি বলশালী হইয়া ইহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, এবং ক্রমশঃ উহার স্থান অধিকার করিতে পারে। যাহা হউক, মনে হয় যতদিন জাতীয় স্বাধীনতার অনেকখানি না পাওয়া যাইতেছে, ততদিন কংগ্রেস ভারতবর্ষে এক প্রধান শক্তিরূপে কার্য্য করিবে।

কোন প্রকার হিংসামূলক কার্য্যের কথা উঠিতেই পারে না, উহা অনিষ্টকর পণ্ডশ্রম মাত্র। স্থানবিশেষে নিম্নলিখিত হিংসামূলক কার্য্যের বিরল দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও আমার বিবেচনায় ভারতে সকলেই পূর্বোক্ত মতে বিশ্বাসী। ঐ পথে অগ্রসর হইলে আমরা হিংসা ও প্রতিহিংসার এমন এক নৈরাশ্র-জনক গোলকধাঁধায় পড়িয়া যাইব, যাহা হইতে মুক্তি পাওয়া কঠিন হইবে।

অনেকে আমাদের সকল দল এক্যবদ্ধ করিয়া, ‘ইউনাইটেড ফ্রন্ট’ গঠন করা উচিত, বলিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত সরোজিনী নাইডু তাঁহার কবি-হৃদয়ের

কতকগুলি আধুনিক ঘটনা

আবেগ-মণ্ডিত ভাষায় ইহার কথা বলেন। তিনি কবি, ছন্দ, মিলের সৌন্দর্যের তিনি প্রশংসা করিবেনই। কিন্তু ঐ শব্দটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, উহার অর্থ ও উদ্দেশ্য উপরের দিকের বতকগুলি ব্যক্তির মধ্যে চুক্তি বা আপোষ-রক্ষা মাত্র। এই ভাবে মিলিত হইলে অতি সাবধানী মডারেটগণ আমাদের উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রিত করিবেন, এবং অগ্রগতি মন্দীভূত করিবেন। ইহাদের মধ্যে অনেকে কোন প্রকার আন্দোলনই পছন্দ করেন না। অতএব তাহার ফল হইবে এক ঐক্যবদ্ধ জড়ত্ব। ঐক্যবদ্ধ হইয়া সম্মুখীন হওয়ার পরিবর্তে আমরা সমারোহ সহকারে ঐক্যবদ্ধ পশ্চাৎ দেশ প্রদর্শন করিব।

অবশ্য আমরা অপরের সহিত সহযোগিতা অথবা আপোষ করিব না, একথা বলা নির্বুদ্ধিতা। আমাদের জীবন ও রাজনীতি এত জটিল ব্যাপার যে সব সময় সরাসরৈথায় চিন্তা করা যায় না। এমন কি অনমনীয় লেনিন পর্যন্ত বলিয়াছেন,—“কোন প্রকার আপোষ না করিয়া, পথে কোন মোড় না ঘুরিয়া কেবলই সম্মুখে অগ্রসর হওয়া, বুদ্ধির বালকোচিত চাপল্য মাত্র,—ইহা বৈপ্রবিক শ্রেণীর স্বস্ব স্বকৌশল নহে।” আপোষ রক্ষা আসিবেই, তবে উহা লইয়া অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা উচিত নহে। আমরা আপোষই করি অথবা উহাকে অস্বীকারই করি, মুখ্য বিষয়ই প্রথম আলোচ্য বিষয়, উহা ছাড়িয়া কোন গৌণ ব্যাপারকে প্রথম স্থান দিতে আমরা প্রস্তুত নহি। যদি আমাদের মূলনীতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট থাকে, তাহা হইলে কোন সাময়িক আপোষে ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আমাদের দুর্বলহৃদয় ভ্রাতারা অসন্তুষ্ট হইবেন এই ভয়ে আমরা মূলনীতি ও উদ্দেশ্য কলঙ্কিত করিয়া ফেলিতে পারি,—বিপদ তাহাই। অপরকে অসন্তুষ্ট করা অপেক্ষা বিপথে চালিত হওয়া অধিক মন্দ।

প্রচলিত ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে আমার লেখা অনেকটা অস্পষ্ট ও অনিশ্চলন-মূলক হইল। আমি নিরপেক্ষ দর্শকের আসন হইতে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু যখন কর্ণের ডাক আসে, তখন স্বভাবতই আমি দর্শকরূপে থাকিতে পারি না; আমার অপরাধ, লোকে বলে, উত্তেজনার প্রচুর কারণ না থাকিলেও আমি নির্বোধের মত ছুটিয়া যাই। আমি এখন কি করিব? আমার দেশবাসীকে কি করিতে বলিব? সম্ভবতঃ যাহারা সাধারণের কাজ লইয়া নাড়াচাড়া করেন, তাঁহাদের স্বভাবের মধ্যে একটা সাবধানী ভাব থাকে, সেইজন্যই আমি এত শীঘ্র কিছু বলিতে ইতস্ততঃ করিতেছি। কিন্তু যদি অকপটে সত্য কথা বলিতে হয়, তাহা হইলে বলিব,—আসলে আমি কিছুই জানি না এবং অন্বেষণ করিবার চেষ্টাও করি না। আমি

জগদ্বন্দ্বলীল লেখক

যখন কাজ করিতে পারিতেছি না, তখন কেন দুশ্চিন্তা করিব? কিন্তু আমাকে অনেক দুশ্চিন্তাই করিতে হয়, কিছুতেই এড়াইতে পারি না। অন্ততঃ যতদিন আমি জেলে আছি,—ততদিন আমাকে আশু কর্তব্যের সমস্তার সম্মুখীন হইতে হইবে না।

কারাগারে বসিয়া কৰ্মক্ষেত্র বহুদূরবর্তী বলিয়া মনে হয়। মাহুষ ঘটনার অধিপতি না হইয়া, ঘটনার বিষয় হইয়া উঠে। এবং একটা কিছু ঘটবার প্রত্যাশায় অপেক্ষার অন্ত থাকে না। আমি বসিয়া বসিয়া ভারত ও জগতের রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্তার বিষয় লিখিতেছি, কিন্তু আমার দীর্ঘকালের আবাসভূমি এই স্বয়ম্পূর্ণ কারা-জগতে তাহার মূল্য কতটুকু? বন্দী-জীবনের একমাত্র মুখ্য বিষয় কারামুক্তির দিবস।

নৈনীজেলে এবং এই আলমোড়া জেলে অনেক কয়েদী আসিয়া “জুগলী”র কথা আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিত। প্রথমে আমি ঐ শব্দের অর্থ বুঝিতে পারি নাই, পরে বুঝিলাম যে, তাহার জুবিলীর কথা বলিতেছে। রাজা জর্জের রক্ত-জুবিলীর গুজব শুনিয়াই তাহারা উহা অস্বাভাবিক করিয়াছে, কিন্তু সে বিষয়ে তাহারা বিন্দু-বিসর্গও জানে না। অতীতের স্মৃতি হইতে ঐ শব্দের একটি মাত্র অর্থ তাহারা জানে—অনেকের কারামুক্তি অথবা কারাদণ্ড হ্রাস। প্রত্যেক কয়েদী বিশেষভাবে দীর্ঘ কারাদণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তির এই কারণে ‘জুগলী’ সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের নিকট পার্লেমেন্টে শাসনসংস্কার আইন, সমাজতত্ত্ববাদ বা কম্যুনিজম অপেক্ষা জুগলী অনেক বড় জিনিষ।

উপসংহার

“কর্মে আমাদের অধিকার আছে, কিন্তু কর্ম শেষ করিবার অধিকার আমরা পাই নাই।”—তালমুদ

আমার কাহিনী ফুরাইল। আমার জীবনের যাত্রাপথে এই আত্মকাহিনী আজ আলমোড়া জেলে ১৯৬৫-এর ১৪ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তিন মাস পূর্বে এই দিবস কারাগারে আমার পঞ্চচষারিংশত জন্মদিন পূর্ণ হইয়াছে। আমার মনে হয়, আমাকে আরও দীর্ঘকাল বাঁচিতে হইবে। সময় সময় বয়োধিক্যের ক্লাস্তিবোধ করিয়া থাকি, অল্প সময়ে নিজেকে বেশ সুস্থ-সবল বলিয়াই মনে হয়। আমার দেহ বেশ সুগঠিত, আঘাত সহ্য ও অতিক্রম করিবার মত মানসিক বলও আমার আছে। এই কারণে আমি ভাবি, কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা না ঘটিলে আমাকে আরও দীর্ঘকাল বাঁচিতে হইবে। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা লিখিবার পূর্বে আমাকে জীবন যাপন করিতে হইবে।

সম্ভবতঃ ইহার মধ্যে রোমাঞ্চকর দুঃসাহসের কিছুই নাই, দীর্ঘ বহু বর্ষ যে জীবন কারাগারে কাটিল, তাহার মধ্যে রোমাঞ্চকর কি-ই বা থাকিতে পারে! ইহার মধ্যে বিশেষ অভিনবত্বও কিছু নাই, কেন না আমার সহস্র সহস্র স্বদেশবাসী নরনারীর জীবনের উত্থান ও পতন, হর্ষ ও বিষাদ, আনন্দ ও অবসাদ, তীব্র কর্মপ্রবণতা ও পরবশ নিঃসঙ্গতার সহিত মিলিয়া মিশিয়া আমার এই সকল বর্ষ অতিবাহিত হইয়াছে। আমি জনসাধারণের একজন হইয়া তাহাদের সহিত একত্রে চলিয়াছি। কখনও বা তাহাদের পরিচালিত করিয়াছি, কখনও তাহারা আমাকে প্রভাবিত করিয়াছে; তথাপি অগ্ন্যাগ্ন সকলের মতই ব্যক্তিগত ভাবে আমি জনতার মধ্যেও আমার স্বতন্ত্র জীবন যাপন করিয়াছি। সময় সময় আমাদেরকে অভিনেতার মত সচেতন ভঙ্গীতে মনোভাব প্রদর্শন করিতে হইয়াছে, কিন্তু আমরা যাহা করিয়াছি তাহা কঠোর সত্য এবং অকৃত্রিম। ইহা দ্বারাই আমরা ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র অহমিকার উর্দ্ধে উঠিয়াছি এবং বল ও প্রাধান্য লাভ করিয়াছি, হয় ত ক্ষেত্রান্তরে

তাহা সম্ভব হইত না। কার্যের সহিত আদর্শের ঐক্যসাধন করিতে গিয়া জীবনের পূর্ণতার যে অনুভূতি আসে, সৌভাগ্যক্রমে কখনও কখনও আমরা সে অভিজ্ঞতাও লাভ করিয়াছি। এবং আমরা নিঃশেষে বুঝিয়াছি, এই সকল আদর্শহীন অশ্রু যে কোন প্রকার জীবন এবং প্রবলতর শক্তির নিকট নিরীহ বশতা স্বীকার করিলে জীবন নিষ্ফল অতৃপ্ত ও বিষাদময় হইয়া উঠিত।

এই দীর্ঘকালে আমি অনেক কিছুর সহিত এক বহুমূল্য সম্পদ লাভ করিয়াছি। আমি জীবনকে যতই দুর্লভের আকাজক্ষায় অভিযানরূপে দেখিয়াছি, ততই বুঝিয়াছি, ইহার মধ্যে কতকিছু জানিবার আছে, কত কিছু করিবার আছে। প্রতিদিনই অবিরত আমি বর্দ্ধিত হইতেছি, এই ধারণা আমার মধ্যে এখনও রহিয়াছে, ইহাই আমার প্রতিকর্মে বল সঞ্চার করে। এই আগ্রহেই আমি পুস্তকাদি পাঠ করি এবং জীবন আমার নিকট সাধারণতঃ সার্থক বলিয়া মনে হয়।

এই কাহিনী লিখিতে গিয়া আমি প্রত্যেক ঘটনার সময় আমার মনোভাব ও চিন্তা লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, বিশেষ ঘটনায় আমার মনে কি ভাবের উদ্বেগ হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিয়াছি। অতীতের কোন মনোভাব ফিরিয়া পাওয়া কঠিন এবং পরবর্তী ঘটনাগুলি ভুলিয়া যাওয়াও সহজ নহে। আমার প্রথম জীবনের বর্ণনা অনিবার্যরূপেই পরবর্তীকালের ভাবের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়াছে, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ছিল, প্রধানতঃ আত্মকল্যাণের জন্ত স্বকীয় মানসিক বিকাশের দ্বারা অনুসন্ধান করা। সম্ভবতঃ আমি যাহা লিখিয়াছি, তাহাতে আমার প্রকৃত স্বরূপ ফুটে নাই; হয় ত বা আমি যাহা হইতে চাহিয়াছি অথবা নিজেকে যাহা কল্পনা করিয়াছি তাহাই লিখিয়াছি।

কয়েকমাস পূর্বে শ্রী সি, পি, রামস্বামী আইয়ার প্রকাশে বলিয়াছেন, আমি জনসাধারণের মনোভাবের প্রতিনিধি নহি, তথাপি আমি অধিকতর বিপজ্জনক; কেন না আমার স্বার্থত্যাগ, আদর্শবাদ এবং আমার বিশ্বাসের জোর আছে; ঐগুলিকে তিনি “আত্মসম্মোহন” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যে ব্যক্তি “আত্মসম্মোহিত” সে কখনও নিজেকে বিচার করিতে পারে না এবং যে কোন কারণেই হউক ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমি রামস্বামীর সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতে চাহি না। আমাদের মধ্যে দীর্ঘকাল দেখাশুনা নাই; কিন্তু বহুকালপূর্বে এমন এক সময় ছিল যখন আমরা হোমফ্রল-লীগের যুগ্ম-সম্পাদক ছিলাম। তাহার পর অনেক কিছুই ঘটিয়াছে, রামস্বামী বর্তুলাকার পথে শিরোঘূর্ণনকারী

উপসংহার

উর্কলোকে উঠিয়া গিয়াছেন, আমি মাটির মানুষ, মাটিতেই আছি। আমরা একই দেশের অধিবাসী ছাড়া আমাদের মধ্যে আর কোন ঐক্য নাই। আজ তিনি ব্রিটিশ শাসনের একজন উৎসাহী সমর্থক, বিশেষতঃ গত কয়েক বৎসরে তাঁহার উৎসাহ অধিক বাড়িয়াছে, তিনি আজ ভারতে ও অন্তর্ভুক্ত ডিক্টেটরীর অনুরাগী এবং স্বয়ং দেশীয় রাজ্যের স্বৈচ্ছাচারমূলক শাসনের এক উজ্জ্বল রত্নরূপে শোভা পাইতেছেন। আমাদের মধ্যে মতভেদ প্রচুর, কিন্তু একটা সামান্য বিষয়ে আমাদের মতের ঐক্য আছে। আমি যে জনসাধারণের মনোভাবের প্রতিনিধি নহি, একথা বলিয়া তিনি নিঃসন্দেহে সত্যকথা বলিয়াছেন। আমার মনে সেরূপ কোন মোহ নাই।

নিশ্চয়ই, আমি বিস্মিত হইয়া ভাবি আমি কাহারও প্রতিনিধি নহি। যদিও অনেকে আমার প্রতি সদয় ও বন্ধুভাবাপন্ন তথাপি আমি তাহাদের প্রতিনিধি নহি, ইহাই ভাবিতে চাহি। আমি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এক অদ্ভুত মিশ্রণ, সর্বত্রই আমি অপরিচিত, কোথাও আমার গৃহ নাই। সম্ভবতঃ আমার চিন্তা ও জীবনকে দেখিবার ভঙ্গীর, প্রাচ্য অপেক্ষা যাহাকে পাশ্চাত্য বলা হয়, তাহার সহিতই ঘনিষ্ঠতা অধিক। কিন্তু ভারতমাতা আমাকে ক্রোড়ে করিয়া আছেন; যেমন তিনি তাঁহার সমস্ত সন্তানকে অগণিত উপায়ে বক্ষে ধারণ করিয়াছেন। এবং আমার পশ্চাতে মনের অবচেতন অংশে রহিয়াছে, শত-পুরুষ কিম্বা সংখ্যা যাহাই হউক না কেন, বংশানুক্রমিক ব্রাহ্মণের স্মৃতি। আমি অতীতের সেই কৌলিক স্মৃতি এবং আমার আধুনিক শিক্ষাসংস্কৃতি কোনটাই অতিক্রম করিতে পারি না। ইহারা আমার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ, যদিও ইহাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়দিক হইতেই আমি সাহায্য পাইয়া থাকি, তথাপি ইহার ফলে কি বাহিরের কাজে, কি নিজের জীবনে এক মানসিক নিঃসঙ্গতা অন্তর্ভব করিয়া থাকি, পাশ্চাত্যদেশে আমি একজন অপরিচিত বিদেশী মাত্র। আমি তাহার হইতে পারি না। আমার স্বদেশেও সময় সময় নিজেকে নির্বাসিত বলিয়া মনে হয়।

দূরবর্তী পর্বত দেখিয়া মনে হয়, অতি সহজেই আরোহণ করা যায়, পর্বতশৃঙ্গ ইন্ধিতে আহ্বান করে! কিন্তু মানুষ নিকটবর্তী হইলেই বাধাবিল্ল দেখা দেয়, সে যতই উঠিতে থাকে ততই আরোহণ ক্লেশকর হইয়া উঠে, পর্বতশৃঙ্গ মেঘে ঢাকা পড়িয়া যায়। তথাপি এই আরোহণের উত্তমের সার্থকতা আছে, এবং ইহার বিশিষ্ট

আনন্দ ও তৃপ্তিও আছে। সম্ভবতঃ সংগ্রামের মধ্যে জীবনের কে গৌরব, পরিণাম কলের মধ্যে ততটা নহে। প্রকৃত সত্য পথ কি, সকল সময় তাহা বুঝা কঠিন, তবে সময় সময় কি সত্য নয় তাহা; বুঝা সহজ; এবং তাহা হইতে দূরে থাকিও ভাল। অত্যন্ত বিনয়ের সহিত আমি মহাপ্রাণ সফ্রেটিসের সর্বশেষবাক্য উদ্ধৃত করিতেছি, “মৃত্যু কি আমি জানি না—হইতে পারে ইহা ভাল এবং আমি উহাতে ভীত নহি। তবে আমি নিশ্চয় করিয়া জানি যে নিজের অতীতকে বর্জন করা মন্দ; অতএব যাহা আমি মন্দ বলিয়া জানি তাহার পরিবর্তে যাহাতে ভাল হইতে পারে, তাহাই গ্রহণ করিব।”

কত বৎসর কারাগারে কাটিল! একাকী বসিয়া একান্তে চিন্তা করিয়াছি; কত ঋতু আসিল গেল, একের পর আর বিন্মতির অতলে মিলাইয়া গিয়াছে! কত চন্দ্রের হাসবুদ্ধি আমি লক্ষ্য করিয়াছি, এবং কতবার অজস্র নক্ষত্রপুঞ্জ নিঃশব্দ গতিতে মহিমময় শোভায় চলিয়া গিয়াছে! আমার যৌবনের কতদিন এই কারাগারে সমাধিস্থপ্ত; সময় সময় সেই মৃত দিবসগুলির প্রেতমূর্ত্তি তীব্র স্মৃতি লইয়া জাগিয়া উঠে, কাণে কাণে বলে; “ইহার কি কোন সার্থকতা আছে?” এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার কোন বিধা নাই। যদি আমার বর্তমান জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লইয়া জীবনপথে আর এক বার যাত্রার সুযোগ পাইতাম, তাহা হইলে আমার বক্তীগত জীবনে অনেক কিছু পরিবর্তন করিতে চেষ্টা করিতাম সন্দেহ নাই; পূর্বে যাহা করিয়াছি, তাহা আরও ভাল করিয়া করিতে পারিতাম; কিন্তু জনসাধারণের কাজে আমার প্রধান সিদ্ধান্তগুলি একই থাকিত। অবশ্য আমি উহা পরিবর্তন করিতে পারি না, কেন না ঐগুলি আমা অপেক্ষাও শক্তিমান; এবং আমার আয়ত্তের অতীত এক শক্তি আমাকে ঐগুলি গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছে।

অত্ৰু কারাগারে এক বৎসর পূর্ণ হইল। আমার দুই বৎসর কারাদণ্ডের মধ্যে এক বৎসর অতিবাহিত হইল। আরও পূর্ণ এক বৎসর; কেন না অশ্রম কারাদণ্ড, দণ্ড মকুবের কোন বিধান নাই। এমন কি, যে এগার দিন আমি বাহিরে ছিলাম, তাহাও আমার দণ্ড কালের সহিত পুনরায় যোগ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এ বৎসরও কাটিবে এবং আমি বাহিরে যাইব—এবং তারপর? আমি জানি না, তবে জীবনের এক অধ্যায় শেষ হইয়া অপর অধ্যায়ের সূচনা হইল। ইহা যে কি হইবে আমি ধারণা করিতে পারি না। জীবন-পুথির পাতাগুলি বন্ধ!

পুনশ্চ

বাডেনওয়েলার, সোয়ার্জওয়াল্ড

২৫শে অক্টোবর, ১৯৩৫

মে মাসে আমার পত্নী ভাওয়ালী হইতে চিকিৎসার জন্ত ইউরোপ যাত্রা করিলেন। তিনি চলিয়া গেলে ভাওয়ালী যাওয়ার আর কোন প্রয়োজন রহিল না, পনের দিন পর পর জেলের বাহিরে পার্কতা পথে মোটরে ভ্রমণ শেষ হইল। ইহার ফলে, আলমোড়া জেল আমার নিকট নীরস ও নিরানন্দকর হইয়া উঠিল।

কোয়েটার ভূমিকম্পের সংবাদ আসিল, কিছুকালের জন্ত অল্প সব কিছু ভুলিয়া গেলাম। কিন্তু বেশী দিনের জন্ত নহে; ভারত-গভর্নমেন্ট আমাদিগকে তাঁহাদের ভুলিয়া থাকিতে, অথবা তাঁহাদের কাজ করার অদ্ভুত ব্যবস্থা ভুলিয়া থাকিতে দেন না। আমরা শুনিলাম, কংগ্রেসের সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং ভূমিকম্পের সাহায্য কার্যে ভারতে সর্কাপেক্ষা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে সেবাকার্যের জন্ত কোয়েটায় যাইতে দেওয়া হইল না। এমন কি, গান্ধিজী ও অন্যান্য খ্যাতনামা ব্যক্তিদেরও যাইতে দেওয়া হইল না। কোয়েটার ভূমিকম্প সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখিয়া অনেক ভারতীয় সংবাদপত্রের জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হইল।

কি ব্যবস্থা পরিষদ, কি গভর্নমেন্টের শাসন বিভাগ, কি সীমান্ত প্রদেশে বোমা নিক্ষেপ সর্বত্রই একই সামরিক মনোবৃত্তি, একই পুলিশী দৃষ্টি-ভঙ্গী। মনে হয় যেন ভারতে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট, ভারতীয় জনসাধারণের একটি বৃহৎ অংশের সহিত স্থায়ীভাবে সংগ্রামে রত রহিয়াছেন।

পুলিশের প্রয়োজন ও আবশ্যক আছে; কিন্তু পুলিশ কনেষ্টবল ও রেগুলেশান লাঠি বোঝাই জগৎ বাসের পক্ষে খুব প্রীতিবর নহে। একথা সর্বত্রই শোনা যায় যে, অবাধ বলপ্রয়োগের ফলে যে বলপ্রয়োগ করে তাহারও অধঃপতন হয় এবং যাহার উপর বলপ্রয়োগ করা যায়, সেও অপমানিত ও অধঃপাতিত হয়। ভারতের বড় চাকুরীয়া মহলে বিশেষভাবে ভারতীয় সিভিল সার্কিসের নৈতিক ও বুদ্ধিগত ক্রমাবনতির মত প্রত্যক্ষ ব্যাপার অগ্রকার ভারতে অতি অল্পই আছে। বড় চাকুরীয়া মহলে ইহা সর্বাধিক প্রত্যক্ষ হইলেও,—স্থত্রের মত ইহাতে সমস্ত

জওহরলাল নেহরু

চাকুরীয়া মাজেই গ্রথিত। যখনই বড় চাকুরীতে কাহাকেও নিয়োগের কথা উঠে, তখন এই নূতন ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ব্যক্তিকেই যোগ্যতম বলিয়া নিয়োগ করা হয়।

আমার পত্নীর অবস্থা সঙ্কটজনক এই সংবাদ আসায় ৪ঠা সেপ্টেম্বর সহসা আমাকে আলমোড়া জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হইল। জার্মানীর সোয়াজ্জুওয়াল্ডের বাডেনওয়েলারে তাঁহার চিকিৎসা চলিতেছিল। আমি শুনিলাম আমার কারাদণ্ড “স্থগিত” রাখা হইল এবং আমার কারাদণ্ড শেষ হইবার সাড়ে পাঁচ মাস পূর্বেই আমি মুক্ত হইলাম। বিমানপোতে আমি ইউরোপে ছুটিলাম।

ইউরোপ বিক্ষুব্ধ, যুদ্ধভীতি ও কোলাহলময়, দিকচক্রবালে অর্থনৈতিক সঙ্কট ঘনাইয়া আছে। আক্রান্ত আবিসিনিয়ার জনসাধারণের উপর বোমা বর্ষণ চলিতেছে; বিভিন্ন সাম্রাজ্যের মধ্যে সংঘাত এবং পরস্পরের প্রতি ভীতিপ্রদর্শন চলিতেছে। সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইংলণ্ড শাস্তি ও রাষ্ট্রসঙ্ঘের সমবেত নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ব্যগ্র, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহা বোমাবর্ষণ এবং তাহার অধীন জাতিগুলিকে নির্ধমভাবে দমন করিতেছে। কিন্তু এই ক্রমঃ অরণ্যের মধ্যে কি নিস্তরঙ্গ শান্তি, এমন কি, ‘স্বস্তিক’ও বড় বেশী দেখিতে পাই না। উপত্যকা হইতে কুয়াসা ঘনাইয়া উঠে, ফ্রান্সের সীমান্ত ও কাস্তার আবৃত হইয়া যায়; আমি বিস্মিত হইয়া ভাবি, উহার পশ্চাতে কি রহিয়াছে।

পরিশিষ্ট—ক

স্বাধীনতা দিবসের সঙ্কল্প বাক্য

২৬শে জানুয়ারী, ১৯৩০

আমরা বিশ্বাস করি যে, আত্মবিকাশের পূর্ণ সুযোগলাভের জন্য অত্যাশ্রিত দেশের অধিবাসীদের ত্রায় ভারতবাসীদেরও স্বাধীনতা লাভ করিবার, দ্বীয় শ্রমার্জিত বিত্ত ভোগ করিবার এবং জীবন ধারণের উপযোগী উপকরণ পাইবার অবিচ্ছেদ্য অধিকার আছে। আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, যদি কোনও গভর্নমেন্ট কোন জাতিকে এই সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত করে এবং তাহাকে নির্যাতন করে, তবে সেই গভর্নমেন্টকে পরিবর্তন বা ধ্বংস করিবার অধিকারও সেই জাতির আছে। ভারত গভর্নমেন্ট ভারতবাসীকে শুধু স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত রাখিয়াই বিরত হয় নাই, অধিকন্তু জনসাধারণের শোষণের উপরই আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতবর্ষের অর্থনীতি ও রাজনীতি, সভ্যতা ও অধ্যাত্ম-সমুন্নতির সর্বনাশ করিয়াছে, সুতরাং ভারতের পক্ষে ব্রিটিশ সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পূর্ণ স্বরাজ অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা ব্যতীত গতান্তর নাই, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

ভারতের অর্থনৈতিক সর্বনাশ হইয়াছে। আয়ের তুলনায় অত্যধিক পরিমিত রাজস্ব আমাদের দেশের লোকের নিকট আদায় করা হয়। আমাদের দৈনিক আয় গড়পড়তা সাত পয়সা মাত্র। আমরা যে গুরু করভার বহন করিতে বাধ্য হই, তাহার শতকরা বিশ টাকা কৃষকদের নিকট হইতে ভূমি-কর স্বরূপ এবং শতকরা তিন টাকা লবণ গুরু বাবদ আদায় করা হয়। এই গুরু ভারে দরিদ্র জনসাধারণ অত্যন্ত পীড়িত হইতেছে।

নূতা কাটা প্রভৃতি গ্রামাশিল্লের ধ্বংস সাধন করিয়া তাহার পরিবর্তে অত্যাশ্রিত দেশের ত্রায় কোনও নূতন শিল্পের প্রবর্তন করা হয় নাই, ফলে দেশের কৃষক সম্প্রদায়কে বৎসরে অন্ততঃ চারি মাস কাল অলসভাবে সময় কাটাইতে হয় এবং শিল্প-নৈপুণ্যের অভাবে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তিও খর্ব হইতেছে।

বাণিজ্য-গুরু এবং মুদ্রা-নীতি এরূপ চতুরতার সহিত পরিচালিত

করা হইতেছে যে, তাহার ফলে কৃষকদের বোঝা আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের দেশের আমদানী পণ্যের মধ্যে অধিকাংশই ইংলণ্ডে প্রাপ্ত। বাণিজ্য-শুল্ক ধার্য্য করিবার পদ্ধতি ব্রিটিশ শিল্পের প্রতি পক্ষপাতহুই, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় এবং উক্ত শুল্ক লব্ধ রাজস্ব দরিত্রের দুঃখ নিরাকরণের জন্য ব্যয়িত না হইয়া ব্যয়বহুল শাসনতন্ত্র পরিচালনার জন্য ব্যয়িত হয়। মুদ্রা-বিনিময় নীতি আরও অধিক যথেষ্টাচারিতার পরিচায়ক; ইহার ফলে কোটি কোটি টাকা দেশ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে।

ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতের রাষ্ট্রীয় অবস্থা যত হীন হইয়াছে, এরূপ আর কখনও হয় নাই। কোন প্রকার শাসন-সংস্কারই ভারতবাসীকে প্রকৃত রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করে নাই। আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিকে পর্য্যন্ত বিদেশী শাসকগণের নিকট অবনত হইতে হয়। আমরা স্বাধীন মত প্রকাশ এবং স্বাধীনভাবে সজ্ঞ সমিতি গঠনের অধিকারে বঞ্চিত। আমাদের দেশের অনেকেরই নির্বাসিত অবস্থায় বিদেশে কাল কাটাইতে হইতেছে। তাঁহারা স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে পারেন না। শাসনকার্য্য পরিচালনার উপযোগী সমস্ত প্রতিভার বিলোপ সাধনের ফলে জনসাধারণকে শুধু কেরানীগিরি এবং গ্রাম্য পঞ্চায়েতী লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইতেছে।

সভ্যতা-সংস্কৃতির দিক দিয়া, বৈদেশিক শিক্ষা-পদ্ধতি আমাদের কাছে আমাদের বিশিষ্ট ভাব ধারা হইতে বিচ্যুত করিয়াছে। ফলে যে শৃঙ্খল আমাদের দাসত্বের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সেই শৃঙ্খলকেই আমরা আদর করিতে শিখিয়াছি।

বাধ্যতামূলক নিরস্ত্রীকরণ আমাদের নৈতিক সর্বনাশ করিয়া আমাদের নিকারী করিয়া ফেলিয়াছে। আমাদের প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতাকে নিষ্পেষণ করিবার উদ্দেশ্যে নিযুক্ত বিজাতীয় সৈন্যদলের উপস্থিতির মারাত্মক ফল এই হইয়াছে যে, উহাদিগকে দেখিয়া আমরা মনে করি যে, বিদেশীয় আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে, এমন কি, চোর, ডাকাত, গুণ্ডা প্রভৃতির হস্ত হইতে নিজেদের গৃহ রক্ষা করিতেও আমরা অসমর্থ।

যে শাসন-পদ্ধতি আমাদের দেশের এই চতুর্দিক সর্বনাশ সাধন করিয়াছে, সেই শাসন-পদ্ধতির অধীনে আর মুহূর্ত্তকাল বাস করা আমরা মহুগ্ৰস্ত ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপরাধ বলিয়া মনে করি। এ কথা আমরা অবশ্যই স্বীকার করি যে, হিংসাই স্বাধীনতা অর্জনের প্রকৃষ্টতম পন্থা নহে; স্তবরাং আমরা ব্রিটিশের সহিত সর্বপ্রকার স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা বর্জনাধ্য বর্জন করিবার জন্য প্রস্তুত হইব এবং কর প্রদান বন্ধ ও অগ্রাগ্র উপায়ে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ-নীতি অবলম্বন করিবার জন্য প্রস্তুত হইব। আমাদের

পরিশিষ্ট—গ

স্মারক-প্রস্তান

২৬শে জানুয়ারী, ১৯৩১

.....অধিবাসিবর্গ আমরা গর্ব ও কৃতজ্ঞতা সহকারে,—স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসর্গাকৃত ভারতের পুত্রকন্যাদিগকে প্রশংসা করিতেছি—তাহারা মাতৃভূমির মুক্তির জন্ত ত্যাগস্বীকার ও দুঃখবরণ করিয়াছেন, আমাদের মহান ও প্রিয় নেতা মহাত্মা গান্ধী মহান উদ্দেশ্য ও উচ্চতর কর্তব্যের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া আমাদের সতত অনুপ্রাণিত করিতেছেন, আমাদের শত শত সাহসী যুবক স্বাধীনতার বেদীমূলে জীবনদান করিয়াছেন। পেণোয়ার, সমগ্র সীমান্তপ্রদেশ, সোলাপুর, মেদিনীপুর জিলা এবং বোম্বাই-এর সহিদগণকে আমরা শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দিতেছি। যে শত-সহস্র ব্যক্তি শত্রুপক্ষের হস্তে বর্বর যষ্টি প্রহারের দ্বারা লাঞ্চিত হইয়াছেন; গাড়োয়ালী সৈন্যদলের এবং গভর্নমেন্টের পুলিশ ও সমর বিভাগের যে সকল কর্মচারী নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও স্বদেশবাসীর বিরুদ্ধে গুলিবর্ষণ করিতে বা হস্ত উত্তোলন করিতে অস্বীকার করিয়াছেন, গুলিগাটের যে সকল সাহসী কৃষক বহুপ্রকারে উৎপীড়িত হইয়াও অদম্য উৎসাহে অটল রহিয়াছেন, ভারতের অগ্ন্যাগ্ন প্রদেশের সাহসী ও দীর্ঘকাল দুঃখভোগী কৃষক-মণ্ডলী, যাহারা দমননীতির বহুতর আয়োজন সত্ত্বেও বর্তমান সংঘর্ষে সম্পূর্ণরূপে যোগ দিয়াছেন; যে সকল ব্যবসায়ী এবং বৈদিক-সমাজের যে সকল ব্যক্তি নিজেদের ক্ষতি করিয়াও জাতীয় সংগ্রামে সাহায্য করিয়াছেন, বিশেষভাবে বিদেশীবস্ত্র ও ব্রিটিশ পণ্যবর্জনে সহায়তা করিয়াছেন; যে লক্ষাধিক নরনারী কারাগারে গিয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন এবং কখনও বা কারাগারীতির মধ্যেও প্রহার ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন; যে সকল সাধারণ স্বেচ্ছাসেবক, ভারতের প্রকৃত সৈনিকের গায়, যশঃ ও পুরস্কারের প্রত্যাশা না করিয়া, মহান উদ্দেশ্যের সেবায় একাগ্রচিত্তে অবিরত শাস্তিপূর্ণ ভাবে কার্য্য করিয়াছেন, দুঃখ দুর্দশা ভোগ করিয়াছেন, তাহাদের সকলের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিতেছি।

ভারতের নারীজাতির প্রতি আমাদের গভীর আশ্রয় অর্থ্য করিতেছি। মাতৃভূমির সঙ্কট কালে তাঁহারা স্বতঃপূর্ব ও গৃহে ত্যাগ করিয়া ভারতের জাতীয় সৈন্তবলের পুরোভাগে আসিয়া সহিত কাঁধ মিলাইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহাদের সহিত একত্রে জয় ও আত্মত্যাগে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং অপূর্ব সাহস সহনশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। আমাদের গর্ব ও গৌরবের স্থল ও বানরসেনাকেও আমরা অভিনন্দিত করিতেছি, যাহারা কিশোর হইলেও, সাহসের সহিত আন্দোলনে যোগ দিয়াছে এবং মহান জয় নিজেদের উৎসর্গ করিয়াছে।

এবং আমরা সন্তোষচিত্তে লক্ষ্য করিতেছি ভারতের ক্ষুদ্র বৃহৎ গুলি একযোগে সংঘর্ষে যোগ দিয়াছেন এবং সর্বশক্তি নিয়োজিত করিতেছেন। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিশেষভাবে শিখ, পাশী, খ্রীষ্টান ও অন্যান্য অনেকে তাহাদের মাতৃভূমির কল্যাণ সাহসের সহিত অগ্রসর হইয়াছেন, দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন তুলিতে সাহায্য করিতেছেন, ভারতের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার ও স্বাধীনতা হইতেছেন, এবং নবলব্ধ স্বাধীনতাদ্বারা সকল বন্ধন, সং ভারতীয়ের মধ্যে অনৈক্য ও ভেদ দূর করিয়া মনুষ্যত্বের চরম সেবা করিতেছেন। ভারতের কল্যাণের জয় আমাদের আত্মত্যাগ ও দুঃখবরণের এই মহনীয় দৃষ্টান্তে আমরা অমুপ্রাণিত এবং পূর্ণ স্বাধীনতালাভের স্বপ্নবাক্যের পুনরাবৃত্তি করিয়া স্বাধীন ভারত সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন থাকিবে।

পরিশিষ্ট—খ

বিশ্বাস এই যে, উত্তেজনার কারণ বিত্তমান থাকা সত্ত্বেও আমরা হিংসামূলক উপায় অবলম্বন না করিয়া স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা বর্জন করিতে পারি এবং করপ্রদানে বিরত হই, তাহা হইলে এই অমায়ুষিক সিনতন্ত্রের অবসান সুনিশ্চিত। ততএব এতদ্বারা আমরা শান্ত ও সংযত চিন্তার সঙ্কল্প গ্রহণ করিতেছি যে, পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কংগ্রেস যখন স্বরূপ নির্দেশ দিবেন, আমরা সেই নির্দেশ ঐকান্তিকভাবে পালন করিব—সেই মাতরম্!

পরিশিষ্ট—খ

এরোডা জেল হইতে ১৯৩০-এর ১৫ই আগষ্ট কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে তেজ বাহাদুর সপ্ত ও মিঃ এম, আর জয়াকরের নিকট শান্তি আশ্বাসের জন্য সর্ব সম্পর্কে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছিলেন।

এরোডা সেন্ট্রাল জেল

১৫ই আগষ্ট, ১৯৩০

প্রিয় বন্ধুগণ;

কংগ্রেস ও ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের মধ্যে শান্তিপূর্ণ আপোষ সাধনের জন্য আপনারা যে কর্তব্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, সেজন্য আমরা আপনাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আপনাদের সহিত বড়লাটের যে পত্র বিনিময় হইয়াছে তাহা উত্তমরূপে পাঠ করিয়া আপনাদের সহিত সুস্বাহুপুঙ্খরূপে আলোচনার সুযোগ পাইয়া এবং আমাদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, আমাদের দেশের পক্ষে সম্মানজনক আপোষের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। গত পাঁচ মাসের গণ-জাগরণ অতীব বিস্ময়কর; নানাশ্রেণীর মানামতের জনসাধারণ অকাতরে দুঃখবরণ করিয়াছে; তথাপি আমাদের মনে হয় আশু উদ্বেগ সিদ্ধির পক্ষে এই দুঃখবরণও পর্যাপ্ত নহে, কিঞ্চিৎ অধিক নহে। নিরুপদ্রব প্রতিরোধ নীতির ফলে দেশের অনিষ্ট হইয়াছে, ইহা সময়োপযোগী হয় নাই এবং ইহা নিয়মতন্ত্রবিরোধী, আপনাদের এবং বড়লাটের এই মতের সহিত আমাদের মতের ঐক্য নাই একথা বলাই বাহুল্য। ইংলণ্ডের ইতিহাস রক্তাক্ত বিপ্লবের দৃষ্টান্তে পূর্ণ, ইংরাজগণ ঐগুলির অভয় প্রশংসাবাদ করেন এবং আমাদেরকেও ঐরূপ

করিতে শিখাইয়াছেন। অতএব যে আন্দোলনের উদ্দেশ্য শান্তিপূর্ণ এবং কার্যক্ষেত্রেও বাহ্যিক বিপুলভাবে প্রমাণিত হইয়াছে তাহার নিন্দা করা বড়লাট কিম্বা কোন বুদ্ধিমান ইংরাজের পক্ষে অশোভনীয়। বাহ্যিক হউক বর্তমান নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের সরকারী বা বেসরকারী নিন্দাবাদের সহিত কলহ করিবার কোন অভিপ্রায় আমাদের নাই। এই আন্দোলন জনসাধারণ যেরূপ বিপুল উৎসাহে বরণ করিয়াছে, আমাদের মতে ইহার যৌক্তিকতার তাহাই চূড়ান্ত প্রমাণ। বাহ্যিক হউক আসল কথা এখানে এই যে, যদি সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন বন্ধ বা স্থগিত রাখিবার জন্ত আমরা আপনাদের সহিত আনন্দ সহকারে একমত হইতাম। আমাদের দেশের নরনারী বালক বালিকাদিগকে অহেতুক কারাদণ্ড, যষ্টিপ্রহার ও অধিকতর দুঃখের সম্মুখে তুলিয়া দেওয়ার মধ্যে আমাদের কোন আনন্দের কারণ থাকিতে পারে না। অতএব আপনারা আমাদের কথা বিশ্বাস করুন এবং আপনাদের মারফৎ বড়লাটকেও বিশ্বাস করিতে বলি যে, আমরা সম্মানজনক আপোষের প্রত্যেকটি পথ ও উপায় তুলমূল করিয়া বিচার করিয়াছি, কিন্তু আমরা অকপটে স্বীকার করিতেছি যে এখনও আমরা দূর দিখলয়ে কোন আশার চিত্র দেখিতেছি না। ভারতের নরনারীরাই ভারতের পক্ষে কি ভাল তাহা নির্ণয় করিবার একমাত্র অধিকারী, এই মত ইংরাজ চাকুরীয়া মণ্ডলী মানিয়া লইয়াছেন, এমন পরিবর্তনের কোন লক্ষণ আমরা দেখিতে পাইতেছি না। সরকারী কর্মচারীদের উদার ঘোষণাগুলি সাধু ইচ্ছা ও অকপট আগ্রহ হইতে প্রকাশিত হইলেও, আমরা উহাতে অবিশ্বাস করি। দীর্ঘকাল যাবৎ এই প্রাচীন ভূমির জনসাধারণ ইংরাজগণ কর্তৃক শোষিত হওয়ার ফলে আমাদের দেশের নৈতিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক কি ধ্বংসসাধন হইয়াছে তাঁহারা তাহা দেখিতে অক্ষম। তাঁহারা কিছুতেই নিজেদের বুঝাইয়া উঠিতে পারিবেন না যে তাঁহাদের একমাত্র পথ আমাদের স্বাক্ষর হইতে নামিয়া যাওয়া এবং অতীতের অগাধের ক্ষতিপূরণ করিবার জন্ত, এক শতাব্দী ধরিয়া ব্রিটিশ প্রভুত্বের ফলে আমাদের দিগকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিবার যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা হইতে আমাদের দিগকে উদ্ধার পাইতে সাহায্য করা।

কিন্তু আমরা জানি যে আপনারা এবং আমাদের অনেক বিজ্ঞ স্বদেশবাসী ভিন্নভাবে চিন্তা করেন। আপনারা বিশ্বাস করেন হৃদয়ের পরিবর্তন হইয়াছে; অন্ততঃপক্ষে প্রস্তাবিত বৈঠকে যোগদান করিবার মত পরিবর্তন হইয়াছে। অতএব আমাদের কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হওয়া

পারিশিষ্ট—খ

সঙ্গেও আমাদের সাধ্যমত আমরা আপনাদের সহিত সানন্দে সহযোগিতা করিব।

আমরা বর্তমান যে অবস্থার মধ্যে অবস্থিত তাহাতে আমরা কতদূর অগ্রসর হইতে পারি সে সম্বন্ধে আমাদের নিম্নলিখিত মনোভাব ব্যক্ত করিতেছি।

(১) আমাদের মনে হয় প্রভাবিত বৈঠক সম্পর্কে আমাদের নিকট লিখিত পত্রে বড়লাট যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন তাহা এত অস্পষ্ট যে গতবৎসর নাহোরে গৃহীত জাতীয় দাবীর সহিত তুলনা করিয়া তাহার মূল্য নির্ণয়ে আমরা অক্ষম হইতেছি। কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির নিয়মিত সভা ব্যতীত এবং প্রয়োজন হইলে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন ব্যতীত কংগ্রেসের তরফ হইতে কোন কথা বলা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। তবে ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের পক্ষ হইতে আমরা বলিতে পারি, কোন মীমাংসাই সম্ভাবজনক হইবে না, যদি না,—

(ক) ভারতের ইচ্ছামত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে যাইবার অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হয়।

(খ) ভারতীয় সৈন্যদলের উপর কর্তৃত্ব, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ এবং বড়লাটের নিকট লিখিত পত্রে গান্ধিজীর এগার দফা দাবী সহ জনমতের নিকট দায়ী জাতীয় গভর্নমেন্ট সম্পূর্ণরূপে ভারতে প্রবর্তন করা হয় এবং

(গ) জাতীয় গভর্নমেন্টের নিকট যাহা অন্তায় বিবেচিত হইবে অথবা যাহা ভারতীয় জনসাধারণের স্বার্থের অন্তর্কুল নহে; ভারতের স্বাধীনতা সহ বিভিন্ন স্ববিধা প্রভৃতির ব্রিটিশ দাবী সম্পর্কে প্রয়োজন হইলে কোন নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচারকমণ্ডলীর নিকট উপস্থিত হইবার অধিকার ভারতকে দেওয়া হয়।

মন্তব্য—ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইবার কালে ভারতের স্বার্থের জন্ত যে সকল অদল বদল প্রয়োজন হইবে তাহা ভারতের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই নির্ণয় করিবেন।

(২) যদি ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এই সকল বিষয় সমীচীন মনে করেন এবং ঐ মর্মে সম্ভাবজনক ঘোষণাপত্র প্রচার করা হয়, তাহা হইলে আমরা আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করিবার জন্ত কাঙ্ক্ষকরী সমিতিতে পরামর্শ দিব। অর্থাৎ অমান্য করিবার জন্তই যে সকল আইন অমান্য করা হইতেছে তাহা প্রত্যাহৃত হইবে। কিন্তু যতদিন গভর্নমেন্ট স্বতঃপ্রসূত হইয়া বিদেশীবস্ত্র ও মত্ত রহিত না করেন ততদিন

জগদ্বৈশাল নেহরু

কর্তব্য। নিম্নলিখিত কার্যসমূহ হইবে। জনসাধারণ কর্তৃক লবণ তৈয়ারী হইবে এবং লবণ আইনের অন্তর্ভুক্ত বারাদেশি প্রেরণ করা হইবে না। পূর্ণবয়স্কের অধিকাংশ লবণ গোলার উপর উৎসর্গ করা হইবে না।

(৩) আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করার সঙ্গে সঙ্গে—

(ক) মণ্ডিত লবণ বিচারার্থী সত্যগ্রহী ও সন্তোষ রাজনৈতিক বন্দী, বন্দীরা যেরূপে হিংসাত্মক অপরাধ বা হিংসাত্মক কার্যে প্ররোচনা বিবাহ অপরাধে অপরাধী নহে তাহাদিগকে মুক্তির আদেশ দিতে হইবে।

(খ) লবণ আইন, গ্রেস আইন, খাজনা আইন এবং অন্যান্য আইনবলে যে সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে তাহা ফিরাইয়া দিতে হইবে।

(গ) মণ্ডিত সত্যগ্রহীর নিকট অথবা গ্রেস আইনবলে যে জরীমান আদায় কিংবা জামীনের টাকা লওয়া হইয়াছে তাহা ফিরাইয়া দিতে হইবে।

(ঘ) আইন অমান্য আন্দোলন কালে যে সকল সরকারী কর্মচারী ও গ্রাম্য তহশিলদার প্রভৃতি পদত্যাগ করিয়াছেন অথবা কর্মচ্যুত হইয়াছেন তাহারা পুনরায় সরকারী চাকুরি গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে হইবে।

মন্তব্য—এই সকল প্রস্তাবের মধ্যে অসহযোগ আন্দোলনের সময়ের ব্যাপারও ধরিতে হইবে।

(ঙ) বড়লাট কর্তৃক মঞ্জুরী সমস্ত অর্ডিগ্রান্স প্রত্যাহার করিতে হইবে।

(৪) এই বিষয়গুলির প্রাথমিক সম্ভাবজনক মীমাংসা হইলেই প্রস্তাবিত বৈঠকের পঠন ও উহাতে কংগ্রেসের প্রতিনিধি প্রেরণের কথা আলোচনা করা যাইতে পারে।

আপনাদের বিশ্বস্ত

মতিলাল নেহরু

এম. কে. পাণ্ডী

সরোজিনী নাইডু

"রত্নভাই প্যাটেল

জয়রামদাস দৌলভরাম

সৈয়দ মঈনুদ

জগদ্বৈশাল নেহরু

